ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ৯, সংখ্যা ১৯, জানুয়ারি, ২০২২

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

Vol. 9th Issue 19th, Jan., 2022

সম্পাদক

আশিস রায়

এবং প্রান্তিক

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 9th Issue 19th, 10th Jan. 2022, Rs. 750/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
৯ ম বর্ষ ও ১৯ তম সংখ্যা
১০ জানুয়ারি, ২০২২

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিস্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৭৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. মোনালিসা দাস, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মাখন চন্দ্র রায় (বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
ড. শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)

সহযোগী সহ-সম্পাদক - সৌরভ বর্মণ

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। অনধিক ৪০০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।
২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডিএফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।
৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।
৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২
ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address
Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস
ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান
দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

অমিয়ভূষণের 'দুখিয়ার কুঠি' : সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা
উর্বী মুখোপাধ্যায় ১৫
টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ : প্রেক্ষিত জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা
অজয় কুমার দাস ২২
'স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা প্রেমের কবিতা'
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা ৩৮
'জতুগৃহ' : একটি নৃশংস গণহত্যা
রচনা রায় ৫৭
চলমান সময়ের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিশু-কিশোর চরিত্র ও শিক্ষাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা
আব্দুল্লা মোল্লা ৬৫
অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'শাদা হাওয়া': একটি পর্যালোচনা
স্বরূপ হালদার ৭২
বাংলা উপন্যাসের ইতিবৃত্তে নতুন দিগন্ত : প্রসঙ্গ সন্তোষ করের 'মুক্তামাছ'
অনির্বাণ সাহু ৭৬
প্রাবন্ধিক আনিসুজ্জামানের মনস্বিতায়, মাঙ্গলিক চেতনায়-মুসলিম মানস দর্শন ও বাংলা সাহিত্যে তার সাঙ্গীকরণ
আর্পিতা দাস ৮৬
গল্পকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্প : কিছু কথা
বিশ্বজিৎ পোদ্দার ৯৪
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প: একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা
হেনা বিশ্বাস ১০২
"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" ও প্রকৃতি
শেফালী মণ্ডল ১১০
বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণে ব্যোমকেশ-ভাষ্য : একটি পর্যালোচনা
পঙ্কজ কুমার মণ্ডল ১১৬
"তরুণ বৎসরের ফুল, পরিণত বৎসরের ফল": অরণ্যদুহিতার অভিজ্ঞান
দীপক নন্দী ১২২

সুখলতা রাও ও বাংলা শিশুসাহিত্য-একটি সমীক্ষা
বিজয় দাস ১২৮
দুধবিবি : এক লৌকিক দেবীর ইতিকথা
শুভঙ্কর মণ্ডল ১৩৬
গৌড়ীয় নৃত্যের প্রেক্ষিতে বাংলার দেবদাসী প্রথা: একটি
ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
তানিসা দাস ১৪৬
বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি ও কিন্নর রায়ের ছোটোগল্প
সৈকত মিস্ত্রী ১৫৪
ক্ষণিকার ক্ষণবাদী জীবনচেতনা
বাপী নস্কর ১৬২
জাতি-রাষ্ট্রের গঠন: বাঙালি উদ্বাস্তুদের জীবন-সংগ্রামের ঐতিহাসিক সমীক্ষা
মোঃ নাসির আহমেদ ১৬৬
ঔপন্যাসিক কাজী নজরুল ইসলাম
রাকিবুল হাসান বিশ্বাস ১৭৫
বাংলা কাব্যে নান্দনিকতার বিবর্তন
স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায় ১৮১
সেলিম আল দীনের পুত্র নাটকে নারী ও নদী
শাকিলা তাসমিন ১৮৭
'রাত্রির তপস্যা' : শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকতার পেশার জগৎ
দিব্যেন্দু ঘোষ ১৯৮
অ-চর্চিতা এক বীরাঙ্গনা সৌদামিনী পাহাড়ী: প্রেক্ষাপট অবিভক্ত
মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম
অশ্রুকণা ঘোষ ২০৩
প্রাক স্বাধীনতা পর্বে মেদিনীপুরের ছাত্র আন্দোলন (1905-1942) :
একটি পর্যালোচনা
ইয়াসিন চৌধুরী ২১৪
নলিনী বেরার গল্পে বহুমাত্রিকতার স্বর
ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় ২২২
প্রতিভা বসুর গল্পের অন্দরমহল: একটি পর্যালোচনা
(নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে)
সঙ্গীতা সাহা ২২৯

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নির্বাচিত উপন্যাসে স্বাধীনতা-পরবর্তী নাগরিক নারী
প্রিয়মিতা ঘোষ ২৩৭
বাঙালি মুসলিম নারীর আত্মসচেতনতা ও নবজাগরণ:
নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী
শিবানী মন্ডল ২৪৭
ঔপনিবেশিক সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজ্ঞানভাবনা ও বিজ্ঞানচর্চা
শুভেন্দু বিশ্বাস ২৫৩
মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের বাংলায় আগমন ও তাদের বাণিজ্যিক সাফল্যের
ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক)
ইমরান সেখ ২৫৯
লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির আলোকে নলিনী বেরার উপন্যাস; শবরচরিত
বিন্দেশ্বর টুডু ২৭০
সুন্দরবনে মনুষ্য বসতির গোড়াপত্তনের ইতিহাস
কৃষ্ণ কুমার সরকার ২৮০
একাঙ্ক নাটকের রূপ বিশ্লেষণ—নভেন্দু সেনের ‘পোস্টমর্টেম’ অবলম্বনে
সুকুমার বর্মন ২৮৮
এপিকিউরাস: প্রসঙ্গ সুখবাদ
সুদর্শন দাস ২৯৫
শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের মহিলা উত্তরসূরী :
প্রথম প্রজন্ম-সুখলতা রাও থেকে লীলা মজুমদার
শম্পা লাহা ৩০৫
স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তায় সামাজিক মূল্যবোধ ও বর্তমান সমাজ
বাসুদেব হালদার ৩১৩
রাঢ়ের কবিগান ও মহাভারতের কৃষ্ণ মাহাত্ম্য
সুবীর ঘোষ ৩২৪
আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে
প্রান্তবর্গীয় জীবনচেতনা
কালিপদ বর্মন ৩৩৫
বৈষ্ণব তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের আলোকে রবীন্দ্রনাথের
‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস : একটি অন্বেষণ
সুবর্ণা সেন ৩৪৪
স্বদেশপ্রীতি ও দ্বিজেন্দ্রলালের ‘রাণা প্রতাপসিংহ’ নাটক
অভিজিৎকুমার ঘোষ ৩৫৩

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজন-অভিবাসন এবং পশ্চিমবঙ্গের
উদ্বাস্তু নারী সমাজ
সজ্ঘমিত্রা দাস ৩৫৯
স্বামী বিবেকানন্দ ও বেদান্ত ভাবনা : একটি দার্শনিক সমীক্ষা
জেনারুল সেখ ৩৬৯
নব্যকারকতত্ত্বের একটি অভিমুখ হিসেবে থিম্যাটিক রিলেশন তত্ত্ব
অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ৩৭৮
৪2 এর আন্দোলনের পটভূমিকায় ভারতীয় সংবাদপত্রের অবস্থান
সোনালী নস্কর ৩৮৬
বাংলা শিশুসাহিত্যের ভিত্তিভূমি : প্রসঙ্গ বিদেশি শিশুসাহিত্য ও
ভিক্টোরিয়ান লিটারেচার
দেবাংকৃতা সরদার ৩৯২
বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত দেশভাগ
সুজিত দেবনাথ ৪০১
চরক সংহিতা অনুসারে বিধিবিহিত আহারের প্রকৃতি ও গুণাগুণ বিচার
অমৃতা দাম ৪১৪
মহিষকুড়ার উপকথা : এক বিচ্ছিন্ন মানুষের ইতিবৃত্ত
উৎপল ডোম ৪২৬
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পে দ্বন্দ্বময় দাম্পত্য ও বিচ্ছেদ
টুম্পা নস্কর ৪৩৩
আনন জামানের ‘জুঁইমালার সইমালা’: মৈমনসিংহ-গীতিকার
মলুয়ার পুনর্নির্মাণ
ফারজানা আফরীন রূপা ৪৪৪
আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর গল্প: নিবিড় পাঠ
তন্ময় দেবনাথ ৪৫৭
নির্বাচিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় সমাজ ও মানবিক প্রেম সম্পর্ক
কস্তুরী চৌধুরী ৪৬৮
চিত্রকল্প, জীবনানন্দ দাশ ও ‘রূপসী বাংলা’
রুদ্রজিৎ দাস ঠাকুর ৪৭৯
‘জমিদার দর্পণ’ নাটকে নারী: লাঞ্ছনা ও প্রতিবাদ
রাহুল মণ্ডল ৪৯৩
দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনে উনিশ শতকীয় নারীজীবন-প্রসঙ্গ
শিল্পী অধিকারী ৫০১

নজরুলের মরু-ভাস্কর : মরুর দুলালের জীবন দর্শন
মহম্মদ মুজাহিদ ৫০৯
বিশ্বায়ন ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বিপন্নতার অন্তহীন আখ্যান :
ভগীরথ মিশ্রের আড়কাঠি
সোমা দাস (চৌধুরী) ৫১৮
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা উপন্যাস : বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিসর
সুকন্যা বেরা ৫২৬
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অলৌকিক জলযান' : সমুদ্র-জীবনকেন্দ্রিক মানুষের
জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণ
ননীগোপাল সরকার ৫৩৬
অমর মিত্রের ছোটগল্পে : হারানো শিকড়ের খোঁজে বেদনার অভিব্যক্তি
বহ্নিশিখা সরকার ৫৪৪
উপন্যাস – সংরূপ – প্রয়োজনীয়তা
সুষমা সেন ৫৫৩
সংস্কৃত সাহিত্য-গোলকের দুই মেরু; কালিদাস ও ভবভূতি
নিবেদিতা চৌধুরী ৫৬২
বিদ্যারসাগর ঈশ্বরচন্দ্র তথা শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
রুবেল পাল ৫৭০
সচ্চাষি সম্প্রদায়ের জাতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গঠনের ইতিহাস
(স্বাধীনতা পূর্ব সময় পর্যন্ত)
উজ্জ্বল বিশ্বাস ৫৮৩
উপজাতি সমাজে স্বাস্থ্য, রোগ ও নিরাময়: প্রসঙ্গ জঙ্গল মহলের উপজাতি
দীপক মণ্ডল ৫৯৩
রবীন্দ্র-নাটকে দ্বন্দ্বের বিবর্তন
সাগর দাস ৫৯৭
জীর্ণত্রয়ের অতীত ও বর্তমান
দীপঙ্কর পাত্র ৬০৪
পরিবেশবান্ধব পাটচাষ ও ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি
বিশ্বরূপ প্রামাণিক ৬১০
প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও আঞ্চলিক ইতিহাসের তাত্ত্বিক নির্মাণ
পীযুষ নন্দী ৬২৭
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রবাসী পত্রিকা : ১৯৩১-১৯৪২ খ্রিঃ
নিতাই গায়েন ৬৩৬

SWAMI VIVEKANANDA: A TORCH BEARER OF
WOMEN EDUCATION & EMPOWERMENT
Debashis Biswas ৬৫৫
'The Quarantine And Its Evolution Of Practice :
From Historical Perspective'
Hoque Sabiruddin ৬৬২
Job satisfaction of college teachers in West Bengal:
An empirical study in the field of organizational psychology
Lusika Datta
Usashi Kundu (De) ৬৭২
TEACHER: A FACILITATOR
Subhajit Saha
Bisu Bhuinya ৬৮৩
Environmental Thoughts in Ancient India in the Light of
Dharmashastras
Gopal Chandra Das ৬৮৮
Relations between Environmental Changes and Human
Trafficking in the Indian Sundarbans- A study
Arabindu Sardar ৬৯৩
Patriarchy in Cinderella- Portrayal of the Society
Arkojjwal Dasmahapatra ৭০২
RE-DEFINING THE SOUTHERN BELLE
Madhumita Basu ৭০৫
Partition of India and Bengali Women as
Depicted in Bengali Novels
Utkalika Sahoo ৭১৩
CULTIVATION OF JUTE AND ITS CONTRIBUTION TO
THE ECONOMY OF NINETEENTH CENTURY BENGAL
Chanchal Chowdhury ৭২৩
Relevance of Teacher Motivation to Student Motivation
in the Context of Dooars
Sanghamitra Roy ৭৩৪

The Mentality of Education and the Use of Education in Different Fields during the Mughal Period
(Babar to Aurongojib)
Bimal Mandal ৭৪২

Silent Followers of Mahatma: Recognizing Some Women Followers of Gandhi in Bengal
Sayantani Maitra ৭৬০

Mental health and Maladjustment Issues in the context of Indian Culture and Indian Economy
Sarthak Paul ৭৭০

ROLE OF RAJA RAMMOHAN ROY AS A GREAT REFORMIST OF THE MASSES IN NINETEENTH CENTURY BENGAL
Pradip Kumar Sen Gupta ৭৭৮

PROBLEMS OF ROAD TRANSPORTATION IN MURSHIDABAD DISTRICT, WEST BENGAL
Ananta Halder ৭৮৫

A Study of Reflection of Pandemics in Literature in English: Context Covid 19
Tamali Neogi ৭৯৭

Importance of social media to eradicate Cultural issues and to boost Indian economy
Trisha Paul ৮০৮

THOSE WHO COULD NOT CROSS
Pallab Das ৮১৫

Second Language Teaching Methods: Effectiveness, Limitations and Emerging Activities
Seuli Basak ৮২২

A feminist study of tribal women in selected works of Mahasweta Devi
Madhulina Bauri ৮৩৪

THE KARAM FESTIVAL AND WOMEN SOCIETY OF THE TRIBAL COMMUNITY
Jagannath Mahato ৮৪২

সম্পাদকীয়

অচেনা ভিড়ে চেনাকে খুঁজি। নিরন্তর। অস্বচ্ছকে স্বচ্ছ করার প্রচেষ্টা। প্রতিনিয়ত। বিষয়ের প্রগাঢ়তা উপলব্ধি করি। বারবার। হাজার চেষ্টার মাঝেও অধরা থেকে যায়। মূল বিষয়। শত ক্লান্তির চাদর ভেদ করে প্রকাশিত হয়। অন্তর্নিহিত ভাববস্তু। ভাবনার দূরন্ত ঢেউকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় দূর আলোকে। আলোকিত হয় বিষয়ের অলিগলি। এবারের ‘এবং প্রান্তিক’ এই পথেরই সন্ধানী।

অমিয়ভূষণের ‘দুখিয়ার কুঠি’ : সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা

উর্বী মুখোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : দুখিয়ার কুঠি উপন্যাসে উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের প্রান্তীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন কাহিনি। সভ্যতার অনুপ্রবেশ কীভাবে তাদের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল এবং কীভাবে নানাবিধ সম্পর্কের জটিলতা উপন্যাসের চরিত্রদের জীবনকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল, তারই আলেখ্য এই উপন্যাস। আমরা এই প্রবন্ধে সম্পর্কের সেই বহুমাত্রিকতাকে তুলে ধরার এবং তাঁর কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

শব্দ সূচক : সভ্যতা, অগ্রগতি, পিতৃপরিচয়ের অনুসন্ধান, আত্মদ্বন্দ্ব

অমিয়ভূষণ মজুমদার উত্তরবঙ্গের গ্রামবাংলার অরণ্য, প্রকৃতি তথা প্রান্তীয় আদিবাসী মানুষের নিকটজন হয়ে উঠতে চেয়েছেন। ‘দুখিয়ার কুঠি’র মতো ‘মহিষকুড়ার উপকথা’, ‘বিনদনি’, ‘মাকচক হরিণ’ উপন্যাসগুলো তারই সাক্ষ্য বহন করছে। ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রথাগত পথে না হেঁটে তিনি যখন ‘দুখিয়ার কুঠি’-তে এক বিকল্প নির্মাণের প্রস্তাবনাকে তুলে ধরেন, তখন পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয় উপন্যাসের এক ভিন্ন রূপ। অমিয়ভূষণ তাঁর ইতিহাস-চেতনাকে নিয়ত নির্মাণ-বিনির্মাণ করেছেন। উপন্যাসের সূচনায় বর্ণিত দুখিয়ার কুঠির প্রাচীন লোকায়ত ইতিহাস তাঁর রচনার আধার হয়ে উঠেছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁর একাধিক উপন্যাসে নারী পুরুষের সম্পর্কের এক ভিন্নতর উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। সম্পর্কের ভেতরের জটিলতাকে তিনি নানাবিধ মোড়কে আখ্যানে প্রকাশ করতে ভালোবাসতেন এবং পরতে পরতে তার খোলস উন্মোচন করার প্রতি তাঁর তীব্র আগ্রহ আখ্যানের কাহিনি বিন্যাসে ধরা পড়ত। তাঁর তৈরি চরিত্রেরা অনেকেই যেন নিয়তি তাড়িত। সময় পরিবেশ পরিস্থিতি যেন তাদের চালিত করছে প্রতিনিয়ত। আপাত দৃষ্টিতে এইসব বিন্যাসকে স্বাভাবিক মনে না হলেও, তাকে ‘অস্বাভাবিক’ বলা যাবে কিনা এটা অবশ্যই আলোচনা সাপেক্ষ।

দুখিয়ার কুঠি যেন ‘সভ্যতা’ নামক চোরাবালিতে চিরতরে বিলীন হয়ে যাওয়া নিয়তি তাড়িত এক আদিবাসী যুবকের জীবন বৃত্তান্ত। পিতৃ-পরিচয়হীন আদিবাসী কৌম সমাজের প্রতিভূ মাতালুর কাছে তথাকথিত আধুনিকতা কোনও সদর্থক ভূমিকা নিয়ে হাজির হতে পারেনি। “তুই ফান্দৎ পড়ছিস রে মাতালু, রুদ্ধার নাই” – মাতালুকে উদ্দেশ্য করে বলা বন্ধু কাঁকরুর কথাটি প্রাথমিকভাবে পরিহাসস্বরূপ মনে হলেও বাস্তবেই ফাঁদে পড়েছিল মাতালু, যে ফাঁদ থেকে আর উদ্ধার পায়নি সে। সভ্যতার হাত

ধরে মানব সভ্যতায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলা পরিবর্তনের সঙ্গে তথাকথিত প্রান্তীয় আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সামিল হতে পারেনি। সভ্য সমাজের কাছে তাদের অগ্রগতি নেই-এর সামিল হলেও, কৌম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক দুখিয়ার কুঠির মানুষের কাছে এই অগ্রগতি অনেক বেশি ও দ্রুত হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়েছে। নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠল দুই শ্রেণির মধ্যে। একদিকে আধুনিকতার বাহক একদল মানুষ, অপরদিকে রইল কৌম সভ্যতার বাহক আদিবাসী মানুষেরা। একদল কৌম সত্তাকে ত্যাগ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাইল, স্বেচ্ছায় ভাটীয়াদের অধীনতা স্বীকার করে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে তৎপর হল। আর একদল শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে মনের মধ্যে একরাশ ঘৃণা নিয়েও বাধ্য হল ভাটিয়াদের অধীনে বৃত্তিধারী 'নৌকরি' গ্রহণ করতে। আর যারা কোনও প্রকারেই আধুনিকতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারল না তাদের মধ্যে দেখা দিল বিদ্রোহ, সংগ্রাম প্রবণতা। যেমনটা দেখি কাঁকরুর মধ্যে। তাঁর ধান জমির উপর কাঁটাতারের বেড়া দখে প্রাথমিকভাবে সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই অন্নের সন্ধানে সে চাকরি করতে বাধ্য হয়। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মাতালুর মধ্যে প্রাথমিকভাবে লক্ষ করা যায় আধুনিকতার প্রতি বিস্ময়, আকর্ষণ। সে মানিয়ে নিতেই চেয়েছিল নতুনের সঙ্গে। কিন্তু ব্যর্থ হল। বেঁচে থাকার লড়াইতে সে পিছিয়ে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরতরে।

বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত আদিবাসীদের জীবনের পরিবর্তন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে ভাটিয়াদের নির্মিত পাকা সড়ক-এর মধ্য দিয়ে। উত্তরবঙ্গে প্রান্তীয় অরণ্যবহুল গ্রামগুলোতে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল পাকা সড়ক নির্মাণকে কেন্দ্র করে। আদিবাসীদের শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবনে গতির প্রবেশ জীবনকে গতিময় করে তোলে। মাতালুও প্রাথমিক পর্যায়ে মোহ অনুভব করে এই আধুনিকতার প্রতি। সেই মোহের টানেই সে বারবার বিনা কাজে ছুটে গেছে শহরে। যদিও মন থেকে সে এই গতিময়তার কোনও হেতু খুঁজে পায় না –

"বুঝির পাই না ইয়াৎ কার লাভ অলাভ হইবে।"

(দুখিয়ার কুঠি, পৃ. ৪৫)

ভাটিয়াদের মত মাতালুরা এই পাকা সড়ক নির্মাণে আনন্দিত হতে পারে না। সড়কের সঙ্গে তারা কোনও আত্মিক যোগ উপলব্ধি করতে পারে না। ক্রমবর্ধমান এই সড়ক আশেপাশের গ্রামগুলিতে একটা অসাচ্ছন্দ্য-আশঙ্কার জন্ম দিয়েছিল। সভ্যতার অগ্রগতি কারও জন্য থেমে থাকে না, কাউকে গ্রাহ্য করে না সে। তাই কাঁকরুর ক্ষেতভরা হলুদ ধানের উপর যেদিন কাঁটাতারের বেড়া পড়ে সেদিন মাতালু-কাঁকরু বুঝে পায় না মানুষ কী করে এতটা অমানবিক হতে পারে! তীব্র ক্ষোভে কাঁকরু বলে ওঠে –

"মান্‌সি না হয় তোমরা?" (দুখিয়ার কুঠি, পৃ.৩৮)

মাতালু অনুভব করে -

> "নতুন সড়ক পুরনো পথ ধরে চলছে না। এ দুটির চালই যেন আলাদা। পুরনো পথ চলত এঁকেবেঁকে, দু'পাশের জমিকে বাঁচিয়ে। ... কিন্তু নতুন সড়ক সোজা ধেয়ে চলেছে। তার গতি দেখে মতি বোঝা যায় না।" (দুখিয়ার কুঠি, পৃ.৩৭)

মাতালুর দৃষ্টিতে পাকা সড়ক 'কালো নদী' হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়েছে। সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে, ধ্বংস করে এগিয়ে চলার দুর্বার গতিতে এই কালো নদী বয়ে চলেছে। মানুষের সঙ্গে শুভ সম্পর্ক স্থাপনের কোনও তাগিদ তার নেই। মাতালু, রংবর, কাঁকরুরা বরং গদাধর নদীর সঙ্গে আত্মিক যোগ অনুভব করে। গদাধরের জল তাদের শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে। রংবর মনে করে –

> "গদাধরের গেরুয়া জল রক্তধারাকে মলিন করে না। তার প্রবাহ কালো নয়।"
> (দুখিয়ার কুঠি,পৃ.৪৫)

আদিবাসীদের মতো ভাটিয়াদের জীবনেও সভ্যতার স্পর্শ লাগে। মালতীর জীবনধারণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। মালতীর দাদারাও ব্যবসার প্রয়োজনে দুখিয়ার কুঠি ছেড়ে গদাধরপুর থাকতে শুরু করে। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখা যায় শহরে পড়াশোনা করা মেজদা প্রায় পাকাপাকিভাবে গ্রামে থাকতে শুরু করে। কথক খুব সুন্দরভাবে এই অংশটিকে তুলে ধরেছেন –

> "এটা একটা কৌতুক যেন। শিক্ষা ও রুচির দিক দিয়ে যার সঙ্গে শহরের জীবনের সবচাইতে মিল হওয়া উচিত, সে-ই রইল গ্রামে। আর রুচির দিক দিয়ে যারা গ্রাম্য, অর্থোপার্জনের স্থূল আবেগ ছাড়া যারা অন্য কোনো আকর্ষণকেই স্বীকার করে না, তাদের স্থান হল শহরের সভ্যতায়।" (দুখিয়ার কুঠি, পৃ. ৬২)

সভ্যতার বহুবিধচিত্র ধরা পড়েছে এই আখ্যানে। সভ্যতার সবটুকুই অশুভ নয়, এর শুভ দিকও আছে। এই সভ্যতা জন্ম দিয়েছে এমন একদল মানুষের যারা ঠগ, জোচ্চোর, চোরাকারবারির দল। অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য লখাই চক্রবর্তী আফিমের চোরাকারবার করত। আর সেই চোরাকারবারিদের ধরিয়ে দিতে এক্সাইজের চাকরিই নিতে হয় কাঁকরুকে। অমিয়ভূষণ লক্ষ করেছিলেন আধুনিক সভ্যতায় মানুষের মধ্যে থেকে মনুষ্যত্ব হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। মাতালু, রংবর অবাক হয়ে যায় যখন দেখে গোঁসাই বাড়িতে ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা-কাজিয়া কিছু জমির জন্য। গোসাঁই বাড়ির মেজছেলে যে প্রথম মালতীকে পরিচিত করিয়েছিল আধুনিকতার সঙ্গে, সে নিজেই একদিন হারিয়ে যায়। আফিম বা মরফিয়া, যা এই সভ্যতারই প্রতিদান সেই আফিমের নেশায় চূড় হয়েই একদিন মারা যায় মালতীর অন্যতম প্রিয় মেজদাদা।

আধুনিকতার অবদান হল দেহগতনেশা বা অর্থগত নেশা। অধিক অর্থ উপার্জনের জন্যই লখাই আফিমের চোরাচালান করে। আবার মালতীর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে এক অন্ধ উল্লাসের নেশা 'দেহ দেহ দেহ'।

> “আর এ কী অদ্ভুত নেসা যা সকালের স্নানেও কাটে না। সারাদিন যেন তারই বিহ্বলতায় কেটে যায়। অন্ধ-করা, অন্ধ একটা উল্লাস।”(দুখিয়ার কুঠি, পৃ.৭২)

রুচিসম্পন্না মালতীর সামনে লখাই কপটতার মুখোশ পড়ে থাকত। কিন্তু ছলনা কখনও চীরস্থায়ী হতে পারে না। লখাইয়ের মুখোশও একদিন হঠাৎই খুলে যায় মালতীর সামনে। সেইদিন মালতী সম্মুক্ষীণ হয় এক অজানা তথ্যের। যে মরফিয়া নামক বিষে তার মেজদাদা মারা যায়, সেই মরফিয়া সে সংগ্রহ করত তারই স্বামীর দোকান থেকে। সেইদিন থেকেই সে মুক্তি পেতে চাইল এই অচেনা-অজানা আধুনিকতার হাত থেকে। মুক্তির সন্ধান করলেও মুক্তি সে পায়নি।

> “মদের কথা ভাবতে গিয়ে আকস্মিকভাবে মালতীর একদিন মনে পড়ল মেজদাদা নেই। বাইরের দিকের একটা জানলার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল সে, যেন দৃষ্টিকে বাইরে পাঠাতে চায়, ঠিক তখনই যেন অনিবার্যভাবে লখাইকে দেখা গেল।”   (দুখিয়ার কুঠি,পৃ. ৭৩)

মালতী যে একদিন তার মেজদাদার হাত ধরে মুক্তির আস্বাদ পেয়েছিল, সেই মুক্তিই ক্রমে তার জীবনে বদ্ধতার রূপ নেয়। আধুনিকতার প্রতি আকৃষ্ট হলেও মালতী জেনেছে, এই সভ্য সমাজের দান হল আফিম, মদ – যার ফলে তার দাদা মারা গেল। মালতী নিস্তার পেল না। মালতী তাই মুক্তি পেতে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াত। জানলা হল জীবনের বন্ধন ও মুক্তির আবহমান দ্বন্দ্বের এক চিরন্তন প্রতীক। তার মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করা চলে, বাইরের মুক্ত দুনিয়ার আভাসও মেলে। কিন্তু জানলা কখনও সিংহ-দুয়ার হয়ে ওঠে না। পরিপূর্ণ মুক্তির স্বাদও তাই লাভ করা যায় না। বাইরের প্রতি দৃষ্টি একসময় ঘরের চার দেওয়ালে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। মালতীর হৃদয়ও তাই পূর্ণ মুক্তি পায় না। জানলার গরাদে ধাক্কা খেয়ে তা ফিরে আসে ঘরের বিছানায়, যে বদ্ধতা থেকে তার মুক্তি নেই। জানলা হয়ে ওঠে মালতীর বন্ধন-মুক্তির দ্বন্দ্বের এক ট্র্যাজিক পরিণতি।

ডাঙরআই-এর সন্তান মাতালু, যার আসল নাম বটেশ্বর ধনী - এই আখ্যানের প্রধান চরিত্র। তার আকর্ষণ-বিকর্ষণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে আখ্যানের মূল ঘটনা। বাল্য সহচরী মালতীকে তার ভালোলাগে। কিন্তু মালতী ভাটিয়া কন্যা। রুচি, সংস্কৃতি, জাতি কোনও দিক থেকেই তাদের মিল হয় না। মালতীর চেহারার বর্ণনা দিয়ে কথক বলেছেন –

> “মালতীর দেহের ছাঁদ...রোগাটে এবং লম্বা,রংটা চাপা। নিরপেক্ষভাবে দেখলে এই উনিশ বছরের মেয়েটিকে আকর্ষণীয় মনে হওয়ার কারণ নেই।” (দুখিয়ার কুঠি,পৃ.৩৩)

তথাপি মাতালু মালতীর প্রতি আকৃষ্ট। মাতালু মালতীর প্রতি আকৃষ্ট থাকলেও আদালতে সে গোঁসাইদের হয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়নি। বরং তার কথায় মালতীর পরিবার বিপদেই পড়ে। দাদাদের মতো মালতীরও মাতালুকে বোকাই মনে হয়। আখ্যানে বারবারই মাতালু আর মালতীর সাক্ষাৎ ঘটেছে নানান কারণে। মাতালু ভাটিয়াদের কার্যকলাপ মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও তাকে বারবারই যেতে হয়েছে ওভারসিয়ারের কাছে, যার জন্যই কাঁকরু আজ ছন্নছাড়া, উদ্বাস্তু। ভাটিয়াদের সে ঘৃণা করে অথচ সেই ভাটিয়া কন্যা মালতীর প্রতিই তার দুর্নিবার আকর্ষণ। কিন্তু আখ্যানের বিবরণ থেকে দেখা যায়, মালতীর মাতালুর প্রতি দুর্বলতা থাকলেও মাতালুকে বিয়ে করার কথা ভাবে না কখনও। মালতীর প্রতি মাতালুর এই আকর্ষণকে ভালো চোখে দেখে না ফুলমতী –

> “টানা টানা চোখ দুটিতে যতই কাজল আঁকা থাক – সেখানে প্রশান্তি নেই। বরং একটা ক্ষুধার আভাস। এ ক্ষুধাই যেন, এই অতৃপ্তিই যেন ভাটিয়াদের বৈশিষ্ট্য। এ মেয়ে কি কখনও স্তব্ধ শান্ত হয়ে সেবা করতে পারে?” (দুখিয়ার কুঠি,পৃ.৫৯)

ফুলমতীর আশঙ্কার আর কোনও কারণ থাকে না। মেজদাদার মৃত্যুর কিছুদিন পরই মালতীর বিয়ে হয় লখাই চক্রবর্তীর সঙ্গে। মাতালুও ধীরে ধীরে ভুলতে থাকে মালতীকে। তার জীবনেও নতুন নারীর আগমন ঘটে। ভাটিয়া কন্যা কমলার। শহরের শেষে গড়ে ওঠা নতুন বেশ্যাপল্লীর মেয়ে সে। বেশ্যাপল্লী, যেখানে নারীত্বের অপমান হতেই দেখা যায় – সেইখানে মাতালুর মত মানুষের পরিচয় পেয়ে কমলাও প্রাথমিকভাবে কিছুটা বিস্মিত হয়ে যায়। কমলা বুঝতে পারে মাতালুর সঙ্গে শহুরে মিস্ত্রি-ড্রাইভারদের পার্থক্যকে। নারীত্বের প্রতি যে শ্রদ্ধা, সম্মান মাতালুর মধ্যে সে লক্ষ করে তা আর কারও মধ্যে দেখেনি। কমলাকে আশ্রয় করে মাতালুরও দিন ভালোই কাটতে থাকে।

উপন্যাসের প্লট-জনিত সমস্যা কিন্তু অন্যত্র। কাঁকরুর কাছ থেকে মাতালু জানতে পারে তার জীবনের অন্যতম শত্রু লখাই-এর বহু রাতের ঠিকানা ছিল কমলার গৃহ। এই লখাই তার মালতীকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। বিতৃষ্ণা তীব্রতর হয়ে ওঠে। উপন্যাসে একদিকে মালতী ও অন্যদিকে কমলার উপর অধিকারকে কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছে মূল সমস্যা। আর এই সমস্যা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে আখ্যানের অন্তিম পর্যায়ে এসে। এক রাত্রির অন্ধকারে যখন কাঁকরুর সঙ্গী হয়ে মাতালুও নদীর পাড়ের জঙ্গলে প্রবেশ করে চোরাকারবারির সন্ধানে, তখনও তারা জানত না কী দুর্নিবার সত্য তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। টর্চের তীব্র আলোয় মাতালুরা আবিষ্কার করে চোরাকারবারি লখাইকে। সেই অন্ধকার রাতের সবজে আলোতে জঙ্গলের গোলকধাঁধায় “তিনটি ঘর্মাক্ত মানুষ দুই দলে ভাগ হয়ে এক নির্বোধ খেলায় মেতে উঠেছে”। মাতালু ও কাঁকরু উভয়ের কাছেই লখাই শত্রুপক্ষ – কাঁকরুর কাছে সে শুধুই অপরাধী। কিন্তু

মাতালুর কাছে সে প্রতিপক্ষসম। অরণ্যের অন্ধকারে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের এক আশ্চর্য ধারাবাহিক খেলায় মেতে ওঠে দু'পক্ষ। "যেন বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ যেন নয় আর।" মাতালুর উড়ন্ত বল্লমে ভূ-লুণ্ঠিত লখাই, মাতালুর ক্ষিপ্র বজ্রমুষ্ঠির সামনে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় এক মোক্ষম আর্তনাদে ঘুরিয়ে দেয় গল্পের মোড়।

পিতৃপরিচয়হীন মাতালু কোনওদিনই তার পিতার পরিচয়ের সন্ধান করেনি। ডাঙরআই-এর সন্তান এই পরিচয়েই সে সর্বত্র পরিচিত। কিন্তু শেষ রাতের অস্পষ্ট আলোয় যখন মাতালু তার পিতৃ-পরিচয় জানতে পারে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কমলার এক সময়ের সঙ্গী, মালতীর স্বামী – লখাই, যে আসলে ডাঙরআই-এরও ভালোবাসার পাত্র – এটা জেনে সে দিশেহারা হয়ে যায়। সম্পর্কের এই জটিলতাই মাতালুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বাধ্য করে। সভ্যতার এই করাল পরিহাস্কে সে মেনে নিতে পারে না। কথকও বোধহয় এটাই চেয়েছিলেন। সভ্যতার চোরাবালিতে হারিয়ে যায় মাতালু।

উপন্যাসে চোরাবালি বিশেষ প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিপূর্বেই আধুনিক সভ্যতার নানাবিধ চরিত্রের কথা আমরা জেনেছি। এই আধুনিকতার আর একটা রূপের সঙ্গে কথক আমাদের পরিচয় করান আখ্যানের শেষ ভাগে এসে। সভ্যতার চোরাবালি সত্তা। আধুনিকতার প্রতিদান হল সম্পর্কের মধ্যেকার জটিলতা। ডাঙরআই-মাতালু-মালতী-লখাই-কমলা সম্পর্কের এই বহুবিধ জটিল বিন্যাস সরল, গ্রাম্য মাতালু মেনে নিতে পারেনি। নদীর স্রোতের মতো বারবার ভেসে গেছে মাতালু। মালতী থেকে কমলা – মাতালু যেন সভ্যতার চোরা স্রোতে ভেসে চলেছে।

> "সেও কি ভাটিয়াদের স্রোতেরই আর এক অঞ্চল নয়? ... এই স্রোত সেই স্রোত করতে মাঝে দাঁড়ানোর মাটি অনেক সময়ে চোরাবালি হয়।" (দুখিয়ার কুঠি, পৃ. ৮৮)

তাই শেষ অবধি টিকে থাকা আর তার হল না। জীবনের মাঝ পথেই তাকে বিদায় নিতে হল এই তথাকথিত সভ্য জগৎ থেকে। কৌম সমাহের ধারক, আদিবাসী মাতালু কমলার নারীত্বকে দলিত করেনি, বরং সুন্দরের পূজারী মাতালু কমলার মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছিল মনের শান্তিকে। তাই মৃত্যুকে সামনে দেখে তার জানতে ইচ্ছে হয় "মোর ছাওয়া আছে নাকি জলপরীর ঘর?" কমলার মধ্যে রেখে যেতে চেয়েছে নিজের ভবিষ্যতকে। এখানেও মাতালুর জন্য অপেক্ষা করে ছিল সভ্যতার নিষ্ঠুর পরিহাস। উপন্যাসের অন্তিম পর্বে কথক পাঠকের জন্য রেখে দিয়েছেন সভ্যতার সেই নগ্ন চিত্রকে।

> "নিজেকে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখলে এই মনোভাব হয় মানুষের। নিজের চিহ্ন রেখে যেতে সাধ যায়। কিন্তু কী খোঁজ নেবে কাঁকরু! মাতালুর জলপরী যে কমলা তা সে জানে। বহুসেবিকা সেই সব নারীর

প্রেম এবং দেহ সমান বন্ধ্যা হওয়াই স্বাভাবিক।” (দুখিয়ার কুঠি, পৃ. ১০১-১০২)

উল্লেখপঞ্জি :

১. অমিয়ভূষণ মজুমদার। ২০০৫। দুখিয়ার কুঠি। অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র (৩য় খণ্ড)। কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং।

২. অনিন্দ্য সৌরভ। ২০০২। দুখিয়ার কুঠি : ছিন্নমস্তা সভ্যতা ও বিলীয়মান কৌম সমাজ। বৈতানিক। ৩ বর্ষ।

৩. তপোধীর ভট্টাচার্য। ১৯৯৫। দুখিয়ার কুঠি। উত্তরাধিকার। ৫ বর্ষ। ১ সংখ্যা।

৪. রমাপ্রসাদ নাগ। ২০০২। স্বতন্ত্র নির্মিতি : অমিয়ভূষণ সাহিত্য। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।

টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ : প্রেক্ষিত জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

।। এক ।।

"…. but should victory be in doubt, even for a moment, you will see your Emperor exposing himself to the first blows of the anemy, for there must be no doubt of victory, especially on this day when what is at stake is the honor of the french infantry, so necessary to the honor of our nation."[১]

- লিও টলস্টয় (Leo Tolstoy, 1828 - 1910) তাঁর 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' (War and Peace, 1869) উপন্যাসে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের মুখ থেকে একথা শুনিয়েছেন । যদি ক্ষণমাত্রও জয় সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ দেখা দেয়, তবে শত্রুর প্রথম আঘাতের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়েছে তোমাদের সম্রাট। কারণ জয়লাভ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। বিশেষভাবে এমনদিনে যখন আমাদের জাতির সম্মানের জন্য তা অত্যন্ত জরুরী। আমাদের ফরাসী পদাতিক বাহিনীর সম্মান আজ বিপন্ন। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের উগ্র জাতীয়তা প্রকাশক এ এক মহাঘোষণা। একনায়ক নেপোলিয়ন যুদ্ধকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তার আবেগের আগুনে জুড়ে দিয়েছেন।

আর উক্ত উপন্যাসে ('ওয়ার অ্যান্ড পীস', War and Peace) রাশিয়ার প্রধান সেনাপতি ছিলেন কুতুজভ। সেই স্মরণীয় অস্তারলীজ (Battle of Austerlitz) এবং বরদিনের (Battle of Borodino) যুদ্ধজয়ের কারিগর তিনি। ইতিহাসের অন্তরালবর্তী থেকে গেছেন কুতুজভ। রাশিয়ার সম্রাট জারের অপছন্দ তিনি। স্বল্পবাক কুতুজভ নীরবে সহ্য করেছেন তাঁর প্রতি সমস্ত অবজ্ঞাকে। বৃদ্ধ একাকী মানুষটি ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রাশিয়ার জনমতের প্রকৃত গুরুত্ব তিনি বুঝেছিলেন। মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তিনি বারবার বলেছেন, মস্কোকে হারানো মানেই রাশিয়াকে হারানো নয়- "The loss of Moscow is not the loss of Russia."[২] কুতুজভ আরো বলেছেন, দশজন ফরাসীর বিনিময়েও একজন রুশকে তিনি বলি দিতে রাজি নন – "…. that be would not sacrifice a single Russian for ten Frenchmen."[৩] অস্তারলীজের যুদ্ধে জয়লাভ করেও পশ্চাদপসরণকেই তিনি সময়োচিত মনে করেছেন। এবং বারবার বলেছেন, অকারণ কোন যুদ্ধ করা উচিত

নয়। নতুন করে আর যুদ্ধ শুরু করা কিংবা রুশ সীমান্ত অতিক্রম করাও উচিত নয় – "He alone during the whole retreat insisted that battles, which were useless then, should not be fought, and that a new war should not be begun nor the frontiers of Russia crossed,"[৪]

কুতুজভ ঘটনার তাৎপর্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অসাধারণ দূরদর্শিতায়। টলস্টয় লিখেছেন তাঁর অন্তরে ছিল 'নিষ্কলুষ জতীয়তাবোধ' – "The source of that extraordinary power of penetrating the meaning of the events then occuring lay in the national feeling which he possessed in full purity and strength."[৫] টলস্টয় তাঁর 'War and Peace' – গ্রন্থে আরো লিখেছেন, জাতীয়তাবোধের স্বীকৃতি হিসেবেই রাশিয়ার জনসাধারণ জারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন বৃদ্ধকে এই জাতীয় যুদ্ধে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিলেন । আর এই জাতীয়তাবোধই তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মানবিকতার সর্বোচ্চ মহিমায়। প্রধান সেনাপতিরূপে তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন একটি কর্তব্যে অবিচল থেকে – মানুষকে হত্যা নয়, তাকে ধ্বংস করতে নয় – তাদের রক্ষা করতে, তাদের প্রতি মহত্ত্ব ও করুণা প্রদর্শন করতে – "Only the recognition of the fact that he possessed this feeling caused the people in so strange a manner, Contrary to the Tsar's wish, to select him – an old man in disfavor – to be their representative in the national war. And only that feeling placed him on that highest human pedestal from which he, the Commander –in-chief, devoted all his powers not to slaying and destroying men but to saving and showing pity on them."[৬]

টলস্টয় জাতীয়তাবাদের মহতী উত্তরণ দেখিয়েছেন মানবতায়। মানব মহিমায় ধৌত জাতীয়তাবোধই আন্তর্জাতিকতা বা Internationalism. এই জাতীয়তা নিষ্কলুষ জাতীয়তা – প্রকৃত জাতীয়তা। আন্তর্জাতিকতা মানবমহিমার সুউচ্চ শিখর। টলস্টয় লিখেছেন, অনাগত ভৃত্যের দৃষ্টিতে কোন মানুষ মহৎ হয় না। মহত্ত্বের একটা নিজস্ব ধারণা আছে – "To a lackey no man can be great, for a lackey has his won conception of greatness."[৭]

অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব মানবতবোধের মহত্তম বিস্ময়। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধই তিনি জীবৎকালে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। উগ্র জাতীয়তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। উগ্র জাতীয়তার বিভীষিকা ও তাঁর ভয়ানক স্বরূপ দেখে শিউরে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের 'বুদ্ধভক্তি' কবিতায় উগ্র জাতীয়তার স্বরূপকে চিহ্নিত করেছেন। কবি লিখেছেন – "জাপানের কোন কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।"[৮] যুদ্ধের ভয়ানক নির্মম ছবি। নারী – শিশুর কাটা ছেঁড়া অঙ্গ,

পল্লী প্রান্তরে কেবলই ভস্মের চিহ্ন, ঘরে ঘরে কান্নার রোল –এসবই। এই জাতীয়তা উগ্র জাতীয়তা –

"হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির –
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।"[৯]

এমন উগ্র জাতীয়তাকে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দেননি। বিশ্বযুদ্ধের বীভৎস রূপকে চিহ্নিত করেছেন কবি। ব্যথিত, মর্মাহত কবি মনে করেছেন, মানবদেবতা লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছেন। মানবমন যে কোন দেশে কালে স্বরূপত এক। যুদ্ধের ভয়ানক নৃশংসতায় অন্তরের দেবতা পীড়িত, মানব প্রীতি খণ্ডিত, মানব মন দ্বিধাগ্রস্ত। মানুষের অপমানে দেবতা ক্রন্দন করছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের ১১ সংখ্যক কবিতায় সংকীর্ণ জাতীয়তা থেকে উত্তরণের চিহ্ন স্পষ্ট।

"তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার –
এদের মার্জনা করো, হে রুদ্র আমার।
....
হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়
সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।"[১০]

প্রায় একই সময়কালে দুই মহাস্রষ্টা টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) এবং রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) – দু'জনের ভাবনার মধ্যে থেকে গেছে আশ্চর্য মিল। কূপমণ্ডূক জাতীয়তা নয়, সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেশকে ভালবাসা নয়, দেশকে ভালবাসার জন্য উগ্র হিংস্রতা নয়, যুদ্ধের বীভৎসতা নয় – মানবকল্যাণ, সর্ব-মানবের মঙ্গল কামনা – যেখানে দেশকালের ব্যবধান ঘুঁচে যায়, মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধিত হয় – এমন আন্তর্জাতিক চেতনাই দুই মহাস্রষ্টার সৃষ্টির ভুবনকে আলোকিত করেছে। আসলে মহামানবদের ভাবনায় থেকে গেছে সার্বজনীন ঐক্য।

।। দুই ।।

জাতীয়তা একটা অনুভূতি, একটা ভাব, একটা বিশেষ একতার মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ উগ্র জাতীয়তার স্বরূপকে প্রথম অনুভব করেছিলেন বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে। রবীন্দ্রনাথের

কাছে জাতীয়তা হল ‘অপদেবতার মূর্তি’। বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক আবহে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন জাতিপ্রেমের বিধ্বংসী উন্মত্ত তাণ্ডব। যে সামান্য কয়েকজন দূরদর্শী চিন্তক মনীষী এমন উন্মত্ত প্রতিহিংসা স্পৃহার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তাঁরা বৃহত্তর জনাসমষ্টি ও দেশবাসীরকাছে ধিক্কৃত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছিলেন। জাতীয়তার নামে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষকে হত্যা করা, সম্পদ বিনষ্ট করা, উন্মত্ত অন্ধ জাতীয়তা ছাড়া আর কিছু নয়। অপ্রেমী ধর্মপ্রণেতারা দেবতার মূর্তিকে সামনে রেখে এমন নৃংশস হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করেন। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার নামে এমন মৃত্যুর অগ্নি-উৎসবকে প্রশ্রয় দেন নি। কিন্তু তিনি শুধু শুধু সমালোচনা করেননি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি পর্বের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে। বিশ্বব্যাপ্ত আন্তর্জাতিক সংকট রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই জটিল হয়ে উঠেছিল। দু’দুটি বিশ্বযুদ্ধ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। টলস্টয়ের কিন্তু সে সৌভাগ্য হয় নি। বাংলাদেশে জাতীয়তার মহেন্দ্রক্ষণ চিহ্নিত হয়ে রয়েছে ‘স্বদেশী আন্দোলন’ এর মধ্য দিয়ে। লর্ড কার্জনের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করে। কিছুক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলনকারীরা পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ থাকতে পারেন নি। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গতিপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। **১৯০৬** সালের **১১ই** মার্চ গঠিত হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education). শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। কবি মনে করেন, মাতৃভাষার মাধ্যমেই মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - “ আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ় সম্বন্ধরূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে।”[(১১)] কিন্তু রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তার এক বড় দিক মানবতাবোধ। সহজ কথায়, রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনব্যাপী বিশ্বমানবিকতার আরাধনা করে গেছেন। তিনি আমৃত্যু বিশ্বাস রেখে গেছেন মানুষের প্রতি। তিনি মনে করেন, মানুষের অকৃত্রিম হৃদয়ের ভালবাসা জাতীয়তা ও স্বাদেশিক চেতনার গণ্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকবোধে উন্নীত হতে পারে। বিশ্বমানবতাবোধ হল সর্বমানবের জয়ধ্বজা, যা জাতীয় সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে বিশ্বশান্তির দ্যোতক হয়ে ওঠে।

পায়ে পায়ে এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণাম। দূর ভারতবর্ষে বসে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেন নি। সমস্যা এবং সংকট থেকে মুক্তিপথের দিশা দিয়েছেন তিনি। বিশ্বভারতীর বার্তা পৃথিবীবাসীকে তিনি শুনিয়েছেন। বিশ্বশান্তি এবং বিশ্বমৈত্রীর চিরন্তন বাণী প্রচার করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ‘শান্তিনিকেতন’ গ্রন্থের ‘মা মা হিংসীঃ’ প্রবন্ধে উক্ত শিরোনামাঙ্কিত প্রার্থনা মন্ত্রটির উল্লেখ করেছেন – “আমাকে বিনাশ কোরো না, আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করো।”[(১২)] যেদিন যুদ্ধ ঘোষিত হয়, (৪ আগস্ট, ১৯১৪) তার

পরদিন রবীন্দ্রনাথ মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনায় বেদনাহত চিত্তে সর্বমানবের দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন –"স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে, এই যে আমরা প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করছি ও আঘাত পাচ্ছি - ..... মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে। .... বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর কর। মা মা হিংসীঃ। বিনাশ থেকে রক্ষা করো।"[১৩]রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপিতার কাছে মার্জনা চেয়েছেন। মানুষ যথার্থ মানুষ হওয়ার জন্য তপস্যা করেছে। কিন্তু সেই তপস্যা আজও সম্পূর্ণ হয় নি। যুদ্ধ বহু শিল্পী সাধকের তপস্যার ফলকে পদদলিত করেছে। কেন মানুষের এই মৃত্যু-যজ্ঞের উপাসনা? এই যুদ্ধ যে জাতীয় অহমিকার প্রতিফলন, তাও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন। কবি লিখেছেন – "সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। এক এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠবার জন্য চেষ্টা করছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে।"[১৪] – এভাবেই উগ্র জাতীয়তার স্বরূপকে চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাকে উত্তরণের অভীপ্সা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'পাপের মার্জনা' প্রবন্ধে। কবি লিখেছেন – "বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে ওঠে তখনই তো তার মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোকঃ বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।"[১৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আগত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এই যুদ্ধের নায়ক গৌরবহীন নামহীন ব্রাত্য জনতা। এই অপাংক্তেয় ব্রাত্য জনতার অভিষেক সম্পন্ন হয়। ফুলমালা শোভিত বিজয়মাল্য জনতার গলায় অভিসিঞ্চিত হয় ভগবানের আশীর্বাদ রূপেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকা' কাব্যের 'পাড়ি' কবিতায় নাবিকের কথা বলেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এই কবিতার নাবিক কে? যিনি মাতাল ঝড়েও তরী বেয়ে চলেন, তিনি 'অগৌরবা'। কবিতায় সামাজিক দুর্যোগ, ভয়ানক উপপ্লব-যুদ্ধের প্রতীকরূপে এসেছে। আসলে এই 'অগৌরবা' – এই অনামা অখ্যাত আর কেউ নয় – এই মহাযুদ্ধের নায়ক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকা' কাব্যের ৫ সংখ্যক (পাড়ি) কবিতায় লিখেছেন –

"মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে

ওই যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।
....
কোন অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে।
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথি
বিরহী মোর নেয়ে।”[১৬]

এখানেই টলস্টয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার ঐক্য। মহামানবের একই রকম ভাবনা। টলস্টয়ও জনতা জনার্দনকেই ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছেন। টলস্টয় তাঁর ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ (War and Peace) উপন্যাসে লিখেছেন, রাজা তো ইতিহাসের ক্রীতদাস –“A king is history’s slave”[১৭] নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ, প্রথমে অস্তারলীজ (Battle of Austerlitz) এবং পরে বরদিনের (Battle of Borodino) যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেছেন, ১৮১২ সালের ১২ই জুন পশ্চিম ইউরোপীয় সেনাদেল রুশ সীমান্ত অতিক্রম করল। যুদ্ধ শুরু হল, শুরু হল এমন একটি ঘটনা যা মানুষের বুদ্ধি ও স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী – “On the twelfth of June, 1882, the forces of Western Europe crossed the Russian frontier and war began, that is, an event took place opposed to human reason and to human nature.”[১৮] বরদিনের এই যুদ্ধের নায়ক কে? টলস্টয় বলেছেন - না নেপোলিয়ন, না রাশিয়ার সম্রাট জার আলেকজাণ্ডার। টলস্টয়ের মতে, মহাকালের যাত্রাপথে অসংখ্য মানুষের কর্মধারার মিলেমিশে সেই ঘটনা বা সম্মিলিত কাজটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য লাভ করে। মানুষ সচেতনভাবে বাঁচে কেবল নিজের জন্য। কিন্তু মানবতার ঐতিহাসিক ও সার্বিক লক্ষ্য সাধনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি অচেতন যন্ত্রমাত্র। -“Man lives Consciously for himself, but is an unconscious instrument in the attainment of the historic, universal, aims of humanity. A deed done is irrevocable, and its result coinciding in time with the actions of millions of other men assumes an historic significance.”[১৯] টলস্টয় বলেছেন, নেপোলিয়নের ফরাসী বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন রুশজনগণ। যাকে বলা হয়েছে জনযুদ্ধের মুকাম। (Cudgel of the people’s war). টলস্টয় লিখেছেন – “The fencer who demanded a contest according to the rules of fencing was the French army, his opponent who threw away the rapier and snatched up the cudgel was the Russian people.”[২০] সাধারণ জনগণের সঙ্গে একনায়ক নেপোলিয়নের এই যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী বিধ্বস্ত হয়েছিল- “The cudgel of the people’s war

was lifted with all its menacing and majestic strength .... and belabored the French till the whole invasion had perished."[২১]

টলস্টয় নিজেও নেপোলিয়নকে মহাপুরুষ (Grands Hommes) বানাতে রাজী নন। তিনি লিখেছেন, ফরাসী জনসাধারণের মনে একটি লক্ষ্য ছিল, দেশকে ফরাসী আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত করা – "The people had a single aim to free their land from invasion. That aim was attained in the first place of itself, as the French ran away."[২২] আর নেপোলিয়নকে টলস্টয় চিহ্নিত করেছেন ইতিহাসের হাতের একটি নগন্য যন্ত্র রূপে, কোথাও কখনো, এমনকি নির্বাসনকালেও নেপোলিয়ন মানবিক মর্যাদার স্বাক্ষর রাখতে পারে নি – "Nepoleon – that most insignificant tool of history who never enywhere, even in exile, showed human dignity"[২৩] টলস্টয়ের কাছে রুশ জনতা এবং কুতুজভ যেমন জাতীয় নায়ক, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথও 'অগৌরবা' জনতার গলায় খেয়ার নাবিকের প্রতীকে বিজয়ীর মাল্য অর্পণ করেছেন। সর্বোপরি টলস্টয় লিখেছেন, ইতিহাসের নিয়ম মানুষকে নিয়ে – "But the law of history relates to man."[২৪]

রবীন্দ্র সৃষ্টিতে সংকীর্ণ দেশপ্রীতি এবং লোকাচারের থেকে যে মানবধর্ম শ্রেষ্ঠ, তা কবি বারবার বুঝিয়েছেন। 'বিসর্জন' নাটকে গোবিন্দমাণিক্য মানবধর্মের পূজারী। আর 'গোরা' উপন্যাসে গোরার উপলব্ধি তো জাতপাত ও সংস্কার দীর্ণ ভারতবর্ষের সত্যকার সত্যমূর্তি। গোরার উত্তরণ মানবধর্মের নব উন্মোচন।

কোন মহৎ স্রষ্টা তাঁর সমকালকে উপেক্ষা করে কালের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথও সমকালের ঘটনা প্রবাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি। রবীন্দ্রনাথ সমস্যা বিমুখ নন, সমস্যা উত্তরণের পথ নির্ণয় করেছেন। লর্ড কার্জন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের (১৯০৫, ৭ই আগস্ট, ২২শে শ্রাবণ, ১৩১২) সিদ্ধান্ত কার্যকর করলেন। সেদিনের বাঙালি সমাজ ঐক্যবদ্ধ হলেন বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য। বাঙালির জাতীয়তার নবজাগরণ ঘটল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের 'স্বদেশী সমাজ' শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ 'দেশের হৃদয়'-এর কথা বললেন। জানালেন গ্রামের শাসনকাজ গ্রামের মানুষই করবেন। কৃষককে রক্ষা, সন্তানের শিক্ষা, কৃষির উন্নতি, গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের করতে হবে। স্বদেশের উন্নতি সাধারণ প্রজাসাধারণের উপর ন্যস্ত হলেই মঙ্গল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব হল সংকীর্ণ স্বদেশিকতাকে অতিক্রম করা। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন – "গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। ...... ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া ওঠে।"[২৫] এমনকি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যখনই

হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে, তখনই রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীকে স্থিতধী, সংযত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উগ্র বিপ্লবপন্থা যে আত্মহননের নামান্তর এবং তা যে আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী, রবীন্দ্রনাথ তা বলেছেন তাঁর 'রাজা ও প্রজা' গ্রন্থের 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে। লেখক লিখেছেন – "য়ুরোপের এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে।"(২৬) কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের সংকীর্ণ জাতীয়তা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। কবি লিখেছেন – "মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যা দ্বারা।(২৭) কবি আরও লিখেছেন, আমাদের পিতামহদের পবিত্র মুখ দিয়ে, সত্যতর নিত্যতর বাণী উচ্চারিত হয়েছে। যে বাণী দূরকে নিকট করতে বলে, অনাত্মীয়কে আত্মীয়রূপে আহ্বান করে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষির শাশ্বত কল্যাণ মন্ত্রের বিনষ্টি নেই, কবি লিখেছেন—"ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব"... তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য করিয়া লইব।"(২৮) প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ঋষি বিশ্বদেবতার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন। কর্ণের দ্বারা কল্যাণ বাক্য শ্রবণ, যজ্ঞের দ্বারা কল্যাণ কাজ, জ্ঞান বৃদ্ধদের দ্বারা শ্রুত হয়ে ইন্দ্রদেব যেন কল্যাণ প্রদান করেন। আর সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানবান সূর্যদেব যেন আমাদের কল্যাণ প্রদান করেন। তার্ক্ষ্যদেব এবং বৃহস্পতিদেবও যেন কল্যাণ প্রদান করেন—

"ভদ্রং কর্নেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রং পশ্যে মাকক্ষভির্যজত্রাঃ
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেন দেবহিতং যদায়ুঃ।।
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।"(২৯)

রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর প্রেক্ষিতে উগ্র উন্মাদনাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে কবি লিখেছেন—"উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।"(৩০)

স্বদেশী আন্দোলনের উন্মত্ততা থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই দূরে থেকেছেন। সমকালের দেশীয় নেতাদের ধৈর্যহীনতায় কবি 'খেয়া' কাব্যের 'বিদায়' কবিতায় লিখেছেন—

"কাজের পথে আমি তো আর নাই। ......
আর তো চলা হয়ও না সাথে সাথে।"(৩১)

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি রচনা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের 'নেশন কী' প্রবন্ধে ন্যাশলিজমের ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন। কবি লিখেছেন—"নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ।"(৩২) রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মানবজাতি এবং মানব সমাজের ইতিহাস। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের সংস্কৃতি। কিন্তু

ভারতবর্ষীয় জাতীয় চেতনার একটি নিজস্বতা আছে—তা হল ঐতিহ্যাশ্রিত অধ্যাত্মবোধের আদর্শ। আধ্যাত্মিক আদর্শবোধকে ইউরোপ উন্নাসিক দৃষ্টিতে দেখেছে। শক্তিমদমত্তা কখনো মানব জীবনের সার্থকতার পরিচায়ক নয়। মানুষের সার্থকতা পূর্ণতায়। বিশ্বযুদ্ধের কালে জাতিতে জাতিতে যে ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের জন্ম হয়েছে, তা খণ্ডিত মানবতার উপর দাঁড়িয়ে—আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী। আন্তর্জাতিকতার নিজস্ব সুরটি রবীন্দ্রনাথ 'নেশন কী' প্রবন্ধেই স্পষ্ট করেছেন। কবি লিখেছেন—"মনুষ্যত্বের মহাসংগীতে প্রত্যেকে এক একটি সুর যোগ করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে তাহা কাহারও একক চেষ্টার অতীত।"(৩৩) রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিজমের গুরুত্বকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তার অস্বাভাবিক উগ্রতা এবং সংকীর্ণতাকে চিহ্নিত করেছেন। ন্যাশনালিজম যখন যথার্থ আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে উন্নীত হয়, তখনই মানবপ্রেমের পথ প্রশস্থ হয়। আন্তর্জাতিকতাই প্রকৃত মানবধর্ম, তার বিশ্বগত মূল্য (Cosmic Value) অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই আন্তর্জাতিক চেতনা 'মনুষ্যত্বের মহাসংগীত'।

।। তিন ।।

যুদ্ধের অভিঘাতে বীরের মৃত্যু, মায়ের অশ্রুধারা, প্রিয়ার ক্রন্দন-এর কি কোন মূল্য নেই? ভগবানের মহাশঙ্খ ভূলুন্ঠিত। তার মর্যাদা রক্ষণের আহ্বান কবির কণ্ঠে। যুদ্ধের এই সংকটকালে, মানবতার অপমানে অসহায় কবি যুদ্ধ দিয়েই অন্যায়কে পরাজিত করার কথা বলেছেন। অন্যায়ের মুখোমুখি হওয়ার কথা বলেছেন। রজনীগন্ধার বদলে রক্তজবার মালাকে বরণ করেছেন। কবি 'বলাকা' কাব্যের 'শঙ্খ' কবিতায় লিখেছেন—

"গাঁথব রক্তজবার মালা?
হায় রজনীগন্ধা।

....

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।"(৩৪)

আর 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় লিখলেন, ইউরোপের এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে এত মৃত্যু, এত রক্তস্নান কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। এরও বৃহত্তর ও মহত্তর মূল্য আছে। এই জিজ্ঞাসার উত্তর 'নঞর্থক' নয়—অস্ত্যর্থক। কবি লিখলেন—

"মানুষ চূর্নিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"(৩৫)

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে আমেরিকায় তাঁর প্রদত্ত ভাষণে ইউরোপের প্রলয়ংকর যুদ্ধের কথা বললেন। বললেন ইউরোপে জাতিতে জাতিতে 'আত্মঘাতী মরণযজ্ঞ'-এর কথা। লিখলেন—"ন্যাশনালিজম্ অপদেবতা, ইহার সমক্ষে নরবলি দিয়ো না।"(৩৬)

শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১লা সেপ্টেম্বর)। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন হিটলারের প্রতিপক্ষ ব্রিটেন এবং ফ্রান্স হিংস্র নীতিতেই যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। নেপাল মজুমদার তাঁর 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' (ষষ্ঠ খণ্ড)—গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির (২৩ জুলাই, ১৯৩৯) উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

"আমি আশা করি এখনও তিনি (হিটলার) ন্যায় ও যুক্তিতে মর্যাদা দিবেন এবং জার্মান জাতিসহ সমগ্র চিন্তাশীল মানব সমাজের আবেদনে কর্ণপাত করিবেন।"(৩৭) ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের ভয়ানক রূপ দেখে মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি পত্রে (প্রবাসী' তে প্রকাশিত, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬, পৃ.২৭৯) লিখেছেন—"জাপানের দীর্ঘকালব্যাপী অভিযানের সর্বধ্বংসী হস্ত হইতে নিরীহ চীনবাসীদের জীবন রক্ষা করা আমাদের সকলের অবশ্য কর্তব্য।"(৩৮) 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাই রবীন্দ্রনাথের সে সময়ের বেদনাদীর্ণ রবীন্দ্রমানসকে ধারণ করে আছে। কবি উক্ত কাব্যের 'জয়ধ্বনি' কবিতায় লিখেছেন—

"বার বার আত্মপরাভব কত
দিয়ে গেছে মেরদণ্ড করি নত
কদর্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে
দিগন্ত গ্লানিতে দিল ঘিরে।

....
অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ,
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।"(৩৯)

অহিংস সংগ্রামের পূজারী গান্ধীজির প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ তাকে মহিমমণ্ডিত করেছে। মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ। আন্তর্জাতিক মানববিশ্বের স্বপ্ন দেখেন তিনি। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কবির কবিতা উদ্ধৃত করে লিখেছেন—

"গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী, কেউ বা নিঃস্ব,
কবির মর্তজীবনের শেষ মাঘোৎসব আসিল।"(৪০)

কবি জানতেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকেও একদিন আমাদের মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে হবে। 'আরোগ্য' কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতায় ('ওরা কাজ করে') কবি লিখলেন—

> "প্রবল ইংরেজ
> বিকীর্ণ করেছে তাঁর তেজ
> জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
> কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল;
> জানি তার পণ্যবাহী সেনা
> জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।"[৪১]

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, 'ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।'[৪২] 'সভ্যতার সংকট', প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। ....কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। .... মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"[৪২] আর 'জন্মদিনে'র ৯ সংখ্যক কবিতায় কবি নিজেকে ঘোষণা করলেন—'আমি পৃথিবীর কবি'[৪৩]

মানব সভ্যতা রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। আন্তর্জাতিক কবি তিনি। সার্বজনীন মানবধর্মের সাধনা করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় ঋষির মন্ত্র উচ্চারণ করে বলেছেন—"জল দিয়ে কেবল দেহেরই শোধন হয়, মনের শোধন হয় সত্যে, সেখানে বিশ্বমানবমনের সম্মতি পাওয়া যায়। কিংবা যেখানে বলা হয়েছে—

> "কৃত্বা পাপং হি সন্তপা তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
> নৈবং কুর্যাম পুনরিতি নিবৃত্তা পূয়তে তু সঃ।
> ...... মানুষ আপন বুদ্ধিতে স্বীকার করে বিশ্বমনের
> প্রজ্ঞাকে।"[৪৪]

।। চার।।

"An adjutant came now to inform him that the fire of two hundred guns had been concentrated on the Russians, as he had ordered, but that they still held their ground.

"our fire is mowing them down by rows, but still they hold on," said the adjutant."[৪৫]

বরদিনের যুদ্ধে নেপোলিয়নের আদেশ অনুযায়ী দু'শো কামান থেকে একযোগে রুশদের উপর গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে। তবু তারা ঘাঁটি আগলে রেখেছে। গোলাবর্ষণে কাটা ফসলের মত সারি সারি রুশ সৈন্য ঢলে পড়ছে। তবুও কিন্তু তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অ্যাডজুটান্ট বললেন।

নেপোলিয়নের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র রাশিয়াবাসীর এমন মরণপণ লড়াই যথার্থ জাতীয়তা। রাশিয়ার এই লড়াই কোন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নয়। এই মহত্তম জাতীয়তাই আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। টলস্টয় তাঁর 'War and Peace' গ্রন্থে লিখেছেন, এ যুদ্ধ ছিল শুভবুদ্ধির যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছিল সকলের শান্তিকামনায় এবং তা রক্ষণশীল—"It was a war of good sense, for real interests, for the tranquillity and security of all, it was purely pacific and conservative."[(৪৬)]

রাশিয়াবাসীর কাছে এই যুদ্ধের একটি মহত্তর ও বৃহত্তর লক্ষ্য ছিল। এই যুদ্ধে সমস্ত অনিশ্চয়তার অবসান ঘটেছিল। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়েছিল। সর্বোপরি সকলের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ এক নতুন দিগন্ত উদ্ঘাটিত হয়েছিল। টলস্টয় লিখেছেন—"It was a war for a great cause, the end of uncertainties and the beginning of security. A new horizon and new labors were opening out, full of well-being and prosperity for all."[(৪৭)] মানবপ্রেমিক টলস্টয় মানবজাতির জন্য কল্যাণমূলক কাজকর্মকেই মানবধর্ম বলে মনে করেন। মানুষের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বর। জনসাধারণের জন্য মঙ্গলকাজই হল ঈশ্বর আরাধনা। সর্বমানবের কল্যাণ কামনা আত্মজ্ঞান ছাড়া লাভ করা সম্ভব হয় না। এই হল টলস্টয়ের সার্বজনীন মানবধর্ম—আন্তর্জাতিক চেতনা। টলস্টয় লিখেছেন, মানুষ এক সর্বশক্তিমান, সর্বকল্যাণময় ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সৃষ্টি—"Man is the creation of an all-powerful, all-good, and all seeing God."[(৪৮)] বৈদিক ঋষিদের মত টলস্টয় শান্তি খুঁজেছেন বিশ্ব, মানব প্রীতির মধ্যে—"He had sought it in philanthropy."[(৪৯)]

।। পাঁচ ।।

"The kingdom of God cometh not with outward show; neither shall they say, Lo here! Or, Lo there! For behold, the kingdom of God is within you."[(৫০)]—ভগবানের রাজ্য তোমার নিজের ভেতরে। মানুষের হৃদয়েই ঈশ্বরের অবস্থান। মানবধর্মের এই হল সারকথা। পৃথিবীবাসীকে আন্তর্জাতিকতার পাঠ দিয়েছিলেন টলস্টয়। সুস্থ জাতীয়তাবোধই আন্তর্জাতিক উপলব্ধির চারণক্ষেত্র। টলস্টয় কোনদিনই সংকীর্ণ জাতীয়তাকে কোনভাবেই গুরুত্ব দেন নি। তিনি মনে করেন, উগ্র দেশপ্রেম ও সংকীর্ণ জাতীয়তার হাত ধরেই ইতিহাসের একনায়কদের উত্থান হয়। ফরাসী বিপ্লবের পরে ক্যাপ্টেন নেপোলিয়ন দেশপ্রেমকে ঢাল করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিলেন। উগ্র জাতীয়তা নেপোলিয়নের স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতায় স্বদেশে উর্বর ভূমি পেয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কাছে দেশপ্রেমই ছিল মূলমন্ত্র। উগ্রজাতীয়তায় ভর করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত হেনেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) প্রাক্কালে হিটলারের নৃশংসতার কোন তুলনা পৃথিবীর

ইতিহাসে নেই। উগ্র দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এমন ভয়ানক পরিণতির জন্য দায়ী। হিটলারের ইহুদী নিধন তীব্র জাতিবিদ্বেষ এবং ঘৃণা থেকে উত্থিত। টলস্টয় নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বভাবতই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্বেই তিনি মারা যান। কিন্তু টলস্টয় তাঁর 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' (War and Peace) গ্রন্থে এমনভাবে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন, যেন যুদ্ধের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ মারা (১৯৪১) যান। ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে, সংকীর্ণ জাতীয়তার পরিণতি এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। আর তার অনিবার্য ফলশ্রুতি সৈনিকের মৃত্যু—সাধারণ মানুষের মৃত্যু, ধ্বংস ও সম্পদের ক্ষতি। জাতীয়তাকে হাতিয়ার করেই চিরকাল সর্বশ্রেণীর শাসককুল ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। মানুষ হয়েছেন অবহেলিত। টলস্টয় মানব প্রেমিক। তাঁর কাছে মানুষই মহান। মানবকল্যাণেরও একটা নীতসূত্র থাকে। অন্যায় দিয়ে কখনও বিশুদ্ধ মঙ্গলবোধের পথ প্রশস্থ হয় না। প্রকৃত মানবতা এবং মানবকল্যাণ কখনও উগ্র জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের হাত ধরে আসে না। উগ্র জাতীয়তা ঘৃণা শেখায়, তা মানবধর্ম বিরোধী। টলস্টয় মানপ্রেমিক। মানব কল্যাণেই তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। টলস্টয়ের জীবনীকার Paul Birukoff তাঁর 'Leo Tolstoy His life and Work'—গ্রন্থে লিখেছেন—"We see here artistic truth interwoven with historical and if the latter gives the former an air of truthfulness, so it receives from it in return that touch of human nature which makes all the characters of War and Peace so life like and so irresistibly soul-stirring."[৫১]

অপরপক্ষে নিষ্কলুষ জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে টলস্টয় যেখানে শেষ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে শুরু করেছেন। টলস্টয় আন্তর্জাতিকতার বীজ বপন করেছেন, মানবপ্রেমকে জল হাওয়ায় লালিত করেছেন, কিশলয়কে বর্ধিত করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথে আন্তর্জাতিকতাবোধ - বিকাশ-বৃদ্ধি ও পরিণতির শীলিত-শুদ্ধতর-মহত্তর উত্তরণ ঘটে গেছে। টলস্টয় আন্তর্জাতিকতার কুশলী বিশ্বকর্মা। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ আর্টিস্ট, টলস্টয়ও। তবুও ঠিক যেন একজন (টলস্টয়) কারুশিল্পী (craft) অপরজন (রবীন্দ্রনাথ) চারুশিল্পী (art)। দু'জনেই আন্তর্জাতিকতাকে অবলম্বন করে সৃষ্টির ফুল ফুটিয়েছেন। দু'জনেই মানবতা এবং মনুষ্যত্বকে মানবধর্ম বলে মনে করেছেন। দু'জনেই মানবহৃদয়কে ঈশ্বরের আবাসভূমি বলে মনে করেন। দু'জনেই মানবতার সমস্ত নদী উপনদীকে মহাসমুদ্রে বিলীন করেছেন। দু'জনেই মহান ঋষি। মহাপুরুষ এবং ধর্মপ্রণেতাদের বাণীকে আজীবন লালন করে জীবন উৎসর্গ করেছেন। টলস্টয় তাঁর

মহাপুরুষদের বাণী ও রচনার সংকলন গ্রন্থ 'The pathway of life'-গ্রন্থে হিন্দু দর্শনের ('Hindu Philosophy') উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন—

"The stronger the faith of man, the firmer his life. The life of man without faith is the life of a beast."—

All God requires of us is good works,
Therein is the entire law of God."(৫২)

।

তথ্যসূত্র:

১. Leo Tolstoy, War and Peace, Fingerprint classics, Prakash Books India Pvt. Ltd, 113/A, Darya Ganj, New Delhi, 2019, P. 262
২. ibid, P. 1070
৩. ibid,
৪. ibid,
৫. ibid, P. 1071
৬. ibid,
৭. ibid,
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধভক্তি, নবজাতক, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ১১০
৯. তদেব
১০. পূর্বোক্ত, বলাকা, ১১ সংখ্যক কবিতা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৪
১১. পূর্বোক্ত, শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৭২
১২. পূর্বোক্ত, মা মা হিংসীঃ, শান্তিনিকেতন, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৬৭৫
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৭
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৬
১৫. পূর্বোক্ত, পাপের মার্জনা, শান্তিনিকেতন, পৃ. ৬৭৭
১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাড়ি, বলাকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৪৮-২৪৯
১৭. Leo Tolstoy, War and Peace, Fingerprint classics, Prakash Books India Pvt. Ltd, 113/A, Darya Ganj, New Delhi, 2019, P. 596
১৮. ibid, P. 594
১৯. ibid, P. 596
২০. ibid, P. 1015
২১. ibid, P. 1016
২২. ibid, P. 1058

২৩. ibid, P. 1069
২৪. ibid, P. 1185
২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বদেশী সমাজ, আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৩৩
২৬. পূর্বোক্ত, পথ পাথেয়, রাজা প্রজা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬৬৭
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭১
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৮
২৯. বেদগ্রন্থমালা (সপ্তদশ খণ্ড), কৃষ্ণযজুর্বেদ, তৈত্তিরিয়-আরণ্যক, প্রথম ভাগ, সম্পা.- অয়ন ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১২৯
৩০. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ. ১৭৫
৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদায়, খেয়া, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ১৮১
৩২. পূর্বোক্ত, নেশন কী, আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬২১
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২১
৩৪. পূর্বোক্ত, ৪ সংখ্যক কবিতা (শঙ্খ), বলাকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৭-২৪৮
৩৫. পূর্বোক্ত, ৩৭ সংখ্যক কবিতা, (ঝড়ের খেয়া), বলাকা, পৃ. ২৮৮
৩৬. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ. ৫৬৯
৩৭. নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (ষষ্ঠ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়ধ্বনি, নবজাতক, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ১৪২
৪০. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ. ২৬৭
৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১০ সংখ্যক কবিতা, ওরা কাজ করে, আরোগ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪২
৪২. পূর্বোক্ত, সভ্যতার সংকট, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৭৪৪
৪৩. পূর্বোক্ত, ৯ সংখ্যক কবিতা, জন্মদিনে, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৬৫
৪৪. পূর্বোক্ত, মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ. ৬৪৫

৪৫. Leo Tolstoy, War and Peace, Fingerprint classics, Prakash Books India Pvt. Ltd, 113/A, Darya Ganj, New Delhi, 2019, P. 804
৪৬. ibid, P. 805
৪৭. ibid,
৪৮. ibid, P. 1187
৪৯. ibid, P. 995
৫০. Leo Tolstoy, The Kingdom of God is within You, Prabhat prakashan, New Delhi, 2017, P. 368
৫১. Paul Birukoff, Leo Tolstoy His life and work (volume-1), charless scribner's sons, New York, 1906, P. 12
৫২. Leo Tolstoy, The Pathway of Life, Part-1, International Book Publishing Company, New York, 1919, PP. 18, 22

‘স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা প্রেমের কবিতা’

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

প্রেম কী? কী তার সংজ্ঞা? প্রেম হল যৌবনের আন্তরিকতার, জটিলতার, অনুভবের বিরহের বিষাদের, বিচ্ছেদের আনন্দের, উচ্ছাসের, স্নেহ-মায়া-মমতা, প্রীতি-অভিমান, রাগ-অনুরাগ প্রভৃতি গুণগুলি মন্থণ করে যে বৈভাব তৈরী হয় তাই হল প্রেম। প্রেম এক পরম সম্পদ। প্রেমের জন্য স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়েছিল আদম-ইভ। আদিম মানব আদিমানবীকে নিয়ে পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পাহাড়ের দেওয়ালে ছবি এঁকেছিল। তারপর দীর্ঘ ইতিহাস। মদন ও রতির কথাও এক্ষেত্রে মনে আসে। বলা হয় জীব-জগতের অগ্রগতির অনেকটাই যৌনতাড়িত। প্রেমের আধার এই মানব শরীর। প্রেম হল এক প্রবাহমান ছবি। মানবজীবনের জয়যাত্রা। সে চিরকালীন। প্রেমের ভাষা মানুষের অন্তরের ভাষা। প্রেম বাঁচার অনিবার্য সর্তও। প্রেমই মানবসত্তার পূর্ণতা। প্রেমই হল মানুষের প্রথম শিহরণ। সেই শিহরণই তার জাগরণ। নিত্য নতুন করে পাব বলে মানুষ প্রেমকে করেছে গ্রহণ। সেই গ্রহণ করা চলছে যুগ যুগ ধরে। বিচিত্রময় মানুষের জীবনের বৈচিত্র্যই হল এই প্রেম।

কবিরাও যুগ যুগ ধরে প্রেমের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন এই বৈচিত্র্য। আদিকবি বাল্মিকীর শ্লোকের বিষয়ই ছিল প্রেমের। প্রেম কবিদের প্রিয় বিষয়ও। জীবনের নানা ধারায় প্রবাহিত সুখানুভূতি থেকে গেঁথে তোলেন তাঁরা সেইসব কবিতা। প্রেম আছে বলেই এক হৃদয় আরেক হৃদয়কে অতুলান্ত গর্ভগৃহ থেকে আহ্বান জানায়। চর্যাপদের কবিদের থেকে শুরু করে মধ্যযুগের অন্যতম বিশিষ্ট কাব্যসম্পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে এই মানবপ্রেমের সমধুর জয়গান। প্রেমের এই ধারা মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী থেকে বিবর্তিত হয়েছে সহজিয়া বৈষ্ণব নাথ সম্প্রদায়, মৈমনসিংহ গীতিকায়, আউল-বাউল সাধনার মধ্যে। বাউলের সাধনার যে কথাটি সবচেয়ে বড় তাও বাউলের মানবপ্রেম। এই প্রেম কোনো বাইরের বস্তুকে আশ্রয় করেই শুধু ব্যক্ত নয় – এই প্রেমের আরেক আধার তাদের ‘মনের মানুষ’। এই মনের মানুষ আছে দেহেরই মধ্যে অর্থাৎ এই জগত এবং জগতের মানুষের মধ্যেই। সেই পরম প্রিয়কে খোঁজবার জন্যই তাদের আকুলতা। মানুষের হৃদয়ের দরজায় দরজায় তাদের আঘাত।

> ‘আমি কোথায় পাব তারে
> আমার মনের মানুষ যে রে,
> হারায়ে সেই মানুষ দেশ বিদেশে
> (আমি) কী উদ্দেশ্যে বেড়াই ঘুরে’

প্রেমই আমাদের সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের ছত্রপতি। কোন কোন পন্ডিত অভিমত দিয়েছেন, আমাদের দেশের এই রোমান্টিকতা পাশ্চাত্য প্রভাবের ফসল। তাঁদের মতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য এই রোমান্টিকতা প্রথম উপস্থাপন করেন। মানুষ যুগ যুগ ধরে এই প্রেমের ভালোবাসার সিঁড়িপথ খুঁজছে। কখনও কখনও সে পথ হয় বন্ধুর। তার স্বরূপ চেনা সহজ নয়। তাকে অনুভব করলে দুঃখ পেতে হয়। সে বড় যাতনাময়। কবিও তাই প্রশ্ন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যের এক নায়িকার মুখে সেই প্রশ্ন রাখেন – 'সখী, ভালবাসা কারে কয়? সে কি কেবলই যাতনাময়?' ...... এই প্রেম কি তবে তৈরী করে 'চোখের জল'? প্রেমের ফাঁদপাতা ভুবনে সে তাই রহস্যময় বা রহস্যময়ী তার অপ্রকাশ ও আছে এবং তা আবার বিশিষ্টভাবে পূর্ণও। প্রেমের রঙ রামধনুকে অতিক্রম করে যায়। নানারঙের মাধুর্যে তা প্রবাহমান।[১]

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতিহার। (অনন্ত প্রেম, 'মানসী')[i]

রাবীন্দ্রিক প্রেমাস্পদের বহমানতা যুগ যুগ ধরেই বয়ে চলেছে যা অনন্তকালের, নিখিলের সুখ-দুঃখ প্রাণের প্রীতির কথা অবিনশ্বরকালের সীমারেখা পেরিয়ে তার মাঝে সকল কালের সকল কবির গীতি এক ঐক্যসুরে মিলে আছে। আবার নজরুলের সুন্দরভাবনা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নরূপে অনুভব করেছেন তিনি, 'সুন্দর' তাঁর চালিকা শক্তি। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা', 'মানসসুন্দর', 'লীলাসঙ্গিনী'র মতোই নজরুলের 'সুন্দর'। এই সুন্দরই তাঁর প্রেম ও সত্যজ্ঞান। তারই শক্তি ও প্রেরণায় তিনি কখনো প্রেমিক কবি।

এইবার আমার আলোচ্য প্রবন্ধের মূল অংশে আলোকপাত করা যাক। স্বাধীনতা পরবর্তী দশক বলতে আমরা পঞ্চাশের দশক থেকেই ধরব। পঞ্চাশের দশকের কবিদের মুখপত্র হিসেবে আমরা দুটি কবিতা পত্রিকাকে দেখি 'শতভিষা' (১৯৫৯)। সম্পাদক আলোক সরকার ও দীপংকর দাশগুপ্ত। এঁদের সঙ্গী ছিলেন কবি তরুণ সান্যাল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস সংকলন -১'।

পঞ্চাশের তরুন কবিরা যাঁরা পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন প্রায় সকলেরর কবিতাই 'শতভিষা' পত্রিকায় ছাপা হত। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ রায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুবেন্দু মল্লিক, উৎপলকুমার বসু, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ কবিরা 'শতভিষার' নিয়মিত লেখক ছিলেন।

স্বাধীনতার পরই ভারতে রাজনৈতিক মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। বামপন্থীদের সঙ্গে আদর্শগত দিক দিয়ে 'কংগ্রেস' সরকারের বিরোধীতা চরমে ওঠে এবং ১৯৪৮

খ্রিস্টাব্দে এই সরকার পক্ষ কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেয়। এইসময় দেশের অস্থির অবুস্থা কবিরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যেমন তেভাগা আন্দোলনের (১৯৪৬ – ৪৯) সময় পুলিশ-প্রশাসন সমর্থন করে জমিদার মহাজনদের এবং গরীব কৃষকদের প্রতি-অবিচার করে। সরকারের বিরুদ্ধে মিছিলে সামিল হয় দেশের সাধারণ মানুষ। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্বাধীন দেশের নতুন সরকার ‘লাঠি চার্জ’ করে। গুলি চালিয়ে মিছিলের মোকাবিলা করে। আবার সেই সময়েই দেখা যায় প্রার্থণা সভায় গান্ধিজীকে হত্যা করা হয়(১৯৪৮)। দেশের সরকারের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজশক্তির ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত সঠিক সম্পর্ক ও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল বিভ্রান্তিকর।তরুণ বাঙালি কবিরা সমাজকে শুদ্ধতার রূপ দিতে হলে কোন সার্বিক রাজনৈতিক বিশ্বাসে পৌঁছবেন তা স্থির করতে পারলেন না। হয়তো এই কারণেই নিজস্ব অনুভবের জগত থেকেই তরুণ কবিরা কবিতা লিখতে শুরু করেন। একেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ‘স্বীকারোক্তিমূলক’ কবিতা এবং দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ‘একলার স্বগতাচার’।[২]

পঞ্চাশের কবিদের অনেকেই বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখতেন। পঞ্চাশের কবিরা রবীন্দ্রনাথের পরেই তিরিশের কবিদের কাছ থেকে কবিতার পাঠ নিতেন অব্যবহিত অগ্রজ চল্লিশের কবিদের সঙ্গে তাঁদের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। জীবনানন্দের কবিতা পড়ে তাঁরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হতেন। জীবনানন্দের পৃথিবী ছিল জটিল। অন্যদিকে পঞ্চাশের কবিরা জীবন ও বেঁচে থাকার ব্যাপারটিকে জটিল করে ভাবেন নি। তাঁদের ভালো লাগার স্বরূপ ছিল গভীর সূক্ষ্ম অথচ সরল-মধুর। মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের বৃত্তের বাইরে অন্য কিছু নিয়ে যেমন সার্বিক মহাবিশ্বে মানব অস্তিত্বের অনুভব আছে কি নেই এবং জীবনের সত্য অথবা অসত্য সম্পর্কে খুব বেশি ভাবনাচিন্তা করে না। এই ধারাকেই গ্রহণ করেছেন কবিরা। চল্লিশের দশকের কাব্যচর্চার পরম্পরা-বাহিত সুস্পষ্ট সমাজ-মনস্কতার ঘোষণা থেকে সরে এসে ব্যক্তিগত আর আত্মগত নিমগ্ন স্বগত উচ্চারণকেই পছন্দ করেছিলেন বেশি পঞ্চাশের কবিরা।[৩]

‘পঞ্চাশের কবিতার রূপরেখা’ প্রবন্ধে পবিত্র মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “পঞ্চাশের দশকের কবিদের চরিত্র এককেন্দ্রিক নয়। তা হয়ও না, কারণ কবিতা লেখায় প্রাণিত যাঁরা তাঁদের থাকে নিজস্ব একটি মৌল-চেতনার ভূমি। বহুমুখি ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হবে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত, এটাই স্বাভাবিক।”[৪]

পঞ্চাশের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবি হলেন – শঙ্খ ঘোষ, তরুণ সান্যাল, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,

মনীন্দ্র গুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, শুদ্ধসত্ব বসু, আনন্দ বাগচী, রাম বসু, পূর্ণেন্দু পত্রী, সুনীল বসু, চিত্ত সিংহ, নরেশ গুহ, ফণিভূষণ আচার্য, নবনীতা দেবসেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে মহিলা কবিদের রচনায় নারী-পাঠকৃতি ক্রমশ যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই ধারায় রয়েছে নতুন নতুন আরম্ভ। পুরুষের রচনায় যে-নারীকে পেয়েছি তাতে নারী-সত্তার অকুণ্ঠিত প্রকাশ নেই, বরং নারী প্রতিমার মনোরঞ্জক সাজসজ্জায় আবৃত হয়ে যায় প্রকৃত-নারী। পিতৃতান্ত্রিক দাপটের স্রোত-পেরিয়ে চলমান প্রেক্ষিতে যে-অনুভব নারীকে ঐশ্বর্যময়ী করে, সেই প্রেমের সাথেও তার সত্তার সংঘর্ষ দেখা দেয়। যখন প্রেম পিঞ্জরে পরিণীত হয়, সেই পিঞ্জরায়িত প্রেমের বিরুদ্ধে নারীকবিদের দ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। নারীর আত্মনির্ভরতার, আত্মসচেতন বোধের, আত্ম-আবিষ্কারের উন্মুখ ঘটেছে।[ii]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চাশের কবিদের প্রেমের ধারায় শীর্ষে আছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রেমের একটা শরীরীরূপ, জীবন্ত নারীদেহ কবিতায় যযেন উপচে পড়ছে সুনীলের কবিতায়। বুদ্ধদেব বসুরর প্রছন্ন ছায়া আছে সুনীলের কবিতায়। এই জীবন্ত নারী ঐতিহ্যকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ব্যক্তিগত নারী ‘নীরা’তে রূপান্তরিত করে তাঁর রূপতৃষ্ণা ও স্প্রেমতৃষ্ণাকে আস্বাদ করেছেন। সৌন্দর্যতন্ময় কবিদৃষ্টি সুনীলের প্রেমের কবিতায় পৌরুষের সঙ্গে এক মাধুর্য যুক্ত করে এবং এ জাতীয় ভাবাবেগ যৌনতা থেকে উদ্গত না হয়েও শরীরী ও জীবন্ত।[iii]

তবে দেহ নির্ভর হলেও সুনীলের প্রেম যৌন সর্বস্ব নয়। রাবীন্দ্রিক বোধের এক পরিমার্জনা তাঁর অনুভূতির প্রকাশকে করেছে মার্জিত। তাই তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছেন –

‘এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কী এ-হাতে কোনো পাপ করতে পারি?
শেষ বিকেলের সেই ঝুল বারান্দায়
    তার মুখে পড়েছিল দুর্দান্ত সাহসী এক আলো
যেন এক টেলিগ্রাম, মুহূর্তে উন্মুক্ত করে
    নীরার সুষমা।’

সুনীলের বহু বিখ্যাত ‘কেউ কথা রাখেনি’ কবিতাটিতে রয়েছে প্রথম যৌবনের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ বেদনা, বরুণার সুগন্ধি রুমালের গন্ধ বরুণাকে বুকে পাবার জন্য কবি ভালোবাসায় নিজেকে উন্মাদ করে তুলেছেন।

সুনীল প্রেমিক এবং রোমান্টিক। নীরার কথা চর্বিত-চর্বনের মত তাঁর কাব্যে ঘুরে ফিরে আসে। ‘নীরার অসুখ হলে কলকাতার সবাই বড় দুঃখে থাকে/....../ নীরা আজ ভালো আছে? (নীরার অসুখ)

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় কৃত্তিবাস পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন শক্তিমান কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রোমান্টিক কাব্যাদর্শে – সুন্দরের বোধ। সুন্দরকে দেখার ও বোঝার ব্যাকুলতা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেমের বিচিত্র রূপ লক্ষিত হয়। কবি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন – 'ভালোবাসা ছাড়া কোন যোগ্যতাই নাই এ-দীনের'। এ প্রেম কখনও আত্মকেন্দ্রিক যার পরিণাম না-পাওয়ার বেদনার আর্ত ব্যক্তির যন্ত্রণা। আবার কখনও এ প্রেম নারী কেন্দ্রিক যা নারী-পুরাণের যৌন সম্ভোগের স্থূলতায় কবির কাছে এনেছে অন্য এক মানসিক যন্ত্রণার উপকরণ। প্রেম যে নিজের স্ত্রীকে কেন্দ্র করে ঠিক গড়ে হয়ে ওঠে না এ বৈষ্ণব কবি থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত মানেন। তাই পরস্ত্রী কবিতার অবতারণা। নিজ ভালবাসার জন্য যখন 'কপালে কী' পরার জন্য পর হয়ে যায় তখন নিজেকে বড় বোকা-বোকা লাগে –

বালক আজও কুড়ায় তুমি কপালে কী পরেছো।
কখন যেন পরে?
সবার বয়স হয় আমার বালক-বয়স বাড়ে না কেন
চতুর্দিক সহজ শান্ত হৃদয় কেন স্রোত সফেন
মুখচ্ছবি সুশ্রী অমন, কপাল জুড়ে কী পরেছো
অচেনা, কিন্তু চেনাও চিরতরে।" (পরস্ত্রী)

নারীর প্রশ্রয়ী ক্রোড়ে গভীর শান্তি পেতে চান কবি। সারাদিনের অজস্র ক্লান্তি শরীরে বয়ে সন্ধ্যায় 'এলায়ে পড়িব তব বুকে'। সাধ এই অথচ নায়িকা মিলন নয় – বিরহ প্রত্যাশী –

তুমি ভালোবেশে ছিলে সব / বিরহে বিখ্যাত অনুভব (এবার হয়েছে সন্ধ্যা)[iv]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল নির্জন" (১৯৫৪) এক অর্থে মাইলস্টোন। নীরেন্দ্রনাথ প্রেমের কবিতা কিছু কম লেখেননি। ১৯৯২ বইমেলায় তাঁর ১০০টি প্রেমের কবিতা নিয়ে এক নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ পেয়েছিল। কবিতাগুলির বিস্তার প্রেমের বিভিন্ন স্তর নিয়ে।[v]

তুমি সব দিয়েছিলে
আমি তার যৎসামান্য গ্রহণ করেছি।
তুমি জানো,
যেমন দেবার, তেমনি নেবারও যোগ্যতা থাকা চাই!
আমার ছিল না।

-'অযোগ্যতা', 'নির্বাচিত প্রেমের কবিতা'

'অযোগ্যতা' কবিতাটি পাঠমাত্র মনকে ছুঁয়ে যায়। এ প্রসঙ্গেবলে রাখি কবি সচাতনভাবেই শারীরিক ব্যাপারটা কবিতায় আনেন নি, আনার খুব দরকার আছেও বলেও মনে করেন নি। দেহবাদের পরিবর্তে রসবোধের অভাব নেই কবিতায়।

কন্টকাকীর্ণ পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতেই শেষ পর্যন্ত কবি বিশ্বাস রেখেছেন প্রেমেই–

'তারপর যখন যযে প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছে,
শোকের আগুলে পুড়িয়ে পুড়িয়ে
প্রেম তাকে দিল সান্তনা, দিল
স্বয়ংশান্ত তৃপ্ত ঘর।' ('আকাঙ্খা তাকে')

কবির 'অন্ধকার বারান্দা' কাব্যগ্রন্থের –'তোমাকে বলেছিলাম' এবং 'প্রিয়তমসু' কবিতা দুটি কবির প্রণয়ীর কাছে অঙ্গীকার এবং অনন্ত মিলনের অপার আনন্দ ভাস্বরে উজ্জ্বল প্রেমাস্পদ।

নীরেন্দ্রনাথের কাব্যভুবনে নিরন্তর জেগে থাকে সৃজনের অমল উদ্যম, স্বপ্ন আর ভালোবাসা। কবির বিশ্বাস ও প্রত্যয় – "ভালোবাসা থাকলে সব হয়।/ দেখো সব হবে।/ যা কিছু বানানো যায়, আমি সব/ দুই হাতে/ দিনে-দিনে বানিয়ে তুলব, তুমি দেখে নিয়ো।" ('তুমি দেখে নিয়ো', 'কলকাতার যীশু')

শঙ্খ ঘোষ

'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতাটি ছিল কবি শঙ্খ ঘোষের লেখা। পঞ্চাশের কবির কবিতায় প্রেম অধিকাংশ জায়গাইয় এল স্নেহ হয়ে। কখনো অভিভাবক পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা। ক্ষণকালীন থেকে চিরকালীন রূপ ধরে। মৃদু আত্মকথনের সুরে ও আদি কল্পের ইশারায় কবি বার্তা পৌঁছে দেন –

'নিহিত পাতালছায়া' (১৯৬৭) নামক সংকলনের 'প্রতিহিংসা' কবিতাটি লক্ষ্য করা যাক –

'যুবতী কিছু জানে না, শুধু
প্রেমের কথা বলে
দেহ আমার সাজিয়ে ছিল
প্রাচীন বন্ধনে।
আমিও পরিবর্তে তার
রেখেছি সব কথা :
শরীর ভরে ঢেলে দিয়েছি
আগুন প্রবণতা।'

নিঃসন্দেহে এই কাব্যভাষা জড়ে রয়েছে পরাবাচনের অদৃশ্য আভা।[vi]

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পঞ্চাশের অন্যতম কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এক জটিল বিন্যাস সঙ্গত হয়েছে অলোকরঞ্জন দাশগপ্তের কবিতায়। এ সময়ের বুদ্ধিবাদি কবি তিনি, অথচ তীব্রভাবে রোমান্টিক। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখলেন,

'আমি - তোমার ? আমি কী সেই বল্লভ তোমার?
সে আমাকে তখনও এক নিরপেক্ষস্থলপম জানে। (স্বপ্নিনী)

তরুণ সান্যাল

পঞ্চাশের দশকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি তরুণ সান্যাল। তরুণ সান্যালের একদিকে কবি জীবন দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। এক দিকে মায়াময় নিষ্পাপ বাল্য; কৈশোর; প্রেমের জীবন স্বপ্ন। অন্যদিকে জাগ্রত জ্বলন্ত বাস্তব। এই দুই কুলেই কবির কাব্যতরী আনাগোনা করেছে – নোঙর করেনি কোথাও।[vii] রোমান্টিক কবি মাধুর্য তাঁর 'বিজয়িনী' কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে –

'আমি তো ভাবিনি
প্রেমের স্বরূপে বিজয়িনী'

অমিতাভ দাশগুপ্ত

পঞ্চাশের দশকের একজন অন্যতম কবি হলেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। কবিতা রচনার পাশাপাশি 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বও দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন।

প্রেমের মোহময় আবেশ প্রস্ফুটিত 'মরুকেতনের মত' কবিতটিতে –

'মরুকেতনের মত অমন উজ্জ্বল মুখ –
মনে হয় স্নান সেরে আসি।'

অলোক সরকার

'শতাভিষা' সম্পাদক **অলোক সরকারের** কবিতায় রোমান্টিক অনুভবের প্রগাঢ়তা রয়েছে, রয়েছে ইঙ্গিত্ময়তাও। তাঁর উচ্চারণের মাধুর্য মৃদুতায়। 'প্রেম' কবিতায় কবির সপ্রতিভ উচ্চারণ –

"ঘরটা সুন্দর করে সাজিয়েছিলে। আমি ভাবছিলুম
কতনা পরিশ্রম করতে হয়েছে তোমায়।"

....

আমার জন্যে কত দরদ তোমার সারা ঘড়টাই
আর সেই গম গম শব্দ – এইরকম একটা ঘর
আমরা থাকবো বলেই তো তুমি রচনা করেছো। (প্রেম)

এছাড়া উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে উল্লেখ্য কবিতাগুলি হল-

তারাপদ রায় (শেষ প্রেমের কবিতা), পূর্ণেন্দু পত্রী (তুমি এলে সূর্যদোয় হয়), অরবিন্দ গুহ, (পারাপার), মনীন্দ্র রায় (ক্রীতদাস), উৎপল কুমার বসু (কুচবিহার), শরৎ মুখোপাধ্যায় (স্থিরচিত্র)।

পঞ্চাশের তিন উল্লেখ্য মহিলা কবির বিষয়ে এখানে আলোকপাত করছি – রাজলক্ষী দেবী, কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন। **রাজলক্ষী দেবীর** মননধর্মিতা প্রবল হলেও হৃদয়ধর্ম ছাপিয়ে ওঠে সব কিছু –

'জানি না, আমার ছিলো সে এক আশ্চর্য
ভালোবাসা
তার কি ক্ষমতা আছে, মিথ্যে করে দিবি
সে পাওয়াকে।' (জানি আমি একদিন)

কবিতা সিংহ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরুষতন্ত্র নারীকে যে প্রেমের আঙরাখা পরিয়েছে, তাকে মেনে নেওয়া নিশ্চয়ই তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিছক বিষয়কে পেরিয়ে বিষয়হীনতাই নারীর কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে বলে প্রেমের বদলে দুঃখ বতাথাই তার প্রেমকথাকে আঁকড়ে ধরে;

'সেই নারী অধঃনেত্রে, পিছনে জগৎ রেখে স্থির পৃথিবীর মত সেই অন্য এক পৃথিবীতে একা/
চলে যাবে মুখ ঢেলে যদি মুখে শত মসীরেখা দুঃখগুলি, ভীতিগুলি তীক্ষ্ণ টানে এঁকে এঁকে রাখে।' (প্রেম)[viii]

নবনীতা দেবসেন

পুরুষতন্ত্রের পরম্পরাকে অস্বীকার করে নারীর আত্ম-সন্ধানের পথ পরিক্রমার অনন্য দিক ফুটে উঠেছিল নবনীতা দেবসেনের কবিতায়। রোমাটিক অনুভব নবনীতার কাব্যে স্থান পেয়েছে। তাঁর কবিতায় প্রেম আছে কিন্তু আত্মসচেতনতা কবিতার মজ্জায় মজ্জায় জাগ্রত –

"তোমার প্রণয় প্রযুক্ত নয়, দূর বিশুদ্ধ –
আমার প্রণয় কিছুটা প্রণয়, কিছুটা যুদ্ধ"[ix]। (ভালোবাসা ১২)

ষাটের দশকের কবিতা

পঞ্চাশের দশকের সঙ্গে ষাটের দশকের কবিতার মূল পার্থক্য সূচিত করেছে সময়। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় ষাটের কবিদের অধিকাংশেরই তখন অতি শৈশব, কারো কারো কৈশোরকাল। অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ কোনটি এঁদের ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে হয়েছে নিরুপায়। শৈশব-কৈশোরে এঁরা দেখেছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, ছিন্নমূল কয়েক লক্ষ মানুষের দুই বাংলায় আছড়ে পড়া এবং তৎসহ সুবিধেবাদী রাজনীতি, ধান্দাবাহী এবং সংস্কারে আহৃত মূল্যবোধগুলির নির্মাণ মৃত্যু। খুব সংশয়ের দৃষ্টি নিয়ে জীবনকে দেখা ছিল অনিবার্য।

অসহিষ্ণু এই দশক দাপিয়ে বেড়িয়েছে আত্ম-আবিষ্কার। কিন্তু পঞ্চাশের সংঘবদ্ধতা ছিল না এই দশকের। সকলেই বিচ্ছিন্ন, আলাদা অথচ স্বতন্ত্র্য এবং স্বকীয়। সে কারণে নির্বান্ধবেই দশক, ভেতরে বাইরে উভয়ত। সমকালের বিরুদ্ধে শত্রু মনোভাব, এই মানসিকতা থেকেই এ সময়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আন্দোলন। অস্থিরতা ও সংশয়ে এই দশক হাংরি আন্দোলনের মতো ভিত কাঁপানো আন্দোলনে মেতেছিল এক সময়ে। অন্য দিকে 'শ্রুতি' ও 'ঈগল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠল, তা মূলত শ্রুতি আন্দোলন নামে পরিচিত।[x]

দেবারতি মিত্র

নারী-পুরুষের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে ষাটের কবিদের মধ্যে **দেবারতি মিত্র** আলাদা স্থান করে নিয়েছেন। দেবারতির কবিতার অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর প্রেমের কবিতা যার মধ্যে মিশে আছে আদর-সোহাগ-কামনা-ভালোবাসা বিজড়িত আবেগ। কোথাও কোথাও বিরহ, স্থানে স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে নারী-চেতনার স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত দীপ্তি। তাঁর 'পাহাড়ী স্নানের ঘর' , 'পাহাড়ি ঝিঁঝির গান', 'তোমার স্নান', 'তোমার জ্যোৎস্না সুর', 'তরুণী পিয়ানো আর কিশোর', 'পদ্মগোখরোর শিস, 'স্তব', আদর, পাগলামি কিংবা যা হোক কিছু', 'চুম্বনের সময়', 'আপেল,কুঁড়ির গান', 'কাছাকাছি তারা', 'প্রিয়তম নেমিসিস', 'একজন সমবয়সী তরুণের প্রতি', 'সান্ধ্য সেতুর নীচে', 'ব্যথাহত দূরের বিকেল', 'না, না এবং না', 'কিশোরীর ফুল', 'সায়ং না সূর্যমন্দির', 'পৃথিবীর সৌন্দর্য একাকী তারা দুজন' কবিতাগুলি প্রেমের কবিতা হিসেবে অনবদ্য। প্রেমের সহজ-চাওয়া-পাওয়া-যৌনতার বিষয়টিকে অস্বীকার করেন নি দেবারতি বরং কাব্যিক শিল্প সুষমায় মন্ডিত করে তুলেছেন। তাঁর কবিতার ভাষাই প্রেমের আবেদন নিয়ে জীবন্ত শরীর হয়ে ওঠে –

'রূপোলি সবুজ বন রজস্বলানারীর শরীর
যতদূর যাও তত আরো খুলে যায়
টকটকে লাল পাতা উল্টেপালতে বেহুঁশ হাওয়াতে
সারারাত ছোটাবে তোমাকে।' (পদ্মগোখরোর শিস)

মনের একান্ত মানুষটি প্রেমিক এর সঙ্গে প্রেমিকার ঘনিষ্ঠ সাআন্নিধ্য ও নিবিড় সাহচর্যের মুহূর্তটিকে ফুটিয়ে তুলতে কবি যখন বলেন –

'একটি তারার থেকে আরেকটির ঘনিষ্ঠতা যতটুকু
তুমি ও আমার তত কাছে আছ সেই কথাই ভাবি।' (কাছাকাছি তারা)

শরীরী যৌনলীপ্সাকে সুষমামন্ডিত করে তুলে, শারীরিক প্রেমের লাবন্যময় সাহসী কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'আমার পুতুল' কাব্যের 'পৃথিবীর সৌন্দর্য একাকী তারা দুজন' কবিতাটিতে –

প্রিয়তম পুরুষটি এক পা একটুখানি উঁচু করে
বিছানায় ভেসে আছে দেবদূত
সুকুমার ডৌলভরা মাংসল ব্রঞ্জের উরু
অবিশ্বাস্য নিখুঁত সহজ গ্রীক ভাস্করতা-
হঠাৎ সচল হয়ে ডাকে তরুনীকে।...

রতিক্রিয়ার এমন নিটোল বুনন সকল কবিকে ছাপিয়ে মনে হয় প্রেমিকা দেবারতিই সম্ভব করেছেন।

কেবল পুরুষই যে নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে প্রেম নিবেদন করে তা নয়, নারীও যে পুরুষের প্রতি মুগ্ধ হয়ে অনুভবের গভীর তাড়না থেকে নিয়তির মতো পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় তা দেবারতি সপ্রতিভভাবে ব্যক্ত করেছেন।

;দেবারতির নিজের কথায় 'নারীর পুরুষকে দেখার প্রচলিত প্রথা আমি ঠিক জানি না। তবে আমি বরাবরই পুরুষকে শুধু কানা-ই-করিনি, আদরও করতে চেয়েছি।'

'প্রেমের কবিতায় দেবারতি সত্যিই সমকালকে ছাপিয়ে সর্বকালীন মাত্রায় উঠতে পেরেছেন। শরীরী সংরক্ত বাসনা, ইন্দ্রিয়ঘনতাই শেষ কথা ন্য, অন্য এক শিল্পসম্মত গভীরতা ও বোধ তন্নিষ্ঠ পাঠককে অমর্ত্যগোচর সিম্ফনির কাঁচঘরে নিয়ে যায়।'[xi]

প্রেম শুধু সুখ স্মৃতির উদ্রেগ করে না তা নিয়তি তাড়িত যন্ত্রণার উদ্রেগ করে। জীবনের দ্বন্দ্ব জটিলতায় কবি **পবিত্র মুখোপাধ্যায়** নিজেকে যাচাই করে নিতে চেয়েছেন তাঁর জনৈক দুর্বল প্রেমিকের উক্তি কবিতাটি লক্ষ্য করি –

তোমার সত্তার স্মৃতি ধারণ
কোরেছি, অপলক

......
দুর্লভ তোমার প্রেম ভাগ্যবান প্রেমিকই তা জান।

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

ভালোবাসা অর্ধেন্দুর কবিতার মধ্যবিন্দু সেই ভালোবাসা ও-প্রাপ্তির কারণে উদ্বেলিত। কখনো বা বেদনার গ্লানি বহনকারী।

বৃষ্টি হচ্ছে, আমি যাবো অগাধ জলের দিকে
এ-সময়, হৃদয়ের কাছাকাছি
শেষবেলায় এসেছিলে তুমি' (শেষবার)

ভাস্কর চক্রবর্তী (শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণ, কাব্যটি স্বতন্ত্র) – প্রেমে পড়লে আর ভালোবাসতে জানলে কত কিছু যে করা যায়, কল্পনায় অথবা বাস্তব ইচ্ছাশক্তির জোরে কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর 'শুধুমাত্র তোমাকে' – ৩ কবিতায় ছুঁয়ে যায়।

'তোমার মাথার উপর দিয়ে দ্রুত, উড়ে গেলো .../ .../ ...

দুপুরবেলা, আরও কতো কী করতে ইচ্ছে করে হলুদ শাড়ি প'রে যখন তুমি দাঁড়িয়ে থাকো রত্নেশ্বর বারান্দায়।'

অন্তর্মুখীন ষাটের কবি **মৃণাল চৌধুরী** সবচেয়ে গীতল ও রোমান্টিক – 'এই তো পেতেছি হাত' কবিতায় সেই সুর ধনিত। **মৃত্যুঞ্জয় সেন** প্রকৃতি প্রেম নদী ও ভালোবাসা একাকার হয়ে যায় কবি মৃত্যুঞ্জয় সেনের কবি চেতনায় – 'বলা হয়' কবিতাটিতে তারই দ্যোতনা। **অতিন্দ্রিয় পাঠক** (চিঠি) কবিতাটি মেধাবান হয়েও রোমান্টিক, মগ্ন স্বভাব পরিস্ফুট **বাসুদেব দেব** কবির কবিতায় আছে প্রেমের এক গোপন বেদনা। **আশিষ সান্যাল** শ্বাশত প্রেমের মাধুর্যেরই প্রকাশ কবির 'আজো ঠিক' কবিতায়। **রত্নেশ্বর হাজরা** প্রেমিকের তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের আর্তি "তৃষ্ণা" কবিতায় ফুটে উঠেছে। ষাটের দশকের কবি **মণিভূষণ ভট্টাচার্য** শীতল রোমান্টিক মন ধর্মের পরিচয় মেলে তাঁর 'জোনাকি' কবিতাটিতে। **শামসুর রহমান** বিগত প্রেমের পুণরোমন্থনের আশা নিয়ে প্রেমিক কবি শামসুর রহমান 'তুমি কি আসবে ফের'।**কেতকী কুসারী ডাইসন** আবার পার্থিব সম্পদে আসক্তি নয় বরং হৃদয়ের প্রেমাস্পদকের আন্তরিকতায় ভরিয়ে দিতে চান কেতকী। কেতকী।তাঁর 'নয়' লাইনের কবিতা-টি লক্ষ্যনীয়। **উত্তম দাস** 'রাত একটার বৃষ্টি' কবিতায় খুবই প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ উচ্চারণ। **বাসুদেব দেব** কবির কবিতায় আছে প্রেমের এক গোপন বেদনা। 'তোমার জন্য' কবিতাটি অপূর্ব।

সত্তরের দশকের কবিতা

স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের আর্থ সামাজিক অবস্থা সত্তর দশকে অনেকটা স্পষ্ট। ভারত বিভাগের ক্ষতস্থান শুকিয়ে এসেছে, ছিন্নমূল মানুষগুলো হয় তলিয়ে গেছে নইলে ততদিনে নিজের মতো বাঁচার পথ খুঁজে নিয়েছে। স্বাধীনতার স্বপ্ন কিংবা নতুন ভারত গড়ার কোন উচ্চাকাঙ্খা বা স্বপ্ন এ সময়ের কবিদের বিভোর করে নি। বরং এসময়ের ভ্রষ্টাচার, চ্রিত্রহীনতা এবং মানসজগতের সামগ্রিক ভাঙণ এঁরা বাস্তব অর্থে চিনতে শিখেছেন। এ সম্পর্কে কোন মোহ বা মোহভঙ্গজনিত অনুতাপ এঁদের স্পর্শ করে নি। এ সময়ে নকসালবাড়ি আন্দোলন মধ্যবিত্ত মাসনে প্রবল ধাক্কা দিয়েছিল বটে কিন্তু সাহিত্যে রাজনৈতিক অর্থে তেমন রূপন্তর ঘটেনি কোথাও। এ পর্বের কবিতায় যে রাজনৈতিক চেতনা বর্তেছে তার প্রধান প্রেরনা মূলত চল্লিশ-পঞ্চাশের কবিরা।[xii]

এ সময়ের বাংলা কবিতা, কবিতার বহিরঙ্গ নির্মাণে ভাষা ছন্দ জাতীয় প্রকরণগতরূপে কবিরা অনেক স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক পাঠকের কাছে গ্রহনীয় হয়ে উঠেছে।

জয় গোস্বামী

সত্তরের কবিতায় প্রকৃতি ও প্রেম এক জাতীয় স্নিগ্ধতা দিয়েছে যা থেকে নগর জীবনের ক্লান্তি, হতাশা, অবক্ষয় আর পীড়ার নাম করে বাংলা কবিতা বহুদিন বঞ্চিত ছিল। সত্তরের দশকে খুবই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী কবি জয় গোস্বামী। আত্মানুসন্ধানী কবি জয়

গোস্বামীর প্রেমচেতনার যে স্ফুরণ দেখা যায়, কখনো বা প্রকৃতির রূপকে রোমান্টিক কবি মন নারীকে অন্বেষণ করেন, কখনো বা প্রেমাস্পদের জন্য দূরন্ত উচ্ছাস, অগাধ সমুদ্রের তরঙ্গায়িত ফেনিল ঢেউ যেন আছড়ে পড়ছে। কখনো রোমান্টিক প্রেম মাধুর্যের অনাবিল আনন্দ সুধা আবার পাশাপাশি প্রেমের নঞর্থক দিকটিও ফুটে উঠেছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রেমের স্বপ্ন ভঙ্গ তৎজনিত বিরহ জবেদনা কবিতার ছত্রে ছত্রে অনুভূতিতে নিষিদ্ধ। জয় গোস্বামীর কবিতায় প্রেমের ভাষা ভারতীয় সাহিত্যের প্রেম কবিতার ধারাবাহিকতাকে স্বীকার করেই কমনীয় হয়ে উঠেছে। জয়ের কবিতায় প্রেমচেতনা ও আত্মানুসন্ধানের এক মেলবন্ধন দেখা যায়।

জয় গোস্বামীর 'কবিতা সংকলন' (১৯৮৯) প্রথম কবিতা 'স্নান' এ এক লাজুক প্রেমিকের দয়িতাকে এতদিনের অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করার সাহস অর্জনের মুগ্ধতা স্ফুরিত হয়েছে। প্রেমান্ধ কবির কাঙ্খিত দয়িতার সঙ্গে স্নানের মধ্য দিয়ে সাহসি উচ্চারণ ঘটে,

"পৃথিবী দেখুক, এই তীব্র সূর্যের সামনে তুমি
সভ্য পথচারীদের আগুনে স্তম্ভিত করে রেখে
উন্মাদ কবির সঙ্গে স্নান করছ প্রকাশ্য ঝর্ণায়।"

কবির সমগ্র কবিসত্তায় ঈশ্বরীয় প্রেমচেতনাই হোক আর মাননীয় প্রেমচেতনাই হোক দুই-ই-একাত্মীভূত হয়ে নিমজ্জিত হয়ে যায় আত্মানুভবের মধ্যে। এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য কোজাগর, মহৎ, সখা, একটি প্রেমের দৃশ্য, বাৎসরিক, বোমভোলা, ৭ই ডিসেম্বর, আলোহাওয়া, প্রীতিভোজ, রাখী, একটি বৃষ্টির সন্ধ্যা, বিধি, ছাত্র, বসন্তসেনানী, মল্লিকা ও লীলাচ্ছল, ডানা, এই মালঞ্চে, বর্ষা বন্দনা, গান, বসন্ত-উৎসব, জন্মদিনের কবিতা ইত্যাদি।

কবির বিশেষভাবে উল্লেখ্য কয়েকটি কবিতার প্রতি এখানে আলোকপাত করব। কবি জয় গোস্বাআমীর 'ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা' (১৯৮৯) কবিতা সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত – 'ঝাউপাতাকে রুগন্ কবির চিঠি কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি যেন প্রকৃতির মধ্যে তাঁর প্রেমিকা-নারীকে খুঁজে নিতে চান।

'বরষা বন্দনা' কবিতাটিতে দৈনন্দিন জীবনের বাগাড়ম্বরকে ছাপিয়ে এ জীবনে যে প্রেমের প্রয়োজন তাই অনস্বীকার্য।

'সে কবিকে খুঁজে পাবে বলে
এ বর্ষায় এই ঝড়জলে
আজকে আমি এসেছি রাস্তায়
একা মানুষ'

প্রকৃতি ও জীবন এবং জীবনের উত্তাপ প্রেমের প্রবাহমানতা ও অন্বেষা জয়ের কবিতা পংক্তিগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এখানেই ইন্দ্রিয়ঘনাতুর ও শরীরী যৌন প্রেমাচার থেকে জয় স্বকীয়। 'পাগলী তোমার সঙ্গে' (১৯৯৪) কাব্যের জয়ের 'স্পর্শ' কবিতাটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

'এতই অসাড় আমি,
চুম্বনও বুঝিনি, মনে মনে দিয়েছিলে তাও তো যে না বোঝার নয়...
ঘরে কত লোক ছিল, তাই ঋণ স্বীকার করিনি। ভয়, যদি
কোনো ক্ষতি হয়?
কিন্তু আজ বলো, দশত শতক ধরে ধরে / ঘরে পথে লোকালয়ে স্রোতে-জলস্রোতে আমাকে কি
একাই খুঁজছো তুমি? আমি বুঝি তোমাকে খুঁজিনি?'[xiii]

জয়ের বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম – 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়''। একদিকে এ কবিতা প্রেমের কবিতা অন্যদিলে প্রতিবাদী স্মৃতিচারণার কবিতা। আবার প্রেমিকার অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে প্রতিবাদে ফেটে পড়ার কবিতাও। বেণীমাদবের সঙ্গে নায়িকার প্রথম পরিচয়ের মুহুর্তটির চিত্র-এরকম–

'আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শাড়ি
আলাপ হলো, বেণিমাধব, সুলেখাদের বাড়ি।'

মেধাবী ছেলে বেণীমাধব নায়িকার কালো শরীরের অভ্যন্তরে প্রেমের সাদা আলো জ্বেলেছে। ষোলো বছরের নায়িকার মনে নতুন জাগা প্রেমের সেই উদ্বেলমুহুর্তের কথা স্মরণ করেছে সে। তারপর একদিন জানতে পারে সে বেণিমাধবের নূতন প্রেমিকার কথা। সব হারানোর বেদনা বুকে নিয়েও সেই কালো মেয়ে স্বীকার করে,

'স্বীকার করি, দুজনকেই মানিয়েছিল ভালো
জুড়িয়ে দিলো চোখ আমার, পুড়িয়ে দিল চোখ
বাড়িতে এসে বলেছিলাম, ওদের ভালো হোক।'

একই সাথে চোখ জুরানো এবং চোখে পোড়ানোর বৈপরীত্য মালতীর অন্তরীর বেদনার দ্যোতক। তবু সে তাদের শুভাকাঙ্খী। গভীর প্রেমের ধর্ম এটাই। প্রেমের জন্য এই আত্মত্যাগ কবিতাটি উজ্জ্বল।

কবি অমিতাভ গুপ্ত মিতভাষী নিভৃতচারি আত্মমগ্ন প্রেমের কবিতায়। তাঁর যেমন প্রবঞ্চণার প্রতি-বিদ্রোহের সুর ধ্বণিত তেমনি ভালবাসার জন্যে কবি যে দিক্‌বিদিক্ প্রসারিত হতে জানেন তাঁর 'জলৌকা' কবিতাটিতে ভালবাসার সেই সুখ-তৃপ্তি বিধৃত-

'বুনো বেনো বনে হেঁটেছি অনেক রক্ত শুষেছে জোঁক
তবু সেই সব ভ্রমণও ছিল উৎসাহ-ব্যঞ্জক/ ....
ফুটেছি ঝরেছি দেওয়ায় নেওয়ায়
হিসেব নিকেশে নিকষে/ সোনায় কখনো স্ফটিকবোনায়
অপরাবশ্য বশে/ কেবল একটি মিথ্যাচারকে আমারও
আত্মজারকে রেখেছি/ তাকেই ভালোবাসা বলে।
নইলে সইবে আর কে / ভালোবাসা সব সহ্য

করেছে। সব ক্ষয়ক্ষতি শোক/ মিথ্যাচারের এপাড়ে
ওপাড়েৃজড়ানো জটিল জোঁক। / তুচ্ছ করেই ছুঁয়ে
যেতে পারে সব অসীমের প্রান্ত / থাক্ পড়ে থাক্
ডানাহীন মাঠ রাঢ়রূঢ় প্রান্তর।'

কবির 'তোমার ফাল্গুনে আমি', 'দ্বৈত', 'মানুষের দুঃখ, 'মস্‌মাইকেডস্', 'স্বয়ংবরসভায়', 'একটি দুটি দিন', 'অসংলগ্ন', 'সিংহাসন', 'আগুনে পোড়া ছিন্ন চিঠি', 'ক্লো-ম্যাগননের দ্বীপ', 'জু-চেন', 'অজ্ঞাত-বাস', দোলপূর্ণিমা, প্রভৃতি কবিতাগুলিতে প্রেমের বিভিন্ন দিকের বিস্তার বিধৃত।

প্রকৃতি ও ভূ-খন্ড কখনো কবিচেতনায় প্রেমিকা দায়িতা হয়ে ওঠে।

'ক্লো-ম্যাগননের দ্বীপ' – তোমাকে বধূর মতো সাজাব বলেই আমি প্রথম এসেছি/

কবির 'অসম্ভবের গান' কবিতাটি অস্তিত্ব যে এক অসম্ভব বিস্ময়ে জীবন যুদ্ধে ক্ষয় হতে হতে গভীর ভালোবাসার টানেই বাঁচেন তা স্বীকার করেন এবং কবি বলের এই ভালোবাসা ও এক অপার বিস্ময় –

'যেভাবে নিবিড় ভালোবাসা বাঁচে/......... / ...... /
...... / আছি বেঁচে তাই, বিস্ময়-মোহে, অসহনীয়
যে তুমি / তোমাকেও জানি ভালবাসি, জানি, এও এক বিস্ময়।'

'জু-চেন' মেধা ও মনন সমৃদ্ধ এক দীর্ঘ কবিতার শেষে কবি শ্বাশত প্রেমেরই জয়গান গেয়েছেন।[xiv]

এছাড়াও অন্যান্য কবিদের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি - **কবি কৃষ্ণা বসু** 'তোমার মুখের দিকে', কৈশরের প্রেম রোমন্থন হয় প্রেমিকের মুখের দিকে তাকালেই। কবি **মৃদুল দাশগুপ্ত** কার্তুজ আর অস্ত্রের বিধস্ত পরিবেশ থেকে উঠে গুরে দাঁড়াতে চেয়েছেন শুধুমাত্র প্রেমেরই টানে 'প্রেমিকা' কবিতায়। রাজনৈতিক ও সমাজ মনস্ক কবি **ব্রত চক্রবর্তী** ক্ষোভ ও বিদ্রোহের মধ্যেও গরাদ গলে ভালোবাসা উপলব্ধি করেন 'আলো' কবিতায়। **ধূর্জটি চন্দ** প্রেমের কবিতা ঈষৎ শরীরী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। নারী তাঁর হৃদয় হরণ করে নিয়ে গেছে – 'অন্নপূর্ণা নারী আমার'। কবি **প্রমোদ বসুর** ভাবাবেগও রোমান্টিক। 'দাম্পত্য' কবিতায় প্রমোদ লিখেছেন – পাখির পালকে ভালোবাসাবাসি খেলা/ এসো আজ খেলি একেলা জগত ভুলে। **পঙ্কজ সাহার** আদ্যন্ত রোমান্টিক মন বেদনায় আতুর। উল্লেখযোগ্য, 'কোলাজ' কবিতা। **রণজিৎ দাস** 'আমাদের প্রেম'। প্রবল আবেগ, দেহানুরাগ এবং কিছু নারীবাদী চিন্তার বিপ্রতীপে ভালবাসাদ আসন দান করেছেন রণজিৎ। তিনি জানেন রমাণ আঙুলের মত ভরে ওঠে শরীর, বলেন – "যে রোদে আঙুল পাকে, সেই রোদ, সেই মুখতাম প্রেমের তীব্রতায় তিনি উপহার দিতে পারেন তাঁর ছিন্নসূত্র নায়িকাকে। কবি তাঁর নায়িকাকে কখনো বৃদ্ধা হতে দিতে চান না। **পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল** প্রেমের বিরহে ব্যাথাতুর। **অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়** মূলত রোমান্টিক

কবি। নিজ জীবনের ব্যক্তিগত তাঁর কাজ রচনার মূল প্রেরণা। 'নদী কিংবা নারী' কবিতায় কবির গভীর জিবনানুভব ব্যক্ত হয়েছে। **শ্যামলকান্তি দাশ** নায়িকার মনের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন "তার নাম অভিমান এত দীর্ঘ/ পুড়ে যায় সংসার, সমাজ!" **পিনাকী বসু লিখেছেন** প্রেমের যন্ত্রনা ও সংশয়। **সুবোধ সরকার** প্রেমের ছটফটানি অনুরণন। অবদমিত মানস জগত সংশয়ে নিক্ষেপ করে। **অজয় নাগ** 'পুরণ' কবিতাটি উল্লেখ্য।

আশির দশক

আশির কবিতায় অবদমিত জীবন চেতনার একটি ধারা প্রবল হয়ে উঠেছে, সত্তরের জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার প্রমুখের, আরো পেছনে তাকালে হাংরি লেখকদের উত্তরাধিকারীর ছায়া যেন এঁদের মধ্যে দেখা যায়। অবশ্যই অভিজ্ঞরা প্রত্যেকের নিজস্ব, চেতনার গোপন স্তরগুলিও ব্যক্তিগত।

আশির দশকের মহিলা কবিদের কথা আগে বলে নি। পুরুষ – সর্বস্বতার নিরিখে মেয়েদের ধর্ম শুধু পুরুষের ভালবাসার ঘোষণায় সাড়া দেওয়া। এই একতরফা ভালোবাসায় মেয়েদের প্রীতির প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। পি্তৃতন্ত্রের পিঞ্জর ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবণতাই বর্তমান সময়ের মহিলা কবিদের পূর্ববর্তী দশকগুলি থেকে স্বতন্ত্র – মাত্রা এনে দিয়েছে। এই সময়ের মহিলা কবিদের কবিতায় নারীত্বের অহংকার।[xv]

এই ধারার কবিদের মধ্যে আছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, সুতপা সেনগুপ্ত, তসলিমা নাসরিন, অঞ্জলি দাশ, অনুরাধা মহাপাত্র, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মল্লিকা সেনগুপ্ত

প্রায় দুই শতকের কবিতা চর্চায় মল্লিকা হয়ে উঠেছেন নারী চেতনাবাদী কবিদের অগ্রণী। পষ্টতা, ঋজুতা ও প্রত্যয়ই তাঁর অভিজ্ঞান। পুরুষতন্ত্রের রূঢ় দাপটকে কষাঘাত করে নতুন প্রত্যয় জাগিয়ে রাখেন তিনি।

তবে তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'আমাকে সারিয়ে দাও ভালবাসা' আমাদের আপ্লুত ও বিষন্ন করে। মারাত্মক কর্কট রোগের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে যেতে যাঁর কণ্ঠস্বর জীবনের প্রতি ভালবাসায় স্নিগ্ধ কোমল ও সতৃষ্ণ, এর মানবিক কারুণ্য আমাদের স্পর্শ করে –[xvi]

'ভালবাসা ভালবাসা বাঁচাও আমাকে
আমাকে সারিয়ে দাও মলমলে জীবনের স্বাদে
মাথা ভর্তি চুল দাও, চোখে দাও কটাক্ষ বিদ্যুৎ,
আমার আকালে দাও মেঘ বৃষ্টি আলো।'

(আমাকে সারিয়ে দাও ভালবাসা – ১)

গভীর জীবন বোধে এই পার্থিব পৃথিবী ছেড়ে তিনি এখনই অকালে যেতে চান না তাঁর প্রিয় মানুষদের ছেড়ে, তারই করুণ আর্তি এই পংক্তিগুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সুতপা সেনগুপ্ত

কবি সুতপা সেনগুপ্তের 'অন্ধকারের নৌকা' কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ। তিনি সত্তরের দশকে কবিতা লিখতে শুরু করলে ও মূলত আশির দশকেই তাঁর কবিতা দিগন্ত প্রসারী হয়েছে।

প্রেম তো বয়স মানে না। প্রৌঢ় নারীর ও আকর্ষণ জন্মায় কম বয়েসি তরুণের দিকে। অবচেতনার এই সত্তাটি ধূসরতার মধ্যেও যযেন স্বপ্ন দেখে, বাঁচিয়ে চায়, জীবনকে উপভোগ করতে চায় সব ইন্দ্রিয় দিয়ে জীবনের সমস্ত স্বাদকে। এই বোধ থেকেই জন্ম নিল সুতপার অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ –

'ছোকরা ছোকরা শ্যাম রায় রাই।'

শ্যাম রায় নামক বিবাহিত তরুণের সঙ্গে বয়োজ্যেষ্ঠ কবি-নায়িকার যৌন সম্পর্কের প্রতিচ্ছবিই রয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। ৫৬টি নামহীন কবিতা বাংলা-কাব্য-বিশ্বে এক বিতর্কিত সংকলন।

'আমার বুকের মধ্যে আমের বোলের মতো ব্যাথা/
কত বছরের পর, শ্যাম রায়, তোমার জন্যেই এল/
এদিক ওদিক বহু কথা হলো, পাশাপাশি শুয়ে
খোলা রোদী। .... টক-ঝাল তারুণ্য মেখে ফেঁসে
গেছে বেশি বয়েসি মেয়ে।'

এখানে প্রেম এসেছে যৌনতারই শর্তে। আর এরই অন্তরালে রয়েছে জীবনের সূক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা,ভিন্ন স্পন্দন।বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের বাইরে অর্থাৎ অবৈবাহিক সম্পর্কের মাণ্যতা বা অনুমোদনের অবস্থান সুতপার দানার ক্ষেত্রটিকে বিস্তৃত করেছে।[xvii]

তসলিমা নাসরিন

পুরুষ-সর্বস্বতার বিপ্রতীপে খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করে তসলিমার কবিতা। 'আমি ও মানুষ' এই উচ্চারণের ভেতরে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে প্রান্তিকায়িত নারীর দীর্ঘ বঞ্চণার গোপন ইতিহাস।

তবু প্রেম যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই লেখিকার রচনা কেবল বিষাদ, তিক্ততা, গ্লানি, প্রতিবাদের নয়, তাঁর মধ্যে রয়েছে ভালবাসার জন্যে ব্যাকুলতাও।

'প্রতারক পুরুষেরা / একবার ডাকলেই/
ভুলে যাই পেছনের সজল ভৈরবী/ একবার
ভালবাসলেই সব ভুলে কেঁদে উঠি অমল বালিকা'।[xviii]
(ভুল প্রেমে কেটে গেছে তিরিশ বছর)

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিদের **চৈতালী চট্টোপাধ্যায়** (উড়ন্ত কার্পেট), **অনুরাধা মহাপাত্র (**'বর্ণনীয়'), **অঞ্জলী দাস** (পূর্ণবৃত্ত), **সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়** (ঘড়ি)।

আশিতে অন্তর্মুখী কবিতার একটি ধারা বহমান, যা তুলনায় স্থিতধী এবং অন্তর্লোকের রহস্য উন্মোচক। এই ধারার কবিরা বিচিত্রগামী। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – **অনন্য রায় (ওবেলিক্স), জহর সেন মজুমদার (বিভক্তি চিহ্ন), কুন্তল মুখোপাধ্যায়, সুজিত সরকার (তোমার মৃত্যুকে ডেকে আনি), অলোক বিশ্বাস (যৌনযাত্রা), প্রবালকুমার বসু(পুরুষই তোমার বন্ধু), ঈশিতা ভাদুড়ী(এ কোন গোপন মুদ্রা) শ্রীধর মুখোপাধ্যায়,** (রমণ শহরে) প্রমুখ।

নব্বই-এর দশক

নব্বই এর কবিরা সমকাল সচেতন। প্রেমের প্রেক্ষিতটি যাচাই করে নেন বাস্তব-ভূমিতে। প্রতিবেশ তাঁকে সংসারী করেছে, হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের জন্যে ক্ষোভ আছে – কিন্তু আসক্তিও আছে জীবনের স্নিগ্ধতায়।

এই ধারার কবিদের মধ্যে আছেন – **কুমারেশ চক্রবর্তী(ঢেউ), অজিতেশ মাইতি(আমাদের গল্প), রামকিশোর ভট্টাচার্য(ফ্রেডরিক নগরের মেয়ে), নাসের হোসেন(আকাশ এবং সমুদ্র)** প্রমুখ। **শতরূপা সান্যাল (একা একা হাঁটি ক্ষত-বিক্ষত দু-পা), যশোধরা রায়চৌধুরী(আহতের গান), অহনা বিশ্বাস(নস্টালজিয়া), মন্দাক্রান্তা সেন(মন্ত্রণা)** কবিতাগুলিতে প্রেমের তাৎপর্য ব্যঞ্জনাবহ।

এই দশকের নবীন কবিদের মধ্যে কবি **বিদ্যুৎ ভৌমিক** আদ্যোপান্ত রোমান্টিক মনোধর্মের। তাঁর 'গাছবৃষ্টি চোখের পাতা ভিজিয়ে দিল' কাব্যগ্রন্থের 'ধ্রুপদী প্রেম এবং তুই', কবি প্রেমিকা একমাত্র নবনীতাক ভালোবেসে বিশ্রামহীন নিবেদন করেছেন –

'বিমূর্ত বাস্তব থেকে লক্ষ্যভাগ যন্ত্রণা-চ্যাঁচায়,
'বয়স লুকিয়ে প্রেমিক হয়েছি', 'মন'
ধ্রুপদী কথোপকথন, একমাত্র মুখপুড়ির জন্য ,
জলছবি, প্রিয়তমা, প্রভৃতি কবিতায় তারই চিহ্ন।
শেষলগ্নের ভেঙে পড়া স্রোত –'[xix]

এছাড়া প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ ফুটে উঠেছে – 'এখানে স্বপ্ন প্রবাহমান', 'গর্ভবতী নবনীতাকে', 'আমি তোমার মধু নেব', 'অতলান্ত তুমি', 'চৈতন্যে ফিরেছে প্রেমের সর্বনাশ', 'নতুন দর্শনে', 'শুধু তোকে প্রিয় নারী', 'প্রেম-অপ্রেম', 'কি চাই তোমায়', ছবি, 'অবিনশ্বরী' প্রভৃতি কবিতা ও তাল অনবদ্য। আদ্যোপান্ত এক প্রেমিক কবি কণ্ঠেই তো এ কথাগুলি উচ্চারণ হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কবিতায় প্রেমের রহস্যময়রূপ যতই বাস্তববোধে স্পষ্ট হোক না কেন, ক্ষণবাদী দেহাত্মবাদী প্রেমের ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে প্রেমের চিরন্তরন শ্বাশত কোলেই আশ্রয় চেয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকা। প্রেম ভাঙা

এবং তৎজনিত বিচ্ছেদ বেদনা যে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক তা যেমন প্রলেপ দেওয়া যায় না চিরস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করে তেমনি দুটি মনের অনন্ত ভরসা পরস্পরকে মর্যাদা ও সম্মান দেওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার এতো সারাজীবনের পাথেয়। অনন্তকাল ধরে প্রেমের এই প্রবহমান স্রোতই বয়ে চলেছে সমুদ্রের ফেনিল উচ্ছ্বাসের মতো।

প্রেমের এই শাশ্বত রূপই তো আবহমান বাংলা কবিতার চির-সম্পদ। সহস্রাব্দের বাংলা কবিতা তথা সর্বকালীন সর্বদেশের সকল কবিতায় প্রেম অবিনশ্বর। যতদিন পৃথিবীতে কবিতা থাকবে কবিতাতে প্রেমও চিরকালীন পরম রত্ন হয়ে বিরাজ করবে।

সাধারণ সূত্র নির্দেশ

---

[i] রবীন্দ্র রচনাবলীভুক্ত ২য় খন্ড/ মানসী কা, পৃঃ২১৩, , ১০ই পৌষ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী।

[ii] রূপা ভট্টাচার্য-, পূর্বোক্ত, পৃঃ

[iii] উত্তম দাশ (সম্পাদিত), শতাব্দীর বাংলা কবিতা, শতাব্দীর বাংলা কবিতা, মহাদিগন্ত, বারুইপুর, ২৪ পরগনা, ৮৭৩৩০২, পৃ ৪৮

[iv] তরুণ মুখোপাধ্যায়, বাংলা কবিতা অনেক আকাশ, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা ২০১২, পৃঃ ২৮২।

[v] তাপস ভৌমিক, কোরক সাহিত্য-পত্রিকা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৮, -এতে প্রকাশিত প্রবন্ধ – 'তুমি রবে নীরবে/সুনন্দ অধিকারী' থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৬২।

[vi] তপোধীর ভট্টাচার্য, কবিতাঃ নন্দন ও সময়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ – দোলযাত্রা ২০১৬,; পৃঃ ১১৮

[vii] তরুণ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯২

[viii] ডঃ অশোককুমার মিশ্র, 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা' (১৯০১-২০০৮), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭০০০৭৩, এপ্রিল , ২০১৭,পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬২

[ix] রূপা ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯

[x] উত্তম দাশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২

[xi] শাওন নন্দী, প্রসঙ্গঃ কবিতা, প্রবাহের কূল ছুঁয়ে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০১১, পৃঃ ৯০

[xii] উত্তম দাশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩

[xiii] রূপা ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬

[xiv] অমিতাভ গুত, 'অসমাপ্ত ভারতের দিকে', 'কবিতা পাক্ষিক ৩৬ডি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০২৬, প্রথম প্রকাশ ২৬ ডিসেম্বর, ২০০০, কবিতাগুলি সংগৃহীত।

[xv] রূপা ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯

[xvi] রূপা ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪

[xvii] রূপা ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০

[xviii] রূপা ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯

[xix] বিদ্যুৎ ভৌমিক, 'গাছ বৃষ্টি চোখের পাতা ভিজিয়েছিল'', আনন্দময়ী প্রকাশনী, ৪২, পোস্টাল পার্ক, বাঁশদ্রোনী, কলকাতা ৭০০০৭০, পৃঃ ৫১

‘জতুগৃহ’ : একটি নৃশংস গণহত্যা

রচনা রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আমডাঙা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মহাভারত কালে কালে মানুষের মনে নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে চলেছে। কালের অগ্রগতির সাথে মহাভারতকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করতে তৎপর হয়েছেন মহাকবি ভাস থেকে এযুগের নাট্যকার ব্রাত্য বসু। বারণাবতের ঘটনা একালের মানুষের মধ্যেও প্রশ্ন জাগিয়েছে। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক খুঁজে পেয়েছেন জাতিভেদের চরম নৃশংসতা। আর্য সমাজ চতুর্বর্ণে বিভাজিত হলেও সর্বশেষ শূদ্র শ্রেণী অনার্য হিসেবে গণ্য হত। এমনকি তাদের তুল্যমূল্য করা হতো পশুদের সঙ্গে। সমাজে তারা মানুষের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় এই শ্রেণীর ওপর নানা অত্যাচার ও নিপীড়নে আনন্দ পেত। এ অসাম্য ভারতবর্ষে বহুদিন বহাল ছিল। আজও তা নির্মূল হয়েছে বলা যায় না। নাট্যকার অমল রায় তাঁর ‘জতুগৃহ’ নাটকে সমাজের এই অসাম্য ও অস্পৃশ্য নীতিকে ধিক্কার দিয়েছেন। নাট্যকার দেখিয়েছেন দুই জ্ঞাতি ভ্রাতার সম্পত্তিবিষয়ক বিবাদে বলি হয়েছে ছটি নিরাপরাধ প্রাণ, যারা সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণী হিসেবে পরিগণিত। নাটকে নাট্যকার বরংবার অবহেলিত, নিপীড়িত জনগণের যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন। মহাভারতের কাহিনিকে প্রায় অবিকৃত রেখে মহাভারতের কাল থেকে আজও বয়ে আসা অস্পৃশ্যতার অমানবিকতার ছবি সংযুক্ত হয়েছে নাটকে। নাট্যকার বারণাবতে পান্ডবদের হত্যার চক্রান্তকে উপলক্ষ করে মূলত অসহায় দরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরেছেন। 'জতুগৃহ' নাটকের সংলাপ পড়তে পড়তে মনে হয় এ কোনো প্রাচীন মহাকাব্য থেকে তুলে আনা কাল্পনিক গল্পগাথা নয়, এ আবহমানকাল ধরে চলে আসা ক্ষুধার্ত মানুষের বঞ্চনার ইতিকথা। রাজনীতির স্বার্থের কাছে নিরীহ প্রাণের কোনো মূল্য নেই। মহাভারতের কাল থেকে সেই ধারা আজও প্রবহমান। আমাদের চেনা পরিসরেও এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে অহরহ। এ নাটক তাই কালিক সীমা অতিক্রম করে সমকালের অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

সূচক শব্দ : জতুগৃহ, চক্রান্ত, শূদ্র, গণহত্যা

মূল আলোচনা:

অমল রায় (জন্ম ১৯৫০) বাংলা নাট্যজগতে একটি চর্চিত নাম। দীর্ঘদিন গণ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নাটকের সংখ্যা প্রায় দুইশত। প্রতিটি নাটক নাট্যকারের মৌলিক চিন্তা চেতনায় ঋদ্ধ। তিনি বেশ কয়েকটি মহাভারত নির্ভর নাটক রচনা করেছেন। তাঁর কলমে উঠে এসেছে 'ঘটোৎকচ',

'দ্রোণাচার্য', 'জতুগৃহ'। নাট্যকার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরর সম্মান অর্জন করেছেন ১৯৯০ সালে। আমাদের বর্তমান আলোচ্য ‘জতুগৃহ’ নাটকটি অভিনয় পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় (পঞ্চম বর্ষ, সংখ্যা ৩ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৫)। প্রসঙ্গত স্মরণীয় তিনি দীর্ঘদিন 'অভিনয়' পত্রিকা ও 'শ্রুতিনাট্যপত্র' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১]

মহাভারতের আদি পর্ব থেকে জানা যায় পঞ্চপান্ডবের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে পুত্র দুর্যোধনের প্ররোচনায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপান্ডবকে বারণাবতে প্রেরণ করেছিলেন। বারণাবত প্রদেশে 'শিবভবন' নামে গৃহকে জতুগৃহ হিসেবে নির্মাণ করে পুরোচনের সহায়তায় দুর্যোধন পান্ডবদের সপরিবারে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করেছিলেন। পরিকল্পনা ছিল জতু বা লাক্ষা নির্মিত গৃহে (জতুগৃহ) অবস্থানকালে কোন একদিন সুযোগ মতো অগ্নিসংযোগ করে মাতা কুন্তী সহ পঞ্চপান্ডবকে পুড়িয়ে হত্যা করা। চক্রান্ত হয়েছিল সুচারুভাবে। কিন্তু মন্ত্রী বিদুর, যিনি সম্পর্কে কুরু-পাণ্ডবের পিতৃব্য, সমস্ত পরিকল্পনার আঁচ করতে পেরে সেইমতো জ্যেষ্ঠ পান্ডব যুধিষ্ঠিরকে উপযুক্ত পরামর্শসহ সাবধানী হতে বলেছিলেন। পরবর্তী সময় দেখা যায় 'জতুগৃহ' অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল এবং সেখানে মাতা কুন্তী সহ পঞ্চপান্ডবের পরিবর্তে মাতা সহ পাঁচ নিষাদ পুড়ে মারা গিয়েছিল। জতুগৃহ দগ্ধ হবার পর সকল নগরবাসী ছয়টি দগ্ধ মৃতদেহ দেখে পান্ডবদের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তারা ধৃতরাষ্ট্র সহ দুর্যোধনের শাপ-শাপান্ত করতে থাকে। অন্যদিকে পান্ডবদের মৃত্যু হয়েছে নিশ্চিত জেনে, দুর্যোধন আনন্দিত হয় এবং ধৃতরাষ্ট্র শোকবিহ্বল চিত্তে যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সেদিন পাণ্ডবরা জতুগৃহে দগ্ধ হন নি। মাতা সহ পঞ্চ নিষাদকে খাদ্য-পানীয় দ্বারা বশীভূত করে পান্ডবরা নিজেরাই গৃহে অগ্নিসংযোগ করে গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে নিরাপদে পালিয়ে গিয়েছিল গভীর অরণ্যে।

সাধারণভাবে মহাভারতে পাণ্ডবগণ সত্যধর্মের রক্ষক হিসেবে চিহ্নিত। অথচ নাট্যকার অমল রায় 'জতুগৃহ' নাটকে পান্ডবদের ন্যায়-নীতি তথা ধর্মপরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন! নাট্যকার দরিদ্রের ওপর অভিজাত ও রাজপরিবারের অমানবিকতার ছবি তুলে ধরেছেন। নাটকের শুরুতেই দেখা যায় একদল ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্যান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত। অন্যদিকে বারণাবত নগর যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলেছে বৈতালিকগণ। কিন্তু তাদের মঙ্গলিকগানে যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের মনের অস্থিরতা লাঘব হয় না। যুবরাজ অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত। আশীর্বাদক পিতৃব্য বিদুরের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন পুরোচনের সহায়তায় দুর্যোধন তাদের এই গৃহে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করেছে। এমতাবস্থায় যুধিষ্ঠির মাতা সহ অন্য চার ভ্রাতার সুরক্ষা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। ভীম ও অর্জুন তাকে আশ্বস্ত করলেও তার অন্তরের ভীতি দূরীভূত হয় না। ভাইদের সঙ্গে কথোপকথনে যুধিষ্ঠিরের আশঙ্কা ও অস্থিরতা প্রকাশ পায় —

"মনটা আমার কিছুতেই সুস্থির হচ্ছে না। একটা ভয় সারাক্ষণ বুকের ভেতর সাপের মত জড়িয়ে রয়েছে। উঃ, কি চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র, কি কুৎসিত এই পারিবারিক কলহ, মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় —এই ঘৃণ্য রাজমর্যাদায় আগুন লাগিয়ে চলে যাই অরণ্যে, বনবাসী সন্ন্যাসীর মত সুখে জীবন কাটাই।" [২]

এমতাবস্থায় গৃহে প্রবেশ করেন পিতৃব্য বিদুর। প্রসঙ্গত স্মরণীয় মহাভারতের আধারে রচিত এই কাহিনিতে 'মহাকাব্যিক তথ্যগুলিকে যথাযথ ও অবিকৃত' রাখতে সচেষ্ট হলেও নাট্যকার নাটকের বক্তব্য বিষয়কে যথাযথ পরিস্ফুটন করতে বিদুর চরিত্রটির কিছু পরিবর্তন করেছেন। এই পরিবর্তনে মহাকাব্যীয় চলনে কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। বিদুর মহাকাব্যে স্বয়ং ধর্ম হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এখানে বিদুরকে ধর্মের পরিবর্তে অধর্ম আচরণ করতে দেখা যায়। নাট্য কাহিনির অগ্রগতির সাথে সাথে জানা যায় বিদুর পাণ্ডব পক্ষের শুভাকাঙ্ক্ষী। কৌরব রাজবংশের অন্নদাস হয়েও তিনি দুর্যোধনের অভিসন্ধি জানার পর পান্ডবদের সুরক্ষিত করতে তৎপর। তারই নির্দেশে ও সুচারু পরিকল্পনায় খনকের দ্বারা গৃহের মধ্যে গোপন সুরঙ্গ খনন করা হয়েছে। পরিকল্পনা হয়েছে, চতুর্দশীর দিন ঘন কালো অমাবস্যার রাত্রে পুরোচনের পূর্বেই ভীম গৃহে অগ্নি সংযোগ করে নিরাপদে সুরঙ্গ পথে বেরিয়ে আসবে এবং মাতা ও পঞ্চম ভ্রাতা মিলিয়ে যাবে গভীর অরণ্যে। কিন্তু এই পরিকল্পনায় প্রয়োজন ছিল ছয়টি অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহের, যার মধ্যে পাচঁ জন পুরুষ ও একজন নারী। কারণ জনসমক্ষে এতে প্রমাণ করা সহজ ছিলো যে পঞ্চপুত্রসহ মাতা কুন্তীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। নাটকে দেখা যায় মাতা কুন্তীর ব্রাহ্মন ভোজনের দিন একদল বুভুক্ষ হতদরিদ্র মানুষ খাদ্যের আশায় রাজপ্রাসাদের সামনে জড়ো হয়েছে। তাদের কোলাহলে রাজপুত্ররা অত্যন্ত বিরক্ত। প্রহরী এসে জানিয়েছে —

"ব্রাহ্মণ ভোজনের সংবাদ শুনে ছুটে এসেছে। ব্রাহ্মণদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য পথের ওপর ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কুকুরের মতো তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে ক্ষুধাতুর ভিক্ষুকেরা!" [৩]

এমন দৃশ্য ছিয়াত্তর বা ছেচল্লিশের মন্বন্তরের ক্ষুধিত মানুষের আচরণের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানেও ক্ষুধার্ত মানুষেরা উচ্চবিত্তের কাছে কুকুর বা পশুর সমতুল্য। রাজপুত্র অর্জুন তাই তাদের মেরে তাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব দিলে রাজনীতি সচেতন বিদুর তৃতীয় পাণ্ডবকে সতর্ক করে দেন —

"তৃতীয় পাণ্ডব, মেরে তাড়াবে তাড়াও, তবে দেখো বেশি অত্যাচার করোনা যেন, হিতে বিপরীত হবে। শুধু তোমাদের এই গৃহটি নয়, যুধিষ্ঠির, পুরো দেশটাই এখন জতুগৃহ, শুধু আগুন লাগার অপেক্ষায়। অর্জুন প্রয়োজনের বেশি অত্যাচার কোরোনা, বিদ্রোহের সম্ভাবনায় ঘৃতাহুত দিয়ো না।" [৪]

বিদুরের এই সংলাপে বোঝা যায় এ নাটক কোন সুদূর অতীতের গল্প নয়, এ যেন সমকালের রাজনৈতিক অস্থিরতার আভাস। মহাভারতের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করে নাট্যকার ভীষণভাবে সমকালকে ছুঁয়ে গেছেন। খেয়াল করলে স্পষ্ট হবে যে, নাটকের সমগ্র শরীরে জুড়ে সমকাল মিলে মিশে রয়েছে। নাট্যকার সমাজের অসাম্য ও অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন রাজনীতি অভিজ্ঞ বিদুরের সংলাপে। ক্ষুধার্ত মানুষ যে কতখানি হিংস্র হতে পারে, বিদুর তা জানেন —

> *"ক্ষুধা কি ভয়াবহ আগুন জ্বালাতে পারে, ক্ষুধার্ত মানুষ যে কি ভয়ংকর তা কল্পনারও অতীত...."* [৫]

নাটকে দেখা যায় একদল ক্ষুধার্ত মানুষ খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সরাসরি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছে। খাদ্যের অন্বেষণে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তারা উন্মাদের মত খাদ্য অন্বেষণ করতে থাকে। কিন্তু কিছুই পায় না। নাট্যকার দীর্ঘ অংশজুড়ে এদের সংলাপে ক্ষুধার জ্বালার তীব্রতা প্রকাশ করেছেন। দেখিয়েছেন ক্ষুধার জ্বালায় উন্মাদ হয়েছে পাঁচ পুত্রের মাতা। এমনকি একজন আপন সন্তানকে নিজের হাতে গলা টিপে হত্যা করেছে। এদের আচরণ ও সংলাপে সমাজের দরিদ্র মানুষের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। মূল মহাভারতে বিভিন্ন অংশে দুর্ভিক্ষ তথা খাদ্য সংকটের প্রসঙ্গ রয়েছে। দেখা গেছে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করত এবং তারাই মূলত দুর্ভিক্ষের শিকার। অধ্যাপক দেবীদাস আচার্য যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন —

> *"....তাই ইতিহাসের ক্যানভাস জুড়ে বুভুক্ষুর মিছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের সরাসরি সম্পর্ক। মহাভারত সংকলনের সময়ে কৃষিব্যবস্থা আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে, ফলে খাদ্যও উৎপাদিত হয়েছে বেশি। কিন্তু সেই খাদ্যের ষোলো আনা খিদে মেটানোর কাজে লাগেনি। এখন যেমন হয়, তেমনই প্রাচীন কালেও গরিব-দুঃখীর পাতে পৌছে, খাদ্যের একটা বড় অংশ ধনীর ভাঁড়ারে সঞ্চিত হয়েছে, দূর বিদেশে চলে গিয়েছে ধনার্জনের পণ্য হয়ে। বর্ণশাসনের মেরুদণ্ড ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের রাজনৈতিক সখ্য। দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজ থেকে তারা যে কেবল নিজেদের মুক্ত করল-ই নয়, গায়ে-গতরে খাটুনির যে কাজ, তাকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল। সেই ঘৃণায় বিদ্ধ হল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনাতিপাত করা মানুষ। রাজতান্ত্রিক পরিকাঠামো, আর বণিক-মহাজন উদরসাৎ করার পরে অল্পই থেকেছে ঘাম-ঝরানো মানুষের জন্য।"* [৬]

শাস্ত্রে অন্নদানকে স্বর্গবাসের চাবিকাঠি হিসেবে বর্ণনা করলেও কৃপণ ধানীর জন্য কোনরূপ নরকবাসের নির্দেশনামা দেয়নি। তাই সমাজে দাতার তুলনায় কৃপণ ধনীর সংখ্যা বেশি। আজও সেই ধারা অব্যাহত। সমাজে নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা চিরকালই পশুর সঙ্গে তুলনীয়। এক অনুচরের সংলাপে বোঝা যায় সমাজে অনার্য ও শূদ্র শ্রেণীর অবস্থান ঠিক কোনখানে —

> *“সত্যি, অনার্য শূদ্রদের হত্যা করাটা মৃগয়া করার মতোই একটা রোমাঞ্চকর খেলা, অবসর বিনোদনের প্রকৃষ্ট উপায় –”* [৭]

এমন বক্তব্যে পাঠক চমকে উঠলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, চতুর্বর্গীয় আর্য সমাজে শূদ্র বা অনার্য শ্রেণী ছিল অবহেলিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত। একবিংশ শতকে বিশ্বায়নের যুগে এসেও এই ছবিটা সমাজ থেকে এখনো নির্মূল হয়নি, সভ্য জাতির পক্ষে যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও লজ্জাজনক।

নাটকে সমান্তরালভাবে দুটি ঘটনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে —

- আসন্ন সংকট থেকে সপরিবারে সুরক্ষিতভাবে যুধিষ্ঠিরের পরিত্রাণের পরিকল্পনা এবং
- সমাজের নিরন্ন হতভাগ্য নিম্নবর্গীয় মানুষের খাদ্য অন্বেষণের মরিয়া প্রচেষ্টা।

নাট্যকার সুকৌশলে দুটি ঘটনাকে শেষ পর্যন্ত মহাভারতীয় আখ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। পৌরাণিক ঘটনাটি অবিকৃত রেখে নাট্যকার দেখিয়েছেন যুধিষ্ঠির সুরক্ষিতভাবে জতুগৃহ থেকে সপরিবারে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে পান্ডবদের পরিবর্তে অনাহারী পাঁচ নিষাদ ও তাদের মাতার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। নাট্যকার দেখিয়েছেন সমস্ত পরিকল্পনাটি বিদুরের। নাটকীয় কৌশলে বিদুরের সুচতুর পরামর্শে নাট্যকার দেখিয়েছেন দুর্যোধনের কাছে পঞ্চপান্ডবের মৃত্যুসংবাদকে বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য ওই অনাহারী মানুষগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছিল। একবেলা ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্তির বিনিময়ে তাদের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। মহাভারতে এমন সুনিপুণ গণহত্যার নিদর্শন হয়তো আর একটিও নেই। শূদ্রা দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম। তবু রাজপরিবারের স্বার্থে তিনি স্বজাতি ভাইদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। মহাভারতে এই পাঁচ নিষাদ ও তাদের মায়ের প্রতি কোন শোক বাক্য বা অনুতাপ বাণী রচিত হয়নি। কিন্তু একালের নাট্যকার বিদুরের সংলাপে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করে বিদুরকে কিছুটা মানবিক করে তুলেছেন। বিদুরের বিলাপোক্তিতে পাঠকের হৃদয়ে আদ্র হয়ে ওঠে।

> *“ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ বলবে ধর্মরাজ — বিদুর শূদ্র প্রেমিক ছিল না, বরং সে দাসীপুত্র হয়েও চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে নির্ঘাতিত শূদ্রদলের সঙ্গে, প্রতারিত করেছে নিরপরাধ শূদ্রদের — আজ — আজকের রাতই বিদুরের জীবনের সব চেয়ে কলঙ্কিত রাত —সব চেয়ে ঘৃণ্য রাত —”* [৮]

বিদুর চেয়েছিলেন দুর্যোধনের রোষানল থেকে পান্ডবদের রক্ষা করতে। কিন্তু যে মূল্যে তিনি দুর্যোধনের জিঘাংসা থেকে পান্ডবদের রক্ষা করলেন, তা ঘোরতর অন্যায় — এক কথায় নৃশংস অপরাধ।

পৃথিবীতে ধনী আর নির্ধনের অবস্থান চিরকাল পাশাপাশি। একদল বিলাস-ব্যসনে আনন্দে মত্ত থাকে, অন্য দল চীরবসনে অনাহারে কাল যাপন করে। পৃথিবী এমন কঙ্কালসার ক্ষুধার্তের মিছিল বহু দেখেছে। এই ক্ষুধার্তের সংখ্যাই সমাজে বেশি। বিদুর যথার্থ বিশ্লেষণে বলেছেন —

> *"জীবনে তো ওরা খেতেই পায় না। হস্তিনানগর আর এই বারণাবতের আকাশচুম্বী প্রাসাদে প্রাসাদে চন্দ্রালোকিত রজনীতে যখন চলে বিলসিত উৎসবের প্রমোদ রঙ্গ, তখনই তো এই সুবিশাল আর্যাবর্তের বিস্তর্ণ গ্রামাঞ্চলে অরণ্যে পর্বতে জমা হয় আসন্ন দুর্ভিক্ষের কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা।"*[৯]

বিদুরের কণ্ঠে যে বক্তব্য, তাতে কেবল হস্তিনাপুরের চিত্র নয়, বাঙালি পাঠকের চোখে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের মন্বন্তরের জীবন্ত বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে।

নিরন্ন, নিম্নশ্রেণীর জনতা উচ্চশ্রেণীর ধনবিলাসের সোপান। এদের শোষণ করেই ধনাঢ্য ব্যক্তির অহংকারের সুরম্য সাম্রাজ্য নির্মিত হয়। মহাভারতে পঞ্চপান্ডবকে সুরক্ষিত করতে পাঁচ নিষাদকে তাদের মাতা সহ মরতে হয়েছিল। রাজপুত্ররা ঠান্ডা মাথায়, পরিকল্পনা করে তাদের হত্যা করেছিল। এই গণহত্যার কোন বিচার হয়নি। হত্যাকারীদের শাস্তিও হয়নি বরং ভারতীয় সমাজে এরাই যুগ যুগ ধরে আদৃত ও বরনীয় হয়ে আছেন। বিদুরের সংলাপে নাট্যকার অসাধারণ দক্ষতায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন —

> *"নিশ্চিন্ত থাকো ধর্মরাজ-এদেশ অধ্যাত্মমহিমার দেশ, আগামী দিনে তোমাদের ধর্মপরায়ণতার কাহিনী দিক দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হবে, প্রতিদিন তোমাদের দেবতা বানিয়ে পূজো করবে মানুষ, সেদিন কেউ জানতেও চাইবে না যে সত্যবাদী ধর্মভীরু যুধিষ্ঠির আর তার ন্যায় পরায়ণ ভাইয়েরা তাদের নিজেদের স্বার্থে আত্মরক্ষার তাগিদে সব জেনে শুনেও একদল নিরপরাধ নিরীহ ভিক্ষুককে কেন পুড়িয়ে মেরেছিল কোন ন্যায় বোধের প্রেরণায় —কেউ জানতে চাইবে না, কেউ না —"*[১০]

সামগ্রিকভাবে স্পষ্ট কোনো অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন নেই নাটকে। তবে নাট্যকারের রচনা কৌশলে দৃশ্যান্তর বুঝে নিতে দর্শক বা পাঠকদের অসুবিধা হয়না। মহাভারতীয় চরিত্রের পাশাপাশি বেঙা, ঘটু, রুক্ষ, ছিবড়ে, ভিখু নাম দিয়ে নাট্যকার নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির পরিচয়কে সুনির্দিষ্ট করেছেন। মহাভারতে এই পাঁচ নিষাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু নাটকে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বুভুক্ষু

জনতার প্রতিভূ হয়েও প্রত্যেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা লক্ষণীয়। এই অসহায় মানুষগুলোকে যথাযথ মানুষের মর্যাদা দান করতে নাট্যকার বিশেষ যত্নবান হয়েছেন। নাটকের শেষে দেখা যায় অনাহারী মানুষগুলো বুঝতে পেরেছে তারা রাজপুরুষদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। বুঝেছে গভীর চক্রান্তের শিকার হয়েছে তারা। তখন পালানোর পথ বন্ধ। মৃত্যুর লেলিহান শিখা তাদের গ্রাস করতে উদ্যত। মাতা সহ পঞ্চ নিষাদ একসাথে মৃত্যু বরণ করেছে। এখানে তাদের গভীর উপলব্ধিতে কাহিনি কেবল মহাভারতীয় প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা হয়ে যায় যুগ-যুগান্তরের নিপীড়িত মানুষের অনুভবের প্রকাশ —

> *"এমনি ভাবে, এমনি ভাবেই চিরটাকাল ওদের তৈরী জতুগৃহে অসহায় নিরুপায়ের মত আমরা পুড়ে মরছি, ওদেরই ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের মরণকে ডেকে এনেছি, কিন্তু কত কাল আর কতকাল?"* [১১]

এই প্রশ্ন পৌঁছে যায় সচেতন নাগরিকদের বোধ আর বিবেকের কাছে। সত্যিই তো এই অসাম্য, এই অন্যায় আর কতকাল সহ্য করবে হতভাগ্য দরিদ্র অনাহারী মানুষের দল! তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে নাটক সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ একটি সুপরিকল্পিত গণহত্যার বর্ণনায় নাটকটি পান্ডবদের কুশল কামনায় নয় বরং এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন ও সতর্ক করে গর্জে ওঠার আহ্বান জানিয়ে কাহিনি সমাপ্ত হয় — যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত থাকে গণ-আন্দোলনের উচ্চকিত সুর।

মহাভারতে পান্ডবদের বারংবার ধর্মচারী ও সদাচারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র ও সত্যবাদী হিসেবে সর্বকালে সর্বযুগে শ্রদ্ধেয়। কিন্তু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরপরাধ ছয়টি প্রাণ কেড়ে নিতে তাকে কোথাও বাধা দিতে দেখা যায়নি। অনুমান করা যায় কুন্তীর ব্রাহ্মন ভোজনের দিন ওই নিষাদী পাঁচ পুত্রসহ বরাহুতের ন্যায় গৃহে আগমন করে নি। রাজপুত্ররা পরিকল্পনা করেই তাদের রাজপ্রাসাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এতে বোঝা যায় এই গভীর ষড়যন্ত্রে শামিল ছিলেন মাতা কুন্তীও। আপন সন্তানদের বাঁচাতে অন্য পাঁচ সন্তানের প্রাণ কেড়ে নিতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। এমনকি সমগ্র মহাভারতে ওই নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রের জন্য কোথাও এতটুকু সহানুভূতি ব্যক্ত হয়নি। মহাভারতের কবি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে ধর্মের ধ্বজাধারী যুধিষ্ঠির তথা পান্ডবদের কেবলই অধর্মমূলক আচরণ করিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে মহাভারতের কবি একলব্যের মতো প্রতিভাধর নিষাদকে যেমন ভবিষ্যতের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছিলেন, তেমনি ক্ষত্রিয়ের প্রাণ রক্ষার্থে মাতা সহ পাঁচ নিষাদকে মৃত্যুর সীমানায় পৌঁছে দিতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু এ কালের নাট্যকার ব্রাত্য বসুর 'জতুগৃহ' বা অমল রায়ের 'জতুগৃহ' নাটকে ফুটে উঠেছে সেই নিরাপরাধ মানুষগুলির প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ। নাট্যকার অমল রায় নাটকের শেষে জানিয়েছেন এই নাটক মহাভারতের এক উপেক্ষিত অধ্যায়ের কাল্পনিক বিস্তার। এই কাহিনিতে গুরুত্ব পেয়েছে সেই উপেক্ষিত মানুষগুলো, যাদের জন্য কোন

কালে কোন সহৃদয় ব্যক্তির অন্তরে প্রজ্বলিত হয়নি করুণা কিরণ। আজকের সমস্ত বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নাটকটি একেবারেই এই যুগের সমকালীন। নাট্যকার সেই অনালোকিত মানুষগুলিকে পাদপ্রদীপের সামনে এনে মনুষ্য জাতির পাপস্খলনে ব্রতী হয়েছেন।

আকর গ্রন্থ:

অমল রায়, জতুগৃহ, ‘অভিনয়’ পত্রিকা, সম্পাদক: দিলীপ বন্দোপাধ্যায়, পঞ্চম বর্ষ, সংখ্যা - ৩, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ৭৫

তথ্যসূত্র:

১. সম্পাদক: বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০০০, কলকাতা ৭০০০০৯
২. অমল রায়, জতুগৃহ, ‘অভিনয়’ পত্রিকা, সম্পাদক: দিলীপ বন্দোপাধ্যায়, পঞ্চম বর্ষ, সংখ্যা - ৩, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ৭৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯৪০
৩. ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯৪৬
৪. ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯৪৬
৫. ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯৪৭
৬. দেবীদাস আচার্য, মহাভারতের জন বিদ্রোহের উপাদান, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ: নভেম্বর ২০১৯, কলকাতা ৭০০০৯১ পৃষ্ঠাসংখ্যা - ১৫১
৭. অমল রায়, জতুগৃহ, ‘অভিনয়’ পত্রিকা, সম্পাদক: দিলীপ বন্দোপাধ্যায়, পঞ্চম বর্ষ, সংখ্যা - ৩, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ৭৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯৫৪
৮. ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯৫৯
৯. ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯৬৬
১০. ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯৭০
১১. ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৯৭৩

চলমান সময়ের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিশু-কিশোর চরিত্র ও শিক্ষাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা

আব্দুল্লা মোল্লা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথ শব্দটির সঙ্গে তাঁর গান, কবিতা, উপন্যাস বা নাটক যেমন অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে প্রথমেই মনে পড়ে, একই সঙ্গে মনে পড়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম, শিক্ষাসত্র বা বিশ্বভারতীর কথা। এই তিনটিই মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 'নৈবেদ্য' (১৯০১) এর সময়ে লিখছেন- 'রে মৃত ভারত/শুধু সেই এক আছে নাহি অন্য পথ'। তপোবনের আদর্শ ছিল মনে। তপোবনশিক্ষার আধুনিকীকরণ প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য ভাইদের বিদ্যালয় বা কলেজশিক্ষা খুব একটা ডিগ্রি লাভে সম্পন্ন নয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতা একাধিক কারণে ইতিবাচক ছিল না একথা সকলেই জানে। রথীন্দ্রনাথ বা মেয়েরা যখন বড় হয়ে উঠছেন তখন একান্ত বাস্তব কারণেই ছেলে মেয়েদের জন্য নতুন রকমের স্কুল স্থাপন করার কথা ভাবছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সেই সময় একটি আশ্রমিক বিদ্যালয় তৈরি করেন। ১৯০১, ২২ ডিসেম্বর তা প্রতিষ্ঠিত হল শান্তিনিকেতনে। শুরুর দিকে ভাবনা সম্পূর্ণ আশ্রমিক, অবৈতনিক। অজিত কুমার চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, সতীশচন্দ্র রায় এর মত নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক আশ্রমের আদিপর্বে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা এবং তার প্রয়োগ নিজের জীবনে পাশাপাশি লক্ষ্য করি। ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশনের পরিদর্শনের সময় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে বোলপুর স্কুল বলে চিহ্নিত করা হয়। এই সময় থেকেই পরীক্ষা ও প্রমোশন ভিত্তিক হয়ে উঠেছে বিদ্যালয়। স্যাডলার কমিশনের মূল্যায়নের সময় 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশ হচ্ছে 'তোতাকাহিনী'। একাধিক প্রবন্ধে বার বার বলছেন মাতৃশিক্ষার কথা। যদিও বিদ্যালয়ের রুটিনে দেখি সপ্তাহে বাংলা ক্লাস ছ'টি, ইংরেজি ক্লাস বারোটি।

রবীন্দ্রনাথের নিজের চাওয়া ও অন্যান্য অভিভাবকদের দাবি এর মধ্যে তীব্র বিরোধ তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতেই শিক্ষাসত্র স্থাপিত হচ্ছে ২২ বছর পর। তার আগে প্রথম বিদ্যালয়ের পরিবর্ধিত ও ব্যাপকতর রূপ নিয়ে তৈরি হয়েছে বিশ্বভারতী। শিক্ষাসত্র একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান। সন্তোষচন্দ্র ও রথীন্দ্রনাথ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যা পড়ে এসে আশ্রমে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সক্রিয় আত্মনিয়োগের কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠবে শিক্ষাসত্র। এখানেও লক্ষ্য করি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন আলাদা হয়েই থেকেছে। আচার্য যদুনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথের উচ্চ শিক্ষা ভাবনার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বিশ্বভারতী স্থাপনের সময়। তাঁর ভাবনায়—

“বোলপুরের ছাত্রগণ Exact Knowledge কে Intellectual Discipline কে ঘৃণা করিতে এবং উহার শিক্ষক সেবকগণকে হৃদয়হীন, শুস্ক মস্তিস্ক, বিশ্বমানবের শত্রু মেকি পণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে শেখে” (চিঠিপত্র ১৫, ৮৭ থেকে ৮৮ পাতা)। এই সমালোচনা যদুনাথের একার তা নয়। তাত্ত্বিক শিক্ষাভাবনা এবং তার প্রয়োগ দুটি ক্ষেত্রেই বিরোধ সমন্বয়, চেষ্টা ও ব্যর্থতা সবই লক্ষ্য করি। আর তখনই কৌতুহল তৈরি হয় এই শিক্ষাভাবনা যাদের নিয়ে তারা শিশু বা কিশোর বা তরুণ। তাত্ত্বিকভাবে যে কথা লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, আশ্রমে যা ঘটছে তার সঙ্গে সাহিত্যের চরিত্রগুলো খাপ খাচ্ছে বা খাচ্ছে না কী? বনফুল থেকে শেষলেখা প্রায় ৬০ বছর এর সময়ে কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস এমনকি গানেও শিশু কিশোর চরিত্ররা অনেক ভাবে এসেছে। কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছে সেই ভাবনা, শিক্ষা ভাবনার সঙ্গে সাহিত্যিক চরিত্রের আচরণ কখনো মিলে যাচ্ছে কী? এই অনুসন্ধান এবং মিলিয়ে পড়ার মাধ্যমে তত্ত্ব প্রয়োগের সেতুটিকে দেখা প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

নানা কারণে ছোট থেকেই তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছেন। এমনকি বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। এই ব্যর্থতাই শাপে বরের কাজ করেছে। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেক যত সরে দাঁড়িয়েছেন, তত অপ্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়, প্রকৃতি থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। পাঠ্য বিষয়ের বাইরে দেশি-বিদেশি গ্রন্থ পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। প্রাকৃতিক পাঠশালা থেকে জ্ঞান আহরণ করে দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে বিরাটাকার বট গাছের ন্যায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিরাজিত হয়েছেন। যে বটগাছ পরবর্তীকালে বহু পথিক ও প্রাণীকে আশ্রয় দিয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা জানার জন্য অবশ্য করেই প্রকৃতিকে সঙ্গে নিতে হবে। কেননা তিনি ‘শিক্ষাসমস্যা’ প্রবন্ধে বলেছেন—“ শিক্ষার জন্য এখনো আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক”। প্রাচীন তপোবনের আদর্শ ছিল মনে। সেই অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাও পরিচালিত করার ইচ্ছা ছিল। তাই তিনি যখন বাবার ভূমিকায় উপস্থিত হন, বাড়ির অন্য সকলে তখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সঙ্গে জড়িত। তিনি যেহেতু প্রতিষ্ঠান বিরোধী, সেহেতু রথীন্দ্রনাথকে কলকাতা থেকে নিয়ে চলে এলেন শিলাইদহে পদ্মানদীর বক্ষে, যা নিয়ম শৃঙ্খলার অতীত প্রকৃতির সান্নিধ্যে একপ্রকার আনন্দ পাঠ। ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’ প্রবন্ধ থেকে জানা যায়— অল্প বয়সেই রথীন্দ্রনাথ ডিঙি বয়েছে, সেই ডিঙি করে স্টীমার থেকে সে প্রতিদিন রুটি নামিয়ে এনেছে এবং বন-ঝাউয়ের জঙ্গলে শিকার করে বেড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, রথীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র ষোলো, তখন তাঁকে পদব্রজে কয়েকজন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে কেদারনাথ ভ্রমণে পাঠিয়েছিলেন। কবির মনে শিক্ষা বিষয়ক যে মনোভাব ছিল, সেই ভাবনা নিজের সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে শিষ্যদের জীবনেও কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন। প্রভাত কুমার

মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—“শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে ছেলে মেয়েদের জন্য ছোট একটি স্কুল খোলা হয়েছে। ইংরেজি পড়াবার জন্য এলেন লরেন্স নামে এক ইংরেজ, চালচুলোহীন পাগলা মেজাজের লোক। গণিত শেখাতে এলেন জগদানন্দ রায়, তালুকের এক কর্মচারী। সংস্কৃত শেখাবার জন্য নিযুক্ত হলেন শিবধন বিদ্যার্ণব, রবীন্দ্রনাথ নিজেও সন্তানদের শিক্ষার জন্য যথেস্ট সময় দেন”। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের কাজের সূচনা এইখানে। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’(১৯০১) প্রতিষ্ঠা করলেন। নিজের মনোভাবকে ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। তপোবন আশ্রয়ী প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে মুক্ত, আনন্দময় শিক্ষালাভ। এই আশ্রমের কাজে তিনি এতটাই নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে সমস্ত ত্যাগই হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—“সমুদ্রতীরে বাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল”। রবীন্দ্রনাথের এই ত্যাগই একটি ছোট আশ্রমকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রূপদান করে জগতের সামনে এনে হাজির করেছিল। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শিক্ষাচিন্তা।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শিক্ষাচিন্তা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য জগতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রায় গোড়ার দিক থেকেই শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। মাত্র ষোল বছর বয়সে লেখা ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ প্রবন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান উক্তি করেছিলেন—“...বঙ্গদেশে এখন এমনই সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছ যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল ঘটনা ও রাজাদের নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখেন নাই”। এই উক্তি আসলে উনিশ শতকের উপযোগবাদ আশ্রিত শিক্ষাব্যবস্থার মুখে চপেটাঘাত। তিনি এবং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য চরিত্র প্রথম উনিশ শতকের উপযোগবাদের বিরোধীতা করে এবং সেই গণ্ডি উত্তরণ করতে চেষ্টা চালায় ও সফল হয়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা যেহেতু প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন নয়, সেহেতু তাঁর সাহিত্যে শিক্ষাভাবনা দুই দিক থেকে এসেছে। প্রথমদিকে প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি শিক্ষাভাবনার প্রয়োগ, দ্বিতীয় দিকে প্রকৃতি আশ্রয়ী পরোক্ষভাবে শিক্ষালাভ— যা শিশু মনের উপযোগী, কল্পনাপ্রবণ, মানসিক ও দৈহিক সার্বিক শিক্ষালাভ। শিক্ষাচিন্তাবিষয়ক বিভিন্ন বই, যেমন- ‘সংস্কৃত শিক্ষা’(১৮৯৬), ‘ইংরেজি সোপান’(১৯০৬), ‘ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা’(১৯০৯), ‘ইংরেজি সহজশিক্ষা’(১৯২৯), ‘সহজপাঠ’(১৯৩০) এবং শিক্ষাসংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী ‘শিক্ষা’ প্রবন্ধ সংকলন, ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’, ‘শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী’ ইত্যাদি প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা যে সমস্ত বই এ সরাসরি প্রভাব বিস্তার করেছিল সেগুলি হল—‘গিন্নি’, ‘ছুটি’, ‘অতিথি’, ‘ইচ্ছাপূরণ’, ‘লিপিকা’ সংকলনের (গল্প, তোতাকাহিনী, পুনরাবৃত্তি) গল্পে। এছাড়া ‘শিশু’ ও ‘শিশু

ভোলানাথ' কবিতা সংকলনের কবিতায়, 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন' নাটকে। পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা যে সমস্ত রচনার মধ্যে পড়েছে সেগুলি হল- 'সুভা', 'অতিথি', 'আপদ', 'বলাই', 'লিপিকা, 'সে', 'গল্পস্বল্প । এছাড়া 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর', 'ঋণশোধ' ইত্যাদি নাটকে। 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি' সংকলনের কবিতায়। যে সমস্ত গানে শিশু কিশোর মনের উপযোগী শিক্ষাচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি হল—"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে", "ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু", "আমারে যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি", "আপন হতে বাইরে দাঁড়া", "আলো আমার আলো, ওগো", " আমাদের শান্তিনিকেতন" ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা তাঁর সৃষ্ট শিশু-কিশোর চরিত্রগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি যেমন শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করেছেন, ঠিক একই ভাবে শিক্ষক চরিত্রকেও ব্যঙ্গ করেছেন। অপরদিকে প্রকৃতি থেকে মুক্ত শিক্ষালাভকে যেমন প্রাধান্য দিয়েছেন। ঠিক একইভাবে শিশুমনের কল্পনা, কৌতূহল ও রূপকথার জগতকে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। 'গিন্নি' গল্পে পণ্ডিত শিবনাথ বাবু হলেন ছাত্রদের বেড়ে ওঠার প্রধান প্রতিবন্ধকতা। তিনি শশিশেখরকে ডাকেন 'ভেটকি' নামে এবং আশুর নামকরণ করেন 'গিন্নি'। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থার অন্যতম উপাদান শিক্ষক/পণ্ডিত মশাইকে ব্যঙ্গ করেছেন। 'ছুটি' গল্পের ফটিক গ্রাম ছেড়ে শহরের শিক্ষায়তনে হাঁপিয়ে ওঠে। এই শিক্ষাব্যবস্থা ফটিকের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। 'সুভা' গল্পের কিশোরী সুভার প্রকৃতির কোলবিচ্ছিন্ন হওয়ায় মানসিক মৃত্যু ঘটে। 'অতিথি'র তারাপদ প্রকৃতির সন্তান। তাই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পর্কের কোন বাঁধনই মেনে নিতে পারেনি। 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পে বালক সুশীলচন্দ্র ও তার পিতা উভয়ের বিপরীতভাবনা। ইচ্ছাঠাকরুণ এর কৃপায় তাদের ইচ্ছাপূর্ণ হলে বিপরীত ফল ফলে। এর থেকে বোঝা যায় শিশুমনকে বৃদ্ধের মন দিয়ে বিচার করা যায় না। 'তোতাকাহিনী' গল্পে তোতাপাখির পেটে নীরস পুঁথি পুরে দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, যার ফলে পাখির মৃত্যু হয়। গল্পকার বলেছেন—"কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খসখস, গজগজ করিতে লাগিল"। এই উক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। আসলে কবি উনিশ শতকের শিক্ষাব্যবস্থা মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই 'শিশুভোলানাথ' সংকলনের কবিতায় বলেছেন—"সাত আটটে সাতাশ, আমি বলেছিলেম বলে/ গুরুমশায় আমার 'পরে/ উঠল রাগে জ্বলে" (পুতুলভাঙা), "আমি তো, মা, চাইনে হতে/ পণ্ডিতমশাই"(মুর্খু)। 'বলাই' গল্পের বলাই প্রকৃতির সন্তান, সে প্রকৃতির কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করে। যার ফলে প্রকৃতি তার অংশ হয়ে গিয়েছে। এককথায় রবীন্দ্রনাথ 'শিশু' সংকলনের কবিতায় বলেছেন—"খোকা থাকে জগৎ মায়ের অন্তপুরে/...বিশ্বগুরু মশাই থাকেন/ কঠিন হয়ে/ আমরা থাকি জগৎ পিতার/

বিদ্যালয়ে"। 'লিপিকা', 'সে' এবং 'গল্পস্বল্প' সংকলনের গল্পগুলি শেষ বয়সে এসে লেখা। এই সমস্ত সংকলনের গল্পগুলিতে শিশু-কিশোর চরিত্রের কৌতূহল মেটানো হয়েছে। কল্পনা আশ্রয়ী রূপকথার জগৎকে উপাদান করে শিশুর মানসিক বিকাশে সার্থক হয়েছেন, সঙ্গে একাধিক ছবির ব্যবহার শিশুদের কাছে লোভনীয় বিষয়। 'ডাকঘর' নাটকের অমল প্রচলিত সমাজের শিক্ষা কাঠামো থেকে বেরোতে চায়। সে পণ্ডিত না হয়ে দই বেচতে চায়, রাজার কাছে হরকরার কাজ নিতে চায়। অমলের উক্তি প্রচলিত সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে উনিশ শতকীয় উপযোগবাদকে ভেঙে তছনছ করে দেয়। প্রয়োজনের তাগিদে গুরুত্বহীন হয়ে নিজের সার্বিক মুক্তিই প্রধান হয়ে ওঠে। 'অচলায়তন' নাটকের পঞ্চক প্রথা বিরোধী, আচার বিদ্রোহী। তার মিলিত প্রয়াসেই অচলায়তন পরিণত হয়েছে সচলায়তনে। স্থবির পত্তন হয়েছে বিদ্যায়তনে। যেখানে বিদ্যালাভের সঙ্গে প্রকৃতির সান্নিধ্যলাভও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত সৃষ্টি যেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অপ্রাপ্তি, ইচ্ছার পরিণত বয়সে সার্থক রূপায়ণ। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ব্যক্তিগত জীবনে ও সাহিত্যজীবনে সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বর্তমান সমাজব্যবস্থা প্রতিযোগিতা এবং প্রযুক্তিনির্ভরতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই জীবনদর্শনে পরীক্ষাব্যবস্থা, তুলনামূলক সাফল্য, স্বল্প পরিশ্রমে অধিক ফললাভের আকাঙ্খা, শহরমুখী মনোভাব, উপযোগবাদে বিশ্বাস ইত্যাদি বিদ্যালয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে। যেখানে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় খুবই নগন্য। তাহলে প্রশ্ন হল- বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কি অসম্পূর্ণ? এর উত্তর যদি না হয়, তাহলে প্রশ্ন হল বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের আদর্শ গুরুত্বহীন? এরও উত্তর হল- না। এইবার আমরা আলোচনা করে দেখব বর্তমানের সঙ্গে অতীতের মেলবন্ধন কীভাবে সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যখন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাইছিলেন, তার আগে ছিল উনিশ শতকের উপযোগবাদ আশ্রিত নীতিমূলক শিক্ষাদান ব্যবস্থা। তিনি থেমে থাকেননি। সত্তর বছর বয়সে লিখলেন 'সহজপাঠ'। এরও থেকে প্রমাণিত হয় দীর্ঘ জীবনে তিনি বারবার শিশুদের কথা চিন্তা করেছেন। শিক্ষাব্যবস্থাকে সহজ করার পরিকল্পনা করেছেন। 'সহজপাঠ' আজও সকলের কাছে প্রাথমিক পাঠ্য হিসেবে গ্রহণীয়। বুদ্ধদেব বসু লিখছেন—"যে বয়সে ক-খ চিনলেই যথেষ্ট সেই বয়সেই সাহিত্যরসে দীক্ষা দেয় 'সহজপাঠ'; এই একটি বইয়ের জন্য বাঙালি শিশুর ভাগ্যকে জগতের ঈর্ষাযোগ্য বলে মনে করি"। তাহলে প্রশ্ন হল 'সহজপাঠ' লেখার আগে কি পাঠ্যপুস্তক ছিল না? উত্তর হলো ছিল। তাহলে প্রমাণিত পরিবর্তন সম্ভব। শুধু তাই নয়, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম তৈরির সময় তপোবন আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল। প্রশ্ন হল তিনি বাস্তবে তা পেয়েছিলেন? এরও উত্তর হল- তিনি আদর্শকে প্রয়োগ করলেও বর্তমানকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা হল অচলায়তন, যার পরিচালক মহাপঞ্চক। এখানে প্রয়োজন একজন পঞ্চকের। যে অচলায়তনকে পরিণত করবে

সচলায়তনে। তবে মনে রাখতে হবে মহাপঞ্চককে বাদ দিয়ে বা তাঁর ভাবনাকে বাদ দিয়ে সচলায়তন হওয়া অসম্ভব। অতএব, আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনাকে যোগ করতে হবে। অর্থাৎ মহাপঞ্চক ও পঞ্চকের মিলন। কেননা, আমি বা আমরা বর্তমান এই শিক্ষাব্যবস্থাকে বাদ দিতে পারব না। এর জন্য বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাগুলি তুলে ধরা প্রয়োজন—

ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ নেই।

খ) বর্তমান শিক্ষা ভাষা নির্ভর, ভাব নির্ভর নয়।

গ) বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় আবরণকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। যার ফলে তোতাপাখির শিক্ষা না হলেও খাঁচার উন্নতি হয় এবং খাঁচাকে কেন্দ্র করে কিছু মানুষের হিত সাধন হয়।

ঘ) শিক্ষাব্যবস্থার বেসরকারিকরণ।

ঙ) অনুকরণকে প্রাধান্য দেওয়া।

চ) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সব থেকে বড় সমস্যা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে অবনতি।

ছ) উপযোগবাদকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া।

উপরের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য অবশ্য করেই রবীন্দ্রনাথের কাছে আশ্রয় নিতে হবে। তিনি শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দেখেছেন। সত্তর বছর বয়সে লিখেছেন ‘সহজপাঠ’, যা ভাষার সঙ্গে ভাবাশ্রয়ী। যার জন্য সহজপাঠের ছন্দ আজও আমাদের কানে বাজে। রবীন্দ্রনাথের মতে উপকরণের তুলনায় আবরণ প্রধান হয়ে উঠলে উপকরণ অবহেলিত হয়। সেইজন্য তপোবনাশ্রয়ী আবরণহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন, শিক্ষাব্যবস্থার বেসরকারিকরণ যার জন্য দায়ী। সেখানে অনুকরণ, প্রযুক্তি, উপযোগবাদ প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে এবং শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। এই সমস্যাগুলির সমাধানের প্রয়োজন আবশ্যিক। তাঁর জন্য বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাদ দেওয়া যায় না। কেননা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক স্তরের বইগুলিতে একটি নির্দিষ্ট ভাবনাকে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে ভাবমূল করে পাঠ্যবই এর সূচিপত্র নির্বাচিত করেছে। যার ফলে বর্তমান ও রবীন্দ্রভাবনার মেলবন্ধন ঘটেছে। এবার আমাদের সকলের ভেবে দেখবার বিষয় উপরের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার প্রয়োজনীয়তা কতটা উপযোগী। বাকিটা সময়সাপেক্ষ।

গ্রন্থঋণ:

১. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা – ১৭, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৭

২. দত্ত হীরেন্দ্রনাথ, 'শান্তিনিকেতনের এক যুগ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনাবিভাগ, কলিকাতা-১৭, আশ্বিন, ১৩৮৭
৩. বসু বুদ্ধদেব, "প্রবন্ধ সংকলন", অন্তর্গত 'বাংলা শিশু সাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, সপ্তম সংস্করণ, জানুয়ারি-২০১২, পৃ.১৩০-১৫৫
৪. মজুমদার অভীক ও চৌধুরী রাজীব (সম্পা), 'শিক্ষাদর্পণ প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, মে ২০১৪।
৫. রায় বিশ্বনাথ (সম্পা), 'রবীন্দ্র–জন্মসার্ধশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা', বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ৭৩, বৈশাখ ১৪২২
৬. ঘোষ অমিতাভ, 'বিশ্ববিদ্যার আনন্দ প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ', বিশ্ববীণা, কলিকাতা ১৯, বৈশাখ ১৩৯৩।
৭. বিশী শ্রীপ্রমথনাথ, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘শাদা হাওয়া’: একটি পর্যালোচনা

স্বরূপ হালদার
গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। তাঁর অন্যতম একটি উপন্যাস ‘শাদা হাওয়া’। এই উপন্যাসের পটভূমি হলো গোটা বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে উত্তাল একটা পটভূমি। একই সঙ্গে ভারতের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াই, ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীনতাকামী মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা—এই সবটাই এই উপন্যাসে ধরা হয়েছে।
সূচক শব্দ: অদ্বৈত মল্লবর্মণ, শাদা হাওয়া, উপনিবেশ, বিশ্বযুদ্ধ
অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটি বহুপঠিত এবং পাঠকের কাছে বহু সমাদৃতও বটে। বলা চলে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও ‘তিতাস’ একটি নদীর নাম’ শব্দদুটি যেন একে অপরের পরিপূরক। তবে লেখকের উপন্যাসের তালিকায় অন্য দুটি উপন্যাসও রয়েছে যা প্রায়শই অনালোচিত। তার একটি— ‘শাদা হাওয়া’ এবং অন্যটি ‘রাঙামাটি’। বর্তমান প্রবন্ধে ‘তিতাস’ যদি একটি গোষ্ঠী তথা একটা সংস্কৃতির পরিচায়ক সাহিত্য হয়ে থাকে, তাহলে ‘শাদা হাওয়া’ সেই ধারার একেবারে ভিন্ন অভিমুখেরউপন্যাস তা বলাই বাহুল্য। বলা চলে ‘তিতাস’ এর লেখক অদ্বৈতর হাতেই এমনতর একটা বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে, সেটা পাঠকের কাছে একটা নতুন ভাবনা এবং জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য উপন্যাস ‘শাদা হাওয়া’।

‘শাদা হাওয়া’ উপন্যাসটি ‘সোনারতরী’-র শারদীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সংবাদটি ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় ১৯৫১ সালের ১৮ই এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছিল। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ প্রতিবেদন করেছিল ‘শাদাহাওয়া’ ছিল ‘সুবৃহৎ উপন্যাস’। সুনীল দাস এবং শান্তনু কায়সার উক্ত তথ্যে বিশ্বাস করেছেন। এমনকি শান্তনু বাবুএই গ্রন্থের আকার নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, অদ্বৈতের এই উপন্যাস(যেটা পাওয়া গেছে) খসড়া জাতীয় রচনা। ঔপন্যাসিক জীবিত থাকলে সেটা বৃহৎ আকার দিতেন। যেটা ‘Good Earth’ এর মতোই যথার্থসার্থক উপন্যাস হয়ে উঠত। যদিও পরবর্তীতে তিনি এই মত থেকে সরে এসেছেন।

‘শাদা’ বানানটি লেখক সচেতন ভাবে দন্ত্য ‘স’ না দিয়ে তালব্য ‘শ’ লিখেছেন। তিনি‘শাদা’ অর্থে পাশ্চাত্য বোঝাতে চেয়েছেন। আর ‘হাওয়া’ বলতে ভাবাদর্শকে ইঙ্গিত করেছেন। ‘শাদা হাওয়া’ উপন্যাসটিতে আসলে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পরিস্থিতি অর্থাৎ Post-Colonial situation কে ইঙ্গিতকরতে চেয়েছেনে।

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। এই উপন্যাসের পটভূমি হলো গোটা বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে উত্তাল একটা পটভূমি। একইসঙ্গেভারতের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াই, ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীনতাকামী মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা— এর সবটাই এই উপন্যাসে ধরা হয়েছে।

ঔপন্যাসিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালকে তাঁর এ লেখনীর মধ্যে তুলে ধরেছেন। যে যুগ্ম বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বরাজনীতিরসমীকরণ বদলে রেখে দিয়েছিল, তেমন একটা বিষয়কে অদ্বৈতর লেখনীর বিষয় হতে দেখে বেশ আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। তাঁর অন্যতম সুবৃহৎ উপন্যাস‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এ যুদ্ধের কোনো ছাপ আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু ‘শাদা হাওয়া’ নামক উপন্যাসে গোটা বিষয়টাই দাঁড়িয়ে রয়েছে যুদ্ধপরিস্থিতি, ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার লড়াই-এর দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিরিখে। অতএব ‘তিতাস’কে দেখে যদি সমালোচক বা পাঠকের মনে হয় লেখক অদ্বৈত রাজনৈতিকভাবে অ-সচেতন— সেটা যে অমূলক একটা ভাবনা তা বোঝাতেই এ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। তাছাড়া ‘শাদা হাওয়া’ উপন্যাসটিতেলেখক একই সঙ্গে সমাজনীতির পরিচয়ও তুলে ধরেছেন। অথচ ছয়ের দশকে প্রকাশিত ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এর রচনা এবং লেখার কালপটেও রাজনৈতিক আলোড়নের অভাব ছিল না। তা সত্ত্বেও সেখানে একমুখীভাবেই মালো সমাজের আত্মপরিচয়ের উদ্‌ঘাটনটিই ছিল প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট। এ বক্তব্যটিকে প্রাধান্য দেবার মূলে রয়েছে লেখক হিসেবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের পর্যালোচনা করবার ক্ষেত্রে ‘তিতাস’ ব্যতীতও অন্যান্য রচনার তুলনামূলক পাঠের মাধ্যমে তাঁর লেখকসত্তার সমগ্রতাকে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এইভাবে— সন ১৯৪২ এর কালপটকে সামনে রেখে। উপন্যাসের শুরু থেকেই ঔপন্যাসিকের অভীপ্সা কী— তাও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ বিজাতীয় বহিঃশত্রুর আক্রমণের শিকার হয়েছে। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য ‘টমি’দের আগমন। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনি এগিয়ে গেছে। উপন্যাসিক বলেছেন এই দেশ রক্ষা করার দায় এই ‘টমি’রা নিয়েছে! তারা দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জীবন পণ করে থাকেন। ঔপন্যাসিক বাঙালি জাতিকে একই সঙ্গে বিদ্রুপ করেছেন গোবিন্দ শর্মার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে—

> “কে না জানে এসব কাজ বাঙ্গালীর কর্ম নয়। ধুতি পাঞ্জাবি পরে, ঢেঁকুর তুলে, পান চিবুতে চিবুতে একখানা আনন্দবাজার হাতে করে ট্রামে চড়ে রাইটার্সবিল্ডিং- এ গিয়ে চাকরি করা যায়। কিন্তুএদেশ রক্ষা করা যায় না। দেশ রক্ষা করতে হলে যুদ্ধ করতে হয় এবং এই যুদ্ধ করতে এসেছে এই টমিরা।”[১]

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে ১৯৪২ এর ১৯ শে ডিসেম্বর তারিখ লেখা ছিল। এই তারিখ আসলে উপন্যাসের সমাপ্তির সময় বলে মনে করা হয়। এই সময়কালে দেশ বিদেশের রাজনৈতিক অনেক উত্থান-পত্তন দেখা যায়। সেই সময়ের চিহ্ন হিসেবে উপন্যাসে নাৎসি বাহিনীর স্টালিনগ্রাড আক্রমণের কথা এসেছে, এসেছে জনযুদ্ধের কথা।

এই উপন্যাসে টম, জেল, জিল-এর মতো বিদেশি চরিত্ররা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে গুপ্তচর গোবিন্দ শর্মা, শ্রমিক নেতা বিনয় বাগচি, গৌরাঙ্গ ও সুনীলের মতো দুই শ্রমিক চরিত্র। উপন্যাসে বিশেষভাবে দুটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে— বৃটিশ সৈনিক টম ও ভারতীয় গোয়েন্দা গোবিন্দ শর্মাকে। বৃটিশ সৈন্য দেশে থাকতে স্কুল মাস্টারি করতেন। দেশের রাজার ডাকে সৈন্যদলে চলে আসেন। যদিও সৈন্য দলে আসার আগে স্কুল ইন্সপেক্টরের হাতে অপমানিত হয়ে সেই পদ তিনি ছাড়েন। বৃটিশ সৈন্য (টমি) বন্ধু আমেরিকান বন্ধু জীলের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ নিয়ে বৃটিশের মতাদর্শ চোখে পড়ার মতো। টম বলে—

> "একে শাসন করি। এর ভালোমন্দের দায় ঘাড়ে নিয়েছি, কাজেই যখন দেখছি, স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে যাচ্ছে, তখন চাপ একটু বাড়িয়ে দিয়ে ঠান্ডা করি। এর যদি কোনো নিজস্ব প্রভাব থাকে তো তা থাকবে আমাদের পায়ের তলায়, ঘাড়ের উপরে নয়।"[২]

বৃটিশ সৈন্য টম-এর সঙ্গে আমেরিকান সৈন্যের (জীল) বন্ধুত্ব থাকলেও তার সমস্ত কথা জীল কিন্তু মেনে নেয়নি। এই মতোবিরোধ তাদের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব নিয়ে এসেছে। কিন্তু টমের মতাদর্শ প্রথম দিকে একেবারেই পরিবর্তন হয়নি। তার মধ্যে একটা অহং সর্বদাই বিরাজ করতো যে, তারা অসংখ্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং সেই সব দেশের মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি সবইঅমার্জিত, বর্বর এর মতো। সেই সমস্ত মানুষদেরকে মানুষ তৈরি করার দায় তাদের নিতে হয়েছে—

> "এরা অসভ্য। এরা ইতর। বনঘেরা অজ্ঞাত এক রাজ্যেতে রাজ্যতে নোংরা জীবন যাপন করছে। অপরিমেয় ঐশ্বর্যের মাঝে পড়ে থাকবে, কিন্তু ঐশ্বর্যের কদর বুঝবে না। এদের মানুষ করতে হবে। ইতরামি দূর করে এদের সভ্য, আলোকিত করতে হবে।... সভ্যতাসম্মত বিদ্যায় বসনে ভূষণে ও পাশ্চাত্য আদবকায়দায় কেতাদুরস্ত করে এদের ও ঐহিকজীবন সুখময় এবং এদের মধ্যে মিশনারি পাদরি দিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে, পারত্রিক জীবন মধুময় করে তুলতে হবে।"[৩]

উপন্যাসে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো গোবিন্দ শর্মা। যে এই ভারতবর্ষের শিক্ষিত সন্তান। পরাধীন ভারতবর্ষে গোয়েন্দার তথা বৃটিশের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করে সে। পরাধীন দেশে স্বদেশী আন্দোলন বা বৃটিশের বিরুদ্ধাচারণ করা হলে দ্রুত সে বৃটিশকে খবর দেয়।তাছাড়া এক শ্রেণির মানুষের দেখা মিলছে, যারা মনে করে ইংরেজ

রাজত্বের সবটাই সুখের। তাদের ধারণা এই দেশকে ইংরেজরাই ভালো ভাবে রাখতে পারে। এই মোহভঙ্গ হয় গোবিন্দ যখন শ্রমিকনেতাকে হত্যা করে। এই শ্রমিক নেতা বুঝে ছিল ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া ততোটা সহজ নয় যতটা ভাবা যায়। তার মূল কারণ ভারতীয়রাই,তারা ভারতবর্ষের অধিবাসী হিসেবে পরিচিত হবার থেকে ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত হতে ভালোবাসেন। ধর্মগত পরিচয়েই ভারতীয়রা বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে—
"আগে সাম্প্রদায়িক মিলনের কাজ করে পরে স্বাধীনতা চাইবো, ...কিন্তু মিলনতো হচ্ছে না। আর স্বাধীনতার আগে এ তো হবার নয়।"[৪]
লেবার লিডার তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময়েও ভারতকে স্বাধীন করতে না পারার জন্যে দায়ি করেছেন এই কারণটিকেই—"হিন্দুরা যে জঘন্য মুসলিমবিদ্বেষ ; তখন নরঘৃণাবৃত্তি দীর্ঘকাল দেশের সহযোগের আবহাওয়াকে পঙ্কিল করে রেখেছিল তারই স্মরণ যেন ঘরের স্বাভাবিক আলো-বাতাসকে ভারী করে তুললো।... যার সঙ্গে মনের মিল রয়েছে, তাকেও তামাক দিয়ে আপ্যায়ন করার পর হুকার জলটুকুঢেলে দিয়ে তাকে অপমান করেছ।তার স্পর্শ থেকে সর্বদা সন্তর্পণে আপনাকে রক্ষা করেছ— আহাম্মক তুমি, মনে করেছ তুমি ছাড়া সবাই পাপী, তাদের ছায়া মাড়ান পাপ, এতে করে নিজের যে পাপের বোঝা বাড়িয়েছ, তারই প্রতিক্রিয়ায় আজ তুমি বিপর্যয়গ্রস্ত।"[৫]
পরিশেষে বলার কথা, লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখনীর ভাঁড়ারেও বৈচিত্র্যাভাব নেই। 'তিতাস' যদি তাঁর কাছে আত্মপরিচয়ের প্রকাশক হয়, তবে সমাজ এবং রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন লেখক হিসেবে তাঁর 'শাদা হাওয়া'র উপস্থাপন।'তিতাস' এর পরতে পরতে একাধারে যেমন তথ্যনিষ্ঠা এবং আন্তরিক উদ্ভাসনের প্রচেষ্টা দেখা যায়, তেমনি 'শাদা হাওয়া'র মতো উপন্যাসে মেলে তাঁর কালচেতনার অভিক্ষেপ এবং অন্তর্গূঢ়তা। ইতিহাসের ধারা বেয়ে চলতে চলতে যে বর্তমান আসলে ইতিহাস হয়ে যায়, তার উত্থাপনও করছেন তিনি। বিশ্বরাজনীতির সূক্ষ্ম স্তরে যে দেশীয় রাজনীতি এবং মানসিকতা ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের বিপর্যয়ের কারণ তাও তুলে ধরে লেখক হবার দায় পালন করেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

তথ্যসূত্র:

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র',পুনর্মুদ্রণ, দেজ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫,পৃ ৬৩৭
২. তদেব, পৃ ৬৪১
৩. তদেব, পৃ ৬৪২
৪. তদেব, পৃ ৬৭১
৫. তদেব, পৃ ৬৭৩

বাংলা উপন্যাসের ইতিবৃত্তে নতুন দিগন্ত : প্রসঙ্গ সন্তোষ করের 'মুক্তামাছ'

অনির্বাণ সাহু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড (ভারত)

সারসংক্ষেপ: 'সারানি' জাল থেকে 'সাবাড়' মহাজাল পাতার সমুদ্র-সংগ্রাম। সমুদ্রজীবী যৌথ জেলে-জীবনের লড়াই-এ কারা জয়ী হবে? ভাত-ভিখারি জেলে, নাকি লাখপতি আড়ৎদার। মোহনা থেকে মহাসমুদ্রের জেলে-মাঝিদের আত্মবিশ্বাসের শুধু কাহিনি নয় — বাংলার আঞ্চলিক ভাষায় নির্মম বাস্তবের সঙ্গে রোমান্সের এক অভিনব আলেখ্য। একদিকে সমুদ্র-নির্ভর জেলেপাড়ার সনাতন বিশ্বাস ও আধুনিক সংস্কারের দ্বন্দ্ব ; অন্যদিকে জেলে পরিবারের প্রেম প্রত্যাখানের উপাখ্যান। আধুনিক পাঠকের কাছে জল ও জালের মৎস্য-পুরাণ। তাই 'মুক্তামাছ' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিবৃত্তে সার্থক পথিকৃৎ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললে নয়, বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে ঔপন্যাসিক সন্তোষ কর পাঠকবর্গের নিকট একটি অপরিচিত নাম। তিনি লেখার জগতে থাকলেও তাঁর সৃষ্টি তথা বইপত্রের পরিচয় বাইরের জগতে কোথাও নেই। তার কারণ সন্তোষবাবুর লেখা মোট পাঁচখানি উপন্যাসের মধ্যে এখনো পর্যন্ত চারটি উপন্যাস অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে।

সূচক শব্দ : সারানি জাল, সাবাড় মহাজাল, আড়ৎদার, আঞ্চলিক ভাষা, মৎস্য-পুরাণ।

'মুক্তামাছ' উপন্যাসের নায়ক সুবল ও উপন্যাসের অন্যান্য পাত্র-পাত্রীর প্রধান জীবিকা সমুদ্রে মাছ শিকার। দিনের পর দিন জাল নৌকা নিয়ে তাদের সমুদ্রে ভেসে থাকতে হয়। অর্থাৎ জীবন-জীবিকার স্বার্থে নৌকা, জাল ও মাছের সম্পর্ক ওতপ্রোত। এর সঙ্গে সুবলের বাড়তি ভাবনা মুক্তামাছ। তাই সবকিছু মিলে 'মুক্তামাছ' নামকরণটি সার্থক হয়েছে।

মৎস্য বন্দর শঙ্করপুর থেকে দু'তিন কিলোমিটার পূর্বে জলধা মোহনা। জলধা মোহনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহ গড়িয়ে গেছে। তে-বাঁকি খালের মোহনায় জঙ্গল কেটে সুবলের ঠাকুরদা ঘনশ্যাম মাঝি প্রথম বসবাস শুরু করেন। তার পড়শি হয় ধীরেন মাঝির ঠাকুরদা, ঝাটু মাঝি। পরে পরে বেরারা, খালুয়ারা, মঙ্গলরা এসে বসবাস করতে শুরু করে। সবাই সমুদ্রে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। "...একদিন সকালে খেত্রি জেলেনি গরু ছাড়তে গেছিল উত্তরের বিল চরে, সেই

প্রথম দেখল নতুন আগন্তুককে, ঝোপের ধারে বড় এক টুকরা পাথর, সিঁদুর পড়া।.......... সেই থেকে মা মঙ্গলা এখানকার নতুন বাসিন্দা। দুঃস্থ জেলেদের সুখে দুঃখে ভয়ে আতুরে পাশে এসে দাঁড়ান। তাই প্রত্যেক অমাবস্যা পূর্ণিমায়, শনিবার, মঙ্গলবারে পূজা পান তিনি। এবং সেই দিন থেকে মা মঙ্গলার সেবায়েত গজপতি পন্ডাও এ তল্লাটে ঠাঁই পেয়েছে। ......"

বেড়াখানা এই জেলেপাড়ায় এক-দু'বছর অন্তর কলেরা কিংবা বসন্ত রোগে দু'একজন মারা যায়। দুধের ছেলে সুবলকে শাশুড়িমা আহ্লাদি বুড়ির কোলে রেখে, সুবলের মা বসন্ত রোগে মারা যায়। তার ঠিক দু'দিন পরে সরমা জেলেনির স্বামীও মারা যায়। সরমার কোলে তখন তার মেয়ে রয়েছে। সরমার বুকের দুধ খেয়ে সুবল বড় হয়।

সুবলের বাবা হারাধন মাঝি চৌধুরীদের সিদ্ধেশ্বরী বোটের বড় মাঝি। দেড় দু'মাস অন্তর সে বাড়ি ফিরতো। চাল, ডাল, সুপারি, সর্ষেতেল, মশলাপাতি সে আনতো। পাড়ার লোকেরা, বউড়িরা যা যা আনতে বলতো তাও আনতো। ছেলে সুবলের জন্য নানারকম পুতুল আনতো। পুতুলের গন্ধ পেয়ে কেতু সুবলের বাড়ি চলে আসতো। দু'জনে মিলেমিশে খেলতো। সন্ধ্যায় আহ্লাদি ঠাকুমার কাছে বসে দু'জনে রোজ গল্প শুনতো। সিদ্ধেশ্বরী বোটের গল্প, ভুঁইনাগের গল্প, মুক্তামাছের গল্প।

মুক্তামাছের গল্পটা মনে ধরে সুবলের। "....মুক্তামাছ যে পায়, রাতারাতি ভাগ্য ফিরে যায় তার, জোয়ারের জলের মতন কোন দিক দিয়ে যে লক্ষ্মী ঠেলে আসে তার ঘরে, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।..... এতোদিন ধরে স্বপ্ন দেখেছিল সুবল, বড় হয়ে সে সিদ্ধেশ্বরী মতন বড় কোনো বোটের মাঝি হবে। বড় মাঝি, অন্য মাঝিদের ওপর খবরদারি করবে সে। বোটের তদারকি করবে। সে স্বপ্নটাকেও এখন বাতিল করে দিল সুবল। বড় হয়ে মাঝি বোটের হবে না সে। জাল বাইতে যাবে, জেলে হবে। বড় জেলে, বোটের মাঝি হয়ে কি লাভ ? জেলে হলে সে মুক্তামাছ ধরতে পারবে বরং।........."

জেলেপাড়ায় ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের মা-বাবারা মাথা ঘামায় না। পাড়ায় কোনো পাঠশালা নেই, ছেলেরা সারাদিন তে-বাঁকি খালে জলকাদায় মাখামাখি হয়। ছেলেরা বড় হলে জালে যায় অর্থাৎ সমুদ্রে মাছ শিকারে যায়। ".....তেরো চৌদ্দ বছর বয়সে প্রথম জালে যাওয়ার দিনে মা মঙ্গলাকে ভালোরকম পুজো দেওয়ার একটা প্রথা আছে বরং। সেদিন ছেলেকে দু'এক ঘন্টা উপবাসী থেকে মা মঙ্গলার সিঁদুর নিতে হয়। প্রসাদ পেতে হয়।......

চৌধুরীদের ধারে বাকি আদায় উশুল কারবারে একদিন ভুল করে বসলো হারাধন মাঝি। কারবারে বেশ লোকসান হলো। মাঝি বুঝতে পারলো স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে ব্যবসা করা যায় না। খাতায় লেখালেখির প্রয়োজন আছে। তার পড়াশোনা থাকলে এ ভুলটা হতো না। "....হারাধন বুঝতে শিখল, নিরক্ষরতা পাপ,

মহাপাপ। দু-অক্ষর কালির আঁচড় পেটে থাকলে সেটা একদিন না একদিন কাজে আসে। এমনকি শুধু দাঁড় বেয়ে রুজি কামাতে হয় যাদের, তাদের জীবনেও।

ছেলের কথা মনে পড়ল তখন-ই। সুবলের ভবিষ্যৎ ভেবে হিম হয়ে গেল হারাধন। অনেক চিন্তা করে সুবলের জীবিকা সম্পর্কে ধারণা সে বদলে ফেললো। পাড়ায় পড়াশোনা করানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়ে চব্বিশ পরগণার সুবলকে তার মামার বাড়িতে রেখে এলো। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা, তে-বাঁকি খালের মতো খাল, বেড়াখানার গাঁওয়া বনের মতো বন দেখতে না পেয়ে হতাশ হলো সুবল। "..... মামার বাড়িতে সুবলের দিনগুলো ছিল হ্যাংলা কুকুরের মতনই ঘুরে বেড়ানোর। ছোট-বড় সকলের ফাই-ফরমাশ খাটার কিংবা চড়চাপড় খাওয়ার এবং লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদার। ..." এই অবস্থায় পড়াশোনা তেমন হয়নি সুবলের। পাঁচ বছর পর তার বাবার সাথে সে বাড়ি ফিরে আসে।

বাড়িতে আহ্লাদি ঠাক্‌মাকে না পেয়ে বাড়িটা সুবলের কাছে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। মামার বাড়িতে থাকার সময়ই তার ঠাক্‌মা মারা গেছেন। ঠাক্‌মার জন্য তার খুব কষ্ট হয়। তার ওপর তরণী দলুই-এর সাথে কেতুর বিয়ের খবর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মতো। কেতুর বিয়েটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। ছেলেবেলায় গরু চরাতে গিয়ে দিনের পর দিন কেতুর সাথে বিয়ে বিয়ে খেলতে গিয়ে কেতু যে তার বুকের মধ্যে অনেকখানি জায়গা দখল করে ফেলেছে, তা ভালোভাবে বুঝতে পারে। দু'টো ঘটনাই তার বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাকে তলানিতে ঠেকিয়ে দেয়। এই হতাশার মধ্যে ফুলির সাথে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করায় তার বাপ হারাধন মাঝি। ঠিক তার পরে পরেই হারাধন মাঝি মাঝ গাঙে গিয়ে মারা যায়। এরপর সংসারের সব দায়-দায়িত্ব সুবলের উপর পড়ে। বাপটা বেঁচে থাকাকালীন সংসারের কোন দায়িত্ব আগ-বাড়িয়ে নেয়নি। এখন পুরোপুরি তার ওপর পড়ায় সে বেসামাল হয়ে পড়ে। "…. এদিকে সংসার বেড়ে চলে। তিনজন থেকে পাঁচজন। সংসারের খাঁই বাড়ে। কিন্তু উপায় বাড়ে না। মাঝে একবার মাছের কারবারে ফেঁদে ছিল সুবল। সুবিধা করতে পারেনি। পেটের টান মূলধন গিয়ে ঠেকল। সত্য-মিথ্যার ভেজাল দিতে পারল না বলে ব্যবসা ডুবলো। নাচার সুবল আবার ফিরে এল জালে। অভাবের তাড়নায় মরিয়া হয়ে খাটে।......"

এত কষ্টের মধ্যেও আহ্লাদি ঠাকুমার গল্পগুলো ভুলে যায়নি। বিশেষ করে মুক্তামাছের গল্প। তার বিশ্বাস ঝিনুকে যদি মুক্তা থাকতে পারে, তাহলে সমুদ্রেও মুক্তামাছ আছে। "…. সুবল এখনও মুক্তামাছ খুঁজতে বেরোয়। ইতিমধ্যে ছোট্ট একটা মাছ ধরা ডিঙি তৈরি করিয়ে নিয়েছে সে। এখন সে দাঁড় বাইতে চোস্ত। তেমন কোন জ্যোৎস্না রাত পেলে খেই জাল নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে একা একা। এক

হাতে জাল অন্য হাতে দাঁড়। দাঁড় বাইতে জাল ফেলাতে কখন যে সে তে-বাঁকি খালের মুখ ছাড়িয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে টেরই পায় না। ....”

সুবল আর কেতুর মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক সেই ছেলেবেলা থেকে প্রবাহমান তা নানা রকম ঝড় এসেও গতিরুদ্ধ করতে পারেনি। বরং সাবলীল গতিতে এগিয়েছে। সুবল যেখানে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ সেখানে কেতু বউর অবস্থা খুব ভালো। অভাবী সুবল ও সুবলের পরিবার যাতে উপোশে না থাকে তাই বারবার লুকিয়ে ওদের বাড়িতে চাল পৌঁছে দিয়েছে কেতু। শুধু তাই নয় ওদের বাড়িতে সচ্ছলতা আনার জন্য লখা পালের সাবাড় ভেটিতে সুবলকে কাজ পাইয়ে দিয়েছে। আর সুবল কারণে অকারণে কেতুর কাছে না এলে তার দিনটা ভালো যায় না। ভেতরে ভেতরে কেতুর ওপর তার অধিকার বোধ গড়ে উঠেছে। সে বোধটা একদিন চরম আকার ধারণ করলো।

সেদিন ছিল জলযাত্রার দিন। লখা পালের ছ'টা নতুন মাছধরা নৌকা ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। মা মঙ্গলার পুজো দিয়ে টানা হবে পাল। দাঁড় ফেলা হবে। তার পরে পরে নৌকাগুলো ভেসে যাবে সমুদ্রে। নৌকায় ওঠার আগে কেতুর সঙ্গে দেখা করতে আসে সুবল। কেতু তখন খিড়কির দাওয়ায় বসে চুল ঘাঁটছে। কিছুক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে দেখার পর দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে গেল সুবল। হঠাৎ কেতুকে দু'হাতে জাপটে ধরলো কেতুর টাল-বেটাল দেহটাকে টেনে-হিঁচড়ে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যেতে পারলো সুবল। পুকুরপাড়ে কেয়াঝোপের পেছনে খানিক আড়াল পেয়েই কেতুকে সে আধা-উদোম বানিয়ে ফেলল। ..... সুবলের চোখে জ্বলে উঠল কেতুর অনাবরণ অঙ্গঠাম — পরিপুষ্ট লাবণ্য। মাথার চুল থেকে নাভি পর্যন্ত সর্বত্রই ছড়ানো অঢেল সৌন্দর্য। বিচ্ছুরিত সৌন্দর্য।

সৌন্দর্যের ছ'টায় ঝলসে গেল তার চোখ। বিহ্বল সুবল স্থানকাল ভুলে গেল। নিজেকে ভুলে গেল। কেতুকে ভুলে গেল। কেয়াগাছের কান্ডে গা-হেলা দেওয়া কেতু যেন আর তার সেই পরিচিত কেতু নয়। অপরূপ স্বর্ণদলে বিকশিতা প্রতিমা। তন্ময় সুবল কেবল তাকিয়েই রইল তার দিকে। জীবন ভর চড়াই উৎরাই ভেঙে দূর তীর্থ যাত্রী যেমন চত্বর ছুঁয়েই মন্দির দেখে, তেমনি দেখল।.....”

এদিকে মা মঙ্গলার পূজো শেষ করে নৌকা যাত্রার প্রস্তুতি চলছে। প্রসাদ বিতরণ হয়ে গেছে। সবাই আনন্দে মশগুল। মা মঙ্গলার জয়ধ্বনি দিতে দিতে জেলেরা নৌকায় উঠে বসলো। সুবলের যাওয়ার ইচ্ছে নেই। নিছক কর্তব্য রক্ষায় সে ধীরে ধীরে নৌকায় উঠে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। আবার মা মঙ্গলার জয়ধ্বনি দিতে দিতে এক এক নৌকা জলে ভাসতে শুরু করলো। সুবলরা যে নৌকায় আছে সেই নৌকাটা কিছুটা গিয়ে কাৎ হয়ে গেল। নৌকার ভেতর জল ঢুকলো হু হু করে।

শুভ যাত্রায় বাধা। সুবলদের নৌকায় যারা আছে তাদের মধ্যে কেউ পাপ করেছে বলে অনেকে ধরে নেয়। এই পাপীর জন্যই এই সর্বনাশ। সুবল চুপচাপ

থাকায় সুবলকেই পাপী বলে বলে উঠলো বিরু মঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র চিতা বাঘের মতো সুবলের ওপর লাফিয়ে পড়লো লখা পাল। মারতে মারতে নৌকা থেকে নামিয়ে দিল সুবলকে। "…. যা শালা তকে আর জালে যাইতে হবেনি। ঘরে শুইবু যা। তবু কই রাখছি মাছ যদি না মরে ত তকে মারবা আমি। কুচিকুচি করি কাটবা, বাজারে বিক্রি করবা কেজি দরে।…"

এতো অপমানিত কোনো দিন হয়নি সুবল। অপমানের জ্বালা তার বাঁচার ইচ্ছাটা একেবারে শেষ করে দেয়। জলে ঝাঁপ দেবে বলে তে-বাঁকি খালের কাছে সে পৌঁছে যায়। পরক্ষণে তার মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে। কেন সে মরবে ? সে তো কোনো অপরাধ করেনি। যে যাই বলুক সে জানে, কেতু জানে সে নিরপরাধ। সে বাড়ি ফিরে আসে।

সাতদিন পর সাকরেদদের নিয়ে লখা পাল ক্ষয়ক্ষতি টাকা চাইতে এলো সুবলের কাছে। সুবলের পাপের জন্যে লখা পালের বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। যা ক্ষতি হয়েছে সব টাকাই দিতে হবে সুবলকে। দু'চোখে সর্ষে ফুল দেখলো সুবল। তার পাশে লখা পালের ছেলে চন্দন দাঁড়াতেই সে স্বস্তি পেলো। "…. তৈরি করার পর তে-বাঁকি খাল পাড় অবধি বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওই নৌকাগুলিকে । সেই সময় একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল ওই নৌকাটা। অনেকেই সেটা জানে, দেখেছে। খুব সম্ভব জোড় মুখে চিড় খেয়ে থাকবে। তবুও সারাদিন জলে ভাসছিল। কেননা, তখন এই চিড়টা জলের ওপরে ছিল। নৌকা যাত্রার সময় লোকজন উঠে বসতে এবং জালের বোঝা চাপতে জল ধরেছে। তাতেই কাত্‍ হয়েছে নৌকা।

নৌকাটা বয়ে নিয়ে আসছিল যারা, তারা কেন পরীক্ষা করে দেখেনি, যখন ধাক্কা খেলো ! দোষ তো তাদেরই। সুবলবাবু নির্দোষ। এদের দোষে অন্যের সাজা হয়েছে বরং।…"

এরপর আর কোন কথা বলেনি লখা পাল, চুপচাপ চলে যায়।

এরপর আর এই টাকার ব্যাপারে কোনো কথা বলেনি লখা পাল। তবে তার কাছে সুবলের টিপ-ছাপ মারা যখন কাগজ রয়েছে, তখন ওকে এ মরশুমে তার ভেটিতে থাকতেই হবে। এ রকম একটা ইঙ্গিত দিয়ে চলে গেল লখা পাল।

দিনক্ষণ দেখে লখা পালের অন্যান্য মাঝির সাথে মাছ শিকারে সমুদ্রে ভাসতে হলো সুবলকে। জল দেখে মাছ চিনিয়ে দিয়েছিল অপয়া সুবল। সামনেই সমুদ্রের জল টগবগ করে ফুটছে। বিঘা তিনেক জায়গা জুড়ে লালচে হয়ে আছে জল। ঠাসাঠাসি মাছের লালচে শিরাগুলো পাশাপাশি জোড়া লেগে। দেখেই জেলেরা বুঝলো, মাছ - ইলিশ মাছ বড় মাছের চাঁই।

'জয় মা মঙ্গলা
শুরু হল মাছ মারি উৎসব।'

এবারে এত মাছ পড়লো যে নৌকাগুলো ভর্তির পর জাল কেটে অনেক মাছ সমুদ্রে ফেলে দিতে হলো। মাছ বিক্রি করে প্রচুর টাকা লাভ করলো লখা পাল। এই লাভের থেকে ভাগের ভাগ যে টাকা পাবে মনে মনে হিসেব করে খুশি হয় সুবল। এবার ঘরের পুব পাশে আর একটা ঘর করবে, ফুলিকে ডাক্তার দেখাবে, সাবিত্রীপুরের ছোটবাবুর দোকানের ধার শোধ করবে, আরও অনেক কিছু। মনের আনন্দে লখা পালের কাছে লাভের ভাগের ভাগ আনতে গেল সুবল। ভাগ তো দিলই না উপরন্তু চরম অপমান করে ঝুপড়ি থেকে বের করে দিল সুবলকে।

এ অপমানের একটা হেস্তনেস্ত করবে সুবল। ফুলির নজর এড়িয়ে ঘর থেকে ধারালো কাতানটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। লখা পালকে খতম করে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবে। যাওয়ার পথে হঠাৎ কেতু বউর ঘরে ঢুকে কেতুকে জড়িয়ে ধরলো সুবল। কেতু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সুবলকে শুনিয়ে দিল কু-কথা। "…. খটির মাইয়া পাইচু নাকিরে আমাকে ? শিয়াল কুকুর পাইচু ? বঁটি ধরবা ত কুচেই দিবা তকে। রক্ত মাংস এক কর দিবা।… কিন্তু জালি পেড়ে থমকা খেল কেতু । সুবলকে দেখল। সুবলের ধড়ে প্রাণ নেই যেন। রক্ত নেই, শুধু যা দু'টো পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে মূর্তি। সুস্থির তাকিয়ে আছে কেতুর দিকেই। সাঁজের প্রদীপ প্রায় নিবু নিবু, তারই ক্ষীণ আলোয় কেতু দেখল সুবলের চোখে জল।

পাথর হয়ে গেল কেতু।

কয়েকটা মুহূর্ত পরস্পরকে নীরব নিরীক্ষণ, তারপর ঘুরে দাঁড়ালো সুবল, নির্বাক বেরিয়ে গেল…."

তারপর আর সুবলকে দেখা যায়নি। সুবল বারদরিয়ায় মুক্তামাছ ধরতে গেল — না অন্য কোনখানে গেল ? পাঠকের মনে বড় একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে দিয়ে লেখক উপন্যাসের যবণিকা টেনেছেন।

উপন্যাসটির ঘটনা প্রবাহ মৎস বন্দর জলধা মোহনায় গড়িয়ে গেছে। এবং লেখকের বাড়িও জলধা ও শঙ্করপুরের মাঝামাঝি ক্ষীরপাল গ্রামে। ফলে এই সব এলাকার মানুষদের মুখের শব্দ উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন যাউচি (যাবে), কাঁই (কোথায়), সাঁইজ (সন্ধ্যা), নিদ (ঘুম), রইচে (রয়েছে), পাইচে (পেয়েছে), ছুকরা (ছেলে), সুঁতকি (তাড়াতাড়ি) প্রভৃতি শব্দ।

এই শব্দগুলোর সাথে আধুনিক বাংলা শব্দ মিশিয়ে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মুখে বসানো হয়েছে। তাতে পাঠকের পড়তে কিংবা বুঝতে অসুবিধা হয়নি বলে আমার বিশ্বাস। যেমন তারিণী দলুই সুবলকে বলছে, — "দুক্তা পান খাবু সুবল, কফ সরল হবে। আর পুঁথি পড়বু, ভারত পড়বু সাঁইজবেলা। ধর্ম হবে তাইলে। লেখাপড়া জানা ছুকরা তু।"

আবার সুবল যখন হতাশ হয়ে পড়েছে তখন সরমা বুড়ি বলছে, — " ভাবচু কিরে সুবল ? আঁয় ? বারদরিয়ায় রইতে হবে ভাবি ভয় পাইচু নাকি ? জুয়ান

ছুকরা তুমরা সব। বারদরিয়ার নাম শুনলে কুদি উঠবে রক্ত। জল ভাঙবে কি দাঁড় ভাঙবে। মাছ মরবে কি মনিস মরবে। বিজুলির মতন ছুটবে না। ভাঙি পড়ছু কি ? আঁয় ?...”

এইভাবে দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষদের মুখের ভাষা পাঠকদের লেখক চিনিয়ে দিয়েছেন।

উপন্যাসে সুবলকে কেন্দ্র করে ঘটনা প্রবাহ গড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য অনেক চরিত্রের আনাগোনা হয়েছে। লখা পাল একটি খল চরিত্র। নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। কেতু বউ-এর প্রতি তার দুর্বলতা রয়েছে। কেতু বউ-র প্রতি অন্য কারোর দুর্বলতা থাকুক তা সে চায়নি। তাই সে সুবলকে সহ্য করতে পারতো না। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সাবাড় জালে লাভের ভাগ থেকে ওকে বঞ্চিত করেছে।

আহ্লাদি ঠাকমা সহজ-সরল স্নেহপরায়ণ। নাতি সুবলকে ঘিরেই তার সবকিছু। ওকে নজরে রাখা, ওকে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় সিদ্ধেশ্বরী বোটের গল্প, ভুঁনাগের গল্প, মুক্তামাছের গল্প সে শোনায়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তার আস্থা না থাকলেও ব্যবহারিক শিক্ষার উপর ছিল। “.... জেলের ছেলে জেলে হবে, বড় হয়ে জাল টানতে কি দাঁড় বাইতে যাবে। বৃষ্টিতে ভিজবে, রোদে পুড়বে, জল চিনবে, আকাশ চিনবে, জোয়ার ভাটার মর্ম বুঝবে।...”

কেতু বউ উপন্যাসের সহ-মুখ্যচরিত্র। কেতু ছোটবেলায় সুবলের সাথে বর বউ খেলতে খেলতে সুবলকে ভালোবেসে ফেলেছিল। সে চৌদ্দতে পা দিতেই তার বিয়ে হয়। কিন্তু মাস দুয়েকের পর বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসে। কয়েক বছর পর তারিণী বুড়ার সাথে তার আবার বিয়ে হয়। এবং সংসারে একটু সুখের মুখ দেখার জন্য লখা পালকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সুবলের প্রতি ভালোবাসা তার থেকে যায়। সেই পবিত্র আসনে অন্য কাউকে বসাতে পারেনি সে। অভাবী সুবল ও সুবলের পরিবার যাতে উপোসে না থাকে সদা সর্বদা সে সতর্ক থাকে। “.... চাল, শশা কি কুমড়োর ফালি, নিদেনে দু'মুঠো খুদ, গাছ পাথরকেও আড়াল করে ওগুলো সুবলের হাতে তুলে দেয়। তৃপ্ত অথচ সন্ত্রস্ত চোখে।...”

উপন্যাসে চরিত্রগুলোর মধ্যে তিনটি চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা এবং ভিন্নধর্মী। প্রথমজন হচ্ছে নৃপতি খালুয়া, পা হারিয়ে সারাদিন দোলনায় বসে থাকে। তামাক খায়, রাস্তা দিয়ে যে যায় তাকে ডেকে তামাক খাওয়ায় এবং চোখাচোখা কথা শোনায়। “.... পা খুইয়ে মুখ খুলছে এখন। পরনিন্দা, পরচর্চায় মুখর থাকে সর্বক্ষণ। জেলেপাড়ার সমস্ত খবর তার নখদর্পণে। মন্দটাকে খুঁটিয়ে বড় করে, মন্তব্য করে নিজের পছন্দসই। বিষ উগরে দেয়। শ্লীল-অশ্লীল গালাগাল দেয় মন্দজনের উদ্দেশ্যে। বলে, শালাকে লাথকুড়া মারতে নাইকেই, বলে এবং ন্যাংড়া পা দোলায়।...”

দ্বিতীয়জন হল তরণীবুড়া, সারাদিন মহাভারত পড়ে, আর ব্যাখ্যা করে মানুষজনকে শোনায়। "…. মহাভারতের কতা অম্রুতের সমান। মুখে কই শেষ করা যাবেনি তার গুণ। ভারত পড়লে জ্ঞান বিরিদ্ধি হয়, বল বিরিদ্ধি হয়। মহাপাপ খণ্ডন হয়। পরকালে পার পায় মনিস। এমনে কি বাঁজি মাইয়া-উ যদি মন দি ভারত শুনে একমাস, তাইলে ছেলা হবে তার।…."

তৃতীয়জন হলো সরমাবুড়ি। "….. ছানা চুরি যাওয়া কুক্কুরীর মতন নিছক জৈব যন্ত্রণায় পরের বাচ্চাকে কেবল দুধ দিয়েছে জেলেপাড়ার কালো গাই সরমা ভোলেনি। মায়ের কাজ করছে। কিন্তু মা হয়নি তাদের। ….." শুধু তাই নয় গ্রামের পুরুষরা যখন বারদরিয়ায় মাছ ধরতে যায় তখন বউড়িরা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা ঘুরে ঘুরে দেখে। "ঘরে ঘরে ঘুরে সরমাবুড়ি টহল দিচ্ছে আজ। তার চোখকে ফাঁকি দেবার সাধ্য কারোর নেই। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি দেখলেই হুলুস্থুলু কান্ড বাধিয়ে বসবে বুড়ি। হয়ত ফের একবার চান করতে বাধ্য করাবে। ….."

এছাড়া ফুলি, হারাধন মাঝি, নিরঞ্জন, চন্দন, রাণি প্রভৃতি চরিত্রগুলো নিজের নিজের গুণে চিত্রিত হয়ে উপন্যাসকে চরম উৎকর্ষের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

জালের ব্যবহার — উপন্যাসে ছানিজাল, খেইজাল, ধাইজাল, সারানিজাল ও সাবাড়জালের উল্লেখ করেছেন লেখক। শুধু তাই নয় কোন ধরণের জাল কারা কিভাবে কোথায় ব্যবহার করেন তা উল্লেখ করে পাঠকদের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

ছানিজাল — "জেলে পাড়ার আইবুড়ো মেয়ে মাত্রই গরু চরাতে বেরোয়। ছানিজাল নিয়ে মাছ ধরতে যায় তে-বাঁকি খালে।…."

খেইজাল — "সুবল এখনও মুক্তামাছ খুঁজতে বেরোয়। ইতিমধ্যে ছোট্ট একটা মাছ ধরা ডিঙি তৈরি করিয়ে নিয়েছে সে। এখন সে দাঁড় বাইতে চোস্ত। তেমন কোনো জ্যোৎস্না রাত পেলে খেইজাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে একা একা।…."

ধাইজাল — "এক পা হারিয়ে ন্যাংড়া নৃপতি দোলায় বসে থাকে এখন, জাল বোনে, কলকে টানে। তার বউ রাধা, মিদাদের সরমা বুড়ির সঙ্গে এবেলা-ওবেলা তে-বাঁকি খালে যায়। ধাইজাল টানে।…."

সারানিজাল, সাবাড়জাল — "সমুদ্রের ভিতায় সারানিজাল ছেড়ে সুবল মাঝির এবার সাবাড়জালে ভাগ নেওয়ারকারণ ওই একটাই — টাকা। ….. সাবাড়জালে খাটুনি নেই তেমন। বারদরিয়ায় নৌকাবাস যা কেবল। সারা মরসুমে মাছ কেটে ক-বার ? বড়জোর দু-একবার। তাতেই ঢের। তাতেই হাজারকে বেজার।"

"শুরু হল মাছমারি উৎসব, আশি হাত খাড়াই জালের রশি ছেড়ে দিল জেলেরা। চারখানা নৌকা রইল জাল নিয়ে পেছনে। দু-খানা নৌকা সামনে এগিয়ে গেল লগি পিটতে পিটতে। বিরাট মাছের ঝাঁক থেকে লগি পিটে আলগা করে আনা হল ছোট্ট একটা টুকরা

যার বেড় বড় জোর একটা খেই জালের মতন হবে। .....যতটুকু ঘিরে নিয়েছে তারা, তাতেই হবে কয়েক হাজার মণ। সেইটুকু মারতে পারলেই লখা পাল রাজা।”

এইভাবে জাল ও জাল নিয়ে কারবারী লোকদের কথা এখানে বলা হয়েছে।

সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া তো দূরের কথা, সমুদ্রের বড়ো বড়ো ঢেউ আর গর্জন আমাদের হাত-পা ঠান্ডা করে দেয়। আবার কিছু মানুষের উন্মাদনা জাগায়। জীবন বাজী রেখে তারা সমুদ্রে পাড়ি দেয় মাছ শিকারে। বারদরিয়ার ‘মাছমারি উৎসব’-এ তারা মেতে ওঠে। সেইসব মানুষদের অনেক অজানা তথ্য নিয়ে ‘মুক্তামাছ’ উপন্যাসটি আমাদের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. সন্তোষ কর, ‘মুক্তামাছ’, দিঘলপত্র, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২১ শে এপ্রিল ২০১৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : ‘বাংলা সমালোচনার ইতিহাস’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথমসংস্করণ, ১৯৬৫।

২. বসু, সুদীপ : বাংলা সহিত্যে সমালোচনার ধারা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭।

৩. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার : শিল্পদর্শন ও সাহিত্য সমালোচনা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা,প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৫।

৪. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩।

৫. বসু, শুদ্ধসত্ত্ব : ‘বাংলা সাহিত্যের নানারূপ’, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৫।

৬. দাশ, শ্রীশচন্দ্র : সাহিত্য-সন্দর্শন, চক্রবর্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, লিঃ এবং দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং,লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৭।

৭. ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র : ‘সাহিত্য ও পাঠক’, বামা পুস্তকালয় ও পুস্তক বিপণি।

৮. মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার : সাহিত্য-বিবেক, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬।

৯. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন : সাহিত্য-প্রকরণ, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৪০২।

১০. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল : সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫।

১১. রায়, নীহাররঞ্জন : রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৮।

১২. মিশ্র, অশোককুমার : সাহিত্যের রূপ-রীতি কোষ, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৪।

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৪।

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৩।

১৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০২।

১৬. সিংহ, অমিত : বাংলা উপন্যাসে সমাজ চিন্তার বিবর্তন, গ্রন্থমেলা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৩।

১৭. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০০।

১৮. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার : একালের প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা,প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩।

১৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে — বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪।

২০. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৪।

২১. ভট্টাচার্য, সত্যপ্রসাদ : বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৪।

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (প্রধান সম্পাদক), বিষয় ঃ প্রবন্ধ, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০।

প্রাবন্ধিক আনিসুজ্জামানের মনস্বিতায়, মাঙ্গলিক চেতনায়- মুসলিম মানস দর্শন ও বাংলা সাহিত্যে তার সাঙ্গীকরণ

আর্পিতা দাস
গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃতিচর্চায়, ইতিহাস অন্বেষণের তাড়নায় বাঙালীর জাতীয় জীবনকে,তার ঐতিহ্য উত্থান বিপুল পৃথিবীর বিপুল ভালোবাসার বাতিঘর আনিসুজ্জামানের সাহিত্য। প্রজ্ঞাসাধনার গভীরতায় মননের আন্তরিকতায় যাঁর বাঙালি বিবেক সদা জাগ্রত।যিনি এক জীবনে সাহিত্যের উত্থান-পতনের হৃদস্পন্দনকে বক্তব্যের সত্যতায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন,ভাষা আন্দোলনের শরীক যিনি,৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যাঁর ভূমিকা অনন্য,নানা সামাজিক আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকায় থেকে যে ব্যক্তিপুরুষ বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে বরাবর প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করার সাহস রাখেন,ধর্মীয় গন্ডীর সংকীর্ণতার উর্দ্ধে যাঁর কলম সাহিত্য রচনায়, ইতিহাস রচনায় নির্মোহভাবে সত্যতেই আস্থা রেখেছে-- তিনি গবেষক, অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক আনিসুজ্জামান।

বাংলাদেশের সাহিত্য বললে যে খুদ্রভাব দ্বারা সাহিত্যকে সীমিত করা হবে তাকে অস্বীকার করেই বলতে হয়,আনিসুজ্জামান তাঁর সমাজ দর্শনে,মনস্বীতায়,বিদগ্ধতায় আধুনিক সময়ের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের মধ্যে অন্যতম।তাঁর লেখা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষতবিক্ষত সময় গহ্বরে।যাঁরা সে ক্রান্তিকালের প্রহরে স্বাধীনতার জন্য রক্ত ঝরিয়েছিলেন,যাঁরা জাতি-ধর্মের উর্দ্ধে গিয়েহাতে করে বুনেছিলেন স্বাধীনতার বুকভরা স্বপ্নকে, তাঁদের মধ্যে আনিসুজ্জামান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছেন ষাটের দশকের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতেরপ্রগতি-আন্দোলন,যা একসময় আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় হয়ে উঠেছিল বাংলা সংস্কৃতি বাঁচানোর আন্দোলন,আনিসুজ্জামানের সাহিত্য সেই বিক্ষুব্ধ দিনের বিশ্বস্থ সাক্ষী। যার নৈর্ব্যক্তিক দলিল উঠে এসেছে তাঁর আত্মজীবনী থেকে শুরু করে সাহিত্যের নানা ধারাপ্রবাহে।এরই পাশাপাশি তিনি গবেষকের নির্মোহ দৃষ্টিতে গবেষণা করেছেন কতোগুলি বিষয়কে আশ্রয় করে,যার প্রধান ছিলো বাঙালি সত্তার বিবর্তন ও তার বিকাশের দিক।বিশেষত মুসলমান বাঙালি সত্তার উদ্ভব, তাঁর বিকাশ, বাঙালি সংস্কৃতির সাথে ঐক্যে সাযুজ্যে তার বিবর্তনের ধারাবাহিকতা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়তাঁর এই গবেষণা অবধারিত ভাবে সীমাবদ্ধ থাকেনি শুধু সাহিত্যে, তাকে তিনি বিস্তৃতকরেছেন ইতিহাস,সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং সমাজতত্ত্বেরপ্রান্তে-প্রত্যন্তে।

আমরা জানি,পরাধীন ভারতে মুসলমানরা ছিল দুই নিয়ন্ত্রণাধীন শক্তির অধীনে।প্রথমটি ইংরেজ ওদ্বিতীয়টি তাদের জাতিগত ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন

সময়ে।ইংরেজ শাসনের সঙ্গেনিজেদের মানিয়ে নিতে না পারায় একদিকে শিক্ষায় সাংস্কৃতিক উন্নয়নে পিছিয়েছে তারা অন্যদিকে জাতিগত ইতিহাসে ধর্মীয় অন্ধানুগত্যে আত্মসমর্পন করায় বর্তমানের পরিবর্তে আতীতের দিকে গেছে সম্প্রদায়টি।কিন্তু বাংলার মুসলমানরা এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করেও নিজেদের আত্মপ্রকাশ করেছেন,বাঙালি সংস্কৃতি অর্জনের গর্বে নয়,উন্নত সংস্কৃতিকে আপনতার মহিমায় বলিষ্ঠ নির্মানের দাবিতে।তাদের এই জাগরণের পটভূমিকাতেই জোড়ালো আলো ফেলেছেন সাহিত্যিক আনিসুজ্জামান।তিনি মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখেছেনই নয়,তাকে বিচার করেছেন।তার অধোগতি উচ্চগতির স্পন্দনকে পাঠকরেছেন সাহিত্যে,ইতিহাসে, সমাজতত্ত্বে ও আত্মজীবনীর আত্মসমীক্ষায়।সত্যদ্রষ্টার চোখে তিনি মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতি, তার অন্তঃসলীল মননের, গভীর অভিবেদ্য অনুভূতির শিল্প রচনা করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে আনিসুজ্জামানের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মানস দর্শনের রূপটি তারই প্রজ্ঞার ধারাপ্রবাহে দাঁড়িয়ে আমরা আবিষ্কার করবো। সবার প্রথমে বলা প্রয়োজন আনিসুজ্জামানের মুসলিম মানসদর্শন মুসলিম চেতনার নির্মান নয় বরং তা মুসলিম সত্তার সার্থক বাঙালি সত্তায় বিনির্মান।বাঙালি সত্তার সম্পূর্ণতা মুসলিম সত্তার বাঙালিত্বের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েই।মুসলিম জাতির সৃজনশীলতার কথা বলতে গিয়ে তিনি – এই জাতির অনগ্রসরতা,কি কারণে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার প্রতি তাদের অনাগ্রহ,বিশেষত কেনো ইংরেজ রাজত্বে থাকাকালীন ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শ থেকেতারা দূরে থেকে গেল, একই ভুখণ্ডে থেকে কেনো হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের বিভাজন রেখা কোনোদিন মিটলোনা এমন বিতর্কিত প্রশ্নের প্রাঞ্জল উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ‘মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য’গ্রন্থে লিখেছেন --“মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আবদানে সমৃদ্ধ।এর তুলনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের পশ্চাৎপদতা বিষ্ময়কর।বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করেছেন১৮০০ থেকে১৮৬০খ্রিঃ পর্যন্ত অর্থাৎ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বে বাঙালি মুসলমান সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ক্রিয়।অথচ তাঁদের সাহিত্যানুরাগ বা সৃষ্টিক্ষমতা যে লোপ পায়নি,তার প্রমাণ আরবি ফার্সি শব্দবহুল কাব্যধারার মধ্যে পাওয়া যায়। ...বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কাব্য সাধনার ইতিহাসে এই কাব্যধারা মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে ঐতিহাসিক সূত্র রক্ষা করেছে মাত্র।”[১] আনিসুজ্জামান তার এই মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থে একদিকে যেমন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ওপর দৃষ্টিপাত করে প্রাগাধুনিক যুগের বাঙালি মুসলমানদের এই অবস্থার সংকটকে ব্যাখ্যা করেছেন অন্যপ্রান্তে প্রাগাধুনিক ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাবকেও বিশদে পর্যালোচনা করেছেন।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলত হিন্দু কবিদের লেখা ধর্মমূলক কাব্যের ইতিহাস।অথচ বাস্তবের সত্য এই যে, মধ্যযুগের বাংলায় কেবল হিন্দুরাই

সাহিত্য রচনা করেননি।মুসলমানরাও যথাসাধ্য লেখনীর পরিচয় দিয়েছেন। তাই স্বাধীনোত্তর ভারতের বাংলা সাহিত্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে গেলে হিন্দু কবিদের পাশাপাশি মুসলমান কবিদের রচনা বৃত্তান্তের পরিচয় নেওয়া জরুরি। তথ্যের প্রয়োজনে স্মর্তব্য যে, ত্রয়োদশ শতকের আগে মূর বণিকদের বাংলা নৌবন্দরগুলিতে ব্যবসা সূত্রে উপস্থিতি ঘটলেও তুর্কিবিজয়ের মধ্যে দিয়েই বাংলায় রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমানদের।এর পূর্বে অনেক আগে থেকেই ভারত তথা বাংলায় সংখ্যাধিক্য হিন্দুরা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে ছিলো।সেদিক থেকে মুসলিমরা অনেক বেশি পিছিয়ে ছিলো তাদের উগ্র ধর্মনীতির কারণে। সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পর্বে তাদের চন্ডমূর্তি ‘হয় ইসলাম বরণ অথবা মৃত্যু’-প্রবল পরধর্মবিদ্বেষী নীতি সংখাগুরু হিন্দুদের দলে দলে মুসলমান বানায়।ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে এছারাও অন্যতম প্রধান কারণ ছিলো হিন্দু উচ্চবর্ণের ধর্মীয় ও সামাজিক নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। যাই হোক,ধর্মান্তরীতকরণের বিভিন্ন কারণ ঘটলেও এই ইসলাম বিশ্বাসী মানুষের ভাষার ভিত্তি বাংলা, সংস্কৃতি তাদের বাঙালি। মাতৃভাষা বাংলার পাশে ছিলো শাস্ত্রভাষা আরবি এবং প্রশাসনিক ভাষা ফারসি।শিক্ষিত মুসলমানেরা সেইসময় এই তিনটি ভাষাতেই চোস্ত হতেন।বাংলাভাষারপ্রতিতাদেরযে আকর্ষণ ওদরদবোধছিলতার প্রকৃত প্রমাণ আছে।যারা বাংলা ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগে শ্লাঘা বোধ করতেন তাদের সেই উন্নাসিক মনোভাবকে পূর্ববঙ্গের কবি আব্দুল হাকিমতাঁর ‘চারি মোকাম ভেদ’ গ্রন্থেতীব্র ভাষায় সমালোচনা করে লিখেছেন-

“যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসা বঙ্গবাণি।/ সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।।/ দেসি ভাষা বিদ্যা জার মন না জয়াএ।/নিজ দেস তেয়াগি কেন বিদেশে না জাএ।।”

সেই সময় মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রতি দরদবোধ করেছিলেন তাঁরা বাংলা ভাষায়কাব্য রচনা করে এ সাহিত্যের সমৃদ্ধিকে আরও প্রসারিত করে দিয়েছিলেন।তাদের আরবি ফারসি অনুবাদের মধ্যে দিয়ে ভরে উঠেছিলো তখনকার বাংলা শব্দ ভাণ্ডার।

বাংলায় মুসলমান কবিদের প্রথম আত্মপ্রকাশ পঞ্চদশ শতকে।প্রাবন্ধিকের ভাষায়-- “চৈতন্যের প্রভাবে তার এবং তাঁর কোন কোন শিষ্য-শিষ্যাদের জীবনী রচনার দিক উন্মোচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে...ফার্সি ও হিন্দি –আওধী সাহিত্যের রোমান্টিক প্রনয়কাহিনির ভান্ডার থেকে রস আহরণ করে মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্যের রুচি বদল করেছিলেন।”[২] তবে এই ত্রয়োদশ-চতুর্দশশতাব্দীতে ব্যাপক হারে মুসলিম কবিবের দেখা মেলে নাতার প্রধান কারণ শিক্ষা।ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বেশিরভাগ এসেছিলেন হিন্দু সমাজের নীচু তলা থেকে ফলত জীবনসংগ্রামের তাড়না, সামাজিক নিষ্পেষণ তাদের প্রতিভা বিকাশের অবকাশই দেয়নি। এমনই প্রতিভা দৈনের দিনে পনেরো শতকে একজন মুসলমান কবিকে আবির্ভূত হতে দেখি।তিনি শাহ মুহম্মদ

সগীর।সগীরের 'ইউসুফ–জোলেখা' ধর্মনিরপেক্ষ বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্যের আদি নিদর্শন।এই জাতীয় রচনা সারাবাংলায় পূর্বে ছিলোনা।হিন্দু কবিদের রচিত বাংলা প্রণয় কাব্যের(জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)প্রেক্ষাপটকে স্মরণে রেখে মুসলমান কবিরা বাংলা রোমান্স কাব্যধারাকে মধ্যযুগের সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিস্রোত রূপে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।এইধারা, পূর্বাগত সমগ্র ধর্মীয় সংস্কারকে বর্জন করেনির্ভেজাল মানুষকে, তার জীবনসত্যকে সাহিত্যে প্রধাণ উপজীব্য করে তুললো।প্রাবন্ধিক আনিসুজ্জামান পঞ্চদশ শতকের আরওএকজন কবির কথা বলেছেন।তিনি 'রসুল বিজয়ের' প্রণেতা কবি জৈনুদ্দিন। এই কাব্যে গৌড়ের সুলতান য়ুসুফ শাহের প্রশংসা আছে। কাব্যটি হজরত মুহম্মদ কর্তৃক ইসলাম ধর্ম প্রচারের বিজয়াত্মক কাহিনি হলেও ধর্মের ঊর্দ্ধে এই কাব্যেও চিরন্তন মানবজীবনের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

ষোড়শ শতক হল মুসলমান সাহিত্য চর্চার দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পর্ব।এইশতকেযাঁদের নাম বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁদের অন্যতম সাবিরিদ খান,শেখ কবীর,দৌলত উজির বাহরাম খান,শেখ ফয়জুল্লাহ,আফজল আলি,হাজি মুহম্মদ,মুজাম্মিল ও দোনা গাজী চৌধুরী প্রমুখ। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইসলামি সাহিত্যের নতুন সূর্যদ্বয় সেদিন সম্ভবপর হয়েছিল।এই সময়কাল প্রসঙ্গে আনুসুজ্জামান লিখছেন--"মুঘল আমলে উত্তর ভারতের সঙ্গে ইরানী বাস্তুত্যাগীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে বাংলায় বহু ধর্মনেতা ও পীর ফকীর দেখা দেন......উগ্রতা কিংবা আলৌকিকতা অথবা বাস্তব লাভালাভ দেখিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার যে ইতিঃপূর্বেই শুরু হয়েছিলো,তা এবারে ব্যাপক আকার ধারণ করলো।ধর্মশাস্ত্রের আনুবাদ-আনুসরণ,ইতিহাসের পটে কাফের-দলন কাহিনি, পীরের কাছে দেবদেবীর পরাজয় ও পীরের প্রতিষ্ঠালাভের উপাখ্যান বাংলায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।তবু তাঁরা হয়তো জানতেন যে,জেহাদী মনভাবটাই মানবচিত্তের একমাত্র বৃত্তি নয়,তাই সুকুমার অনুভূতির চাহিদা মেটাতে ধর্মের মোড়ক দেওয়া প্রণয় কাহিনিও রচিত হল।"[৩]তাঁর এই স্পষ্ট উক্তি ধন্দের অবসান করে বাংলা প্রণয় উপাখ্যান সৃষ্টির প্রধান কারণকে।যাইহোক,এই পর্বে বেশ কয়েকজন মুসলিম কবিকে আমরা দেখলাম যাঁদের লেখায় ইসলামি সুফিতত্ত্বের প্রকাশ দেখা দিল বাংলা সাহিত্যের বলিষ্ঠধারা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে।এঁদের রচনা বিশুদ্ধ প্রনয়মূলক হলেও তাতে ধর্ম সম্পৃক্ততা ছিলো।এই ধারাকে পরিপুষ্ট করেন দৌলত উজির বাহরাম খান এর 'লায়লা-মজনু' এবং দোনা গাজী চৌধুরীর 'সয়ফলমূলকবদিউজ্জামান' কাব্যদুটি।

ষোড়শ শতকেই বাংলা সাহিত্যের অপর এক ধারার জন্ম হয়।যার কেন্দ্রও একইভাবে ইসলামি ধর্মসাধনার আশ্রয়ে লালিত।সেটি হল নাথ সাহিত্যের ধারা। নাথ গুরু গোরক্ষনাথের নামে 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন' নামে অনেকগুলিই বই সেইসময় লেখা হয়।যার একটির রচইতা শেখ ফয়জুল্লা।তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি-

গোরক্ষবিজয়,গাজীবিজয়,সত্যপীর জয়নাবের চৌতিশা আর রাগনামা।এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য নাথ সাহিত্যের অপর ধারা ময়নামতী বৃত্তের কাহিনি ‘গোপীচাঁদের সন্ন্যাস’ লিখেছিলেন সুকুর মামুদ।তাঁর গ্রন্থটি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

ষোড়শ শতকের গন্ডী পেরিয়ে সতেরো শতকে গিয়ে দাঁড়ালে প্রণয়কাব্যের ধারায় বিখ্যাত ও প্রতিভাশালীক’জন কবির সম্মুখীন হই আমরা।এঁরা হলেন রোসাঙ রাজসভার কবি সৈয়দ আলাওল ও দৌলত কাজী।এইসময় মুসলিম সমাজে শিক্ষিত কবি প্রতিভার অভাব ছিলোনা।তাঁরা এইসময় আরবি ফারসি বা ভারতীয় ভাষায় প্রেমকাব্যগুলি অনুবাদে তৎপর হয়েছিলেন। এঁদের অবলম্বিত কাহিনিতে মানবিক প্রেম,নরনারীর বাস্তবিক রূপসৌন্দর্য্য,প্রেমিকাকে পাওয়ার দুঃসাহসিক অভিযান,ইত্যাদি মটিফ পৌণঃপুণিক ভাবে আবৃত হয়েছে।এই সময় উত্তর ভারতে উর্দু ভাষা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে এবং আমাদের দেশেও তার প্রভাব দেখা দেয়, যার ফলে বহু ফার্সি হিন্দি শব্দ বাংলাভাষায় প্রবেশ করে এবং ফার্সি ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এই কারণে এইসময় আলাওলের আরও দুটি ফার্সি অনুবাদ আমরা পাই ‘সেকেন্দর্‌নামা’ ও অন্যটি ‘তোহফা’। আরাকান রাজ সাদ উমাদার (থদো মন্তোর)-এর নির্দেশে মাগন ঠাকুর লেখেনপ্রেমকাব্য ‘চন্দ্রাবতী’।সৈয়দ আলাওল লেখেন ‘পদ্মাবতী’র মতো জনপ্রিয় কাব্য।সতেরো শতকে মুসলমান কবিদের লেখা এমন অনেক প্রণয়কাব্য আছে যাদের মূলসুর মোটামুটি একই। তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের গভীর প্রভাব উঠে এসেছে তাদের লেখাগুলিতে যেমন-- ‘গুলেবকাওলি’, ‘লালমতি’, ‘সয়ফুলমুলুক’, ‘শাহজালাল-মধুমালা’, ‘মৃগাবতী’ প্রমুখ অসংখ্য প্রণয়কাব্য। আরও একজন প্রতিভাবান কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর ‘নবীবংশ’, ‘রসুলচরিত’, ‘ইবলিসনামা’ প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও সেই সময়কার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শন।

অষ্টাদশ শতক বাংলায় হিন্দু মানসে মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে একটা নিকট সম্পর্ক তৈরী করলো।বাংলারমানুষ যাঁরা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং মুসলমান যাঁরা বিদেশী সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে এসেছিলেন বাংলার লৌকিক প্রভাব তারা এড়াতে পারলেন না।প্রাবন্ধিকের ভাষায়- “বাঙালি মুসলমান যেমন নানারকম হিন্দু আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছিলেন, হিন্দুরাও তেমনি মসজিদ ও পীরের দরগাহে সিরনি দিতেন।”[৪]তবে প্রাবন্ধিক এ কথাও বলছেন-“হিন্দু পুরান-পাচাঁলীর প্রভাবে মুসলিম মানসে একটা প্রতিক্রিয়া জেগেছিল।ফলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য অনেকেই ভিতর ভিতর উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন...তাই উগ্রতা কিংবা অলৌকিকতা অথবা বাস্তব লাভালাভি দেখিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রচেষ্টা ইতিঃপূর্বে শুরু হয়েছিলো তা এবারে ব্যাপক আকার ধারণ করলো।”[৫] অষ্টাদশ শতকে সাহিত্যের

ক্ষেত্রে এই টানাপোড়েনেরফলে বিপুল সমৃদ্ধ ইসলামি সাহিত্যের ভাঙন ধরেছিলো। একই বিষয়ের চর্বিতচর্বন হয়ে উঠেছিলো এই সময়ের লেখা। যার অন্যতম প্রধান কারণ আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাংলা রাজনীতিতে লর্ড ক্লাইভের হাত ধরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান যার দ্বারা ব্রিটিশ শাসনের ক্ষেত্র পাকা হয়ে উঠেছিলো।এর আগে ঘটেগেছে মারাঠা বর্গীদের নির্মম অত্যাচারের পর্ব।প্রাবন্ধিকের ভাষায়-“অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে আমাদের সমাজ জীবনে যে অবক্ষয়দেখা দিয়েছিল...মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে তার সুস্পষ্ট ছাপ আছে।এর মধ্যে যে প্রধান লক্ষণগুলি আছে-- যেমন বাস্তব জীবন থেকে সরে থাকার প্রচেষ্টা,আদর্শবাদের অভাব,সমকালীন জীবনের সাথে পূণাঙ্গ বিচ্ছেদ,নারীর সৌন্দর্যের স্তুতি সত্ত্বেও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা-এর সব কিছুই ক্ষয়িষ্ণু সমাজভুক্ত মানুষের মানসিকতার ফল...।ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ আবেগ ও অনুভূতি অনেক সময়ে আজগুবি,বিকৃত ও মৌলিক ধর্মবিরোধী রূপ পরিগ্রহ করেছে।”[৬]

এরই ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলমান কবিরা তাদের সাহিত্যে ভাষাভঙ্গিতে আনলেন পরিবর্তন। শুরু হল দোভাষী পুথির যুগ।আরবি-ফার্সি-তুর্কি-উর্দু-হিন্দি ভাষার মিশ্রণে মুসলিম মানসের উপযোগী করে দোভাষী সাহিত্য রচিত হতে থাকলো।যাকে ড. মুহম্মদশহীদুল্লাহ স্পষ্টত ‘মুসলমানীভাষা’ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। আঠেরো শতকে এই দোভাষী রীতির কবি বলতে দুজন কবি খুবই স্মরণীয়।এঁরা হলেন ফকির গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা।গরীবুল্লাহের মোট পাঁচটি পুথি পাওয়া যায়- ‘সোনাভান’, ‘আমির হামজা’, ‘ইউসুফ জোলেখা’, ‘মদন-কামদেব পালা’ ও ‘হোসেন মঙ্গল’। অন্যদিকে সৈয়দ হামজা ফকীর গরীবুল্লাহকে কাব্যগুরু রূপে বরণ করে সাহিত্য জগতে পদার্পন করলেন।তাঁর প্রথম লেখা ‘মধুমালতী উপাখ্যান’ কাব্যটি দোভাষী না হলেও তা হিন্দি কবি মনঝনের ‘মধুমালত্’ দ্বারা প্রভাবিত।এছাড়া শাকের মামুদ এর ‘মনহর মধুমালতী’ কাব্য আমরা পাই।ভাবগত দৈন্য সত্ত্বেও মিশ্র ভাষারীতির এই কাব্যগুলিতে কখনো কখনো উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়েছে।শুধুতাইনয়, হিন্দু মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব ও সমন্বয়ের আভাস ও মেলে এই দোভাষী বা মিশ্রভাষা রীতির কাব্যগুলিতে।যেমন-‘সত্যপীরের পুথি’, ‘গাজীকালু’ ও ‘চম্পাবতী’ কাব্যযেখানে দুই সম্প্রদায়ের আপাত বিরোধের অন্তরালে ধর্মবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ মিলনের পরিচিয় ফুটে উঠেছে।হিন্দুর সত্যনারায়ণ সত্যপীরে পরিণত হয়েছে।ড.আনিসুজ্জামান তাইগরীবুল্লাহের কাব্যকৃতির মুল্যায়ন করতে গিয়ে যথাযথ লিখেছেন-“কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা তাঁর ছিল,কিন্তু লোকরঞ্জন ছিল তাঁর আশু লক্ষ্য।তাই গরীবুল্লাহ জনপ্রিয় হলেন,কিন্তু একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হতে পারলেন না।”[৭]এদেরমতো খ্যাতি অর্জনে অসমর্থ হলেও আঠারো শতকে আমরা পেলাম-মুহম্মদ উজির আলির ‘সায়াটনামা’,আলিরাজার ‘সিরাজকুলুব’,সৈয়দ সুরউদ্দিনের ‘কেয়ামতনামা’ হায়াৎ মামুদের ‘জংগ্নামা’প্রভৃতি কাব্যগুলিকে।যাঁরা হিন্দু কবিদের সমকক্ষতায় নিজেদের ধর্মসম্প্রদায়কে পরিপুষ্টির লক্ষে কাব্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এতো দ্বন্দ্ব

বৈপরীত্যের মধ্যেওতাঁদের আত্মনিয়োগ বাংলা সাহিত্যের প্রাগাধুনিক ভান্ডারে যে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিল তা বলাই বাহুল্য।

১৮৭০ থেকে ১৯১৮ খ্রিঃ বাংলা মুসলমান সাহিত্যের আধুনিক যুগ।আমাদের মনে রাখতে হবে মুসলমানরা আধুনিক সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন সেই সময়ে,যখন ছিলো হিন্দু পুনর্জাগরণের যুগ।ফলত হিন্দু ঐতিহ্য গর্বের দম্ভে সেই সময় ব্যপকভাবে মুসলিম বিদ্বেষী মনভাবের জন্ম নেয়।যার ফলস্বরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া জেগেছিল মুসলমানদের মনেও।এর ফলে একসময় হিন্দু মুসলমান বিরোধী সংস্কৃতির চর্চা শুরু হলো। তারা হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে থাকল। ফলত আধুনিক রাজনৈতিক,সামাজিক অবস্থানে থেকেও তাঁদের লেখায় বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হল তাদের সমাজ ও সম্প্রদায় সম্পর্কে অনুভূতি।কখনো সমসাময়িক জীবন থেকে প্রভাবিত হলেও ইসলামের ঐতিহ্য ও ধর্মীয়পন্থা থেকে তারা প্রেরণালাভ করলো।

উনিশ শতকের এই পর্বে আমরা পেলাম ফার্সি কাব্য 'কিস্সা-ই চাহার দরবেশ' এর উর্দু রূপান্তর মীর আম্মান এর 'বাগ ও বাহার' গ্রন্থটি।মুহম্মদ দানেশের 'চাহার দরবেশ', নেহালচন্দের 'মঝহব-ই ইশাক', এরাদত আলির 'গোলে বকাওলী', কামরুদ্দীনের 'বেনজিরবদরে-মুনির' প্রমুখ অনুবাদ সাহিত্যকে।এই সময় হিন্দু লেখকেরাও বহু উর্দু কাহিনি ও ফার্সি কাহিনির বাংলা আনুবাদ করেছেন যেমন – চন্ডীচরণ মুনশীর 'তোতা ইতিহাস'(১৮০৫),গিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমনি বসাকের 'পারস্যইতিহাস' (১৮৩৪), উমাচরণ মিত্রের 'গোলেবকাওলি ইতিহাস' (১৮৪৩) প্রমুখ। একদিকে নবাবি আমলের পতন ও অন্যদিকে কোম্পানির শাসনের অভ্যুদ্বয়ের ফলে বিশ শতকের কাব্য রচনার ধারায় গতানুগতিক বিষয়ের অনুসরণ ছাড়া এইসকল সাহিত্যিকেরা কোনো নতুনত্বের সন্ধান দিতে পারলেন না।

এই গতানুগতিকতার কারণগুলিকে আনিসুজ্জামান চিহ্নিত করেছেন তাঁর লেখায়।তিনি বলেছেন-

ক. বাস্তব জীবন থেকে সরে থাকার চেষ্টা...ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পনের মধ্যে বর্তমান থেকে পালিয়ে থাকার আশ্রয় মেলে।

খ. আধুনিক ইংরেজী ও যুক্তিনির্ভর শিক্ষার আলো থেকে সরে দাঁড়ানোর মানসিকতা।

গ. আদর্শবাদের অভাব।জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।

ঘ . সমকালীন জীবনের সাথে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ।

মূলত এই কারণগুলির জন্যে উনিশ শতকের আধুনিক মননকে সাহিত্যের বা গদ্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে তাদের এতো বিলম্ব হয়েছিল।

এইপর্বে আমরা সেইসময়কার গদ্যকারদের কথা বলবো যাঁদের লেখনীতে প্রথম আধুনিতার আনুসরণ ঘটলো।যেমন- খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীর রচিত

'ভাবলাভ কাব্য', ওগদ্য 'উচিৎ শ্রবণ', আবদর রহিম রচিত 'প্রেমলীলা' ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর 'রূপজালাল' গদ্য, ,গোলাম হোসেনের 'হাড় জ্বালানী' নাটক যেখানে উনিশ শতকের বাংলার বিশ্বস্ত মানচিত্রের প্রকাশ মিলবে।

পাশাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে মানসিক উৎকর্ষ ও তার প্রস্তুতি বাঙালি মুসলমান সমাজে অনেক পরে আসলেও তার আলোড়ন থেকে তারা পৃথক থাকতে পারেনি।তাই একালের মুসলমান লেখকেরা ভাল সাহিত্য সৃষ্টি করলেন।আধুনিক সময়ের দাবিকে তারা নবভাষ্যে নবরূপ দিলেন বাংলাসাহিত্যে।যার ফলে বাংলাদেশের সাহিত্য আর 'মুসলমানের সাহিত্য' নামক সংকীর্ণ গন্ডিতে আবধ্য থাকলো না।তা হয়ে উঠল সর্বজনীন।যাঁর বলিষ্ঠ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আনিসুজ্জামানের সাহিত্য। তাঁর সাহিত্যের বলিষ্ঠ বক্তব্য, বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিপারম্পর্য বোধ, পাঠক চিত্তে বাংলাসাহিত্যের প্রতিদায়বদ্ধতা, প্রাবন্ধিকের নৈর্ব্যক্তিক বিচারের সাযুজ্যে,সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরদৃষ্টিকে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এই প্রেক্ষিতেবাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমানকবিদের অবদানের যথাযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাতাঁর সাহিত্যকে যে সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা দিয়েছে তা এককথায় অনস্বীকার্য।

উৎসেরসন্ধানে:

১. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম- মানস ও বাংল সাহিত্য', ঢাকা, বাংলাদেশ, চারুলিপি, ফাল্গুন ১৪১৮, পৃ. ১৫৪

২. তদেব: পৃ. ১৬৯

৩. তদেব: পৃ. ২৩৪

৪. আনিসুজ্জামান, ঢাকা, বাংলাদেশ, 'বিপুলা পৃথিবী' প্রথমা প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২১, পৃ. ৩২৫

৫. তদেব: পৃ. ৩৫৪

৬. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য', পৃ ৪২২.

৭. দীনেশ চন্দ্র সেন, 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান', মখদুমী লাইব্রেরী এণ্ড আহছানউল্লা বুক হউস লিমিটেড,ঢাকা,বাংলাদেশ,প্রথম প্রকাশ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ

গল্পকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্প : কিছু কথা

বিশ্বজিৎ পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলেজ

সারসংক্ষেপ : প্রায় ১০০ খানি বাংলা উপন্যাস এবং বাংলা ছোটগল্প উপহার দিয়েও বাংলা সাহিত্য মহলের আলোকিত বৃত্তের প্রায় বাইরেই থেকে গেছেন কথাসাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০, ৭ই সেপ্টেম্বর – ১৯৮৯, ৪ই মে)। তাঁর অনেক গল্প এবং উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে বাংলা ও হিন্দী চলচিত্র জগতের অনেক কালজয়ী চলচিত্র নির্মিত হয়েছে। আশুতোষ-বাবুর প্রথম গল্প 'নার্স মিত্র' নিয়ে নির্মিত হয়েছে 'দীপ জ্বেলে যাই'। 'সন্দেশ' গল্প থেকে 'শঙ্খবেলা', 'চলাচল' থেকে 'সফর' (হিন্দী), 'আমি সে ও সখা' থেকে 'বেমিসল' (হিন্দী), 'সাত পাকে বাধা' থেকে নির্মিত হয়েছে 'কোরা কাগজ' (হিন্দী) ইত্যাদি নানা চলচিত্র। সুতরাং তাঁর কাহিনীর ঘটনা প্রবাহ নিয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকে না। বিষয় নির্বাচন নিয়েও কোন বিতর্ক নেই। কেবল কাহিনীর বর্ণনারীতিতে সংঘবদ্ধতার কিঞ্চিৎ অভাব। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি যেমন 'প্রথমা', 'দ্বীপ', 'রিষ্টি', 'মস্তি', 'ঠাকুমার ঝুলি', 'মহাবিহার', 'সন্দেশ', 'দুধ', 'তপ', 'যৌবন', 'ব্যক্তিত্ব', ইত্যাদি গল্পগুলি আলোচনার মাধ্যমে তাঁর গল্প রচনার প্রতিভা সম্পর্কে দু-এক কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি আমার এই প্রবন্ধে।

শব্দবন্ধন: অন্তর্বেদনা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার, আবেগময়তা, মত্ততা, সংযম, অপারেশন, বিড়ম্বিত দাম্পত্য, সামাজিক সমস্যা, অভাব, মানবতা, হতভম্ব, ব্যক্তিত্ব, তপস্যা, বিলাসিতা, সংগ্রহশালা, দায়িত্ব ইত্যাদি।

প্রতিপাদ্য বিষয় : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্প শাখার পরিচিত কোন নাম নয়। সব শিল্পীই যে যথার্থ পরিচিতি পাবেন – এমনও নয়। আবেগঘন বিষয় নির্বাচনের পাশাপাশি ভারহীন গদ্যের ব্যবহারে গল্পগুলিকে সর্বজনবোধ্য করে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তাঁর গল্পে। H. G. Wells –এর মতে ছোটগল্প দশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। হাডসন অবশ্য এই সীমাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে বলেছেন –'A short story is a story that can be easily read at a single siting'. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথমা' গল্পখানি Single sitting গল্প বটে। গল্পখানির বিষয়বস্তু নিয়ে সমালোচনা সৃষ্টির আগেই বলে রাখছি – পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার চেখভ মনে করতেন যেকোন বিষয় এমনকি অ্যাশ-ট্রে নিয়েও ছোটগল্প লেখা যেতে পারে।

'প্রথমা' গল্পখানি একান্নবর্তী পরিবারের জনৈক অংশী সদস্যের বরাদ্দ সংসার খরচ জোগাড় করার নাভিশ্বাস ওঠা কাহিনী। এই সূত্রে কাহিনীতে জন্ম নেয় দাম্পত্য

কলহ। সপ্রগলভ, মারমুখী স্ত্রীর সামনে তাই সংকুচিত হয়ে থাকতে হয় সর্বদা। টোটকা ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখে বা অপ্রথিতযশা লেখকদের লেখা থেকে আয় সহজ কথা নয়। তাই প্রায়ই প্রকাশকের গালমন্দ খেতে হয়। এই যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি পেতে সুপারিশ মারফত জোগাড় করতে হয় মাদ্রাজ প্রভিন্সের সেলস্ অর্গানাইজারের চাকরী। কিন্তু এমন অনভ্যস্ত 'দালালি'র চাকুরীর সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠতে বইয়ের আলমারীর সঙ্গে তার বলপূর্বক বিচ্ছেদ-সূত্র নির্মাণ করতে হয়। সৃষ্টি যার কাছে সন্তানতুল্য ছিল তাকে সেই সাহিত্য সৃষ্টির জগৎ থেকে আত্মনির্বাসিত হওয়া যে কতখানি কষ্টের তা ক্রমে অনুভব করে স্ত্রী। বিভুঁই দেশে চাকরীতে যাওয়া থেকে নিরত করে পুনরায় সাহিত্যচর্চার জগতে তাকে টেনে আনে স্ত্রী। আর তাতেই –

> 'নীলমণির গলির দেয়ালের ওধারে একফালি আকাশ দেখা যায়। চেয়ে থাকি। হঠাৎ সচকিত হয়ে অনুভব করি দুগল বেয়ে ধারা নেমেছে। শশব্যস্তে মুছে ফেলি। ফিরে দেখি হাসি হাসছে মিটি মিটি।'১

'দ্বীপ' গল্পখানি বিশ্বাসভঙ্গের গল্প। সমুদ্রের বুকের প্রবাল দ্বীপের আদিম মানুষগুলি যারা সমুদ্রের মতোই উন্মুক্ত, উচ্ছল, উদ্দাম – তাদের সহজ বিশ্বাসকে হরণ করে নিজেদের রিরংসা পূরণের গল্প এটি। অতিথিদের আনন্দের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে, তাদের ভোগের আয়োজনে মুখ ফিরিয়ে না থেকে নিজেদের উজাড় করে দিয়ে তারা আজ যুগ-যুগান্তের যৌন ব্যধিগ্রস্থ নারী। সভ্য জগতের মানুষের প্রতি সম্ভ্রমে আর তাদের থেকে আলোর লোভে এরা পতঙ্গের মতো পুড়েছে। দ্বীপের মেয়ে ববির জীবনে কলকাতা-নিবাসী দেহযন্ত্র-রসিক দত্তবাবু এসেছিলেন। পোর্টব্লেয়ার থেকে ব্যসায়িক সূত্রে কার-নিকোবরের এই দ্বীপে যাতায়াত করতে করতেই তার নজরে এসেছিল আদিবাসী সর্দার-কন্যা ববিকে। ববির প্রণয়প্রার্থী অনেক আদিবাসী মরদ-যুবক ছিল। পিতা তাদের মধ্যে থেকে একজনকে স্বামী হিসাবে মনোনীত করতে বলে ববিকে। তার মা-ও যে বহিরাগত জনৈক সভ্যের প্রতি সহজ-বিশ্বাসে যৌনব্যধিগ্রস্থ হয়ে মরেছে। বাবার সিদ্ধান্তকে সেদিন যার প্রতি অগাধ বিশ্বাসে ববি অস্বীকার করার শক্তি পেয়েছিল সেই ধুতিধারী, পকেটে কুঁচি গুঁজে রাখা ভদ্রবেশী ভদ্রলোক যথাসময়ে বেপাত্তা হয়ে গেছে। দ্বীপের পথে দত্তবাবু বলেছিল -- দ্বীপের নির্জন বনে ছোটাছুটির পাল্লায় হারিয়ে কোনো বন্য মেয়েকে দস্যুর মতো দুহাতের বেড়ায় আটকানোর মত্ততা আর কোথায় পাওয়া যাবে ? কোথায় এমন ববির বুকের মতো যৌবন সমুদ্রের ঢেউ ? তার কোলে আজ তিন বছরের শিশু। স্বজাতীয়দের কাছে সে নিজেই রটিয়েছে – দত্ত বাবু যুদ্ধে গেছে। অদৃষ্টের হাতে নিপীড়িত হয়েও এই আদিবাসী রমণী তার স্বজাতির মধ্যে নিজের আত্মমর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে ছলনার আশ্রয়ে। এই ঢঙের ধুতি পরিহিত গল্পকথককে সেখানে দেখে ববি দত্তসাহেবের সেই সগোত্রকে বিদ্বেষ, ঘৃণা, রুক্ষতা আর শাসানি দিয়ে আতঙ্কিত করে তোলে। প্রবাল দ্বীপের ফূর্তি-সর্বস্ব অভিশপ্ত যৌনরোগার্জিত জীবনকে কাটিয়ে ভালোবাসার নজির গড়বে ববি। প্রতারক দত্তের ছবি মালাসহ আজও তার ঘরে ঝুলছে।

সে শেখাবে প্রকৃত ভালোবাসার মন্ত্র। নিজের জীবনের নিদর্শন আর অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যধিমুক্ত করবে তার সম্প্রদায়কে। ফ্লাশ ব্যাকে শুরু হওয়া এই গল্প আসলে বিশ্বাস আর বিশ্বাসভঙ্গের গল্প, জনৈক আদিবাসী রমণীর অদৃষ্ট-বঞ্চনার গল্প। রিরংসা-প্রমত্ত সভ্য মানুষের আদিম অসভ্যতায় লালসা পূরণের গল্প এটি। ববির বিশ্বাস একদিন ফূর্তির নেশা ছুটে গিয়ে, লোভ কুঁকড়ে গিয়ে প্রকৃত ভালোবাসা জেগে উঠবে। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সাযুজ্যে ববির শূন্য হৃদয়ের রিক্ততাকে প্রকাশ করতেই গল্পকার গল্পের নামকরণ করেছেন ‘দ্বীপ’।

বিদ্যা আমাদের ভাবনাকে জড় থেকে, কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেয় – এই প্রচারিত সত্যটি সর্বদা স্বীকৃত না-ও হতে পারে। আশুতোষবাবুর ‘রিষ্টি’ গল্পের ড. রামকিঙ্কর গোস্বামী তার প্রমাণ। পন্ডিত এই মানুষটি তার পান্ডিত্যের জন্য ছাত্রমহলে সুখ্যাত হলেও নিজের সংসারে, সন্তানের বিয়ের ঘটনায় গ্রহদোষের ভয় মুক্ত হতে না পেরে আত্মহননের পথ অবলম্বন করলেন। মেয়ে-জামাইয়ের ভবিষ্যতকে গ্রহদোষমুক্ত নিষ্কন্টক করতে তার এই রিচুয়াল নির্ভর আত্মবিসর্জন। তা পরার্থসম্ভব নয়। কারণ কন্যা তার পর নয়, আত্মজা। কেবল কন্যার আগামীকে নিষ্কন্টক করতে সংস্কার নির্ভর আত্মত্যাগ তার। জনৈক পন্ডিত কর্তৃক মেয়ের কোষ্ঠীবিচারে বৈধব্য-যোগ বা প্রিয়জন বিচ্ছেদের রিষ্টি যোগ আছে। আরতির সহপাঠিনী সুলতার দাদার মতো সুযোগ্য পাত্রকে ফিরিয়ে দিয়েছেন ড. গোস্বামী। চরম উৎকন্ঠা, অস্বস্তি, দুর্ভাবনা, বিভীষিকা সব মিলেমিশে জট পাকিয়ে ফেলেছে তার স্থির সিদ্ধান্তকে। এই পন্ডিতের গণনাতেই এক দিন অকালে স্ত্রী-বিয়োগের ফল মিলে গিয়েছিল। আজ তাই –

> ‘ওটা ভুল প্রমাণ করার জন্য গোটা জ্যোতিষ-শাস্ত্রটাই কি লন্ডভন্ড করে আঁতিপাঁতি করে খোঁজেননি তিনি ? ভুল এবং যুক্তিহীন প্রমাণ করে বহুবারই নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা করেন নি আজ পর্যন্ত ? সবই করেছেন। করে করে হাল ছেড়েছেন। শান্ত হয়ে পড়েছেন।’২

রামকিঙ্কর গোস্বামীর ভ্রাতা কালীকিঙ্করবাবু দাদার মনের ভ্রান্ত ধারণা মোচন করতে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। শেষে দাদার মতের বিপরীতে বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়র পাত্র সমরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে আরতির বিয়ে ঠিক করেছেন। পাত্রের অহেতুক সামান্য শারীরিক অসুস্থতা রামকিঙ্করবাবুর অস্থিরতাকে আরো চাগিয়ে তোলে। বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসে তার অস্বস্তি, অস্থিরতা তত বাড়তে থাকে। মেয়ের বিয়ের পর নবদম্পতিকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে তিনি বেপাত্তা হন। পুলিশ আত্মহত্যাকারীর পকেট থেকে তার ভাইয়ের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিখানি উদ্ধার করে –

> ‘তাঁর মেয়ে-জামাই এবার দীর্ঘায়ু হবে, সুখী হবে, সে সম্বন্ধে আর তাঁর একটুও সন্দেহ নেই। তিনি নিশ্চিন্ত।’৩

জ্ঞানের পরিধি দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না। চিরকালীন পিতৃহৃদয়ের অপত্য-

দুর্বলতার আন্তরিকতা ফুটে ওঠে নিজের জীবনকে তুচ্ছ ভেবে বলিদানের মাধ্যমে, অপত্যের জন্য একটা চিরন্তন সুরক্ষা এনে দিতে পারার সার্থকতায়। সেই বিশ্বাসেই রিষ্টিদোষ মুক্তি ঘটবে মেয়ের। আত্মহননে এক মহৎ পিতার পিতৃসত্তাকে সে উন্মোচন করে গেল। উচ্চশিক্ষা, আচ্ছন্ন কুসংস্কার – সবই এখানে গৌণ বিষয়। মূল বিষয় পিতৃ-হৃদয়। এখানেই গল্পের সারবত্তা নিহিত।

গল্পকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনেক গল্পের নামকরণ একটি মাত্র শব্দবিশিষ্ট। 'মস্তি' গল্পের নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মী এবং একটি মাত্র শব্দবিশিষ্ট নামকরণ। মস্তি আসলে যৌবন-মিলনোন্মত্ত বন্য হাতি। আলোচ্য গল্পের কাহিনীতে দুটি অর্থবহ ঘটনাকে একই সমান্তরালে এগিয়ে নিয়ে গেছেন গল্পকার। গল্পে মনিবের পোষা হস্তিনী হরিমতীকে মত্ত মস্তির থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা যেমন সত্য, তেমনি প্রাক্তন প্রেমিক অর্জুন নায়েকের যৌবনাকুতি থেকে পার্বতীর নিজেকে শেষপর্যন্ত রক্ষা করার কাহিনীও সমান সত্য। মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে যৌনাকুতি বা তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ কোন বিস্ময়কর ঘটনা নয়। কিন্তু মানব জীবনে তার প্রকাশ ঘটাতে অনেক আড়াল-আবডাল, সমস্যা-সম্ভাবনা, সূত্র-রন্ধ্র সৃষ্টি করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে একসময় ছিল তীব্র আকর্ষণ, ছিল পারস্পরিক গভীর বিশ্বাসবোধ সেই সম্পর্ক হঠাৎ কেন স্বামীর কর্তব্য-কর্ম-নিষ্ঠা, কর্মচাঞ্চল্যের কারণে উপেক্ষা, অবজ্ঞা, বিরক্তি, সংশয় ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হবে? পার্বতীর হাস্যোচ্ছল প্রগলভতা কেন মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাবে ? অর্থাৎ সম্পর্কের ফাটল বা রন্ধ্রের জন্ম হচ্ছে। সেই সূত্র ধরে গল্পকার মানবরূপী মস্তিকে গল্পের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। রাজীবের প্রতি পাবর্তীর অভিমান, অভিমান তীব্র হয়ে একসময়ে তার মনে identity crisis-এর জন্ম দেবে। অর্জুন নায়েকের সঙ্গে পার্বতীর যে সম্পর্ক একদিন প্রায় পরিণতি লাভ করতে চলেছিল, কিঞ্চিৎ যৌবন-চাঞ্চল্যে তা খন্ডিত হয়। সে অপ্রাপ্তির শূন্যতা আজও অর্জুন বহন করে চলে। Forest Officer রাজীব স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসে বাংলোয় অর্জুন থাকা সত্ত্বেও কয়েকদিনের জন্য চলে যায় পেশাগত প্রয়োজনে। রঙ্গুর মুখে পার্বতীর আবদার পূরণার্থে রাজীবের দুঃসাহসিক বাঘের বাচ্চা সংগ্রহের শিহরণ জাগানো কাহিনী শুনে রাজীব সম্পর্কে পার্বতীর মনের সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়। জয়বাহাদুরের গুলিতে মস্তির কর্ণরন্ধ্র ছিদ্র হয়ে যায়। মস্তি হরিমতীর প্রত্যাশা ছেড়ে পালায়। ঠিক একইভাবে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায় অর্জুনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলা পার্বতী 'মস্তি'র প্রকৃত অর্থ ও ঘটনা অর্জুনকে ব্যক্ত করে বাংলো ত্যাগের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। মান-অভিমানের বিসর্জন শেষে আবেগে গদগদ পার্বতী –

> 'ফুলে ফুলে হেসে গুঁজে উঠতে গিয়ে দুই বাহুতে সবলে তাকে আঁকড়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে হঠাৎই ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল পার্বতী।'৪

আশুতোষবাবুর 'ঠাকুমার ঝুলি' গল্পের বুনন খুব নিটোল নয়। গল্পখানি দাদু-ঠাকুমার প্রণয়ানুভূতির গল্প না বিমলা ও তাঁর ঘরজামাই স্বামীর দাম্পত্য-জীবনের গল্প বোঝা

গেল না। তাঁর ‘মহাবিহার’ গল্পের অনেক ঘটনাবলীই বেশ নাটকীয়। শীলাবতীর বাল্যবিবাহ, আকস্মিক নৌকাডুবিতে এক বছরের মাথায় বৈধব্য দশা, রক্ষণশীল উত্তরপ্রদেশীয় পরিবারের সংস্পর্শ ও অনুগ্রহে পিতার জীবিকা নির্বাহ, সেই রক্ষণশীল পরিবারের পুত্র শঙ্কর আচার্যের সহযোগিতায় এম. এ. পাশ করা, পারস্পরিক মৃদু আকর্ষণ থেকে নৌকাবিহার এবং পরবর্তীতে তাদের দৈহিক মিলন – এই সব ঘটনাই নাটকীয় গতিতে ঘটে চলা কাহিনী। পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে, পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা নিয়েও শঙ্কর তার ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিল। শীলাবতীই রাজি হয়নি। তবে শীলাবতীর ইচ্ছায় তাদের শিশুপুত্রকে শঙ্কর তথাগতর স্পর্শধন্য মৃগদায় তপোবন মহাবিহারে রেখে আসে। মহাবিহারের সংগ্রহশালা দেখানোর গাইডের ভূমিকা নিয়ে চব্বিশ বছর বয়সী রাহুল মন জয় করে ফেলে শীলাবতীর। এক অনির্দেশ্য আকর্ষণে তার উপর নানা অধিকার-আবদার প্রয়োগ করতে শুরু করে। শঙ্করের মুখ থেকে যুবকটির প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হয়ে শীলাবতী মাতৃহৃদয়ের অধিকারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে অভিমানী যুবক শোনায় –

> ‘দেখো মাদার, জন্মের পর থেকে এত বড় বঞ্চনার এতটুকু দাগ লাগেনি যাঁর দয়ায়, এই বয়সে তাঁর পায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে আজ আর কতটুকু আশ্রয় তুমি আমাকে দিতে পারো বলো। তুমি কষ্ট পেও না, আমি খুব ভালো আছি। আমাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে তুমি নিরাশ্রয় করতে চেও না মাদার।’[৫]

বিধবা নারী গর্ভধারণ করেছেন – সমাজের দৃষ্টিতে এঘটনা এক চরম অপরাধমূলক ঘটনা। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে আপোষ করে না। আবার দেহ-মনের কামনার উপর তো কারো হাত নেই। সে অকল্যাণকেও চেয়ে বসতে পারে। তাই লোকলজ্জার ভয়ে শীলাবতী সেদিন সন্তানকে নির্বাসিত করেছিলেন। আজ সে বল-বীর্য লাভ করেছে, বুদ্ধের চরণ-তলের অবলম্বন পেয়েছে। আজ মা যে আশ্রয় দিতে চায় তার থেকে অনেক বড় সে আশ্রয়। মহাভারতের কর্ণও মায়ের স্নেহ-আকর্ষণকে অস্বীকার করেছিল অভিমানে। এইখানেই গল্পের আবেগময়তা অনিবার গতি পেয়েছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘সন্দেশ’ গল্পের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত হয়েছিল ‘শঙ্খবেলা’ চলচিত্র। গল্পের নামকরণে চমক না থাকলেও কাহিনী বিন্যাসটি চমৎকার। গল্পখানিতে সমকালীন সমস্যার উদ্‌ঘাটন ও সমাধান পদ্ধতিটি অতি মনোহর। কাহিনীর মূলচরিত্র ডঃ সুজন ঘোষ কাহিনীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়েই বদমেজাজী রাশভারী মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন। অকৃতদার, নারীঘেঁষা এই প্রবল ব্যক্তিটি সহকর্মীদের ভাষায় গর্জন ঘোষ বলে পরিচিত। গল্পের শেষ প্রান্তে এসে দেখা যায় তিনি যতবড় সার্জেন ঠিক তত বড়ো মনের মানুষও বটে। অসুস্থ জনৈক শিশুকে অপারেশনে ভালো করেই তুললেন না সেইসঙ্গে তার পিতামাতার চূর্ণ-বিচূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্ককে আবার

জোড়াও দিলেন বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে। সমকালীন প্রচলিত সামাজিক এক ব্যাধি, বধূনির্যাতনের ফলেই তাদের সম্পর্কের ছেদ ঘটেছিল। নিঁখুত ছুরি চালনার মতো নিখুঁত বুদ্ধিমত্তার চালনায় তৃপ্তি গাঙ্গুলী ও তার স্বামী উভয়ের কাছে পরিষ্কার করে তুললেন – সন্তানের জন্য তাদের উভয়েরই ভূমিকা কী ? ক্রমে তাদের এতদিনকার ব্যবধান ঘুচে গেল। স্বামী-সন্তানসহ তৃপ্তি গাঙ্গুলীর এখন ভরপুর সংসার। দেহের আর মনের – দুই ধরনের অপারেশনে সফল ডাক্তারবাবু বিদেশী বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশে জাহাজ-ঘাটে আজ বিদেশের পথে। তৃপ্তি গাঙ্গুলী তার যাত্রার শুভকামনায় সন্দেশের বাক্সসহ জাহাজ-ঘাটে হাজির হয়েছে। জুনিয়রদের আক্ষেপ আবার কবে তার পায়ের কাছে বসে কাজ করতে ও শিখতে পারবে তারা? গল্পের নামকরণটি অতি তুচ্ছ। কাহিনীখানি অতি মহৎ এবং চমৎকার। এমন গল্পের নামকরণ ‘অপারেশন’ হলে আমার মতে বেশ হতো।

চমকহীন নামকরণের ‘দুধ’ গল্পখানিতে কিছু পরস্পর বিরোধী ঘটনা ও অবস্থার সন্নিবেশে পাঠকের আবেগকে সংহত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পিতৃগৃহে খুশীর বিলাসহীন সাদামাঠা জীবনের বিপরীতে অঙ্কিত হয়েছে স্বামীগৃহে তার বিলাসবহুল ফ্ল্যাট জীবনের চিত্র। এই ফ্ল্যাটের অদূরের বস্তিজীবনের ছবি খুশীর কাছে বিরক্তি উৎপাদন করে। বড়ো গা ঘিনঘিন করে তার। কিছুর অভাব তাদের নেই বটে, কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবনও সুখসমৃদ্ধ নয়। বরং অভাবগ্রস্থ বস্তিবাসী পিয়নের ঈর্ষণীয় সুখী দাম্পত্য-চিত্র শেখরকে বিচলিত করে তোলে। ফ্ল্যাট আর বস্তি – দুই জীবনের শিশুই দুধের জন্য কান্না করে। বস্তির মা তার শুকনো স্তনকে টিপে টিপে ছেলের দুধের বিন্দু জোগানোর কসরত করে। আর অন্যদিকে খুশী তার ফিগার রক্ষার্থে সন্তানকে স্তন দিতে রাজি নয়। কৃত্রিম দুধ দেওয়া হয় শিশুকে। প্রয়োজনে নিজের স্তনের দুধ পাম্প করে বার করে দিতে হলেও একবিন্দু তার শিশুর মুখে ফেলে না। এত অন্যায় নীরবে সহ্য করে অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হয় শেখর। আকস্মিক হার্ট অ্যাটাকে আজ সে হাসপাতালে ভর্তি। খুশী স্বামীর মঙ্গল কামনা করে। তার দুশ্চিন্তা শেখরের কিছু ঘটে গেলে খোকাকে পালনের আয়া রাখার পয়সা জোগাড় হবে কোথা থেকে ? ডাক্তার শেখরকে দুধ খাবার নির্দেশ দিয়েছে। স্বার্থমগ্ন স্ত্রীও তাকে ধমক দেয় দুধ না খাবার জন্য। অভিমানী শেখর হাসপাতালের জানালা দিয়ে ফেলে দেয় সে দুধ। তার সন্তান দুধের জন্য কান্না করে একদিনও দুধ পায়নি। তাই সে নিজেও তা খাবে না কখনো। এভাবে অসংখ্য পরস্পর বিরোধী ঘটনার সন্নিবেশ ঘটিয়ে গল্পকার গল্পদেহে একাধিক চমৎকারিত্ব সরবরাহ করেছেন। মূল সমস্যা এখানে একটিই। অন্য সমস্যাগুলি সবই শেখর মেনে নিয়েই দাম্পত্য জীবনকে টেনে নিয়ে চলছিল। কেবল সন্তান তার প্রাপ্য মাতৃস্তন থেকে বঞ্চিত হবার ঘটনাটি তার কাছে ভীষণ রকমের অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। গল্পটির নামকরণে গল্পকার মুন্সীয়ানা দেখাতে না পারলেও বিশেষত একটি সমস্যাকে জোর দিয়ে এমন একটি রসোত্তীর্ণ গল্প লেখার গৌরব অর্জন করে নিয়েছেন। গল্প পড়ে ওয়েবস্টার ডিকশনারি ও এনসাইক্লোপিডিয়াতে উল্লিখিত ছোটগল্পের ছোট উক্তিটি মনে পড়ে।

আলোচ্য গল্পের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য – A short story usually representing the crisis of a single problem.

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'তপ' গল্পখানিতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'মাতৃহীন' গল্পের প্রভাব পড়েছে। দুটি গল্পের ক্ষেত্রেই গল্পের কোন চরিত্রের মুখ থেকে গল্প নিয়ে গল্প রচনার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। বাইরের আচ্ছাদনের রুক্ষ, গমমগে মেজাজের আড়ালে স্বামীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, প্রেম, ভালোবাসা এতখানি লুকিয়ে ছিল – স্বামীকে ত্যাগ করে যাবার দীর্ঘবছর পরে আবার তা ফুটে উঠলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই তপস্যার কথা বলাটাই গল্পকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী না? গল্পে প্রকৃত কার তপস্যা সফল হয়েছে বোঝা যায় না। দ্বীজেন গাঙ্গুলীর স্বেচ্ছাচারিতা তার ভালোবাসাকে পরিণতি এনে না দিলেও মণিমালার কন্যা মনোরমাকে কন্যাস্নেহে বড় করার সুযোগ পেয়েছেন। স্বামীর সংসার সে পায়নি। অবশ্য তার পিছনে তার নিজের দোষ বড় কম নয়। পাঠক গল্পকথিকা হিসাবে এই যে মা-কে পেয়েছিল ক্রমে তাকেই মনোরমা রূপে উপস্থাপিত হতে দেখে বেশ রোমাঞ্চকর স্বস্তিদায়ক কাহিনীর জাল বুনে ছিল। কিন্তু তা ছিন্ন হয় তখন, যখন গল্পকার কথক হিসাবে পরিচয় দেন প্রেমানন্দ ঘোষের দ্বিতীয় স্ত্রী সুমিত্রাকে। গল্পের বিপুল সম্ভাবনা যেন মুহূর্তে ধাক্কা খায়। কাহিনীর পরতে পরতে এত জটিল গ্রন্থি-জাল আছে যে পাঠক মাঝে মাঝে বিরক্ত না হয়ে পারে না। 'তপ' গল্পে তাই স্পষ্ট করা সম্ভব হয়না কার তপস্যা সফল হল – কোন তাপস (দ্বীজেন না মনোরমার স্বামীর) না কোন তাপসীর (মনোরমা না সুমিত্রার)।

'যৌবন' গল্পখানিতে গল্পকার দুটি পরস্পর বিরোধী ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। জগু দত্তের মতো ষাটোর্দ্ধ বৃদ্ধরা তাদের পক্ক কেশ কলপ করতে আসে – বাইরের যৌবনকে তরতাজা দেখিয়ে প্রিয়বালাদের মন বশে রাখতে। কেউ পরকীয়া বাঁচাতে আবার কেউ অল্প বয়স্কা স্ত্রীকে বশীভূত করতে এই আত্মপ্রবঞ্চনাময় পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এই তালিকায় আরেকটি বৃদ্ধের কথাও বলতে হবে। তিনি একজন রিকশাওয়ালা। তিনি চুল কলপ করেন যৌবনবান রিকশাওয়ালা সেজে যাত্রীদের মনে আস্থা অর্জন করতে। সুতরাং একদল টাকাওয়ালারা আসে নিজেদের অসংযত প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় ছলনায় ভোলাতে আবার তার বিপরীতে কেউ আসে নিজের পেটের টানের কথা ভেবে।গল্পকারের 'ব্যক্তিত্ব' গল্পখানি কোন গুরুগম্ভীর বিষয়কেন্দ্রিক গল্প নয়। কদাকার চেহারা নিয়ে জন্ম নেওয়া বংশগত পরম্পরার দোষ খন্ডনের উদ্দেশে সুন্দর ও ব্যক্তিত্ববান নারীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণের সূত্র থেকে এ-কাহিনীর জন্ম।

আশুতোষ মুখোপধ্যায়ের অধিকাংশ গল্পের ক্ষেত্রে একথা সত্য যে নামকরণে চমক সৃষ্টি অপেক্ষা তিনি কাহিনী গ্রন্থনে, আঙ্গিক-নির্মাণে ও বিষয় নির্বাচনে অনেক বেশী সচেতন শিল্পী। তার ভাষা সহজ, সরল, প্রাঞ্জল। বাক্যগুলি সংহত ও ক্ষুদ্র। গুণবাচক (ইতি ও নেতিবাচক) ক্রিয়াপদের বহুল ব্যবহার তার গদ্যকে সচল রেখেছে।

গল্পে সমাজভাবনা আছে তবে সেই সামাজিক সমস্যা নিয়ে তীব্র-শানিত আক্রম নেই। বরং তার দায়ভার যেন পাঠকের হাতেই ছেড়েছেন। ন্যারেটিভ বর্ণনাতে যেন তাঁর সার্থকতা নিহিত। সিরিয়াস বিষয় নির্বাচনের জন্য তার গদ্যে হাস্যরসের স্থান প্রায় নেই বললেই চলে। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে শ্রীভূদেব চৌধুরীর একটি বিশ্লেষণ তাঁর গল্প সম্পর্কে যথাযথ – '....... সীমায়িত-জীবনের ক্ষণ-বৃন্তে অনন্ত-জীবনের ব্যঞ্জনা রচনাতেই ছোটগল্পের রূপ-শৈলীর বিশিষ্টতা'।[৬]

তথ্যসূত্র:

১. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প , তৃতীয় মুদ্রণঃ জানুয়ারি ২০১৬, প্রমা প্রকাশনী, ৫৭/২ই কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা– ৭৩, পৃ. ১১
২. তদেব, পৃ. ২৫
৩. তদেব, পৃ. ৩৩
৪. তদেব, পৃ. ৫৪
৫. তদেব, পৃ. ৭৪
৬. শ্রীভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৯, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প: একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা

হেনা বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, অশোকনগর

সারসংক্ষেপ : সাহিত্যকর্মে অবতীর্ণ হবার যাত্রা শুরুতে যাঁরা পুরস্কৃত হয়ে যাত্রা শুরু করেছেন সেই বিরল প্রতিভাধারীদের একজন শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা যখন বেজে উঠেছে বিশ্বময়, সেই সংকট কালে আবির্ভূত হয়েও, ক্ষয়িষ্ণু মানবতাবোধে বা আত্মিক শূন্যতায় আক্রান্ত না হয়ে অপরিসীম স্নিগ্ধ-সরস ও বিস্ময়ের মুগ্ধতা নিয়ে বিচরণ করেছেন নানা গল্প আঙ্গিক ও বিষয় বর্ণনায়। দিগ্‌দিগন্তের তূর্যধ্বনিতে আতঙ্কিত না হয়ে কখনো মিশে যেতে চেয়েছেন শিশুর সহজ-সরল জীবন পরিসরে। কখনো হিউমরের ছটায় কৌতুকরস সিঞ্চন করেছেন গল্পদেহে। কখনো তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি রোমন্থনে বেদনা-মধুর অতীত। এক্ষেত্রে স্মরণীয় তাঁর 'হৈমন্তী' 'বর্ষায়' ইত্যাদি গল্পগুলি। আবার কখনো পশুমনস্তত্ত্বের গল্প ('কুইন অ্যান') শুনিয়েছেন পাঠককে। পরিচিত জীবনের অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে রচনা করেছেন 'সার্টিফিকেট', 'সম্পত্তি' ইত্যাদি গল্পগুলি। রক্তাক্ত সমকালের মধ্যে থেকেও জীবনের পঙ্কিলতাকে এড়িয়ে থাকতে চেয়েছেন তিনি।

শব্দ বন্ধন: ধর্মভক্তি, হিউমর, ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি, প্রেমের সংকোচ, তাবেদারি, অতিপ্রাকৃত বর্ণনা, বাৎসল্য প্রেম, শাক্ত সাধনা, শৈব সাধনা, বৈষ্ণবভক্তি, দার্শনিকবোধ ইত্যাদি।

প্রতিপাদ্য বিষয় : বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্প রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর কয়েকটি ছোটগল্পকে কেন্দ্র করে তার প্রতিভার বিচ্ছুরণকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। বিভূতিভূষণের বাৎসল্যরস মুখ্য ছোটগল্প হল 'রানুর প্রথম ভাগ', 'ননীচোরা', 'পীতু', 'মাসী' ইত্যাদি গল্পগুলি। বাৎসল্য রসের গল্প পরিবেশনে গল্পকার অঙ্গীরস হিসাবে হাস্যরসেরও অবতারণা করেছেন। ভারহীন সাবলীল গদ্য কাঠামোতে শিশুর অকালপক্ক বাচনিক প্রয়োগে হাস্যরস সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। খুব বিরলভাবে সেই নির্ভার কাহিনীতে দু-একবার করুণ কাহিনীর সংযোজনও আমরা লক্ষ্য করি। 'রানুর প্রথম ভাগ' গল্পটিতে অকালপক্ক রানুর গিন্নীপনা, আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সমন্বিত পরিপক্ক রচন গল্পে হাস্যরসের সঞ্চার করে। মেজকাকা শৈলেন মুখার্জির সঙ্গে রানুর এই বাৎসল্য স্নেহের গল্প কেবলমাত্র অপরিণত অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার অকালপক্ক গৃহিনীপনা বা জ্যাঠামোতেই শেষ হয় না। গল্পের তৃতীয় দৃশ্য থেকেই শুরু হয় সমস্যা। রানুর পুণ্যলোভাতুর পিতা শশাঙ্ক মুখুজ্যে তার ধর্মাচরণের নিষ্ঠা প্রদর্শনে ঐটুকু ক্ষুদ্র

কন্যাকে গৌরীদানে উদ্যত হয়েছে। প্রতিবাদী মেজকাকা একসময়ে হার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। গল্পের শেষ দৃশ্যে চিরাচরিত বাঙালী গৃহের আগমনী-বিজয়ার সম্ভাবনাময় আনন্দ-মধুর হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে কাকা-ভাইঝির সংলাপে। প্রাণোচ্ছল হাসিখুশিময় বালিকা এতদিন দুষ্টুমি আর জ্যাঠামি করে করে প্রথম ভাগই উত্তীর্ণ হতে পারেনি। আজ গৌরীদানের পরমুহূর্তে তার আট বছরের কৃত্রিম গৃহিণীপনা একমুহূর্তেই বাস্তবসম্মত রূপ ধরতে চলেছে। অশ্রুসিক্ত চোখে কাকাকে সে প্রতিশ্রুতি দেয় – আর দুষ্টুমি নয়, শ্বশুরালয়ে লক্ষ্মী হয়ে সে প্রথম ভাগ শেষ করে কাকাকে পত্র লিখবে রোজ। শিশুমহলের মনের অফুরন্ত ভান্ডারকে এভাবে সহজ রূপে গ্রহণ করে অসাধারণ সৃজনী-প্রতিভার স্বাক্ষরে লিখেছেন গল্পখানি। বিভূতিভূষণ বাবুর ‘পীতু’ রানুর মতোই এক শিশু। ধানবাদের সে শিশু রানুকে ছাপিয়েও যেন অধিক সর্বজ্ঞ। এ ধরণের গল্প লেখার প্রতি বিভূতিভূষণ যেন এক অনিবার আকর্ষণ অনুভব করেন বারংবার। এই সূত্রেই স্মরণে আসে তাঁর ‘ননীচোরা’ গল্পখানি। রানুর কাহিনীতে শাক্তপদাবলীর কন্যা-বাৎসল্য, এখানে বৈষ্ণবীয় ধারার কৃষ্ণপ্রীতি। বংশানুক্রমিকভাবে বৈষ্ণবাদর্শে লালিত মমত্ব, বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও ভক্তি আলোচ্য গল্পের খোকার উপর বর্ষিত হয়েছে। শিশুর মিষ্টান্ন-নাড়ু-ননী-প্রীতি ঠাকুরমার মনে বালগোপালের আবির্ভাবের অলৌকিক ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। তাই ঠাকুরমা তাকে গোপাল রূপে স্বীকৃতি দিয়ে বউমাকে আদেশ করলেন –

> ‘কাল থেকে খোকার জন্যে ছোট্ট একটি নৈবিদ্যি আমার আসনের পাশে রাখা থাকবে বউমা, যখন গোপালকে ওদিকে নিবেদন করব, খোকা তার নিজেরটি নিয়ে খেতে বসবে।’১

সংসার-জীবনে অনেক গৃহস্থের ঘরেই আদরণীয় শিশু গোপালের ভাবনাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ছোট্ট এবং সহজ সত্যকে গল্পদেহে সঞ্চার করে গল্পলেখাটা সহজসাধ্য নয়। রানুর গল্পের মতো, পীতুর গল্পের মতো এখানেও শিশুর মায়াময় মনোজগতের কথা উন্মোচিত হয়েছে। হাস্যরসের পরিবেশনের পন্থাটিও এখানে বিস্ময়কর। রানুর গল্পে প্রসঙ্গক্রমে খানিকটা বিরহভার এসেছে। নইলে গল্পগুলির আঙ্গিক বাৎসল্যরস। অঙ্গীরস সেখানে হাস্যরস। আর পরিণামে সিঞ্চিত হয়েছে ভক্তিরস।বিভূতিভূষণের ‘মাসী’ গল্পখানি রানু-পীতু-খোকাদের গোত্রের গল্প। গল্পের মূল চরিত্র মিটু ও তুলতুল। মিটুর থেকেও বয়ঃকনিষ্ঠা তুলতুল ভাগ্নের মুখ থেকে মাসী সম্ভাষণ শুনবেই। গল্পকথক মেজকাকার ক্ষুদ্র ভাইপো মিটু সে সম্ভাষণ তাকে করতেই চায় না। কারণ সে মাসীদের মতো কাপড় পরে কই ? দুই শিশুর খুনসুটি, রাগ, অভিমান, সময়-বিশেষে মর্যাদাজ্ঞান – এইসব নিয়েই গল্পের বুনন। গল্প-আঙ্গিকের এই বুনন compact নয় আবার গল্প-পরিণতিও চমৎকার নয়।

বিভূতিভূষণের ‘কালিকা’, ‘চৈতালী’, ‘শ্যামলরানী’ গল্পগুলিতেও শিশু চরিত্রকে নিয়ে নানা ঘটনানির্ভর বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য ‘চৈতালী’ গল্প সম্পর্কে একথা বলা যাবে না। তবে তিনটি গল্পেই লেখকের জ্ঞান-বিশ্বাসের নির্ভরতায় বাঙালী হিন্দুর নানা

অভ্যস্ত ধর্মবোধের পরিচয় কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে আবার কখনো প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জগজ্জননীকে বাঙালী ঘরের মেয়ে রূপে আরাধনা করে আগমনী-বিজয়ার হাসিকান্নার মধ্যে দিয়ে লীলারস আস্বাদনের একটি চমৎকার উদাহরণ যেন 'শ্যামল রানী' গল্পখানি। আলোচ্য গল্পেও শৈল নামক একটি অল্পবয়সী মেয়ের অকাল-পক্কতার কথা আছে। তবে এ-গল্পে সে গৌণ চরিত্র হিসাবে উপস্থিত। গল্পের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে মিত্তিরবাড়ীর মেয়ে সুধার সন্তানসহ পিত্রালয়ে আসার আগমনীর আবেগঘন বর্ণনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। শৈলর অকালপক্ক আচরণ, গৃহিণীপনা বর্ণনা লেখকের মানসপটে সঞ্চিত শিশুকাহিনী বর্ণনাদির রসদ থেকে উদ্ভূত। শাক্তপদাবলীসুলভ আগমনীর আবাহনে গল্পের সূচনাংশ মুখরিত। এরপর ক্রমে গল্পের দিক বদল ঘটেছেই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের মূক বালিকা চরিত্র সুভাষিণীর সর্বশ্রী ও পাঙ্গুলি নাম্নী দুই গাভীর প্রতি প্রীতি আলোচ্য গল্পে দেখা যায় সুধা-শ্যামলীর মধ্যে। এই শ্যামলীকে ছেড়ে কীভাবে সে শ্বশুরালয়ে যাবে ? খেলাঘর ভেঙে শ্বশুরালয়ে যাবার সময় ক্রমে সমাসন্ন হয়ে উঠলে তার খেলাঘরের স্বামী নিমাই দাদা সুধার মনের কষ্ট দূর করতে তার প্রকৃত স্বামী হরিহরকে দিয়ে বিয়ের আসনে শ্যামলীকেও দানের অনুরোধ করা হয়। এই নিয়েই বিবাহ আসরে হইচই শুরু হয়। শাক্তসুরের ঝঙ্কার নিয়ে শুরু হওয়া গল্প গাভীপ্রীতির পরিচয়ে পরিণতি পায়। আর তা থেকে কিছু হাস্যরসের উদ্ভব ঘটে কাহিনীতে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'কালিকা' গল্পখানি শক্তিভক্তির গল্প। বৈষ্ণব-ভক্ত নটু গোঁসাইয়ের পুরুষোচিত দস্যি মেয়ে রাধারানীর গাত্রবর্ণ কালীমাতার মতো। কালিকাপুরের পরম শাক্ত বিষ্ণু ভট্টাচার্য একদিন গেছো মেয়ে রাধারানীকে পেয়ারা গাছে দেখতে পায়। নিজের মন্দিরের কালী মায়ের সঙ্গে রাধারানীর অনির্দেশ্য কোন সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে একদিন তাকে পুত্রবধূ করে নিয়ে আসেন গৃহে। নববধূর একমাত্র দায়িত্ব শ্বশুরের কালিকা মন্দিরের তত্ত্বাবধান। পিস্-শাশুড়ী তার শ্বশুরকুলের আদর্শে এখনো জগন্নাথ পূজারিণী। বিধবা হয়ে ভাইয়ের সংসারই তার একমাত্র ঠিকানা । তার কঠোর বিধি নিয়মে কালী মন্দিরে পাঠাবলি বন্ধ হয়েছে। ইতিমধ্যে পত্রমারফত খবর আসে ভৈরব সর্দার সদলবলে ডাকাতি করতে আসবেন। প্রতিবেশী বৃদ্ধ নিবারণ ঘোষালের মতে এ-হল বলি বন্ধের কুফল। বিষ্ণু পুনরায় তা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেও প্রতিহত হন দিদিরি কারণে। কালীভক্ত ডাকাতসর্দার যথাসময়ে সদলবলে উপস্থিত হয়ে অবাধে লুণ্ঠনক্রিয়ায় মত্ত হয়ে ওঠে । হঠাৎ ঈষত্তরলিত আঁধারে ছায়ামূর্তির মতো সে প্রত্যক্ষ করে শিবের বুকের উপর দন্ডায়মান কালী মূর্তিকে। পরম ভক্তিতে দেবীর নির্দেশে সব লুণ্ঠনকৃত মালসামগ্রী সেখানে ফেলে চলে যায় ভৈরব। আকস্মিকভাবে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ত্বের পরিচয় রেখে কালীপদকে শিব আর নিজে কালী সেজে লুণ্ঠিত সামগ্রী পুনরুদ্ধার করে বধূ। তার সেই উপস্থিত বুদ্ধি বিমোহিত করে পাঠককে।

বাঙালী জীবনের প্রচলিত ধর্মসাধনার প্রবহমান ধারা নিয়ে বিভূতিভূষণের রচিত

নানা গল্পের কথা ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে শাক্ত এবং বৈষ্ণব ভাবাদর্শের প্রয়োগ নানা গল্পে আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু 'চৈতালী' গল্পখানি শৈব ভাবাদর্শসুলভ রসনিষ্পন্ন ছোটগল্প। আত্যন্তিক ভাবাবেগ আর কবিত্বসুলভ বর্ণনায় গল্পকথক শৈলেনের নেপালে পশুপতিনাথ দর্শনের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করেছেন। যার দৃষ্টিভঙ্গিতে এতদিন 'ধর্ম জিনিসটা বড় সংক্রামক' প্রতিপন্ন হয়েছিল তাকেই (শৈলেন) দেখলাম ভক্তিবৎসল সহযাত্রীদের সংস্পর্শে পরম শিবানুরাগী হয়ে যাত্রাপথে পা মেলাচ্ছেন। নেশার আবিষ্টতা আর সম্মোহনের আকর্ষণে দেবদর্শনের সাধ পূরণের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে তীব্র হতে থাকে তার। এত কষ্টে এতদূর দেশে এসে স্থাবর শিলামূর্তি দেখতে চান না তিনি। বরং –

> 'তপঃক্ষীনা ধ্যানরতা উমার প্রশান্ত জ্যোতির্ময়ী মূর্তিই হোক, ভিক্ষার্থী শঙ্করের সামনে শিবানীর অন্নপূর্ণা মূর্তিই হোক বা মদনভস্মের সময় যোগিবরের প্রলয়-মূর্তিই হোক –কালের যবনিকা তুলে আমায় দেখান একবার। তার জন্য যা তপস্যা তা আমি করব। আমার জাগ্রত চেতনায় যদি সম্ভব না হয় তো স্বপ্নই হোক বা আমার চেতনাকে সম্মোহিত করেই হোক, আমায় দেখান! আমি সেটাকেও সত্যরূপেই গ্রহণ করে আমার তীর্থ অভিযানের পরম সঞ্চয় করে রাখব। তাঁর লীলাক্ষেত্রে এসেও যদি আমায় মাত্র স্থাবর শিলামূর্তি দেখেই ফিরতে হয় তো ভাবব, আমি বঞ্চিত হলাম।'২

লোকোত্তরে কিছু দেখার ভাবনার উদগ্রতা থেকেই চরম কষ্ট-স্বীকার ও কৃচ্ছ্রসাধনসম দুর্নিবার এই যাত্রা শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভ করে। গিরি-পাহাড়-বন-জঙ্গল পেরিয়ে অসাড় দেহ নিয়ে সে যাত্রায় এগিয়ে চলা যেন সাধনার পরাকাষ্টায় উন্নীত হতে পারার পরীক্ষা। পথে মঠধারী শৈব লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক উপলব্ধি, শেষে তার অন্তর্হিত হওয়া সব কিছু যেন হিমালয়ের বিস্ময়-রহস্য – অপরূপ অতিপ্রাকৃত মায়ামুগ্ধতার পরিচয়। অবসন্ন দেহে শৈলেন একসময় তরাইয়ের সেই ধ্যানগম্ভীর মূর্তির কাছাকাছি পৌঁছায়। সে পথে প্রতিমুহূর্তে নটরাজের নাট্যশালায় নতুন নতুন পট উন্মোচন করে তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। মুখোমুখি পৌঁছাতেই শুরু হয়ে যায় প্রলয় ঘূর্ণির সংহার মূর্তির বীভৎস মাতন লীলা। প্রত্যাবর্তন পথে সে আবিষ্কার করে (হিমালয়-তিব্বতে) ঘূর্ণাবর্তে সৃষ্ট আসনবদ্ধ মানুষের মূর্তি। এই সামগ্রিক বর্ণনার শেষে শ্রোতা অক্ষয়-তারাপদর মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নানা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এটা গল্পের সারকথা নয়। চিরায়ত ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও আকর্ষণের প্রশংসনীয় বর্ণনাই আলোচ্য গল্পের motif হতে পারে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'সার্টিফিকেট', 'সম্পত্তি' ইত্যাদি গল্পগুলি মানের দিক থেকে অতি সাধারণ। জমিদারগৃহে গৃহশিক্ষকতা করার সুযোগ পেতে কোন বিখ্যাত ব্যক্তির সুপারিশ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের অভাবে প্রাক্তন ছাত্রের স্বীয় প্রতিভায় রচিত একটি প্রবন্ধকে সার্টিফিকেটের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। জনৈক অযোগ্য ছাত্রকে

যিনি পরীক্ষায় সাফল্য এনে দেবার ক্ষমতা রাখেন তিনি অবশ্যই এলেমদার গৃহশিক্ষক। সুতরাং সেই অসাধ্য সাধনের পুরস্কার-স্বরূপ টেলিগ্রাম মারফত নিয়োগপত্র পাওয়াটা শিক্ষকটির জন্য বাঞ্ছনীয় ছিল। প্রয়োজন পড়েনি ব্রজমোহনবাবুর দস্তখত-সমন্বিত হলফনামার। গল্পে যতটুকু হাস্যরস আছে তা নিকুঞ্জলালের প্রবন্ধের ভাষা প্রয়োগের মধ্যে নিহিত। এ-রকম অতি তুচ্ছ বিষয়কেন্দ্রিক আরেকটি সামান্য গল্প 'সম্পত্তি'। গল্পখানি আত্মাভিমানকে জয় দেবার গল্প। বাতাসপুরের দুই জমিদার উমেশ পাল ও ভৈরব পালের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই চোরকে নিজেদের মতো করে শাস্তি প্রদানের উৎকট ভাবনা থেকে গল্পখানি রচিত। গল্পখানি রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

বাংলা ছোটগল্পে বিভূতিভূষণ অদ্বিতীয় হাস্যরসের শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর যেসব ছোটগল্পগুলির আলোচনা আবশ্যক সেগুলি হল 'বরযাত্রী', 'বৈরিগীর ভিটেয়', 'দ্রব্যগুণ' ইত্যাদি। হাস্যরস-মুখ্য গল্প হলেও আলোচ্য গল্পগুলিতে কবিসুলভ সৌন্দর্যবোধ ও দার্শনিকসুলভ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রচ্ছন্নভাবে হলেও বিদ্যমান। 'বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় শ্রী ভূদেব চৌধুরীরএকটি তুলনামূলক আলোচনা এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক–

> 'দ্বিতীয় পর্যায়ে এতাবৎ আলোচিত হাসির গল্পের শিল্পী যাঁদের পরিচয় গ্রহণ করা হয়েছে, মুখ্যত সকলেই তাঁরা satirist; মাঝে মাঝে স্যাটায়ার সৃষ্টির সহায়ক হাতিয়ার হিশেবেই যেন wit এর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হাস্যরসিক বিভূতিভূষণ একান্ত ভাবেই হিউমারিস্ট। এখানেই মনে পড়ে, হিউমার-এর উৎস সহৃদয় সহানুভূতির মধ্যেই, – উইট হৃদয়হীন না হলেও হৃদয়মুখ্য নয়। আর স্যাটায়ার-এর উদ্ভব যে অন্তত কঠিন-হৃদয় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে, তাতে সংশয় নেই। শিল্পী হিশেবে বিভূতিভূষণ একান্ত সহৃদয়, – রোমান্টিক হৃদয়বৃত্তির অনুসারী। তাঁর হাসির গল্পের উৎসও এই স্নিগ্ধ-চিত্ততায় সঞ্জীবিত।'৩

Humorist বিভূতিভূষণের 'বরযাত্রী' গল্পখানি নির্ভেজাল, হাস্যরসাত্মক, ভারহীন কাহিনী-নির্ভর গল্প। বরযাত্রা, ভোজন, বাসর-কৌতুক বাঙালী জীবনের এক অতি পরিচিত ঘটনা। তোতলা গণশা, কবি রাজেন, পেটুক গোঁরাচাদ, ঘোঁৎনা, কে. গুপ্ত প্রমুখ বন্ধু বরযাত্রী ও অন্যান্য কর্তা-ব্যক্তিদের নিয়ে বিয়ে করতে চলে ত্রিলোচন। বাসরভীতি প্রথম থেকেই তার দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিবাহসম্পন্ন হবার পর বরযাত্রী বন্ধুরা বাসরঘরে স্ত্রী-ক্রিয়া উপভোগ করার কৌতূহল-জনিত ঘটনার সূত্র থেকে ডাকাত প্রতিপন্ন হয়ে পানাপুকুরে আশ্রয় নেয়। নিজেদেরকে বরযাত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিতে তাদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত বাসর থেকে বর বেরিয়ে এসে সমস্যার মীমাংসা করেন। গল্পে কৌতূহল থেকে নাস্তানাবুদ হবার ঘটনাক্রিয়া বর্ণনায় লেখক

হিউমরের আশ্রয় নিয়ে সমগ্র গল্পে অনাবিল হাস্যরসের ধারা সিঞ্চিত করে দিয়েছেন। ‘বৈরিগীর ভিটেয়’ গল্পখানিও হাস্যরসের গল্প। তবে গল্পের মূল অঙ্গীরস অতিপ্রাকৃত রস। গল্পের পরতে পরতে পরিবেশিত হয়েছে ভৌতিক অনুভূতি। প্রভাতকুমারের ‘রসময়ীর রসিকতা’ গল্পে ভৌতিক বিশ্বাসের উপর আস্থা স্থাপনে time এবং space-কে চমৎকারভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই আলোচ্য গল্পেও গোকুল বৈরাগীর ভিটেয় নাছোড়বান্ধা আধুনিক ছোকরাদের থিয়েটারের অভিনয়কালে বিভিন্ন কুশীলবদের মুখে সংযোজিত সংলাপে গোকুল, সাধন, রেবতীদের ছায়া ফুটে ওঠে। সেলুকাস, সেকেন্দার, চাণক্যের সংলাপ পরিবর্তিত ও অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। প্রাক্তন দিনের প্রতিশোধজনিত হত্যায় মৃত চরিত্রগুলি তথা হত্যাকারী পলাতক গোকুলের জীবনক্রিয়ার প্রতিধ্বনি কুশীলবদের অসংলগ্ন সংলাপে প্রকাশ পেলে দর্শক ভৌতিক আবহের গন্ধে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। আসল সত্য – পালায় অংশগ্রহণকারী রাঁধুনী অশ্বিনীর কেরামতি। কচুরীর পুরে সে যথেচ্ছ সিদ্ধি মিশিয়েছিল। অপঘাত না হলেও রহস্যজনক হত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এই পরিত্যক্ত ভিটেয়। বাড়ীটি এখন ভূতের দখলে বলেই মানুষের বিশ্বাস। উঠানে মোচড়ানো খেজুর গাছ তার প্রমাণ। সেখানে থিয়েটার করা এবং এমন ভৌতিক আবহ তৈরী, সর্বোপরি প্রকৃত সত্যের উন্মোচন – এই সব কিছুকে কেন্দ্র করে ভৌতিক পরিবেশে, অতিপ্রাকৃত রসের আবহে, হিউমরের ছোঁয়ায় প্রাণখোলা হাসির খোরাক জুটেছে পাঠকচিত্তে। এই ধারায় গল্পকারের ‘দ্রব্যগুণ’ গল্পটিও আলোচনা করা যেতে পারে। বড়দিনের বাজার করতে শৈলেন বাজারে প্রবেশ করে বাহক পুনিয়াকে নিয়ে। নিজের হাতে দুটি বোতল। একটিতে ফিনাইল, অন্যটি নারকেল তেল রাখার জন্য সংগৃহীত। সন্ধ্যার পর হাতে দুটি বিলেতী মদের বোতল ভেবে দর্শকগণ কৌতূহলী হয়ে ওঠে। বিস্মিত হন করুণাময়বাবু। নাছোড়বান্ধা মাতাল বন্ধু অনাদিও হতবাক। তার জেরার কাছে বাধ্য হয়ে মিথ্যা বলতে হয় শৈলেনকে। পরদিন নীতি-উপদেশ দিতে বৃদ্ধ প্রসন্নবাবু, করুণাময়বাবুদের মতো অনেকে আসে তার বাড়ী। বন্ধু অনাদিও আসে। স্বরাজী-গান্ধীবাদীদের একটি দল তার বাড়ীতে এসে সত্যাগ্রহ শুরু করে। পিকেটিং বসিয়ে তারা বিদেশী দ্রব্য বর্জন তথা শৈলেনবাবুর চিত্তশুদ্ধির আবেদন জানাতে থাকে। জ্বালাতন সহ্য করতে না পেরে শৈলেন ঘর থেকে একটি বোতল বের করে এনে আছড়ে ভাঙে। দুর্ভাগ্যগক্রমে সেটি তীব্র সুরাগন্ধময় মেথিলেটেড স্পিরিটের বোতল ছিল। সত্যাগ্রহীদের মনে আর কোন দ্বিধা থাকে না বিলাতী মদের নমুনা নিয়ে। খবরটি ডিসেম্বরের ‘বজ্রবাণী’ পত্রিকাতেও প্রকাশ পায়। সন্ধ্যার পরে হাতের বোতল ব্যবহার্য সাধারণ দ্রব্যের পরিবর্তে বিলাতী মদের বোতলে প্রতিপন্ন হয়ে শৈলেনবাবুকে যেভাবে নাকাল করেছে তা থেকে উদ্ভূত হাস্যরসই আলোচ্য গল্পের মূল বিষয়।

ব্যর্থ প্রাক্তন প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন করে লেখা করুণ রসের গল্প হল ‘হৈমন্তী’ এবং ‘বর্ষায়’ গল্প দুটি। ‘জীবনের অনেক গভীর ভাবাবেগ ও ভক্তিবিশ্বাসের মূল যে কত মিথ্যা মোহ ও অবাস্তব মায়ার ছলনাজালে জড়িত, এবং সে কারণেই মানুষের গভীরতর

সুখ দুঃখও ক্ষেত্রবিশেষে যে কত হাস্যোদ্দীপক, এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ‘কালিকা’, ‘বৈরিগীর ভিটেয়’, ‘হৈমন্তী’ ও ‘বর্ষায়’ প্রভৃতি গল্পে’।৪‘হৈমন্তী’ গল্পখানি অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বর্ণনায় হাস্যোদ্দীপক। তবে সেখানে একটি করুণ রসকেও অভিসিঞ্চিত করা হয়েছে। ফটোগ্রাফারের দোকানে নিজের ছবির পাশে মানানসই ভাবে সাজিয়ে রাখা নারীর ছবি দেখে যে মুগ্ধতার জন্ম হয়েছিল তা বাস্তাবায়িত হতেই পারতো বর্তমানের রেল ইঞ্জিনিয়র সুরেশ্বর গুপ্তের জীবনে। নইলে ফটোর নায়িকা অমিতা সেনের সঙ্গে কাকতালীয় হলেও মুখোমুখি সাক্ষাৎ কেন ঘটবে ? Appointment letter হাতে পেয়েই কর্মচঞ্চল জীবনসাগরে ঝাঁপ দিয়ে ভুলে গিয়েছেন সব প্রাক্তনকে, আজ হৈমন্তিক বিকালে সন্তানসহ সাঁওতাল দম্পতির এগিয়ে চলার প্রাণবন্ত ছবি, তাঁর অফিসে স্টেনোর চাকরীর Interview দিতে আসা অমিতা সেন – সব মিলে একটা দোলা দিয়ে যাচ্ছে। দুজনেই আজ অবিবাহিত। তথাপি পরস্পরের হাত ধরাও অসম্ভব। এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলাই জীবন নয়। জীবনের কিছু মৌল দাবীকে পূরণ করাও জীবন। অস্তরাগের শেষ আভাটুকু আকাশে মিলিয়ে যাবার আগে তাই আক্ষেপ –‘নিঃসঙ্গ শ্রান্ত ব্যর্থ ... কেহ কাহাকেও পাইবে না জীবনে। নীড় নাই, সোনার ফসলও নাই; – শ্রান্ত সন্ধ্যায় কোথায় গিয়া কি গুছাইয়া তুলিবে ?’৫

পঞ্চদশ-বর্ষীয়া বালিকার প্রেমপত্রের দৌত্যকার্য করতে গিয়ে অষ্টমবর্ষীয় বালকের মনে যে প্রণয়-দুর্বলতা তৈরী হয়েছিল সেই প্রাক্তন স্মৃতিজর্জর এক করুণ কাহিনী ‘বর্ষায়’। ‘ধর্মতলা-টু-কলেজ স্কোয়ার’ গল্পখানি ল-কলেজের ফাস্ট বয় ও তার প্রণয়িনী সুনন্দা ওরফে নন্দা বা নদু বা শানু বা সুনু নাম্নী নায়িকার ভীরুতা মিশ্রিত প্রণয়ের গল্প। পশুচরিত্র নির্ভর বাংলা ছোটগল্পের ধারায় আমরা মহেশ , লম্বকর্ণ, বুধীর বাড়ি ফেরা, সাদা ঘোড়া , কালাপাহাড় , গবিন সিংহের ঘোড়া , সৈনিক, বাঘা, গণেশ জননী, আদরিণী, কুইন অ্যান প্রভৃতি গল্পগুলিকে স্মরণ করতে পারি। এদের মধ্যে বাৎসল, স্নেহের মাধুর্য ফুটে উঠেছে আদরিণী, মহেশ, গণেশ জননীতে। সখ্যরসের মহিমা ফুটে উঠেছে বাঘা ও কালাপাহাড়ে। মানুষের হীন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছে সৈনিক গল্পে। নির্ভেজাল হাস্যরসের গল্প লম্বকর্ণ। সাদা ঘোড়া ও কুইন অ্যান গল্পে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৩৬ বঙ্গশ্রী পত্রে প্রকাশিত কুইন অ্যান গল্পের প্রেক্ষাপট রাজনৈতিক হলেও এখানে রায় বাহাদুর খেতাব লোভী স্বার্থান্বেষী. ইংরেজের তোষামোদকারী বাঙালী জমিদার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ননীগোপাল চক্রবর্তীর শ্বেতাঙ্গ-প্রভুপ্রীতিবশে তার কথায় ঘুড়ী কেনেন। উডবার্ন সাহেবের ঘুড়ীর পিঠে চড়ে ফটো তুলবেন ননীগোপালবাবু। সে স্বপ্ন তার ক্ষতবিক্ষত হয়। বিপর্যস্ত আর নাকাল হতে হয় কেবল। তার এই নাকাল হবার দৃশ্য পাঠক চিত্তে হাস্যরসের জোগান দেয়। কেবল হিউমর নয় কিছু শ্লেষও রয়েছে গল্পে। গল্পশেষে

পারিষদ অনন্তকে তার নির্দেশ –‘তুমি দিয়ে দাও কাগজে একটা বিজ্ঞাপন। সামনের শীতটা যাক, তখন আবার একটা কিনে নিতেই বা কতক্ষণ ?’**৬**

এই সামগ্রিক আলোচনার শেষে এসে বলতে হয় হিউমরিস্ট বিভূতিবাবুর গল্পকথার প্রধানত তিনটি ধারা – কবিত্ব শক্তি, দার্শনিক বোধ আর হাস্যরস। এই তিনের সংমিশ্রণে ভাবাবেগের আত্যন্তিকতায়, মানবসত্তার সুখ-দুঃখের বিচিত্র উপস্থাপনায়, সাদামাঠা আঙ্গিকের গঠনে সরলরৈখিক বর্ণনায় তিনি জীবনের বিচিত্র দিককে আলোচনা করেছেন গল্পে। মানুষ-দার্শনিক-শিল্পীর রসায়নে সে আলোচনা কতটা সমৃদ্ধ তার বিচার পাঠকেরই হাতে।

তথ্যসূত্র:

১. অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, পঞ্চম সংস্করণঃ মাঘ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২, দেজ পাবলিশিং , কলকাতা-৭৩, পৃ. ৬২

২. তদেব, পৃ. ৬৫-৬৬

৩. শ্রীভূদেব চৌধুরী, ‘বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার’, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৯, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৫২৫

৪. জগদীশ ভট্টাচার্য, ‘আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী’, দ্বিতীয় প্রকাশ মাঘ ১৪১৩, জানুয়ারি ২০০৭, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা – ৭৩পৃ. ৬০

৫. অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, পঞ্চম সংস্করণঃ মাঘ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২, দেজ পাবলিশিং , কলকাতা-৭৩, পৃ. ১০২

৬. তদেব, পৃ. ১১২

“অভিজ্ঞানশকুন্তলম্” ও প্রকৃতি

শেফালী মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন

সারসংক্ষেপ: প্রকৃতি ও জীবজগৎ একই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুগে যুগে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর কাব্য কল্পনায় এই সম্বন্ধটি ধরা পড়েছে। ইংরেজ কবিদের মধ্যে Wordsworth as a ‘Poet of Nature’ প্রকৃতিকে সচেতন জীবরূপে দেখেছেন, সেইরূপ একই কারণে ভারতবর্ষেও কালিদাসকে ‘প্রকৃতির কবি’ রূপে আভিহিত করা হয়ে থাকে। আজকের দিনে পরিবেশের সার্বিক সংকট আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। অরণ্য উচ্ছেদ, প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান অভিযান, জল-বায়ু-মৃত্তিকা দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ণ সেই সংকটের মূলে। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে সুখে থাকে, প্রকৃতিবিযুক্ত হলে তার মানসিক সংকট সৃষ্টি হয়। কালিদাস জীবনের কবি, প্রাণের কবি । জীবন, প্রাণ প্রকৃতিরই অঙ্গ। তাই কালিদাসের যেকোন সাহিত্যে প্রকৃতি মূর্ত হয়ে উঠেছে । স্বাভাবিকভাবে অমরকবি কালিদাসের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেও অনবদ্য নিসর্গপ্রেমের প্রতিফলন দেখা যায়। এই পত্রে আমি তাঁর সৃষ্ট ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকে নিসর্গপ্রীতির যে অনুপম নিদর্শন বহুল পরিমাণে বিদ্যমান তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

সূচকশব্দ: জীবন, প্রকৃতি, প্রযুক্তি, নিসর্গপ্রীতি।

প্রকৃতি ও জীবজগৎ একই বিশ্বপ্রকৃতি মনুষ্য সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুগে যুগে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর কাব্য কল্পনায় এই সম্বন্ধটি ধরা পড়েছে। ইংরেজ কবিদের মধ্যে যেমন দেখা যায় প্রকৃতিকে সচেতন জীবরূপে দেখার জন্য Wordsworth ‘Poet of Nature’ ‘প্রকৃতির কবি’ আখ্যা পেয়েছেন, সেইরূপ একই কারণে ভারতবর্ষেও কালিদাসকে ‘প্রকৃতির কবি’ রূপে আভিহিত করা হয়ে থাকে।

আজকের দিনে পরিবেশের সার্বিক সংকট আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। অরণ্য উচ্ছেদ, প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান আভিযান, জল-বায়ু-মৃত্তিকা দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ণ সেই সংকটের মূলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের এক নতুন তত্ত্বের জন্ম হয়। ১৯৭৮ সালে উইলিয়াম রুখার্ট সেই তত্ত্বের নাম দেন:ইকোক্রিটিসিজিম্। প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা, মানব ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ, নিগুঢ় সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা ইকোক্রিটিসিজিম্-এর মূল কথা।

মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে সুখে থাকে, প্রকৃতিবিযুক্ত হলে তার মানসিক সংকট সৃষ্টি হয়।কালিদাস জীবনের কবি,প্রাণের কবি।জীবন, প্রাণ

প্রকৃতিরই অঙ্গ।তাই কালিদাসের যেকোন সাহিত্যে প্রকৃতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবে অমরকবি কালিদাসের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেও অনবদ্য নিসর্গপ্রেমের প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর সৃষ্ট 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেও নিসর্গপ্রীতির অনুপম নিদর্শন বহুল পরিমাণে বিদ্যমান।

কালিদাসকে যে কেন প্রকৃতির কবি বলা হয় তা তাঁর যে কোন কাব্য বা নাটক পড়লেই অনুধাবন করা যায়। 'ঋতুসংহার', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত', 'বিক্রমোর্বশীয়,'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'- সর্বত্রই তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের, প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার অনুভূতির পরিচয় মেলে।

সমগ্র 'ঋতুসংহার' ঋতুবৈচিত্র্যের সঙ্গে মানবজীবনেও যে বৈচিত্র্য আসে তার কাব্যিক প্রকাশ। 'রঘুবংশে'ও ফেনিল সমুদ্র, সবুজ বনরাজি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় এবং সেই সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে নায়ক- নায়িকার প্রেমলীলার তুলনায়, অকারণ লোকাপাবাদে সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার সময় জাহ্নবী গঙ্গার নিষেধ করার প্রচেষ্টা বর্ণনায়, সীতার দুঃখে বনের পশুপাখীরও করুণ অবস্থা বর্ণনায়, 'মেঘদূতে' যক্ষের অচেতন মেঘকে দৌত্যে নিযুক্ত করায়, নদ-নদীর বর্ণনায়, নায়িকার বিভিন্ন অবস্থার তুলনায়, অলকার অলৌকিক রূপ বর্ণনায় এবং অনুরূপ অসংখ্য ক্ষেত্রে কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় মেলে।'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেও এই বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্যে'র শকুন্তলা প্রবন্ধে বলেছেন "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকে অনুসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন,কন্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রভৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। "প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই।"

আলোচ্য নাটকের প্রস্তাবনাতেই গ্রীষ্মসময়ের পাটলসংসর্গে সুরভি বনবায়ুর কথা, নটীর গানের মধ্য দিয়ে জানতে পারি বিলাসিনী রমণীরা ভ্রমরের দ্বারা অল্প অল্প চুম্বিত কোমল কেশরাগ্রবিশিষ্ট শিরীষ ফুলগুলি তাদের কানের অলঙ্কার হিসাবে পরছে।

নগরসভ্যতার প্রতিনিধি রাজা দুষ্যন্ত। শিকার করতে গিয়ে তিনি ঢুকে পড়েছেন কন্বের তপোবনে। তপোবনের ধারণার মধ্যেই প্রকৃতি ও মানবের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা আছে। তপোবনে হিংসার স্থান নেই, রিরংসার জ্বালা নেই, লোভের প্রদাহ নেই। এখানে মানুষ আর প্রকৃতি আর মানবেতর প্রাণীরা নির্বিবাদে বাস করে। তাদের সম্পর্ক খাদ্য-খাদকের নয়, বন্ধুত্বের, সহমর্মীতার। রাজা দুষ্যন্ত সেসব কথা জানেন না, অথবা জানলেও সেসবকে কথার কথা মনে করেন। অরণ্যের কেউ নন তিনি। তিনি তো বহিরাগত। তিনি শিকারের আনন্দে এক হরিণের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন। তাঁকে নিবৃত্ত করে এক তপস্বী বললেনঃ মহারাজ, আশ্রমমৃগ বধ করবেন না।

কতদিন আগের তপস্বীর এই কাতর অনুরোধ সভ্যতাগর্বী একবিংশশতাব্দীর পরিবেশসচেতন মানুষেরও অনুরোধ। অরণ্যের মতো আরণ্যক প্রাণী ধ্বংস করে আমরা নিজেদের কবর খুঁড়ে চলেছি ক্রমাগত। মানবেতর প্রাণীরাও যে কোন না কোনভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে সে কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। শুধু তাই নয়, দুষ্যন্তের আচরণে প্রতিফলিত হয় সভ্য ও বুদ্ধিমান মানুষের অকারণ প্রাণীহত্যার উল্লাস। তপস্বী রাজাকে আরও বলেছেনঃ শরাসনে যে শর সংহিত করেছেন আশু তার প্রতিসংহর করুন; আপনার শস্ত্র আর্তের পরিত্রাণের জন্য, নিরপরাধের প্রহারের জন্য নয়। রাজা সারথিকে বললেন সারথি, কেউ বলে না দিলেও এ জায়গা যে তপোবন তা বোঝা যাচ্ছে। কেননা-গাছের যে কোটরে শুকপাখি থাকে, সেই কোটরের মুখ থেকে নীবার ধান গাছের তলে ছড়িয়ে আছে; কোন জায়গায় চকচকে ও মসৃণ পাথরগুলো পড়ে আছে- সেগুলি যে ঈঙ্গুদীফল ভাঙ্গার জন্য ব্যবহার হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে; মানুষের সংস্পর্শে থাকায় বিশ্বাস জন্মেছে এমন আশ্রমের হরিণগুলো রথের শব্দ শুনছে, ভয়ে পালাচ্ছে না; আর জলাশয়ের পথগুলোও স্নান করে ফেরা ঋষিদের পরিধেয় বাকল থেকে পড়া জলের ধারায় চিহ্নিত হয়ে আছে।

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ।।

শকুন্তলা নগর- সভ্যতার কৃত্তিমতা থেকে বহুদূরে আশ্রমে আবাল্য প্রতিপালিত হয়েছে। হাবে- ভাবে, ভূষণে- প্রসাধনে- সরলতার, বিশ্বস্ততার, স্বাভাবিকভাবে মূর্ত বিগ্রহ শকুন্তলা। নাগরিক কৃত্তিমতার সঙ্গে সর্বদা পরিচিত দুষ্যন্ত 'আরণ্যক' শকুন্তলার অকপট স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে আজ বিমুগ্ধ। শকুন্তলার সঙ্গে তুলনা করা হল নীলোৎপলের। এ ফুল ফোটে রাতে –চাঁদের আলোয়। এত কোমল যে তা দিনের আলো সহ্য করতে পারে না। রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার বল্কল পরিধান সম্পর্কে বলেন-

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।।

অর্থাৎ পদ্ম শৈবালে ঘেরা থাকলেও সুন্দরই লাগে। চাঁদের কলঙ্ক মলিন হলেও তা তার সৌন্দর্য বাড়ায়। এই তন্বী শকুন্তলা বল্কল পরে থাকলেও বেশী সুন্দর লাগছে। আকৃতি যাদের সুন্দর –সবই তাদের অলঙ্কার।

শকুন্তলা প্রিয়ংবদাকে বলছে , বাতাসে বকুলগাছের নতুন পাতাগুলি কাঁপছে– মনে হচ্ছে যেন আঙ্গুল দিয়ে তাড়াতাড়ি তার কাছে যাবার জন্য ডাকছে। যাই, একে

একটু আদর করি। অনসূয়া শকুন্তলাকে বলল, সহকারকে নিজেই পতিরূপে বরণ করেছিল যে- এই সেই নবমালিকা লতা, যার তুমি নাম দিয়েছিলে 'বনজ্যোৎস্না'। তুমি কি করে একে ভুলে গেলে? শকুন্তলা বলে যে, যেদিন একে ভুলব সেদিন আমি নিজেকেই ভুলে যাবো। লতার কাছে গেলেন এবং বললেন- দেখ, কি সুন্দর সময়ে এই লতা আর সহকারতরুর মিলন হয়েছে। বনজ্যোৎস্না যৌবনের নতুন ফুল ফুটিয়ে শোভা পাচ্ছে। আর এই সহকার নতুন পল্লবে ভরে উপভোগের যোগ্য হয়ে উঠেছে। ভ্রমর শকুন্তলার মুখের কাছে আসছে। এর দ্বারা শকুন্তলার মুখের সঙ্গে পদ্মের সাদৃশ্য সূচিত হচ্ছে। রাজা দুষ্যন্তের কথায় ভ্রমরের উপর তাঁর ঈর্ষ্যা পরিষ্কার পাচ্ছে।

"চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্তং খলু কৃতী।।"

দ্বিতীয় অঙ্কে রাজার বয়স্য মাধব্যের অনুরোধে মৃগয়া একদিনের জন্য স্থগিত থাকলে, সে অবসরে বন্যপ্রাণীদের নির্ভয়ে সেদিনটি যাপনের দৃশ্যটি অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্ত রূপে প্রকট হয়েছে,-

গাহন্তং মহিষাঃ নিপানসলিলাং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং
ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।
বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে
বিশ্রামং লভতামিদং চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ।।

তৃতীয় অঙ্কেও মালিনীতীরের বেতসকুঞ্জের সুন্দর বর্ণনা- পদ্মগন্ধে সুরভি জলকণার সংস্পর্শে শীতল বায়ু মদনসন্তপ্ত বিরহী-বিরহীনির যা প্রকৃষ্ট আশ্রয়। অসুস্থ শকুন্তলার উপশমের জন্য ব্যবহার হয় মৃণাল, উশীরানুলেপন; তাপশান্তির জন্য পদ্মপত্রে রচিত হয় তাঁর স্তনাবরণ। সখীরা যুক্তি দেয়- রাজার কাছে প্রেমপত্র পাঠানো হোক। শুকোদরকোমল পদ্মপত্রে নখের আঁচড়ে শকুন্তলা প্রেমপত্র রচনা করেন। মৃগশিশুকে মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার অছিলায় সখীরা রাজার সঙ্গে শকুন্তলার ঘনিষ্ঠ মিলনের সুযোগ করে দেয়।

চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় আমরা দেখি বনদেবতারা শকুন্তলার জন্য অমূল্য আভরণ, অলক্তক, ক্ষৌমবস্ত্র উপহার দিচ্ছে- রাজরাণীর যোগ্যভূষণে তাঁদের স্নেহের কন্যাকে যেন পাঠাতে চাইছে। মহর্ষি কন্ব আশ্রমতরুর কাছে বিদায়ের অনুমতি চাইলেন-

ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোস্তরবঃ,
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মন্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুত্সবঃ

সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্।।

কোকিলের ডাক শুনতে পেয়ে মহর্ষি কন্ব বললেন- একসঙ্গে বনে বাস করায় যাদের সঙ্গে সখ্য হয়েছে এমন সব তরুসকল শকুন্তলাকে বিদায়ের অনুমতি দিয়েছে।মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এমন অন্তরঙ্গ বন্ধনের দৃষ্টান্ত বিরল। শকুন্তলার বিদায়লগ্ন সমাগত। আসন্নবিয়োগের চিন্তায় আশ্রমের প্রাণীদেরও কি ভাবান্তর।

মাতা গৌতমী বললেন বৎস, আত্মীয়ের মত স্নেহপরায়ণ এই বনদেবতারাও তোমায় যাবার আনুমতি দিয়েছেন।পূজনীয় এঁদের প্রণাম কর।শকুন্তলা প্রিয়ংবদাকে বলল – 'হলা প্রিয়ংবদে, ননু আর্যপুত্রদর্শনোত্সুকায়া অপি আশ্রমপদং পরিত্যজন্ত্যা দুঃখেন মে চরণৌ পুরতঃ প্রবর্ততে।' প্রিয়ংবদা বলল সখী, তপোবনের বিরহে তুমিই যে কেবল কাতর হয়েছ তা নয়। দেখ, তোমার আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তপোবনেরও সেই একই অবস্থা।

উগ্গলিঅদব্ভকবলা মিআ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরা।
ওলরিঅপন্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাও।।

হরিণীদের মুখ থেকে ঘাসের গ্রাস পড়ে যাচ্ছে। ময়ূরগুলি আর নাচছে না। লতাগুলি থেকে হল্দে পাতা খসে পড়ছে- মনে হচ্ছে তোমার বিরহে তারা অশ্রুবিসর্জন করছে।শকুন্তলা বা তার সখীরাই আশ্রমের তরুলতার সঙ্গে একাত্ম তা নয়- মহর্ষি কন্বও। সামান্য নবমালিকা লতা যোগ্য সহকারের সঙ্গে মিলিত হয় কিনা – তার জন্যও তাঁর চিন্তা। শকুন্তলা পিতাকে বললেন তাত, এই হরিণী গর্ভভারে তাড়াতাড়ি চলতে পারে না- কুটিরের কাছেই সবসময় থাকে। এ যখন নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করবে, তখন সেই শুভসংবাদ জানানোর জন্য কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। শকুন্তলা যেতে গিয়ে বাধা পেয়ে বলল- কে যেন আমার কাপড় ধরে টানছে। কাশ্যপ বললেন- যার মুখ কুশের ডগায় ক্ষতবিক্ষত হলে ক্ষত শুকানোর জন্য তুমি ইঙ্গুদীর তেল লাগিয়ে দিতে, শ্যামা ধানের মুঠি খাইয়ে তুমি যাকে বড় করে তুলেছ, যাকে তুমি নিজের পুত্র বলে গ্রহণ করেছ, সেই হরিণ তোমার পথ আটকাচ্ছে। তপোবন ত্যাগ করার শেষ মুহুর্তেও শকুন্তলা গর্ভভারমন্থরা হরিণীর সুখপ্রসব সংবাদ দেবার জন্য কণ্বকে অনুরোধ করে। শকুন্তলা বলল সখী, দেখ – সহচর চক্রবাক পদ্মপাতার আড়ালে পড়ে যাওয়াতে তাকে দেখতে না পেয়ে চক্রবাকী কাতর হয়ে আর্তনাদ করছে। আমি সত্যিই কঠিন কাজ করছি। অনুসূয়া বলল সখি এরকম বলো না। এই চক্রবাকীও প্রিয়বিচ্ছিদে বিষাদের দীর্ঘ রাত কাটায়। মিলনের আশাই অসহনীয় বিরহের দুঃখও সহ্য করায়।" বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়।"(রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, 'শকুন্তলা')।

পঞ্চম অঙ্কের শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের রুক্ষ পরিবেশেও "পাণ্ডুপত্রাণাং মধ্যে কিসলয়ম্ ইব মধ্যে নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা অবগুণ্ঠনবতী ইয়ং কা স্বিত্-" এই বর্ণনার মধ্যেও প্রকৃতির স্পর্শ অনুভূত হয়। শকুন্তলা যে প্রকৃতির কত একাত্ম তা আমরা বুঝি পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত রাজার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টায় রত শকুন্তলার বর্ণিত এক কাহিনীতে। একদিন শকুন্তলা এবং রাজা দুষ্যন্ত যখন নবমালিকাকুঞ্জে নিভৃতমিলনের সুখ উপভোগ করছিলেন, তখন দীর্ঘাপাঙ্গ নামে হরিণশিশু সেখানে উপস্থিত হল। দয়াপরবশ হয়ে আপনি প্রথমে এই হরিণশিশুই জল পান করুক- এই বলে তাকে জলের লোভ দেখিয়ে কাছে ডাকলেন। কিন্তু আপনার সাথে পরিচয় না থাকায় সে আপনার হাতের কাছে গেল না। পরে সেই জলই যখন আমি নিলাম তখন সে সাগ্রহে পান করতে এল।তখন আপনি আমায় এইভাবে উপহাস করেছিলেন-'সর্বঃ সগন্ধেষু বিশ্বসিতি। দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ ইতি।' শকুন্তলা সম্বন্ধে রাজার এই মন্তব্যও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ বহন করেছে। ষষ্ঠ অঙ্কেও রাজার বিরহদশায় প্রকৃতির সমব্যথার ছবি আঁকা হয়েছে। কেননা কঞ্চুকীকে আমের মুকুল তোলায় রত দুই চেটীকে বলতে শুনি মহারাজ বসন্তোত্সব বন্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। বসন্তের গাছেরা পর্যন্ত মহারাজের আদেশ মাথা পেতে নিয়েছে, সেইসব গাছের পাখীরাও তা মেনে চলছে। দেখনা- আমের মুকুল বহুদিন আগে বের হলেও আজ অব্দি তাতে পরাগ জন্মেনি। কুরবক ফুল একটুখানি ফুটেও কুঁড়ি অবস্থাতেই রয়ে গেছে। শীতকাল চলে গেলেও পুরুষ কোকিলের কুহুরব তাদের কণ্ঠেই রয়ে গেছে। সপ্তম অঙ্কেও প্রবহবায়ু এবং মেঘরাজ্যের মধ্য দিয়ে স্বর্গ থেকে অবতরণ এবং মারীচের আশ্রমের বর্ণনায় প্রকৃতির প্রতি কালিদাসের অকুণ্ঠ অনুরাগের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. কালিদাস, মহাকবি। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।* সম্পা. ডঃ অনিল চন্দ্র বাসু। কলিকাতাঃ সংস্কৃত বুক ডিপো,
২০০০।

২. ------। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।* সম্পা. ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। কলিকাতাঃ শিবশঙ্কর প্রেস, ১৯৮৮।

৩. মজুমদার, দিলীপ। *কালিদাসের শকুন্তলা: ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে।* https://www.parabaas.com/PB71/LEKHA/pDilip71.shtml,2018. (Online)

৪. "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা" by Prof. Dr. Rabindranath Maiti, Department of Sanskrit, Narajole College. 2nd December, 2021 (An Online Article)

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণে ব্যোমকেশ-ভাষ্য : একটি পর্যালোচনা

পঙ্কজ কুমার মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ : বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণ গর্ব করার মতো স্তরে পৌঁছাতে না পারলেও অবশ্যই ইতিমধ্যে তা একটা নতুন ঘরানার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এই ধারার কাহিনি যে বর্তমানে দর্শকসমাজে চিত্তবিনোদনের অন্যতম খোরাক হয়ে উঠতে পেরেছে, এর পিছনে চলচ্চিত্রায়ণের ভূমিকাটি অনস্বীকার্য। গুণগত বিচারে বাংলা চলচ্চিত্রের ধারায় রহস্য কাহিনির রূপায়ণে যাঁদের গল্প চিত্রনাট্যের রূপ পেয়েছে তাঁদের মধ্যে কীর্তিমান দুজন লেখক হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায়। এঁরা দুজনেই চলচ্চিত্রের কারবারিও ছিলেন। অদ্যাবধি শরদিন্দুর রহস্য কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণের সংখ্যা প্রায় কুড়ি ছাড়িয়ে গেছে। এর শুরুটা হয়েছিল খ্যাতনামা পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরেই ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ‘চিড়িয়াখানা’ উপন্যাসের মাধ্যমে। আজকের বাংলা সিনেমায় ‘ব্যোমকেশ কাহিনি’র একটা স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তায় তা ঈর্ষণীয় স্থান লাভ করেছে, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ প্রবন্ধে শরদিন্দুর গোয়েন্দা গল্পের চলচ্চিত্রায়ণের উপর একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

সূচক শব্দ : গোয়েন্দা কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণ, প্রাক্ শরদিন্দু পর্ব, চলচ্চিত্রায়ণে ব্যোমকেশ অধ্যায়, শরদিন্দুর উত্তরাধিকার।

মূল আলোচনা :

গোয়েন্দা কাহিনির আকর্ষণ সর্বজনবিদিত এবং বর্তমানে এটি একটি বহুল পরিচিত সাহিত্য শাখা । সেইসূত্রে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিরও একটি নিজস্ব মূল্য স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইংরেজি গোয়েন্দা গল্পের অনুসরণেই বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি এসেছে। জনপ্রিয় গোয়েন্দা লেখক আর্থার কোনান ডয়েল তাঁর বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমসকে নিয়ে আসেন ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। এর ঠিক ৮ বছর পরেই অর্থাৎ ১৮৯২ সালে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ‘দারোগার দপ্তর’ লিখে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটান। এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থের নাম ‘বনমালী দাসের হত্যা’। তারপর ঠগী কমিশনের রিপোর্ট অবলম্বনে লিখতে আসেন কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই গোয়েন্দা গল্পের মৌতাতে যোগ দেন বিখ্যাত গোয়েন্দা লেখক পাঁচকড়ি দে। তাঁর গোয়েন্দা হলেন দেবেন্দ্রবিজয় ও সহকারী অরিন্দম। এরপর একে একে এই

আসরে কালানুক্রমে যোগ দেন দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, রমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়। গোয়েন্দা গল্প লিখে হেমেন্দ্রকুমার খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর গোয়েন্দা জয়ন্ত এবং সহকারি মানিক ও পুলিশ ইন্সপেকটর সুন্দরবাবু। এইভাবে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারা বিকশিত হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে : গোয়েন্দা কাহিনি কি শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের খোরাক? এটি কি অপাংক্তেয় সাহিত্য? এই প্রশ্নের যোগ্য জবাব দিতেই প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭০) আবির্ভাব । তাঁর গোয়েন্দা গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা তেত্রিশ । ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে 'পথের কাঁটা' গল্প দিয়েই তাঁর যাত্রা শুরু এবং শেষ গোয়েন্দা উপন্যাস 'বিশুপাল বধ'। এটি একটি অসমাপ্ত উপন্যাস; জুলাই মাসে ১৯৭০ সালে এটি প্রকাশিত হয়। শরদিন্দুর গোয়েন্দা গল্পের সংখ্যা ১৯, বড়গল্প ৫টি এবং উপন্যাসের সংখ্যা ৯টি। শরদিন্দু প্রায় একক প্রচেষ্টায় বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যকে সাহিত্যিক মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। সমালোচক সুকুমার সেন লিখেছেন, *"আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর শ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদা দিতে হয়। ... শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৌরব এইখানে যে তিনি গোয়েন্দা কাহিনীকে সাধারণ উপন্যাসের মর্যাদায় তুলেছিলেন।'*[১] শরদিন্দু সমকালীন গোয়েন্দা লেখকদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী হলেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত। তাঁর সৃষ্ট স্মার্ট গোয়েন্দা কিরীটী রায় একসময় জনপ্রিয়তায় শরদিন্দুর ব্যোমকেশকেও ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। সমকালের অন্যান্য গোয়েন্দা লেখকেরা হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। আর শরদিন্দুর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দীপক চ্যাটার্জী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিমল কর, সমরেশ বসু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অদ্রীশ বর্ধন, সত্যজিৎ রায়, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকবৃন্দ। সে যাই হোক, এখন বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণ প্রসঙ্গে দৃষ্টি ফেরানো যাক।

ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনি চলচ্চিত্রায়ণে যেমন একটি নিজস্ব স্টাইল সৃষ্টি করতে পেরেছিল , বাংলা সিনেমায় ঠিক তেমন স্টাইল কিন্তু তৈরী হয়নি। সমালোচক সোমেন ঘোষ মন্তব্য করেছেন, *" হিচককের অনবদ্য চলচ্চিত্র দক্ষতায় তাঁর ডিটেকটিভ ছবিগুলো সারা বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছিল। কেবল গল্পের মনস্তাত্ত্বিক স্তর উন্মোচনেই নয়, সিনেম্যাটিক প্রকরণের দিক থেকেও সেগুলি উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন হয়ে আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা তথা সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রে এমন কোনো নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না।'*[২] একথা মেনে নিয়েও বলতে দ্বিধা নেই যে, বাংলা গোয়েন্দা চলচ্চিত্র

নির্মাণে ব্যোমকেশ ঘরানা দর্শক সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং এর আবেদনমূল্যও কম নয়।

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে শশধর দত্তের মোহন সিরিজের একাধিক ঘটনাকে অবলম্বন করে 'দস্যুমোহন' নামে সিনেমা তৈরি হয়েছিল। এর পরিচালক ছিলেন স্বনামধন্য চলচ্চিত্র নির্মাতা অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় । ১৯৬০ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত গোয়েন্দা চলচ্চিত্র 'চুপিচুপি আসে' মুক্তি পেয়েছিল। তারপর রাজকুমার মৈত্রের কাহিনি নিয়ে 'শেষ অঙ্ক' নামে একটি ছবি মুক্তি পায় ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৫ সালে মুক্তি পায় অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে ও হীরেন নাগের পরিচালনায় ভিন্নধর্মী গোয়েন্দা চলচ্চিত্র 'থানা থেকে আসছি'। এই সিনেমায় আলোকচিত্রের কাজ করেন কানাই দে ও সংগীত পরিচালক ছিলেন তিমিরবরণ । সবচেয়ে বড় বিষয় এতে ডিটেকটিভের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার।

১৯৬৭ সালে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় নির্মিত হয় শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের লেখা 'চিড়িয়াখানা' উপন্যাসটি। সত্যজিৎ পরিচালিত প্রথম গোয়েন্দাকাহিনি বিষয়ক সিনেমা এটি। ছবিটির প্রযোজক হলেন হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। চিড়িয়াখানা ছবিটির নায়ক উত্তমকুমার ব্যোমকেশ চরিত্রে এবং অজিতের চরিত্রে শৈলেন মুখার্জী অভিনয় করেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সত্যজিতের সিনেমায় অজিত বন্দোপাধ্যায়ের পদবী হয়ে যায় 'চক্রবর্তী' । আর অহেতুক ব্যোমকেশকে কালো ফ্রেমের চশমা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন তা স্পষ্ট নয় । এটি মূলত ক্রাইম ফিল্ম, কিন্তু রহস্য ও উৎকণ্ঠা নেই বললেই চলে। এ সিনেমার প্রায় প্রত্যেকটি অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। উত্তামকুমারের অভিনয়ও স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু শরদিন্দুর শক্তিশালী গোয়েন্দা কাহিনিতে সত্যজিতের ক্যারিশমা তথা মেধা সেভাবে ফুটে ওঠেনি। আরও ভালো ছবি হিসেবে একে আশা করাটা অমূলক ছিল না। বোধকরি সেই কারণেই স্বয়ং শরদিন্দুরও সত্যজিৎ পরিচালিত এই ' চিড়িয়াখানা'র চলচ্চিত্রায়ণ পছন্দ হয়নি। তাই 'চিড়িয়াখানা' সত্যজিৎ ঘরানার ফিল্ম হিসেবে অনেকটাই বেমানান ঠেকে বইকি!

'শজারুর কাঁটা' ছবিটি ১৯৭৪ সালে শ্রীমতী মঞ্জু দে'র পরিচালনায় মুক্তিলাভ করে। এতে অজিতের ভূমিকায় শৈলেন মুখার্জী থাকলেও ব্যোমকেশ হন শ্যামল ঘোষাল। সিনেম্যাটিক দক্ষতার ছাপ এতে নেই; স্বভাবতই এটি বানিজ্যিক সফলতা পায়নি। কাহিনির গতিধারায় রহস্য উন্মোচন পর্বটি এই ছবিতে সেভাবে বিশ্লেষিত হয়নি। সাদাকালো এই সিনেমায় সুরকার ছিলেন সুধীন দাশগুপ্ত; কিন্তু আলোকচিত্র ছিল বড্ড সাদামাটা। এককথায় গোয়েন্দা কাহিনির রূপায়ণে পরিচালক ব্যর্থ হয়েছেন। ডি ডি বাংলায় ১৯৮০ সালে কিছুদিনের জন্য একটি ধারাবাহিক চলেছিল 'ব্যোমকেশ বক্সী' নামে। ব্যোমকেশ হয়েছিলেন অভিনেতা অজয় গাঙ্গুলী। কিন্তু জনপ্রিয়তার অভাবে অল্প দিনেই বিখ্যাত চিত্রপরিচালক বাসু চ্যাটার্জী ব্যোমকেশ চরিত্রটিকে সর্বভারতীয় স্তরে

দক্ষতার সঙ্গে মেলে ধরেন। কারণ তাঁরই পরিচালনায় ১৯৯৩ সালে 'Byomkesh Bakshi' ডি ডি ন্যাশানাল চ্যানেলে ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচারিত হতে শুরু করলে তা ক্রমশ জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে পড়ে। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত চলেছিল এই বহুল প্রচারিত ধারাবাহিকটি। এরই প্রভাবে ব্যোমকেশ চরিত্রে অভিনয় করে রজিত কাপুর জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যান। ধারাবাহিকে কে. কে. রায়না হয়েছিলেন অজিত এবং সুরকার ছিলেন আনন্দশঙ্কর। এর ফলেই শরদিন্দুর গোয়েন্দা কাহিনি সর্বভারতীয় রূপ পেয়ে গিয়েছিল। স্বপন ঘোষালের পরিচালনায় ২০০৪ সালে ডি ডি বাংলায় 'ব্যোমকেশ বক্সী' নামে পুনরায় একটি ধারাবাহিক আরম্ভ হয়েছিল। এতে ব্যোমকেশ ছিলেন সুদীপ মুখার্জী এবং অজিতের ভূমিকায় ছিলেন দেবদূত ঘোষ। এরপরে ২০০৭ সালে ফের স্বপন ঘোষাল তারা মিউজিক চ্যানেলে 'ব্যোমকেশ' ধারাবাহিকটি করেছিলেন। এখানে সপ্তর্ষি রায় হয়েছিলেন গোয়েন্দা ব্যোমকেশ এবং অজিত ছিলেন বিপ্লব চ্যাটার্জী। পরিচালক স্বপন ঘোষাল ২০০৯ সালে একটি সিনেমার পরিচালনা করেন, তার নাম ছিল 'মগ্ন মৈনাক'। শুভ্রজিত দত্ত ব্যোমকেশ চরিত্রে অভিনয় করেন, আর অজিতের ভূমিকায় অভিনয় করেন রাজর্ষি মুখার্জী। তবে দর্শক মহলে এটি একদম সাড়া জাগাতে পারেনি।

সত্যি কথা বলতে কি, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই এই ব্যোমকেশ বক্সীকে নিয়ে টলিউডে তুমুল মাতামাতি শুরু হয়। 'আদিম রিপু' কাহিনি অবলম্বনে পরিচালক অঞ্জন দত্ত 'ব্যোমকেশ বক্সী' নামে সিনেমা করেন। আবীর চ্যাটার্জী নতুন ব্যোমকেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং অজিতের ভূমিকায় অভিনয় করেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। এই সিনেমাতে সত্যবতী চরিত্রে প্রথম অভিনয় করেন উষশী চক্রবর্তী। অঞ্জন দত্তই ২০১২ সালে 'আবার ব্যোমকেশ' নামে সিনেমা করেন 'চিত্রচোর' গল্পটি অবলম্বনে। এটিও দর্শকদের মন কাড়ে। ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনায় ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। নতুন মুখ সুজয় ঘোষ ব্যোমকেশ হয়েছিলেন এবং অজিত হয়েছিলেন সংগীত শিল্পী অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। 'চোরাবালি' গল্প অবলম্বনে এই সিনেমাটির নাম ছিল 'সত্যান্বেষী'। কালীগতি চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করেন অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়য়। তবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকের এই ছবিটি অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় পরিচালক অঞ্জন দত্ত 'বেণীসংহার' অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, যার নাম ছিল 'ব্যোমকেশ ফিরে এলো'। এই সিনেমায় ব্যোমকেশরূপী আবীর চ্যাটার্জীর অভিনয় দর্শক মহলে সাড়া ফেলেছিল। ঐ বছরই কালার্স বাংলায় 'ব্যোমকেশ' নামে একটি সিরিয়াল শুরু হয়েছিল। এতে শরদিন্দুর ব্যোমকেশের অধিকাংশ কাহিনিই প্রদর্শিত হয়েছিল তিনজন পরিচালকের দ্বারা। এতে ব্যোমকেশ চরিত্রের ভালো অভিনয় করেন অভিনেতা গৌরব চক্রবর্তী এবং সত্যবতী হন ঋদ্ধিমা ঘোষ। অজিতের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৫ সালে শরদিন্দুর গোয়েন্দা কাহিনি নিয়ে চারটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। সেই কারণে অনেকেই এই বছরটাকে ‘ব্যোমকেশ year’ বলতে ভালোবাসেন। প্রথম সিনেমা আবার সেই ‘শজারুর কাঁটা’। বয়স্ক ব্যোমকেশ চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় প্রদর্শন করেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় এবং অজিত হলেন প্রদীপ মুখার্জী। অনেকটা অন্য নির্মাণে তুলে ধরেন পরিচালক শৈবাল মিত্র। এবার টলিউড ছেড়ে এই ব্যোমকেশ পাড়ি জমায় বলিউডে। দিবাকর ব্যানার্জীর পরিচালনায় শরদিন্দুর ‘সত্যান্বেষী’ গল্প অবলম্বনে তৈরী হয় অন্যতম একটি সিনেমা ‘Detective Byomkesh Bakshy’। জনপ্রিয় অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত ব্যোমকেশ চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করেন। আর দুর্দান্ত অভিনয় করেন আনন্দ তিওয়ারী অজিতের ভূমিকায়। দিবাকরবাবু পুরোপুরিভাবে শরদিন্দুর কাহিনি অবলম্বন না করলেও চিত্রসমালোচক ও দর্শকেরা চলচ্চিত্রটিকে বাহবা দিতে ভোলেন নি। এভাবেই ব্যোমকেশের নাম ভারতব্যাপী পুনরায় ছড়িয়ে পড়ে। একই বছরে মুক্তি পায় অঞ্জন দত্তের চতুর্থ সিনেমা ‘ব্যোমকেশ বক্সী’। এই মূল কাহিনি ‘কহেন কবি কালিদাস’ থেকে গৃহীত। নতুন ব্যোমকেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন যীশু সেনগুপ্ত । অজিত ছিলেন সেই শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়ই। বক্স অফিসে এটি তেমনভাবে কিন্তু সাফল্য লাভ করেনি। এরপর বেনারসের পটভূমিকায় শরদিন্দুর ‘বহ্নিপতঙ্গ’ গল্প অবলম্বনে আর একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়; সিনেমাটির নাম ‘হর হর ব্যোমকেশ’। ব্যোমকেশ চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করেন আবীর চট্টোপাধ্যায়। অজিত হলেন ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং সত্যবতী চরিত্রে অভিনয় করেন সোহিনী সরকার। এই সিনেমাটিকে ঘিরে কিন্তু দর্শক-মহলে বেশ আলোড়ন উঠেছিল জনপ্রিয়তার নিরিখে। ছবিটি পরিচালনা করেন অরিন্দম শীল। ঠিক এভাবেই বাংলা চলচ্চিত্রের ধারায় শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের ডিটেকটিভ কাহিনি একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে, একথা অনস্বীকার্য। শরদিন্দুর গোয়েন্দা কাহিনির চলচ্চিত্র নির্মাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এরপর অনেকেই ক্রাইম ফিল্ম তৈরীতে এগিয়ে আসেন।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে নারায়ণ সান্যালের কাহিনি অবলম্বনে যাত্রিক একটি ছবি করেন ‘যদি জানতেম’ নামে। ১৯৭৫ সালে ‘নিশি মৃগয়া’ নামে একটি ডিটেকটিভ সিনেমা মুক্তি পায়। ছবির পরিচালক ছিলেন দীনেন গুপ্ত এবং কাহিনিকার হলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। ১৯৭৬ সালে অভিনেতা রবি ঘোষ অশোক ঘোষালের কাহিনি ও চিত্রনাট্যে তৈরি করেন ‘নিধিরাম সর্দার’। সুরকার ছিলেন আনন্দশঙ্কর ও ক্যামেরার পিছনে ছিলেন সৌমেন্দু রায়। বিখ্যাত পরিচালক তপন সিংহ ‘আদালত ও একটি মেয়ে’ নামে একটি উল্লেখযোগ্য ছবি করেন ১৯৮২ সালে। তিনি নিজেরই লেখা কাহিনি নিয়ে ১৯৮৫ সালে ‘বৈদূর্য রহস্য’ নামে একটি রহস্যমুলক ছবি পরিচালনা করেন। এই দুটি সিনেমাতেই মনোজ মিত্রের অভিনয় দর্শকদের মন কাড়ে। প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর কিশোরদের লেখা গোয়েন্দা কাহিনি নিয়ে ১৯৭৪ সালে ‘সোনার কেল্লা’ সিনেমাটি

তৈরি করেন। আর ১৯৭৯ তে মুক্তি পায় 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। ফেলুদা চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মন কাড়া অভিনয় সব বয়সী দর্শকদের মাতিয়ে তোলে। জটায়ু চরিত্রে সন্তোষ দত্তের দুরন্ত অভিনয়ও ছিল মনে রাখার মতো। এই দুটি সিনেমায় ক্রাইম স্টোরি অন্যতর মাত্রা পেয়েছে সত্যজিতের সিনেমাটিক প্রকরণশৈলীর গুণে। এরপর সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায়ের পরিচালনায় ৬ টি ফেলুদা কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণ হয়। এখানে ফেলুদা চরিত্রে সব্যসাচী চক্রবর্তীর স্মার্ট অভিনয় দর্শকদের মাতিয়ে তোলে। কিন্তু সত্যজিতের মতো খাঁটি গোয়েন্দা চলচ্চিত্রের স্তরে এগুলি উন্নীত হতে পারে নি। অবশ্য এরপর থেকে নবীন প্রতিভাবান পরিচালকেরা উন্নতমানের খাঁটি গোয়েন্দা চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হবেন। এব্যাপারে আমরা আশাবাদী।

তথ্যসূত্র :

১. ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলি-৯, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৮

২. বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণ, সোমেন ঘোষ, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, সম্পাদক : তাপস ভৌমিক, প্রাক্ শারদ সংখ্যা, ১৮২০ বঙ্গাব্দ, কোলকাতা–৫৯

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা :

১. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, সম্পাদক তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ রায়বর্মণ, বইমেলা সংখ্যা, ১৯৯৬, কোলকাতা-৫৯

২. বিষয় চলচ্চিত্র, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট, ১৯৯৩, কলিকাতা-৯

৩. শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বাদশ খন্ড, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৪ বঙ্গাব্দ, কলি-৯

৪. শারদীয়া বিচিত্রপত্র, প্রবন্ধবার্ষিকী, সম্পাদক : সৌরদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়ন বন্দোপাধ্যায়, সৌম্যকান্তি দত্ত, ২০২১, কলি-৬

"তরুণ বৎসরের ফুল, পরিণত বৎসরের ফল": অরণ্যদুহিতার অভিজ্ঞান

দীপক নন্দী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, সংস্কৃত বিভাগ
আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলেজ

সারসংক্ষেপ : সীমাহীন গগনে কালিদাসকে যদি সূর্যের সাথে তুলনা করা যায়, তবে অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ সেই সূর্যের জ্যোতি। চরিত্র-চিত্রণ, নাটকীয় ঘটনার বৈচিত্র্য, কাব্যকলার সৌন্দর্য, সংলাপের মাধুর্য, চরিত্রের গভীরতা, কল্পনার বিশালতা, রস-গুণ ও অলংকারের যথাযথ প্রয়োগে "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে বিবেচিত। কালিদাসের তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল হল অভিজ্ঞান শকুন্তলম্। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কেবলমাত্র একটি সময়ে কালিদাস কে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়, কালিদাস হল একটি যুগের নামান্তর। মহাভারতের "শকুন্তলোপাখ্যান্"-এ মাত্র চারটি চরিত্র বর্ণিত হয়েছে- দুষ্যন্ত, শকুন্তলা, সর্বদমন ও মহর্ষি কন্ব। কিন্তু কালিদাস সেখানে ২৮ জন পুরুষ চরিত্র, ১৭ জন নারী চরিত্র এবং ১৬ জন মঞ্চে অনুপস্থিত চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটিয়ে ১৯৩টি শ্লোকযুক্ত শৃঙ্গাররস প্রধান সপ্তাঙ্কবিশিষ্ট একটি অপূর্ব কাব্য, তাঁর লেখনীর স্পর্শে সমাজকে উপহার দিয়েছেন। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনায় অদ্ভুত সামঞ্জস্য লক্ষ্য না করে পারা যায় না। নাটকে উল্লিখিত বিভিন্ন জীবজন্তু, ফুল-ফল ও বৃক্ষ-লতাদির উল্লেখ এক অপূর্ব প্রাণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। সত্যিই সার্থক হয়ে ওঠে এই উক্তি – "কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"।

সূচক শব্দ: স্বয়ংসম্পূর্ণ যুগ, মহাভারত, চরিত্রচিত্রণ, রস, অলংকার, রীতি, প্রকৃতি্, প্রাণবৈচি্ত্র্য।

মূল আলোচনা: প্রাচীন আলংকারিকগণ কালিদাসকে ব্যাস ও বাল্মীকির সমানাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। কালিদাস কেবল একটি নাম নয়, ব্যাক্তি নয়, কালিদাস একটি স্বয়ং সম্পূর্ণযুগ। বাণীর বরপূত্র মহাকবি কালিদাস কেবলমাত্র কালোত্তীর্ণ নয়, দেশোত্তীর্ণও বটে। অধিকাংশ সাহিত্যিকের মত কালিদাসেরও একটি নিজস্বতা বা মৌলিক স্বতন্ত্র রচনাশৈলী আছে, কিন্তু কালিদাসকে একটি নির্দিষ্ট সীমায় বদ্ধ করা যায় না। কোনো এক বিদগ্ধ পাশ্চাত্য গবেষক বলেছেন- "All literature implies style, for style is the reflection of the writers personality which is again, determind by the age in which he lives."

কালিদাসের জীবনাদর্শনে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও আধ্যাত্মিক চেতনা যেমন লক্ষ্যণীয় তেমন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে জন্মান্তর ও জাতিস্মরত্ববাদ – এই দুটি দার্শনিক তত্ত্বও পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষন করে।

Wouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline.
And all by which the soul is charmed
Enraptured, feasted, fed,
Wouldst thou the earth and heaven
Itself in one sole name combined?
I name thee, O' Sakuntala!
And all at once is said.

গ্যেটে –কৃত শকুন্তলা-প্রশস্তির E. B. Eastwick কৃত ইংরাজী অনুবাদ।

বাসন্তং কুসুমং ফলঞ্চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্বং চ তৎ
যৎকিঞ্চিন্মনসো রসায়নমহো সন্তর্পণং মোহনম্।
একীভূতমপূর্বমথবা স্বর্লোকভূলোকয়ঃ
ঐশ্বর্যং যদি কোঽপি কাঙ্ক্ষতি তদা শকুন্তলং সেব্যতাম্।।

গ্যেটে –কৃত শকুন্তলা-প্রশস্তির তারাকুমার কবিরত্ন-কৃত সংস্কৃত অনুবাদ।

আলোচ্য শিরোনামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলা যায় যে, মহাকবি কালিদাসের রচনা ফুল থেকে ফলে পরিণত হওয়া। মহাকবি কালিদাস তাঁর "মালবিকাগ্নিমিত্রম্" নাটকে যে প্রেমের সূচনা করেছিলেন, "বিক্রমোর্বশীয়ম্" নাটকে সেই প্রেমকে প্রগাঢ় করেছেন এবং "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে সেই প্রেমকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে মর্ত্যের কামজ প্রেমকে স্বর্গীয় প্রেমের পবিত্রতায় পরিণত করেছেন।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের উৎস হল- মহাভারতের আদিপর্বে ৭১-৭৪ তম অধ্যায়ে বর্ণিত "শকুন্তলোপাখ্যান", এছারাও "কঠ্ধ্হরি-জাতক" ও "পদ্মপুরাণ" থেকেও কবি কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। মহাভারতের একটি ছোট্ট বিষয়-বস্তুকে কালিদাস তাঁর লেখনীর স্পর্শে বৃহৎরূপ দান করেছেন। মূল মহাভারতের উপাখ্যানে কেবলমাত্র চারটি চরিত্র বর্তমান ছিল- দুষ্যন্ত, শকুন্তলা, সর্বদমন ও মহর্ষি কন্ব। নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনককৃত মহাযজ্ঞে সমবেত ঋষিগণের উপস্থিতিতে মহর্ষি জনমেজয় দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুত্র সর্বদমনের জন্মবৃত্তান্ত জানতে আগ্রহী হলে, তাঁর কৌতুহল নিরসনার্থে মহাভারতস্রষ্ঠা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ ব্যাসদেব শিষ্য বৈশাম্পায়ন তা ব্যাক্ত করেন। মৃগয়ার্থী রাজা দুষ্যন্ত মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রমে প্রবেশ করে শকুন্তলার মুখ থেকে তাঁর জন্মেতিহাস শুনে তাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করতে চাইলেন এবং সমগ্র রাজ্য দান করার মত প্রলোভনও দেখিয়েছিলেন। রাজা দুষ্যন্ত বলেছিলেন-

সুব্যক্তং রাজপুত্রী ত্বং যথা কল্যাণি ভাষসে।

ভার্যা মে ভব সুশ্রোণি ব্রুহি কিং করবাণি তে।।
সর্বং রাজ্যং তবাদ্যাস্তু ভার্যা মে ভব শোভনে।
গান্ধর্বেণ চ মাং ভীরু বিবাহেনৈহি সুন্দরি।।(আদিপর্ব। মহাভারত)

অর্থাৎ- ওগো কল্যাণি! তুমি এত সুন্দরভাবে বললে যাতে তোমাকে রাজপুত্রী বলেই মনে হয়। সুশ্রোণি! আমার ভার্যা হও। তোমার জন্য আর কিইবা করতে পারি? শোভনে! সমগ্র রাজ্য তোমাকে দেবো, তুমি আমার ভার্যা হও। ওগো ভীরুস্বভাবা সুন্দরি! গান্ধর্ব বিবাহের দ্বারাই তা সম্ভব।

কিন্তু শকুন্তলা পার্থিব লোভ সংবরণ করে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুত্র রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার অর্জন করবে, এই শর্তে দুষ্যন্তকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। বিবাহের নয় বৎসর পরে শকুন্তলা তাঁর পুত্র সর্বদমনকে নিয়ে রাজা দুষ্যন্তের নিকটে উপস্থিত হলে , রাজা লোক নিন্দার ভয়ে সজ্ঞানে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। শকুন্তলা যখন আত্মগ্লানি নিয়ে তপোবনে ফিরে যেতে উন্মুখ ঠিক তখনই এক আকাশবাণীর মাধ্যমে শকুন্তলার বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং রাজা তাকে গ্রহণ করেন।

এতাবদুক্ত্বা রাজানং প্রাতিষ্ঠত শকুন্তলা।
অথান্তরিক্ষাদ্ দুষ্মন্তং বাগুবাচাশরীরিণী।।
ভস্ত্রা মাতা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্।।(আদিপর্ব। মহাভারত)

সর্বদমনের নতুন নামকরণ হয় ভরত এবং ভরতকে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন-

দুষ্যন্তস্তং ততো রাজা পুত্রং শকুন্তলং তদা।
ভরতং নামতঃ কৃত্বা যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।।(আদিপর্ব। মহাভারত)

উপর্যুক্ত কাহিনীর সাথে কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের কাহিনীবিন্যাশের পার্থক্য বেশ লক্ষ্যণীয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে কিন্তু রাজা নিজের পরিচয় গোপন করেছিলেন(যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ সোঽহমবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় ধর্মারণ্যমিদমায়াতঃ।), মহর্ষি কন্ব দৈববাণীর মাধ্যমে শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের গান্ধর্ব বিবাহের কথা জেনেছিলেন, দুর্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত যা মূল মহাভারতে নেই। পতিগৃহে বিদায়ের বর্ণনা ও প্রকৃতির সাথে মানুষের একাত্মতার অপূর্ব দৃশ্য, অঙ্গুরীয়ক বৃত্তান্ত, হংসপদিকার সংগীতের মাধ্যমে জন্মান্তর ও জাতিস্বরত্ববাদের মত দুটি দার্শনিক তত্ত্ব যা মূল কাহিনীতে বর্ণিত হয়নি। ধীবর বৃত্তান্ত, অভিশাপ মোচনের পরে দুষ্যন্তের অতীত বৃত্তান্তের স্মৃতিমন্থন ও অনুতাপ, দুষ্যন্তের স্বর্গে গমন ও মহর্ষি মারীচের আশ্রমে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার অপূর্ব পুনঃমিলনের দৃশ্য ইত্যাদি বিষয় সংযুক্ত করে কালিদাস ২৮ জন পুরুষ চরিত্র, ১৭ জন নারী চরিত্র, ১৬ জন মঞ্চে অনুপস্থিত চরিত্র, ১৯৩ টি শ্লোক

সমন্বিত শৃঙ্গাররসাত্মক সপ্তাঙ্কবিশিষ্ট এক অপূর্ব দৃশ্যকাব্য সংস্কৃত জগৎকে উপহার দিয়েছেন।

কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে শৃঙ্গাররসকে মুখ্য বা অঙ্গীরস রূপে গ্রহন করেও অন্যান্য সকল রসকে অঙ্গরস বা গৌণ রস রূপে প্রয়োগ করেছেন। এই নাটকে ব্যাবহৃত রসগুলি হল- সম্ভোগশৃঙ্গাররস, বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররস, অদ্ভুতরস, বীররস, রৌদ্ররস, ভয়ানকরস, হাস্যরস, করুণরস ও বাৎসল্যরস। নাটকের তৃতীয় ও সপ্তমাঙ্কে সম্ভোগশৃঙ্গাররস, তৃতীয়াঙ্কে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররস, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে - তৃতীয় অঙ্কের শেষে ও সপ্তম অঙ্কের প্রারম্ভে বীররস, সপ্তমাঙ্কে অদ্ভূতরস, চতুর্থাঙ্কের বিষ্কম্ভকে রৌদ্ররস, প্রথমাঙ্কে ও তৃতীয় অঙ্কের শেষে ভয়ানক রস, দ্বিতীয়াঙ্কে হাস্যরস, চতুর্থাঙ্কে করুণরস ও সপ্তম অঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত ভরতকে স্পর্শ করে যে অপত্যস্নেহ অনুভব করেছেন, তার মাধ্যমে বাৎসল্য রসের অপূর্ব প্রয়োগ দেখা যায়। একটি নাটকে একসাথে এতগুলি গৌণরস অভিব্যক্তি লাভ করেছে, যা সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল।

কেবলমাত্র রসের প্রয়োগেই নয়, ছন্দ, অলংকার, সন্ধি ও রীতির প্রয়োগেও কালিদাস সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি, গর্ভসন্ধি, বিমর্ষসন্ধি ও নির্বহণ পঞ্চসন্ধির সুনিপুন প্রয়োগ দেখা যায়। সমগ্র অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে কালিদাস ২২ প্রকার ছন্দ ও ৪৫ প্রকারের অলংকার এবং সম্পূর্ণ বৈদর্ভী রীতির প্রয়োগ করেছেন। তবে অলংকারের ক্ষেত্রে অনুপ্রাস অলংকার ও ছন্দের ক্ষেত্রে আর্যা ছন্দের প্রয়োগ সর্বাধিক। কালিদাসের একটি বিশেষত্ব হল উপমা অলংকারের যথাযথ ব্যবহার। যে কারণে কালিদাসকে "উপমার কবি" বলা হয় এবং কালিদাসের প্রশংসা করে বলা হয়েছে "উপমা কালিদাসস্য"। মহাকবি মাঘের প্রশস্তি করতে গিয়ে কোন এক সমীক্ষক বলেছেন-

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
দন্ডিনঃ পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ।।"

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে কাহিনী বৈচিত্রের সাথে সাথে প্রাণবৈচিত্রের বর্ণানাও বেশ আকর্ষণীয়। নাটকের প্রতিটি অঙ্কে ফুল-ফল, পশু-পাখী ও বৃক্ষ-লতার উল্লেখ দেখা যায়, যা বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। যেমন এই নাটকে উল্লিখিত ফুলগুলি হল- নবমালিকা, বকুলফুল, পদ্ম, কুমুদিনী, পাটলপুষ্প, নীলপদ্ম, আকন্দফুল, আম্রমুকুল, মাধবীলতা, শিরীষফুল, স্বর্ণপদ্ম, মন্দার ফুল, কুরবক ফুল, কমলিনী, কুমুদ, কুন্দফুল। নাটকে বর্ণিত বৃক্ষ-লতাগুলি হল- অশোক বৃক্ষ, মাধবীলতা, মন্দার বৃক্ষ, চন্দন বৃক্ষ, আম্রবৃক্ষ, বেতসলতা, সহকার বৃক্ষ, বাণামূল, কুশঘাস, নীবার ধান, সপ্তপর্ণী বৃক্ষ, শমীগাছ, বেতগাছ, মুথাঘাস, কুরবক গাছ, দুর্বার শিস, শ্যামাধান, ডুমুর গাছ, নবমালিকা লতা। নাটকে প্রাপ্ত বিভিন্ন পশু-পাখী ও জীবজন্তুগুলি হল- অশ্ব, হরিণ, ভ্রমর, হস্তী, শুকপাখী, বরাহ, শার্দূল, মহিষ, ভাল্লুক, চক্রবাক্-পক্ষী, ময়ূর, হরিণশিশু, কোকিল, ব্যাঘ্র, রাজহংস,

সর্প, কুকুর, রোহিৎ মৎস্য, শকুনি, ইঁদুর, বিড়াল, চাতক পাখী ও সিংহশিশু। এই প্রাণবৈচিত্র্য যেন অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটককে এক স্বতন্ত্র্য অনন্যতা দান করেছে।

মহাভারতে বর্ণিত "শকুন্তলোপাখ্যান", এছারাও "কঠ্ধ্হরি-জাতক" ও "পদ্মপুরাণ"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের উৎস হলেও বাল্মীকিকৃত রামায়ণের সঙ্গে এক অদ্ভূত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের সাতটি অঙ্ক, আবার রামায়ণের সাতটি কান্ড। চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলা বিয়োগ, আবার রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকান্ড অর্থাৎ চতুর্থকান্ডে সীতাবিয়োগের উল্লেখ আছে। রামায়ণে যেমন দু'বার রাম-সীতার বিচ্ছেদ রয়েছে, ঠিক তেমনি অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকেও দুষ্যন্ত-শকুন্তলার দু'বার বিচ্ছেদ রয়েছে। রামায়ণের প্রথম কান্ডে রামের আশ্রমে প্রবেশ ও সীতাপ্রাপ্তি, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের প্রথমাঙ্কে দুষ্যন্তের আশ্রমে প্রবেশ ও শকুন্তলা প্রাপ্তি বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। দুটি কাব্যেই পুত্রের জন্ম আশ্রমে এবং তারা বড় হওয়ার পরে পিতার সঙ্গে মিলন হয়েছিল। অযোধ্যাকান্ডে রামচন্দ্রের নগরবাসে অনীহা পক্ষান্তরে অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে দুষ্যন্তের নগরজীবনের প্রতি বিমুখতা-

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।।

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল দুর্বাসার অভিশাপ। দুর্বাসার অভিশাপের মাধ্যমে নাটকটি যেন গতিময়তা লাভ করেছে। অভিশাপ বৃত্তান্তটি না থাকলে নাটকটি হয়তো তৃতীয়াঙ্কেই সমাপ্ত হয়ে যেত এবং কোন অজ্ঞাত আখ্যান-উপাখ্যানের মতই অন্ধকারে নিমজ্জিত হত। মুলমহাভারতের শকুন্তলোপাখ্যানে আমরা দেখতে পায় রাজা দুষন্ত কেবলমাত্র লোকলজ্জার ভয়ে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যা আপাতদৃষ্টিতে অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হতেই পারে। কিন্তু কালিদাস অভিশাপ বৃত্তান্তের মাধ্যমে রাজা দুষ্যন্তের চরিত্রকে অনুতাপের অনলে দগ্ধ করে এক নতুন জীবন দান করেছেন। এই বৃত্তান্তটি একাধারে যেমন নাটকের অগ্রগতির পথকে তরান্বিত করেছে তেমন শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির অংশীদারও হয়েছে। ঠিক তেমনই কালিদাস একটি সামাজিক বার্তা প্রদান করেছেন। নাটক সমাজের দর্পন। তাই উদ্দাম যৌবনের চাঞ্চল্যতায় দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা যে অপারাধ করেছে, উভয়কে শাস্তিপ্রদানপূর্বক কালিদাস সমাজকে একটি সুবার্তা প্রদান করেছেন। নায়কচরিত্রের এই নীতিভ্রষ্টতা কালিদাস মেনে নেননি বলেই দুর্বাসার অভিশাপের মাধ্যমে একাধারে যেমন উভয়কে শাস্তি প্রদান করেছেন, আবার অঙ্গুরীয়ক বৃত্তান্তের মাধ্যমে তার নিরসন করে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাকে নবজীবন দান করেছেন।

কথাশেষ- মহাভারতে যা কেবলমাত্র একটি অতি সাধারন গল্প, কালিদাস তাঁর লেখণী ও কবিত্বপ্রতিভায় পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ ও অনবদ্য নাটকে পরিণত করেছেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকটিকে কালিদাসের একটি অত্যুজ্জ্বল নাটকের দৃষ্টান্ত বলা

যেতে পারে। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে মর্ত্যের সঙ্গে স্বর্গের এক অপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ্যণীয়। নাটকটি শুরু হয়েছিল মর্ত্যে মহর্ষি কণ্বের তপোবন আশ্রমে এবং পরিসমাপ্তি ঘটে সপ্তমাঙ্কে স্বর্গে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুনঃমিলনের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রাচীন সাহিত্যে বলেছেন- "শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত গম্ভীর, এমন সংযত সম্পূর্ণ নাটক শেক্স্পিয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নেই।" আবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কালিদাস-প্রশস্তিতে বলেছেন - "সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই অপূর্ব নাটকের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গ-সুন্দর। যদি শতবার পাঠ কর শতবারই অপূর্ব বোধ হইবেক।...ধন্য কালিদাস!ধন্য অভিজ্ঞান-শকুন্তল! প্রলয়ের পূর্বে তোমাদের বিলয়ের আশঙ্কা নাই।"

পরিশেষে যথার্থই সার্থক এই উক্তি-

"নববৎসরের কুঁড়ি, তারি একপাতে, বরষশেষের পক্কফল।
প্রাণ করে চুরি আর, তারি একসাথে প্রাণে এনে দেয় পুষ্টিবল।।
আছে স্বর্গলোক আর, সেই এক ঠাঁই, বাঁধা যেথা আছে মহীতল।
হেন যদি কভু থাকে, তুমি তবে তাই, ওহে অভিজ্ঞান-শকুন্তল।।"

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ডঃ অনিল চন্দ্র বসু, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, পুনঃর্মুদ্রণ- মে,২০১০,২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬, সংস্কৃত বুক ডিপো।
২. ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, ষষ্ঠ সংস্করণঃ চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৮, ৩৮, বিধান সরণী কোলকাতা-৭০০০০৬, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।
৩. নির্মাল্য দাস, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, প্রথম সংস্করণঃ আগষ্ট, ২০১২, ৫/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী।
৪. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ মাঘ ১৪২১/ বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, ৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯, রত্নাবলী।

সুখলতা রাও ও বাংলা শিশুসাহিত্য-একটি সমীক্ষা

বিজয় দাস
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্য জগতে দুটি পরিবারের নাম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বিরাজ করছে।একটি ঠাকুর পরিবার,আরেকটি রায়পরিবার – এটি সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নেন। বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের আলোচনায় রায় পরিবারের উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদারের পাশাপাশি যাঁর নাম অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তিনি উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম সন্তান সুখলতা রাও। যাঁর বিপুল সাহিত্য সম্ভারবাংলা শিশু – কিশোর সাহিত্যে অমূল্য সম্পদরূপে আজও বিশেষ মূল্যবান। শৈশব পৃথিবীর বহুবর্ণিল রুপের কল্পরাজ্য খুলে যায় রূপকথার সায়রে। আরএই রূপকথার সায়োর হল সুখলতা রাওয়ের সাহিত্য। তাঁর কল্পরাজ্যে বিচরণকারী গল্পগুলি সারল্যের রসসুধা পরিবেশনের মাধ্যমে শিশু থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে পরিণতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ভাবে , আবেগে, বাস্তবে, লৌকিক উপাদানে ওচিরন্তন স্নেহে.তাঁর শিশু – কিশোর সাহিত্যগুলি সমসাময়িক থেকে চিরন্তনতার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। যেখানে স্বদেশ ভাবনা,লৌকিক, রীতিনীতি, আচার সংস্কার, মূল্যবোধকে রক্ষা করে শিশুমনের পুষ্টিসহযোগী হয়ে উঠল ফল্গুনদীর মতো। রায় পরিবারের সুখলতারাও – এর লেখনী আমাদের সেই কালান্তরের পথেই নিয়ে যায়। কেবল শিশুদের জন্যনয়, বিভ্রান্ত মানুষের মন ও মননে শৈশবের ছোঁয়া জোগানোর জন্য শিশু সাহিত্যিক সুখলতা রাওয়ের মূল্যায়ন প্রয়োজন বলে মনে হয়। আমার নিবন্ধটির আলোচ্য বিষয় "**সুখলতা রাও ও বাংলা শিশুসাহিত্য – একটি সমীক্ষা**"
সূচক শব্দ : রূপকথা , চিরন্তন , কালান্তর,উত্তরাধিকার ,শিশুপাঠ্য

মূল আলোচনা:

'আমি এই বুঝি যে, সেই সাহিত্যই সার্থক যা মানুষকে জ্ঞানের পথে, কর্মের পথে, শুভবুদ্ধির পথে অগ্রসর করে নিয়ে যায়।' – একথা যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন তিনি সুখলতারাও। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রথম সন্তান ও সুকুমার রায়ের বড়ো দিদি। আজ মৃত্যুর এত বছর পরেও বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়।

শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর আর বিধুমুখীর প্রথম সন্তান সুখলতা রাও। ২৩শে অক্টোবর ১৮৮৬ সালে কলকাতায় ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণের মধ্যেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর মহান পিতার কল্পনার অভিনব ঐশ্বর্য। এনাম দ্বিতীয়কারোর সোনা গেছে কিনা সন্দেহ আছে। ১৮৮৭সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি' উপন্যাস প্রকাশিত হলে সুখলতাআর সুকুমারের ডাক নাম হাসি আর

তাতারাখা হয়।স্বভাবে সুখলতারাও সব ভাইবোনের থেকে একটু আলাদা ছিলেন। অন্যেরা যেখানে হাসিখুশিতে উচ্ছল সেখানে তিনি শান্ত, গম্ভীর ওরাশভারি ছিলেন।

লীলা মজুমদার লিখেছেন , "তেরো নম্বরের বাড়িটা রায়েদের কলকাতা বাসের প্রাণকেন্দ্র ছিল। উপেন্দ্রকিশোর যে অংশে থাকতেন তার ভিতর দিকেও একটা বারান্দা ছিল। রোজ সন্ধ্যাবেলায় সেখানে গান-গল্পের আসর বসে যেত, বাইরের অনেকেও এসে যোগ দিতেন। মসুয়ার রায়েদের অনেকেরই একটা অসাধারন গুন দেখা যেত, তারা চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। কয়েক বছরের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখীর নিজেদের তিন – চারটি ছেলেমেয়ে হল। বড় মেয়ের নাম সুখলতা।"(১)

উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রত্যেকেই শিশু সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর মেয়েদের মধ্যে জ্যেষ্ঠাসুখলতা 'রূপকথার জগৎ' বছর নিয়েছিলেন বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে। দেশীয় রূপকথার পাশে বিভিন্ন দেশের রূপকথা অনুবাদের মাধ্যমে তিনি আদের নতুন করে তুলেছেন। আবার লোক প্রচলিত বাংলা ছড়া থেকে উপাদান নিয়েও একটি গল্প লিখেছিলেন – 'আলিভুলির দেশে'। ছড়া রচনা ও অনুবাদ তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; ছোটদের জন্য উপন্যাস, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবন্ধের পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'বাংলা শিশুসাহিত্য'প্রবন্ধে লিখেছিলেন – 'আরসুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই', 'আরোগল্প' সেই দুটি হায়রে দুটি মাত্র'– বইয়ের কথা কি বলবার!নাকি তারা কখনোইভোলবার!শৈশবের হৃদয়মন্থন এই বই ক-টি, সংখ্যায়বেশি নয় ব'লেই সম্ভোগে নিবিড়, অফুরন্ত বার পড়েও কখনো পুরোনো হ'তো না।' (২) আজকের দিনেও তারা পুরোনো হয়নি। নিয়মানুসারে তাঁর লেখাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় – ক) গল্প ওউপন্যাস, খ) ছড়া – কবিতা, গ) নাট্যসাহিত্য, ঘ) প্রবন্ধ, ঙ)পাঠ্যবই

গল্প – উপন্যাস

সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই' প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯১২**। 'আরো গল্প' – র প্রথম প্রকাশ **১৯১৫**সালে।পরবর্তীকালে এই বইদুটি 'গল্প আর গল্প' নামে **১৯৫৪** সালে প্রকাশিত হয়। উৎকৃষ্ট শিশু সাহিত্য রচনার জন্য ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া শুরু করলে এই বছরেই ' গল্প আরগল্প ' রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায়। তিনি বিদেশি রূপকথার দেশীয় রীতিতে রূপান্তর করেছিলেন 'ব্যাঙরাজা'(The Frog prince), পাঁশকুড়ানি ইলা (Cinderella), 'মালতীওপারুল ' (Snow white and Rosebed), সোনারহাঁস (The golden goose) গল্পে।তাঁর দেশীয় রূপকথার উল্লেখযোগ্য বই হল 'খোকা এলো বেড়িয়ে'। এছাড়াও 'আলিভুলির দেশে', 'ঈশপের গল্প',' নানান দেশের রূপকথা' তাঁর বিখ্যাত গল্পের বই।তাঁর নানান দেশের রূপকথা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়।

ছড়া - কবিতা

ছড়া রচনায় সুখলতাবিশেষ পারদর্শী ছিলেন।বিদেশি ছড়ার অনুবাদ ও মৌলিক ছড়া – উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সুনাম রেখেছেন। প্রাকিতিক দৃশ্যসংক্রান্ত ছেলে ভুলানো,

শিক্ষামূলক নানা ধরনের ছড়া তিনি লিখেছেন। তাঁর ছড়াগুলো **১৯৫২** সালে ‘নতুন ছড়া ‘নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। সুখলতার একমাত্র কবিতার বই ‘পথের আলো’

নাট্য সাহিত্য

সুখলতারাও কয়েকটি গদ্য নাটিকা ওনাট্যকাব্য জাতীয় লেখা লিখেছিলেন।তাঁর লেখা নাট্যকাব্য 'আজবপুর' ,'তারার ঘর', ‘পাষাণী’,ঋতুনাট্য – 'ফুলের ভাষা' ; গদ্যনাটিকা ‘বনেভাই কত মজাই’, 'যাত্রাপথে’।

প্রবন্ধ

সুখলতারাও শিশুদের জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা তথ্য গল্পের মত করে প্রবন্ধের আকারে লিখেছিলেন।‘ 'কাকের জাত’,’ 'সমুদ্রের ফুল’,'হীরা’,‘তুলা’– প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি সরস ভঙ্গিতে তথ্য পরিবেশন করে মনোরঞ্জন করেছেন।এই রীতিতিনি তার পিতা উপেন্দ্রকিশোরের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

পাঠ্যবই

সুখলতা রাও শিশুদের জন্য কিছু বই লিখেছিলেন। নীতিশিক্ষার বই ঈশপের গল্প , হিতোপদেশের গল্প ছাড়াও পাঠ্যবই 'পড়াশোনা' ,'নতুন পড়া'(প্রথম ভাষা,১৯২২), 'স্বাস্থ্য'(১৯২২), 'নিজে পড়' (১৯৫২), 'নিজে শেখ’(১৯৪৭),’ খেলার পড়া' (১৯৬১) ছোটোদের শিক্ষাদানে সাহায্য করেছিল। 'নিজে পড়ো’ বইটির জন্য **১৯৪৮**সালে তিনি রাষ্ট্রীয়পুরস্কার পেয়েছিলেন।

বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে সুখলতা রাও একজন শ্রেষ্ঠ লেখক।এই মহীয়সী, প্রতিভাময়ী শিশু সাহিত্যিক শিশু সাহিত্যের আদি পুরুষ উপেন্দ্রকিশোরের যোগ্য উত্তরসূরীএকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুখলতারাও ঠিক ছোটোদের মত করেই লিখেছেন।শিশুদের যেমন করে বললে তাদের মনে হবে যে ঠিক তাদের মতন করেই বলা হচ্ছে সুখলতা রাও ঠিক তেমনি করে বলেছেন।তাই তার লেখায় কোথাও কোনো কৃত্রিমতা নেই,কোনো পিঠচাপড়ানো নেই, কোনোরকমস্কুল মাস্টারি করার ইচ্ছাও নেই।তাঁর যে গুণটি শিশু থেকে বয়স্ক সবাইকে মুগ্ধ করে,যা প্রশংসার যোগ্য তা তাঁর লেখার আশ্চর্য রীতি।“ছোটো-ছোটো কথা মৃদু মৃদুবাক্য,শাদাশিধে ঘরোয়া ধরণে নিচু গলায় বলা –যেন লেখা নয়আসলে ,বলা গল্প , ছোট্টমাপের মধ্যে ভরপুর এক একটি গল্প।”(৩)

বাংলার শিশু কিশোরদের জন্য বহু কবিতা,গল্প,নাটক, উপন্যাস,ছড়া,গান আর বিচিত্র পাঠ্যবইয়ের সমবায়েতাঁর সাহিত্য সম্ভার সুসমৃদ্ধ।তিনি বহু দেশি-বিদেশি ছড়ার সংগ্রহ ওসংকলনও করেছেন।‘ 'গল্পের বই’ এবং 'আরো গল্প'বইএই পর্যায়েরসুন্দর নিদর্শন। বই দুটি পরে ‘গল্প আর গল্প’ নামক গ্রন্থে একত্রে সংকলিত হয়েছে।‘গল্পের বই’ এআছে মোটকুড়িটিদেশীয় রূপকথার গল্প।এই বইয়ের ‘ব্যাঙরাজা’, ‘নেকড়ে’, ওছাগলছানা,গরীব মুচি,ঘুমের দেশে,সোনার হাঁসগল্পগুলি অসাধারণ।লেখিকা নিজেই এই

সমস্ত গল্পের বিষয় ওভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুন্দরসুন্দর মনোহরণকারীছবি এঁকেছেন।ফলে ছবির আকর্ষণে আর গল্পের জাদুতে সম্পূর্ণ বইটি ছোটোদের কাছে বিশেষ গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে।

'আরো গল্প' বইটিও বিচিত্র স্বাদের দেশীয় রূপকথার একটি সুন্দর সংকলন। মোটপনেরোটি গল্প স্থান পেয়েছে এখানে।রয়েছে সুখলতার আঁকাবেশ কিছু ছবি এগ্রন্থের 'বোতলের ভূত', ‘ রাজা নাকেশ্বর’,’ 'দুষ্টু বিড়াল', ‘ বামন বুড়ো', প্রভৃতি গল্পগুলির বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থাপন ছোটোদের মুগ্ধ করে,আনন্দ দেয়।

সুখলতারাওয়ের বই যারা পড়েছেন তারা জানেন ছোটোদের জন্য তিনি প্রাণ খুলে লিখেছেন যেমন, সেই সঙ্গে নিজে ছবিও এঁকেছেন। অবশ্য আঁকার নেশাতি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতা উপেন্দ্র কিশোরের কাছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিনী সুখলতারাও। লেখার আগে আঁকার জন্য তিনি পরিচিতি পেতে শুরু করেছিলেন।১৯০৬-০৭ সালেই কলকাতায় ভারতীয় কৃষি ওকারিগরীপ্রদর্শনীতে তিনি তেল রং বিভাগে পদক পান। ‘প্রবাসী‘ পত্রিকায় ১৯১০সালে ছাপা হয় তাঁর ‘পূজারিনী' ছবিটি।পরের বছর ছাপাহয়'সাবিত্রী'।

গল্প লেখার পাশাপাশিতিনি ছোটোদের জন্য ছড়া রচনা করেছিলেন।যেখানে তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় বাঙালি পাঠক পেয়েথাকে।১৯২৩সালে সন্দেশ পত্রিকায় ছবি আর কবিতা ‘ঘুমের ঘোরে’ প্রকাশিত হয়েছিল।ছড়ার পাশাপাশি ছবিগুলো শিশুদের আনন্দদান করে। এরইসঙ্গে সে ছড়ার ভাষাও সহজ সরল শিশুর পছন্দের ভাষা চয়ন –

“লাফ দিয়ে হুসকরে
নেয়তার তুলে, শূন্যেতে ঝুলে
মাথা বন্বন ঘোরে।”

'ছবিতে গল্প' নামে একটি কবিতা সিরিজ লেখেন যা ‘বাংলার প্রথম কমিকস্ট্রিপ’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরওসুখলতারছবি পছন্দ করতেন ‘সন্দেশ' পত্রিকার জন্য তাঁর লেখা কবিতায় তিনি নিজের আঁকা ছবিও দিয়েছেন।

শিশুদের উপযোগী ভাষা ওশব্দ চয়ন এবং অন্তমিলের দিকটিও তিনি খেয়াল রাখতেন- ‘ ময়রার চোরধরা’ কবিতায়তিনি লিখেছেন-

“রাত্তিরে রোজ মিঠাই চুরি
এই বারেতে করবো শেষ,
তাই গড়েছি গন্ডা কুড়ি
কচু বাটারসন্দেশ”

বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক সুখলতা রাওয়ের বিশিষ্টতা ও কৃতিত্ব তাঁর রূপকথার গল্পগুলিতে।যে রূপকথা চিরন্তন, চিরকালের পুরোনো হয়েও নতুন থাকে। সুখলতার গল্প দেশে বিদেশের রূপকথা সংগ্রহ করে বাঙালি ছেলে মেয়েদের মনের মতন করে সাজিয়ে দিয়েছেন, সেখানে মৌলিক কিছু না থাকলেও গৌরবের কোনো হয়নি।আসলে

সুখলতারাও মনে করতেন দেশে বিদেশে যে রত্নরাজি ছড়িয়েরয়েছে সেগুলোকেই শিশুদের মতন করে পরিবেশন করতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল হবে।প্রচলিত লোকসাহিত্যের সংগ্রহবা সংকলনেরকাজ শুরু করেছিলেন অনেকেই এঁদের মধ্যে পিতা উপেন্দ্রকিশোর যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি দক্ষিণারঞ্জন রায়,যোগীন্দ্রনাথ সরকারওছিলেন।এঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশের রূপকথা গুলিকে দেশীয় রীতিতে পরিবেশন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।আসলে তাঁর ছোটগল্পগুলির অধিকাংশই দেশী–বিদেশি উপকথার পুনঃসৃজনযেমন 'গল্প আর গল্প', হিতোপদেশের গল্প, 'ঈশপের গল্প',' আলিভুলির দেশে', 'সোনার ময়ূর'।তবে ‘আলিভূলির দেশে’ লোক প্রচলিত বাংলা ছড়াগুলিরই গল্পরূপ।যা বালভাষিত গদ্যে লেখা হয়েছে।এই দেশি-বিদেশি রূপকথাগুলি সম্পর্কে ভারতী’তে লেখা হয়েছিল “ গল্পগুলি টাটকা ফুলের মতোই সুন্দর, উপভোগ। লেখিকার লেখাটিও বেশ সহজ তাহাতে একটি সুখ আছে - সুরটুকু একেবারে গিয়া প্রাণের তারে আঘাত দেয়....গ্রন্থে অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে,সেগুলি আবার গ্রন্থকর্ত্রীর স্বহস্ত রচিত। বঙ্গ নারীর হস্তে এমন চিত্র রচিত হয়- ইহা দেখিয়া শুধু আনন্দে নহে গৌরবেও আমাদিগের চিত্ত ভরিয়া উঠে।”

'বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে আশা গঙ্গোপাধ্যায় রূপকথার উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন ‘ রপকথার উৎস কোথায় কাহারা ইহার স্রষ্টা, সে কথা কেহই বলিতে পারে না ইহার সমগ্র জাতির অন্তর হইতে যেন আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে।”(৪)- তবে একথা ঠিক এই রূপকথাগুলি শিশুদের স্বপ্নাচ্ছন্ন করে ঘর থেকে তাদের মন পক্ষীবাহকের পিঠে চড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে। দেশের ও বিদেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই রূপকথা – উপকথার এই অমূল্য সঞ্চয় সুখলতা রাও চিরকালীন অমরত্ব দান করেছেন।

সুখলতা রাওয়ের ‘গল্প আর গল্প’, ‘ আলিভুলির দেশে’,নানান দেশের রূপকথা গল্প সংকলনের গল্পগুলি কৈশোর যৌবনের সেতু বন্ধন করেছে।দেশীয় রূপকথার অনুবাদের পাশাপাশি চিন, জাপান, হল্যান্ড,তুরস্ক এরই পাশাপাশি গ্রিম ভাতাদের অনুসরণে তিনি লিখেছেন ।তবে এগুলিকে দেশীয় রীতিতে তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন।এখানেই সুখলতা রাওয়ের বিশেষত্ব।

সুখলতা রাওয়ের রূপকথার গল্পগুলি বর্তমান ও আসন্ন ভবিষ্যতের বার্তা শিশু হৃদয়ে প্রথিত করে।শিশু মনে অনাবিল আনন্দ উৎসারিত করে।গল্পগুলি তাদের বয়ে নিয়ে যায় অকৃত্রিম কাল্পনিক দুনিয়ায় যেখানে পরিণত মনস্ক উপাদান সমূহ সুস্বাদুভাবে পরিবেশিত হয় গল্পগুলির অন্তর্নিহিত এই কাল্পনিক দুনিয়ায় দর্শনকেন্দ্রিক প্রতিরূপ (visual image)গুলি শিশুদের অবচেতন মনকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের গভীরতা অন্বেষণ শুধুমাত্র শৈশবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।শৈশবের অতিক্রম করেও জীবনের অন্যান্য সময়েও এই অন্বেষণ বজায় থাকে।এই রূপকথার গল্পগুলির নির্যাস ও তার অকৃত্রিম

আবেদন পাঠকের কাছে আজও নেশার গল্পের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি যা কল্পনাকে সমৃদ্ধ করে এক সম্পূর্ণ অন্য দুনিয়ার অস্তিত্ব ঘোষণা করে,যে অস্তিত্ব কেবল সুদূর কল্পনাবিলাসী নয়, তা শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্কতার সেতু নির্মাণকারী বিমূর্ততায় (Abstract) প্রতিভাসিত।

'শিশুসাহিত্যে সুরুচি' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেনযে, "শিশু মনকে ওশিক্ষা দিবার ভার যাঁহারা হাতেলইতেছেন তাঁহাদের দায়িত্ব গভীর।" আমাদের মনে হয় তিনি আজীবন গভীর নিষ্ঠায় এই দায়িত্ব পালন করে এসেছেন।রাজা – রানীর বিয়ে অপেক্ষা বন্ধুপ্রীতি,মাতৃস্নেহ, ভাইবোনেরভালোবাসা,স্বদেশ প্রেম এগুলোই তিনি তাঁর রূপকথার গল্পে স্থানদিয়েছিলেন।সুখলতা চাইতেন শিশু সাহিত্য নির্মল হবে।তাতে কোনওপ্রকার মন্দিভাবের প্রশ্রয় বা গুরুজনদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব থাকবে না। কারওপ্রতি বিদ্বেষেরবা অবজ্ঞার ভাব থাকবেনা।

শিশুসাহিত্যের ভাষায় দিকেও তিনি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন – 'গল্প আর গল্প' গ্রন্থের 'ব্যাঙরাজা' গল্পটিতে শিশুরা যে কথা শুনতে চায় তিনি সে কথায়বসিয়েছেন চরিত্রগুলির মুখে ' ব্যাঙবলছে – 'রাজারমেয়ে,রাজার মেয়ে,অত কাঁদছকেন? রাজার মেয়ে তাকে বলল–" আমার সোনার গেলাস জলে পড়েগিয়েছে,তাই আমি কাঁদছি।"ব্যাঙ বললো,' আমি যদি তোমার গোলা তুলে দিতে পারি তবে আমাকে কি দেবে? আমার চকচকে পোশাক,ঝকঝকে মুকুট,আমার হীরার বাক্স, মুক্তোর মালা যা চাও আমি তাই দেব।"বললো রাজার মেয়ে।"

রূপকথার অন্তরালে যে কল্পনার মুক্তি বস্তুটি সুখলতা গল্পে সেটি আশ্চর্য রকমভাবে লক্ষ করা যায়।তাঁর 'ফুলরানী' গল্পটিতে যখন বন্ধু চড়াই পাখির পিঠে করে ফুলরাণী যাত্রা করে তখন শিশুর কল্পনা প্রবণ মনেরও মুক্তি ঘটে – শিশুরাও মনের পথ ধরে পারি দেয় – ' তারপর তাকে পিঠে নিয়ে চড়াই পাখি উড়ে চলে গেল।তখন চাঁদ উঠেছে।তারা একটা বাগানের উপর দিয়ে যাচ্ছে।"-এইকলভাষিত গদ্য একান্তভাবেই শিশুদেরই উপযোগী।

ফরাসি রূপকথা 'The sleeping Beauty' গল্পে অভিশপ্ত রাজকন্যা একশো বছরের জন্য মৃত্যু নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ার গল্প অবলম্বনে তাঁর 'ঘুমের দেশ'।'The sleeping beauty' গল্পেরই রূপভেদ মাত্র।দেশীয় রীতিতে তিনি শিশুদের জন্য পরিবেশন করলেন – রাজার ছেলে ঘুরে ঘুরে ঘুমন্ত বাড়িতে পৌঁছাল।ঘরে ঢুকেই তিনি অবাক হয়ে দাঁড়ালেন,আর ভাবলেন,' এতোসুন্দর মেয়ে বুঝি আর পৃথিবীতে নেই।'ঠিকসেই সময়ই রাজার মেয়েরএকশো বছরের ঘুম শেষ হল,আর সে চোখ মেলে চাইল।"- এগল্প শিশুদের রূপকথার স্বপ্নালোকেনিয়ে যায়।পাখি,কাঠবিড়ালি, চড়াই, ইঁদুর,ব্যাঙ,গাধা,সোনার হাঁস,সোনার পুতুল,ভাল্লুক,বিড়াল রাণী, নেকড়েওছাগলছানা – গল্পগুলির চরিত্র হিসাবেউঠে এসেছে।এই পশুপাখির গল্প শিশুদের আনন্দ দেয়।

তাঁর পাশকুড়ানীইলা ‘ Cinderella’ বিদেশি রূপকথা অবলম্বনে লেখা।একটি ছোট্ট মেয়ে আসলে তার নাম ইলা।কিন্তুরান্নাঘরেরছাইফেলে বলে তার নাম হতে গেছে পাঁশকুড়ানী।– পাঁশকুড়ানীরউপর সৎবোনেদেরহিংসাএবং শেষ পর্যন্তরাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ে,সৎবোনেরা সেজেগুজে বিয়েদেখতে গেল এবং পেটভরে নেমন্তন্ন খাওয়ারমধ্যেইলারপ্রতি তাদের যে হিংসা তা দূর হয়েছে এই বার্তা দেয়।লেখিকা সুখলতা রাও শিশুদের এই নীতিগতশিক্ষারব্যাপারটি গল্পেপ্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন।

সকলেরই প্রত্যাশা থাকে যে,আজকের শিশুরাই একদিন আদর্শ নাগরিক হিসাবে বিকশিত হবে সমাজে।দেশের দায়িত্বগ্রহণ করবে দেশ ওজাতির সুনাম। মর্যাদা বৃদ্ধিকরবে শিশুদের মধ্যে সম্ভাবনার আলো নিহিত থাকে।ওরা 'নূতনবানীর’অগ্রদূত।ওদের গড়িমা, জ্ঞান , সাহসে সারা বিশ্ব জাগবে। সুখলাতা রাও তাঁর শিশুসাহিত্যেসেই আলোর সন্ধানইদিয়েছিলেন।তাঁর প্রতিটি গল্পেরমর্মে আছে সত্য ন্যায়ের পথে চলা,দেশমাতার পূজা,ব্যথীরব্যাথাবুঝতেপারা। বিশিষ্টশিল্পী,সাহিত্যিক মাত্রই তাঁদের নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বকীয়তারকারণে স্বতন্ত্র ওবিখ্যাত হয়ে ওঠেন।পারিপার্শ্বিক প্রভাবে তাঁরা প্রভাবিত হলেও এতে তাঁদের নিজেস্বতা নষ্ট হয়নি।পিতা উপেন্দ্রকিশোরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েও তিনি নিজস্বতার কারণেই একটা বিশিষ্টআসন লাভ করেছেন।পরিবার কেন্দ্রিক পরিচিতিরমধ্যে সীমাবদ্ধনা থেকেতিনি স্বমহিমায় ,স্বপ্রতিভায় ভাস্বর।ছোটোদের সাহিত্যকে সম্পূর্ণ নবকলেবরে উপস্থাপন করে রায়পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের ভাবনা – চিন্তাকেসেইদিকে চালিত করেছিলেন সুখলতারাও।পিতার সুযোগ্য কন্যা সুখলতা রাও পিতার সৃষ্ট এই সাহিত্য ধারাকে নিজগুণেউৎকৃষ্টকরে তুলেছিলেন। বিশশতকের বৈজ্ঞানিকচিন্তাধারার মিশ্রণ তাঁর রচনাকে যেমন পুষ্ট কর তুলেছে তেমনি সেখান থেকেমজ্জাগত পারিবারিকউত্তরাধিকারের ছবিও ফুটে উঠে।এই কারণেই রায়পরিবারের উত্তরাধিকার হিসেবে শিশুসাহিত্যিক সুখলতারাওয়ের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে আলোচনা ওমূল্যায়নের অবতারণা আবশ্যিক হয়ে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. লীলা মজুমদার,রচনাবলী (৩য় খন্ড),এশিয়া প্রকাশনী,১৯৮১,পৃষ্ঠা ৩৩৭
২. ব্রততী চক্রবর্তী,বাংলা শিশুসাহিত্যের চর্চা,দে বুক স্টোর,১৯৯৭, ১মপ্রকাশ
৩. বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্য চর্চা, দেজ পাবলিকেশন, ১৯৯৬,পৃষ্ঠা ৪৮
৪. আশা গঙ্গোপাধ্যায়ের, বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ডি.এম. লাইব্রেরী, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ১২

আকর গ্রন্থ:

১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র –শতাব্দীরশিশুসাহিত্য, বিদ্যোদয়লাইব্রেরি,প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ৯, ১৯৫৮

২. সুখলতা রাও – ‘ গল্প আর গল্প ‘,মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯৬,১৪ দশ মুদ্রণ

৩. সুখলতা রাও – রচনা সংগ্রহ ১, থীমা প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯,জয়িতা বাগচী সম্পাদিত

৪. সুখলতা রাও – রচনা সংগ্রহ ২,থীমা প্রথম প্রকাশ ২০১৮,জয়িতা বাগচী সম্পাদিত

৫. সুখলতা রাও – রচনা সংগ্রহ ৩, থীমা প্রথম প্রকাশ ২০০৪

৬. লীলা মজুমদার –রচনাবলী(৩ য় খন্ড) এশিয়া ১৯৮১, ১ ম প্রকাশ

৭. বুদ্ধদেব বসু –সাহিত্যচর্চা, দেজ পাবলিকেশন, ১৯৯৬, ৩য় সংস্করণ।

দুধবিবি : এক লৌকিক দেবীর ইতিকথা

শুভঙ্কর মণ্ডল
গবেষক,
শিল্পের ইতিহাস বিভাগ, দৃশ্যকলা অনুষদ
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের গবাদিপশুকূলের মঙ্গলকামনা করে লৌকিক দেবতা মানিকপিরের থানে পূজা-হাজত দিয়ে থাকেন। এই লোকদেবতাকে কেন্দ্র করে রচিত একাধিক কাহিনী, উপাখ্যান, পালাগান ইত্যাদি বাংলার লোকসংস্কৃতির একেকটি হীরকতুল্য সম্পদ। অথচ মানিকপিরের মা দুধবিবি দেবীরূপে সমাদৃতা হলেও লোকসমাজে ঠিক ততটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেননি। কয়েকটি জায়গায় মানিকপিরের পার্শ্বদেবী হিসাবে তাঁর থান থাকলেও, দুধবিবির একক থান সংখ্যায় নগণ্য। অথচ মানিকপিরের মতো তিনিও দৈবগুণসম্পন্না, মাতৃদুগ্ধবর্ধনকারিণী এক বিশিষ্ট লৌকিকদেবী। সেই উপেক্ষিতা দুধবিবিই বর্তমান প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই প্রবন্ধে দুধবিবির কয়েকটি বিরল থানের ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক আলোচনার পাশাপাশি তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠা নানান বৈচিত্র্যময় বিষয়ের বিশ্লেষণাত্মক ও সার্বিক পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: দুধবিবি, মানিকপির, দুধ, থান, লৌকিক, দেবী।

ভূমিকা

তখন সবে স্নান সেরে, ভিজে কাপড় শুকোতে দিয়ে, বাদশাজাদি তাঁর সখীদের সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প জুড়েছেন। জঙ্গলে ঘেরা ওই নিরিবিলি স্নানঘাট, তাঁদের খুব প্রিয়। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা নাম না জানা হরেক কিসমের ফুলের গন্ধ মেখে, সবুজ ঘাসের চাদরে গড়াগড়ি দিয়ে, পাখিদের কিচিমিচি গানের তালে তালে তাঁদের না ফুরনো গল্পগুলি সারাদিন ধরে বয়ে চলে। কিন্তু সেই দিনটি ছিল অন্যরকম। বাতাসে এক অদ্ভুত বিষাদের গন্ধ। পাখিরাও কেমন মনমরা। প্রকৃতি যেন খুব চিন্তিত। স্নানঘাটের পাশের একটি ঝোপ থেকে অনেকক্ষণ ধরেই এক ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল। কৌতূহলী শাহাজাদি আওয়াজের পথ ধরে সেই ঝোপের কাছে এগিয়ে গেলেন। সেখানে এক ফুটফুটে শিশু। যেন বেহেস্তের সবথেকে কিমতি ফুলটি কোনো অজ্ঞাত কারণে ওই ঝোপের মধ্যে খসে পড়েছে। শাহাজাদি দয়াময়ী, মাতৃস্বরূপা। এতটুকু দুধের শিশুকে দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। মনস্থির করলেন যে এই শিশুকে তিনিই পালন করবেন। নিজের বুকের দুধে একে মানুষ করে তুলবেন। শিশুটিকে কোলে তুলে নিতেই প্রকৃতি যেন এক অপার্থিব উৎসবে মেতে উঠল। সেই

বিষাদ কোথায় যেন গা ঢাকা দিল। তাকে আর খুঁজেই পাওয়া গেলনা। চারিদিকে স্বর্গীয় ফুলের গন্ধে ভরে গেল, পাখিরা আনন্দ-সঙ্গীত গাইতে শুরু করল। তবে যারপরনাই খুশি হল গবাদিপশুরা। কারণ তারা তাদের ভবিষ্যতের রক্ষাকর্তাকে পেল। এই শিশুই তো গবাদিপশুরক্ষক মানিকপির। বাপ-মাহারা মানিকপির পেল তার পালিকা-মাকে -- দুধবিবিকে।

মানিকপির প্রসঙ্গ

গবাদিপশুর হিতকারী মানিকপিরকে ঘিরে এমন একাধিক গল্প প্রচলিত। কিছু গল্পে তিনি দুধবিবির গর্ভজাত, শাহ্ কামারুদ্দিনের পুত্র। তাঁর যমজ ভাই গজ।[১] আবার কোনো কোনো কাহিনী অনুযায়ী তিনি দুধবিবির পালিত-পুত্র। মানিকপির গৃহপালিত পশুর রোগনিরাময়কারী, প্রাণদানকারী লৌকিক দেবতা। অনেক গবেষকের মতে তিনি যিশুর সমতুল্য। অনেকে বলেন তিনি পির দরবেশ। বিশেষত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের গবাদিপশুর মঙ্গলকামনার্থে মানিকপিরের থানে পূজা-হাজত দিয়ে থাকেন। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে মানিকপিরের 'গইলে গান' এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।[২] ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণের পর বিপর্যস্ত হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষেরা অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে অবহেলিত অন্ত্যজশ্রেণীর জনগণের সঙ্গে এক সমন্বয় গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন। তৎপূর্বে বহুকাল ধরে সমাজের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণের মানুষেরা উচ্চবর্ণের অভিজাতদের হাতে পদে পদে অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত হয়ে আসছিলেন। ফলে উচ্চবর্ণের পদদলিত হয়ে থাকা এইসব মানুষেরা নিজেদের আত্মরক্ষার্থে তথা রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক চাপে পরে দলে দলে ইসলামধর্মে আশ্রয় নিতে থাকেন। এপ্রসঙ্গে বিমলেন্দু হালদার তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হবার পর - সুফী দরবেশ সম্প্রদায়ের সাধকগণ যখন বাংলার জনসাধারণের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিলেন, সেই সময় মানিক পিরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনিও এ দেশে প্রচারিত হতে শুরু করে।"[৩] গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে মানিকপিরের জনপ্রিয়তালাভের প্রসঙ্গে বলেছেন, "পির গাজীরা লোকধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন না।... তাঁদের প্রতি ভক্তির ব্যাপকতার কারণ সম্বন্ধে মনে হয়, তাঁদের অনেকেই অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং কবিরাজী বা হাকিমী চিকিৎসায় দক্ষ ছিলেন, সাধারণ লোকেরা তাঁদের কাছ থেকে বহুপ্রকার উপকার পেত।"[৪] তাঁর মতে মানিকপির হয়তো তাঁর সেই অলৌকিক ক্ষমতা ও হাকিমী বিদ্যার দ্বারা গবাদিপশুর রোগের চিকিৎসা করে মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন।[৫]

দুধবিবি প্রসঙ্গ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তথা সুন্দরবনাঞ্চলের লৌকিক জীবনে বনবিবি, শীতলা, বিবিমা, মনসা, দক্ষিণরায় প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীরা যতখানি প্রাধান্য পেয়েছেন ঠিক

ততখানি প্রধান্য দুধবিবি পাননি। জ্বরাসুর, রক্তবতী, বসন্তরায় ইত্যাদি দেবদেবীরা যেমন শীতলার পার্শ্বদেবতা হিসাবে প্রায় সব শীতলার থানেই কমবেশি থেকে গেছেন ঠিক তেমনটিও দুধবিবির সঙ্গে ঘটেনি। হাতে গোনা কয়েকটি মানিকপিরের থানের পাশেই দুধবিবির থান দেখা গেছে। গ্রামবাংলার কৃষিনির্ভর সমাজে গবাদিপশুর রক্ষাকারী দেবতা হিসাবে মানিকপির যে বিশেষ মর্যাদা পাবেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মানিকপিরের কাহিনীগুলিতে দুধবিবিকে সে অর্থে দেবীত্ব প্রদান করা হয়নি। বরং একজন সাধারণ সুন্দরী বাদশাহকন্যা ও মানিকপিরের মা হিসাবেই তাঁর ছোটখাটো পার্শ্বচরিত্রটি গড়ে উঠেছে।[৬] কাহিনীর দুধবিবির সঙ্গে লোকদেবী দুধবিবির তুলনা করতে গেলে মনে হতে পারে এঁরা দুই পৃথক চরিত্র। যদিও তাঁর নামাঙ্কিত থানগুলি জনসাধারণের কাছে মানিকপিরের মা দুধবিবির থান হিসেবেই আদৃত। এই দেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা থান প্রায় নেই বললেই চলে। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা তথা বৃহত্তর কোলকাতার অন্তর্গত গড়িয়া অঞ্চলের বৃজি পূর্বপাড়ার দুধবিবির থান, তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত থানের এক বিরলতম উদাহরণ।[৭]

যাইহোক, আলোচ্য দেবী দুধবিবির নাম শুনে পাঠক-পাঠিকারা মোটামুটি একটি ধারণা করে নিতে পারেন যে এই দেবী দুধ-বিশেষজ্ঞা। তিনি দুধ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার মুশকিল আসান করে থাকেন। মানিকপিরের মত তিনিও হাকিমীবিদ্যায় পারদর্শী। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানা যায় যে মানুষ হোক বা কোনো গবাদিপশু, দুধের কোন সমস্যা হলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারা দুধবিবির উদ্দেশ্যে পূজা-হাজত দেন, মানসিক করেন। অনেক সময় রমণীদের সন্তান প্রসবের পরে অপুষ্টিজনিত কারণে অথবা মাতৃদুগ্ধবর্ধনকারী প্রোল্যাক্টিন হরমোনের স্বল্পতার কারণে পর্যাপ্ত স্তনদুগ্ধের সৃষ্টি হয়না।[৮] অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই কোন মেয়ে মাতৃত্বলাভ করলেও তাঁর শারিরিক গঠন সেভাবে পরিণত হয়ে ওঠে না। সন্তানপ্রসবকালে মা ও শিশু উভয়েরই জীবনের ঝুঁকি থেকে যায়। ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুও ঠিকঠাক ভাবে মাতৃদুগ্ধ পায়না। কখনও কখনও সেই শিশু নানাবিধ মারণরোগের স্বীকার হয়। সাধারণ অজ্ঞ মানুষের কাছে এর পিছনে থাকা বিজ্ঞানসম্মত কারণের থেকেও বেশি গুরুত্ব পায় তাঁদের মননজাত অলৌকিক সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস। যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির সুবাদে দুধবিবির মতো এমন অনেক লৌকিক দেবদেবীই তাঁদের পদমর্যাদা হারিয়েছেন। তবুও কিছু কিছু স্থানে পারম্পরিক ভাবে নমঃ-নমঃ করে হলেও তাঁদের পূজা-হাজত দেওয়া হয়। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়েও প্রসূতির চিকিৎসা করানোর পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের সদস্যরা দুধবিবির থানে মানসিক করেন। কারণ, বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করলেও সামান্য একটু পুজা-হাজত না দিয়ে দেবদেবীদের রোষের মুখে পড়ার মতো কোন ঝুঁকি তাঁরা নিতে রাজি নন। সমস্যার

সমাধান ঘটলে অল্প করে হলেও বাতাসা, চিনি, নলেন গুড়ের পাটালী, কদমা, সন্দেশ, ফল, দুধ, মুড়কী ইত্যাদি দিয়ে তাঁরা তাঁদের মানসিক পূরণ করেন।

'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' গ্রন্থে নীলোৎপল জানা 'দুধকুমারী' নামক এক লৌকিক দেবীর কথা আলোচনা করছেন। তিনি লিখেছেন যে গ্রামের কোনো এক বট বা তেঁতুল গাছের গোড়ায় স্থাপিত একটি নুড়িপাথরকে এই দেবীর প্রতীকরূপে পূজা করা হয়। উক্ত গ্রামে কোনো গৃহস্থের গাই গোরুর বাছুর হলে এই দেবীর থানে বাছুরের সুস্থতা ও সেই গোরুর দুগ্ধবৃদ্ধির কামনা করে মানত করা হয়। বাছুরের একমাস অতিক্রান্ত হলে কোন এক শনি অথবা মঙ্গলবার দেখে সেই গাইয়ের দুধ দিয়ে দেবীর থানে পূজা দিতে দেখা যায়।[৯] তবে ঠিক কোন অঞ্চলে দুধকুমারীর পূজা প্রচলিত আছে সে বিষয়ে তিনি কিছু আলোকপাত করেননি। এই দুধকুমারীর সঙ্গে আলোচ্য দুধবিবির বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান। প্রথমত, উভয়েরই প্রতীকপূজা হয়। কোনো নির্দিষ্ট মূর্তি নেই। দ্বিতীয়ত, উভয়ের সঙ্গেই দুগ্ধসম্বন্ধীয় দিকটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এবং উভয়েই মাতৃস্বরূপা। প্রজননশক্তি ও উর্বরাতন্ত্রের দিকটিও এদিক থেকে বিশেষ গুরুত্ব পায়। তৃতীয়ত, উভয়ের থানেই দুধ ঢেলে পূজা-হাজত দেওয়ার রীতি প্রচলিত। শুধু ধর্মীয় উপস্থাপনায় কিছু তফাৎ থেকে যায়। আবার পুরুষ-দেবতা মানিকপিরের সঙ্গেও এই স্ত্রী-দেবী দুধকুমারীর বিস্তর মিল। মানিকপিরের মতো এই দেবীর থানেও পায়েস নিবেদন করা হয়। সর্বোপরি এই দুই দেবদেবীই গোসম্বন্ধীয় মুশকিল আসানে সিদ্ধহস্ত এবং উভয়েই গোরক্ষক দেবতা। এপ্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে স্থানভেদে এইধরনের লৌকিক দেবদেবীর রূপগত, উপস্থাপনগত ও তাঁদের উদ্দেশ্যে পালনীয় নানাবিধ আচারবিধির খানিক বৈচিত্র্য তৈরি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। দুধবিবির ক্ষেত্রেও এই বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। গড়িয়া ও সোনারপুর অঞ্চলে দুধবিবির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত দু'টি থানের ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে এবিষয়ে এক সম্যক ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

গড়িয়ার বৃজি পূর্বপাড়ার দুধবিবি

গড়িয়া অঞ্চলের পাটুলী থানার অন্তর্গত বৃজি পূর্বপাড়ার দুধবিবির থানের বর্তমান খাদেম[১০] হোসেন মোল্লা। বয়স আনুমানিক আশি বছর। তিনি বংশপরম্পরায় এই থানের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধের অস্পষ্ট স্মৃতিচারণায় সওয়ার হয়ে বড় জোর দুইপুরুষ অতীতে পৌঁছানো যায়। তাঁর ঠাকুরদা ছোনো মোল্লা ও বাবা মোক্তার মোল্লা এককালে এই থানের পরিচালনা করতেন। তবে হোসেনবাবু সারাবছর এই থানে থাকেননা। মাঘমাসের বিশেষ দিনগুলিতে তিনি এখানে আসেন এবং হাজোতের বন্দোবস্ত করেন।[১১] দুধবিবির থানের কারণে এই এলাকার নাম দুধবিবিতলা। উচ্চারণ বিপর্যয়ের ফলে দুধবিবিতলা অনেকের কাছে 'দুধমিতলা' নামেও বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

এই এলাকার স্থানীয় বর্ষীয়ান বাসিন্দা সুবোধবালা সর্দারের বক্তব্যানুসারে দুধবিবির থান সংলগ্ন এলাকাটি এককালে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় দু'টি ঢিপি পাওয়া যায় এবং ক্রমেই এটি দুধবিবির থান হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর দাদাশ্বশুর স্বর্গীয় গোবর্ধন সর্দারের বাবার আমলে এই জমি পিরোত্তর জমি হিসাবে দান করা হয়। এখানে দুধবিবির থানের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি কবরস্থানও গড়ে ওঠে। কালক্রমে এই স্থানে কবর দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলেও দুধবিবির থানটি থেকে যায়।[১২]

দুধবিবির থান, দুধবিবিতলা, বৃজি পূর্বপাড়া, কোলকাতা-৭০০০৮৪

দুধবিবিতলার থানে পাশাপাশি দু'টি বাঁধানো ঢিপি আছে। একটি বড় এবং একটি ছোট। ছোটটি ওলাবিবির এবং বড়টি দুধবিবির। ঢিপিগুলির বামদিকে সম্মুখভাগে একটি অতি সামান্য অবতল গর্ত করা আছে। স্থানীয়রা এই গর্তকে 'গভীর' বলেন। এই 'গভীর' নিয়ে বিশেষ লোকাচার ও এক লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। মানতকারী এই গর্তে দুধ ঢালেন এবং খাদেম দেবীর উদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম করেন, দেবীর কাছে দোয়া করেন এবং সেই দুধ চরণামৃতের ন্যায় ভক্তকে দান করেন। এই বিশেষ দুধ দেবীর নাম করে মুমূর্ষ রোগিণীর স্তনে বুলিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রচলিত বিশ্বাস যে এরকম করলে দেবীর আশীর্বাদে রোগিণী আরোগ্যলাভ করবেন এবং তাঁর শিশুও পর্যাপ্ত মাতৃদুগ্ধ পানের থেকে বঞ্চিত হবে না।

পয়লা মাঘ দুধবিবিমার বিশেষ উৎসব। এছাড়া সারা মাঘমাসের প্রতি বৃহস্পতিবারগুলিতে সারম্বরে দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা-হাজত দেওয়া হয়। একসময় দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসতেন, মানসিক করেতেন, দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা-হাজত দিতেন। এই থানে মুসলমান রমণীরা ক্ষীর দিতেন এবং হিন্দু রমণীরা দুধ ও পায়েস চড়াতেন। সুবোধবালাদেবীর বাড়ি থেকে প্রতিবছর পৌষ-সংক্রান্তির দিন একটি করে শিংবিহীন ছাগী দান করা হতো। তবে এই থানে বলি দেওয়া হতো না। সেটি খাদেমের প্রাপ্য ছিল। নস্করপাড়ার আশুতোষ নস্করের বাড়ি থেকে গুঁড়, বাতাসা, সন্দেশাদিতে পরিপূর্ণ মিঠাইএর হাঁড়ি দেবীর থানে সর্বাগ্রে উৎসর্গ করা হতো। এখন সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই হাজত দেওয়া প্রায় সম্পন্ন হয়ে গেলেও আগে তা শুরুই হতো রাত্রি

দশটার পর। রাত বাড়লেই হাজত দেওয়ার জন্য হাঁক পারা হতো। রাতভোর চলতো হাজতদানের অনুষ্ঠান। তবে এখন আর সেদিন নেই। বর্তমানে আশেপাশের পাড়ার কয়েকটি ঘরের বাসিন্দারা মিলে এই থানে পূজা-হাজত দেন। মানসিক পূরণের উদ্দেশ্যে থানের পার্শ্ববর্তী পুকুরে স্নান সেরে শুদ্ধ হয়ে অনেকে দণ্ডি দেন ও ধূনো পোড়ান। তবে মাঘমাসের শেষ বৃহস্পতিবারে পাড়ায় এক আনন্দঘন বাতাবরণের সৃষ্টি হয়। এইদিন দেবী ও তাঁর পুত্র মানিকপিরের হাজত উপলক্ষে বনভোজনের আয়োজন করা হয়। আগে মাসের চারটি বৃহস্পতিবারেই এই বনভোজন আয়োজিত হতো। পাড়ার প্রতিটি ঘর থেকে কিছু কিছু সামগ্রী জোগাড় করে দুধবিবির থানসংলগ্ন মাঠেই নিরামিষ রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এইদিন জাতিধর্মনির্বিশেষে পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতারা যেন এক পারিবারিক উৎসবে মেতে ওঠেন। উৎসবের কয়েকটি দিন প্রতিটি বাড়ি আত্মীয়কুটুমে গমগম করতে থাকে। দেবীর থান থেকে এইদিন কেউ শুধুমুখে ফিরে যাননা।

এই থানের সম্মুখে একটি ঊর্ধ্বমুখী বাঁশ পোতা আছে যা মাটি থেকে উঠে ক্রমশ থানের ছাদের দিকে হেলে পড়েছে। স্থানীয়দের মতে এটি দেবীর ধ্বজা। এসম্পর্কে স্থানীয় প্রবীণা আরতি নস্করের বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। যথা, অগ্রহায়ণ মাসে চাঁদ ওঠার পর একটি নিখুঁত বাঁশকে এককোপে ঝাড় থেকে কেটে এনে থানের নিকটবর্তী পুকুরে ফেলে রাখা হয়। কাটার সময় অথবা নিয়ে আসার সময় সেটিকে কোনোভাবেই ভূমিস্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। এরপর চন্দ্রালোকময় কোনো এক বৃহস্পতিবার দেখে ওই বাঁশটি পুকুর থেকে তুলে এনে, থানের সামনে গর্ত করে সেটিকে স্থাপন করা হয়। স্থাপন করার আগে গর্তের মধ্যে কাঁচা পয়সা, আতপচাল, ফুল ইত্যাদি দেওয়া হয়। এরপর বাঁশের গায়ে সিঁদুর দিয়ে, ধূপ-মোমবাতি জ্বেলে দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। একটি চেলি কাপড়ের মধ্যে আলতাপাতা, পয়সা, চাল, কড়ি ও সুপারি পুটলি বেঁধে এই বাঁশের ডগায় বেঁধে দেওয়া হয়। বাঁশ কেটে আনা থেকে স্থাপন করা - এই সম্পূর্ণ আচারটি মূলত পাঁচজন এয়ো স্ত্রী মিলে সম্পন্ন করেন। তবে এখন ছেলেরাও এই নিয়ম পালনে অংশগ্রহণ করে থাকেন।[১৩] এই ধ্বজাপূজার রীতি বাংলা তথা ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই দেখা যায়। তবে দুধবিবির থানের সামনে যেভাবে এটির স্থাপনা করা হয় তাতে হিন্দুধর্মের প্রভাব যে প্রকট তা সহজেই বোঝা যায়। লৌকিক দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে প্রোথিত আশাবাড়ি বা আশাদণ্ডের সঙ্গেও এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আবার এর সঙ্গে যে বৃক্ষপূজার অনুষঙ্গও জড়িত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই পাড়ায় কোনো বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে পান, সুপারি, কাঁচা পয়সা দিয়ে দেবীকে নিমন্ত্রণ করে আসার রীতি আজোও প্রচলিত আছে। ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে পূজিত হতে হতে এইধরণের লৌকিক দেবদেবীরা একসময় গ্রামবাসীদের নিকটাত্মীয়ে পরিণত হন, তাঁদের সুখদুঃখের সঙ্গী হয়ে ওঠেন। ফলে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ন্যায়, গ্রামপ্রধানের ন্যায় তিনিও বিবাহাদির মতো শুভানুষ্ঠানে

সাদরে আমন্ত্রিত হন। গ্রামদেবতার থানে পূজা দিয়ে কোনো শুভানুষ্ঠানের সূচনা করার প্রথা অনেক স্থানেই পালিত হতে দেখা যায়।

দুধবিবির থান ফেলে একটু এগিয়ে গেলেই বড় রাস্তার পাশে মানিকপিরের অবহেলিত থানটি চোখে পরে। কারণ, বর্তমানে পুরোদস্তুর শহরমুখী এই অঞ্চলে গবাদিপশুরক্ষক লোকদেবতার প্রয়োজনীয়তা না থাকাটাই স্বাভাবিক। তবুও এইধরনের থানগুলি কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের লৌকিক ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলে। এখানে মানিকপির ও গজপিরের নামাঙ্কিত দু'টি বাঁধানো ঢিপি আছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই থানে রোজ ধূপ-মোমবাতি দিলেও তা সারাবছর তেমন ভাবে লোকদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনা। পৌষ-সংক্রান্তির দিন এই থান পরিষ্কার করে হাজত দেওয়ার উপযুক্ত করে তোলা হয়। বিশেষত পয়লা মাঘ তথা মাঘমাসের বৃহস্পতিবারগুলিতে দুধবিবির হাজত সম্পন্ন হওয়ার পর এই থানে সকলে জড়ো হন এবং মানিকপির ও গজপিরের উদ্দেশ্যে হাজত দেন। বাতাসা, কদমা, পাটালীর পাশাপাশি কেউ কেউ এখানে দুধও দেন। পিরদ্বয়ের উদ্দেশ্যে খাদেম নামাজ পড়ার পর সেদিনের মতো পূজা-হাজত সম্পন্ন হয়।

এককালে দুধবিবির এই থান মাটির ছিল। ক্রমেই স্থানীয় ভক্তদের অর্থানুকূল্যে তাঁর নামে সমতল ছাদযুক্ত একটি ছোট্ট ঘর গড়ে ওঠে। দেবীদের নামাঙ্কিত মাটির ঢিপি দু'টিকেও বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। যদিও স্থানীয়দের কাছে এই থান 'মন্দির' হিসেবে বিশেষ পরিচিত। থানের দেওয়ালে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা 'দুধবিবি মায়ের মন্দির'। পূজা-হাজোতের সময় সামনের ছাউনিওয়ালা ছোট্ট বারান্দায় ভক্তরা ভিড় করেন। পাশাপাশি এখানে প্রতিদিন বিকেলে মা-ঠাকুমাদের বৈঠকি আড্ডাও জমে ওঠে। থানসংলগ্ন মাঠে নানারকমের খেলাধুলায় শিশুকিশোরেরা ব্যস্ত থাকে। ওই মাঠে প্রতিবছর হরিনামের আয়োজন করা হয়। তাই দেবীর থানের পাশেই একটি তুলসীমঞ্চ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। বাৎসরিক সংকীর্তনের সময় এই থানটিকেও সুন্দর করে সাজানো হয়। থানের চৌকাঠে ও দু'পাশের দেওয়ালে প্রতিবছর এলাকার হিন্দু রমণীরা মঙ্গলসূচক সিঁদুর ও চন্দনের পাঁচফোঁটা দিয়ে যান। এমনকি সারাবছর পাড়ার মা-ঠাকুমারা সন্ধ্যায় এই থানে ধূপ-মোমবাতি জ্বালান। ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অদ্ভুত সম্প্রীতির চিত্র এই ছোট্ট থানটিকে ঘিরে ফুটে ওঠে। মানিকপিরের পাশাপাশি দুধবিবির এই থান দুই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আদানপ্রদান এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধের এক মূর্ত প্রমাণস্বরূপ।

সোনারপুরের ছয়ানিপাড়ার মানিকপির ও দুধবিবির থান

এই জেলার রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা ও সোনারপুর থানার অন্তর্গত ছয়ানিপাড়া দোলতলার প্রায় ত্রি-শতাব্দী প্রাচীন মানিকপিরের থানের কথা না বলে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি টানা সমচীন হবে না। এখানে মানিকপিরের পাশেই পার্শ্বদেবতা হিসেবে দুধবিবির থান বর্তমান।[১৪] দু'টি থানই বাঁধানো এবং পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এক সংরক্ষিত

পিরোত্তর জমির মধ্যে অবস্থিত। স্থানীয় দেওয়ান পরিবার বংশানুক্রমিক ভাবে এই থানে খাদেমের কাজ করে আসছেন। এই পরিবারের গৃহকর্ত্রী মানু দেওয়ানের বক্তব্য অনুসারে এককালে তাঁর শ্বশুর প্রয়াত রব্বানি দেওয়ান ও স্বামী প্রয়াত অজিত দেওয়ান থানের সবরকম দায়িত্ব সামলাতেন। বর্তমানে অজিতবাবুর ভাই হারা দেওয়ান, নন্দ দেওয়ান, মানিক দেওয়ান, কাকা বুধো দেওয়ান ও খুড়তুতো ভাই সাহেব দেওয়ানেরা এই কাজ করছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে নিয়মিতভাবে অন্যত্রও খাদেমের ভূমিকা পালন করতে যান। এই থানে পূজা-হাজত দিতে গেলে দেওয়ান পরিবাবের সদস্যদের উপস্থিতি আবশ্যিক। মানুদেবীর কথায় তাঁদের ছোঁয়া ছাড়া কোনকিছুই সম্পূর্ণ হবে না।[১৫] প্রতিবছর মাঘমাসে এখানে ধূমধাম করে মানিকপিরের বাৎসরিক পূজা-হাজতের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় গণ্যিমান্যিদের উদ্যোগে থানের পার্শ্ববর্তী মাঠে মানিকপিরের গানের আসর বসে।

তবে মানিকপির এখানকার স্থানীয় মানুষদের যতটা প্রভাবিত করেছেন ঠিক ততোটা দুধবিবি পারেননি। কারণ এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ মানিকপিরের পার্শ্বস্থিত এই থানের পরিচয় সম্পর্কে উদাসীন। কারও কারও মতে এটি বিবিমার থান, আবার অনেকে এটিকে বনবিবির থান বলে মনে করেন। ফলে এই দেবীর আক্ষরিক পরিচয় নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দেওয়ান পরিবারের গৃহিণীরা এই থানটিকে দুধবিবির থান বলেই দাবী করেন। এমনকি স্থানীয় বেশকিছু বর্ষীয়ান রমণীদের মধ্যেও এই দেবী দুধবিবি নামে অধিক সমাদৃতা। এক্ষেত্রে বলা যায় যে বনবিবির জনপ্রিয়তা এতদঞ্চলে যথেষ্ট বেশি থাকার কারণে হয়তো দুধবিবি কালক্রমে নাম হারিয়ে বনবিবির সঙ্গে একাত্ব হয়ে গেছেন। পাড়ার মহিলারা নিজ সন্তানদের মঙ্গলকামনা করে দুধবিবির এই থানে ডাবের জল ও দুধ ঢালেন, ধূপ ও বাতি দেন। দেবীর আশীষ স্বরূপ থান ধোয়া জল ভক্তিভরে নিজেরা খান ও নিজেদের সন্তানদের খাওয়ান। অনেকে সন্তানলাভের আশায় দেবীর কাছে মানত করেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দেবীর থানে হাজত দিয়ে যান। পাশাপাশি মানিকপিরও হাজত পান।

তবে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। যথা, যে দেবী প্রসূতির অপুষ্টিনাশ করেন, শিশুর মুখে পর্যাপ্ত মাতৃদুগ্ধের যোগান ঘটান তিনি কেন জনসমাজে সেভাবে গুরুত্ব পেলেন না? এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে জলে-জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষের জীবনে বসন্ত, কলেরা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদির মতো মারণরোগের অভাব ছিল না। পাশাপাশি বাঘ, সাপ, কুমীরাদির মতো সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকাই তখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ফলে সেসবের হাত থেকে রক্ষা পেতে বনবিবি, দক্ষিণরায়, মনসা, শীতলার মত দেবদেবীদের তুষ্ট করাটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রসূতিরোগ, মেয়েদের অপুষ্টি, স্তনদুগ্ধ সংক্রান্ত সমস্যাদির মতো বিষয়গুলি ঠিক কতটা গুরুত্ব পেত সে নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। আর পাঁচটি স্ত্রীরোগের মতো এই দিকটিও মহিলামহলেই ঢাকা পড়ে থাকতো। আবার এমন কিছু লৌকিক দেবতা আছেন যাঁরা

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একাধিক সমস্যার সমাধান করতে একাই সিদ্ধহস্ত। যেমন, পঞ্চানন্দ। তিনি একাধারে শিশুরক্ষক, সন্তান-প্রদায়ক, পশুরক্ষক, রোগব্যাধির অধীশ্বররূপে পূজিত হওয়া এক জনপ্রিয় লৌকিক দেবতা। হয়তো এইসব কারণেই বনবিবি, দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ, মনসা, শীতলার মতো প্রথম সারির লৌকিক দেবদেবীরা জনমানসে বিশেষ পদমর্যাদা লাভ করলেও দুধবিবি সেইরূপ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেননি। ফলে গ্রামজীবনের রঙ্গমঞ্চে তিনি দেবীরূপে অবতীর্ণ হয়েও গুটিকয়েক গ্রামের মহিলাদের মধ্যেই সীমিত থেকে গেছেন।

অশেষ কৃতজ্ঞতা- হোসেন মোল্লা, সুবোধবালা সর্দার ও আরতি নস্কর (বৃজি পূর্বপাড়া, গড়িয়া), বিকি কর (পাটুলী, কোলকাতা), অলোক কুমার শর্মা (স্বর্ণকারপাড়া, রাজপুর-সোনারপুর), মোনাজাত মণ্ডল ও মানু দেওয়ান (ছয়ানিপাড়া দোলতলা, সোনারপুর), কুহেলী ব্যানার্জী (টেগোর পার্ক, কোলকাতা), কৃষ্ণকালী মণ্ডল (ধোপাগাছি, বারুইপুর)।

তথ্যসূত্র:

1. Sen, Dineshchandra, *Folk Literature of Bengal,* Calcutta: University of Calcutta, 1920, Pp 113-114.
2. হালদার ,বিমলেন্দু ,*দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা,* ২য় সংস্করণ , কোলকাতা: প্রিয়নাথ প্রকাশনী,২০১৯ , পৃ. ১৪।
3. তদেব।১৬ ,
4. বসু ,গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ,*বাংলার লৌকিক দেবতা,* ৪র্থ সংস্করণকোলকাতা ,: দেজ ‘ .পৃ ,২০০৮ ,পাবলিশিং ১৭৯।
5. তদেব।১৭৯ ,
6. Sen, Dineshchandra, পূর্বোক্ত, 113-115.
7. ক্ষেত্রসমীক্ষা- দুধবিবির থান, দুধবিবিতলা, বৃজি পূর্বপাড়া, থানা পাটুলী, কোলকাতা-৭০০০৮৪, পশ্চিমবঙ্গ, তারিখ ১৬ই জানুয়ারী, ২০২০, সময়- ১৯ঘণ্টা ০০:।
8. Wikipedia contributors. “Prolactin”, *Wikipedia*, 15th August 2020, Time: 12:00hrs.
   http://en.m.wikipedia.org/wiki/Prolactin
9. জানা” ,নীলোৎপল ,দুধকুমারী ,“*বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ,* বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত ,য় সংস্করণ৩ ,কোলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স.পৃ ,২০১৬ , ২৪৮।
10. আরবি শব্দ ‘খাদিম’ বা ‘খাদেম’এর অর্থ হল ভৃত্য বা সেবক, যিনি মসজিদের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকেন। (বিশ্বাস, শৈলেন সংকলিত *সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান,* ২য় সংস্করণকোলকাতা ,: শিশু সাহিত্য সংসদ্, ১৯৭৩, পৃ. ২২৩।)

11. সাক্ষাৎকার- হোসেন মোল্লা, বয়সবছর ৮০ - (আনুমানিক), পেশাখাদেম -, ঠিকানা - দুধবিবিতলা, বৃজি পূর্বপাড়া, থানা- পাটুলী, কোলকাতা- ৭০০০৮৪, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান- দুধবিবির থান, দুধবিবিতলা, তারিখ-১৬ই জানুয়ারী, ২০২০, সময়- ১৯ঘণ্টা ০০:।
12. সাক্ষাৎকার- সুবোধবালা সর্দার, বয়স- ৮০ বছর (আনুমানিক), পেশা- গৃহবধূ, ঠিকানা- দুধবিবিতলা, বৃজি পূর্বপাড়া, থানা-পাটুলী, কোলকাতা- ৭০০০৮৪, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান- দুধবিবিতলা, তারিখ- ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২০, সময়- ১৮ঘণ্টা ০০:।
13. সাক্ষাৎকার- আরতি নস্কর, বয়স- ৭৫ বছর (আনুমানিক), পেশা- গৃহবধূ, ঠিকানা- দুধবিবিতলা, বৃজি পূর্বপাড়া, থানা-পাটুলী, কোলকাতা- ৭০০০৮৪, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান- দুধবিবিতলা, তারিখ- ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২০, সময়- ১৮ঘণ্টা ৩০:।
14. ক্ষেত্রসমীক্ষা- মানিকপিরের থান, ছয়ানিপাড়া দোলতলা, থানা-সোনারপুর, কোলকাতা- ৭০০১৪৯, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, তারিখ-৯ই আগস্ট, ২০২০, সময়-১৬ঘণ্টা ০০:।
15. সাক্ষাৎকার- মানু দেওয়ান, বয়স- ৫০ বছর (আনুমানিক), পেশা- গৃহবধূ, ঠিকানা - ছয়ানিপাড়া দোলতলা, থানা-সোনারপুর, কোলকাতা-৭০০১৪৯, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান- ছয়ানিপাড়া, তারিখ-৯ই আগস্ট, ২০২০, সময়-১৬ঘণ্টা ৩০:।

গৌড়ীয় নৃত্যের প্রেক্ষিতে বাংলার দেবদাসী প্রথা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

তানিসা দাস
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: দেবদাসী একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ দেবতার দাস। দেবদাসী প্রথা বহু শতাব্দী ধরে হিন্দু সমাজের একটি অংশ হলেও মূলত ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত একটি ধর্মীয় রীতি। দেবীকে দেবদাসী উৎসর্গ করার প্রক্রিয়া একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং মেয়েটির বয়ঃসন্ধির আগে সম্পাদন করা হয়। আচারের পরে তাকে দেবতার সাথে বিবাহিত বলে মনে করা হয় এবং সে সারা জীবনের মত কোনো নশ্বরকে বিবাহ করার অনুমতি হারায়। প্রাচীনকালে দেবদাসীরা মূলত মন্দির পরিষ্কার করা, প্রদীপ জ্বালানো প্রভৃতি কাজ ছাড়াও বিশেষ অনুষ্ঠানে দেবতার সামনে শাস্ত্রীয় নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করত। তাদেরকে সমাজের সম্মানিত সদস্য বলে গণ্য করা হত। পরবর্তীকালে মধ্যযুগে বিপুল সংখ্যক মন্দির ধ্বংসের কারণে এই ধর্মীয় রীতির অবনতি ঘটে এবং সমাজে দেবদাসীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তারা আর্থিক সমস্যার কারণে সমাজের অভিজাত ব্যাক্তিদের উপপত্নীতে পরিণত হয়। দক্ষিণ ভারতের মতো বাংলাতেও দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল বলে মনে করা হয়। গৌড়, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন মন্দিরগাত্রগুলিতে খোদাই করা নৃত্যমূর্তি থেকে অনুমান করা যায় বাংলার নিজস্ব ধ্রুপদী নৃত্যধারা ছিল যা কালের নিয়মে বিবর্তিত হয়েছে। এই প্রবন্ধটির মাধ্যমে বাংলার দেবদাসী প্রথা এবং বাংলার ধ্রুপদী নৃত্যধারা গৌড়ীয় নৃত্য ও তার বিবর্তন আলোচনা করার প্রচেষ্টা করেছি।

সূচক: দেবদাসী প্রথা, বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা ও সঙ্গীত, বাংলার দেবদাসী, গৌড়ীয় নৃত্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের শাস্ত্রীয় নৃত্য ও দেবদাসী প্রথা সম্পর্কে বহুল চর্চা বহুদিন ধরেই মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল- বাংলার কি কোনও ধ্রপদি নৃত্যধারা নেই? বাংলার কি কোনও শাস্ত্রীয় নৃত্যের ধারা ছিল? যদি না থাকত তাহলে বাংলার মন্দিরগাত্রে নৃত্যমূর্তি এল কোথা থেকে? তাহলে কি বাংলায় দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল? বাংলার মন্দিরের এই নৃত্যমূর্তিগুলি যে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল তার তাগিদেই জানতে চেষ্টা করেছি বর্তমান ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির অতীত ইতিহাস, তাদের ক্রমবিবর্তন এবং শাস্ত্রীয় ভিত্তি এবং জানতে পেরেছি বাংলার একটি নিজস্ব শাস্ত্রীয় নৃত্য পদ্ধতি ছিল এবং তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। সুপ্তভাবে গ্রামীণ

নৃত্যধারা বিশেষত গ্রামীণ গুরুপরম্পরা সজীব নৃত্যধারাগুলির মধ্যে বিবর্তিতরূপে চলছিল।

বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে এছাড়া পরবর্তীকালে ভারতীয় অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে এবং স্বাধীনতার পর বহুল সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলে সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি বিভিন্ন গ্রামীণ নৃত্যধারাগুলি থেকে পুনর্গঠিত হয়ে, রুপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। যে সময়ে অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি ধীরে ধীরে পুনর্গঠিত হতে শুরু করে সে সময় থেকেই বাংলা এই ব্যাপারে ধীরে ধীরে স্তব্ধ হতে থাকে অথচ বাংলার গীতগোবিন্দ, পরকীয়া রাধাতত্ত্ব দিয়েই অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্য সমৃদ্ধ হয়েছে এবং আজকের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ভারতবর্ষে প্রাথমিক ভাবে শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির পুনর্গঠনে স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব থেকে কিছু পর পর্যন্ত আমরা চারটি শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা পাই- ভরতনাট্যম, কথাকলি, কত্থক ও মনিপুরী। পরবর্তীকালে গবেষণার দ্বারা এক একটি নৃত্যধারা পুনর্গঠিত হয়ে পূর্বোক্ত তালিকায় সংযোজিত হয়। এর সম্বন্ধে Prof. Mohan Khokar বলেছেন-“ Four major forms of traditional dance speedily came to the fore during the Revival and each built up it’s own following so rapidly did these dances emerge and so firmly did they established themselves, that for a long time Bharatnatyam, Kathakali, Kathak and Manipuri were the only forms of classical dance in the Indian tradition. For years, almost all writings on Indian dance referred pointedly to “the four classical forms”. Only later did it become increasingly evident that a number of other modes rooted in the classical tradition existed.”-(Marg, vol. XXXXI No. 2, topic – The Revival is Ushered., pg.54).

প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের ধারা ফল্গু নদীর মতো সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও শাস্ত্রে বয়ে চলেছে। বাংলার ধ্রুপদী নৃত্যধারা যে কতটা প্রাচীন তার প্রমাণ দেয় নাট্যশাস্ত্রে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য, আহার্য- অভিনয়ের আলোচনা। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চৈতন্যদেবের পরিভ্রমণ সারা ভারতকে উন্মথিত করেছে। গৌড়ীয় নৃত্যের শাস্ত্রীয় আলোচনা সূচনা পর্বে Curt Sachs-এর ‘World History Of Dance”-এ নৃত্য সম্পর্কে উক্তিটি করতেই হয়- “Dance is the mother of the arts. Music and poetry exist in time : Painting and architecture in space. But the dance lives at once in timevand space.” ঐতিহ্যবাহী গৌড়ীয় নৃত্য বিষয়ে যুগ যুগ ধরে নৃত্যশিল্পী ও শাস্ত্রকারেরা চিন্তা করার পরে তার রূপ দিয়েছেন এবং শাস্ত্রও রচনা করে গেছেন। বাংলার ভৌগোলিক রূপের মতো নৃত্য, গীত ও বাদ্য সমস্ত কিছুর

মধ্যেই আছে গাম্ভীর্য-দৃঢ়তা-গভীরতা ও তার সাথে লালিত্য-কমনীয়তা-আন্দোলিত হিল্লোল এবং চক্রাকৃতি আবর্তন। গৌড়ীয় নৃত্য ভঙ্গিমাও বলিষ্ঠ দৃপ্তময় ও লাবন্যমন্ডিত সুষমাময় আবর্তনের সংমিশ্রিত এক মাধুর্যপূর্ণ রূপ। ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রামাণ্য গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রে গৌড় দেশের রমণীদের কোমল ও দৃঢ় ভঙ্গিমা যুক্ত নৃত্যের বর্ণনা আছে। পরবর্তীকালে মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে গৌড় রাগগুলির গীতের সঙ্গে কিভাবে নৃত্যাভিনয় ও নাট্যাভিনয় হত তার বর্ণনা এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দে গৌড়বঙ্গে অভিনয় সহযোগে প্রবন্ধগীতের সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ের বর্ণনা পাওয়া গেছে।

প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য 'গৌড়ীয় নৃত্য' নামটি গৃহীত হয় প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে ১৯৯৪ সালে। নামকরণের কারণগুলি হল:

[১] ষষ্ঠ শতকের লেখক দন্ডিনের 'কাব্যাদর্শে' গৌড়ী নামে সাহিত্য রচনা রীতির উল্লেখ আছে। বাণভট্টের রচনা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সাহিত্যদর্পণে গৌড়ী রীতির উল্লেখ পাওয়া যায় অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলার যে অবদান তাকে তৎকালীন ভারতবর্ষের সারস্বত সমাজ স্বীকৃতি দিয়েছে, বরণ করেছে গৌড়ী রীতি বলে।

[২] চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' হিসেবে বিশ্বজনীন সমাদর লাভ করে। রামমোহন রায়ের লেখা বাংলা ব্যাকরণ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে পরিচিত অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার যা কিছু তা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গৌড়ী বা গৌড়ীয় নামে প্রসিদ্ধ।

[৩] সর্বভারতীয় তথা আঞ্চলিক সংগীত শাস্ত্রেও প্রাচীনকাল থেকেই গৌড়ী বা গৌড়ীয় পদ্ধতির উল্লেখ আছে। যেমন 'নাট্যশাস্ত্রে' গৌড়বঙ্গের নর্তক-নর্তকী তথা গৌড়ী নর্তক-নর্তকীর বেশভূষা রূপসজ্জার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এছাড়া গৌড়, গৌড়কৈশিকী, গৌড়পঞ্চমা ইত্যাদি রাগের সঙ্গে নবরসযুক্ত নাট্যাভিনয় বা নৃত্যাভিনয়ের কথাও পাওয়া যায়।

[৪] পঞ্চদশ শতকে উড়িষ্যার সংগীত শাস্ত্রকার মহেশ্বর মহাপাত্র রচিত 'অভিনয় চন্দ্রিকা'তে সাতরকম নৃত্যশৈলীর উল্লেখ পাওয়া যায় তারমধ্যে স্পষ্ট ভাষায় গৌড়বাসীদের নৃত্যশৈলীর এক বৈশিষ্ট্যর কথাও আছে (শ্লোক ১৯৩-১৯৪)।

উপরের তথ্যগুলি স্পষ্টতই প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের নামকরণে 'গৌড়ীয় নৃত্য' নামটির যথার্থতাই নির্দেশ করে থাকে।

বাংলার দেবদাসী প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের শরণাপন্ন হতে হয় কারন ভারতবর্ষের প্রচলিত শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে নাট্যশাস্ত্র স্বীকৃত। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত চারপ্রকার নৃত্যের উল্লেখ আছে-আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী, ও ঔড্রমাগধী এবং এর মধ্যে চতুর্থ অর্থাৎ ঔড্রমাগধী নৃত্য গৌড়বঙ্গে প্রচলিত ছিল। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-দশম শতকে বাংলার মন্দিরে শাস্ত্রানুসারী নৃত্যানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল যার উল্লেখ পাওয়া যায়

কলহণ রচিত 'রাজতরঙ্গিনীতে'। সেখানে বিবৃত আছে – কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় যখন ছদ্মবেশে গৌড়বঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধন শহরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি দেখেন কার্তিকের মন্দিরে শাস্ত্রীয় সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নৃত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং কমলা নামে এক দেবদাসী নৃত্য করছে। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে বাংলায় দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল।

ভারতবর্ষের বেশীরভাগ নৃত্যই দেবতাকেন্দ্রিক। দেবতার দাসী এই অর্থে দেবদাসী কথাটির প্রচলন হয়েছে। মন্দিরে মন্দিরে নৃত্যর মাধ্যমে দেবসেবায় এরা নিজেদের উৎসর্গ করত। ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই মন্দিরে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হত। ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই দেবদাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। সামাজিক বিভিন্ন কারনে – কখনও বা চরম দারিদ্রতায়, কখনও বা বিয়ে না হওয়ার ফলে সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে কিম্বা শুধুমাত্র ধর্মীয় কুসংস্কারের বশে স্বেছায় অ্থাৎ পুরোহিত বা রাজার নির্দেশে এবং বিভিন্ন ধরনের উৎপীড়নের ফলে দেবদাসী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। প্রথমদিকে দেবদাসীরা শুধুমাত্র মন্দিরে দেবতার সামনে নৃত্য করত, ক্রমে এই ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে এবং ধর্মীয় বন্ধন বহুলাংশে লোপ পায়।

দেবদাসীরা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে বিভিন্নভাবে আহরিত হত। ব্যবহারিক কারনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়নের মানদণ্ডে দেবদাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত – দেবদাসী, রাজদাসী ও স্বদাসী। দেবদাসীরা শুধুমাত্র মন্দিরে দেবতার সামনে নৃত্য প্রদর্শন করত। এছাড়া এরা পুরোহিত ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সামনেও নৃত্য প্রদর্শন করত। রাজদাসীরা মন্দিরের চত্বরে রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাগমে বা রাজদরবারে নৃত্য প্রদর্শন করত এবং স্বদাসীরা সাধারন লোকের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য করত। এছাড়া বিশেষ কোনও উৎসবে বছরে এক দুবার মন্দিরের বাইরের চত্বরে নৃত্য প্রদর্শনের সুযোগ পেত।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় দেবদাসী প্রথা প্রচলিত। বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরেও দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। এইসময়ে নগরনটী অর্থাৎ রাজদাসী স্বদাসীরও ব্যাপক প্রচলন ছিল। জৈনদের 'রায়পসেনিয়' সূত্রে ন্রিত্যকলাভিজ্ঞ নর্তক-নর্তকীর উল্লেখ আছে। মহাবীরের সমক্ষে নট নটীরা বত্রিশ প্রকার ভঙ্গীতে নৃত্য করেছিলেন বলে লিখিত আছে। বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই বাংলায় জৈনমত প্রসারলাভ করেছিল। জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুসারে সর্বমোট চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর অবতীর্ণ হন এবং কথিত আছে এদের মধ্যে একুশ জনের সঙ্গে রাড় বাংলার সংস্রব ছিল। জৈ্নগ্রন্থ 'বসুদেবহিণ্ডই' থেকে জানা যায়, উদ্যান যাত্রায় নৃত্যগীতরতা মদ্যপানে মত্তা গণিকা অর্থাৎ নটি বা রাজদাসী বা স্ব-দাসীর কথা। এই বৃত্তি বৌদ্ধযুগে অতি ব্যাপক ছিল। তার অন্যতম প্রমাণ পালিতে গনিকাবাচক বেশ কয়েকটি শব্দের প্রয়োগে – বেসী, নারিয়, গামনিয়ো, নগরশোভিনী, বন্নদাসী, কুম্ভদাসী। বৌদ্ধ সাহিত্যে নগরবধূ বা রাজদাসীদের কথা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখ্য হল- মগধবতী, শালবতী, বাসবদত্তা, আম্রপালি,

এবং বিমলা। বাংলায় অনেক বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির ছিল যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলার পাল রাজাদের অবদান ছিল।

যদিও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের দেবদাসীদের কথাই উচ্চারিত হয় সব থেকে বেশী কিন্তু বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়। রাজদাসী ও স্বদাসীদের গৌড়বঙ্গে 'নটী' বলা হত। এছাড়া আরও বিভিন্ন নামে বাংলায় এদের অভিহিত করা হয়েছে। যেমন- জনপদকল্যানী, দেববাসিনী, দেউলবাসিনী, বাররামা, দেববারবনিতা ইত্যাদি। প্রাচীনকালে নৃত্যগীত চর্চায় কবি পণ্ডিতরা বিমুখ ছিলেননা। যারা নটবৃত্তি করতেন সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা ছিল। 'নতগাঙ্গো' রচিত বেশ কয়েকটি শ্লোক 'সদুক্তিকর্নামৃত' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় নৃত্য গুরুদের নট, আচার্য, গুরু, এবং পরবর্তীকালে গীদাল, রসিক ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেমন কবি কর্ণপুরের 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে' পাওয়া যায় গুরুদের কথা – "তথা সতি নৃত্য- গীত –বাদ্যাধ্যায়পাসিত চরণস্তঃ।" এর অর্থ হল- 'নৃত্য গীত বাদ্য অধ্যয়নের আচার্যদের উপাসিত চরণ।

কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে (খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতক) উল্লেখ আছে যে বারাঙ্গনা গণিকা বা দাসীরা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন। ভারতের গণিকারা পড়াশুনা ও নৃত্য গীতের সুযোগ পেত। বারনারীদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ছিল – নৃত্য, গীত, বাদ্য, পঠন, লিখন, চিত্রকলা, পরমর্মজ্ঞতা, সংবাহন, গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা ও মালা গাঁথা। ভাবী গণিকাকে আট বৎসর বয়স থেকে সঙ্গীত অর্থাৎ গীত বাদ্য নৃত্য অভ্যাস করতে হত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যগীত পটীয়সী গণিকাদের উল্লেখ পাওয়া গেছে। গণিকাদের নামের অন্তে সাধারণত এই শব্দগুলি থাকত, যথা- দত্তা, মিত্রা, সেনা (দত্তা মিত্রা চ সেনেতি বেশ্যানামানি যোজয়েৎ)। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে গৌড়ীও রিতিতেবাংলার কবি সুবন্ধু রচিত 'বাসবদত্তা' নামের শেষে 'দত্তা' শব্দটি লক্ষণীয় এবং সে রাজদাসী, নৃত্য গীত পটীয়সী। পরবর্তীকালে গুপ্ত, পাল, সেন আমলে বাংলায় নৃত্য-গীতির স্বচছল অনুশীলন ছিল। লোকগীতি অ লোকনৃত্যের পাশাপাশি করণ, অঙ্গহার, চারি, রস সম্বলিত নৃত্যকলা নাট্যাভিনয়ের অনুশীলন তখন অব্যাহত ছিল রাজ অন্তঃপুরে, রাজ দরবারে। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন নাট্যগৃহে বা রঙ্গমঞ্চে, দেবায়তনে ও বিভিন্ন পার্বণ-উৎসবাদিতে।

মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী'-র (খৃঃ ৫ম অন্য মতে খৃঃ ৭ম-৮ম শতক) গীতাধ্যায়ে গৌড়কৈশিক, গৌড় পঞ্চমা রাগের সঙ্গে বিভিন্ন রসযুক্ত নৃত্যাভিনয় বা নাট্যভিনয়ের কথা পাওয়া যায় অর্থাৎ তৎকালীন বাংলায় অভিজাত নৃত্য তথা সংগীতের আঙ্গিক ও বিকাশ ভরতমুনি রচিত নাট্যশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসরণ করত। বাংলায় পাল ও সেন রাজাদের আমলে শিব কিংবা কার্তিকের মন্দিরে দেবদাসীদের নৃত্যগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী'-তেও এর উল্লেখ আছে। G.S. Ghurye তাঁর

Bharatnatyam and its Costume গ্রন্থে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য প্রসঙ্গে লিখেছেন "Jayapida (AD 751-782) while he was in the town of Paundra Vardhana in Gauda Bengal, once saw in the temple of Kartikeya a dance 'Lasya' being performed. The 'Nartaki' was one 'KAMALA'. এর থেকে জানা যায় খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে উত্তরবঙ্গের পৌণ্ড্রবর্ধন নগরে কার্ত্তিক মন্দিরে দেবদাসীদের শাস্ত্রানুসারী নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। নয়পালের রাজত্বকালে মূর্তি শিবের বাণগড় প্রশস্তিতে জানতে পারি মন্দিরে সহস্র দেবদাসীদের কথা-

"হিমগিরিমিব শুভ্রং রম্য-রত্নাশু-জাল-
প্রতিফলিত-সকেলি-প্রৌরহ-রামা-সহস্রম"

অর্থাৎ মন্দিরটি হিমগিরির ন্যায় শুভ্র সেখানে সহস্র দেবদাসী। রামপালের সময়ে গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত কাব্য'- এ দেবদাসী সম্প্রদায়ের নৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্নামৃতে' সংগীত কুশলা বারাঙ্গনাদের উল্লেখ আছে। গোবর্ধন আচার্যের বইতে গৌড়বঙ্গে নৃত্যগীতের কথা পাই। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতেও (১০৯৫ খৃঃ) বঙ্গদেশে দেবদাসী প্রথার ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে বাংলার দেবালয়ে দেবদাসী ব্যবস্থা ছিল।

রাঢ়বঙ্গের মল্লভূমে প্রসিদ্ধ মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর। এখানে দেবদাসী নটীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এরা নৃত্যগীতবাদ্যে পারদর্শী ছিলেন। যার নিদর্শন এখনও দেখা যায় বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সব মন্দিরের ভাস্কর্যে – শ্যামরায়, কৃষ্ণরায়, জোড়বাংলা প্রভৃতি। বিষ্ণুপুরে দেবদাসী বা নটী পাড়া ছিল। রাজারা এই 'নটীপাড়া' কোরে দিয়েছিলেন- ইঁদকুড়ি, রাণার পুকুর, রাঙ্গামাটি প্রভৃতি পাড়ায় এঁরা থাকতেন এবং রাজা-শ্রেষ্ঠী-বণিকদের মনোরঞ্জন করতেন। এই দেবদাসীদের নাম পাওয়া যায়- যোগীদাসী, ভৈরবদাসী, কুমুদদাসী, লক্ষ্মীদাসী, পদ্মদাসী, পন্ডারিনীদাসী প্রভৃতি। এঁদের শেষ দেবদাসী ৩০/৪০ বছর আগে মারা গেছেন, তাঁর নাম ঊষারানী দাসী। এই দেবদাসীরা কৃষ্ণবাঁধের কাছে ইঁদকুড়িতে ইন্দ্রপূজার সময়ে রাজা ও সভাসদদের সামনে নৃত্যগীত করতেন – হোরী গান ও নাচ ছাড়া বাংলার লোকনৃত্য টুসু ভাদু ইত্যাদিও করতেন। রাজা তাঁদের অর্থ-জমি দিতেন। দুর্গাপূজার সময়ে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন মৃন্ময়দেবীর মন্দিরে আগমনী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত নৃত্যগীত করতেন। দুর্গাপূজায় দেবীকে স্নান করানোর সময়ে অষ্টপ্রহরে আটটি রাগে গান গাইতেন দেবদাসীরা এবং এই সময়ে চামর ও নানা উপাচার হাতে নৃত্য করত, যার নিদর্শন শ্যামরায় মন্দির ভাস্কর্যে দেখা যায়।

প্রচলিত ধারণা বাংলায় দেবদাসী প্রথা ছিল না-নেই কিন্তু পূর্বোক্ত তথ্যগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে যুগযুগ ধরে বাংলায় নানা ধরনের দেবদাসী, রাজদাসী, স্বদাসীর প্রথা চলে আসছে। এর নিদর্শনস্বরূপ দেখা যায় মন্দিরগুলিতে নাট মন্দিরের

অবস্থান। যেমন- আদিনা মসজিদে, রাজা জয়ন্ত নির্মিত জটার দেউল মন্দিরে (৯৭৫ খৃঃ) ও বাংলার বিভিন্ন মন্দিরগুলিতে, বিশেষত বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতেও নাটমন্দির আছে। পরবর্তীকালে সেই ধারা বজায় রেখে আধুনিক মন্দিরগুলিতেও নাটমন্দির দেখা যায়। যেখানে বর্তমানে লীলাকীর্তন, আরতি নৃত্য ইত্যাদি হয়ে থাকে। আধুনিক বাংলায় বিশেষত পশ্চিমবাংলাতে এখনও দেবদাসীপ্রথার ক্ষয়িষ্ণু ধারা বর্তমান। রাঢ়বঙ্গের মালভুমিময় অঞ্চলে স্থানীয় রাজাদের রাজদাসী-নটী, কথ্যভাষায় 'নাচনী' আজকের স্বদাসীতে পরিণত। এই নাচনী সম্প্রদায় জোতদার রাজাদের বিবাহিত স্ত্রী নন এবং যিনি নাচনী রাখতেন তাঁকে রসিক নামে অভিহিত করা হত। রসিকের সংগীতে অর্থাৎ গীত-বাদ্য-নৃত্যে পারদর্শী – এই থেকেই সম্ভবতঃ রসিক কথাটি এসেছে। নাচনী সম্প্রদায়ের রসিকের সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি থাকত এবং সে কলারসিক ও কলাভিজ্ঞ হত। দক্ষিণভারতের আঞ্চলিক রাজাদের মত রাঢ়অঞ্চলের বিভিন্ন রাজারাও রসিক হতেন, 'নাচনী'দের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, গান লেখেন, গীত-বাদ্য-নৃত্যের উন্নতি ঘটান। যেমন জামতাড়ার মহারাজ শ্যামলাল সিং নিজে পাখোয়াজ বাজাতেন, তাঁর নাচনী ছিল- রাধিয়া, মাধিয়া, ফুলমণি, ফুটকি প্রমুখ। এই নাচনী নৃত্যধারার রীতি অনুসারে নাচনী প্রথমে আসর বন্দনা করে, তারপর মঙ্গলাচরণ এবং তার পথ ধরে আদিরসাত্মক বা শৃঙ্গাররসাত্মক অভিনয় সম্পৃক্ত ঝুমুর নাচ ও গান। বর্তমানে দেবায়তনে নর্তকী প্রয়োগের ক্ষীণ ধারাটি বাংলাতে বৈষ্ণবী সেবাদাসী কীর্তনিয়া রূপে বিরাজমান যারা নানা উৎসবে বিশেষতঃ মাঘী পূর্ণিমা, রাস উৎসব, ঝুলন উৎসব, হোলি উৎসব ইত্যাদি নানা ধরণের উৎসবে নৃত্যগীত করেন।

উপরিউক্ত আলোচনার পাশাপাশি আরও একটি আলোচনা না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সেটি হল 'বাঈ নাচ' যা ঊনবিংশ শতকের বাংলায় বিশেষত কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলায় প্রচলন হয়েছিলো। মূলতঃ ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ এর আমদানী করেছিলেন এবং শহরে বাঙালীর উত্তর ভারতীয় সংগীতপ্রীতি এবং বাঈনাচের অন্যতম প্রেরণা তিনিই। ১২৭১ বঙ্গাব্দের ২১শে বৈশাখ 'সোমপ্রকাশ' প্ত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি থেকে জানা যায় যে, রাসমেলা উপলক্ষে রাত্রিবেলা খেমটা নাচ হত।

মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগের প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত কিন্তু এর বিরুদ্ধাচরণ বা প্রতিবাদও আমরা জানতে পারি বিভিন্ন পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের লেখা দলিল ইত্যাদি থেকে। যেমন আরবীয় পর্যটক অলবেরুণীর বিবরণ (৯৭৩-১০৪৮ খৃঃ) থেকে জানা যায় যে, সমাজের সুস্থ পরিবেশ ও নৈতিক শুদ্ধকামী ব্রাক্ষ্মণ ও তাপসেরা দেবদাসী প্রথার বিরূদ্ধে সোচ্চার হয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু এই প্রতিবাদ কার্যকর হয়নি কারণ রাজা ও প্রভাবশালী অভিজাত সম্প্রদায় এই প্রথা সমর্থন করতেন। রাজপুতানার

একটি লেখ থেকে অলবেরুনীর এই কথার সমর্থন আছে। বঙ্গদেশেও এই প্রথার সাক্ষ্য বহন করে সাহিত্য গ্রন্থরাজি-উৎকীর্ণলিপি, ভাস্কর্য ও জীবন্তধারা।

আধুনিক যুগে এই প্রথার প্রতি জনসাধারণ বিরূপ হয়ে ওঠে কারণ এই প্রথার আবরণে মানুষ হীনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পথ পেয়েছিল, তাই রুচিবান লোকের কাছে এই প্রথাটি ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সামাজিক নিপীড়নের ফলস্বরূপ দেবদাসীদের গ্লানিময় দুর্বিষহ জীবন, কিন্তু তবুও আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক শিল্পকলাকে সযত্নে লালন করে এসেছে- চর্চা করে এসেছে। যার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি আমাদের ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রীয় নৃত্যকলাগুলি – ভরতনাট্যম, মোহিনীআট্টম, কুচিপুড়ী, ওড়িশি, কথক, গৌড়ীয় ইত্যাদি অর্থাৎ এই প্রথার ধনাত্মক দিকটি হল ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে ধরে রাখা। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়, বাংলার নৃত্যশিল্পীরা গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্যে দিয়ে ও বিভিন্ন আঞ্চলিক নৃত্যের মধ্যে দিয়ে এই প্রথাকে সজীব রাখার চেষ্টা করে গেছে। যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে বাংলার প্রাচীন শাস্ত্রীয় নৃত্য ও দেবদাসী প্রথাকে আমাদের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করে চলেছে।

তথ্যসূচী:

১. বাঙ্গালীর ইতিহাস – নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩

২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী – শ্রীসুকুমার সেন, বিস্বভারতি, ১৩৫৩(বঙ্গাব্দ)

৩. প্রসঙ্গ দেবদাসী – আরতি গঙ্গোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ১৯৮২

৪. বাংলার লৌকিক নৃত্য – মহুয়া মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক বিধুভূষণ, ২০০১

৫. গৌড়ীয় নৃত্য : প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা – মহুয়া মুখোপাধ্যায়, ২০০৪

৬. Devdasi System in India : A Changing Scenario – Dr. Sanjeev Kumar B. Nirmalkar, 2013

বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি ও কিন্নর রায়ের ছোটোগল্প

সৈকত মিস্ত্রী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের ফলই হল বিশ্বায়ন, যা সমগ্র পৃথিবীকে পরিবর্তিত করেছে। ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রবেশের সময় হিসাবে **১৯৯১** পরবর্তী সময়কেই ধরা হয়। বিশ্বায়ন দ্রুত প্রসারণশীল বাজার এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে মুছে দিয়েছে দেশ ও সীমানার ধারণা। দেশের সীমারেখা মুছে যাওয়ার পাশাপাশি মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিও প্রচলিত সীমার বাঁধন মুছে নতুন ধরনের সম্পর্কসমূহকে সৃষ্টি করছে। আর এই সবকিছুই কোনো না কোনোভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ছাপ রেখে যাচ্ছে। বাংলা ছোটোগল্পের পরিসরটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই দেখা যায় বিশ্বায়নের ডানায় ভর করে প্রযুক্তির জগতের যে বিপুল বিস্তার হয়েছিল, তার সরাসরি প্রভাব এসে পড়ে ছোটোগল্পে। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রগুলিতে প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন ধরা পড়েছে ছোটোগল্পের অনুপুঙ্খে, তেমনি প্রযুক্তি, বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের দ্রুত অগ্রসর ঘটায় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে ব্যক্তি মানুষের জীবন-জীবিকার একাধিক দিক—সেই ধরনের বিষয়সমূহও উঠে এসেছে এই পর্বের ছোটোগল্পে। এই প্রবন্ধে কিন্নর রায়ের লেখা নির্বাচিত কয়েকটি ছোটোগল্পের নিরিখে সেই দিকগুলিকে তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে।

সূচক শব্দ : বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি, পুঁজি।

কিন্নর রায় (১৯৫৩)-এর লেখালিখির সূত্রপাত সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সামাজিক-রাজনৈতিক ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কিংবা অর্থনৈতিক বহু ওঠাপড়ার সাক্ষী তিনি। সত্তরের দশকের উত্তাল আন্দোলনে জড়িয়েছিলেন তিনি। বহুবার জেল খাটতে হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে। কারাগারের কঠিন কঠোর জীবনও তাঁকে অনেক শিখিয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। এপর্যন্ত একশোটির বেশি বই লিখেছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক ছোটোগল্প লিখেছেন। যে সময়কে তিনি অতিক্রম করে তাঁর লেখনীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, তাঁর লেখায় এসে পড়েছে সেই সময়কালের অবশ্যম্ভাবী ছাপ। সত্তরের উত্তাল সময়, আশির দশকের অর্থনৈতিক সংস্কার এবং মুক্ত অর্থনীতির পদধ্বনি এবং উনিশশো একানব্বই পরবর্তী বিশ্বায়নের নানা অনুপুঙ্খ হয়ে উঠেছে তাঁর একাধিক ছোটোগল্পের বিষয় আশয়। যার অন্যতম ছিল প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার এবং মানুষের জীবনে তার প্রভাব।

বিশ্বায়নের ফলে প্রযুক্তি মানুষের জীবনধারায় যেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল, তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল বেশ কিছু আগে থেকেই। প্রযুক্তির

ক্রমপরিণতির দিকটিও বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় তার ছাপ রেখে অগ্রসর হয়েছে। একাধিক ছোটোগল্পকারের গল্পে সেই ধারাবাহিকতা উঠে এসেছে। কিন্নর রায়ও তার ব্যতিক্রম নন। বিশ্বায়নপর্বের প্রাকলগ্নে যেভাবে তাঁর ছোটোগল্পে প্রযুক্তি যেভাবে উঠে এসেছে, পরবর্তী একদশক কিংবা দুই দশক পরে তার চরিত্র অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। বদলে গিয়েছে প্রযুক্তির ধরন, বেড়ে গিয়েছে প্রযুক্তিনির্ভর মানুষের সমষ্টিগত পরিমাণও। লেখকের *সেরা ৫০টি গল্প* (দে'জ, ২০১১)-এর একাধিক ছোটোগল্পে এই বদলের দিকটি খুঁজে নেওয়া যায়। ১৯৮৯ সালে, অর্থাৎ ভারতে মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার প্রায় দু'বছর আগে 'প্রমা' পত্রিকার জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর লেখা ছোটোগল্প 'টেকনোলজি, টেকনোলজি'-তে প্রযুক্তি যে তাৎপর্যে উঠে এসেছিল, তার গুরুত্ব কিংবা অভিঘাত আরও বদলে যেতে দেখা যায় ২০০১ সালে শারদীয় 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঞ্ছাকল্পতরু' নামক ছোটোগল্পে। এ গল্পের সূত্রপাত খানিকটা হলেও জীবনানন্দীয়। 'নাইলন মশারির নীলিমা' কিংবা 'ফ্যানের হাওয়ায় মশারি ফুলে ওঠা' ইত্যাদি মনে পড়ায় *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের 'হাওয়ার রাত' কবিতাকে। জীবিকার ক্লিন্নতা প্রিন্টিং অফিসে কাজ করা এ গল্পের চরিত্র দিলীপকে সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই অবসন্ন করে তোলে। গল্পের আবহ নির্মাণের প্রয়োজনে একাধিক বার উঠে আসে প্রযুক্তি---

> মনিকা সকালে উঠেই খুব জোরে জোরে রেডিও চালিয়ে দেয়।...গোটা তিনেক পুরনো গান শুনতে শুনতে মনিকা ঘড়ি মেলায়।
>
> দিলীপের এই আট বাই দশ ভাড়া ঘরে টেলিভিশন নেই কিন্তু তার প্রতিবেশী ভাড়াঘরের বাসিন্দা রবিবারে বেশ সকালেই তীব্র স্বরে টেলিভিশন ছেড়ে দিয়ে জানান দেয়—ভোর ভয়ি। ভোর ভয়ি। মনিকার বাঁধা ছিল 'ডিজনেল্যান্ড', 'মহাভারত', 'হমপঞ্ছী এক ডাল কে' এবং কখনও কখনও প্রেশার কুকারে মাংস চাপিয়ে 'ভারত এক খোঁজ', যেখানে জওহরলাল নেহরুর ভূমিকায় রোশন শেঠ।
>
> ইদানীং মনিকা আর তিন্নির রবিবারের টি ভি শুরু হয় মহাভারত দিয়ে। তারপর 'সিগমা' হয়ে তা কোনো কোনো দিন পৌঁছে যায় 'ভারত এক খোঁজ'-এ। রিমোট কন্ট্রোলের রঙিন মায়া পাশের ঘরে। ব্যবধান মাত্র পাঁচ ইঞ্চি ইটের একটি দেওয়াল।
>
> দিলীপ আলোচনায় আলোচনায় জানতে পারে বাজারে এখন সব চাইতে চালু কালার টি ভি ওনিডা। বি পি এল, বিনাটোন—তাও নাকি খুব চলে। তার বন্ধুরা প্রায় সকলেই এই চৌকো বোকা-বাক্সটির মালিক। তাদের চার দেওয়ালের ভেতর বহির্জগতের অজস্র মায়া।[১]

এভাবেই রেডিও, কালার টিভি, একাধিক ধারাবাহিক দেখার প্রবণতা কিংবা তার আড়ালে এই পুঁজিনির্ভর বিনোদনব্যবস্থাকে জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তরে গ্রহণের এক

অদৃশ্য প্রতিযোগিতা যে সামাজিক জীবনপ্রবাহে ঢুকে পড়ছিল, তাকে তুলে ধরেছেন কিন্নর রায়। মনে রাখা দরকার, এ গল্প মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার আগে রচিত। তবু এ গল্প যে সেই অর্থনীতির পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল, তা অনস্বীকার্য। এ গল্পে রয়েছে পুঁজিকে জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবিতায় মেনে নেওয়ার কাহিনি। তাই কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুলে পড়ানো মনিকার মেয়ে তিন্নি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ে। অন্যদিকে 'ড্রিম প্রিন্টিং'-এ চাকরি করা দিলীপের জীবনটি ভরে থাকে দুঃস্বপ্নে। মালিকের মেজাজের উপরে নির্ভর করে তার চাকরি। এ গল্পে প্রিন্টিং অফিসের যে বিবরণ উঠে আসে তাতে বোঝা যায়, ডিটিপির যুগ তখনো আসেনি। তবু সমকালীন যান্ত্রিকতার পরিমণ্ডলে দিলীপের জীবনটি হয়ে ওঠে দুর্বিষহ।

শারদীয় পরিচয় পত্রিকার **১৯৯৯** সংখ্যায় প্রকাশিত লেখকের 'মণ্ডুককথা' নামক ছোটোগল্পে উঠে আসে আর একধরনের অর্থনৈতিক পালাবদলের কথা। মুক্ত অর্থনীতির হাত ধরে বেসরকারিকরণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। প্রযুক্তি ঢুকে পড়ছে বাঁধভাঙা জলের মতো। আর এই সবের হাত ধরে টালমাটাল হয়ে পড়ছে মানুষের উপার্জনের ক্ষেত্র। অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে কর্মনিরাপত্তার দিকটি। এইরকম পরিস্থিতিতে গল্পের চরিত্র অরূপ বাগচির নিজেকে ডিসেকটিং ট্রে'র উপরে আলপিন বিঁধিয়ে কেটে রাখা ব্যাঙের মতো অসহায় লাগে। ইএমআই কন্টকিত মধ্যবিত্ত ছাপোষা জীবনে চারিদিকটাই যেন তার কাছে হয়ে ওঠে ব্যাঙের জগৎ। গল্পের নাম তাই সার্থকভাবেই 'মণ্ডুককথা'—

> পঁয়তাল্লিশ প্লাস অরূপ বাগচির এতসব কথা পর পর মনে পড়ল না। কিন্তু তার মাথার খাদে ক্লোরোফর্মের ভারী গন্ধ। মোমমাখা ট্রের ওপর শোয়া তার হাতে পায়ে বেঁধা বোর্ড পিন।[২]

এ গল্প তুলে ধরে মধবিত্ত অর্থনৈতিক অবস্থার জনৈক চরিত্র অরূপ বাগচির কথা। সংসারের বহু খরচের দায়িত্ব সামলে ভারাক্রান্ত এই ব্যক্তিটির সামনে মূর্তিমান দৈত্যের বিভীষিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে খোলা বাজার অর্থনীতির বিষময় প্রভাবসমূহ। মানুষের পরিবর্তে প্রযুক্তির ব্যবহারের বৃদ্ধি নিচুতলার কর্মীদের মনে জাগিয়ে তোলে কর্মচ্যুতির ভয়---

> বিদেশি বিমা কোম্পানিকে তো বাজার ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। ফিস ফিস করে বলে ওঠে অফিসের পুরনো দেয়াল। প্রাচীন দরজা-জানলা বলে ওঠে, সেই রকম বিল আসছে পার্লামেন্টে।

আসছে কি, এসে গেছে। নেহাৎ বার বার সরকার বদলাচ্ছে, তাই—
মালহোত্রা কমিটির রিপোর্ট—

> খুব খারাপ দিন আসছে সামনে। নতুন কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। যাকে তাকে, যেখানে সেখানে বদলি করে দেবে—তোমার চাকরির শর্তেই এটা

আছে, এমন বলে জানলা-দরজা, দেয়াল, টেবিল- চেয়ার, পেপারওয়েট, জলের গ্লাস, ফাইল—সবাই ফিস ফিস করে এই সব কথা বলে।

ফিরে আসবে সেই কোম্পানির আমল। ন্যাশনালাইজেশনের পর এল আই সি যে লাভ করে তার অনেকটাই এ দেশের উন্নয়নে খাটে। ব্রিজ তৈরি হয়, রাস্তাঘাট। কোটি কোটি টাকার লাইফ ফান্ড আমাদের—সেখানেও বিদেশি ইনসিওরেন্স কোম্পানি হামলা করবে। এসব শুনলে অরূপ হাতের তালু ও পায়ের পাতায় জং ধরা পিনের ব্যথা টের পায়। ক্লোরোফর্মের গন্ধ বসে যায় বুকের ভেতর।

ইউনিয়নও কিছু করতে পারবে না। করার কোনো ক্ষমতাই নেই। সব জায়গায় মেশিন বসে যাচ্ছে। কম্পিউটার, ফ্লপি, হার্ড ডিস্ক। ম্যানুয়ালি আর কিছু হবে না। লোকই লাগবে না অ্যাত। ক্লাস থ্রি, ক্লাস ফোর থাকবেই না বলতে গেলে। যা থাকবে—তা হলো কয়েকজন অফিসার আর কিছু মেশিন।

ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর না থাকলে ইউনিয়নের চাপও নেই।

মনমোহন সিং, চিদাম্বরম, যশবন্ত সিনহা—সবারই কথাবার্তা কাছাকাছি। বিমা বেসরকারিকরণ করতে হবে। বিদেশি কোম্পানিগুলোর সামনে খুলে দিতে হবে ব্যবসার দরজা।[৩]

সুতরাং এ গল্প শুধু প্রযুক্তির প্রসার কিংবা তার ব্যবহারকেই শুধু তুলে ধরেনি, বরং তা যে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষকে কর্মহীন করে তোলার আশঙ্কা তৈরি করেছিল--সেই সত্যটি এখানে উঠে এসেছে। বিশ্বায়ন পুঁজির পৃথিবীকে বৃহৎ করে তুলেছিল, মানুষের কর্মের সম্ভাবনাকে করেছিল সীমাবদ্ধ কিংবা বিপদগ্রস্ত। এ গল্প আমাদের সেই কথাই বলে।

ভারত মুক্ত অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে যে পুঁজির প্রসারকে স্বীকার করে নিয়েছিল, সেই পুঁজি দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল বহুতর সব ক্ষেত্রে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানুষের ঘরবাড়ি, বিনোদন থেকে নিত্যপ্রয়োজন—সমস্ত ক্ষেত্রেই পুঁজির বিকাশ ঘটেছিল দ্রুত। লেখক কিন্নর রায় তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন এই দিকগুলি। এইরকমই একটি ছোটোগল্প ‘বরফের গায়ে আগুন’ (শারদীয় গল্পগুচ্ছ ১৯৯৯)। এই গল্পের প্রেক্ষাপটে জেগে থাকে ১৯৯৯ সালের ভারত পাকিস্তানের মধ্যবর্তী কারগিল যুদ্ধ। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এই গল্প তুলে ধরেছে কীভাবে নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থার এক মুসলমান যুবক সুরজ তার হৃদযন্ত্রের অপারেশনের জন্য রাষ্ট্রের সাহায্য চেয়েও পায় না, কারণ যুদ্ধ হচ্ছে। অন্যদিকে এসময় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের প্রতি তৈরি হয় বিদ্বেষের চোরা স্রোত। খানিকটা সাংবাদিকতার বর্ণনাপদ্ধতিতে এ গল্পে উঠে আসে এইসব ঘটনাপ্রবাহ। গল্পের মূল প্রবাহটি এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হলেও অন্যদিকে এ গল্পের শরীর জুড়ে থাকে বিশ্বায়ন—

> ব্রহ্মপুর ইয়ুথ অর্গানাইজেশন, সমাজ কল্যাণ সমিতির ক্লাবঘর পাকা হয়েছে বছর চারেক হয়ে গেল। একবার ভোটও হয়ে গেল ক্লাবের পাকা ঘরে।
>
> একতলায় রাস্তার দিকে গোটা ছয়-সাত দোকানঘর। সব ভাড়া হয়ে গেছে। টিভি, লেডিজ টেলার্স, বালি-সিমেন্ট-লোহার রড, টেপ ক্যাসেট, রেডিমেড জামা-কাপড়—পাশাপাশি। মাস ভাড়া ছ'শো। অ্যাডভান্স হাজার পনেরো। একটা বড় ঘর আছে ক্লাবের। সেখানে দুটো টিভি। একটা রঙিন—একুশ ইঞ্চি। শাদা-কালো চোদ্দ ইঞ্চি।
>
> ক্লাবঘরের উল্টো দিকে পূর্ণিমা ল্যান্ড অ্যান্ড হাউজিং। প্রোমোটার, ডেভেলপার।...
>
> পূর্ণিমা ল্যান্ড অ্যান্ড হাউজিং-এর অফিসের চেয়ারে বসে আছি। টেবিলের ওপারে ইসলাম আলি মোল্লা, সোফিয়েল পুরকাইত, বাদল চট্টোপাধ্যায়। তিনজনে পার্টনারশিপে জমি কিনে—ঠিক কিনে নয়, কিছু টাকা বায়না দিয়ে মালিকের কাছ থেকে ধরে রেখে মাটি ফেলে উঁচু করে, ড্রেসিং করার পর বেচে দিচ্ছে। বিঘের পর বিঘে জমি। শালি জমি বাস্তু হয়ে যাচ্ছে। পুকুরে রাবিশ ফেলে বুজিয়ে দিয়ে দিব্যি, বাস্তু জমি। এসব খুব চলছে। এর নাম ডেভেলপিং।...
>
> এখানে—এই ব্রহ্মপুর বাদামতলায় এগারো বছর হলো বাড়ি করে এসেছে নিখিল সিদ্ধান্ত। চোখের সামনে দেখতে দেখতে কত কী বদলে গেল। রাস্তার ওপর এস টি ডি বুথ, রোলের দোকান, ঘড়ির দোকান, একটার পর একটা বড় স্টেশনারি, মুদিখানা, 'জলযোগ', বড়সড় মিষ্টির দোকান, শেয়ারের ফর্ম দেওয়ার ঠেক, বিউটি পার্লার, লেডিজ টেলারিং শপ। এস টি ডি বুথ হলো অনেকগুলো। মেয়েদের চুল কাটানো বিউটি পার্লারও বেশ কয়েকটা।[৪]

শুধুমাত্র উপরিউক্ত লক্ষণগুলিই নয়, বরং এ গল্পে উঠে এসেছে মফসসলকে গিলে ফেলে শহরের দ্রুত প্রসারের দিকটিও। তবু নাগরিক পরিষেবার মান যে সেইহারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল না, সেই দিকটিও এ গল্পে উঠে এসেছে।

'প্রহেলিকা সিরিজ' (এবং মুশায়েরা অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯) গল্পটির অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে তথ্য-প্রযুক্তি। এ গল্পের চরিত্র দিবাকর বাগচী পেশায় বইয়ের দোকানের প্রোডাকশন ম্যানেজার। প্রেসে তাড়া লাগিয়ে প্রুফ, কারেকশান সময়মতো নেওয়া এঁদের কাজ। কখনও বা হিসাবপত্র রাখা। বেতন অতি সামান্য। বহুদিন ধরে এইধরনের কাজ করে বুড়িয়ে যাওয়া এই লোকটি আর হিসাবপত্র কিংবা দরকারি কাগজ সেভাবে গুছিয়ে রাখতে পারেন না। এদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ে প্রযুক্তির দাপট। সেলফোনের প্রযুক্তি এসে যায়। এসে যায় কম্পিউটার। আর তারই সঙ্গে অনিশ্চয়তার দিকে ঢলে পড়ে এইসব পুরানো পেশাগুলি---

> না, এবার একটা পি সি নিতেই হবে। পার্সোনাল কম্পিউটারের ফ্লপিতে রাখব সব। মেমোরিতে রাখা থাকবে। দরকার নেই আর হিউম্যান মেমোরির। বলতে বলতে ‘তলব’-এর প্যাকেট দাঁত দিয়ে ছিঁড়ল সাগর। তারপর মুখে অনেকটা গুঁড়ো এক সঙ্গে ঢেলে চিবোতে চিবোতে বলল, ভাবছি একটা ফ্যাক্সও বসিয়ে নেব।[৫]

এ গল্পে পুস্তক মুদ্রণের জগতটিকে তুলে ধরেন লেখক। প্রযুক্তির আগমনের সঙ্গে দ্রুত কেমনভাবে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কগুলি পালটে যায়, তা হয়ে ওঠে এ গল্পের অন্যতম উপজীব্য। ‘হিউম্যান মেমোরি’ পরিত্যক্ত হতে থাকে। চারিদিক থেকে কোণঠাসা হতে হতে বাগচিবাবুর মতো মানুষেরা আশ্রয় নেন একধরনের কল্প জগতে। এই গল্পের বেশ কিছু অংশে তাই জায়গা করে নেয় কুহকী বাস্তবতা। এই ধরনের বাস্তবতার প্রয়োগ আরও কয়েকটি গল্পে ঘটিয়েছেন লেখক। যেমন ‘বাঞ্ছাকল্পতরু’ (শারদীয়া চতুষ্কোণ ২০০১) গল্পটি। এ গল্পের বর্ণনাপদ্ধতিতে রূপকথা, কিংবদন্তির সঙ্গে মিশে যায় জাদু বাস্তবতা। গল্পের শুরু হয় আশ্চর্য এক খবর দিয়ে—

> জলাশয়—তাহা পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা অথবা খরস্রোতা নদী, যাহাই হউক না কেন, সর্বত্রই চন্দ্রের খণ্ডিতাংশ মিলিতেছে। সেই খণ্ডিতাংশ দুই হস্ত ডুবাইয়া অঞ্জলিবদ্ধভাবে তুলিবার উপক্রম করিলেই গাত্র মার্জনার সাবান হইয়া যাইতেছে।[৬]

এইভাবে অগ্রসর হয়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে লেখক বিশ্বায়ন তথা পুঁজির প্রসারের বিভিন্ন অনুপুঙ্খকে যে তুলে ধরতে চান, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে গল্পের শেষে উপস্থিত কল্পবৃক্ষের বর্ণনায়। সারা গল্প জুড়ে গাছেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে। কথা বলে ওঠে প্রকৃতির একাধিক উপাদান—

> ইদানীং রসাল গাত্রে আর স্বর্ণলতিকার পেলব বন্ধন নাই।... রসাল এই লইয়া কয়েকদিন বেশ বিমর্ষ ছিল। এমন কি মাথার উপর নীল নভোমণ্ডলে শশীমুখ দেখিয়াও তাহার বিষাদ দূরীভূত হইতেছিল না। ইতোমধ্যে বহতা ফিচেল পবন একরাত্রে তাহার কর্ণে ফিস ফিস করিয়া বলিয়া গেল, দুঃখ করিও না। চতুর্দিকেই এখন বিশ্বায়নের সুপবন বহিতেছে। সেই মলয় বাতাসে বিশ্বায়নের সুগন্ধ। কেনটাকি চিকেন আসিতেছে। সস্তায়—প্রভূত সস্তায় পাইবে। আসিতেছে চীনা সাইকেল, জুতা, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ছত্র। কোরিয়া ও জাপানের নানা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। সবই জলের দরে। সস্তা, অথচ তাহার তিন অবস্থা হয় না।[৭]

বিশ্বায়নের প্রকৃতিকে গল্পের মাধ্যমে সম্যকভাবে তুলে ধরেন লেখক। তুলে ধরেন বিদেশি পুঁজির অগ্রসরণের কথা—

> ‘গ্যাময়’ ও ‘গ্লোরিফ্লেম’ নামের দুইটি বিদেশি কোম্পানি তাহাদের শ্যাম্পু, সাবান, লিপস্টিক লইয়া দ্বারে দ্বারে পঁহুছিয়া যাইতেছে। দ্রব্যের দাম অধিক।

> কিন্তু ইহাতে নাকি রূপ খোলে, সুতরাং রূপটান হিসাবে অনেকেই উক্ত প্রসাধন সামগ্রী ক্রয় করিতেছে।
>
> কেহ বা রাতারাতি ধনী হইবার নিমিত্ত উক্ত দুই কোম্পানির এজেন্ট হইয়া যাইতেছে। কিছু টাকা লাগাইয়া এজেন্ট হওয়া। তাহার পর অন্যদের পাকড়াইয়া এজেন্টকরণ। এইরূপে বৃত্ত সম্পূর্ণ হইতেছে।...
>
> সুতরাং যাহাদিগের হাতে নিয়মিত অর্থ আসিতেছে, তাহারা ঊর্ধ্ববাহু ও মুক্তকচ্ছ হইয়া বিদেশি সংস্থার জয়গান করিতেছে।[৮]

বলাই বাহুল্য লেখক এখানে কাল্পনিক নামের আড়ালে আমেরিকান বহুজাতিক কোম্পানি 'অ্যামওয়ে' এবং সুইডিশ বহুজাতিক কোম্পানি 'অরিফ্লেম'-এর মাল্টি লেভেল মার্কেটিং-এর কথা তুলে ধরেছেন, যা এই পর্বে মানুষের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। আর এভাবেই বিশ্বায়ন যেন কল্পবৃক্ষ হয়ে দেখা দেয়—

> টিভি-র দৌলতে, সংবাদপত্রের কল্যাণে গ্রামে গ্রামে এখন বডি ফ্রেশনার, হেয়ার রিমুভার, শ্যাম্পু, বডি স্প্রে, পারফিউম, ময়েশ্চারাইজার, সান ক্রিম, বডি লোশন ইত্যাদি, প্রভৃতি, ইত্যাদিরা হু-হু শব্দে ঢুকিয়া পড়িবার প্রয়াস করিতেছে। মহল্লায় মহল্লায় এখন কল্পবৃক্ষ। সর্বত্রই বিশ্বায়নের সুপবন।...
>
> শূন্যপথে বায়ুবেগে কল্পবৃক্ষ গমন করিতেছিল। কি তাহার শোভা! আলোর কি বাহার! জ্যোতিঃপুঞ্জ নির্গত হইতেছে বৃক্ষ শাখা, কাণ্ড হইতে। বৃক্ষ শাখায় থরে-বিথরে বিদেশি দ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। পারফিউম, বডি লোশন, ময়েশ্চারাইজার, সাবান, শ্যাম্পু, টিনের মাছ-মাংস, ছত্র, ঘড়ি, পাদুকা, কম্পিউটার—কিছুই বাদ নাই।[৯]

প্রকৃত প্রস্তাবে 'কল্পবৃক্ষ' আসলে কল্পনাই। সংখ্যাগুরু মানুষের জীবনে আবহমান কাল ধরে রয়েছে অভাব, আর অভাব আছে বলেই রয়েছে কল্পবৃক্ষের কল্পনা। যার দ্বারা সে অন্তত অভাবপূরণের কাল্পনিক সুখ অনুভব করে ভুলে থাকতে পারে তার কঠিন, কঠোর, নিষ্পেষিত জীবনকে। পুঁজির আনুকূল্যকারী গোষ্ঠীসমূহ বিশ্বায়ন তথা পুঁজির অবাধ প্রসারের ফলে এইরকমভাবে সমস্ত অভাবের অবসান হবে বলে যে অলীক স্বপ্ন ছড়িয়ে দেন, তার প্রতি একরকম ব্যঙ্গ উঠে আসে লেখকের আলোচ্য গল্পটিতে--

> তাহার পর এক রাতে প্রতি সরোবর, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ও নদী মধ্যে কোন মন্ত্র বলে বুঝি বা জাগিয়া উঠিল মায়াদ্বীপ। তন্মধ্যে সেই বাঞ্ছিত বাঞ্ছাকল্পতরু। কল্পনাতরুর শাখা-প্রশাখায় পণ্যের সমাহার। সমস্ত পণ্যই আন্তর্জাতিক। কেনটাকি চিকেন, স্কচ হুইস্কি, ফরাসী সুগন্ধী, চীনা সাইকেল, পাদুকা, ব্যাটারি, কোরিয়ার ছাতা, জাপানি ক্যামেরা, টিভি, ওয়াশিং মেশিন—একেবারে ভোগ্যপণ্য সামগ্রীর হদ্দমুদ্দ। ইহা ছাড়াও কল্পতরুর শাখে শাখে বিদেশি বডি ফ্রেশনার, লিপস্টিক, লিপগ্লস, ময়েশ্চারাইজারসহ নানাবিধ রূপচর্চার সামগ্রী।

সবাই কল্পবৃক্ষে পঁহুছিবার নিমিত্ত পাড়ে জড় হইল ও কোলাহল করিতে লাগিল।[১০] পুঁজি এবং প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণকারী মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে এই বিশ্বায়ন কিংবা পুঁজিব্যবস্থা মুনাফার কল্পবৃক্ষ হয়ে ওঠে, কিন্তু সমষ্টির জীবনে এগুলির অবাধ প্রসার ভেঙে ফেলে জীবিকা অর্জনের পুরানো ব্যবস্থাপনাকে, তৈরি হতে থাকে বিপুল পরিমাণ কর্মচ্যুতির আশঙ্কা। অল্প সময়ের ব্যবধানে পুঁজি এবং প্রযুক্তি চরিত্র পালটে ফেলতে সক্ষম বলেই তা কর্মের জগতটিকে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় যন্ত্রনির্ভর করে তোলার দিকে নিয়ে যেতে থাকে, অন্যদিকে ব্যক্তিমানুষ নিক্ষিপ্ত হয় পরিত্যক্তের খাতায়। আর এই সবকিছুর সামগ্রিক প্রভাব এসে পড়ে দেশের তথা পৃথিবীর জনসমষ্টির উপরে। বিশ্বায়নের প্রকৃত রূপকে লেখক কিন্নর রায় এভাবেই তাঁর একাধিক ছোটোগল্পের মাধ্যমে স্পষ্টতই তুলে ধরেছেন ।

উল্লেখপঞ্জি:

১. ‘টেকনোলজি, টেকনোলজি’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কিন্নর রায়, কলকাতা, দে’জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ৪৭৯-৪৮০

২. ‘মণ্ডুককথা’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কিন্নর রায়, কলকাতা, দে’জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৪৫

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৪৭

৪. ‘বরফের গায়ে আগুন’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কিন্নর রায়, কলকাতা, দে’জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩৩

৫. ‘প্রহেলিকা সিরিজ’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কিন্নর রায়, কলকাতা, দে’জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ১২৪

৬. ‘বাঞ্ছাকল্পতরু’, *সেরা ৫০টি গল্প*, কিন্নর রায়, কলকাতা, দে’জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ৫৯

৭. পূর্বোক্ত

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬২

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬

ক্ষণিকার ক্ষণবাদী জীবনচেতনা

বাপী নস্কর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

শঙ্করাচার্য তাঁর 'মোহমুদগর'-এ বলেছেন –

"নলিনীদল গতজলমতিতরলং।
তদ্বজ্জীবনম অতিশয় চপলং।।"

অর্থাৎ পদ্মপাতায় জলকণার মতো জীবন অতিশয় চঞ্চল। জার্মান দার্শনিক নিটৎসেও ক্ষণবাদী জীবন চেতনার কথা বলেছেন। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যপাঠেও ক্ষণবাদী জীবন উপলব্ধির কথা অনুভূত হয়। ক্ষণবাদী জীবন দার্শনিকেরা জীবনের ক্ষণমুহূর্ত্তকে উপভোগ করতে বলেন। তাঁদের মতে জীবন অনিত্য চঞ্চল। তাই যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত থেকেই তা নিঃশেষে পান করতে হবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'ক্ষণিকা'কাব্যগ্রন্থে ক্ষণমুহূর্ত্তকে উপভোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রথম কবিতাটিতেই তিনি ঘোষণা করেছেন–

"শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষনিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষনিক দিনের আলোকে।"[১]

এছাড়া এই কাব্যগ্রন্থে একাধিক কবিতায় জীবনের প্রতিটি ক্ষণের উপভোগ্যতা এবং অতীতচারিতা থেকে বিরত থাকার কথা সরবে উচ্চারিত হয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি এবং জীবনের চিরন্তন শাশ্বত সত্যের জয়োচারণ যে কবির মনোধর্ম, যে কবি উপনিষদের ধ্যান-মন্ত্রে নিজেকে উজ্জীবিত করেছেন, যিনি জীবনদেবতাকে স্বীয়-জীবনের পরিচালক শক্তি বলে বারংবার স্বীকার করছেন, যিনি প্রেম সম্পর্কেও শাশ্বত অনুভূতির সমর্থক – তিনি যখন ক্ষণবাদী জীবনদর্শনের কথা 'ক্ষণিকা'র কাব্যমালায় গ্রন্থিত করেন, তখন তা আমাদের স্বাভাবিক কারণেই বিস্মিত করে। তাই কবির নিজস্ব স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও পাঠকের বিবেচনার একটা অবকাশ থেকে যায় ক্ষণিকার তথাকথিত ক্ষণবাদী চেতনা সম্পর্কে। সঙ্গত কারণেই মনে প্রশ্ন জাগে 'ক্ষণিকা' সত্য-সত্যই ক্ষণমুহূর্ত্তের কাব্য, না কি এর মধ্য দিয়ে কবি জীবনের কোন শাশ্বত অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন?

উৎসর্গ-পত্রে শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিতের প্রতি কবি যে কথা বলেছেন তাতে কাব্যগ্রন্থটির মূল প্রবণতা ধরা পড়েছে –

"কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে
স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে –

কতকটা কি অগ্নিকণায়
ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে?”[২]

অর্থাৎ সহজ ভাব ও রসের এই কাব্যগ্রন্থটিকে অনায়াসেই সিগারেটের সহচর করতে পারা যায় এবং অবসর যাপন করা যায়।

‘উদ্‌বোধন’ কবিতায় কবি যা পাওয়া যায়নি তার জন্য বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন এবং সামনে উপস্থিত মুহূর্ত্তকে বরণ করে নিতে বলেছেন – “যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে/ আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে/ ... ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,/ ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি।”[৩]

‘অনবসর’ কবিতাটিতেও চিরপ্রতীক্ষা ও ত্যাগে উদ্‌ভাসিত প্রেমের মাহাত্ম্য প্রকাশিত থাকে নি। পুরাতন সহচরীর প্রস্থানে বেদনার গুঞ্জরণকে কবি প্রশ্রয় দিতে চান না। দ্রুত অবসরমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটে চলাই জীবন। পুরাতন প্রেমকে আঁকড়ে বসে থাকা মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কবি এখানে শঙ্করাচার্যের মতোই বলেছেন – ‘শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু শিশির বিন্দু –’[৪]। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত – “ইচ্ছা বটে বছর কতক/ তোমার জন্য বিলাপ করি,/ ... নিদেন কাঁদি মাসেক-খানেক/ তোমার চির-আপন জেনেই – / হায় রে আমার হতভাগ্য!/ সময় যে নেই, সময় যে নেই।”[৫] বর্তমান মুহূর্ত্তকে, নূতনকে বরণ করে নিতে হবে; তাঁর প্রতি কবি তাই আহ্বান করেন – “এমন সময় নতুন আঁখি/ তাকায় আমার গৃহদ্বারে .../ চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি/ তারেই শুধু আপন জেনেই।”[৬]

জীবনে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা-হতাশা, দুঃখ-সুখ, জন্ম-মৃত্যু – সবই আছে। কিন্তু তার জন্য মনকে মেঘাচ্ছন্ন করে বিলাপ বা হা-হুতাশ করার প্রয়োজন নেই। ‘বোঝাপড়া’ কবিতায় কবি তাই বলেছেন – “মনেরে আজ কহ যে,/ ভালো মন্দ যাহাই আসুক/ সত্যেরে লও সহজে।”[৭] কবি এখানে দুঃখ, সুখ, প্রেম, প্রীতি – কোনকিছুকেই চিরকালীন সত্য বলে ঘোষণা করেন নি। তবে সহজ সুরে যে গভীর কথা তিনি বলে গেছেন তাঁর চিরকালীনত্ব অস্বীকার করা যায় না। সত্য সত্যই, আমাদের জীবন কখনোই চিরপ্রাপ্তিতে ভরে ওঠে না। সংসারে সবাই আমাদের মনের মতোও হয় না। আর আমরাও কি সকলের মনের মতো হতে পারি? –

“তোমার মাপে হয় নি সবাই।
তুমিও হও নি সবার মাপে,
তুমি মর কারও ঠেলায়
কেউ বা মরে তোমার চাপে...”[৮]

তাই হতাশ ও দুঃখে নিমজ্জিত না হয়ে প্রতিদিনের শত কাজের মধ্যে সুখ খুঁজে নিতে হয় – “তেমন করে হাত বাড়ালে/ সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।”[৯] একথা তো সত্য যে আজ যা পাওয়া হয় নি বলে আমরা অনুতাপ করি কিছুদিন পর তার তীব্রতা

কমে আসে। তখন মনে হয় "তাহারে বাদ দিয়েও দেখি/ বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।"[১০] – কবির এসকল উক্তির মধ্যে জগৎ ও জীবনের গভীর সত্যই নিহিত আছে।

মানব মন ও সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তি যে রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই কবিকেই দেখি মনকে নিয়ে ঠাট্টা করেছেন এখানে – "আমায় যদি মনটি দেবে/ নিষেধ তাহে নাই,/ কিছুর তরে আমায় কিন্তু/ কোরো না কেউ দায়ী।"[১১] মন চিরকাল একই বিষয়কে আঁকড়ে বসে থাকবে এ সত্যে কবি বিশ্বাসী নন। মানুষের মন সদা চঞ্চল, অবাধ তার গতি। তাই নিবিড়ভাবে কোন কিছুর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলে কষ্ট পাওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রত্যাশা থাকলে কষ্ট আরও গভীর হয়। এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এর মধ্যে জীবন সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি আছে, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষণবাদী জীবনচেতনা নিশ্চয় এক নয়। 'ক্ষণের দেখা' কবিতায় যে নারী মুখ ঘোমটার ফাঁকে ক্ষণমুহূর্তের জন্য উদ্‌ভাসিত হলো তার স্মৃতি চিরস্থায়ী হয়তো নয়, কিন্তু ঐ ক্ষণমুহূর্তের অনুভূতিও তো মূল্যহীন নয়।

'আষাঢ়' ও 'নববর্ষা' কবিতায় কালিদাসের 'মেঘদূতে'র মতো আষাঢ় কবির কাব্যবস্তু হয়ে উঠেছে এবং এর মধ্য দিয়ে বর্ষার চিরকালীন রূপ ও সৌন্দর্য ব্যক্ত হয়েছে। এমন বর্ষার দিনে না বলা গোপন বাণী সরব ও ভাষাময় হয়ে ওঠে। চাওয়া-পাওয়ার বাঁধা নিয়মে মন তখন পথ চলতে চায় না। তাই 'অবিনয়' কবিতায় প্রেয়সীর উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে – "হে নিরুপমা,/ চপলতা আজি যদি কিছু ঘটে,/ করিয়ো ক্ষমা।... তোমার দু'খানি কালো আঁখি-পরে/ শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে, ...তোমারি ললাটে নববরষার/ বরণডালা।"[১২] 'কৃষ্ণকলি' কবিতাতেও ধরা আছে এক চিরকালীন আবেদন –"এমনি করে কালো কাজল মেঘ/ জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।/ এমনি করে কালো কোমল ছায়া/ আষাঢ় মাসে নামে তমাল-বনে"[১৩] – পরপর তিনবার 'এমনি করে' কথাটি চতুর্থ স্তবকে ব্যবহার করে কবি আবহমানকালের চিরন্তন সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে কৃষ্ণকলির সঙ্গে ক্ষণিক তাঁর দেখা হয়েছে, সে শুধু ক্ষণিকের অতিথি হয়ে থাকে নি। বর্ষার পটভূমিতে স্থাপিত হয়ে তা চিরশ্বাশত সৌন্দর্যের বার্তাবহ হয়ে উঠেছে।

প্রত্যেক কবির কাব্যপ্রবাহে বহু বাঁক বা মোড় থাকে। তাই পরিবর্তন সুনিশ্চিত। কিন্তু পরিবর্তন মানেই ঐতিহ্য থেকে, প্রবাহমানতা থেকে, ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা', 'চিত্রা', 'সোনার তরী', 'কল্পনা'র থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। কবি জীবনের গভীর সত্য সহজ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। বলেছেন – "সত্য কথা সরলভাবে/ শুনিয়ে দিতে তোরে/ সাহস নাহি পাই।/... উলটা করে বলি আমি/ সহজ কথাটাই।"[১৪] সহজ আনন্দের আস্বাদনের মধ্য দিয়ে পরম আনন্দের প্রত্যাশী হয়েছেন, ভাবনা ভারমুক্ত স্বচ্ছ নিসর্গ প্রীতির সূত্রে প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের চিরবন্ধনের কথা শুনিয়েছেন এবং তুচ্ছতার মধ্যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে আহ্বান করে

আরও গভীরতর সৌন্দর্যের মধ্যে উপনীত হয়েছেন তিনি। বলেছেন – "যেমন আছ তেমনি এসো,/ আর করো না সাজ।"[১৫] (চিরায়মানা) বা "এই ক্ষণিকের পাতার কুটিরে/ প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে।"[১৬] তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে বৃহতের অভিমুখী এই ভাবেই হয় জীবন। এখান থেকেই 'নৈবেদ্য'র সূত্রপাত। প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে প্রকৃতির অধীশ্বরের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অল্পে অল্পে। একের সঙ্গে একের, গভীরের সঙ্গে গভীরের মিলনের সূত্রপাত এখানেই, ক্ষণঅনুভূতির সরণি বেয়ে চিরঅনুভূতিতে উপনীত হওয়ার যে আবর্তন ও অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে তারই পূর্ণতর প্রকাশ 'সমাপ্তি' কবিতায় –

"তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ-আলোকে তুমি আর আমি একা।
নয়নে আমার অশ্রুজলের চিহ্ন কি যায় দেখা।।"[১৭]

তথ্যসূত্র:

১. 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (চতুর্থ খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র, ১৪২২, পৃষ্ঠা- ১৭৪।
২. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৬৯।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭২।
৪. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭৭।
৫. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭৭।
৬. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭৮।
৭. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮৩।
৮. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮৪।
৯. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮৪।
১০. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮৪।
১১. ঐ, পৃষ্ঠা- ২২৬।
১২. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৩৪।
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৩৬।
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৯২।
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৫৩।
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৫৬।
১৭. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬০।

জাতি-রাষ্ট্রের গঠন: বাঙালি উদ্বাস্তুদের জীবন-সংগ্রামের ঐতিহাসিক সমীক্ষা

মোঃ নাসির আহমেদ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: জাতি-রাষ্টের গঠনের প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশ্ব তথা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে মানুষের 'উদ্বাস্তু' নামক নতুন পরিচয় এর উৎপত্তি ঘটেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের প্রভাব বাংলা ও পাঞ্জাবের উপর সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সীমানা পারাপার করতে থাকে। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতায় অল্পসময়ের মধ্যেই উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা স্থায়ীভাবে থেকে যায়। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে রাতারাতি মানুষ নিজেদের জন্মভিটে ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্বপাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে থাকে। উদ্বাস্তুরা প্রায় শূন্য হাতে ঘরবাড়ি ছাড়ার ফলে তাদেরকে সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন এর উপর নির্ভর হতে হয়েছিল। তাদের বাংলার বাইরে মধ্যপ্রদেশ, আন্দামান-নিকোবর, উড়িষ্যা, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতিতে যেতে হয়েছিল। পরবর্তীতে যা বাংলার ইতিহাসে উদ্বাস্তু সমস্যা রূপে প্রকট হয়।

সূচক শব্দ: জাতি-রাষ্ট্র ,দেশভাগ, উদ্বাস্তু, বিভাজনের রাজনীতি, শরণার্থী, ক্যাম্প, পাসপোর্ট, চাকমা জাতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ইউরোপ, হোমল্যান্ড, দণ্ডকারণ্য ।

আমার আলোচনার বিষয় ‘জাতি-রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া’ নিয়ে নয়। এখানে আলোচিত বিষয় হল জাতি-রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার দ্বারা বাঙালি উদ্বাস্তুদের অসহনীয় ও অবর্ণনীয় জীবন কাহিনীর কিছু কথা। তার আগে জাতি-রাষ্ট্র কি তা সংক্ষেপে আলাদা ভাবে বোঝার চেষ্টা করব। জাতি হচ্ছে মানুষের এমন সমষ্টি বা সম্প্রদায়; যাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি এক। যেমন- বাঙালি জাতি, সাঁওতাল জাতি, ইংরেজ জাতি ইত্যাদি। আবার দেশ বলতে আমরা বুঝি প্রতিটি জাতির ভৌগলিক সীমারেখা এক। আর রাষ্ট্র হল কিছু দেশকে নিয়ে গঠিত এক সমষ্টি, যার কিছু বিষয় কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং কিছু বিষয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত দেশ গুলি নির্ধারণ করে থাকে।[১] জাতি-রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হল জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তোলা, যা আমরা দেখেছি মধ্যযুগের ইউরোপে ভাষাভিত্তিক জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় এই জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।[২] ইয়াসমিন খান তাঁর "The Great Partition" বইতে বলেছেন দেশভাগ ও জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসেই প্রভাব ফেলেনি, বরং বিশ্বের ইতিহাসেও প্রভাব লক্ষ করা

যায়।[৩] 'দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা' বইয়ের সম্পাদক সেমন্তী ঘোষও বলেছেন ‘Nation-state’ বা ‘জাতি-রাষ্ট্র’ কেন্দ্রিক চিন্তাধারা আমাদের সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছিল।[৪] দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে যার পরিণতি হল ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাজন ও ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ ‘জাতি-রাষ্ট্রর’ উদ্ভব।[৫]

বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলাকে প্রশাসনিক সুবিধার্থে দুই ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন ১৯০৫ সালের ১৬-ই অক্টোবর। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) জুড়ে আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল। তার পরবর্তী বাংলায় ব্রিটিশদের কূটকৌশলের রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্রিটিশ ভারতে নতুন রাজনীতি শুরু হয় "বিভাজনের রাজনীতি"। এই বিভাজনের রাজনীতির ফলে অখন্ড ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়।[৬] ১৯৪৭ সালে ঠিক হয় ভারত ভাগের। তৈরি হল ভারত ভেঙে নতুন রাষ্ট্র ‘পাকিস্তান’। বাংলা ও পাঞ্জাবের উপর দিয়ে টানা হল ভারত-পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানা। সীমানা তৈরি হয়েছিল স্যার র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশ গুলিকে ভাগ করা।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় ভারত ও পাকিস্তানে দুই ধরনের চিত্র আমরা লক্ষ করেছি। একদিকে ছিল যেমন দুশো বছরের পরাধীনতার শিকল ছিন্ন করে স্বাধীনতার আনন্দ উৎসবের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, তেমনি ঠিক এর উল্টো দিকে ছিল গৃহহারা অজস্র উদ্বাস্তু নর-নারী ও শিশুর ভয়ানক বুকভাঙা ব্যাকুল আর্তনাদ। ১৫-ই আগস্ট ভারত-পাকিস্তান সীমানার দুই পারে অগণিত মানুষের উভমুখী স্রোত পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সমান সংখ্যক মানুষ সীমানা পারাপার করেছিলেন নিজেদের জাতীয় পরিচয়ের তাগিদে। ভারত-পাকিস্তানের পূর্ব সীমান্তে যেমন লক্ষ লক্ষ হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরায় প্রাথমিকভাবে আশ্রয় নিয়েছিল তেমনি এর উল্টো মুখী লক্ষ লক্ষ মুসলিমরা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা ছেড়ে পূর্বপাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল।[৭] দুই দেশে যাদের নতুন পরিচয় হয় “উদ্বাস্তু”।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিক থেকে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের কারণে আমরা দেখতে পাই উদ্বাস্তুদের উৎপত্তি ঘটেছে এবং সমসাময়িক দক্ষিণ এশিয়াতেও দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। সব্যসাচী বসু রয় তাঁর-“দক্ষিণ এশিয়ার উদ্বাস্তু সমস্যা”- বক্তব্যে বলেছেন মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে থাকে মূলত তিনটি কারণে। প্রথমতঃ সংঘাতের কারণ; ধর্মীয় সংঘাত, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, জাতিগত সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব, গণহত্যা প্রভৃতি হতে পারে। এর বড় উদাহরন বর্তমানে সিরিয়া, শ্রীলঙ্কার, মায়ানমার, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশগুলিতে আমরা দেখতে পাই। সিরিয়াতে গৃহযুদ্ধের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশের অভ্যন্তরীণে বা প্রতিবেশী রাষ্ট্রে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে । শ্রীলঙ্কাতেও গৃহযুদ্ধের কারণে বহু শরণার্থী ভারতের তামিলে আশ্রয় নেয়। মায়ানমারেও যা ঘটেছে তা নিছক পরিকল্পিত গণহত্যা। ফলে লক্ষ লক্ষ মায়ানমারবাসী উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশ, ভারতসহ

দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমানে মায়ানমারদের সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। তারা নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে। এখানেই তাদের সমস্যা থেমে থাকেনি, বরং তারা আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। যেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছে সেখানে শরণার্থী হিসাবেও গণ্য হয়নি। বাংলাদেশের কক্সবাজারের এইরকম প্রায় ১০ লক্ষ মায়ানমারবাসী শরণার্থীর মর্যাদা না পাওয়ায়, তারা আজকে 'নেই রাজ্যের বাসিন্দা' (Stateless Person)। না তারা নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারছে, না তারা তাদের সাময়িক আশ্রয়স্থলে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছে। দ্বিতীয়তঃ উন্নয়নমূলক কারণ। যে কোনো উন্নয়নমূলক কারণ হতে পারে, যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, ব্যারেজ নির্মাণ বা বড় কোনো কনস্ট্রাকশন প্রভৃতি। তৃতীয়তঃ পরিবেশগত কারণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আছড়ে পড়ে, যার ফলে বহু মানুষ ঘরছাড়া হয়ে বাস্তুহারা বা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। যেমন বাংলায় আমরা দেখেছি আইলা, আম্ফান, সুনামি, ভূমিকম্প প্রভৃতি কারণে মানুষ ঘরছাড়া হয়েছিল। সব্যসাচী বসু রায় আরও বলেছেন ব্রিটিশ ভারতের 'Passport entry act in India 1920', 'Registration foreigner act 1939' প্রভৃতি আইন গুলিকে বিভাজন পরবর্তীতে ব্যবহার করা হয়েছিল। এর ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। এই আইন গুলি প্রযোজ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতে যখন কোনো বিদেশবাসী আসতো সেই ক্ষেত্রে, কিন্তু দেশভাগের পর আমাদের দেশ বা উপমহাদেশেরই মানুষ যারা উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে ও আমাদের দেশে এসে আশ্রয় নেয় তাদের আগমনের সময়ও এই আইন গুলির প্রয়োগ দেখা যায়; যার ফলে নতুন করে উদ্বাস্তুর উৎপত্তি হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ায় উদ্বাস্তু সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে।[৮]

ভারতের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে, রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার ফলে যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল তারা হয় ভারতীয় নাগরিক না হয় তারা দেশভাগের উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই উদ্বাস্তু সমস্যা পোস্ট-পার্টিশন দক্ষিণ এশিয়ার জাতি-রাষ্ট্র বিকাশের পথে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুরা ভারত পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে আধুনিক রাজনীতির একটা মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কারণ ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ভাবে প্রায় সব রাষ্ট্রই চাইছিল নিজেদেরকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বা হোমল্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলেতে। তারা 'Imagined community' এর কথা ভাবছিল। নিজস্ব চিন্তাভাবনা দ্বারা বিশ্বের বুকে জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস চলছিল। Hannah Arendt এ প্রসঙ্গে ভারতের উদাহরণ টেনে বলেছেন যে 'Ethnicity ও Religion' এর ভিত্তিতে নতুন জাতি-রাষ্ট্র গঠন ও উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দান এর প্রক্রিয়া কিভাবে ব্যর্থ হয়েছিল ভারতে। দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা তার একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ। এই জাতি-রাষ্ট্র গঠন বহু উদ্বাস্তুদের যেমন জন্ম দিয়েছে তার সাথে উল্টে আবার বহু উদ্বাস্তুদের ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, কলকাতা, দিনাজপুর, বীরভূম, বর্ধমান, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, দার্জিলিং, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, জেলা গুলিতে আশ্রয় শিবির তৈরি হয়েছিল। অভিভাবকহীন, মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য তৈরি হয় 'Permanently Liability Camp'। উদ্বাস্তুরা ক্রমে শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রান্সিট ক্যাম্প নামক পাটকলের গুদামে জায়গা পায়।[৯] ১৯৫১ সালের সেনসাস বলছে তিন ভাগের দুই ভাগ উদ্বাস্তুদেরই প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল চব্বিশ পরগনা, নদীয়া এবং কলকাতা। হিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায়ের 'উদ্বাস্তু' নামক বইতে বাংলার উদ্বাস্তুদের বিস্তারিত আলোচনা পাই। উদ্বাস্তুরা স্রোতের মত আসতো শহরকেন্দ্রিক মনোভাব নিয়ে। শিয়ালদা স্টেশন হাজার হাজার উদ্বাস্তুদের আশ্রয় স্থল হয়েছিল উঠেছিল এবং তাদেরকে সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হত। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী তিন ধরনের উদ্বাস্তুদের কথা বলেছেন। প্রথমতঃ যারা স্বক্ষমতায় নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে পুনরায় জীবন যাত্রা শুরু করেছিল। দ্বিতীয়তঃ নিজেদের ক্ষমতায় জমি বা বাড়ি দখল করে সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় থাকত। তৃতীয়তঃ একেবারেই যারা সর্বস্ব হারিয়ে শূন্য হাতে উদ্বাস্তুর পরিচয় বহন করে এসেছিলো। তারা পুরোপুরি সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। সরকারি পরিকল্পনা অনুসারে তাদের আন্দামান-নিকোবরে, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, দণ্ডকারণ্যে ইত্যাদিতে যেতে হয়েছিল। উদ্বাস্তুদের এই নির্মম চিত্র বহু সময় বিভিন্ন লেখায় ফুটে উঠেছে ।[১০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিক থেকে বিশ্বে উদ্বাস্তুদের ঢল নামতে শুরু করে। United Nations Relief and Rehabilitation Administration দেশভাগের উদ্বাস্তুদের 'Displaced Persons' হিসেবে বর্ণনা করেছিল। ১৯৫১ সালে জেনেভা কনভেনশনে উদ্বাস্তুদের সংজ্ঞা তৈরি করা হয়েছিল, যেটা হয়েছিল পুরোপুরি 'European Displaced Persons' এর উপর ভিত্তি করে। কিন্তু তখনও 'Indian Displaced' দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং সেই সংজ্ঞার দ্বারাই ভারতীয় উদ্বাস্তুদের বিবেচনা করা হয়েছে।[১১] দেশভাগের পর যে উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতবর্ষে বা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে দেখা দিয়েছিল তার কোনো সুষ্ঠ সমাধান করে উঠতে পারেনি।

Liisa H. Malkki বলেছেন উদ্বাস্তু নিয়ে লেখালেখি হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। রিফিউজি শিবির গুলিকে অন্যভাবে দেখার কথা বলেছেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে রিফিউজি শিবির গুলিকে শুধুমাত্র 'Place of Refuge' হিসেবে দেখলে হবে না, সেগুলিকে দেখা উচিত 'Devise of Power' হিসেবে।[১২] আমরা যদি বাংলার উদ্বাস্তুদের দেখি তাহলে দেখতে পাব, শিয়ালদা স্টেশনে রিফিউজি ক্যাম্প গুলিতে একদিকে জীবন্ত মানুষের নিত্যকর্ম অন্যদিকে মৃত মানুষের লাশ, রাতের অন্ধকার চিরে শিশুর কান্নার আর্তনাদ, যুবতী নারীদের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের অসহায় অবস্থার কাছে নতি স্বীকার করে বিভিন্ন প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে গণিকাবৃত্তিতে জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি

বহু ঘটনার পাশাপাশি সহাবস্থান।[১৩] Gyanendra Pandey তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন পুরানা কিলার ক্যাম্পের মুসলিম রিফিউজিদের অবস্থা হিন্দু ক্যাম্পের অবস্থার চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল। কারণ হিসেবে তিনি অপর্যাপ্ত পরিমাণের ত্রাণ বিতরণের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪] দিল্লিতে ব্যাপক আকারে দাঙ্গা বাঁধলে দিল্লির মুসলিমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পুরানা কিলা, জামা মসজিদ প্রভৃতি জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে কলেরা, অনাহার প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের জীবন ধারণ করতে হয়েছিল।[১৫] Liisa H. Malkki তার যুক্তির স্বপক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ Post-war ইউরোপের প্রসঙ্গ টেনে উল্লেখ করেছেন যে, ইউরোপে উদ্বাস্তু পরিচালনাকারীরা উদ্বাস্তুদের বিষয়টি শুধুমাত্র মানবিকতার নজরে দেখা হয়েছিল তাই নয়, বরং তাদেরকে দেখা হয়েছিল সামরিক সমস্যা রূপেও। জার্মানিতে যে সমস্ত রাজনৈতিক, সামরিক ক্যাম্পগুলি ছিল সেগুলি কে উদ্বাস্তু শিবিরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন উদ্বাস্তু শিবির গুলিকে পরিদর্শন যোগ্য করে, প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক দক্ষতায় শিবিরের বন্দীদের শ্রেণিকরণ পৃথকীকরণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১৬]

১৯৪৭ এর দেশভাগের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল বাংলা এবং পাঞ্জাবে। এই দুই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছিলেন। পাঞ্জাব ও বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান এর ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার দুই ধরনের নীতি অবলম্বন করেছিল। পাঞ্জাবে উদ্বাস্তু সমস্যা একটা নির্দিষ্ট সময়ের (১৯৪৭-১৯৫০) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে সেখানে পরিকল্পিতভাবে এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস করা হয়েছিল। পাঞ্জাবের এই প্রয়াস ছিল 'Exchange of Population' যা অনেকাংশেই একটা সমাধানের আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রয়াসকে তৎকালীন কেন্দ্র সরকার অপ্রযোজ্য বলেছিল। বাংলার পরিস্থিতি যদিও অন্যরূপ ছিল। বাংলায় উদ্বাস্তুদের আগমন পাঞ্জাবের মত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আগমন শুরু হয়েছিল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'নোয়াখালী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার' পর থেকে। এই আগমন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে আরও তীব্র আকার ধারণ করে। তারপরে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'হায়দ্রাবাদ অপারেশন', ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে 'বরিশাল-খুলনার' ব্যাপক সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'পাসপোর্ট প্রথা' প্রবর্তন প্রভৃতি ঘটনাগুলি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আশ্রয়প্রার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে আগমনের ধারা অব্যাহত রেখেছিল।[১৭] ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'Passport প্রথার' প্রবর্তনের আগে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই জুলাই 'Permit System' চালু হয়েছিল। কিন্তু দেশভাগের আগে থেকে বাংলা ও পাঞ্জাবে মানুষের মধ্যে এক অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এই অস্থিরতার বড় কারণ ছিল সাম্প্রদায়িক হিংসা, যার দরুন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করা হয়। নিজ নিজ পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে অসংখ্য নারী-পুরুষকে চলে যেতে হল অন্য দেশে। কিন্তু

পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হলেও উদ্বাস্তুদের মনে পূর্বপুরুষের ভিটেমাটির প্রতি ভালোবাসার কোনো অভাব ছিল না। তারা নিজের জন্মভূমির সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই জুলাই 'Permit System' নিয়ে ভারত সরকারের অবস্থান মানুষের মধ্যে আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তোলে। উল্টোদিকে পাকিস্তান সরকার ১৫ অক্টোবর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'Ordinance' জারি করে 'Permit System' এর ঘোষণা করে, যা দুই দেশের মানুষের কাছে ছিল সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা। যেটাকে ইয়াকুব আলী জামিনদার 'Real Partition' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮]

বর্তমান বিশ্বে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব না পাওয়া একটা বড় সমস্যা। অনুরূপ চিহ্ন দেশভাগের পর বাংলার ইতিহাসেও পাওয়া যায়। ১৯৬২ সালের মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচিত সংসদ সৈয়দ বদরুদ্দোজা তাঁর চিঠিতে তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেন। মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়াতে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু ও স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে এক অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতায় মুর্শিদাবাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগিতায় খুব দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি সেই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর আরও প্রশংসা করে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। নদিয়া জেলার হাঁসখালি ও করিমপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পুলিশের অমানবিক অত্যাচার। সেখানকার মুসলিমরা পুলিশের অত্যাচারে নিত্যদিনের কাজ কর্ম করতে পারছেন না। স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে তাদের বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি আশা নিয়ে আবেদন করেন যে তিনি যেন এর একটা সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করেন। পুলিশের সেই ফাইলের সাথে করিমপুরের একজন ব্যক্তির চিঠিও পাওয়া যায়। সেই ব্যক্তিও একই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৫০ সালের গোলযোগের ফলে তারা দেশ ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে যান। পরবর্তীতে নেহেরু-লিয়াকৎ-এর দিল্লি চুক্তির ফলে তারা আবার সেখান থেকে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা তাদের ভিটে-মাটিতে ফিরে আসেন। কিন্তু তারা ফিরে আসার পর পুলিশি জুলুমের শিকার হন। সেখান থেকে তাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত তারা "সরকার বাহাদুর" কে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখেন সেই পরিস্থিতির সমাধান চেয়ে ।[১৯] অনুরূপ চিত্র দেখা যায় পূর্ববঙ্গের চাকমা জাতিদের ক্ষেত্রে। তারা নাগরিকত্ব লাভের আশায় পূর্ববঙ্গ ছেড়ে ভারতে চলে এসেছিলেন। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। তারা পরিণত হন 'নেই রাজ্যের বাসিন্দায়' (Stateless Person)।[২০]

উদ্বাস্তু আগমনের ক্ষেত্রে দেখা যায় দুই দেশের মানুষই প্রথম প্রথম এই উদ্বাস্তুদের স্বাগত জানাতেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন। কিন্তু জয়া চ্যাটার্জী তাঁর 'The spoils of partition'- বইতে উল্লেখ করেছেন, সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের বিরোধিতা করেছিলেন অজয় মুখার্জিসহ তৎকালীন বেশ কিছু

রাজনৈতিক নেতারা।[২১] এবং তার সাথে ছিল কলকাতাবাসীর অবহেলা। **১৯৪৭** থেকে **১৯৭১**, চব্বিশ বছরের পরিসরে পূর্ব-পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সামাজিক ও পেশাগত শ্রেণি ছিল ভিন্ন। দেশভাগের অব্যবহিত পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্বাস্তু ছিল তথাকথিত হিন্দু 'ভদ্রলোক'। শিক্ষা না হয় চাকরি সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল তাদের, যার কারণে তাদের পুনর্বাসনে বেগ পেতে হয়নি। বিভাজনের কড়া বাস্তব দেখেছিলেন মধ্যবিত্তশ্রেণী আর ক্ষুদ্র পেশাভূক্ত জনজীবনের মানুষরা যাদের সিংহভাগই ছিল ক্ষুদ্র চাষি, মাছ, পাট, পান চাষের সঙ্গে জড়িত ছোট-মাঝারি কারবারি। তাদের সঙ্গে ছিলেন কুমোর, কামার, দর্জি, বাদ্যকার, পুরোহিত, গণৎকার প্রভৃতি পেশাভূক্ত মানুষরা। তাদের অনেককেই কলকাতা ও তার আশপাশের বিভিন্ন কলকারখানায় সামান্য মজুরিতে ঠিকা-শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয়েছিল। অনেককে আবার কলকাতা ও তার শহরতলীতে রিকশা ও ঠেলাগাড়িচালকের কাজে ভিড় জমাতে হয়েছিল। অনেকে বড় বাজারের মুটে মজুর, হাওড়া-শিয়ালদা স্টেশনের কুলি, ফেরিওয়ালা হয়ে শহরের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কলকাতায় হকারদের রমরমার সূত্রপাত ঠিক এই সময় থেকেই হয়েছিল। ফেরিওয়ালা থেকে কুলি, ঠিকের ঝি থেকে রিকশাচালকের ভিড়ে নাজেহাল মহানগরের বাসিন্দারা এই নিরন্তর উদ্বাস্তু স্রোত কে ঠাট্টাচ্ছলে "পোকামাকড়ের" সঙ্গে তুলনা করতেও ছাড়েননি।[২২]

নবগঠিত দুই রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিকভাবে সেরকম কোন সাহায্য আসেনি। International committee of the red cross-এর পক্ষ থেকে ভারতে শেষ মিশন পাঠানো হয় **১৯৪৭** February-তে । যদিও সমসাময়িক ইউরোপিয় দেশগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে নিজেরাই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল, তারপরও ভারত-পাকিস্তানের পরিস্থিতি জানার জন্য প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল। কিন্তু তাদের রিপোর্ট ছিল হতাশাব্যঞ্জক। সেই রিপোর্টে বলা হয় এত বড় সমস্যা সমাধান করার কাজ তাদের নাগালের বাইরে। আন্তর্জাতিক সাহায্য না পেলেও ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি, ছোট ছোট বিদেশী সংস্থা, National Christian Council of India ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ত্রাণ বিতরণ ও সাহায্যের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। দেশভাগ **১৯৪৭** খ্রিস্টাব্দে হওয়ার ফলে United Nations High Commission for Refugee-এর কোন সাহায্য পায়নি। কারণ এর প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল **১৯৫০** খ্রিস্টাব্দে। **১৯৫১** খ্রিস্টাব্দে United Nations Refugee Convention সংঘটিত হলেও নবগঠিত রাষ্ট্র দুটি কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করেনি, যার ফলে উভয় রাষ্ট্রকে নিজেদেরকেই তাদের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের সূত্র খোঁজার চেষ্টা করে যেতে হয়েছে।[২৩]

ভারতীয় উপমহাদেশে বহু জ্বলন্ত প্রশ্ন এখনো রাষ্ট্রীয় ও আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিতর্ক, অস্বস্তি বাড়িয়ে চলেছে। শুধু তাই নয় 'জাতিরাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ' এই ঐতিহাসিক ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি যেখানে দেখা যায় তা সমষ্টিগত ভাবে কোন

এক বা একাধিক রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রাধীন প্রদেশে নয়, বরং এর প্রভাব পড়েছে সেই সব প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে, মনে; যারা হলেন এর ভুক্তভোগী এবং সেই সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সবকিছু ; তার জীবন, জীবিকা, পরিচিতি, প্রতিবেশী, আত্মীয়, পরিজন, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সম্পর্কগুলো; ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সব। এক কথায় দেশভাগ মানুষকে রাতারাতি শুধু 'গৃহহারা' বা 'বাস্তুহারা'ই করেনি, তার সঙ্গে তার পরিচয়, তার জাতীয়তাও কেড়ে নিয়েছে। জাতি-রাষ্ট্র গঠন যেমন কারো কাছে একজাতিকরণ তেমন কারো কাছে আবার জাতীয়তা হননও। এই সমস্যা বর্তমানে আরও প্রাসঙ্গিক এবং এর শিকার আর কেউ নন আপনার আমার মত সাধারন মানুষ, সাধারন জনজীবন।

তথ্যসূত্র:

১. https://bn.quora.com/unanswered/জাতি-রাষ্ট্র-কাকে-বলে(last access 09/12/2021)

২. https://www.prothomalo.com/opinion/column/জাতিরাষ্ট্র-ও-জাতীয়-ভাষা (last access 09/12/2021)

৩. Yasmin Khan, *The Great Partition: The Making of India and Pakistan*, New Haven and London: Yale University, 2017.

৪. সেমন্তী ঘোষ (সম্পাদনা), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, কলকাতা: গাংচিল, ২০১১, পৃ.১১।

৫. মনন কুমার মন্ডল (সম্পাদনা), *বাংলার পার্টিশন-কথা উত্তর প্রজন্মের খোঁজ*, কলকাতা: নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৪৯।

৬. Joya Chatterjee, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-47*, UK: Cambridge University Press, 2002.

৭. Joya Chatterjee, *The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-67*, New York, Cambridge University Press, 2007.

৮. https://www.youtube.com/watch?v=AEqpyJhJQo8 (last acces 09/12/2021).

৯. ত্রিদিব চক্রবর্তী, নিরুপমা রায় মন্ডল, পৌলোমী ঘোষাল, *ধ্বংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ*, কলকাতা: সেরিবান, ২০১৫, পৃ.১১ ।

১০. হিরেন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের, *উদ্বাস্তু*, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৩।

১১. Uditi Sen, *Citizen Refugee: Forging the Indian Nation after Partition*, New York: Cambridge, 2018.

১২. Liisa H Malkki, 'Refugees and Exile: From Refugee Studies to the National Order of Things.', *Annual Review of Anthropology*, 1995, no. 24 : P. 495–523.

১৩. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব*, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৩ ।

১৪. Gyanendra Panday, Partition and Independence in Delhi, 1947-48 *Economic and Political Weekly,* 1997.

১৫. Vazira Fazira-Yacoobali Zamindar, *The Long Partition and the Making of Modern Soouth Asia*, New York: Columbia University Press, 2010.

১৬. Liisa H Malkki, 'Refugees and Exile: From Refugee Studies to the National Order of Things.'

১৭. সুতপা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তু সমস্যা, *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৯*, কলকাতা: পঃ বঃ ইতিহাস সংসদ, ২০০৫।

১৮. Zamindar, *The Long Partition and the Making of Modern Soouth Asia*, opcit,.

১৯. Home Political Department Files: Confidencial, 1945-1965, West Bengal State Archives, Kolkata.

২০. https://www.youtube.com/watch?v=AEqpyJhJQo8 (last acces 09/12/2021).

২১. Chatterjee, *The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-67, opcit,.*

২২. রাহুল রায় (সম্পাদনা), *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ দেশ বদলে স্মৃতি*, কলকাতা: গাংচিল, ২০১৬, পৃ.-১৫-১৭ ।

২৩. Khan, *The Great Partition: The Making of India and Pakistan, opcit,.*

ঔপন্যাসিক কাজী নজরুল ইসলাম

রাকিবুল হাসান বিশ্বাস
স্টেট এডেড কলেজ টিচার
শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া

কাব্য-কবিতা-গান ছাড়া কাজী নজরুল ইসলাম অসাধারণ উপন্যাস ও ছোটগল্পও রচনা করেছিলেন। তিনি মোট তিনটি উপন্যাস রচনা করেছেন—'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা', এবং 'কুহেলিকা'। নজরুলের এই উপন্যাসগুলি নিয়েই এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উপস্থাপনা। উপন্যাসগুলি পর্যালোচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে, তার তিনটি উপন্যাস স্বতন্ত্র তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। প্রথমত, দারিদ্র্য, বাউন্ডুলেপনা জীবনযাত্রার ছাপ রয়েছে 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে। তার সাথে ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা, সমাজ, ব্যক্তিধর্ম এবং রাজনৈতিক চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, খেটে খাওয়া সাধারন মানুষ, দেশজ বাস্তব পরিবেশ, সাম্য ও বিপ্লবী চেতনার শিল্পময় প্রকাশ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও যন্ত্রণার অভিব্যক্তি হল 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক চেতনা, বিপ্লববাদের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে 'কুহেলিকা' উপন্যাসে। এক কথায় বলা যায় 'বাঁধনহারা'য় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা, 'মৃত্যুক্ষুধা'য় সমাজভাবনা, এবং 'কুহেলিকা'য় বিপ্লববাদের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়।

(১)

"হে দারিদ্র! তুমি মোরে করেছ মহান,
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা।"

অসাধারণ তো নয়ই, সাধারণও নয়—তার চেয়েও দারিদ্রহত পরিবারে অবাঞ্ছিত এক শিশুর মতো ভূমিষ্ঠ হয়েছিল অতি উচ্চ প্রতিভা সম্পন্ন এক শিশু। দুঃখের সংসারে জন্ম বলে নামও হয়ে গিয়েছিল দুখুমিঞা। আর এই দারিদ্রই নজরুলকে দিয়েছিল সম্মান, এক অনাবিল তৃপ্তি, করেছিল মহান। নজরুলের ছিল দেবদত্ত প্রতিভা। তাই কেবল কবিতা বা গান নয়, একই সাথে প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক-সবেতেই ছিল তাঁর সবিশেষ কীর্তি।

নজরুলের সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল ছোটগল্প দিয়ে। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় নজরুল ছোটগল্প লিখেছেন, আবার সৈনিক জীবনেও লিখেছেন ছোটগল্প। তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' একটি ছোটগল্পই। তার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' (১৯২২)। এছাড়াও 'রিক্তের বেদন' (১৯২৪), 'শিউলি মালা' (১৯৩১) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ ছোটগল্পকার কাজী নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ কীর্তির দাবিদার।

নজরুল তিনটি উপন্যাস রচনা করেছেন—'বাঁধনহারা' (১৯২৭), 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০), 'কুহেলিকা' (১৯৩১)। 'বাঁধনহারা' ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ডি.এম লাইব্রেরি। গ্রন্থটিকে উৎসর্গ করা হয়েছে নলিনীকান্ত সরকারকে। এর আগে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ১ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বাঁধনহারা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক পত্রোপন্যাস। করাচিতে থাকা কালে তিনি এ উপন্যাসটির রচনা শুরু করেন। উপন্যাসটিতে যে বিদ্রোহসত্তার আভাস পাওয়া যায়, তা-ই পরবর্তীকালে 'বিদ্রোহী' কবিতার পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস মৃত্যুক্ষুধা প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। প্রকাশক ডি.এম লাইব্রেরি। এর পূর্বে উপন্যাসটি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত 'সওগাত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'মৃত্যুক্ষুধা'র পটভূমিকা হল নদিয়ার কৃষ্ণনগর। উপন্যাসটি রচনা সময় কবি সপরিবারে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদসড়ক এলাকায় বাস করতেন। শ্রমজীবী খ্রিস্টান ও মুসলমানরা এই স্থানের বাসিন্দা ছিল। এই পরিবেশ ছায়া ফেলেছে উপন্যাসটিতে। উপন্যাসের সময় ছিল খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের যুগ।

নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। প্রকাশক ডি.এম লাইব্রেরি। এর পূর্বে ১৯৩৪ সালে 'নওরোজ' পত্রিকার আষাঢ় সংখায় 'কুহেলিকা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্রাবণ সংখ্যায় দ্বিতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদ এবং ভাদ্র সংখ্যায় পঞ্চম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। এরপর হঠাৎ 'নওরোজ' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'কুহেলিকা' ধারাবাহিকভাবে পৌষ ১৩৩৫ থেকে সাপ্তাহিক 'সওগাত'-এ বের হতে থাকে। এ গ্রন্থের পটভূমিকায় রয়েছে বাংলাদেশে স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।

(২)

কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধনহারা' উপন্যাসটি একটি পত্রোপন্যাস। এটি পত্রোপন্যাস হলেও এর ধারাবাহিক কাহিনি দেখে মনে হয় যে, লেখক অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস করেছেন। উপন্যাসের নায়ক নুরুল হুদা ও নায়িকা মাহবুবা একে অপরকে পছন্দ করে। তাদের বিবাহের তোড়জোড় আরম্ভ হয়। কিন্তু নুরু বাড়ি থেকে পালিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। নিজের প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করে সেনাবাহিনীতে যোগদান করলেও আসলে সেনাবাহিনীতে যোগদানের পিছনে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করা কোনও তাগিদ তার ছিল না। নুরু চরিত্রের এই বন্ধনহীন উদ্যমতা, চিরচঞ্চল খেয়ালিপনা চিত্রণের জন্যই অন্যান্য চরিত্রের আগমন। মনুয়র, মাহবুবা, রাবেয়া, সাহসিকা প্রমুখ চরিত্রের জবানিতে নুরুর এই রূপ বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।

অবশ্য কয়েকটি চিঠিতে তৎকালীন মুসলিম পরিবারের পর্দাপ্রথা, আত্ম-অহমিকা হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত এবং ব্রাহ্মসমাজের উদারনৈতিক দিকগুলির কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। রাবেয়া শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের প্রতিনিধি। সাহসিকা চরিত্রটি তার নামের মতোই সাহসী ও প্রতিবাদী। মাহবুবা রাবেয়া ও সাহসিকা বাল্য সখী তাদের মধ্যে পত্র বিনিময় হয়।

'বাঁধনহারা' উপন্যাসটির পত্রসংখ্যা ১৮টি। এর মধ্যে রকিয়াকে উদ্দেশ্য করে লেখা একমাত্র চিঠিতে কেবল তারিখ ছিল না। আর বাকি সতেরোটি চিঠির তারিখ হচ্ছে—করাচি সেনানিবাস থেকে রবুর উদ্দেশে নূরুল হুদার চিঠিটি ২০ জানুয়ারি, করাচি সেনানিবাস থেকে মনুয়রের উদ্দেশে লেখা নূরুল হুদার চিঠি ২১ জানুয়ারি, সালার থেকে নূরুর উদ্দেশে রবিয়লের লেখা চিঠি ২৯ জানুয়ারি, বাঁকুড়া থেকে নূরুল হুদার উদ্দেশে মনুয়রের লেখা চিঠি ২৬ জানুয়ারি, সালার থেকে নূরুল হুদার উদ্দেশে রাবেয়ার লেখা চিঠি ৬ ফাল্গুন, শাহপুর থেকে সোফিয়ার উদ্দেশে লেখা মাহবুবার চিঠি ১০ ফাল্গুন, সালার থেকে মাহবুবার উদ্দেশে লেখা সোফিয়ার চিঠি ১২ ফাল্গুন, করাচি সেনানিবাস থেকে ভাবিসাহেবার উদ্দেশে লেখা নূরুল হুদার চিঠি ১৫ ফেব্রুয়ারি, বাঁকুড়া থেকে নূরুল হুদার উদ্দেশে মনুয়রের লেখা চিঠি ২ ফেব্রুয়ারি, করাচি সেনানিবাসের প্রিজন সেল থেকে মনুয়রের উদ্দেশে লেখা নূরুল হুদার চিঠি ১৭ ফেব্রুয়ারি, সালার থেকে ননদ মাহবুবার উদ্দেশে লেখা রাবেয়ার চিঠি ১২ ফাল্গুন, সালার থেকে আয়েশার উদ্দেশে লেখা রকিয়ার চিঠি ১৩ ফাল্গুন, শাহপুর থেকে বুবুসাহেবা অর্থাৎ রাবেয়ার উদ্দেশে লেখা আয়েশার চিঠি ১ চৈত্র, সালার থেকে সাহসিকার উদ্দেশে লেখা রাবেয়ার চিঠি ২৭ চৈত্র, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা থেকে রাবেয়ার উদ্দেশে লেখা সাহসিকার চিঠি ১ বৈশাখ, শেঙান থেকে সাহসিকার উদ্দেশে লেখা মাহবুবার চিঠি ১ আষাঢ় এবং বাগদাদ থেকে সাহসিকার উদ্দেশে লেখা নূরুল হুদার চিঠির তারিখ ছিল ২৩ চৈত্র।

নুরুর সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া, তার বন্ধনহীন উদ্যমতা, স্বাধীনচেতা মন ইত্যাদি সব কিছুর সাথেই লেখকের ব্যক্তিগত জীবন জড়িয়ে রয়েছে। কবির জীবনাদর্শ লুকিয়ে রয়েছে চরিত্রটির মধ্যে। ভাবিসাহেবাকে লেখা নুরুর চিঠিতে মূলত কবির আত্মচরিত পরিস্ফুটনের প্রয়াস লক্ষণীয়। চির দুর্বার, বাধা বন্ধনহীন, অভিমানী কবিকেই এখানে পাওয়া যায়। তার ক্রোধ, আক্রোশ এবং অভিমান যেন সব স্রষ্টার বিরুদ্ধে। কোন স্নেহের বন্ধনে ধরা দিতে তার আপত্তি। শুধু জীবনাদর্শ নয়, লেখকের জীবনের টুকরো টুকরো বাস্তব ঘটনার প্রতিচ্ছবিও চোখে পড়ে উপন্যাসটিতে। মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধে যাওয়ার পরিবর্তে পদোন্নতিসহ সৈনিকদের ট্রেনিংয়ের জন্য নজরুল হুকুম প্রাপ্ত হলে এক ক্যাপ্টেনকে কিভাবে ঘুষি মেরে জেলে গেলেন তারই বর্ণনা পাওয়া যায় ১১তম চিঠিতে।

(৩)

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের পটভূমি কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের এক বস্তি এলাকা। লেখক এখানে তুলে ধরেছেন তৎকালীন সমাজের দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র। কৃষ্ণনগরের অবস্থানকালে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট এবং দুঃসাধ্য সংসার যাপন ছিল নজরুলের নিত্য জীবনযাত্রার অঙ্গ। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে তা-ই বাস্তব চিত্র রূপে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত 'দারিদ্র্য' কবিতাটিও একই সময়ে রচিত।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের দুটি স্পষ্ট বিভাগ—এক হল, অভাবের তাড়নায় মেজ বউয়ের খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ এবং দুই হল— রুবি ও আনসারের রোমান্টিক অথচ করুণ বিয়োগান্তক প্রেমকাহিনি। উপন্যাসের প্রথমাংশ কৃষ্ণনগরে এবং শেষাংশ কলকাতায় রচিত হয়েছে। সেই হিসেবে বাস্তব জীবনচিত্র চিত্রিত করার উদ্দেশ্যেই একদিকে দারিদ্র ও অপরদিকে প্রেমের অবতারণা করেছেন লেখক। উপন্যাসের প্রথম অংশে দেখা যায়—মৃৎশিল্পের কেন্দ্রভূমি কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়ক। এ সড়কের বস্তি এলাকায় বাস করে একটি দরিদ্র মুসলিম পরিবার। রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ মা, ৩জন বিধবা পুত্রবধু, দেবর প্যাঁকালে। পরিবারের প্রায় ডজনখানেক সন্তানের ভরণপোষণের ভার আঠারো-উনিশ বছরের প্যাঁকালের ওপর ন্যাস্ত। কুর্শি খিস্টান হলেও প্যাঁকালের ভালবাসার জন্য ব্যাকুল। সেজন্য বিধবা-রূপসী ভ্রাতৃজায়া মেজ-বৌয়ের বিবাহের প্রস্তাব তার কাছে অতি তুচ্ছ। কুর্শিকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় প্যাঁকালে ধর্মান্তরিত হয়। উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশের শুরু হয় আনসার-রুবি প্রসঙ্গে। সমাজকর্মী, দেশপ্রেমিক, আত্মত্যাগী ও সংসার-বিরাগী আনসার এসে আশ্রয় নিল লতিফা ওরফে বুচির বাসায়। লতিফার স্বামী স্থানীয় কোর্টের নাজির। পরে কৃষ্ণনগরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের তরুণী কন্যা সদ্য-বিধবা রুবির সঙ্গে শৈশব প্রণয়ের স্মৃতি আনসারের মনে উদয় হয়। যদিও রুবি ও আনসারের পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটেছে উপন্যাসের শেষাংশে। মাঝখানে কয়েক বছর দু'জনের সাক্ষাৎ হয়নি। কারণ রুবির অমতে তার বিয়ে হয়েছিল অর্থলোভী এক যুবকের সঙ্গে। তাদের সংসার টিঁকে ছিল মাত্র একমাস। বাইরের সাজসজ্জা ও আচরণ রুবির বিধবাসুলভ হলেও মনে প্রাণে সে আনসারকেই স্বামী বলে মানে। আনসার রাজবন্দী হয়ে রেঙ্গুনে চলে যায়, সেখানে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হবার আশায় ওয়ালটেয়ারে যায়। রুবি ওই সংবাদ শোনামাত্রই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াতে দ্বিধা করে না। আনসারকে রোগমুক্ত করতে রুবি অক্লান্ত পরিশ্রম করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে নিরাময় করতে অসমর্থ হয় এবং আনসার মারা যায়। এদিকে আনসারকে সেবাযত্নের ফলে একই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে রুবিও মারা যায়। ওদিকে অভাবের তাড়নায় মেজ-বৌ সন্তান ফেলে খ্রিস্টান হয় এবং বরিশালে নিজের জীবন কাটিয়ে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তবে বাদ সাধে সন্তানেরা। তার ছেলেটি মারা যায়। মেজ-বৌকে ফিরে আসতে হয় বস্তিজীবনে। কিন্তু মেজ-বৌ মিশনারী মেম-সাহেবদের বহু অনুরোধেও আর ফিরে যায়নি আবার তৌবা

করে মুসলমানও হয়নি। প্যাঁকালেকে খান বাহাদুর সাহেব কুড়ি টাকার চাকুরি দেওয়ায় প্যাঁকালে কুর্শিকে নিয়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়—এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি।

'মৃত্যুক্ষুধা' প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের রচনা। এই কারণে যুদ্ধোত্তর যুগের অর্থ সংকট, শ্রেণীবৈষম্য, নগরচেতনার প্রকাশ এবং উপলব্ধিতে সার্থক। এ উপন্যাস রচনায় নজরুলের দ্বৈত সত্তা পাশাপাশি কাজ করেছে-একদিকে তিনি সঙ্গীতামোদী, প্রাণচঞ্চল; অন্যদিকে ধ্যানী, শিল্পী, প্রেমিক, সংসার অনাসক্ত, সংস্কারনিষ্ঠ, এবং দেশ ও জাতির প্রয়োজনে সর্বস্বত্যাগী। এ দ্বৈত সত্তার প্রকাশ ঘটেছে প্যাঁকালে ও আনসার চরিত্রের মধ্যে।

(৪)

নজরুল ইসলাম রচিত শেষ উপন্যাস হলো 'কুহেলিকা'। উপন্যাসটির পটভূমি হল স্বদেশী আন্দোলন। সে সময় স্বদেশী আন্দোলন সর্বত্রই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। পরাধীন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের স্বদেশী যুগে যে গোপন বিপ্লবী কার্যক্রম সারা দেশে তরুণ সমাজের মাঝে বিস্তার লাভ করে-'কুহেলিকা' উপন্যাসও তেমনি একটি গুপ্ত সংগঠনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তরুণ কবি হারুনের মেসে তার 'নারী কুহেলিকা' কবিতার ওপর তার সঙ্গীদের মজার বিতর্কের মধ্যে দিয়ে কাহিনির সূচনা। এই নারীকে নিয়েই উপন্যাসের নামকরণ। সঙ্গীদের মধ্যে জাহাঙ্গীরের স্বদেশপ্রেম এবং সে হেতু বিপ্লবী সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ, তার কর্মকাণ্ড ইত্যাদি ঘটনা নিয়ে কাহিনি এগিয়ে চলে। জাহাঙ্গীরের দ্বীপান্তর বাসের মাধ্যমে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

'কুহেলিকা' উপন্যাসটি সাময়িক উপন্যাসের গোত্রভুক্ত হলেও কাহিনি পরিচর্যায় লেখকের পাণ্ডিত্য লক্ষণীয়। কবিত্বময় ভাষা চরিত্রের স্বাস্থ্য আর লাবণ্যকে আরো দ্যুতিময় করে তুলেছে। উপন্যাসটিকে 'বিপ্লবী উপন্যাস'ও বলা যায়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জাহাঙ্গীর বিপ্লববাদে বিশ্বাসী। জাহাঙ্গীরের গুরু প্রমত্ত চরিত্রে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের সব্যসাচী চরিত্রটির প্রভাব স্পষ্ট।

(৫)

কাজী নজরুল ইসলামের গল্প-উপন্যাসের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর সৈনিক জীবন। কারণ হিসেবে বলা যায় যুদ্ধে যাওয়ার তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা; এই যুদ্ধে যাওয়ার পিছনে ছিল, দারিদ্র, বাউন্ডুলেপনা বা রোমান্টিক মনের বিচিত্র উচ্ছ্বাস। অভাবগ্রস্ত দুঃখের সংসারে কি মর্মান্তিক বেদনাক্লিষ্ট জীবন যাপন করতে হয়েছিল নজরুল ইসলামকে, তা তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে। দারিদ্র্যের কন্টকাকীর্ণ জীবন সাধনায় তিনি যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

কাজী নজরুল ইসলামের যে কাল্পনিক চিত্র আমরা মনের মধ্যে এঁকে রেখেছি, তা হচ্ছে নজরুল একজন কবি। কিন্তু কাব্য-কবিতা-গান ছাড়াও যে তিনি অসাধারণ উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছিলেন সে বিষয়ে আমাদের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো

নয়। তাই নজরুল সঙ্গীত নিয়ে, তাঁর কাব্য কবিতা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি নজরুলের উপন্যাস-ছোটগল্প সম্পর্কেও ব্যপক চর্চা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মুজফফর আহমদ : কাজী নজরুল ইসলাম—স্মৃতিকথা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা.লি. : কলকাতা-১৯৬৫

২. সুমিতা চক্রবর্তী : বাংলা উপন্যাসে কাজী নজরুল ইসলাম : কলকাতা-১৯৯৯

৩. সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা-১৯৭১

৪. অশ্রুকুমার সিকদার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস : অরুণা প্রকাশনী : প্রথম প্রকাশ : কলকাতা-১৯৮৮

বাংলা কাব্যে নান্দনিকতার বিবর্তন

স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক, শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ,
শ্রীরামপুর, হুগলী

সারসংক্ষেপ: আনন্দের সন্ধান হল শিল্পীর সাধনার বস্তু। যুগে যুগে শিল্পী কবিরা এই আনন্দেরই সন্ধান করে এসেছেন। তাই কবি বলেন – "সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে।" যে আনন্দে রসিক চিত্ত স্নান করে ধন্য হয়েছে সেই আনন্দই শিল্প-সত্যের মাপকাঠি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে খোদাই করা চিত্র, মূর্তি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে শিল্পীর নান্দনিক বোধ প্রকাশিত, যা পরবর্তীকালে সাহিত্যে প্রবাহিত। বর্তমান প্রবন্ধে কাব্যে নান্দনিক বোধের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
সূচক শব্দ: নান্দনিকতা - চর্যাপদ – শ্রীকৃষ্ণকীর্তন – বৈষ্ণবপদাবলী – রবীন্দ্রনাথ।
সৌন্দর্যের অনুভূতি, যা মানব মনে আনন্দ দান করে তাই নান্দনিকতা। প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টিকে মানুষ তার অন্তরে অনুভব করে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে নিজের সৃষ্টির মধ্যে, সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যুগ যুগ ধরে প্রকাশ পেয়েছে মানবের এই সৌন্দর্যনুভূতি, প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের সমালোচক গণ বিভিন্ন সময়ে এই নান্দনিকতা বা সৌন্দর্যনুভূতি নিয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। শিল্পীর শিল্প সৃষ্টি, কবির কাব্য সৃষ্টির মধ্যে বাস্তবের অতিরিক্ত একটি জগৎ ধরা পড়ে। এই অতিরিক্ত সৃষ্টি কেবল মানব মনের বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলেই সম্ভব। প্রাচীন ভারতীয় বেদ, উপনিষদ থেকে আধুনিক বাংলা কবি সকলের কাব্যেই প্রকাশ পেয়েছে নান্দনিকতা। বর্তমান প্রবন্ধে বিশেষ কয়েকজন কবির কাব্যে নান্দনিকতার প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে সাহিত্য প্রবন্ধে বলেছেন—

> "বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে, তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত—আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।"

মহাকবি শেক্সপীয়ার এই কথাকেই অন্যভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন—

"The poet's eye, in a fine frenzy rolling

Doth glance from heaven to earth,
from earth to heaven;
And as imagination bodies forth
The froms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes,
and gives to airy nothing
A local habitation and a name"

- A mid sumener Night's Dream

কবি Wordsworth একেই বলেছেন—“faculty of imagination” প্রখ্যাত দার্শনিক এ্যারিস্টটল বলেছেন দর্শনের সত্য, ইতিহাসের সত্য ও কাব্যের সত্য এক নয়। দর্শনের মধ্যে আছে Truth. ইতিহাসে আছে fact আর কাব্যের জগতে আছে বিশেষের সঙ্গে নির্বিশেষের মিলন। তিনি বললেন—

"It is not the poet's function to tell of real events, but of such as might happen, and of things possible according to probability or necessity."

ভারতীয় বেদ, উপনিষদের মতো প্রাচীন সাহিত্য থেকে সংস্কৃত ভাষার কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ’ যখন প্রকাশ করেন—

“প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম।
সপদি মদনানল দহতি মম মানসম্।
দেহি মুখকমল-মধু-পানম্।।
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনি
দেহি খরনয়ন শরঘাতম্।
ঘটায় ভুজবন্ধন জনয় রদখন্ডনম যেন ভবতি সুখ জাতম্।।
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মস জীবনং ত্বমসি মম
ভবজলধিরত্নম।
ভবতু ভবতীহ ময়ি মততম্ অনুরোধিনী তত্রমম
হৃদয়ম্ অতি যত্নম।।

অর্থাৎ তুমি আমার অলঙ্কার তুমি আমার জীবনের স্পন্দন, তুমি আমার জীবনসাগরের অপার রত্নরাশি, তোমাতেই আমার হৃদয় একান্ত নিবিষ্ট, তুমি আমার কামাগ্নি নিবারণ কর, ভুজ পাশে আবদ্ধ আমায় সুখের সাগরে অবগাহন করাও।

তখন প্রকৃতি ও প্রেমানুভূতি এক হয়ে গিয়ে পাঠকের অন্তরে এক অপূর্ব চিরন্তন নান্দনিক বোধই জাগ্রত হয়। দুহাজার বছরের পুরোনো বাংলাভাষায় রচিত

বিভিন্ন সাহিত্যও এই নান্দনিকতাবোধে পরিপূর্ণ।

খ্রীষ্টিয় দশম দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের দ্বারা রচিত চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এটি মূলত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মীয় দর্শন, যা রূপকের মাধ্যমে গীত এর আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭-এ নেপালের রাজদরবার থেকে এটি আবিষ্কার এর ভাষা বিশ্লেষণের পর সমালোচকেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এটিই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। বৌদ্ধদর্শনতত্ত্ব প্রকাশ এর মূল উদ্দেশ্য থাকলেও কাব্যমূল্য বিচারে এবং নান্দনিকতার দিক থেকে এটির গুরুত্ব অসীম। চর্যার কবি যখন বলেন—

“যোইণি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।।” — ১৯ নং

প্রেমিককে ছাড়া না বাঁচা, মুখ চুম্বনের সঙ্গে কমল সুধারস পানএ যদি জীবনরস না হয় তবে জীবনরস আর কোথায়। আবার ৫০ নং চর্যায় দেখা যায় পাহাড়ে শবরীর বাড়ি, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, চারিদিকে শুভ্র কাপাস ফুল ফুটেছে, চীনা ধান পেকেছে তার গন্ধ—এই মোহময় পরিবেশে শবর শবরী মিলনে মেতে উঠল, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে প্রকৃতিকে ও তার প্রেক্ষাপটে প্রেমকে অনুভবই তো৷ সার্থক জীবনরস, দর্শন তত্ত্ব গীতের গুঢ়ার্থ হলেও পাঠক মধ্যে অনুভব করেন এক অপূর্ব সৌন্দর্যনুভূতি, আনন্দ, মনের আরাম।

এ ভাবেই বাংলা মধ্যযুগের কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখা যায় সত্য সুন্দরের অপূর্ব প্রকাশ। Wordsworth যাকে Imagination অভিধা দিয়ে কাব্যের প্রাণ বলে মনে করেছেন। তার মতে Imagination-র এর জন্যই কবিরা বিধাতার সমগোত্র হয়ে ওঠেন—

"Is but another name of absolute power And
dearest insight, amplitude of mind, And
reason in her most exalted mood.”

মানুষের আত্মা ও দৃশ্যজগতের আত্মার মিলনে প্রকৃত কাব্যের সৃষ্টি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার চতুর্মাস্যা বর্ণনায় দেখা যায় আষাঢ় মাসে নবমেঘের গর্জনে রাধা মদনজ্বালায় অশ্রু বর্ষণ করছে। শ্রাবণ মাসে যখন অবিরত বৃষ্টি পড়ে, বিছানায় একলা শুয়ে রাধার ঘুম আসে না। ভাদ্র মাসে আকাশ দিবারাত্র মেঘে অন্ধকার থাকে, ময়ুর, ডাহুকেরা কলরব করে সে সময় কৃষ্ণের কথা ভেবে রাধার বুক ফেটে যায়। আশ্বিন মাসে বর্ষা শেষ হয়, মেঘ চলে যায়—চারিদিকে কাশফুল ফোটে, তখনও কৃষ্ণ আসে না দেখে রাধা জীবন বিফল হয়েছে বলে আর্তনাদ করে।

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ।
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথাঁ।।

\- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।।
ভাদর মাঁসে অহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে।।
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক।।
আশ্বিন মাসের শেষে নিবিড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী।
তবে কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ুচণ্ডীদাস বাঙালীগণ।।

প্রকৃতি যে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তাকে প্রভাবিত করে, সেই সত্যের জন্যই এখানে প্রকৃতি রাধিকার প্রেমকে আরও গভীরতরও মহত্তর রূপে প্রকাশ করেছে।

বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমের উদয় হওয়ায় রাধা যখন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তখন কবির অন্তরের সত্যই প্রকাশিত হয়। কবি তার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করেন রাধার মতো নায়িকাকে। কবির দ্বারা সৃষ্ট রাধা আর শুধু বিশেষ একটি যুগ বা সমাজের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন সব কালের সব দেশের সব সমাজের প্রেমিকার প্রতিনিধি রাধা এক সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠেন। কবি বিদ্যাপতি বলেন—

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।।
পাখিক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি।।

কৃষ্ণ রাধার কাছে হাতের দর্পণ, মাথার ফুল নয়নের অঞ্জন, ঠোঁটের রঞ্জিত পান হৃদয়ের কস্তুরী লেপন, কণ্ঠে শোভিত বহুমূল্যের হার। পাখীর যেমন পাখনা, মাছের জল যেমন অপরিহার্য, কৃষ্ণ ও রাধার কাছে তাই। তাকে ছাড়া রাধার জীবন ব্যর্থ। কবির এই প্রেমানুভূতি দেশকালের সীমানা আবদ্ধ থাকে না হয়ে ওঠে সর্বজনীন মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বিভিন্ন ধারায় এ ভাবেই কবির কল্পনা বাস্তবের সাথে একত্রিত হয়ে তৈরি করে এক কাব্যসত্য।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা কাল ১৮০০ খ্র:। পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা কাব্যেও এই সময় থেকে নতুনভাবে পথ চলা শুরু করে। ১৮০০ খ্রী: থেকে বর্তমান

সময়কাল পর্যন্ত রচিত হয়েছে অসংখ্য কবির অসংখ্য কবিতা। বিশ্বের অন্যতম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা পাই এই সময়েই। রবীন্দ্রনাথ অন্তরে নান্দনিকতাবোধ সম্পর্কে লিখেছেন তাঁর একটি কবিতায়, যার মধ্যে দিয়ে একটি দুটি লাইনেই প্রকাশ হয়ে যায় কাব্যের সত্য—

সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

অর্থাৎ রামায়ণ রচয়িতা বাল্মিকী যে রাম ও অযোধ্যার সৃষ্টি করেছিলেন তা বাস্তবের থেকেও সত্য কবি ও পাঠকের কাছে। 'আমি' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ
চুনী উঠলো রাঙা হয়ে
আমি চোখ মেললাম আকাশে
জ্বলে উঠলো আলো
পূবে পশ্চিমে
গোলাপের দিকে চেয়ে বললাম, সুন্দর
সুন্দর হলো সে।

মানবমনের চেতনা যা সৌন্দর্যানুভূতি জাগায় তাই সত্য তাই সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর Religion of Man প্রবন্ধে বলেন— "We have greatest delight when we realise ourselves in others, and this is the definition of love." রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে এই সত্যকে অনুভব করেছেন কখনো নারী মূর্তি কখনো জীবনদেবতা রূপী অন্তর্যামী কখনও বা অরূপের মাঝে, নিজের কল্পনার মাধুরী দিয়ে রচনা করেছেন উর্বশী কে—"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু, সুন্দরী রূপসী, / হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।" বা কখনো অন্তরবাসিনী বিচিত্র রূপিনীর উদ্দেশ্যে বলেছেন— "অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী / তুমি অন্তরবাসিনী।" তাঁর নান্দনিকতাবোধের সারমর্মটি তাঁরই রচিত 'সাহিত্যের স্বরূপ' নামক প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন—"শেষ কথা হচ্ছে : Truth is beauty। কাব্যের এই ট্রুথ রূপের ট্রুথ তথ্যের নয়।"

আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি রূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার নান্দনিকতাবোধ আলোচনা করা হলেও বর্তমান কাল পর্যন্তও সাম্প্রতিক কবিদের কাব্যেও একই ধারায় প্রবাহিত এই নান্দনিকতা। হয়তো কিছুটা বিবর্তিত কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা কাব্য এ বিষয়ে যুগোত্তীর্ণ।

তথ্যসূত্র:

১. ভারতীয় নন্দন চিন্তা – তপোধীর ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
২. রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের নন্দন তত্ত্ব সূত্র – ড. সুধীর কুমার নন্দী, পি. এম. বাকচি
৩. কবিতা : নন্দন ও সময় - তপোধীর ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৪. নন্দন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা – তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), দে'জ

সেলিম আল দীনের পুত্র নাটকে নারী ও নদী

শাকিলা তাসমিন
সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

সেলিম আল দীন (১৯৪৮ - ২০০৮) রচিত পুত্র (২০০৭) নাটকে বিবৃত হয়েছে একমাত্র পুত্রহীন পিতা-মাতার শোকাখ্যান। নাট্যকাহিনিতে পুত্রকে গর্ভে ধারণ থেকে বেড়ে ওঠা পর্যন্ত মাতৃত্বের আনন্দ উচ্ছাস যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমন বেদনাতুর আবছা ও সিরাজ পুত্র স্মৃতি কাতরতায় হাতড়ে ফেরে পুত্রের শৈশব। মানব জীবনের বাস্তব রূঢ়তা এই নাটকের চরিত্রগুলোকে জীবন বাস্তবতার এক কঠিনতর বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করায় যেখানে আবছা ও সিরাজের দাম্পত্য জীবন ধুসর হয়ে ওঠে। সেলিম আল দীনের নাটক সমূহে কোন না কোন ভাবে কাহিনি ও চরিত্রের অনুষঙ্গ হিসেবে বিবৃত হয়েছে নদী, নারী, প্রকৃতি, প্রাণী কিংবা চিরায়ত বাংলার প্রাকৃতিক নৈসর্গ কিংবা প্রকৃতির বিরূপাচরণ, সেলিম আল দীনের বিভিন্ন নাটকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে তুলে ধরা হয়েছে নদী কিংবা নারীকে কেন্দ্র করে নাট্যকাহিনি। তাঁর নাটকের কাহিনিতে কখনো নারী প্রধান হয়ে উঠেছে কখনো নদী ও নারী সমান্তরাল ভাবে বাহিত হয়েছে। প্রকৃতি ও জীবন বোধের নিগুঢ় দর্শন নিয়ে রচিত 'পুত্র' নাটকের নারী ও নদীর সংশ্লিষ্টতা নির্ণয় উক্ত প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

বাংলা নাটকে সেলিম আল দীনের নাট্য চিন্তা, দর্শন, নাটকের বিষয় আঙ্গিক, চরিত্র ও কাহিনির বয়ান নবতর ব্যঞ্জনা নির্মাণ করেছে। উপনিবেশিক নাট্যচর্চার ধারার ভিন্নতর চেতনায় উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ফলে বাঙালির নাট্যচর্চা হয়ে উঠেছে বাঙালির শেকড়জাত শিল্প। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাট্যচর্চায় তাঁর লেখনী বলিষ্ঠ ও অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। মূলত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে প্রাণিত হয়ে যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপট, আর্থ সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি হয়ে ওঠে নাটক রচনার প্রধান বিষয়বস্তু। এর সুদূর প্রসারী প্রভাব ও প্রসার বাংলা নাটক ও থিয়েটারকে ঋদ্ধ করেছে। শেকড় সন্ধানী নাট্যকার সেলিম আল দীনের রচিত নাটকের সর্বাধিক মঞ্চায়ণকৃত দল ঢাকা থিয়েটার তাদের ঘোষণা পত্রে শুরু থেকেই এই কথা বলে আসছেঃ

> "বাংলাদেশ একটি সংগ্রামযুদ্ধ অকুতোভয় জনপদের নাম। যুদ্ধ, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস মধ্যে এই জনপদ সমুন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রজ্বলিত করেছে তার সামুদ্রিক দুই চোখে। এই দেশ, তার ইতিহাস, সংগ্রাম, সংস্কৃতি, তার সবকিছুকে আমরা সম্মান করি। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, আত্রাই, ধরলার,

কূলে কূলে নামহীন গোত্রহীন মানুষের সংগ্রামী জীবন আমাদের নাটকের বিষয়বস্তু”।[১]

এ প্রসঙ্গে গবেষক সাজেদুল আউয়াল বলেনঃ “শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সেই দর্শনই ক্রিয়াশীল। এই দর্শনের প্রভাব সেলিম আল দীনের নাটক রচনা তথা পাঠ নির্মিতির মধ্যে প্রবলভাবে উপস্থিত।[২]

পুত্র একমাত্র সন্তান হারানোর শোকে আচ্ছন সন্তানহীন পিতা-মাতার আত্মোপলব্ধির নাটক। আবছা নির্মিত হয়েছে প্রধান চরিত্রের আধারে। যমুনা তীরবর্তী আবছার মধ্যে প্রতিফলত হয়েছে যমুনার হিংস্রতা ও উন্মত্ততা। যমুনা যেমন ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মেতে উঠে বিলীন করছে প্রতিনিয়ত একেকটি জনপদ তেমনি এই যমুনার প্রতিচ্ছবি লেখক বিস্তৃত করেছেন আবছা চরিত্রে। এছাড়াও প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্যে মানিকের অবাধ বিচরণ,গাছে বসে বাঁশির সুর তোলা, চাঁদের নানা চিত্রকল্প, বাঁশ ঝড়ের রূপকল্প ইত্যাদির মধ্যে প্রকৃতির যেমন সৌন্দর্য চিত্রিত হয়েছে, তেমনি নৃশংসতার বহি:প্রকাশ ঘটেছে নাটকে। আবছার স্বামীর উপলদ্ধি রাক্ষুসী যমুনা তার স্ত্রীর সঙ্গী,তাই সে যেখানেই থাকুক সর্বনাশা যমুনার ভয়াল রূপ সেখানে হানা দেয়। এই বিষয়টির সংশ্লিষ্টতা মেলে সিরাজের নিম্নোক্ত সংলাপেঃ হ হ। অপইয়া নারী। মনে নাই বিয়ার পর কইতিযমুনা তর পিছন লইছে। হ হ তোর পিছন লইছে আইজও তরে ছাড়ে নাই। না যদি সত্য হয় এই কথা তয় ছেলে ফাঁস নিলো ক্যান গাঙ ভাঙনে তর মরণ হইলে যমুনার আহার হইতো। সেই আহারের ক্ষিধাআমার মানিকরে খাইলো। তুই খাইছাস মানিকরেযমুনাবতীর বাচ্চা।[৩]

এই নাটকটি মূলত নাট্যকারের একান্ত মনোবেদনার বহিঃপ্রকাশ, তিনি হয়তো স্বীয় পুত্রের অকালমৃত্যু পরিপূর্ণ মানবভ্রূণকে গভীর আবেকে বড় করেছিলেন মানিকের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেই মানিকই ধাবিত হলো অনিবার্য মৃত্যুর দিকে। নাট্যকারের একান্ত মানসিক মর্মবেদনা সম্পর্কে শিমুল ইউসুফ তাঁর নির্দেশনা ভাবনায় ব্যক্ত করেছেন এভাবেঃ "তাঁদের একমাত্র পুত্র মাইনুল হাসান, যে জন্ম নেবার পর মাত্র ২০ মিনিট বেঁচে ছিল। ঐ অকাল মৃতপুত্র 'মানিক', পুত্র নাটকে এই যে স্বেচ্ছামৃত্যুকে গ্রহণ করে নিল সেই মানিক!"[৪] সেলিম আল দীনের পরিণত বয়সের রচনা ‘পুত্র’ তাঁর মৃত্যুর (২০০৮) মাত্র কিছুদিন পূর্বে জন্মভূমির নিজ বাড়ী সংলগ্ন একটি সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হয়। লেখক এ বিষয়ে পুত্র নাটকের পরিশেষে লিখেছেন এর ঘটনাটা সত্য। অনেক বছর আগে আমাকে প্রতিপালন করতেন যে খালেক ভাই যাঁকে আমার আটমাস কি এক বছর বয়সে আমি আব্বা বলে সম্মোধন করতাম। মার বুক বাদ দিয়ে আব্বার বুকেই ঘুমাতে পছন্দ করতাম বেশী। সেই আব্বার প্রথম কি দ্বিতীয় স্ত্রীর এক ছেলে সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছিল। আব্বার বাড়ি ঠিক আমার বাড়ি সংলগ্ন এবং তখন তিনি মৃত। আর ফাঁসি নেয়া গাছটি সর্ম্পকে গ্রামের সংস্কার

এই যেঃ এটিকে দ্রুত কেটে ফেলতে হয়। ঠিক সংস্কার হলেও এর একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব। কিন্তু সঙ্কীর্ণ ভূমিকার সীমানায় সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা বোধ হয় ঠিক হবে না।[৫]

পুত্র নাটকের কাহিনি সরল রেখায় আবর্তিত হয়নি। নাট্য কাহিনির চলমানতায় কখনো অতীত কিংবা কখনো বর্তমান ঘটনাকে ঘিরে সমগ্র কাহিনি ব্যাপ্তি লাভ করেছে। পুত্র নাটকটি বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষ করা যায় এটি ২ টি নাট্যপর্বে বিভাজিত। উক্ত নাট্যকাহিনিতে বিবৃত হয়েছে যমুনাবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জীবনাচার, সংস্কৃতি, জীবিকা নানা সংস্কার এবং কুসংস্কার। এখানে মানুষের প্রধান জীবিকা রূপেন উঠে আসে কৃষি কাজ। যা মূলত চিরায়ত বাংলার প্রধান জীবিকা রূপে বিবেচ্য। আবার পুকুর খননের মত দূরহ জীবিকা রয়েছে। নাট্যের অন্যতম চরিত্র সিরাজকে 'মাইট্যাল' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ সিরাজের পুকুরখননে পারদর্শীতা রয়েছে এবং তার জীবনধারনের প্রধান অবলম্বন হিসেবেও তা বিবেচ্য। সংস্কার ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত আবছা চরিত্র ধাবিত হয় যমুনার অতলে। বাংলা নাট্যরীতি ধারায় পুত্র বর্ণনাত্মক এবং সঙ্গীত নির্ভর নাটক। মাইট্যাল সিরাজের পুকুর খননের গান তার সঙ্গিদের সাথে করে নৃত্য সুর ও ছন্দে নান্দনিকতার আবেশ ছড়িয়ে দেয়। মাইট্যাল ও সঙ্গীতের সমবেত গীতঃ

ও তোমার মাটির তলে ফাগু নদী মাতা গো
ওমা বসুন্ধরা আমারা করি তোমার গান
নাচের তালে ঢোলের তালে
উঠবো পানির টান।
মা তুমি দয়া কর দয়া কর
মা তুমি দেও পানি দেও দেও গো।[৬]

এছাড়াও আবছার বিয়ের আয়োজনে দেখা যায় নিরেট নিকানো উঠোনে আড়ম্বরহীন বিয়ের গীত। যে গীতে প্রতিফলিত হয় আবছার জীবনের সুখ-দুঃখের ভিন্নার্থক চিত্র। আমাদের দেশ মাতৃকার একান্ত উৎসব বিয়ের গীতে করুণ আবহের সুর ভেসে আসে। মাতা পিতাহীন আবছার বিয়ে বাড়ী আনন্দের পরিবর্তে বেদনায় মূল সুর ভেসে আসেঃ

পদ

হঠাৎ বিবাহ
না তার গায়ে হলুদ- না গুঁড়ি কোটা
না সুগন্ধি লতা শাইলের ভাত।
সখিদের গীতে বেউলা লখিন্দরের
করুণ মিনতি।[৭]

পুত্র নাট্য কাহিনির বিভাজন পর্বের শুরুতে প্রস্তাবনা ও আম গাছের জন্মক্ষণ, পরবর্তীতে পুত্র মানিক যে গাছে ফাঁসি দিয়েছিল সেই গাছটির শেকড় পোড়াতে পোড়াতে উনুনের পাড়ে পুত্রশোকে পিতা মাতার স্মৃতিমন্থন পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র নাট্য কাহিনি আবর্তিত ও এই স্মৃতিকথা কখনো তাদের শান্ত করে কখনো করে তোলে ক্রুদ্ধ। পুত্রের শেষ চিহ্ন আম গাছের শিকড় বারংবার পোড়াতে নিষেধ করলে সিরাজ বলেঃ আমি বেবাক হিকড় পুড়ায়া তবে ফজরের নামাজ পইড়া শান্তি পামু।[৮] তখন আবছা ক্ষিপ্রতর ভঙ্গিতে বলেঃ তুই মর। শকুনে খাইক তর চোখ। তোর মতন আবীজ্যা পুরুষের ঘরে আমার মানিক জরম যে লইছিলহে তোর সোনার কোপাল[৯]

'পুত্র' নাটকে আবছা ও সিরাজের একমাত্র সন্তান মানিক জীবনের নানা অপ্রাপ্তিতে পিতামাতার হাতে বপিত মঞ্জুরিত আম গাছে আত্নহত্যা করে। এখানে নাট্য ঘটনার মূল উপজীব্য আম গাছ, এই জন্যই বলা যেতে পারে, নাট্যকার সুনিপুণ ভাবেই মানিকের পিতামাতাকে সমভাবে দগ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছে। অসহায় সিরাজের সংলাপে বিষয়টি পরিদৃষ্ট হয়ঃ চিৎকার করে উঠে সিরাজ। তবে সেই শয়তান ফকিরটা কোথায়। যে তারে দুইটা আম খেতে দিয়েছিল[১০] আম গাছ নিয়ে সিরাজের মনস্তাত্ত্বিক সংকট প্রকট হয়ে উঠে। এখানে সমগ্র নাট্য ঘটনার মূল বিষয় এভাবে নির্ণিত করা যেতে পারে

(১) মানিকের আত্নহত্যা।

(২) আত্নহত্যা পরবর্তী গাছ উপড়ে ফেলে শেকড় জ্বালিয়ে পুত্র শোকচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করা।

(৩) অতঃপর পুত্রশোকে আবছার স্বামী সংসার ত্যাগ এবং চির বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি।

'পুত্র' নাটকে জীব ও জড়ের দ্বান্দ্বিক সংযোগ পরিদৃষ্ট হয়। এখানে আবছা ও সিরাজ চরিত্রের পর নাট্য ঘটনার সমন্বয় সাধনে যমুনা নদীর ভুমিকা অপরিহার্য রূপে গণ্য। নাট্যে আবছার জন্ম-শৈশব-যৌবনের সঙ্গী যমুনা। সুখ দুঃখে কিংবা পড়ন্ত জীবনের সকল সময় যমুনা নদী চরিত্রটিকে বেষ্টন করে আবর্তিত হয়েছে। যমুনা নদী প্রানহীন হলেও আবছার সকল শঙ্কা কিংবা প্রশান্তিতে নাট্যঘটনা সংঘটনে গুরুত্ববহন করেছে। অন্যদিকে পুত্রের ফাঁসি দেয়া আম গাছটির সঙ্গেও আবছার সম্পর্ক নির্ণিত হয়। মূলত নদীর জন্য আবছার হৃদয়ে জাগে আবেগ আর গাছ ও শেকড় হয়ে ওঠে পুত্রের অধিক। 'পুত্র' নাটকে আবছা ও সিরাজ চরিত্রের সমান্তরাল যে বিষয়টি প্রধান হয়ে ওঠে তা হলো বিশাল প্রবাহমানতার যমুনা নদী ।এই যমুনা নদী যেনো আবছার আত্নায় প্রোথিত, অন্য দিকে সিরাজের অবস্থান নদীর বিপরীতমুখী। যমুনার বিশালতা প্রতিনিয়ত নারী আবছাকে নানাভাবে বিপদগ্রস্থ করেছে, আবার আশ্রয় ও দিয়েছে। নাট্যকার নারী আবছার সঙ্গে নদীর সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেনঃ

"সাম্প্রতিককালে যমুনা প্রিয় নদী হয়ে উঠেছে দেখতে পাই। তার ভয়াল গভীররূপভাঙ্গনের অনিশ্চিত চলন হঠাৎ করে আবছার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে চাইল"।[১১] 'পুত্র' নাটকে নাট্যকার আবছা চরিত্রটিকে কিভাবে নির্ণয় করেছেন তা বোঝা যায় 'আবছাকে নিয়ে যতো' শিরোনাম ভিক্তিক দৃশ্যে বিভাজন পর্বে। আবছার চারিত্রিক লক্ষণ এখানে পরিদৃষ্ট হয় এভাবেঃ 'যমুনার তীরবাসী মেয়েটিকালো শ্যামল। এবং যমুনার তীরের অধিবাসীরা যেমন হয় বেশ দীর্ঘকায়। তার নাম আবছা। আবছা একটা ধানেরও নাম। ধানের নামে মেয়ের নাম। যে বছর তার জন্মো সে বছর চরে প্রচুর ধান আর আষাঢ়ে যেমন তেমন শ্রাবণের ঢলে তলিয়ে গিয়েছিল জমি বাড়ি পর্যন্ত।[১২]

আবছার সমগ্র জীবনে নদী কোন অর্থেই তাকে পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদানে পরিতৃপ্ত হতে দেয়নি। যমুনা নদীর যে ভয়ংকর তান্ডব,ভয়াল রূপ তা যেন আবছা চরিত্রে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে। আবছার জন্ম বছর প্রচুর ফলন হয়েছিল, কিন্তু তা যমুনার ভয়াল থাবায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। মাত্র হামাগুড়ি শেখা আবছার আশ্রয়স্থল ও বিলুপ্ত হয়। শুধু তা নয় পরবর্তীতে আবছা যখন আধো আধো বুলিতে কথা বলে, গুটি গুটি পায়ে হাঁঠছিল ঠিক তখন ঘটে ভয়ংকর প্রলয়। ভয়াল বিপর্যয়ে আশ্রয়দাতা আত্নীয়ের একমাত্র বসতবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। গ্রামের লোকজন বলতে শুরু করেঃ 'আত্নীয়ের বাড়িটাও গাঙ্গে ভাঙলে পর কেউ কেউ আবছাকে নিয়ে আফসোস আর কেউ কেউ তার ভাগ্য লিপির সঙ্গে যমুনার বর্ষাকালীন উম্মত্ততার যোগসূত্র খুঁজে পাওযার চেষ্টা করলো'[১৩]

কিশোরী আবছা যমুনার চরে ঘুরে বেড়ায়, রৌদ্র ছায়ায় খেলা করে, কাশফুলের ঘন বনে হারিয়ে খুঁজে নিজেকে, শুধু তা নয় শরতের মেঘ বাদলের খেলা দেখে বিস্মিত হয় এমনকি ভরা যমুনার টলটলে জলে সাঁতারে বেড়ায়, ঠিক সেই বয়সে যমুনার অথৈ জলে নিমজ্জিত হয় মামা বাড়ি আত্নীয় পরিজন বলতে শুরু করে 'আর পরিবারের সবাই বিশাল জাল থবাহরণ করে নিলেবিষয়টি স্পষ্ঠ হয়ে যায় যেঃ এ মেয়েটির ভেতর এক অপয়াসুপয়া একত্রে বাস করে'[১৪]প্রকৃত পক্ষে, যমুনা নদীর ভাঙ্গন আবছার যাপিত জীবনকে বারংবার বাধাগ্রস্থ করেছে। যে কোন ভাবে করেছে অসহায়,স্থলকুলহীন। এখানে বলা বাহুল্য যে, আবছা চরিত্রকে গতিময় করেছে যমুনার উদ্দাম হাওয়া ও উত্তাল ঢেউ। আবছা বিবাহের চির বিচ্ছেদে মামাকে বলেঃ 'আমার যে যমুনারে ভালো লাগে সেই চর। সেই যেতোমার পাছ পাছ পান্তা ভাতের পাতিল নিয়া হাটু পানি কি নাওতে চরে গিয়া বইসা থাকা। ফের ফির ফির্যা আসা'[১৫]

মূলত যমুনা নদীর প্রতিকূল সংযোগ এড়াতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মামা আবছার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি বিদায় লগ্নে আবছাকে বলেঃ 'সর্বনাশী তুই যেখানে যেই ঘরে গেছস যে পরিবারে গেছস সর্বধনহারা হইছে না সে। দেখস নাবিশাল সম্পত্তি থুইয়া এহানে রিকসা চালাই'[১৬] আবছা যমুনার আশ্রয়ে কখনোই স্বাভাবিক জীবনের অভ্যস্ত হতে পারে নি। তার জীবনে কেবলি হতাশা ও মানসিক বিপর্যয় । পিতা মাতার স্নেহ বঞ্চিত এমনকি আত্নীয় পরিজনের প্রতিনিয়ত অপয়া সম্বোধনে সেই ছোট কিশোরী

আবছা হয়তো সকল দু:খ নিজের মধ্যে ধারণ করেছিল নিরবেনিশ্চুপে নিভৃতে। কখনো চোখের টলটলে জলে ভুলে গিয়েছিল সকল দুঃখ। আবার নতুন প্রত্যয়ে দু'চোখে সুখের স্বপ্ন দেখেছিল। তাই তো ম্যাইটাল সিরাজের হাত ধরে চলে যায় আরেক অঞ্চলে। হয়তো সেখানে মিলবে নিরাপদ, নিশ্চিত আশ্রয়। এই বিবাহের মধ্য দিয়ে যমুনা নদীর সঙ্গে সদ্য বিবাহিত নারী আবছার বিচ্ছেদের সুর ভেসে আসে। আবছা কোন এক অজানা সুখের টানে পাড়ি দিয়েছিল দীর্ঘপথ। অজানা অচেনা পথ, সে পথ দূর বহুদূর। তবে যমুনার টলটলে জলের উত্তাল তরঙ্গ তার বুকে ঝড় তুলেছিল । আর প্রকান্ড ঢেউ যেন সঙ্গী হয়েছে যমুনাবতী আবছার। বিবাহের তৃতীয় দিন সান্ধ্যকালীন নিস্তব্দতায় আবছা শুনতে পায় যমুনার গর্জন। ভীত হয়ে আবছা বল্লেঃ

'না না । ধরবা না আমারে। ঐ আসতেছে'।

: কি

: ঐ যমুনাবতী ভাঙ্গনের শব্দ শুনতেছি[১৭]

একদিন পূর্ণিমার রাতে স্বামীর স্পর্শে আবছার বিস্ফোরিত চোখ ও কম্পমান শরীর দেখে ভীত হয়ে গিয়েছিল সিরাজ। এমনকি সম্ভোগেও খুঁজে পায় যমুনার তীব্রতা। সম্ভোগ মুহূর্তে সিরাজ চমকে উঠেঃ 'যেন মেয়েটি যমুনার চরের বিশাল গোক্ষুর। ফণা তুলেছে প্রচন্ড ক্ষিপ্রতায় তারই ঊরুর উপর। বিষ ঢেলে দেবে তীক্ষ্ণ দাঁতে যেন তারই কপালে'[১৮] আবছার চরিত্রে বিশেষত্ব 'অপয়া' অপবাদ সিরাজ শুনেছিল ধান কাটতে গিয়েঃ আসতে আসতে সেবার মাঘেই ফাল্গুন লেগে গিয়েছিল। আর সিরাজ নিয়ে একটা মেয়েকে সুপয়া অপয়ার রইল স্পষ্ট ভাবে শুনেছিল বতোরে। শাদাসোনা চরে। তবে সে মেয়েটা যে এ মেয়ে সে জানতো না[১৯] কোনো এক অদেখা, অনামা, অজানা নারীর প্রতি যেন তার বুকের ভেতর ভরা নদী প্রবল ভালোবাসার ঢেউ তোলে। ভালোবাসার প্রাবল্যতায় জন্ম হয় মানিকের।

নদীকে ঘিরে নারী আবছা কখনো যমুনার উদ্যোমতার মতো অহংকারী হয়ে উঠতো। মূলত নাট্যকার সেই বোধ নির্মাণ করেছেন চরিত্রের আদ্যোপান্তে। নাটকে আবছার অপরিহার্যতা বিবেচনায় তিনি বলেছেনঃ 'কিন্তু লিখতে লিখতে সিরাজের চেয়ে আবছা হঠাৎ কেমন যেন প্রধান চরিত্র হয়ে উঠলো এবং তারপর থেকে সিরাজগঞ্জে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল'[২০] আবছা চরিত্রের নানা ঘটমান ঘটনাকে আমরা এভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। প্রথমত, সকল শঙ্কা উপেক্ষা করে যমুনার সকল সৌন্দর্য্য নিয়ে আবছার যমুনাবতী হয়ে ওঠা। দ্বিতীয়ত, আশ্রয়হীন আবছার বিবাহ এবং নতুন প্রতিবেশে নিজেকে মানিয়ে চলা। সর্বশেষ জীবনের নিদারুণ বেদনায় পুত্রশোকী আবছা একমাত্র পুত্র হারানোর বেদনায় আবছার স্মৃতিপটে কেবলই ভেসে বেড়ায় মানিকের সেই আল পথে ছুটে চলা, দুরন্তপণা, জোস্নারাতে বাঁশির অবারিত সুর, দোলায়িত বাতাসে আম্র মুকুলের ঘ্রাণ। সেই আধো অস্ফুট সুরেমা সম্বোধণ। রৌদ্র ঘামে ফিরে

আসা পুত্রের জন্য বাতামি লেবুর শরবত বানানোর টুংটাং শব্দ। পুত্রের নানা স্মৃতি মন্থনে চীৎকার করে আবছা বলেঃ 'হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বুকের ভেতর। সে এখনো আসে যায়। কথা কয় দুধ ভাত শবরী কলা খায়'।[২১] উক্ত সংলাপে একজন নারীর মাতৃত্বের যে বিদীর্ণ করা হাহাকার তা তীব্রতর হয়ে উঠেছে। মানিকের মৃত্যুর দুইবছর পর পুত্র বিয়োগ যন্ত্রণা প্রবলভাবে মোচড় দিয়ে উঠে। প্রচন্ড এক শীতের রাতে চাঁদ জোস্না সঙ্গী করে পুত্রশোক গাঁথায় মাতা পিতার অশ্রু ধারার যেন যমুনা নদীর জল উপচে পড়ে। পুত্রশোকের মাতমে প্লাবিত মাঘী পূর্ণিমার আলো বিবর্ণ করে তোলে। এ যেন কুন্ডলিকৃত ধোঁয়ার আঁধারে চাপা বেদনা। উনুনের মতো হঠাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অসংযত সংলাপে একে অপরকে বাংরবার বিদীর্ণ করছে। আবার কখনো নিশ্চুপ শুনসান নিরবতা কখনো উদ্বেগ আশা ও ভরসার স্ফুরণ কিংবা ভয়। নিজেদের নানা আঘাতে জর্জরিত করে ক্ষোপ প্রকাশ করতে গিয়ে হঠাৎ একটি শেকড় হয়ে উঠে পুত্রসম। সিরাজের উপলদ্ধিঃ 'এইটা একটা আজব শিকড়। দেখ না। আবছা দেখে। দুইটা চোখের মত। দুই হাটঁ হাত মুখ উপুড় করে শোয়ায় সিরাজ। যেন হামাগুড়ি দিয়ে সে তার প্রকৃত মায়ের কাছে আসবে'।[২২] আবছার জীবনের পরম মমতা, অপাথিব আনন্দের স্পর্শ তার সন্তান। যার জন্ম ও বেড়ে উঠায় জোস্না র প্লাবণ বাহিত হয়। মানিক যখন ঐ আম গাছেটিতে বসে চাঁদতারা সঙ্গী করে ফ্লাগুনী মৃদু বাতাসে বাঁশি বাজাতো আবছা গভীর আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে বলতোঃ হয়তো আমার যমুনা রক্ত তার শইল্লেও ছিল[২৩] পুত্র নাটকে প্রধান চরিত্র হিসেবে রয়েছে আবছা, সিরাজ ও মানিক। অদৃশ্য মানিক পিতামাতার মন্থনের স্মৃতি নাট্যমধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে। এখানে মূলত 'হ্যালোসিনেশনের' বিষয়টি প্রযুক্ত হয়েছে। যা মূলত অলীক কিছু দর্শন যেখানে রয়েছে কেবলই মায়া, বিভ্রম ও বিশ্বাস। মানিক চরিত্রটি নাট্যমধ্যে অনুপস্থিত পিতা-মাতার কল্পনাজাত চরিত্রটি পাঠক ও দর্শক হৃদয়ে উপলব্ধির বলয় তৈরী করে। সমগ্র নাটকে আবছা কখনো চেতন, অবচেতন ও অর্ধচেতন মানিককে দেখতে পায় আধো অন্ধকারে তার উপস্থিতি কিংবা অস্ফুটস্বরে মা সম্বোধন আবছার মাতৃত্বের আকাঙ্খাকে প্রবলতর করে।

আবছা ফাল্গুনের হাওয়ায় অবারিত কাশফুলের বনে, ঐ নীল আকাকে সাত বরণ ঘুড়িতে খুঁজে ফেরে পুত্রকে।তার পুত্র যেন নাটাই থেকে কেটে যাওয়া ঘুড়ি, ঐ দূর নক্ষত্রের দেকে অনন্তলোকে বিলীন হয়েছে। এতোটা নি:শব্দে চলে যাবে মানিক,এতটা শূণ্যতা স্পর্শ করবে আবছাকে ভাবতে পারেনি।দীর্ঘশ্বাসে বুকের ভেতর হু হু করে ফাগ্লুনের বাতাসে যেন বুকের পাঁজর চূর্ণ হয়ে যায়। দীর্ঘশ্বাসে বুক ভারী হয়ে আসে এ যেনো যমুনায় রুঢ়তা, ক্রুদ্ধতা ভর করেছে বুকের উপর। পুত্রের মৃত্যুর দুটি বছর বিচিত্র ভাবনায় আবছা বলেঃ

> 'যমুনার ধারে হইলে আমার মানিক ফাঁসি নিতো না। সে হউতো তালগাছের মতোন। সে চরে নতুন বাছুরের মতোন ইচ্ছা মতন দৌঁড়াইতো। দিনে আষ্টবার মাথার চুল আঁচড়াইতো সে মানিক উঁচা ভাঙ্গা পাড় থিকা ঝাঁপ দিতো

> গাঙের জলে মায়ের বুকে কাঁপন ধরায়া। খোড়ল থিকা টাইনা বাইর করতো গাঙের বাইল। হাতে গামছা পেঁচায়া ধরতো চেল্লসবাইমএতো বড় ঐ ছায়ার হোমান। আইড়ের কাটা চাইপা ধইরা ফিরতো বৈকালে। স্কুলে যাইতো । পুকুর কাটার খোয়াব দেখতো। গাঙ দেইখা কে কবে পুকুরের কথা মনে করে কোন পাগলে'[২৪]

পুত্রের মৃত্যুতে আবছাকে অভিযুক্ত করে সিরাজ নানা ভাবে বলে তখন তুই সেই টাকা কনে দিলিঃ কনে রে অগভাগী যমুনা খাইগা মাগী গাঙের বিষশ্বাস লাগা মাগী কনে দিলি সেই জোলাতির টেকা।[২৫] আবছা যেন যমুনার প্রবল তোড়ে ভেসে আসা এক নারী। অপয়া সম্বোধন যুক্ত আবছা জন্মশৈশবযৌবন এবং জীবন সাহাহ্নে ও তাকে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করেছে। এইতো স্বামীর কাছে অপয়ার অপবাদ ঘোছাতে আবছা বলেঃ আপনে যখন যাইতেনধান বোনা চর জাগনা নদী। তর কি যমুনাবর্তীও গোক্ষুর হাপ দেখেন নাই। চরের মাইয়্যা গাঙ ভাঙ্গা মাইয়া আমি। ঝড় তুফানে উড়ানি খুঁটি ধইরা টাইনা এই দুই হাতে ছোডো মামার লগে।[২৬] পিতামাতা পুত্র মৃত্যুর সকল দায় যেন একাই বহন করছে, এমন বিষয়টিই প্রত্যক্ষ হয় নাটকে। নাট্য ঘটনার সংঘটনের কৌশল বারংবারই স্তম্ভিত করেছে আবছা ও সিরাজকে। নাট্যরসের যে করুণ আবেগ তা যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। পুত্র নাটকে যে বিষয়টি প্রধান হয়েছে তা হলো পিতা মাতা কর্তৃক আম বপন এবং উক্ত গাছে পুত্রের আত্মহত্যা, শুধু তাই নয় ঝুলন্ত লাশটি দৃষ্টিভূত হয় হতভাগ্য পিতার মাধ্যমে।যার মধ্য দিয়ে নাট্য ঘটনার প্রধান বিষয় 'পুত্রের মৃত্যুর'সকল আয়োজন সংঘটনের বিষয়টি প্রকট হয়ে ওঠে। যা নাটকের মূল সুরের সঙ্গে যথাযথ ভাবেই প্রযুক্ত হয়েছে। 'সিরাজের কন্ঠে সেই বির্দীণ করা সংলাপে বিবৃত হয়েছেঃ

> ওরে আবছা তর বুকের ধন মানিক আর নাইরে। সিরাজ ছুটে যায় আরে রে রে রে হ। মানিক মানিক ফাঁস লইছে। আবছা। তার কন্ঠে গগণের তারা ঝনঝন করে। মাঝ রাতে আর্তনাদের প্রলয় ঘর বাড়ি আলো অন্ধকার একপাত্রে ঘুলে মিকে কী যে হে খোদা আ হা হা হা। কী হয় যে বলা যায় কিনা'।[২৭]

শুধু তা নয় সিরাজের পরবর্তীতে আবছা যখন ঝুলন্ত লাশটি দেখে তার হৃদয়ে শুরু হয় অজানা ভীতি,বুকের ভেতর প্রবল মোচড় লাগে,হৃদয়ে যেন রক্তক্ষরণ। সকল ভীতি উপেক্ষা করে আবছা বলেছেঃ

দুপুরে মানিক রাগারাগি
ঘুড়ি কিনবার টাকা চেয়ে
বিকালে ছেড়ে ঘর। আমার বুকটা
ধড়াস ধড়াস করে ভাতসিদ্ধ উনানে আগুন।

আর কি আনছো আনাজ মাছব্যাগ দাও।
আর তুমি ধরবানা লাশ। হালিম চেয়ারম্যান
বেবাকতে জেরা কইরা
ঘুম নিন তুলবো চাঙে। লাশ তুমি
ধরবানা কিছুতেই।[২৮]

আবছা বিবাহের দিন যমুনার ভাঙ্গা ঘর কুল পাড়ের স্নেহছায়ায় প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার শূন্যতায় হুহু করে কেঁদেছিল। তার আশ্রিত পরিজন চেয়েছিল কোন এক অজানায় হোক আবছার আশ্রয়।যেখানে সে সুখের সন্তরণে জীবন যাপন করবে । স্বামী সন্তান সুখে ভরে উঠবে সংসার। নিকানো উঠানে সন্ধ্যা সমীরণে বসবে চাঁদের হাট। কিন্তু যমুনার করাল থাবা হিঁচড়ে ফেলে দিয়েছে আবছার অনাগত স্বপ্ন। পুত্রের অনন্ত লোক যাত্রায় তার সংসার কালো মেঘে ঢেকে যায়। যেন আবছার নিরেট বাড়িটি ধোঁয়ায় কুন্ডলিকৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরও সর্বহারা আবছাকে বাংরবার সিরাজ নানা কটুক্তিতে ক্রুদ্ধ কন্ঠে বলেঃ পুত্রখাগি। সতেরোটা বছর পার করতে দিলি না। লাথি মারি তর গর্ভথলিরে। ক্যারে মাগী তুইনা যমুনার কূলে শ্যাষম্যাষ মামার ঘরখানা গাঙের খাওয়ায়া আসছস না কিরে।[২৯]

পুত্রশোকী আবছা থিরথির করে কাঁপতে থাকে,পুত্র শোক,স্বামীর অপবাদ আবারও তাকে হাতের রেখায় তার অপয়াযুক্ত অদৃষ্টের কথা মনে করে দেয়। এ যেন নিঃসাড় আবছা, মাতৃত্বহীনতার উপলব্দি কেবল মা-ই বুঝতে পারে। আবছার উষ্ণ রক্ত শ্রোত শীতল হয়ে যায়। নদী যমুনাকে নিয়ে দুই বিপরীত সত্বার দ্বৈরথ যুদ্ধে অবশেষে আবছা স্বামীঅসম্মান, স্বামী সম্ভোগে অতৃপ্ত হয়ে অটল সিদ্ধান্ত উপনীত হয় এবং সে বলেঃ ‘বাপরে দ্যাকে গিয়া পুরুষ খুঁজবো’। পুরুষ। সেই পুরুষ যে আমারে গাঙের ভাঙ্গনের কিনারে দাঁড় করায়ে ফের টাইনা তুলবো। যে আমারে অপয়ার ঘুচাবে সুপয়ার সুনাম দিব।[৩০] দুই বিপরীত টানা পোড়নে সিরাজ মনে করে যমুনাবর্তী আবছার ভাগ্য রেখাই নি:সন্তান করেছে তাকে। অপরদিকে আবছা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস এবং বলেঃ এই দ্যাকে সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে। এ হানে সেই নদী কতই গাঙ ভাঙ্গা। আমার মানিক যমুনার তীরে জন্মালে ঘুড়ি উড়াবার পারতো। না পারলে গলায় দড়ি দিতো না।[৩১]

নাড়ীর প্রগাঢ় উপলব্দি নারী আবছাকে টেনে নিয়ে যায় যমুনা নদীর কাছে। পুত্রশোকে বিদীর্ণ স্বামী ও পুত্রের কবর চিহ্ন উপেক্ষা করে আজন্মের টানে যমুনার সঙ্গ অঙ্গীকৃত করে। নাটকের শেষ নাট্যরস শোকাতুর করে পাঠক ও দর্শককে। সকলের চোখ নিবদ্ধ হয় এই বর্ণনায়ঃ “সিরাজ পুত্রের কবরের পাশে দাঁড়ায়। আবছা ক্রমে দূরের ফাল্গুনী কুয়াশায় মিলায়। মিলায় যে মতো শাদা উড়াল সারস”।[৩২] এই চির বিচ্ছেদে যমুনাবর্তী আবছা এক নিগূঢ় ভালোবাসায় নিঃস্ব, পুত্রহারা ও পৌরুষত্বের অক্ষমতার দায়ে মাথা নুয়ে পড়া সিরাজকে হঠাৎ চাপা কান্নায় জড়িয়ে ধরে। সিরাজকে হৃদয়ের গহীনে টেনে নিয়ে যায় এবং বলেঃ ‘এ জন্মের লাইগা অভাগীরে ক্ষমা করে

দিও। মানিকরে কইছি কুসন্তান। ঠিক কই নাই। কিন্তু সে সুসন্তান ছিল না কোনো দিন। মায়ের দুঃখ সে বুঝে নাই কুনো সমে। এই তোমারে শেষ তালাক বাইন তালাক দিলাম'।[৩৩]

সিরাজ ও ভালোবাসার স্পর্শ উপলব্ধি করেছিল আবছার প্রতি। পুত্রশোকে বিপর্যস্ত প্রায় আবছা যখন আর কোন শব্দে সংলাপে পুত্রকে স্মরণ করতে পারছিলো না, অস্ফুট স্বরে যেন শুধু মা ডাক শুনতে পারছিলো- তখন আবছা অদৃশ্য মানিককে পরম মমতায় জড়িয়ে কাঁদছে আর কাঁপছে। তখন সিরাজও গভীর ভালোবাসায় আবছাকে জড়িয়ে ধরে বলেঃ 'আহা ঘুমাক না আবছা। সে যে বড়ো অপয়া। চরের ধান দ্বিগুন হতো সে যে বাড়িতে আশ্রয় নিতো তারপর ভাঙ্গন এসে সেই পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিতো। চলে যেতো আরেক শঙ্কিত কুটুমের বাড়ি।[৩৪]

সেলিম আল দীনের পুত্র নাটকে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ব্যাপৃত হয়েছে চরিত্র সমুহ। জ্যোৎস্না, বাঁশ ঝাড়, আম্র মুকুলের সুমিষ্ট সৌরভ, লেবুর মন মাতানো ঘ্রাণ, বর্ষায় টইটম্বুর যমুনার জলে পূর্ণিমার চাঁদের বিকিরিণ কখনো বিস্তির্ণ চর জাগায়। যমুনার সকল সৌন্দর্য ছেনে নির্মিত চরিত্র আবছা যমুনা নদীর ভয়াবহতা ভুলে আকড়ে ধরে নবজীবনের উদ্যোমে জীবনতরী ভাসিয়েছিলো আবছা বিপদ সঙ্কুল যমুনা নদীর একূল অকূল সর্বত্র সাঁতারে বেড়িয়েছে, জীবনের অর্থ বোঝার নিমিত্ত। যখন যে পাড়ে গিয়েছে মুখ থুবড়ে ফিরে এসেছে। প্রবল ঘূর্ণিতে বিলীন হয়েছে প্রতিটি স্বপ্ন। সমগ্র নাট্য কাহিনি বয়ানে প্রতিয়মান হয়, কোনো নদী পাড় আঁকড়ে উঠে আসতে পারেনি আবছা কোন স্নেহাবাস কিংবা ভালবাসার পরম মমতা করেনি তাকে আলিঙ্গন। কিন্তু নদীর প্রতি অপার প্রেমাবেগ শেষাবধি ঘূর্ণায়মান নদীর কাছে ফিরে যাওয়া। হয়তো আবছা অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে নতুবা অনাগত স্বপ্ন পূরনে হবে উদ্যেমী। সেলিম আল দীনের 'পুত্র' নাটকে নারী ও নদীর যে নাট্য সন্নিবেশ তা কাহিনির গতি ও চরিত্রের সঙ্গে যথাযথ ভাবে প্রথিত হয়েছে।

সহায়কপঞ্জি:

১. অরুণ সেন, "কলকাতায় থিয়েটার ও সেলিম আল দীন", সাত সওদা, সেলিম আল দীন পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য, সম্পাদনা মফিদুল হক (বাংলাদেশ), অরুন সেন (ভারত), সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ৯৭।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪।

৩. সেলিম আল দীন, রচনা সমগ্র ৮, সাইমন জাকারিয়া সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফ্রেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪৯৭।

৪. সেলিম আল দীনের 'পুত্র', ঢাকা থিয়েটার প্রযোজনা-৪৭ এর প্রচার পুস্তিকা।

৫. সেলিম আল দীন, রচনা সমগ্র ৮, সাইমন জাকারিয়া সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪৯৮।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।
১৯. প্রাগুক্ত।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
৩৩. প্রাগুক্ত।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

'রাত্রির তপস্যা' : শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকতার পেশার জগৎ

দিব্যেন্দু ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত আদর্শের বিষয়টি। গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রাণের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি এসে থাবা বসিয়েছে এই নিষ্পাপ জগতে। আদর্শের চেয়ে বড়ো হয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয়টি, ফলে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে শিক্ষার মহতী উদ্দেশ্যটি। উপরন্তু গতানুগতিকতার কাছে বারেবারে ঠেকে যাচ্ছে নতুন করে কিছু ভাবনার বিষয়টি। শিক্ষার্থীর সপ্রাণ প্রশ্নমুখিতা চাপা পড়ে যাচ্ছে সেকেলে ভাবনার কাছে। নব উদ্দীপনায় জ্ঞানের শিখা প্রজ্জ্বলনের দায়িত্ব যিনি নিচ্ছেন তিনি প্রকৃতই একক বলে তাঁকে শুধু পাকেচক্রে একাকী করা হচ্ছে না, অনেকসময় নানামুখী ব্যক্তিগত কুৎসায় ম্লান করে দেওয়া হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিগত জগৎটিও। অবশ্য যিনি শিক্ষার মহত্ত্বের বাণীবাহক তাঁর সংগ্রামের বিষয়টি যুগপৎ নন্দিত-নিন্দিতের টানাপোড়েনে জেরবার হলেও তাঁর উদ্দেশ্যটি যে মহৎ সে বিষয়ে দ্বিরুক্তির জায়গা নেই।

সূচক শব্দ : শিক্ষাব্যবস্থা, আদর্শহীনতা, ব্যক্তিসম্পর্ক, একক সংগ্রাম, মহত্ত্বের সাধনা ।

মূল আলোচনা:

পেশা হিসেবে একজন মানুষ যখন শিক্ষকতাকে বেছে নেন তখন অন্যদের থেকে তিনি স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন,কেননা পেশার সূত্রে তিনি সম্পর্কে গ্রথিত হন তাদেরই সঙ্গে যারা ভবিষ্যতের কাণ্ডারী; দেশকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে তারাই অগ্রদূত। এই কারণেই বলা হয় শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্কে কদাপি মুনাফার প্রশ্ন ওঠে না। আসলে দেনাপাওনার রফা যেখানে হয় সেটি তো ব্যবসায়িক জগৎ। শিক্ষকতার পেশার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের কাছে বেসাতির কথা মূল্যহীন। সমালোচক বলেছেন '' অর্থ ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে কিংবা 'ধান চাল বেচনের পাটোয়ারি বুদ্ধি'তে আহরণ করা যায়; জোর করে, আদায়ের রাজনীতির মাধ্যমে কিংবা হীন অভিসন্ধির সাহায্যে বাড়ানো-কমানো যায়; কিন্তু বিদ্যা নৈব নৈব চ।'' (১) আসলে যে সম্পর্ক আত্মজের চেয়েও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে সেটির মূল মন্ত্রই হল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা,সেই বিতরণের মন্ত্রে রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতি দানের সঙ্গে তুলনা চলে না। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও যতো দিন অতিবাহিত হয়েছে ততোই জটিলতা বেড়েছে এবং অস্বীকার করার উপায় নেই স্বার্থ-অর্থের প্রসঙ্গ ক্রমশ মাথা তুলেছে সেই পুষ্পতুল্য পবিত্র সম্পর্কে। আদর্শের জগৎ কেমনভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে তার প্রমাণ আমরা স্বাধীনোত্তর পর্বে পেয়েছি জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি',বুদ্ধদেব বসুর 'শোণপাংশু',মনোজ বসুর 'মানুষ গড়ার কারিগর' প্রভৃতি উপন্যাসে।তৎসহ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'রাত্রির তপস্যা' (পৌষ,১৩৫৫) উপন্যাসে দেখি

ভূপেন নামে এক উজ্জ্বল ছাত্র ও শিক্ষকের জীবন কেমনভাবে অপচয়িত হয়েছে শিক্ষার মহতী আদর্শের বিপরীতে অন্ধ স্বার্থময় জগতের দ্বারা।

আদর্শের অন্য এক প্রতিভূ ভূপেন নামক এক সেকেন্ড ইয়ার ক্লাসের ছাত্রকে নিয়েই গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর 'রাত্রির তপস্যা'(পৌষ,১৩৫৫) উপন্যাসের সূচনা করেছেন। লেখক যেন সচেতনভাবেই ভূপেনকে আলাদাভাবে গড়ে তুলেছেন তার সহপাঠীদের চেয়ে। এর কারণটি অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। আসলে এই জগতেরই সাধারণ মানুষ হয়ে চিন্তার ভুবনে ও আদর্শে যখন কেউ অন্যতর জগতের সন্ধানী হয় তখন কে না জানে যে সেটির পরিণতি আদৌ সুখকর হয় না। এই মুদ্রাদোষ যখনই পেয়ে বসবে তখন সকলের মতো হতে না পারার ব্যর্থতা স্বতন্ত্রকে আঘাত করে। তাহলে প্রশ্ন উঠবে স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানী মানুষটি কি অপরের চোখে হাস্যকর হয়ে উঠবে শুধুমাত্র নিজের পথটির জন্য? আমরা মনে করি এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে দেওয়া যায় না। আমরা মনে করি একক মানুষ লড়াইয়ে হারতে পারে, আমরা খুব সহজেই তাকে পরাজিত বলে দেগে দিতে পারি, কিন্তু তার আদর্শের পরাজয় হয় না। জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের নিশীথের মাধ্যমে যে ছবি আমরা পেয়েছি তেমনি আরেকটি চরিত্র পেলাম গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'রাত্রির তপস্যা'র ভূপেনের মাধ্যমে।

সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র ভূপেনের মধ্যে যে স্ববিরোধী আচরণ আমরা খুঁজে পাই সেটির উৎস কিন্তু অন্যত্র। হতেই পারে সে সহপাঠীদের প্রেমের অভিজ্ঞতাকে পছন্দ করে না, অথচ দিবারাত্রি রোমান্টিক চিন্তা ও কল্পনায় ডুবে থেকে তরুণীসঙ্গবঞ্চিত জীবনে গোপনে হা-হুতাশ করে। আসলে বয়সোচিত আবেগবহুল প্রগলভতার এই নানাবিধ স্ব-বিরোধী আচরণের আবরণকে সরিয়ে দিলেই আমরা দেখবো সে একটা প্রকাশের জগৎ খুঁজছে, যে মহত্তর আদর্শগুলি তাকে ভবিষ্যতে কঠিন পথে চালনা করবে তারই একটা ভিত্তিভূমির সন্ধান তার ভিতরে ভিতরে চলছে। এরই পূর্বপ্রস্তুতিতে টাকার পিছনে ছোটাকে 'silly goat' তুল্য মনে হলেও কাঞ্চনমূল্যের মর্যাদাকে তার চেয়ে বেশী কে চিনবে? এই প্রস্তুতিতেই জুটবে ধনাঢ্য মোহিতবাবু ও সন্ধ্যাদের আশ্রয় এবং এই জগৎটি তাকে নূতন করে তৈরী করে নেবে, প্রশমিত করবে তার বালসুলভ উত্তেজনাকে। আসলে এই পূর্ণবৃত্তের নির্মাণও লেখকের সযত্ন চিন্তাপ্রসূত। মোহিতবাবুদের আশ্রয়ে যে অভিজ্ঞতা সে লাভ করবে সেটি হবে তার জীবন পথে চলার সম্বল-যাতে বাধা প্রচুর, যন্ত্রণার দাহ তাকে টালমাটাল করে দেবে, তবু একবগ্গা জেদ নিয়ে সেই পথ থেকে সে বিচ্যুত হবে না। অবশ্য এর পরিণতি শুধু তাকে দগ্ধ করেছে এমন নয়, বিধ্বস্ত করবে দুই নারী-কল্যাণী ও সন্ধ্যার জীবনকেও। অভিযোগ নয়, অভিমানের স্রোতে ভাসতে ভাসতে ভূপেন বীরভূমের এক গণ্ডগ্রামে এসে হাজির হয়েছে,তবু জ্ঞানের আলোই সে জ্বালতে চেয়েছে। অবশ্য প্রতিমুহূর্তে আঘাত এসেছে সহকর্মীদের পক্ষ থেকে। তবু শত আঘাত, অপবাদে অবিচল থেকে শিক্ষকতার আদর্শকে সে রক্ষা করতে চেয়েছে।

সন্ধ্যার সঙ্গে পরিচয় ভূপেনের জীবনে এমন একটি অধ্যায়ের সূচনা করবে যেটির ফল সুদূরপ্রসারী। তবে ভূপেন ছাত্রী হিসেবে সন্ধ্যাকে পেয়ে দীর্ঘদিনের পড়ানোর খেদটি ভুললো। গতানুগতিক পাঠাভ্যাস থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাস-সাহিত্যের বিশাল প্রান্তর থেকে সে রত্ন সংগ্রহ করে আনল সন্ধ্যার জন্য। ইংরেজী বইয়ের আখ্যানভাগ শুনতে শুনতে কিশোরী সন্ধ্যার মনের ভিতরে কখন যে এক অন্যভুবন গড়ে উঠেছে তার রসায়ন বোধহয় তাদের অগোচরে থেকে গেছে। শ্রদ্ধেয় বোধহয় এইভাবেই অবচেতনে হৃদয়ের অর্ঘ্যটি পেয়ে যান।

মোহিতবাবুদের পরামর্শে কলেজে ভূপেন ইংরেজি অনার্স নিয়ে পাঠ শুরু করে, আর সেই সুযোগেই লেখক কলেজের পাঠচর্চার জগৎটিকে আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দিলেন। কলেজের অধ্যাপকেরা রবীন্দ্রস্তুতি বা বিদূষণে একপাক্ষিক। এছাড়া অধ্যাপককুল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, জাদুবিদ্যার খেলা দেখানো, ওকালতি করা- সবকিছুতেই অভ্যস্ত। সর্বোপরি অর্থপুস্তক লেখার বিষয়ে এঁদের আগ্রহ সমাধিক। পয়সা রোজগারের নানাবিধ ফন্দিফিকিরে তাঁরা সর্বদা ব্যস্ত ''এক কথায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছাড়া আর সবই করেন।'' (২) ফলে পাঠ্যপুস্তক-নোট লিখে অসংখ্য টিউশনি পড়িয়ে অধ্যাপকগণ এতোটাই জখম হয়ে থাকেন যে পাঠকক্ষে তাঁরা ক্লান্ত। তবে রাজনীতি, সিনেমা এবং পরনিন্দাতে ঘাটতি ঘটে না বলেই ''অধ্যয়ন যে তপস্যা,তাহা ছাত্ররাও ভুলিয়াছে,অধ্যাপকেরাও ভুলিতে বসিয়াছেন।'' (৩) ভূপেনকে সবচেয়ে অবাক করে ছাত্রদল। এই ছাত্রদলের যে আচরণ লেখক তুলে ধরেছেন সেটি সর্বকালের। লেখকের উক্তিটি স্মরণীয় ''ছেলেগুলি কলেজে আসে যেন পড়াশুনা ছাড়া আর সবকিছুর জন্য।'' (৪) দেশপূজ্য নেতাদের দুর্নাম করতে এদের জুড়ি মেলা ভার। কতকগুলি বাঁধি বিলেতি বুলি এদের সম্বল। ভূপেন এদের মাঝে স্বস্তি পায় না, শেষাবধি মোহিতবাবুর ''ওদের জন্য দুঃখ করো'' (৫) এই বাক্যে তৃপ্তি খুঁজতে চায়। কলেজ জীবনের তিক্ততার মাঝে যে শিক্ষা ভূপেন পেয়েছিল মোহিতবাবুর বাক্যে ''সব কলেজেই ভালো অধ্যাপক আর ভালো ছাত্র আছেন বাবা, খুঁজে নিতে হয়।'' (৬) ঐ বাক্যটিই ভূপেনের আজীবনের সম্বল হয়ে রইলো।

অধ্যাপক হবার স্বপ্নে ভূপেন যখন মশগুল এবং কিশোরী ছাত্রী সন্ধ্যা যখন এই ভাবনায় ক্রমাগত ইন্ধন দিচ্ছে তখন বোধহয় অদৃষ্ট গোপনে মুচকি হেসেছিলেন। ফলভোগ করতে হল ভূপেনকে, সন্ধ্যার সঙ্গে দূরত্ব তো বাড়লই উপরন্তু এম.এ পড়া ছেড়ে, সন্ধ্যাদের সংসর্গ ত্যাগ করে এই আত্মসম্মানী মানুষটি বীরভূমের এক গণ্ডগ্রামে শিক্ষকতা করতে গেল। এই পেশা সম্পর্কে কলকাতার মানুষ অবিনাশবাবু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন ''ইস্কুল-মাস্টারদের লোকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। মাস্টার শুনলেই সবাই মুখ টিপে হাসে-ঠাট্টা করে। ... যাদের কিছু জোটে না তারাই যায় মাস্টারি করতে।'' (৭) তবু এই গভীর অনিশ্চিত পথেই ভূপেন এগিয়ে গেল।

ভূপেন সেই অজগ্রামে গিয়ে দেখে স্কুলটিকে কীভাবে খ্যাতিসর্বস্ব করা যায় সে বিষয়ে কারোর আগ্রহ নেই। দুনিয়ার খবরের চেয়ে শিক্ষককুল গ্রাম্যগুজব নিয়েই মশগুল। লাইব্রেরীর অবস্থা সঙ্গীন, হেডমাস্টারের পছন্দে সেখানে ধর্মগ্রন্থের আধিক্য। জ্ঞানলাভ সম্পর্কে সেখানে সকলেই উদাসীন। বুনিয়াদী শিক্ষাও সেখানে বিপুলভাবে অবহেলিত হয় বলেই শিক্ষার বনেদ প্রথম থেকেই দুর্বল। প্রাইভেট টিউশনের অভিশাপ গ্রামাঞ্চলে না থাকলেও জমি-জমার চাষাবাদ নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই ব্যস্ত। ফলে কোনো মতে পরীক্ষা বৈতরণী উত্তীর্ণ হতে উভয়েরই আগ্রহ 'ইম্পট্যান্ট'-'ভেরি ইম্পট্যান্ট' প্রশ্ন নিয়ে। বুদ্ধিমান ছাত্র যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর খোঁজে তবে তাকে শিক্ষক এই বলে বসিয়ে দেন ''ও-সব কোশ্চেন আসে না।তার চেয়ে... যেগুলো বলি দাগ দিয়ে নে।'' (৮)এই পরিবেশের মধ্যেও ভূপেন এইভেবে অনড় থাকে যদি জ্ঞানের আলোর সন্ধান সে একজনের মধ্যেও জাগিয়ে দিতে পারে। অবশ্য ভূপেনের শিক্ষাদানের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে কলঙ্কিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সহকর্মীবৃন্দ। ভূপেনের সৌভাগ্য পদনের মতো ছাত্র সে পেয়েছে যে প্রিয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করে-এখানেই ভূপেনের শিক্ষাদানের সার্থকতা। পাঠদান যে একটি শিল্প, মুখস্থ করায় যে কোনো সার্থকতা নেই, মানেবই নির্ভরতা যে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কলঙ্কিত করে একথা সেক্রেটারির বিরাগভাজন হয়েও বলতে ভূপেন নির্দ্বিধ। এক্ষেত্রে লেখক সেক্রেটারির পদরহস্যকেও উন্মোচিত করলেন। লেখাপড়ার সংস্রববর্জিত হয়েও শুধুমাত্র অর্থবৈভবে বিত্তশালী হয়ে ঐ পদে আসীন হয়ে সকলের উপর প্রভূত্ব করা যায়, ছড়ি ঘোরানো যায়।

ভূপেন নিজ অভিজ্ঞতায় বুঝে যায় গ্রাম্য পরিবেশ ও তার মধ্যেকার শিক্ষায়তনগুলি আজ আদর্শহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই পরিবেশে তার ভালো লাগে বিজয়বাবুর সাহচর্য। বিজয়বাবুর কন্যা কল্যাণীকে নিয়ে শিক্ষক ভূপেন যে কদর্যতার সম্মুখীন হবে তাতে পল্লীগ্রামের মহান শিক্ষককুল বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কল্যাণীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া, সেই বিবাহে সন্ধ্যার হাজির হওয়া কাহিনীর ত্রিভুজ সম্পর্ককে অন্যতর মাত্রা দেবে। আবার সন্ধ্যার পিতামহ মোহিতবাবুর মৃত্যুর পূর্বে সন্ধ্যার সম্পত্তির অভিভাবক হিসেবে ভূপেনের নাম উল্লেখ করে যাওয়ায় তাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে জট তৈরী হল সেটির প্রভাব গড়াবে উপন্যাসের অন্তিম পর্যন্ত।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বাদ দিয়েও বলতে হয় ভূপেন সেই অজগ্রামে বসেও সালেক আর পদনের মতো যোগ্য ছাত্র তৈরী করতে পেরেছিল। সালেক বিধর্মী বলে অন্যদের মতো ভূপেন তাকে দূরে সরিয়ে রাখেনি, উপরন্তু সালেকের কঠিন পীড়ার কালে সে তাকে স্নেহশীল অভিভাবকের মতো সেবা করেছিল। এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অন্যরা বিষদৃষ্টিতে দেখে বিভেদ তৈরী করে দিতে চেয়েছে। তবে ভূপেনের চেষ্টা সফল হয়েছে,সালেক আর পদন দু'জনেই পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ায়।

সন্ধ্যা-ভূপেন সম্পর্কটি বেদনামণ্ডিত করলেও সেই বেদনার মধ্যে সেই শক্তি ছিল যা মানুষকে আত্মশক্তিতে উজ্জ্বল করে তোলে। অন্তঃসারশূন্য সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় ভূপেন কোন্ আদর্শের দ্বারা নিজেকে সঞ্জীবিত রেখেছিল এবং নিজ শিক্ষকতা পেশার প্রতি সশ্রদ্ধ ছিল সেই গোপন কল্যাণীশক্তিকে চিনতে আমাদের দেরী হয় না।

তথ্যসূত্র:

১. প্রসূন ঘোষ; 'বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষকতার সেকাল-একাল', 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্-শারদ ১৪১৯, সম্পাদনা- তাপস ভৌমিক, কল-৫৯, পৃঃ- (১৭২-১৮৫)।

২. গজেন্দ্রকুমার মিত্র; 'রাত্রির তপস্যা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কল-৭৩, পঞ্চম পেপারব্যাক মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৫, পৃঃ -২০।

৩. তদেব।পৃঃ-২১।

৪. তদেব। পৃঃ-২১।

৫. তদেব। পৃঃ-২২।

৬. তদেব। পৃঃ-২৩।

৭. তদেব। পৃঃ-৪১।

৮. তদেব। পৃঃ-৬০।

অ-চর্চিতা এক বীরাঙ্গনা সৌদামিনী পাহাড়ী: প্রেক্ষাপট অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম

অশ্রুকণা ঘোষ
গবেষক, ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: জগত, সন্তান, পরিবার, দেশ ও জাতি গঠনে নারীর অসামান্য অবদান অনস্বীকার্য। সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই আমরা দেখি সভ্যতার সৃষ্টিতে, বিকাশে, সম্প্রসারণে মাতৃশক্তি তাদের মহামূল্য ও মৌলিক অবদান রেখেছেন। কেবলমাত্র সমাজজীবনে, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলার অঙ্গনে নয় রাজনীতিতেও নারীর অবদান উল্লেখযোগ্য। বিশেষত বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল থেকে এক মাতাকে (ভারতমাতাকে) মুক্ত করার জন্য ভারত তথা বাংলার শত শত মাতার আত্মত্যাগ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বরাবরই নীরব থেকেছেন। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলোচিত হলেও স্থান পেয়েছেন প্রান্তবাসিনী হিসেবে। পরিবারের ভেতরে ও বাইরে তাঁদের অদম্য লড়াইয়ের কথা আচর্চিতই থেকে গেছে। তাই সময় এসেছে নৈঃশব্দ ভেঙে ইতিহাস পুনর্লিখনে। মেদিনীপুরের মাটি শুধু বীর প্রসবিনীই নয়, অনেক বীরাঙ্গনাও জন্মেছেন এই মাটিতে, যাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এরকমই একজন অগ্নিশিখাময়ী সংগ্রামী নারী চরিত্র হলেন সৌদামিনী পাহাড়ী। ইতিহাস এই প্রবীণা বিধবা মহীয়সীর মহামূল্য মৌলিক অবদান সম্পর্কে বিস্মৃতপ্রায় হলেও আমি এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে তাঁর কর্মকুশলতা তুলে ধরে কিছুটা ভারমুক্ত হব।

সূচক শব্দ: সৌদামিনীদেবী, বৈধব্য, চারণ কবি, লবণ আইন অমান্য, শোভাযাত্রা, কারাবরণ, দুর্ভিক্ষে ত্রাণ বিলি।

মূলপাঠ:

"বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম

জগত, সন্তান, পরিবার, দেশ ও জাতি গঠনে নারীর অসামান্য অবদান অনস্বীকার্য। কবি নজরুল এই জগতে বিবিধ সৃষ্টিতে নারীর আত্মত্যাগ ও সম অবদানের কথা স্মরণ করে লিখেছেন-

"কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা ?

কোন কালে একা হয় নি ক ? জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী”।

অর্থাৎ পরাধীন ভারতমাতার দাসত্ব লেখা ঘোচাতে গিয়ে ভারতের কত শত নারী তাদের নয়নের মনি, অন্ধের যষ্টি, নিজেদের সোনার সংসার, সুখের নীড় নিজ হাতে ভেঙে ফেলে আপনাকে রিক্ত করে বিলিয়ে দিয়েছেন তার অবধি নেই। তাদের কথা না লেখা হলেও তাঁরা আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে বেঁচে থাকবেন।ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। প্রায় ৭৫ বছর অতিক্রান্ত। ‘পরাধীনতা’ শব্দটি আজ আর তেমনভাবে হয়তো মনকে নাড়া দেয় না। কিন্তু এমন একটা সময় গেছে শুধু ঐ স্বাধীন ভারত আনবার জন্য জাতির মর্মে মর্মে জেগেছিল আত্মাহুতি দেবার নীরব সাধনার দৃঢ় সংকল্প। শত শত বীরের আত্মাহুতির ভিত্তিপ্রস্তরের উপর আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে আছে। ঐ সমস্ত বীরদের মধ্যে নবজাগ্রত নারীদেরও একটি গৌরবময় অংশ ছিল। কিন্তু তাঁদের অবদান সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বরাবরই নীরব থেকেছেন। আর কিছু ক্ষেত্রে আলোচিত হলেও স্থান পেয়েছেন প্রান্তবাসিনী হিসেবে। পরিবারের ভেতরে ও বাইরে তাঁদের অদম্য লড়াই-এর কথা অচর্চিত থেকে গেছে। তাই সময় এসেছে নৈঃশব্দ ভেঙে ইতিহাস পুনর্লিখনে। মেদিনীপুরের মাটি শুধু বীর প্রসবিনীই নয়, অনেক বীরাঙ্গনাও জন্মেছেন এই মাটিতে, যাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছকরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এরকমই একজন বীরাঙ্গনা হলেন সৌদামিনী পাহাড়ী। আমি আমার এই গবেষণা মূলক প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী স্বাধীনতা অর্জনের যে সংগ্রাম, বাংলাদেশ ছিল তার প্রথম সারিতে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষের বহু আগে থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ তথা বাংলার নারীরা তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিলেন। যেমন, চুয়াড় বিদ্রোহে রানী শিরোমনি, সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহে দেবী চৌধুরানী প্রমুখা। তবে জাতীয়তাবাদী আদর্শের সঙ্গে নারীশক্তির যোগসূত্র প্রথম স্থাপন করেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে ‘বন্দেমাতরম্’ স্তোত্র রচনার করে মাতৃশক্তির আরাধনার মাধ্যমে।[১] এটি দেশমাতাকে রক্ষার আহ্বান ছিল, নারীদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান নয়, তবে নারীত্বের আদর্শের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের যোগসূত্র ছিল। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যখন ইলবার্ট বিলের সমর্থনে ভারতীয় বিচারকের ইউরোপীয়দের বিচারের সুযোগের দাবীতে বেশ কয়েকজন বাঙালী নারী ভাইসরয়কে চিঠি লেখেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার, নারী কল্যাণমূলক নানান আইন প্রণয়ন প্রভৃতির ফলে অন্তঃপুর থেকে রাজনৈতিক মঞ্চে নারীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মানসিক ও সামাজিক বিপ্লবের সুযোগ পেয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা বেরিয়ে এলেন। ১৮৮৯ খ্রি: বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ৬ জন নারী যোগদান করেছিলেন।[২]এঁরা ছিলেন-কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, পন্ডিতা রমাবাই, রমাবাই রানাডে, বিদ্যাগৌরী নীলকন্ঠ এবং শ্রীমতী নিকম্ব প্রমুখা।[৩] এই প্রথম ভারতীয় তথা বাঙালী মহিলারা সংগঠিতভাবে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রি: কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে নারীদের প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করার অধিকার স্বীকৃত হয়। ফলে ঐ অধিবেশনেই কাদম্বিনী দেবী কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রতীকস্বরূপ আগত অন্যান্য প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা দিয়ে সম্বর্ধনা জানান।[৪] সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এইভাবেই একজন বঙ্গমহিলা মেয়েদের প্রকাশ্যে অংশগ্রহণের বাস্তব পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন।

মেদিনীপুর তথা বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অগ্নিবাহিকা হলেন এগরা থানার প্রবীণা বিধবা মহীয়সী সৌদামিনী পাহাড়ী। যেসব বাঙালী নারী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে গৃহসুখ ত্যাগ করে পুরুষের পাশে পাশে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন সৌদামিনী দেবী। নারী দেহে ও মনে স্বভাব কোমলা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পুরুষের কর্মকুশলতা থেকে কম যান না- তার জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি সৌদামিনী দেবী।

সৌদামিনী দেবীর জন্ম ১৮৮৬ খ্রি: (বাংলা ১২৯৩ সনে) ভগবানপুর থানার বিজয়নগর গ্রামের ধনে-মানে প্রতিষ্ঠিত এক জমিদার ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা ছিলেন দ্বারিকানাথ পাহাড়ী, মাতা ছিলেন কাদম্বিনী দেবী। তাঁর ভ্রাতা ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মুরারীমোহন এবং ভ্রাতৃবধূ বরদাসুন্দরী দেবী।[৫]সৌদামিনীর দেবীর শিক্ষারম্ভ গ্রামের পাঠশালায়। তারপর কিছু শিক্ষা পান বৌদিদি বরদাসুন্দরীর কাছে। বয়সে বড় বৌদিদি বরদাসুন্দরী শিক্ষিতা, তাঁর কাছেই সৌদামিনী দেবী রামায়ণ, মহাভারত, গীতা পড়তে শেখেন।[৬]

তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় সৌদামিনীর ১১ বছর বয়সে বিবাহ হয় এগরা থানার বিদূরপুর গ্রামের নিবাসী নরেন্দ্রনাথ পাহাড়ীর সঙ্গে। দুর্ভাগ্যের বিষয় মাত্র সাত-আট বৎসর পরে অসুস্থতাবশতঃ স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু হয়। এই সময় তাঁর বয়স ১৯ বা ২০। তিনি তাঁর কন্যা প্রভাবতীকে নিয়ে পিত্রালয় বিজয়নগরে দাদা বৌদির স্নেহের ছায়ায় চলে আসেন। তবে তিনি স্বামী শ্বশুরের ভিটে ত্যাগ করেন নি। তিনি স্বামীর অংশের পৃথক বাস্তুতে থাকতেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ির একমাত্র জ্যৈষ্ঠ ভাসুর গ্রামের সদাশয় মানুষ গজেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি স্নেহশীল ছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানকে সমর্থন করতেন। সৌদামিনী দেবী আন্দোলন করে গ্রেপ্তার হয়ে জেলের ভিতর কাটালে গজেন্দ্রনাথ বাবু তাঁকে টাকা-পয়সা, বস্ত্র পাঠাতো। সৌদামিনী দেবীও চিঠি লিখতেন।[৭]

সৌদামিনী দেবী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পাঠ পান তাঁর দাদা মুরারীমোহনের কাছে। বৈধব্যের কালোমেঘ যখন তাঁর জীবনকে অন্ধকারময় করেছে, তখন তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা কন্যা প্রভাবতীকে নিয়ে কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় জীবন যাপনের মধ্যে প্রতিদিন গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পড়া অভ্যাস শুরু করেন। এইসময় বিজয়নগরে থাকাকালে বাড়ীতে দাদার অতিথি হিসেবে বিভিন্ন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিনিয়ত যাতায়াত ও আলোচনা তাঁর অন্তরের অগ্নিশিখাটিকে প্রজ্জ্বলিত করে জীবনকে আলোর পথে নিয়ে যায়। মুরারীমোহন প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে আরো উৎসাহিত করেন। তিনি দেশমাতৃকার আহ্বান শুনতে পান অন্তরের গোপন গহনে।[৮]

সৌদামিনী দেবীর রাজনৈতিকজীবন ছিল বর্ণময়। তিনি ছিলেন একাধারে মনোমুগ্ধকর গায়িকা, সুবক্তা অন্যদিকে ব্যতিক্রমী এক যুক্তিবাদী।[৯] তাঁর এই অনন্য গুণগুলি তাঁকে সমসাময়িক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে স্থান করে নিতে সাহায্য করেছিল।

সৌদামিনী দেবী তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কাঁথির বিশিষ্ট নেতা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র মাল, হরিপদ পাহাড়ী, বসন্তকুমার দাস, ত্রৈলোক্যনাথ প্রধান, ডাঃ রাসবিহারী পাল, ভীমচরণ পাত্র, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, নটেন্দ্রনাথ দাস, হৃষিকেশ চক্রবর্তী, পীতবাস দাস, ডাঃ রাখালচন্দ্র পাল, রামসুন্দর সিং, বলাইলাল দাসমহাপাত্র প্রমুখের সান্নিধ্যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এছাড়াও গীতা পাল, বরদাসুন্দরী, রাজবালা পাহাড়ী, ধীরেনবালা দাস, সরস্বতী মিশ্র প্রমুখা মহিলা কর্মীদের বিভিন্ন বৈঠকে কখনও কখনও তিনি সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছেন।[১০]

১৯৩০ সালে একটি বিশেষ ঘটনায় চারণ কবি মুকুন্দ দাসের সঙ্গে সৌদামিনী দেবীর পরিচয় ঘটে। ঐ বৎসরে জমিদার গঙ্গাধর নন্দ মহাশয়ের প্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর হাইস্কুলে ১৫ দিন ব্যাপী এক স্বদেশীমেলায় চারণকবির যাত্রার ব্যবস্থা হয়। সৌদামিনী এবং অন্যান্য মহিলা কর্মীদের আহ্বানে চারণকবি বিজয়নগর গ্রামের নিকটে পাঁউশী সেচ বিভাগের মাঠে স্বদেশী যাত্রা করেন। সৌদামিনী দেবী এবং বরদাসুন্দরীর নারী বাহিনীর উদ্যোগে উপস্থিত অধিক সংখ্যক মহিলার যাত্রা দেখার সুব্যবস্থায় চারণ কবি প্রীত হলেন। চারণকবি যাত্রার আসরে তাঁর অন্যান্য গানের পরে গান ধরলেন-'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে/মাতঙ্গী মেতেছে সমর রঙ্গে'। এই গানটির দ্বিতীয় লাইনে, 'মাতঙ্গী মেতেছে সমর রঙ্গে'-এর পরিবর্তে 'সৌদামিনী মেতেছে সমর রঙ্গে' এই গান ধরার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের করতালির পর করতালি এবং উল্লাস ধ্বনিতে আসর মুখরিত হয়ে উঠল। সৌদামিনী সমর রঙ্গে মেতেছেন- চারণকবির এইরূপ প্রশংসায় এক বিরাট পুলিশ বাহিনী তাঁর পিতৃগৃহে গিয়ে মুরারীমোহন এবং বরদাসুন্দরীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে তাঁদের না পেয়ে ঘরের কিছু আসবাবপত্র পুড়িয়ে

দেয় এবং চাল, কলাই সরিষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য একসঙ্গে মিশিয়ে নষ্ট করে। ঐ সময় মুরারীমোহনের পরিবারের সকলে এবং সৌদামিনী দেবী কিছুকাল আত্মগোপন করে থাকেন।[১১]

সৌদামিনী দেবীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় লবণ আইন ভঙ্গের মধ্য দিয়ে। ৬ই এপ্রিল, ১৯৩০ সালে পিছাবনীতে লবণ আইন আমান্য আরম্ভ হয়, মে মাসে ভগবানপুরের বায়েন্দা, একতারপুর, শিউলিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে লবণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়, ধীরা দাসের নেতৃত্বে একদল মহিলা লবণ আইন ভঙ্গ করতে যান নোনা জল ফুটিয়ে; তাঁরা হলেন সৌদামিনী, বরদাসুন্দরী (সৌদামিনীর বৌদি), কৌশল্যা ও শৈলবালা দাস, ভগবতী শাসমল প্রমুখ। পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে পরে কিছুদূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়, তাঁদের লবণ তৈরীর হাঁড়ি-কড়া প্রভৃতি জিনিসপত্র ভেঙে নষ্ট করে দেয়। এটাই ছিল সৌদামিনী দেবীর প্রথম গ্রেপ্তারের ঘটনা।[১২]

১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে আইন অমান্য আন্দোলন একটু থেমে যায়। তখন ভগবানপুর থানার ধীরা দাসের নেতৃত্বে সৌদামিনী, অন্নপূর্ণা, ভগবতী শাসমল প্রমুখা ৭০ জনের একটি নারী বাহিনী গ্রাম পরিক্রমা করেন। কাঁথির দারুয়া ময়দানে স্বেছাসেবী প্রশিক্ষণ শিবির হলে সৌদামিনী দেবী সেখানে যোগদান করেন ও শিক্ষা গ্রহণ করেন।[১৩]

১২ ই মার্চ, ১৯৩২ সালে ভগবানপুর থানার দগড়া কেন্দ্রে লবণ আইন অমান্য করা হয়। শ্রীযুক্তা ধীরা দাস, পীতবাস দাস ও সৌদামিনী দেবী ৩ টি পৃথক পৃথক শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় বাসুদেববেড়ায় প্রায় ৭০০ পুরুষ ও ৩০০ মহিলার উপস্থিতিতে অন্নদাদেবীর সভানেতৃত্বে এক সভায় মহিলা কর্মী রাজবালা পাহাড়ী, সরস্বতী মিশ্র, শরৎকুমারী পট্টনায়ক, বরদাসুন্দরী, সত্যভামা মিশ্র এবং ধীরেনবালা দাস বক্তৃতা করেন-সৌদামিনী দেবী এবং তাঁর সহকর্মী সুবোধবালা মাইতি উভয়ে সভায় জাতীয়তা বোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।[১৪]

২৭ শে মার্চ, ১৯৩২ খ্রি: সৌদামিনীর নেতৃত্বে ১৫০ জন মহিলা এবং ১০০ জন পুরুষের একটি শোভাযাত্রা পটাশপুরের কয়েকটি গ্রাম পরিক্রমা করে । ২৮ শে মার্চ পটাশপুরের কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করেন সৌদামিনী দেবী।[১৫]

৬ ই মে, ১৯৩২ খ্রি: অজানবাড়ী আবগারী দোকানে পিকেটিং কালে কয়েকজন গুর্খা সহ পুলিশ এসে এক স্বেচ্ছাসেবককে কয়েক ঘা বেত মারে এবং সৌদামিনী দেবী সহ চন্দ্রাবতী, পার্ব্বতী, সরলাদেবী প্রমুখাকে গ্রেপ্তার করে।[১৬]

১৯৩২ খ্রি: ১০ই মে শ্যামহরিবাড়, ১১ই মে মহেশপুর ও ১২ই বাসুদেবপুর সভায় সৌদামিনী দেবী বক্তৃতা করেন।[১৭]

১০ ই জুন, ১৯৩২খ্রি: কাঁথির দারুয়া ময়দানে মহকুমা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা কর্মীরা পতাকা তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি হয়,

মারধোর খেয়েও সৌদামিনী, কাদম্বিনী, রতনমনি দাস, অহল্যা পড়া প্রমুখা অসম সাহসিকতায় অত্যাচারিত হয়েও পতাকা উত্তোলন করেন।[১৮]

১৯ শে জুন, ১৯৩২ খ্রি: এগরায় রুক্মিনীপুর গ্রামে ১৫০০ জন মহিলার রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রমনীবালা ভূএ্যা, রমনীকান্ত মহাপাত্র, যোগেশচন্দ্র কর, শ্রীকান্ত খাঁড়া, সৌদামিনী দেবী জোরালে ভাষায় বক্তৃতা করেন।[১৯]

৪ ঠা জুলাই, ১৯৩২ খ্রি: বিকেল ৪ টার সময় নিখিল ভারত বন্দী দিবস উপলক্ষ্যে সৌদামিনী দেবীর নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা এগরা বাজারে 'হটনাগর' শিবমন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়। সেখানে ঘন্টাব্যাপী সভা চলতে থাকলে পুলিশ এসে সকলকে সভা ত্যাগ করার আদেশ দেয়। কেউ সভা ত্যাগ না করলে সৌদামিনী দেবী, রমনীবালা দেবী, রমনীবালা ভূএ্যা, তিলোত্তমা দাস ও ২৬ জন স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। যদিও রাত্রি ১০ টায় সকলকে ছেড়ে দেয়।[২০]

৬,৭,৮,৯ ও ১৩ ই জুলাই যথাক্রমে রুক্মিনীপুর, এরেন্দা, কৈঁথোড় ও নারাজপুরে সাধারণ সভা হয়। অধিকাংশ সভায় শ্রীযুক্তা সৌদামিনী পাহাড়ী, রজনীবালা ভূএ্যা, তিলোত্তমা খাঁড়া বক্তৃতা দেন।[২১]

১৯৩০ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর চোরপালিয়া গ্রামে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করায় যে ৬ জনকে পুলিশ পুকুরে পিটিয়ে মারে, তাঁদের স্মরণে প্রতি বৎসর সভা হত। ১৯৩২ সালে ঐ দিন (৭ ই সেপ্টেম্বর) স্মরণসভায় সৌদামিনী দেবী বক্তৃতা দিতে গেলে ট্যাক্স বর্জন বিষয়ে কিছু বলতে পুলিশ নিষেধ করে। সৌদামিনী দেবী বলেন-"ট্যাক্স বন্ধের কারণেই এই সকল লোকের মৃত্যু হয়েছে, অতএব ট্যাক্স বন্ধের কথাই হবে"। তিনি তাই করেছেন, তাঁর সতেজ বিদ্রোহী কণ্ঠস্বরে কেউ বাধা দিতে পারে নি। ট্যাক্স বন্ধ, বিদেশী পণ্য বর্জন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, হরিজন ও হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ্য তাঁর বক্তৃতার বিষয়। প্রতি বক্তৃতায় গীতার বাণী তাঁর কণ্ঠ হতে অমৃতধারার মতো ঝরে পড়ত। কে বলবে তিনি সামান্য লেখা পড়া করা এক গ্রাম্য মহিলা।

২৭ শে সেপ্টেম্বর থেকে ২ রা অক্টোবর, ১৯৩২ পর্যন্ত এক সপ্তাহ অস্পৃশ্যতা নিবারণী সভা হয় জেড়থান, তেলামি, দুবদা, পানিপারুল, পাঁচরোল, বাসুদেবপুর, এগরা, তাজপুর প্রভৃতি স্থানে, সব জায়গায় তিনি উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করেন। তাঁর নিজের গ্রাম বিদুরপুরেও এরূপ সভায় বক্তৃতা করেন।[২২]

এই ঘটনার পর কিছুমাসের জন্য সৌদামিনী দেবী তাঁর কার্যকলাপ বন্ধ রাখেন। ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩২ খ্রি: কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটি বিদেশী পণ্য ও মদ্য বর্জন এবং স্বদেশী জিনিস ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য একটি সভার আহ্বান করে। স্থির হয় সৌদামিনী দেবীর সভাপতিত্বে বাগবাজারে (কাঁথি) ঐ সভা অনুষ্ঠিত হবে। পুলিশ জানতে পেরে ঐ অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করে ও সভা

নিষিদ্ধ করে। নিষেধ না মেনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সৌদামিনী দেবী ও ডাঃ রাখালচন্দ্র পাল সভায় বক্তৃতা করেন, সভা পরিচলনা করেন। পুলিশের লাঠি এসে পড়ে তাদের উপর- কিল, চড়, লাথি, ঘুঁষিতে রক্তাক্ত কলেবর।[২৩] এসত্ত্বেও সৌদামিনী দেবীর মুখ বন্ধ করার জন্য পুলিশ তাঁর মুখ সজোরে টিপে ধরে। তাঁর মুখে রক্ত বেরোয়, পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময় সৌদামিনী দেবী পুলিশকে বলেন,-'তোমরাও ভারত মাতার সন্তান, স্বাধীনতা আসিলে তোমাদের সন্তানগণও তাহা ভোগ করিবে, কিন্তু তোমরা যেরূপ মনুষ্যত্ব হারাইয়াছ দেখিতেছি, তাহাতে আমার মতে তোমাদের মতো সন্তান ভারতের বুকে জন্ম না লইলেই ভালো হইত"।[২৪]দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনের জন্য দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার এরূপ দৃঢ় নারীচরিত্রের উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

কাঁথি থানার কুখ্যাত সিপাই বিলায়েত সৌদামিনী দেবীকে প্রহারের সময় দুশ্চরিত্রা নারীদের সঙ্গে তুলনা করে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিলে পথচারীদের মধ্যে আহত চাঁদসীর ডাক্তার চন্দ্রশেখর মজুমদার প্রতিবাদ করে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন,-'আপনাদের সামনে মাতৃতুল্য মহিলাকে অপমান করছে, আপনারা সহ্য করছেন কী করে?' এর ফলস্বরূপ পুলিশ চন্দ্রশেখরকে গ্রেপ্তার করে কিছু দিন থানায় আটকে রাখে।[২৫]

এরপর সৌদামিনী দেবী ও ড. রাখাল পাল মহাশয়কে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় জনতার উদ্দেশ্যে সৌদামিনী দেবী বলেন-"গান্ধীজি জেলে পচিতেছেন (গান্ধীজি তখন যারবেদা জেলে বন্দী, ১৯৩২ সালে ১৯ শে সেপ্টেম্বর থেকে গান্ধীজি অনশন করছেন), যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। সুতরাং প্রতিটি জিনিস কিনিবার সময় দেশবাসী চিন্তা করিয়া দেখিবেন সেটি ভারতে প্রস্তুত কিনা। যে কাঁথি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে এত অগ্রণী, তাহাকে বিলাতিবর্জনের জন্য অনুরোধ করিতে লজ্জা হয়"।[২৬]

১৪৪ ধারা অমান্য করার অপরাধে ১৯৩২ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর কাঁথির ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সৌদামিনী দেবী এবং রাখালচন্দ্রের বিচার শুরু হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট নেত্রীকে দোষী কিনা প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, "এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে আমি কয়েকটি কথা আপনাদের নিকট জানতে চাই। সরকারের আইন অমান্য করিলে আপনারা আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিতে পারেন। মেয়ে মানুষকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করিবার কোন আইন আপনাদের আছে কি?" ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, "লাঠি চালাইবার আইন নাই তবে প্রয়োজনে মৃদু লাঠি প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা আছে"। সৌদামিনীর প্রশ্ন-"তবে মানুষের মাথা ফাটাইয়া জনতা অপসারণ করা হইল কেন?" ম্যাজিষ্ট্রেট রাগতভাবে বলেন, "আপনাকে এ সকল কথা জিজ্ঞেস করি নাই। আপনি দোষী কিনা বলুন"। সৌদামিনী দেবী দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেন, "আমি আপনাদের আইন অমান্য করিয়াছি। আপনি আইন অনুসারে ব্যাবস্থা করিতে পারেন"।[২৭]

বিচারে কাঁথি মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট তথা এস.ডি.ও. (S.D.O.) D.N. Sen I.P.C. 188/51ধারা অনুযায়ী সৌদামিনী দেবীকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁকে সি-ক্লাস বন্দী রূপে গণ্য করা হয়।[২৮]এরপর কারাদন্ড ভোগের জন্য সৌদামিনী দেবীকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। এরপর তাঁকে হিজলী, দমদম এবং বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।[২৯]

বহরমপুর জেলের অভ্যন্তরেও সৌদামিনী দেবী অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। এইসময় তিনি গান্ধীজি প্রদর্শিত অহিংস সত্যাগ্রহের পথ ত্যাগ করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ অবলম্বন করেন। বহরমপুর জেলের সুপার বিল সাহেব মেয়েদের লক্ষ্য করে কুৎসিত কথা বলতেন এবং অশালীন আচরণ করতেন। তাই বিল সাহেবকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য সৌদামিনী দেবী এবং অন্যান্যদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী অধিকারী, শৈলবালা মল্লিক, মৃণালিনী দেবী, রেণুকা সাহা জেলের বাইরে থেকে কাঁঠালের মধ্যে একটি পিস্তল এনে সুপারকে হত্যার চেষ্টা করেন-কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নারীজাতির আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সৌদামিনী দেবী সহ অন্যান্যদের প্রয়াস ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।[৩০]

সৌদামিনী দেবী একবার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সান্নিধ্য লাভের মহান সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে ১২ ই এপ্রিল সুভাষচন্দ্র বসু কাঁথিতে আসেন। সেই দিন সন্ধ্যায় বালিঘাইয়ের জমিদার ধনাঢ্য ব্যক্তি কংগ্রেস কর্মী চৈতন্যচরণ ধাওয়ার তালবাগানের মাঠে সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। মহিলা কর্মীদের পক্ষে তাঁকে মাল্যভূষিত করেন বৃদ্ধা সৌদামিনী। অভিভূত সুভাষচন্দ্র সৌদামিনী দেবীকে সামনে বসিয়ে বাক্যলাপ করেন এবং তাঁর নাম লিখে রাখেন নিজ দিনলিপিতে।[৩১]

সৌদামিনী দেবী জেল থেকে মুক্তিলাভ করে বাড়িতে ফিরে এলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, তাই তিনি ১৯৪২ এর আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এসত্ত্বেও তাঁর লড়াই থেমে থাকেনি। এগরা ও নিকটবর্তীস্থানে সভাসমাবেশে সকলকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতেন। ১৯৪২ সালে ভারতছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে কাঁথি থানার পুলিশ মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। এর প্রতিবাদে সৌদামিনী দেবী কাঁথির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মিছিল করে এই ধরণের অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেই দাবী করেন। এই ১৯৪২ এর ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় সৌদামিনী দেবীর দাদা মুরারীমোহনের নেতৃত্বে ২০০০ কংগ্রেস কর্মী পাঁউশীর সেচবিভাগের ডাকবাংলোটির আসবাবপত্র ভাঙচুর, নথিপত্রে অগ্নি সংযোগ করে এবং ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে আটক করে রাখে। এই অপরাধে মুরারীমোহন এবং তাঁর পুত্র অনন্ত গোবিন্দ এবং গোপালের উপর অকথ্য নির্যাতনের পর সকলকে কাঁথি পাঠানো হয়। সেখানে বিচারে প্রত্যেকের ৬ মাস কারাদন্ড হয় এবং সকলে মেদিনীপুর জেলে আটক থাকেন। মুরারীমোহনের মত ভগিনী

সৌদামিনী দেবীকেও আন্দোলনে নাশকতামূলক কার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার হতে হয় এবং তিনি মেদিনীপুর জেল থেকে বহরমপুর জেলে ৬ মাস বন্দী অবস্থায় কাটানোর পরে দেশে ফিরে আসেন। শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণই নয়, নানা ত্রাণমূলক ও সেবামূলক কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪২ সালে অক্টোবর মাসে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের ফলে সমগ্র কাঁথি মহকুমায় ধনসম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি বহু অধিবাসীর মৃতু হয় এবং কালক্রমে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষ দেখে সৌদামিনী দেবীর ভ্রাতা মুরারীমোহনের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়নগরের নিকটবর্তী পশ্চিম সরপাই এবং চৌমাতালী গ্রামের নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষের নাম তালিকাভুক্ত করে ত্রাণ সামগ্রী দানের ব্যবস্থা করেন। কাকরার কংগ্রেস নেতা পীতবাস দাস ত্রাণশিবিরের উদ্বোধন করেন। প্রথম দিকে সম্পূর্ণ মাস এবং পরের মাসের ১৫ দিন খিঁচুড়ি রান্না করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। সেই সময় উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল শ্রেণীর মানুষের পক্ষ থেকে রান্না করা খাদ্যে জাতপাতের আপত্তি ঘটায় ভ্রাতা ও ভগিনী দু'জনে বিষ্ণু পূজার ব্যবস্থা করে প্রায় ১৫০০ দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য এবং অন্নদান করেন।[৩২]

১৯৪৫ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয়বার কাঁথিতে আসেন। এই সময় সৌদামিনী দেবী মহিলাকর্মী রূপে প্রচারের কাজে নিযুক্ত হন।[৩৩]১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন সৌদামিনী দেবী বিদূরপুরে অশক্ত দেহে যুব-কিশোর সম্মিলিত মানুষজনকে নিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে 'ভারত মাতা কি জয় শ্লোগানে' দিগন্ত মুখরিত করে পথ পরিক্রমা করেন; জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, বক্তৃতায় স্বদেশভূমির মর্যাদা রক্ষায় এগিয়ে আসতে বলেন সবাইকে; দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির মন্ত্র উচ্চারণ করেন।[৩৪]

দুর্ভাগ্যের বিষয় সৌদামিনী দেবী তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন ভারতবর্ষকে বেশিদিন দেখে যেতে পারেননি। তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি ঘটায় ১৩৫৯ সালের ১৪ ই বৈশাখ (১৯৫২ খ্রি:), রবিবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তাঁর মর্ত্যভূমিতে যাত্রাপথ থেমে যায়। তাঁর অমর আত্মা অমৃতধামে যাত্রা শুরু করে। বিদূরপুরের মাটিতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর প্রয়াণে দেশের মহিলারা 'আমাদের মা চলে গেলি' বলে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে করতে মাতৃস্বরূপা সৌদামিনী দেবীকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানান।[৩৫]

সর্বজনপ্রিয়া, অতুলনীয়া, অসীম তেজস্বিনী স্বাধীনতা সংগ্রামী সৌদামিনী দেবী ছিলেন একাধারে অপূর্ব সংগঠক, অপূর্ব বাগ্মী, সহানুভূতিশীলা সমাজসেবী, হিন্দু-মুসলিম আপামর জনসাধারণের মা। এককথায় তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।এই পার্থিব জগত থেকে দীর্ঘদিন আগে তিনি বিদায় নিলেও আমাদের হৃদয় সিংহাসনে শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরকাল আসীন থাকবেন।

তথ্যসূত্র:

১. Geraldine Forbes, *Women in Modern India*, Cambridge University Press, New Delhi, 2018, P. 121.

২. তদেব।

৩. শ্যামলী গুপ্ত, *বঙ্গনারীর প্রগতিপ্রবাহ,* ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২,পৃ. ৯০।

৪. ড. প্রদ্যোত কুমার মাইতি, *স্বাধীনতা আন্দোলনে তমলুক ও হলদিয়া মহকুমার নারীসমাজ,* পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০০৪, পৃ. ১১।

৫. সম্পা. শান্তিপদ নন্দ, *মেদিনীপুরের ইতিহাসের উপাদান ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* সুনীলকুমার ঘোষ, সংগ্রামী নেত্রী সৌদামিনী পাহাড়ী, এগরা রাইটার্স গিল্ড, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০০৮, পৃ. ৩১।

৬. শিশুতোষ ধাওয়া, *এগরার ইতিহাস,* অকিঞ্চন পত্রিকা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩১৫।

৭. তদেব, পৃ. ৩১৬-৩১৭।

৮. তদেব, পৃ. ৩১৭।

৯. Rina pal, *Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle,* Aruna Prakashan, Kolkata, 2013, P. 69.

১০. সম্পা. শান্তিপদ নন্দ, *মেদিনীপুরের ইতিহাসের উপাদান ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* সুনীলকুমার ঘোষ, সংগ্রামী নেত্রী সৌদামিনী পাহাড়ী, এগরা রাইটার্স গিল্ড, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০০৮, পৃ. ৩২।

১১. তদেব, পৃ. ৩৩।

১২. শিশুতোষ ধাওয়া, *এগরার ইতিহাস,* অকিঞ্চন পত্রিকা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩১৭।

১৩. তদেব, পৃ. ৩১৭।

১৪. *কাঁথি কংগ্রেস বার্তা,* সংখ্যা ১৯, প্রকাশকাল ১৮.০৩.৩২।

১৫. শিশুতোষ ধাওয়া, *এগরার ইতিহাস,* অকিঞ্চন পত্রিকা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩১৮।

১৬. *কাঁথি কংগ্রেস বার্তা,* সংখ্যা ৩৫, প্রকাশকাল ১৩.০৫.৩২।

১৭. তদেব, সংখ্যা ৩৭, প্রকাশকাল ২০.০৫.৩২।

১৮. তদেব, সংখ্যা ৪৪, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত ।

১৯. শিশুতোষ ধাওয়া, *এগরার ইতিহাস,* অকিঞ্চন পত্রিকা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩১৮।

২০. *কাঁথি কংগ্রেস বার্তা,* বিশেষ বন্দী সংখ্যা, প্রকাশকাল ০৬.০৭.৩২।

২১. তদেব, সংখ্যা ৫৪, শুক্রবার, প্রকাশকাল অস্পষ্ট ।
২২. শিশুতোষ ধাওয়া, *এগরার ইতিহাস,* অকিঞ্চন পত্রিকা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩১৮।
২৩. *পথের আলো,* সংখ্যা অনুল্লিখিত, প্রকাশকাল ১২.১২.৩২।
২৪. শিশুতোষ ধাওয়া, *এগরার ইতিহাস,* অকিঞ্চন পত্রিকা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩১৯।
২৫. সম্পা. শান্তিপদ নন্দ, *মেদিনীপুরের ইতিহাসের উপাদান ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* সুনীলকুমার ঘোষ, সংগ্রামী নেত্রী সৌদামিনী পাহাড়ী, এগরা রাইটার্স গিল্ড, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০০৮, পৃ. ৩৬।
২৬. শিশুতোষ ধাওয়া, *এগরার ইতিহাস,* অকিঞ্চন পত্রিকা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩১৯।
২৭. তদেব।
২৮. *Midnapore Central Jail Records*, dt.10.12.32 to 06.03.32.
২৯. শিশুতোষ ধাওয়া, *এগরার ইতিহাস,* অকিঞ্চন পত্রিকা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩১৯।
৩০. সম্পা. শান্তিপদ নন্দ, *মেদিনীপুরের ইতিহাসের উপাদান ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* সুনীলকুমার ঘোষ, সংগ্রামী নেত্রী সৌদামিনী পাহাড়ী, এগরা রাইটার্স গিল্ড, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০০৮, পৃ. ৩৩।
৩১. তদেব, পৃ. ৩২।
৩২. তদেব, পৃ. ৩৮।
৩৩. তদেব।
৩৪. শিশুতোষ ধাওয়া, *এগরার ইতিহাস,* অকিঞ্চন পত্রিকা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩২১।
৩৫. তদেব।

প্রাক স্বাধীনতা পর্বে মেদিনীপুরের ছাত্র আন্দোলন (1905-1942) : একটি পর্যালোচনা

ইয়াসিন চৌধুরী
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : রাজনীতি এমন একটি বস্তু যার অদ্ভুত আকর্ষণ রয়েছে। এই শক্তি টানে ছাত্র সমাজ তাদের জীবন উৎসর্গ করে। ফলস্বরূপ রচিত হয় ইতিহাস। আজ বিশ্ব রাজনীতিতে ছাত্রসমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, একুশ শতকের ভোর আজ প্রতিটি মানুষের জন্য একটি নতুন পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছে। আর এ ধাপে ছাত্রদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। তাই ছাত্রসমাজের উত্থানের অপেক্ষায় রয়েছে নতুন পুনর্মূল্যায়ন। ছাত্র সমাজের রাজনীতিতে সক্রিয় পদক্ষেপের উৎস জানতে হলে ইতিহাসের শেকড় অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ভারতে ছাত্র আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য আধুনিক যুগের ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ। মেদিনীপুর জেলায় ছাত্র আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শুরু হয়, বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এই প্রথম জেলায় ছাত্ররা কমবেশি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। প্রশ্ন হল তারা কতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের প্রভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ঘটনা হলো, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। মেদিনীপুর রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় হয়ে ওঠে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে মেদিনীপুরে ছাত্র আন্দোলন (1905-1942): একটি পর্যালোচনা আলোচ্য পর্বে গবেষণামূলক নিবন্ধে মেদিনীপুরের ছাত্র আন্দোলনের অবদান কতটা ছিল তা বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হবে।

সূচকশব্দ: ছাত্র, বিলিতি, স্বদেশী বিপ্লবী বয়কট, সমিতি, আন্দোলন, হত্যা, প্রেরণা, দীক্ষা, পিকেটিং, ধর্মঘট, বলিদান, সন্ত্রাস।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ছাত্র সমাজের অবদান অবিস্মরণীয়। ভারতে ছাত্র আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য আধুনিক যুগের ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ। উনিশ শতকের শেষের দিকে মেদিনীপুর জেলার দু-এক জায়গায় ইংরেজি শেখার ভিড় ছিল, কারণ হার্ডিংয়ের মতে, ইংরেজি শেখাই একমাত্র কাজ। সেই সময়ে জেলায় ইংরেজি শেখার জন্য দুটি ভালো স্কুল ছিল, একটি হল কলেজিয়েট স্কুল এবং অন্যটি মিশনারি স্কুল। কলেজিয়েট স্কুল তখন সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রধান শিক্ষক ছিলেন ইংরেজ, বড় বড় সরকারি কর্মচারীদের ছেলেরা, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, জমিদার প্রভৃতি ধনী পরিবারের ছেলেরা সেখানে লেখাপড়া করতেন। বাঙালি বাবা-

মায়ের উদ্দেশ্য ছিল ছেলেদের ইংরেজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ইংরেজি ও ইংরেজির চরম ভক্ত করা। অন্যদিকে মিশনারি স্কুলটি প্রথমে স্কুল বাজারে এবং পরে মিয়াবাজারের জোড়া মসজিদে স্থানান্তরিত হয়। মেদিনীপুর টাউন স্কুলটি 1883 সালে শহরের শিক্ষিত লোকদের দ্বারা শহরের ছেলেদের খ্রিস্টধর্মের এই দুটি প্রভাব থেকে মুক্ত করার এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের বোধ জাগানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে মেদিনীপুরের নবজাগরণের প্রবর্তক ঋষিরাজ নারায়ণ বসুর অবদানও কম নয়। এই শহরের স্কুলে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষা, জনসেবা, হস্তশিল্প এবং চরিত্র গঠন শেখানো হয়। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য গীতা কর্মযোগ মুখস্ত করা প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল, প্রতি শনিবার একটি ধর্মীয় বিদ্যালয় ছিল। এ ধরনের শিক্ষার ফলে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে গোপনে একদল যুবক গড়ে ওঠে যারা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেমের পরিবেশ গড়ে উঠে।[১] মেদিনীপুর ছাত্র আন্দোলনের সূচনা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। এই প্রথম জেলায় ছাত্রসমাজ অনেকটা আংশিকভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। কুখ্যাত লর্ড কার্জনের বাংলা ব্যবচ্ছেদ হল বাঙালির ঐক্য মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৌশলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় অভূতপূর্ব দৃঢ়তা ও শক্তি নিয়ে জাতীয়তাবাদের আঘাতে মাঠের বাইরে থাকার। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে মেদিনীপুরের বেইলি হলে এক বিশাল জনসভায় শত শত ছাত্র শপথ নিয়েছিল যে, বঙ্গভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো উৎসবে যোগ দেবে না। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে, মেদিনীপুরের ছাত্ররা 1905 সালের 20শে সেপ্টেম্বর খালিগে একটি বিশাল মিছিলে মিছিল করে এবং পুরো মেদিনীপুর শহর প্রদক্ষিণ করে। ছাত্রদের মিছিল এবং সহানুভূতিশীল জাতীয় সঙ্গীত শহরবাসীকে অনুপ্রাণিত করে এবং উজ্জীবিত করে। দাঁতন, খিরপাই, মহিষাদল, ঘাটাল, কাঁথি প্রভৃতি অনেক শহর ও গ্রামে ছাত্রদের অনুরূপ মিছিল হয়।[২] এই সময়ে মেদিনীপুরের ছাত্র সমাজের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধরন ছিল ভারতীয় জাতীয় মিছিলের মতো। কংগ্রেস। ছাত্ররা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অহিংস ও সহিংসভাবে প্রতিবাদ জানায়। 1905 সালের 16ই অক্টোবর, মেদিনীপুরের ছাত্ররা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে, ভোরবেলা কংসাবতী নদীতে সমবেত হয়েছিল, একে অপরের হাতে রাখি বেঁধে একে অপরকে আলিঙ্গন করে। বাংলা ও বালির ঐক্য রক্ষাই তাদের প্রধান ব্রত।[৩] মেদিনীপুরের এই ছাত্র আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও অহিংস প্রকৃতির হলেও মাঝে মাঝে এই তরুণ দলটি সহিংস হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে যারা সক্রিয় ছিল তারা বিপ্লবী দলগুলোকে শক্তিশালী করতে পর্দার আড়ালে ছিল। ব্রিটিশ কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার ছিলেন তারাই পরবর্তীতে বিপ্লবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[৪] অনুশীলন-যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলে যোগদানকারী মেদিনীপুরের ছাত্রদের সংখ্যা গণনা করা কঠিন। পুলিশের হাতে নিহত বিপ্লবী ছাত্রের সংখ্যা

অগণিত। এই তরুণ ছাত্ররা ব্যায়ামাগার ও আখড়ায় বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম, লাঠি খেলা ইত্যাদি শিখতেন এবং শেখাতেন। মেদিনীপুর ক্ষুদিরাম বসু, কলেজিয়েট স্কুলের একজন 18 বছর বয়সী ছাত্র এবং গুপ্ত সোসাইটির একজন সক্রিয় সদস্য, একটি প্রধান উদাহরণ। তিনি মেদিনীপুরের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় সৈনিক ছিলেন। স্বাধীনতার বেদীতে তাঁর এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছিল।[৫] ছাত্র আন্দোলনের এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে 1911 সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করার মাধ্যমে। এরপর 1911-18 পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থবির হয়ে পড়ে, কিন্তু ছাত্ররা মাঝে মাঝে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। শহরের স্কুলের শিক্ষার্থীদের অনুদান অতুলনীয়। প্রথমে এই মেদিনীপুর শহরে আন্দোলন না হলেও পরে শহরের স্কুলের কিছু ছাত্র যেমন শচীন মাইতি, পূর্ণ চক্রবর্তী, নগেন সেন, মৃত্যুঞ্জয় জানা প্রমুখ আন্দোলনে যোগ দেন। প্রবীণ নেতা মনমোহন নাথ দাস মন্তব্য করেছেন যে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মেদিনীপুর জেলার অনেক স্কুল ও কলেজে ধর্মঘট পালিত হয়েছিল।[৬] যদিও সেই সময়ে ছাত্রদের মধ্যেও রাজনৈতিক সচেতনতার এই অভাব প্রকট ছিল। তিনি দুঃখের প্রবাহে অভিভূত হয়েছিলেন যা এই লোকদের হতবাক করেছিল। তারা স্বাধীনতার অমৃতে মগ্ন হতে উদগ্রীব ছিল। একদিন, মেদিনীপুরের পাঁচজন কিশোর ছাত্র (পরিমল কুমার রায়, পুলিন বিহারী মৈত, বীরেন্দ্র নাথ মাঝি, সন্তোষ কুমার মিত্র এবং হরিপদ ভৌমিক) একসাথে গীতা শপথ নিয়েছিলেন যে দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবন নষ্ট হবে। তাদের সহানুভূতি চিন্তার প্রকাশে রূপ নেয় টাউন স্কুলের 'মিলন মন্দির' প্রতিষ্ঠায় তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রফুল্ল কুমার ত্রিপাঠ। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের প্রচেষ্টায় প্রফুল্ল কুমার সম্পাদিত পরশু নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মেদিনীপুর যুব সংঘ' গঠন করা হয়। কুমার দেবেন্দ্রলাল খান ও শহীদ সত্যেনের ভাই কুমার সুবেন্দ্র কুমার বসু ছাত্রদের সাহায্য করেন। কলকাতার যুব আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং 'মেদিনীপুর যুব সমাজ' গঠন করা হয়।[৭] বিভি গ্রুপের দীনেশ গুপ্ত 1928 সালে মেদিনীপুরে আসেন এবং মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র হিসাবে নিজের কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা শুরু করেন। তিনি তৎকালীন ছাত্রনেতা প্রফুল্ল কুমার ত্রিপাঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং পরিমল কুমার রায়, ফণিভূষণ কুন্ডু, হরিপদ ভৌমিক প্রমুখ ছাত্রদের সহায়তায় মেদিনীপুরে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দল গঠন করেন। কয়েক দিনের মধ্যে, অমর নাট চ্যাটার্জি, ব্রজ কিশোর চক্রবর্তী, নরেন দাস, বিজয় মঙ্গল এবং সুধীর পট্টনায়েক দলে যোগ দেন, এরা সবাই শহরের স্কুলের ছাত্র। 1926 সালে সাইমন কমিশনের আগমনের প্রতিবাদে সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। প্রফুল্ল কুমারের নেতৃত্বে মেদিনীপুর টাউন স্কুলের ছাত্ররা এই আন্দোলনে অংশ নেয়। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এই প্রথম জন আন্দোলনে যোগ দেয়। বিপ্লবী দল গঠনে অমর ব্রজকিশোর

এবং কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ক্ষিতি প্রসন্নের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। 1929 সালে, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, মৌলভী জালাল উদ্দিন হাশেমী, ডক্টর সুবোধ চন্দ্র বসুর আগমন ও অনুপ্রেরণা মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল।[৮] "দীনেশ গুপ্ত, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, পরিমল রায়, ফণী কুন্ডু, অমর চ্যাটার্জি, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নরেন দাস এবং অন্যান্য বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকরা আনুষ্ঠানিকভাবে সুভাষ চন্দ্রের কাছ থেকে দীক্ষা নেন।[৯] মেদিনীপুরের অনাচার আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল গৌরবময়। পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের প্রতিবাদের প্রধান কারণ ছিল স্কুল-কলেজ পিকেটিং যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত করে। 1930 সালের 7 এপ্রিল মেদিনীপুরে অনাচার আন্দোলন শুরু হয়। কাঁথি, মেদিনীপুর, তমলুক প্রভৃতি প্রধানত শহরে ছাত্ররা এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য প্রচারে সক্রিয় ছিল; কালিকাপুর মহিষাদল, তমলুক কাঁথি মহকুমা, এই জেলার ছাত্ররা লবণ আইনের বিরুদ্ধে প্রচারে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল।[১০] ছাত্ররা স্বদেশী মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে সাময়িকী এবং পুস্তিকা বিক্রিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সারা বাংলার মাত্র কয়েকটি জেলার ছাত্ররা অনাচার আন্দোলনে অংশ নেয়। মেদিনীপুর সেই জেলাগুলির মধ্যে একটি ছিল। মেদিনীপুরের তমলুক শহরে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল বেশি। প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি তমলুক শহরে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন, তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : বঙ্গদেশে এই আন্দোলন প্রবলতম আকার নিয়েছিল। মেদেনীপুর জেলায় তার মধ্যে তমলুক কাঁথি মহকুমাতেও প্রবলতম হয়েছিল, তমলুক মহকুমার এই ব্যাপক গণ আন্দোলনে শুধু শহরে ছাত্র যুব মধ্যবিত্তরাই নয় গ্রামের লক্ষ লক্ষ কৃষকও যোগ দিয়েছিল। **এই** আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায় এবং সতীশ চন্দ্র সামন্ত এবং তাদের সহকর্মীরা।[১১] এই সময়ে, মেদিনীপুরের ছাত্র সমাজ শুধুমাত্র আইন ভঙ্গের জন্য বড় মিটিং মিছিলে যোগ দেয়নি। ব্রিটিশ সরকারের চাপ সত্ত্বেও তারা শহর ও গ্রামের সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করতে সক্ষম হয় এবং টানা ছয় মাস সব স্কুল বন্ধ করে দেয়। জেলার শত শত শিক্ষার্থী সরাসরি অনাচার আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। মেদিনীপুরের হিজলি জেলে বন্দি নির্যাতন ও হত্যার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজ। বিপ্লবের পর অনেক ছাত্র আকৃষ্ট হয়। ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসেবে মেদিনীপুরে পর পর তিনজন কুখ্যাত অত্যাচারী জেলা গভর্নর পেরি (1931), ডগলাস (1932) এবং বার্জ (1933) নিহত হন। এই খুনের সঙ্গে জড়িত বিমল দাস গুপ্ত, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, অনাথ পাঞ্জা, মৃগেন দত্ত, ব্রজ কিশোর চক্রবর্তী, নির্মল জীবন ঘোষ। সুকুমার সেনগুপ্ত, নন্দলাল সিং, শান্তি গোপাল সেন সবাই তখন ছাত্র।[১২] মামলায় অনেকের ফাঁসি হয়েছে, অনেককে নির্বাসিত করা হয়েছে, অনেকের দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড হয়েছে। অনেকে পুলিশের নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। বাকিদের হয় শহর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে নয়তো শহরে আটকে রাখা হয়েছে। এই বিপ্লবীদের মধ্যে

যারা টাউন স্কুলের ছাত্র তারা হলেন পরিমল রায়, ফণীন্দ্র কুন্ডু, ফণী দাস, নরেন দাস, বীরেন দাস, অজয় ঘোষ, শৈলেন দত্ত, অশোক দাস এবং আরও অনেকে।[১৩] 1928 সালে, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত ছিলেন মেদিনীপুরের কলেজ ছাত্র। তিনি বিনয় বসুর নেতৃত্বে 1930 সালের 6 ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে অভিযান চালান। কিন্তু তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং 1931 সালের 7 জুলাই আলিপুর জেলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হন। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য 1932-33 সালে মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স লেফটেন্যান্ট। তিনি মেদিনীপুরের কুখ্যাত জেলা গভর্নর ডগলাসকে গুলি করেন এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং 12 জানুয়ারী 1933 তারিখে মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। মেদিনীপুরের আরেক জেলাশাসক মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত, কুখ্যাত বার্জটিকে গুলি করেন এবং 3শে সেপ্টেম্বর, 1933 তারিখে জেলা শাসকের দেহরক্ষীদের হাতে গুরুতর আহত হওয়ার পর হাসপাতালে মারা যান। তার আরেক বন্ধু ও সহপাঠী নির্মল জীবন ঘোষ বার্জকে হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্য 26 অক্টোবর 1934 সালে মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।[১৪] এভাবেই দেশের জন্য হাসিমুখে জীবন দিয়ে ইতিহাসে অমরত্ব অর্জন করেছেন আরও অনেক শিক্ষার্থী। 1933 থেকে 36 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মেদিনীপুরের ছাত্ররা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে বসবাস করত। সূর্যাস্তের পর নগরীর রাস্তা-ঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ে। প্রত্যেককে থানার দেওয়া কার্ড নিয়ে যেতে হয়েছিল কারণ পরপর তিনজন ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার পর মেদিনীপুর শহরে ত্রাসের রাজত্ব ছিল। সাইকেল চালানো, বিশেষ রাস্তায় যাতায়াত, তিন বা চারজনের একসঙ্গে যাতায়াত ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল।

তাছাড়া কেউ কারো বাড়িতে এলে বা শহরের বাইরে কেউ এলে থানায় রিপোর্ট করতে হতো, প্রতি সপ্তাহে সব যুবককে থানায় হাসতে হতো। রাস্তায় শাস্তি কর ধার্য করা হয়েছিল, এবং নজরদারি কমিটি আশেপাশে সরকারের প্রতি অনুগত লোকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল।[১৫] তৎকালীন মেদিনীপুরে ছাত্র আন্দোলনে যারা সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন তানিল কুন্ডু, অনন্ত মাঝি, অনিল দে, সৈয়দ আলী হোসেন প্রমুখ। 1936 সালে বার্ড সিস্টেমের উত্থানের পর, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। 1935 সালে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে অনেক তরুণ বিপ্লবী সাম্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ছাত্রদের মধ্যে একদল মানবেন্দ্র নাথ রায়ের সমর্থক, কেউ সৌমেন ঠাকুরের সমর্থক, কেউ লেবার পার্টির সমর্থক, কেউ কেওবা সমাজতন্ত্রীর সমর্থক। তবে দলমত নির্বিশেষে সকলেই মনে করেন স্বাধীনতা সন্ত্রাসের পথে নয়, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পথে আসবে কারণ বিশ্বের সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস দেখিয়েছে যে সমাজ উন্নয়নের যৌক্তিক বিশ্লেষণ স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যায়, বিকল্পধারা। সমাজতন্ত্র কোন সন্ত্রাস নেই। কারণ সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম

ও সন্ত্রাস এক নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সংখ্যাগরিষ্ঠকে সন্ত্রাসবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে, তাই একটি সুসংহত ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। এই প্রসঙ্গে, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশনের জন্ম 1936 সালে।[১৬] সম্পাদক ছিলেন মেদিনীপুরের একজন জঙ্গি ছাত্র নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জি। বিদেশী শোষক, অত্যাচারী ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের ষড়যন্ত্র এবং দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা ছাত্রসমাজকে উদ্বিগ্ন করেছিল। ছাত্রদের মহান আদর্শ হল পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতকে মুক্ত করা, রক্ষা করা এবং সাহায্য করা। এই সমস্ত আকাঙ্খা নিয়েই মেদিনীপুরের ছাত্র সমাজের পথচলা শুরু। ১৯৪২ সালের আগস্টের আন্দোলনে তরুণ ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ ছিল সারা দেশে। কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, সারা দেশ থেকে সব বয়সের ও শ্রেণির ছাত্ররা এত ব্যাপকভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল যে তা ছিল নজিরবিহীন।

মেদিনীপার জেলার এই আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কাঁথি, তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, ময়না, পাঁশকুন্ড ইত্যাদি মহকুমা ও থানা এলাকায়ও হয়েছিল। তারা যেভাবে জঙ্গি কার্যকলাপে অংশ নিয়েছিল। থানা ও সরকারি ভবন দখল, রেললাইন লাইনচ্যুত, ডাক ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার নাশকতা অথিতে কখনো দেখা যায়নি। 1942 সালের আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন মধুসূদন মুখার্জি, সত্য রঞ্জন বেরা, বিমল মহাপাত্র, সুকুমার ঘোষ, দুর্গা মুখার্জি, ভবানীর সত্যেন সরকার প্রমুখ। আগস্ট আন্দোলনের উদ্বোধনী পর্বে মেদিনীপুর জেলার চার ছাত্রকে তলব করা হয়েছিল। তারা হলেন কাঠি মহকুমার বিভূতি ভূষণ দাস (ভগবানপুর), সুকুমার দাস (খেজুরি) এবং আশুতোষ কুইলা (মহিষাদল)। কাঠি প্রভাতকুমার কলেজের ছাত্ররা অগাস্ট আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক অংশ নেয়। ছাত্রদের নেতৃত্বে ছিলেন সুবোধ দেশপাল গুচ্ছাইত, প্রবীর চন্দ্র জানা, বন বিহারী পাল, অমূল্যরতন ভৌমিক, অতুল চন্দ্র মিশ্র, প্রবোধ কুমার ভৌমিক, আভা মাইতি। তাদের আন্দোলনের ফলে কাঠি চন্দ্রমণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও কাঁথি উচ্চ বিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ে। সেই সময় এগরা ঝন্টুলাল হাইস্কুল জোর করে বন্ধ করার অভিযোগে ছাত্রনেতা নির্মল মহাপাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় অধিকাংশ ছাত্র মারামারি করছিলেন। যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়াসে কাঁথি শহরে একটি নৃত্য উৎসবে পিকেটিং করার চেষ্টা করায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। ছাত্র নেতা অতুল চন্দ্র মিশ্র এবং সতীশ চন্দ্র মাইতি, অনন্ত কুমার গিরি এবং প্রমোদ কুমার ভৌমিককে পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার পর আবার গ্রেপ্তার করা হয়। এই 26 বন্দী ছাত্রদের মধ্যে 4 জনকে ব্রিটিশরা মুক্তি দেয় এবং 10 জনকে 1 বছর এবং বাকি 11 জনকে দেড় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এটা সহজেই অনুমেয় যে মাতঙ্গিনী হাজরার মতো একজন বৃদ্ধ মহিলার আত্মহত্যার পর অনেক মেয়ে আর ঘরে থাকতে পারে না। ছাত্র ফেডারেশন নীতিগতভাবে আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও সংগঠনের অনেক সদস্য

গণআন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারেননি, কেউ কেউ জীবনও বিসর্জন দেন।[১৭] 1905-1942 এই দীর্ঘ সময়ে মেদিনীপুরের ছাত্র আন্দোলন বিভিন্ন ধারায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়। তাদের ভিন্ন মত ও পথ থাকলেও তাদের অভিন্ন লক্ষ্য ছিল দেশকে স্বাধীন করা এবং দেশের সেবা করা। তাই মেদিনীপুরের ছাত্র সমাজকে বলা হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন সৈনিক। এমন নয় যে মেদিনীপুরে ছাত্র আন্দোলনে পাক-স্বাধীনতার সময় কোনো বাধা ছিল না। তবুও তাদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তাদের আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং গভীরতা শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই হেয় করেনি বরং দেশের কায়েমি স্বার্থকেও বিচলিত করেছিল।

তথ্যসূত্র :

১. ব্যানার্জী পান্না লাল- মেদিনীপুরের অগ্নিযুগে টাউনস্কুল, মেদিনীপুর টাউন স্কুল শতবর্ষ উদযাপন স্মারক সংখ্যা, 3রা জানুয়ারী 1943 পৃ.38

২. চৌধুরী কিরণ - দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, কলকাতা, 1987, পৃ.264

৩. দাস বসন্ত কুমার - স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, ভলিউম I, মেদিনীপুর, 1970, পৃ. 92

৪. মিত্র সুকুমার - 'শ্রীঅরবিন্দ অকরোড় ঘোষ' মাসিক বসুমতি,১৩৫৮(বঃশ)

৫. সেনগুপ্ত সুকুমার – 'মেদিনীপুর জেলার ছাত্র আন্দোলনের গোড়ার কথা', স্মরণিকা মেদিনীপুর জেলার রজত জয়ন্তী সম্মেলন, স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, 6-8 ফেব্রুয়ারি 93

৬. তদেব

৭. দাস বসন্ত কুমার - স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা 425-26

৮. তদেব

৯. মেদিনীপুর টাউন স্কুল শতবর্ষ উদযাপন, স্মারক সংখ্যা, 3রা জানুয়ারী 1983 পৃ.25

১০. রায় রঞ্জিত কুমার স্বদেশী থেকে আইন অমান্য, রাজ্যের বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্র সমাজের সংগঠিত বিক্ষোভ।

১১. মুখার্জি বিশ্বনাথ - আমি কমিউনিস্ট হলাম: মেদিনীপুর 1976, পৃ. 79.

১২. সেনগুপ্ত সুকুমার - মেদিনীপুর জেলায় ছাত্র আন্দোলনের সূচনা, গোড়ার কথা, পূর্বোক্ত।

১৩. মেদিনীপুর টাউন স্কুল শতবর্ষ উদযাপন স্মারক সংখ্যা, 3রা জানুয়ারী 1983, পৃ. 80

১৪. মেদিনীপুর কলেজ শতবর্ষ উদযাপন, স্মারক সংখ্যা, 1983 পৃ. 48-48
১৫. মেদিনীপুর টাউন স্কুল শতবর্ষ উদযাপন স্মারক সংখ্যা, সুপ্রা, পৃ. ৪০.
১৬. সেনগুপ্ত সুকুমার- মেদিনীপুর জেলায় ছাত্র আন্দোলনের সূচনা
১৭. চট্টোপাধ্যায় গৌতম ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম ছাত্র সমাজ, কলকাতা, 1990, পৃষ্ঠা 58-59

নলিনী বেরার গল্পে বহুমাত্রিকতার স্বর

ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

নকশাল আন্দোলন-পরবর্তীকালের বাংলা কথাসাহিত্যে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছিল তরুণ কথাকারদের হাত ধরে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নলিনী বেরা।পশ্চিমবঙ্গ-উড়িষ্যা সীমান্তের কাছাকাছি সুবর্ণরেখা নদীর তীরে জঙ্গলাকীর্ণ বাছুর খোঁয়াড় গ্রামে তাঁর জন্ম।তিনি একটি বিশেষ অঞ্চল, যাএতদিন সবার দৃষ্টি-বহির্ভূতই ছিলো বলা যায়, তা তাঁর গল্পের পটভূমি হিসেবে তুলে ধরেছেন, তার ভৌগলিক বর্ণনা দিয়েছেন।সেই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয় আঙ্গিক, বাস্তবতা, অব্যক্ত অনুভবের আভাস তাঁর গল্পগুলিকে আধুনিক করেছে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাত্রাই নলিনী বেরার গল্পের মূল লক্ষ্য।লোকজীবন,লোকায়ত সংস্কৃতি, গ্রামীণ মানুষের আর্তনাদ,জাদুবাস্তবতা, আঞ্চলিক জীবনানুরাগ প্রমুখ বিষয় বৈচিত্রের নিবিড় পাঠ তাঁর গল্পের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে।

নলিনী বেরার গল্পের একটি অনন্য সম্পদ হলো লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি। যে জনজাতির জীবনধারা,কথা-উপকথা-রূপকথা-টুসু-ভাদু,কীর্তন, হেঁয়ালি,প্রবাদ-প্রবচন, পরব বা উৎসব সমূহ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে বিশ্বায়নের আগ্রাসনে—নলিনী বেরা পরম যত্ন ও মমতায় তাদের ধরে রেখেছেন নিজের সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে। তিনি লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি কতটা অনুরক্ত তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে। কোন পার্বণে কি কি আচার বিধি পালনীয়,কিভাবে আলপনা দেওয়া হয়, ঘর লেপা হয়, কিভাবে পূজা করা হয় সবকিছু নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন তিনি। জঙ্গলমহলের অন্যতম উৎসব ‘জাওয়া করমে’র বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ‘মাটির মৃদঙ্গ’ নামক গল্পে।ঠিক তেমনি ‘বাঁধনা’ পরবের কথা পাওয়া যায় ‘খোরপোষ’ গল্পে। এছাড়াও জনপ্রিয় লোকনৃত্য কাঠি নাচ- এর বিবরণও তাঁর গল্পে রয়েছে।

‘মাটির মৃদঙ্গ’ বেজে উঠেছে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার বাছুর খোঁয়াড় গ্রামের আদিবাসী সাঁওতালদের পাড়ায়।বহু যুগ ধরে বয়ে চলা কুমোর জাতির সংস্কার-বিশ্বাস-পালা-পার্বণ ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে তুলে ধরেছেন নলিনী বেরা তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে। কুমোরদের লোকসংস্কৃতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এই গল্পে।তাদের পৌরাণিক উপাখ্যান নির্ভরতা, লোকনাটক,কীর্তন, কুমোর সমাজের বৈধ-অবৈধ প্রেম, সালিশি সভা, অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত কুমোর পাড়ার মানুষদের ভুত-ভাবনা, জাতপাতের বিচার, সবর্ণ- অসবর্ণ বিবাহ এই সমস্ত কিছুকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর এই গল্পের কাহিনী বুননের মধ্যে দিয়ে। তিনি দেখিয়েছেন সংস্কারের বশবর্তী হয়েই অখিল চায়না তার ছেলে পড়ার ফাঁকে মাটিতে হাত

লাগাক।সে চায় তার ছেলে বলে চলুক কবিতা 'কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি'। কিন্তু মাটিতে হাত দেওয়া নৈব নৈব চ। পরিবারের সকলে মাটির জিনিস তৈরিতে কোন না কোন দায়িত্ব পালন করে,বাদ থাকে ছেলেমেয়েরা। সন্ধ্যে নামলে কুমোরপাড়ায় হরিবাসরে খোল বেজে ওঠে। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলে জোটে।মুনি-ঋষিদের মতো দেখতে দশরথ কুমার খোলে বোল তোলে,ধুতির খুঁট গলায় জড়িয়ে মৃদঙ্গে চাঁটি মারে। কীর্তন গানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও কুমোরদের মুখে থাকে কৃষ্ণ কথা। অখিল-নিখিলরা কীর্তন গান গেয়ে স্ত্রীর মনের দৈনন্দিন চাহিদা, অপ্রাপ্তির বেদনা লাঘব করে। শ্রীমন্ত-বাণীকান্তরাপথচলতি পাড়ার কোনো পদী-সানকির মনে প্রেমের ভাব জাগায়। প্রেম হয়তো বিবাহে পরিণত হয় না কিন্তু কীর্তন গান গাওয়ার আনন্দ অধরা থাকেনা—

'সব গোপীগণ   আহীর রমণী
পসরা তুলিয়া সাথে।
মাঝে সুনাগরী   প্রেমের আগরী
আনন্দে চলিল পথে।
হাসি রসখানি   রাই বিনোদিনী
বড়াই পানেতে চায়।
আর কতদূর   গোকুল নগর
ক্ষণেক সুধায় তায়।'

পেট তাদের খালি, মুখ তাদের শুকনো, কিন্তু মন তাদের রসে ভরা। এই গল্পে লেখক সুদর্শন নামক এক চরিত্রের কথা বলেছেন,যার মাথায় সর্বক্ষণ রামায়ণ-পুরাণ শাস্ত্রের কথা গিজগিজ করে। সে রচনা করে চলেছে 'কুম্ভ পুরাণ'।সে স্বপ্ন দেখছে তার শ্রমের অবসান ঘটে সার্থক হবে তার শ্রমসাধনা।সে মনে মনে গুন গুন করে—

'সৌতি শ্রীসুদর্শন পিতা শ্রীদাম।
মেদিনীপুর জিলা বাছুর খোঁয়াড় গ্রাম।
মহকুমা ঝাড়গ্রাম থানা নয়াগ্রাম।
অদ্য সন তেরশ বাষট্টি পয়লা অঘ্রান।
প্রথমে বন্দনা করি আদি মহেশ্বর।
মাতব্বর রুদ্র,শশী-দোঁহে পিতার সমান।
শুনাইব তাহাদের দেবতুল্য কুম্ভ পুরাণ।
কুম্ভ পুরাণের কথা অমৃত সমান।
সৌতি সুদর্শন কহে শুনে পুণ্যবান।'

কুমোর পরিবারের মেয়ে করম-জাওয়া, মকর গীত টুসু গানের পাশাপাশি যাত্রার গানকেও আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। কারণ সে কিছুতেই নিজের পরম্পরাকে ভুলতে চায়না। নিজের সংস্কৃতিকে তার চিন্তন ও মননের সাথে গেঁথে নেয়। তাই 'মাটির মৃদঙ্গ' শুধু কুমোরপাড়ায় আবদ্ধ না থেকে বেজে ওঠে প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে।

'খোরপোষ' গল্পটিও তাঁর এক অসাধারণ সৃষ্টি। গল্পের নায়ক নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ভাতুয়া সনাতন টুডু ওরফে সুনা। সারা গল্প জুড়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে সুনা, শালপ্রাংশু, মাথার চুলগুলো পিঙ্গল বর্ণের। মুখে দাড়ি গোঁফ, হাতে একজোড়া লোহার বালা,কানে মাকড়ি।লেখক তার সম্পর্কে গল্পে বলেছেন, এরকম চেহারার সুনা কোথায় যাত্রার আসরে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'- এর লক্ষণ, 'অভিমন্যু বধ'-এর অভিমন্যু, 'কর্ণাজুর্নে- এরকর্ণ সেজে আসর মাত করে ছাড়বে, কোথায় উপস্থিত দর্শকের দল হাততালি মেরে 'ইনকোর' দেবে ডবলতে-ডবল,তা নয় - সে হলো কিনা আমাদের ঘরে ভাতে-কাপড়ে সারা বছরের 'ভাতুয়া!' গল্পে পরবের কাজ করতে দেখা গেছে ঢালো বুড়িকে।বাঁধনা পরবের জন্য সে জোগাড় করেছে মাটি কাটার জন্য মাটি। গোহাল কাড়ার কাজ শেষ করে 'খলা খামার' ঝাট দেওয়ার কাজ শুরু করে দেয় সুনার মা। সাদা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে আসতো হলদে তিলকমাটি, লাল রঙের গিরিমাটি আর তাই দিয়ে মাটি কাম করা দেওয়ালের ওপর লতাপাতা, ফুল-পাখি আঁকতে বসতো।যার শোভা'সুন্দর ল্যাখেন'! এছাড়াও গল্পটিতে 'দাঁশাই' উৎসবের বর্ণনা রয়েছে। বাঁধনা পরবের সুন্দর চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অমাবস্যার রাতে আলপনার ওপর জ্বেলে দেওয়া হয় গুঁড়ির প্রদীপ। আল্পনায় ছড়ানো থাকে ঘাস। ঘাস খেতে খেতে গরুগুলো গোয়ালে ঢোকে। বাঁধনা পরবে গরুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।ঢেঁড়স গাছ জোগাড় করা, তা থেকে রস বার করা,ঘাস কাটা, ঘুড়ির প্রদীপ পাহারা ইত্যাদি কাজে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেশ উৎসাহী হয়ে ওঠে। প্রচলিত বিশ্বাস গ্রামে যে সমস্ত কুমারী মেয়েদেরগায়ে ছুলি তারা গুঁড়ির প্রদীপ চুরি করে গায়ে মাখলে পুরোপুরি সেরে যাবে। পরদিন সকালে খেতে হয় বন বাঁওলার মূল।আগের দিন রাতে সেই মূল পটেটো চিপসের মত কেটে নতুন ঝুড়িতে করে পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়। রাতে গানের দল মাদল বাজিয়ে গান করতে আসে গরু জাগরণের। 'আমরা তো যাইতে ছিলি কুলহি কুল হি যে বাবু হো/ তো রি গিরিহায় ডাকিয়ে ঘুরালো।' ভাইফোঁটার দিন শুরু হয় পইড়ান প্রতিযোগিতা। পইড়ান হলো বেনা ঘাসের বিনুনি, চুলের মত পাকিয়ে অনেকটা মাটি খুঁড়ে সেই বিনুনির গোড়া অন্য কোনো ভারী জিনিসের সঙ্গে বেঁধে মাটিচাপা দিতে হয়। এভাবেই লোকায়ত জীবন ও লোকায়ত অনুষঙ্গের হীরক দ্যুতি ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন গল্প জুড়ে।

'জাদুবাস্তবতাবাদ' বা 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' আজ একটি সুপরিচিত শব্দ।যার জন্ম ঠিক না বলা গেলেও সূচনা ও বিকাশ ঘটেছে লাতিন আমেরিকায়।পাশ্চাত্য সাহিত্যে অতীতেই 'জাদু' বা 'ম্যাজিক' শব্দটি এক নবমাত্রায় স্বীকৃতি পেয়েছে। বাস্তবিক অর্থে জাদুবাস্তবতা বলতে মেক্সিকান সাহিত্য সমালোচক Luis Leal একটি ধারণা উত্থাপন করেছেন পাঠকবর্গের কাছে— "...magical realism is an attitude on the part of the characters in the novel toward the world."(আন্তর্জালিক

তথ্য)১৯৫৫ খ্রি: প্রথম আধুনিক অর্থে জাদুবাস্তবের ব্যবহার সাহিত্যে প্রয়োগ হলেও এই শব্দবন্ধের প্রয়োগ কর্তা জার্মানির বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক Franz Roh১৯২৫ খ্রিঃ 'Neue sachlichkei' শীর্ষক চিত্রশিল্পের এক রীতির প্রাসঙ্গিকতা থেকে সর্বপ্রথম এই ম্যাজিক রিয়ালিজম কথাটির উদ্ভব। ১৯২৭-এ স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত বিখ্যাত গ্রন্থ Franz Roh-এর 'Revista de occidente' যেটি জাদুবাস্তবতার প্রথম গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের প্রথম জাদুবাস্তবতাবাদের প্রয়োগ ঘটে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে। এরপর তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে জাদুবিদ্যা,ডাইনি প্রথার উল্লেখ রয়েছে। গল্পকার নলিনী বেরার যে গল্পগুলিতে ম্যাজিক রিয়ালিজম -এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল— 'বরফ পড়া-দিনগুলোয়', 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা', 'বর্ষামঙ্গল', 'খবাতিহার গল্প', 'ভূত- জোৎস্না', 'জলের মানুষ-ডাঙার মানুষ' ইত্যাদি। 'বরফ পড়া দিনগুলোয়' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন মেদিনীপুরের মাঠে হঠাৎ বরফ পড়ছে। এই ঘটনা রূপকথার ছায়া ফেললেও আসলে এর বাস্তব ভিত্তিতে রয়েছে অলৌকিক ঘটনা। চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত গল্পের মধ্যে আমরা কতগুলো আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পাই। যেমন একটা ভাঁড়ের জন্য গল্পের অন্যতম চরিত্র সুরথের বিদেশগমন। আবার সেই ভাঁড়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটা ডায়লগ— "বল, বল রে পিতার অস্থি দিয়ে গড়া মোর রক্তপাশা"। এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই আশ্চর্যজনকভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার প্রয়াস। আসলে গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু ভাঁড়টার মধ্যে অবস্থান করছে সুরথের মৃত সেজ কাকার অস্থি।যার মধ্যে রয়েছে সমগ্র গল্পের রহস্য বা ম্যাজিক — যা পাঠককে নিয়ে যায় জাদুর এক মায়াময় রাজ্যে।ঠিক এইরূপ একটি জাদুবাস্তবতার মাঝে মন্ত্রশক্তির বলে অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা লক্ষ করা যায় 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা' গল্পে। ছয় পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত গল্পের মুখ্য চরিত্র প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক উমাকান্ত সিং। যিনি গল্পের চরিত্র হিসেবে সৎ ও আদর্শবান এবং 'শতাব্দি মঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা। এই কাব্যের মুখ্য চরিত্র হিসেবে উমাকান্ত বাবু যাকে এনেছেন তিনি হলেন শতাব্দীর এক প্রতিভূ চরিত্র জাতে ভূমিজ, দিবাকর সিং। যে মানুষকে মন্ত্রশক্তি বলে চালিত করে। মন্ত্রশক্তির বলে শূন্য থেকে সাপ নামায়। ঝাঁপানের'বারি' তুলতে গিয়ে সাপ তোলে জল থেকে,আবার সেই সাপ গলায় ঝুলিয়ে শিব সেজে নাচে। অর্থাৎএখানে দিবাকর হয়ে উঠেছে গল্পের এক মুখ্য ম্যাজিশিয়ান চরিত্র এবং সে প্রমাণ করেছে জাদুবাস্তবতাবাদে মন্ত্রশক্তির কতখানি সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। ম্যাজিক রিয়ালিজম-এর ধারায় নলিনী বেরার সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প হল 'ভূত জোৎস্না'। চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই গল্পের মুখ্য চরিত্র কংসহরি ঢালী আর সরিন্দর দলুই। সাধারণ গ্রাম্য অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ একে অপরের বন্ধু সমান। কিন্তু 'ম্যাজিক' এখানেও প্রভাব ফেলেছিল। যেমন- সমবয়সী রানু অনন্তকে বলে ময়ূরীর ডিম নিয়ে আসতে। কারণ— "ডিম ফুটোয়ে বাচ্চা করি পুষমু!" অপরদিকে এতদিনের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তাদের গভীর বন্ধুত্বকে ছাপিয়ে গল্পের শেষ পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই একে অপরের

প্রতি এক ভৌতিক সন্দেহ জেগে উঠেছে। বন্ধুত্বকে ছাপিয়ে জাদুবাস্তবতার জয় কিভাবে ঘটেছে তা আমরা এই গল্পে বিশেষভাবে লক্ষ করি। 'বর্ষামঙ্গল' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে জাদু গঠিত গ্রাম্য জীবনের প্রাচীন বিশ্বাস। গল্পের মূল চরিত্র পরমেশের গ্রাম হাতি বান্দিতে। এক বৃষ্টিমুখর দিনে বৃষ্টির সঙ্গে পড়ছিল হেলেসাপের মণ্ড। যাকে গ্রামের লোকেরা বলতো 'গুড় পুটলু'। তাদের বিশ্বাস ছিল বৃষ্টির সাথে হেলে সাপ নাকি জড়াজড়ি করে পড়তো। এখানে গ্রাম্য কুসংস্কারের পরিচয় আমরা পাই। অপরদিকে তিনজন মানুষ রাতে কুলহী রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত যাদের সবাই বলতো 'গুড়গুড়িয়া'। এবং তারা কারো নাম ধরে যদি রাত্রে ডাকে তাহলে যার নাম ডাকা হবে ঘুমের মধ্যে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। এরকম আরো কুসংস্কার,অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয় আমরা পাই এই গল্পে।যদি ঝড় শুরু হয় তখন কেউ যদি কাচা গামছা পরে লাঙ্গল গোবর গছায় পুঁতে দিয়ে আসে তাহলে দীর্ঘদিনের বৃষ্টিও থেমে যায়।আরো অনেক জাদু সংস্কারের বীজ লুকিয়ে রয়েছে গ্রাম বাংলার মানুষের মনে। 'জলের মানুষ ডাঙ্গার মানুষ' গল্পে ব্যান্ডেল যেতে গিয়ে বালির কাছে গঙ্গার মাছগুলির পাঁচিল টপকে শূন্যে খেলা করার বিস্ময় গল্পের চরিত্র সুধনাকে নিয়ে গেছে বাস্তব পৃথিবী থেকে জাদুবাস্তবতার দুনিয়ায়। এভাবেই জাদুবাস্তবতার আখ্যান নলিনী বেরার গল্পগুলিতে এক ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে।

নলিনী বেরার 'কুসুম তলা' নামক গল্পগ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে এক আঞ্চলিক জীবনানুরাগ। মোট আটটি গল্প রয়েছে এই গল্পগ্রন্থে। 'কুসুম তলা' গল্পে নগরজীবনের প্রাত্যহিক নানা উপকরণ—শপিং মল, বিগবাজার,ইন্টারনেট, বিউটি পার্লার এসবের পাশাপাশি ফেলে আসা লেখকের গ্রাম্য জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় উঠে এসেছে। অফিস যাবার পথে যমুনা সিনেমার গলিতে শপিং মলের সামনে বিহার ঝাড়খন্ডের কোন ব্যক্তিকে কুসুম ফল বিক্রি করতে দেখে সেই কুসুমের প্রকৃতি, স্বাদ ও কুসুম খাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা তাঁর মনে জেগে উঠেছে।কুসুমের বীজ থেকে তেল তৈরির বিশেষ পদ্ধতির মধ্যেও গল্পটিতে এক আঞ্চলিকতার ছাপ ফুটে উঠেছে। কুসুম গাছকে ঘিরে সন্নিহিত অঞ্চলের ভৌগোলিক বর্ণনা ও সেখানকার মানুষের ছবিও গল্পে চিত্রিত হয়েছে।লেখকের শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা কুসুম খাওয়ার বর্ণনাটিও ভারি চমৎকার। কুসুম গাছকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের লোকবিশ্বাস গল্পে ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে কুসুম গাছে যে ভূত থাকে তার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে যদি সাইজ করে কাগজের কুচি গাছের কোটরে রাখা হয় তাহলে পরের দিন ভোর বেলা সেই কাগজের কুচি টাকায় পরিণত হয়। গল্পের কথক বিষয়টির সত্যতা প্রমাণে উদ্যোগী হয়। তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত কুসুম গাছের কোটরে কাগজের কুচি রাখেন।কিন্তু তা ব্যর্থ হয়।এই কুসুমতলাতে মকর সংক্রান্তিতে মেলা বসে। টুসু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।সর্বোপরি, আঞ্চলিকতার ছোঁয়া

পাঠককে আকৃষ্ট করে এই গল্পের প্রতি। ‘দুকান কাটা’ গল্পে পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সরকারি নানা প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে গ্রামাঞ্চলের জীবন-জীবিকার পরিবর্তনের প্রয়াস ও প্রভাব চিত্রিত হয়েছে।এ গল্পে ঝাড়গ্রাম সংলগ্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা ফুটে উঠেছে।এই গল্পের লেখক দেখিয়েছেন লোধারা অশিক্ষিত এবং দারিদ্র্যের চরমসীমায় উপনীত। সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি দিয়ে পশু প্রদান করলেও উপযোগী পরিবেশ ও কাঠামো তাদের নেই। গল্পটিতে আঞ্চলিকতার অন্যতম শর্ত হিসাবে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। ‘চিড়কিন ডাঙ্গা’ গল্পটির মর্মমূলে রয়েছে এক লোকবিশ্বাস আর সেই বিশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে রোমান্স। ‘চিড়কিন’ শব্দটির অর্থ হল ভূত। চিড়কিন ডাঙ্গার সনাতন গুণিনের পুত্র গুরা মকাই-এর খেত পাহারা দিতে গিয়ে চিড়কিনকে বিয়ে করেছিল। চিড়কিন সম্পর্কে লেখক বলেছেন— “হয়তো কুমারী মা পেটের ছা নিয়ে মরল বিষ খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে লজ্জায়, তাকে এই নদী বালিতেই চুপিসারে পুঁতে দিয়ে গেল গায়ের লোক, মরল সে ঠিকই, তার কামনা বাসনা কিন্তু মরল না,রাত বিরাতে আদড়া যুবক দেখলে সে ছুঁক ছুঁক করে।চিড়কিন ভূত হয়ে সুন্দরীর ভেক ধরে হাত বাড়ায় - আয় !” চিড়কিন অর্থাৎ ভূতকে শেষ পর্যন্ত তিনি মানবিক সত্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন। এক অদ্ভুত রোমান্টিক সত্তা গল্পটির পরিণতিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সেজন্য ‘চিড়কিন’ ভূত কি না তা যাচাই করার শপথ থেকে তিনি সরে এসেছেন তাকে হারাবার ভয়ে। ‘ডারউইনের কান্না’ গল্পে ডারউইন হলেন লেখক নলিনী বেরা স্বয়ং। তাঁর কিশোর বয়সের স্মৃতি রয়েছে এই গল্পে।তাদের সংলগ্ন এলাকায় তার বাবা কাকাদের দ্বারা শিমুল গাছ জমা নেওয়া ও শিমুল ফল পাকলে তা গাছ থেকে পাড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক বিচিত্র অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে।জমা নেওয়া শিমুল গাছে বাকড়া অর্থাৎ শিমুল ফল পাড়তে যাওয়ার অভিজ্ঞতার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন তিনি।সেইসঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন তাদের বাখুলের জনা তিরিশেক ছেলে-মেয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন তার মেজ কাকা ও ছোট কাকার কাছে প্রিয়।তাই তাকে সঙ্গে নিয়ে তারা বাকড়া পাড়তে যেতেন।বাকড়া পারার জন্য তৈরি মজবুত ‘ঝুলি-জাল’-এর বর্ণনাটিও চমৎকার।গল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দ আঞ্চলিকতার আমেজটিকে গল্পে ধরে রেখেছে। সেই সঙ্গে পারিবারিক একাত্মতা ও উঠে এসেছে গ্রাম বাংলার প্রাণের দোসর হয়ে।সুতরাং ‘কুসুম তলা’র গল্পগুলিতে শুধু কুসুম তলার কথাই নেই সেই সঙ্গে লেখকের জন্মভূমি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নানা পরিচয়, লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয়, সেই অঞ্চলের মানুষের বিচিত্র পেশা ও বিভিন্ন বর্ণের মানুষের আচার-ব্যবহার,খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি,বিশ্বাস ও আর্থসামাজিক অবস্থাও প্রতিফলিত হয়েছে।

নলিনী বেরার গল্প আধুনিক কথা সাহিত্যের অন্যতম একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে। শিকড়ের সন্ধানে তিনি সদাব্যস্ত। এক অনুসন্ধানপ্রবণ মন তাঁর সাহিত্যে লক্ষ করা

যায়।বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাত্রাই তাঁর গল্পের গতিমুখ।তিনি একজন বিষয় নিরপেক্ষ লেখক। বাস্তবতার কাঠিন্য যেরকম তার গল্পে এসেছে, তেমনি নস্টালজিক অনুভূতিতেও অভিষিক্ত হয়েছে তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। দেশভাগ,মাটির প্রতি টান, লোকসংস্কৃতি, রূপকথা, পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসার স্মৃতিস্বরূপ তাঁর গল্পগুলি। ব্যাকরণ রীতি, শব্দ ব্যবহার, গল্পকথনের কৌশল ও 'হাটুয়া' ভাষার অকৃত্রিম ব্যবহার তাঁর গল্পগুলিকে এক অনন্য ও স্বতন্ত্র রূপ দান করেছে। এভাবেই সাহিত্যের পৃষ্ঠায় তিনি সর্বকালের সর্বজনের মনের কাছে চিরস্মরণীয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকবেন।

সহায়ক:

১. নলিনী বেরার সেরা ৫০টি গল্প, করুণা পাবলিকেশন, ২০০৪
২. নলিনী বেরার সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ প্রকাশনী, ২০১৫
৩. আন্তর্জাল সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য

প্রতিভা বসুর গল্পের অন্দরমহল: একটি পর্যালোচনা (নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে)

সঙ্গীতা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: প্রতিভা বসুর গল্প সাধারণ প্রেমের গল্প নয় বরং স্তরে স্তরে রয়েছে লেখকের গভীর জীবনবোধ ও জীবন জিজ্ঞাসা। নারী মুক্তি, নারীর জীবন সংগ্রাম তার সামাজিক বাধা অতিক্রমের আপ্রাণ চেষ্টা দেখা যাবে প্রতিভা বসুর বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে। বর্তমান আলোচনায় তাঁর 'অনর্থক', 'মাৎসুমোতো', 'সোনার শিকল', 'অন্ধকারে', 'দুটি পোস্টকার্ড' গল্পগুলি সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিসহ আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে নারী-পুরুষের বহুল মেলামেশার অবসরে বন্ধুত্ব ও প্রেমের বিকাশ এবং উদ্ভূত জীবনজটিলতা সহানুভূতিময় দৃষ্টিতে লেখক তুলে ধরেছেন 'অনর্থক', 'মাৎসুমোতো'-র আখ্যানে। 'অন্ধকারে' গল্পে রয়েছে গত শতাব্দীর ষাট সত্তরের দশকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গের ছবি। একইসঙ্গে এই গল্পে রয়েছে বীরেশ্বর ও অনুরাধার সুকুমার প্রেমের করুণ পরিণতি। স্বাধীনতা উত্তর ভারত তথা বাংলায় দ্রুতহারে বদলে যাওয়া সময়ের সাক্ষী প্রতিভা বসুর বিভিন্ন গল্প। দেশভাগ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির উত্থান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিরাচরিত নিয়ম গুলি ভেঙে ফেলে নারী পুরুষ উভয়েই এক নতুন পথের সহযাত্রী হয়ে উঠেছিল। যথার্থ নারীবাদী চেতনা ও মানবিকতাবোধ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিকে করেছে বহুমুখী। পুরুষের হাতে নারী নির্যাতনের চেনা ছকের বাইরে বিবাহিত জীবনে লাঞ্ছিত পুরুষের জীবন যন্ত্রণার উপস্থাপনে প্রতিভা বসুর 'সোনার শিকল' গল্পটি ছিল সমকালের হয়েও আধুনিক। লেখক হিসেবে প্রতিভা বসু জীবননিষ্ঠ ও নারী-পুরুষের প্রতি সহমর্মী। তাঁর গল্প হল এক কথায় জীবনের বহু বর্ণের বিচ্ছুরণ।

সূচক শব্দ: প্রতিভা বসু, ছোট গল্প, নারী চেতনা, মানবিক দৃষ্টি, নানা বর্ণের জীবন অভিজ্ঞতা, নির্ভার গদ্য, যথার্থ কথনশৈলী।

মূল আলোচনা:

প্রতিভা বসুর প্রেমের গল্পগুলিকে যদি অলস দুপুরে ভাতঘুমের উপযোগী হিসাবে ভেবে বসেন কোন পাঠক তাহলে তিনি যে একটি নিদারুণ ভুল করবেন তা আলোচনার শুরুতেই জানিয়ে রাখা ভাল। কারণ বর্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রতিভা বসুর আপাত প্রেমের সুগার কোটিং দেওয়া গল্পের মোড়ক খুলে তার ভিন্নতর ছবি নির্মাণের পথে এগোবো। লেখিকা নিজেও নিছক প্রেমের গল্প বা কপোত-কপোতীর বিশ্রম্ভালাপ তৈরি করে দায়িত্ব সারেননি সে কথা বলাই বাহুল্য। হাতের কাছে থাকা ২০১১ সালে দে'জ

পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত প্রতিভা বসুর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' বইটি আমাদের সম্বল। এ বইয়ের ২১টি ছোট গল্পের মধ্যে মুখ্যত বেছে নিয়েছি 'অনর্থক', 'মাৎসুমোতো', 'সোনার শিকল', 'অন্ধকারে', 'দুটি পোস্টকার্ড' এই গল্পগুলিকে।

আমাদের নির্বাচিত গল্প গুলির মধ্যে কাহিনির কেন্দ্রীয় বিষয় প্রেম- 'অনর্থক' গল্পের সমীর-মণি, 'মাৎসুমোতো'-য় মাসু ও তোসিও, 'অন্ধকারে' গল্পে বীরেশ্বর অনুরাধা, 'সোনার শিকল'-এ ত্রিদিবেশ ও সুবর্ণ- এদের প্রেম সম্পর্কের টানাপোড়েন হল মূল সূত্র। 'অনর্থক' গল্পে শৈশবের বন্ধুত্ব কৈশোরে কখন যে সমীরের মনে মণির জন্য প্রেমে পরিণত হয় মণিমালা বুঝতে পারেনা। অথবা বলা ভালো বুঝতে পারলেও অভ্যস্ত পরিচয়ের বহু ব্যবহারে মণি সমীরের প্রতি তীব্র আবেগ বা প্রেম অনুভব করতে ব্যর্থ হয়। সদ্য যৌবনের মায়া-মাখা চোখে তার ভালো লাগে চিন্ময়কে। যে চিন্ময় সুগঠিত পুরুষালি দেহসৌষ্ঠব ও মেধা নিয়ে মেয়ে মহলে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছিল। বিপরীতে সমীরের গায়ের রং ফর্সা, দেহের উপর হৃষ্টপুষ্ট কমনীয় ছাপ স্পষ্ট, তার চোখেও খেলেনো বুদ্ধির দীপ্তি। আসলে মণি ও সমীরের সম্পর্ক বাল্য পরিচয়ের অভ্যাসে প্রেমের নতুন পরিচয়ের রোমাঞ্চ জাগাতে ব্যর্থ হয়। তাই আধঘণ্টার পরিচয়ে ষোলো বছরের মণি চিন্ময় সম্পর্কে আগ্রহী হলেও সমীরের প্রতি তার মন বিমুখ। গল্পে আরো অগ্রসর হলে জানা যায় সমীর তিন বছরের জন্য বিলেত যাবে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশে। অপরদিকে চিন্ময়ের সঙ্গে মণির আলাপ পরিণয়ে স্থিতি পায়। মণিকে কেন্দ্র করে বাল্যের সুখস্মৃতি আবেগ ভালোলাগা সমীরের মনে প্রেমের উন্মেষ ঘটালেও মণির হৃদয় তাতে কোন মনোযোগ দেয়নি, সে বরং বাল্য বন্ধুটির কাছে বন্ধুতা পেয়েই খুশি ছিল। তাই শেষ অবধি সমীরও বুঝতে পারে নিজের ভুল। তাই মণির বিয়ের খবর পেয়ে বিলেত ফেরত সমীর প্যাডে লিখে রাখে– "এখন অবশ্য খুব স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, আমি আগাগোড়াই মণিকে ভুল বুঝেছিলাম।"[১]

প্রেম ও বন্ধুত্বের টানাপোড়েনে 'অনর্থক' যথার্থই বিষাদমধুর। একই রকম সমীকরণ দেখা যাবে 'মাৎসুমোতো' গল্পেও। ভারতীয় বন্ধুর কাছে জাপানি মেয়ে মাৎসুমোতো নিজের জীবনের ব্যর্থ প্রেম, ব্যর্থ বন্ধুত্বের যন্ত্রণার ইতিহাস প্রকাশ করে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছে। এখানেও দেখা যাবে মাৎসুমোতো সংক্ষেপে মাসু কিয়োটো শহরের ধনী সন্তান তোসিওর বাল্যবন্ধু। তোসিও মাসুর চিরদিনের বন্ধু এবং তোসিওকে মাসু ভালোইবাসে, তার জন্য মাসু কি না করতে পারে। কিন্তু তোসিও যখন মাসুকে প্রেম নিবেদন করে তখন মাসু বুঝল ভালোবাসারও রকমফের হয়। সকলের সঙ্গে সব ধরণের ভালোবাসা হয় না। যেমন তোসিওর সঙ্গে মাসুর প্রণয় হয়ে ওঠে না। তোসিওর মত বন্ধু সংসারে বিরল, সেই বন্ধুকে হারাবার সংশয়ে মাসু কাতর কিন্তু সে বন্ধুত্বকে বিবাহে পরিণত করতে চায় না। একদিকে তোসিওর মত সচ্চরিত্র উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিতে উন্মুখ মা-বাবার আকাঙ্ক্ষা অন্যদিকে তোসিওর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা

এ দুয়ের দ্বন্দ্বে দিশেহারা মাসু নিজের বিরোধিতাকে ভাষা দিতে পারে না। কিন্তু শেষ অবধি বিবাহের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও তারা পিছিয়ে আসে। তোসিওর রোগগ্রস্ত সময়ে সেবা যত্ন করতে করতে দ্বিধাগ্রস্ত মাসু ভাবে বিয়ে করলেই হয়ত প্রেম হবে। কিন্তু তাও সম্ভব হয়না। নতুনত্বের টানে মাসু জাপানে আগত এক জার্মানবাসির প্রেমে পড়ে। এ ঘটনায় তোসিও মর্মাহত হয়। সেও এক বিদেশিনীর সঙ্গে প্রণয় আবদ্ধ হয়। এমত জটিল পরিস্থিতিতে পৌঁছে মাসু তোসিও হায়াসির প্রতি নিজের মনোভাব দর্পণে দেখতে পায়। সে বুঝতে পারে তাদের বন্ধুত্বের আড়ালে, দেখাশোনা অভ্যাসের অন্তরালে তোসিওর প্রতি প্রেম ছাই চাপা আগুনের ন্যায় বর্তমান ছিল। যা উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রত্যাঘাত না পেলে মাসু হয়তো কোনোদিন অনুভবই করতে পারত না। বন্ধুত্ব ও প্রেমের দ্বন্দ্বময় বিন্যাস উপরোক্ত গল্পকে শুধুমাত্র 'মিষ্টি প্রেমের গল্প' এই বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে দেয়নি। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে নারী-পুরুষের বহুল মেলামেশার অবকাশে এমন অনেক বন্ধুত্ব ও প্রেম বুদবুদের মত তৈরি হয়ে কারো কারো মনে রঙিন স্বপ্নের জন্ম দিয়ে মিলিয়ে যায়। কেউ মনে রাখে, কেউ মনে রাখে না; কেউ কষ্ট পায়, কেউ পায় না। অল্প বয়সে অপরিণত মন অনেক সময়ই চিনতে পারেনা মনের মানুষকে, ফলে ভুল হয়। সম্পর্ক ভেঙে যায়, বন্ধুত্ব নষ্ট হয়। আধুনিক বিশ্বের এই সমস্যা বা সংকট প্রতিভা বসুর গল্পের বাস্তব অবলম্বনের প্রচেষ্টাকে চিনিয়ে দিয়েছে।

প্রায় সমধর্মী বিষয় প্রেম নিয়ে লেখা প্রতিভা বসু অপর গল্প হল 'অন্ধকারে'। সেখানেও বীরেশ্বর আর অনুরাধা পরস্পরের বন্ধু- 'একদিন দুদিন নয়, এক আধ বছর নয়, সেই প্রিপারেটরি থেকে এম. এ. অবধি'[২] তারা একসঙ্গে পড়েছে। বি. এ. পর্যন্ত সম্পর্ক সহজ বন্ধুত্বের থাকলেও তারপর লাগে বসন্তের চাঞ্চল্য। নিছক সহপাঠী বা সমবয়সীর বন্ধুত্ব ভালোবাসার উর্ধ্বে প্রেম এসে দোলা দিল দু'জনকেই। কিন্তু এ গল্পেও তারা সেই প্রেমকে প্রথম পর্যায়ে স্বীকার করতে রাজি ছিল না। 'পচা বাজে সেন্টিমেন্টাল' বলে এড়িয়ে যাওয়াই তাদের পক্ষে সহজতর ছিল। তবে বেশিদিন এ মনোভাব স্থায়ী হয় না। অপরদিকে রাজনীতির ছাত্র বীরেশ্বর ক্ষমতার জোরে আঘাত হানবে বলে উদ্দাম রাজনীতির অলিন্দে পা বাড়ায়। দিনের পর দিন সক্রিয় রাজনীতির কাজে বীরেশ্বর আত্মগোপন করে। অনুরাধা বীরেশ্বরের অভাব বুঝতে পারে। ওদিকে বীরেশ্বর প্রেমের সঙ্গীকে এক পথের সহযাত্রী করার আবেদন নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু অনুরাধা বীরেশ্বরকেই এই ঘৃণ্য চোরাগোপ্তা হত্যার পথ থেকে সরে আসার অনুরোধ জানায়। ফলস্বরূপ মিলতে পারে না দুজন। গল্পে বীরেশ্বর অনুরাধার সমবয়সী বন্ধুত্ব থেকে প্রেমে উত্তরণের মানচিত্র থাকলেও তার অভ্যন্তরে বিংশ শতকের ষাট সত্তরের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মেধাবী ছাত্রদের ক্ষমতা বদলের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও দুর্নিবার কর্মযজ্ঞের ইতিহাসকে এড়ানো সম্ভব হয় না পাঠকের পক্ষে। ক্ষমতা বদল হলেও যে পীড়নের মাত্রা পাল্টায়নি সেকথা যুবসমাজ বুঝতে পেরে নেমে পড়েছিল

দিনবদলের আশায়। গুপ্তহত্যা, নিষ্ঠুরতা, রক্তপাতের পিচ্ছিল পথে অনেক মেধাই সেদিন হারিয়ে গিয়েছিল সেই দুর্দিনের বাংলা তথা ভারতবর্ষ থেকে। একদিকে প্রেম ও রাজনৈতিক আদর্শ দুইয়ের মাঝে পড়ে বীরেশ্বর বারংবার অনুরাধার কাছে ফিরে আসে একমুঠো রোদের আশায়। আর বীরেশ্বরের মনে এখনো যে মনুষ্যত্ব মমতা অবশিষ্ট আছে তাকেই জাগাতে চায় অনুরাধা। কিন্তু তারও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে যখন পাড়ার সবচেয়ে পুরাতন প্রতিবেশী পরেশ সেনকে বীরেশ্বর ও তাদের দলের লোকজন ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতায়, মনুষ্যত্বের অপমানে এবং পাশবিক আচরণে হতবাক অনুরাধা নির্দ্বিধায় পুলিশকে দেখিয়ে দেয় বীরেশ্বরের ঠিকানা। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে সুকুমার হৃদয়ালাপ কখন যে ঘৃণা-বিশ্বাসঘাতকতা ও বেদনায় পরিণত হয় তারই নিদারুণ আলেখ্য 'অন্ধকারে' গল্পটি।

প্রতিভা বসুর 'অন্ধকারে' গল্পে একদিকে উগ্র প্রথাবিরোধী রাজনৈতিক আদর্শ আর বিপরীতে প্রথাগত মতাদর্শ এ দুইয়ের প্রবল দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান সমাজ পরিস্থিতি ও ইতিহাস বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। বীরেশ্বর ও তার দলবল অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায় না বরং তারা অন্যায়কে সমূলে উৎখাত করতে উদ্যত। অপরদিকে রয়েছে অনুরাধা, পরেশ সেন যারা রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ত্রুটি খুঁজে পেলেও মতাদর্শগত ভাবে সহিষ্ণু, ক্ষমতাকে উপড়ে ফেলতে তারা চান না, পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠানকে সংশোধনের পথে তারা বিশ্বাসী। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ক্ষমতার অলিন্দে শ্রমজীবীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে না দেখে বীরেশ্বরের মত তরুণেরা সজোরে আঘাত করতে চেয়েছিল ক্ষমতার প্রাচীরে। এর জন্য সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের রক্তপাত, হত্যা সবই ছিল ন্যায্য তাদের কাছে। আলোচ্য গল্পের এ সংকটময় অবস্থানে দাঁড়িয়ে পাঠক দ্বিধাগ্রস্ত হন অনুরাধা না বীরেশ্বর কার পক্ষ তিনি বেছে নেবেন। অবশ্য তার দরকারও নেই। আসলে তিনি তো লেখায় সমকালকে স্থান দিয়ে উত্তরকালকে সেই সময়ের দ্বন্দ্বটি ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন।

স্বাধীনতা উত্তর ভারত তথা বাংলায় খুব দ্রুত হারে বদলে যাচ্ছিল সময়। দেশের অর্থনীতির কাঠামো তখনও খুব বেশি পাকাপোক্ত হয়ে ওঠেনি। দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, যুদ্ধ, প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমস্যা সবই যেন নাগরিক জীবনে পুরনো বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সংস্কারকে নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল। শিক্ষার প্রসার বিশেষত মেয়েদের শিক্ষার পথ আরো উন্মুক্ত হওয়ায় তাদের মধ্যেও নতুন কর্মোদ্দীপনা, স্বাধীন জীবনের আকাঙ্ক্ষা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মানসিকতা আরো বলিষ্ঠ রূপ লাভ করতে থাকে। মেয়েরা খেলার পুতুল নয়, যাদের বিয়েতেই পার করে দিয়ে পরিবার নিশ্চিন্ত হবে– পূর্বতন যুগের ইমারতে তখন বেশ বড় রকমের ফাটল দেখা দিয়েছে। মূল্যবোধ ও সমাজবদলের চিত্র আমরা পূর্বের গল্পগুলিতেও দেখেছি - মণি, অনুরাধা স্কুল-

কলেজের শিক্ষার সিঁড়ি ডিঙিয়ে কর্মক্ষেত্রে পা দিয়েছে। উপযুক্ত প্রণয়প্রার্থীর প্রতি উন্মুখ হতে তারা দ্বিধান্বিত হয়নি। নিজেদের ইচ্ছে তারা জোর গলায় ঘোষণা করেছে। তেমনি ছবি দেখা যায় 'দুটি পোস্টকার্ড' গল্পেও। এই গল্পে দেখি অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণাঙ্গী নাতনির জন্য দাদু জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী ওকালতি ব্যবসার বেশ মোটা অঙ্কের টাকাই বরাদ্দ করে রেখেছেন বরপণ হিসেবে। যেন এটাই তো স্বাভাবিক, লেখকের কলমে- "তিনি জানেন, এই নাতনিকে বিয়ে দিতে একটু বেশি টাকাই খরচ হবে।"[৩] আসলে কালো মেয়ের বিয়ে দিতে এদেশে বরাবরই বেশি খরচ হয়ে থাকে। কিন্তু বনলতা চৌধুরী ওরফে বুলু প্রতিবাদ করে। যে ছেলেরা বিয়েতে টাকা নেয়, নিলামে চড়ে বউ সংগ্রহের জন্য, তাদের প্রতি সে বিমুখ। বুলু চায় এম. এ. পাস করে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে। অন্যের পোষা বিড়াল হতে নারাজ তাই পরীক্ষা পাসের পর বৃত্তি নিয়ে বিলেত যাওয়ার কথাও সে চিন্তা করে। এমন সময় এই কালো মেয়ের জন্যই বিয়ের সম্বন্ধ আসে। আপাত সৌজন্যের আড়ালে চলে দেনা-পাওনার হিসাব। ষোল হাজার টাকার পরিবর্তে কুড়ি হাজার টাকার দাবি উল্লেখিত পোস্টকার্ড বনলতার হাতে পড়লে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে নিঃসংকোচে আরেকটি পোস্টকার্ড লিখে জানিয়ে দেয়- "মানুষ মানুষই, সে কখনও আলু পটলের পাইকারি নিলামে চড়তে পারে না"[৪] এরপর গল্পে আগমন ঘটে নীলাঞ্জনের, যার সঙ্গে বনলতার বিয়ে স্থির হয়েছিল। সে ক্ষমাপ্রার্থী হয় পিতা-মাতার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য। তার অজান্তেই যে তার পিতা-মাতা দেনা পাওনার হিসেব করেছিলেন সেকথাটি জানিয়ে হবু স্ত্রীকে বিয়ের দিন নির্ধারণের জন্য রাজি করায়। গল্পটির পরিণতি মধুর। যোগ্য কন্যার যোগ্য বর নির্ধারণ করে লেখক পরিবর্তিত সময়ে নর-নারীর মধ্যে সহযোগিতামূলক সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুন্দর ইঙ্গিত দিয়েছেন। যাদের জগতে ঘর ও বাইরের তফাৎ অলঙ্ঘনীয় হবে না, যারা গৃহে ও কর্মে পরস্পরের সহযোগী হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা রাখে। শিক্ষার আলো যাদের মন থেকে হীনতা দূর করতে পেরেছে। এ গল্পে নর নারীর বিবাহপূর্ব প্রণয় না থাকলেও পরিণতি যে প্রণয় সম্ভাষণে তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। আর তার অভ্যন্তরে যে আত্মমর্যাদাবোধে দৃপ্ত নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অকপট মন, বলিষ্ঠ জীবন গঠনের আকাঙ্ক্ষা এবং পুরুষের ঐতিহ্যগত সংস্কারের আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত এই আখ্যানকে যথার্থরূপে সময় উপযোগী করে তুলেছে। সাবলীল ভাষাভঙ্গি ও নির্ভার গল্পকথন রীতি এই গল্পের পাঠকের আরেক বিশেষ প্রাপ্তি।

প্রতিভা বসুর 'দুটি পোস্টকার্ড' গল্প মনে করিয়ে দেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা', 'হৈমন্তী' ও 'অপরিচিতা' গল্পের কথা। 'দেনাপাওনা'-য় নিরুপমার সচেষ্ট আত্মহত্যা ও তার স্বামীর পুনর্বিবাহ; 'হৈমন্তী'-তে হৈমন্তীর মৃত্যুর পর অপূর্বর বিয়ে না করতে চেয়েও সুবোধ বালকের মতো বিয়ের পিঁড়িতে বসার সাক্ষী রবীন্দ্রনাথের সকল পাঠক। আর মাসিক 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত 'অপরিচিতা' গল্পে দেখা যায় সোনার গয়না নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে কন্যার পিতা বরপক্ষকে বিদায় দেন। রবীন্দ্রনাথের কলমেও

মেয়েরা দেনা পাওনার ভারে পিষ্ট জীবন থেকে ধীরে ধীরে উত্তরণের পথে এগোচ্ছে। তবে রবীন্দ্রগল্পে মেয়েদের অভিভাবকই তাদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত সেখানে প্রতিভা বসুর গল্পে মেয়েরা আরো এক ধাপ এগিয়ে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। নতুন ধরনের শিক্ষা ও সভ্যতার আলো পূর্বতন সংস্কারকে বিচার বিশ্লেষণের কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে। সংস্কারের পথে সমাজে নতুন মোড় ঘুরেছে তার স্পষ্ট চিহ্ন প্রতিভা বসুর বিভিন্ন গল্পে। যুগের বাতাবরণ ব্যক্তি চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে তাই নীলাঞ্জন নিষ্ক্রিয় চরিত্র নয়, সেও পিতা-মাতার ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে।

প্রায় কুড়ি পাতার বড় গল্প 'সোনার শিকল' দাম্পত্য জীবনের কাহিনি। যে দাম্পত্যের নায়ক নায়িকা ধনীর পুত্র ত্রিদিবেশ ও ধনাঢ্য ঘরের মেয়ে সুবর্ণ। বিবাহপূর্বকালে ত্রিদিবেশ গোপাল মাস্টারের অনাথ ভাগ্নি অতসীকে ভালবাসলেও রাশভারী পিতা প্রমথেশ বাবুর অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিত্বহীন পুত্র হিসেবে সে অতসীর কথা বলতে পারে না। তার ভীরু স্বভাবের সুযোগে প্রমথেশবাবু গোপাল মাস্টারকে অর্থ দিয়ে বাধ্য করেন বৃদ্ধ দোজবরের সঙ্গে অতসীর বিয়ে দিতে। এই আকস্মিক আঘাত ত্রিদিবেশকে দিশেহারা করলেও ধনীর গৃহে পালিত সন্তান কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে করে আনে সুবর্ণকে। সুকুমার হৃদয় ত্রিদিবেশ পরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হতেই চেয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে তার জীবনে জটিলতাও কিছু ছিল না। কিন্তু বাধ সাধল সুবর্ণর স্বভাব। আদরে প্রতিপালিত ঘরমুখো প্রায় অসামাজিক সুবর্ণ স্বামীর প্রতি প্রবল অধিকারবোধে আক্রান্ত। সর্বক্ষণ সোনার শিকলে বেঁধে রাখতে চায় স্বামীকে। বহির্জগতের সঙ্গে সংস্রবহীন জীবনযাপনে বাধ্য করে তাকে। আর ত্রিদিবেশ যেভাবে পিতাকে পূর্ব প্রণয়ের কথা বলতে পারে না তেমনি স্ত্রীকেও একঘেয়ে জীবনে অস্বস্তির অভিযোগ জানাতে পারে না। ফলে সেও সুখী দাম্পত্যের নিপুণ অভিনয় করে যান্ত্রিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়। শাড়ি গয়না আর স্বামী নামক জড়বস্তুকে নিয়ে সুবর্ণ আত্মমগ্ন থাকে। তাদের এরকম জীবন চলতেই থাকত যদি না ইঁদুরে কাটা পুরনো সুটকেস পরিষ্কার করতে গিয়ে ভৃত্য মলিন প্রেমের চিহ্নযুক্ত একটি সস্তা শাঁখের আংটি খুঁজে পেত। আংটিটি ছিল অতসীর। সুবর্ণ কিছু না জেনেই ঈর্ষা ও ক্রোধে কটুবাক্যে বিদ্ধ করতে থাকে ত্রিদিবেশকে। সে যন্ত্রণাময় সংসারিক জীবন থেকে অব্যাহতি পেতে আত্মহত্যার পথই শ্রেয় মনে করে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তারপর ঘটনাচক্রে সে ফিরে যায় অতসীর বাড়ি। কিন্তু সেখানেও সে স্থায়ী হতে পারেনি। তাকে ফিরে আসতে হয় সুবর্ণর কাছে। আবারও তার নিত্য মৃত্যুযন্ত্রণাতুল্য বৈবাহিক জীবনের নাটক চলতে থাকে। সুবর্ণর বিচারবুদ্ধির বিকাশ স্বাভাবিক পথে ঘটেনি। আত্মমগ্ন মন তাকে নিজের বাইরে অন্য জগত চিনতে শেখায়নি। মানবিক গুণাবলির মধ্যে কেবল লোভ, দ্বেষ, আর ঈর্ষাই সে পেয়েছে। আর যা পেয়েছে তা হল, স্বামীর উপর একাধিপত্যের অধিকারবোধ। বিবাহের মন্ত্র পড়লেই যে স্ত্রী 'সহধর্মিনী' হয়ে ওঠেনা একথা ত্রিদিবেশ টের পেয়েছে।

কিন্তু বৈবাহিক দায়দায়িত্ব ফেলে চলে যাওয়ার মতো সাহস বা মানসিক বল তার কোনটাই নেই। ফলে এমন জীবন থেকে তার উত্তরণ হয়না। একই রকম স্ত্রীর অত্যাচারে নব বিবাহিত জীবনের সমস্ত আশা সুখ স্বপ্ন ধূলিসাৎ হওয়ার কাহিনি ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত প্রতিভা বসুর উপন্যাস 'বিবাহিতা স্ত্রী'। সেখানেও সুনন্দের জীবনে প্রমীলা মূর্তিমান বিভীষিকা। এই উপন্যাসে লেখক দীর্ঘদিন পুরুষের হাতে নারীর লাঞ্ছনার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত পাঠককে এর উল্টো ছবিটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছেন। সমাজের চোখে হীন প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে এবং মান সম্মান হারানোর আশঙ্কায় অনেক পুরুষই বৈবাহিক জীবনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারেন না। বর্তমানে আইন ব্যবস্থার বহু সংস্কারে এবং যুগের অগ্রগতিতে এ সমস্যাকেও অপরাধের আওতায় আনা হয়েছে। কিন্তু প্রতিভা বসু যখন এ গল্প বা উপন্যাস রচনা করেছেন তখন অবধি পুরুষ নির্যাতন সম্পর্কে সমাজ এতটাও সচেতন ছিল না সে কথা বলাই বাহুল্য। ফলে আলোচ্য গল্পটিতে লেখক সমকালের চেয়ে অনেক আধুনিক মন নিয়ে বাস্তব সমস্যাকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পাঠকের দরবারে তুলে ধরেছেন। নিছক নারীবাদী মনোভাব থেকে সুবর্ণর অন্যায়-অত্যাচারকে গুরুত্বহীন করে দেখানোর কোনো চেষ্টা লেখক করেননি। এখানেই গল্পটি জীবনের বস্তুনিষ্ঠ রূপ নিয়ে আপন স্বরূপে জাজ্বল্যমান।

চল্লিশের দশকে লিখতে শুরু করার পরের তিন দশকে ছোট গল্পের যে সম্ভার প্রতিভা বসু বাংলা সাহিত্যকে দান করেছেন তার মূল্য অনেক। পরিবর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, বিচিত্র রাজনৈতিক অবস্থা এবং ততোধিক বহুবিচিত্র মানব হৃদয় নিয়ে প্রতিভা বসু রচিত গল্পগুলি নানান আঙ্গিক থেকে বহুবর্ণিল। লেখক হিসেবে তিনি পরিণত, নির্ভীক ও আধুনিক। গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা ইংরেজিতে যাকে বলে 'story-telling' প্রতিভা বসুর গল্প এ বিষয়ে অনন্য। আমাদের আলোচিত প্রতিটি গল্পে দেখা যায় আস্তে আস্তে ভাঁজ খুলে লেখক জীবনের নানান রূপ উন্মোচিত করেছেন। কখনো প্রেম বন্ধুত্বের টানাপোড়েন, কখনো বৈবাহিক জীবনের করুণ পরিণতি আবার কখনো নায়ক-নায়িকার মিলনে মধুরেণ সমাপয়েৎ উপসংহার পাঠকের মনোরঞ্জন করেছে। আবার 'অন্ধকারে'-র মত গল্পে অগ্নিগর্ভ যুগের জীবন সংকটকে মূর্ত করে তুলেছেন। দেশভাগ, দাঙ্গা, মূল্যবোধের অপচয়, উদ্বাস্তু সমস্যা এসব নিয়েও বলিষ্ঠ হাতে লিখেছেন 'মিসেস পালিতের গার্ডেন পার্টি', 'রিফিউজি মেয়ে', 'দুকূলহারা'-র মতো গল্প। ঝরঝরে আধুনিক ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে প্রতিভা বসুর কলমে মানব প্রবৃত্তির বহুবিচিত্র ছবি বারংবার ধরা দিয়েছে। পুরুষতন্ত্রের কঠিন নিয়মে সামাজিক অনুশাসনের চাপে দিনের পর দিন লাঞ্ছিত অপমানিত মেয়েদের করুণ দুর্দশা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। আবার অন্যদিকে পুরুষকে তিনি কেবল আক্রমণের বাণে বিদ্ধ করেননি; তাদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল, তাদের জীবনযন্ত্রণার প্রতিও তিনি সমদর্শী। আসলে জীবননিষ্ঠ লেখক

তো এমনই হবেন। পরিশেষে তাই বলা যায়, সাহিত্যের বৃহৎ পরিসরে প্রতিভা বসু এক অবিস্মরণীয় নাম।

তথ্যসূত্র:

১. অনর্থক, শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রতিভা বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা-১৭।

২. অন্ধকারে, শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রতিভা বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা-২২২।

৩. দুটি পোস্টকার্ড, শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রতিভা বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা-২৯৪।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯৫।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. প্রতিভা বসু, বিবাহিতা স্ত্রী, নাভানা, কলকাতা-১৩, প্রথম মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৬১, মে ১৯৫৪।

২. প্রতিভা বসু, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, মজুমদার লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নির্বাচিত উপন্যাসে স্বাধীনতা-পরবর্তী নাগরিক নারী

প্রিয়মিতা ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিম মেদিনীপুর

সংক্ষিপ্তসার: বিশ শতকে স্বাধীনোত্তর যুগে আর্থসামাজিকতা, অর্থনৈতিক ভগ্নতা, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন, জীবনবোধ বিশিষ্টতা লাভ করে। সময়ের এই প্রভাব অধিক দৃষ্ট হয় স্বাভাবিকভাবেই শহরে, শহরের নারী জীবনের মধ্যেও। একদিকে অর্থের সঙ্কটে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনসমস্যা-জীবনসংগ্রাম, অন্যদিকে জীবনবাসনা-ভোগাকাঙ্খা, অনেকাংশে এর দরুন আদর্শচ্যুতি, রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া-এ সবই নাগরিক নারীদের জীবনদৃষ্টিতে এসেছে। তাছাড়া শহরে নারীস্বাধীনতা-ব্যক্তিচেতনা, সর্বক্ষেত্রে নারীর যোগদান আর আত্মপ্রতিষ্ঠা, স্বাধীনভাবে বাঁচার চেষ্টা বর্তমান। আর উক্ত এই যাবতীয় বা আধুনিক প্রেক্ষিতে নারীর জীবনে আছে সমস্যা, উত্তরণও। সবকিছু নিয়েই নগরের নারীগণ, তাদের জীবন। এর চিত্রায়ণ ঘটেছে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসে; যেমন- 'জন্মেছি এই দেশে', 'জ্যোতিষী', 'হায়নার দাঁত', 'বজ্রে বাজে বাঁশী', 'একাল চিরকাল'- এ।

সূচক শব্দ: স্বাধীনোত্তর যুগ, আর্থসামাজিকতা, অর্থনৈতিক ভগ্নতা, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, জীবনবোধ, সময়ের প্রভাব, শহরের নারীজীবন, অর্থের সঙ্কট, জীবনসমস্যা-জীবনসংগ্রাম, জীবনবাসনা-ভোগাকাঙ্খা, আদর্শচ্যুতি, রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া, নারীদের জীবনদৃষ্টি, নারীস্বাধীনতা-ব্যাক্তিচেতনা, সর্বক্ষেত্রে নারীর যোগদান, আত্মপ্রতিষ্ঠা, স্বাধীনভাবে বাঁচার চেষ্টা, সমস্যা, উত্তরণ, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস।

মূল আলোচনা:

বর্তমান সমাজ এখনও 'পিতৃতান্ত্রিক' বলে মনে করা হয়। এই 'পিতৃতান্ত্রিক' শব্দটিই প্রমাণ করে দেয় সমাজে পুরুষের প্রাধান্য ও নারীর প্রতি অবহেলা। আজও একুশ শতকেও উত্তর আধুনিক যুগেও, নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হলেও নারীর প্রতি সম্পূর্ণ উদারতা পোষণ করতে কিছুটা অপারগ আমাদের সমাজ। কিন্তু অতীতের নারীকেন্দ্রিক গোঁড়ামি, সম্পূর্ণ 'পিতৃতান্ত্রিকতা' বা 'পুরুষতান্ত্রিকতা'–র বিবর্তন বা পরিবর্তন হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। নারীর প্রতি সমদৃষ্টি নিক্ষেপ, তাকে অধিকার প্রদান করা হয়েছে। আন্দোলন হয়েছে, সমাজ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস।

মধ্যযুগীয় ধারাবাহিকতার পরিণাম হিসাবে ঔপনিবেশিক ভারতে নারীদের অবস্থান ও ভূমিকা ছিল খুবই নেতিবাচক। কিন্তু এই উনিশ-বিশ শতকেই পূর্বের অনুসরণ প্রবণতা আর রইল না। উনিশ শতকেই আধুনিকতা, উদারনৈতিক চিন্তাধারা, জাতীয়তাবাদের প্রসারে নারীউন্নতির প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। তাতে প্রতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া নারীবাদ, সক্রিয় নারীচিন্তার সরণি বেয়ে মেয়েদের সার্বিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হতে থাকে। নারীর ব্যক্তিভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা পরিবার ব্যতীত সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির পরিসরেও নারীর অবদান অংশগ্রহণ হয়ে ওঠে সর্বজনস্বীকৃত, বিস্ময়কর। বাংলার নারীদের ইতিহাস রচনায় বিশ শতকে বাংলার অর্থনীতিতে নারীদের যোগদান এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহনে নারীদের অবস্থা জানা যায়, তা প্রদীপ বসু বলেছেন।[১]

আধুনিক যুগে নারী সমাজের সক্রিয় শক্তি, পুরুষের সমকক্ষ, স্বাধীন সত্তারূপে বিবেচ্য। এসময় নারীর স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের বিষয়টিই মুখ্য। উদারপন্থী নারীবাদ সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলে বলে রাজশ্রী বসু বলেছেন।[২] আধুনিক বিশ্বে, ভারত-বাংলায় জাতির অগ্রগতির কথা ভেবে যুক্তিবাদ, মানবতা, নারীচিন্তা আন্দোলন, সমাজসংস্কার এসবের দরুন নারীর অন্তরঙ্গ রূপ ও বহিরঙ্গ জীবনই গেল পরিবর্তিত হয়ে। ফলে সমাজও আর পূর্বানুসারী রইল না।

তবে এও ঠিক যে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি মানুষের মানসিকতা, তার জীবনকে নির্মাণ করে। এই যে নারীর অবস্থা-অবস্থান, পরিবর্তনহল তা যেমন সমাজেরই অনিবার্য বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল, তেমনই তার জীবন, দৃষ্টিভঙ্গির যে নির্মাণ হল বা নারীর চেনা ছক ভেঙে বহির্গমন, আন্তরিক বা জীবনধর্মের বিবর্তন সবই কালসম্পৃক্ত। অর্থাৎ আধুনিক সমাজ সময় বিন্যাসই এর নেপথ্যে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করল।

বিশ শতক বড় অস্থিত। দুই বিশ্বযুদ্ধ ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন,মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা (১৯৪৬), স্বাধীনতা অর্জন (১৯৪৭), দেশভাগ, উদ্বাস্ত সমস্যা, তারপরও স্বাধীনোত্তর নকশালসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের, রাজনৈতিক দলগুলির মতবিরোধের, অন্যান্য নীতির কুফল ভোগ করতে লাগল সাধারণ মানুষ। এর সুফল ছিল অতি নগন্য। তাছাড়া দেশের অর্থনীতির ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছে ততদিনে। আর ধনতান্ত্রিকতার প্রভাব আর্থসামাজিকতায়, রাজনীতিতেও। ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে সমাজ মূলত ধনী, মধ্যবিত্ত এবং সর্বহারা - এই তিন শ্রেনীতে বিভক্ত হয়ে গেছে আগেই বা বিশ শতকে। ফলে উক্ত যাবতীয় ঘটনাসমূহ বা তার পরিণামে মুখ্যত মধ্যবিত্ত, দরিদ্র বা মানুষেরই জীবন হয়ে উঠল দুর্বিষহ। তাই স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ বা বাংলা বড়ই যন্ত্রণাক্লিষ্ট।

অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ মানুষের অবস্থার কোন উন্নতি তেমন লক্ষণীয় নয়, শাসকবদল হয়েছে মাত্র। রাজনৈতিক জটিলতা, আর্থসামাজিক গঠনে ত্রুটি ইত্যাদি কারণে দারিদ্র্য, অর্থকষ্ট, বেকারত্বসহ জটিল সমাজে নানাবিধ সঙ্কটে জর্জরিত হয়ে পড়ল মানুষ। অস্তিত্ব সঙ্কট, অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা, হতাশা, বিপন্নতা-বেদনা, সমষ্টির সঙ্গে একীভূত হতে চাওয়া ও না পারার দ্বন্দ্বে নানাবিধ মানসিক সংঘাত-সঙ্কুলতায়, বস্তুত সমাজনীতি-অর্থনীতি-রাজনীতির চাপে মানুষ হয়ে উঠল অসহায় বিক্ষত। তাই বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন – "স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাঙালী মানুষ তাই সব সময়েই ছিল চঞ্চল, অস্থিত, নানান অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার চাপে অসহায়।"[৩]

সভ্যতার অগ্রসরতা বা আধুনিকতার সঙ্গে নগরের বিশেষ সম্পৃক্তি। আর এই নগরসমাজের সঙ্গে বিশেষ সম্পৃক্ত মধ্যবিত্ত জীবন। উক্ত প্রেক্ষাপটে এই গোত্রভুক্ত নারী-পুরুষ সবার জীবন এলোমেলো হয়ে গেছে স্বাধীনতার পরেও, দুর্ভোগ হয়েছে। তাছাড়া ভোগ্যপণ্যবহুল সমাজে মানুষ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের দরুণ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার আগ্রহ ও উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তদের জীবনের সবদিকে মান উন্নত করার প্রতিযোগিতার কথা বলেছেন বীরেন্দ্র দত্ত।[৪] একদিকে জীবনাকাঙ্খা, অন্যদিকে অপ্রাপ্তি, সমসাময়িকতা ও ব্যক্তিচেতনার পরিনামে, নানাভাবে তাই দেখা দিল মূল্যবোধ ভাঙন, পারিবারিক-সামাজিক দৃষ্টিতে এল পরিবর্তন।

এমন এক সময়ে সাহিত্যিকবৃন্দের কলমে, রচনার ছত্রে এহেন সমাজবাস্তবতা প্রকট হওয়াই স্বাভাবিক। কথাসাহিত্যের চারণভূমি তো প্রস্তুত ছিলই। আর তাতে শিল্পীর গভীর সাময়িক চিন্তার প্রতিফলন ঘটায় বিশ শতকে, স্বাধীনোত্তর সময়ে কথাসাহিত্যের স্বভাব গেল বদলে। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যেকোন গল্প উপন্যাসেই প্রেক্ষাপট এবং নির্মিত নারী-পুরুষ চরিত্রসমূহও সাময়িক ও চুড়ান্ত বাস্তবসম্মত।

ইতিহাসের ধারা বেয়ে স্বাধীনতার পরে লেখকগণ নারী, তাদের জীবনবোধ নির্মাণে অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে নির্মিত নারীগণ লেখকের অভিপ্রেত বক্তব্য বা সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বিশ শতকের সামগ্রিক পরিস্থিতির নিরিখে রচনায় নারীর জীবনদৃষ্টি বিচার্য। তাছাড়া নারীবাদ ও আধুনিকতার হাত ধরে যে নারীদের জন্ম ও বিকাশ ঘটেছিল স্বাধীনোত্তর কালে বাংলা কথাসাহিত্যে তাদেরই সন্ধান পেল পাঠককুল। বলা বাহুল্য, এ বিশিষ্টতা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসে নির্মিত নারীর চরিত্র-জীবনেও।

'জ্যোতিষী' (১৩৭২) উপন্যাসে সরমা 'জ্যোতিষী' বরদার স্ত্রী, কাশীতে বরদার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। বিশেষ কারণে বরদা যখন তাকে গ্রহণ না করেই কলকাতায় ফেরার উদ্যোগ করেন তখন সরমার মধ্যে প্রকাশ পায় আত্মসচেতনতা, সন্মানবোধ

প্রতিবাদ, তীব্রতা –'...আমিও এমন কিছু তাচ্ছিল্যের জিনিস নই যে, দুদিন খুশিমতো প্রয়োজনমতো দুটো মিথ্যে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে খেলা করবেন, আর তারপর ছেঁড়া জুতোর মতো ফেলে চলে যাবেন।'[৫] এভাবেই পুরুষের সামনে আপন চাওয়াপাওয়াকে ব্যক্ত করেছে সে।শেষে পরোক্ষে বরদাকে আক্রমণ করেই যেন স্বীকৃতি আদায়ে সচেষ্ট হয়েছে। এভাবেই শহরে নারীরা অস্তিত্ব অধিকার সম্বন্ধে সচেতন এবং তা রক্ষা করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে তৎপর।

তাই স্বকীয়তা, ব্যক্তিগত বাসনাকে বলি দেওয়ার বিরোধী সে।স্বামীর অপছন্দ সত্ত্বেও প্রতিবেশী যুবকের সঙ্গে সহজ-বন্ধুত্ব বা হৃদ্যতা বজায় রাখার পক্ষপাতী সে। তাই বরদার মিথ্যা সন্দেহে অপমানিত সরমা প্রতিবাদ করে জবাব দিয়েছে। একসময় স্বামী এহেন অন্যায়, মানসিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ সরমা বরদাকে জব্দ করতে, প্রতিশোধ নিতে, অভিমানে পরপুরুষ সন্তোষকে রাজি করিয়ে তার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে।অথচ সন্তোষের সঙ্গে আদতেই সে সম্পর্কে যুক্ত নয়। অর্থাৎ নগরে নরীর ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিচেতনায় চিরাচরিত মূল্যবোধ ভেঙে পুরুষতন্ত্র, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ, বিদ্রোহ এভাবেই গঠিত হয়েছে।

কিন্তু বিবাহের পর সে সংসারের প্রতি দায়িত্বপরায়ণ, অনুগত ছিল। কলহ সত্ত্বেও বরদাকেই সে আজীবন ভালোবেসেছে, শেষে তার কাছেই ফিরতে চেয়েছে- "কিন্তু আজ ও সমস্তরকম লাঞ্ছনার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে – শত নির্যাতনেও আর বরদাকে ছেড়ে সে যাবে না।"[৬] স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ-মনোভাব প্রেম, পাতিব্রত্য তখনও নারীদের চেতনায় বিদ্যমান। তাছাড়া শিবরাত্রি করে বরদাকে লাভ করেছে বলে সরমার বিশ্বাস। বরদার মা তীর্থে গিয়ে গ্রহ-ফাঁড়া কাটানোয় বিশ্বাসী। অর্থাৎ ধর্ম, প্রাচীন সংস্কারে বিশ্বাস, এক সনাতনপন্থী ধারণা যেমন নারীদের মধ্যে বিদ্যমান, তেমনই তা নগরের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে নারীদের সুবাদে।

'জন্মেছি এই দেশে' (১৯৫৭) উপন্যাসে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেই শহর কলকাতা বা শহরতলীর মূলত মধ্যবিত্ত নারীদের জীবন সংগ্রামের কথা বলেছেন লেখক। তখনকার দিনে শহরে চাকুরিজীবি সাধারন মানুষের স্বল্প উপার্জন, অর্থকষ্ট, জীবনসমস্যা – এসবের প্রতিনিধিত্ব করেছে নারীরা।

সংসারের ব্যয়ভার বহন করতে, বোনের পড়ার খরচ জোগাতে পূর্ণিমাকে বাধ্য হয়ে, দায়ে পড়ে পড়াশুনা ছেড়ে সামান্য টাকার চাকরিতে ঢুকতে হয় –"ঠান্ডা স্বভাবের মেয়ে।... অনেকগুলি পোষ্য বাড়িতে – তাই ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বি.এ. পড়তে পড়তেই চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে, ক-টা মাস থাকলেই পরীক্ষা দিতে পারত, কিন্তু তাও সম্ভব হয় নি।"[৭] আবার পর্যাপ্ত উপার্জন না হওয়ায় তাকে অধিক পরিশ্রম করে টিউশনীও করতে হয়। তাদের সংসারে যে দৈন্য-অনটন বজায় আছে তা বোঝা যায় কষ্টেসৃষ্টে তৈরী করে পিঠে এনে পূর্ণিমার কথায় –'আমাদের অবস্থাও আপনাদের চেয়ে

খুব ভাল নয়। ... অন্য অনেকখরচ থেকে বাঁচিয়ে এটা পূরণ করতে হবে।...'[৮] জয়ন্তীও প্রয়োজনীয় বিলাসের জন্য বাধ্য হয়ে চাকরিতে ঢোকে। বিমল অফিসে সহকর্মিণীদের দেখে বলেছে—'আপনাদের অনিমাদি বিয়ের পরে চাকরিতে ঢুকেছেন, সংসারের টানাটানি দেখে...।'[৯]

অর্থাৎ বিশ শতকে মেয়েরা প্রয়োজনে, বাধ্য হয়েই যে উপার্জনে সামিল হয়, এক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন। শহরে নিম্নমধ্যবিত্তের অর্থ অপ্রতুলতার দরুণ জীবনধারণে সমস্যা হলে সেই শ্রেনীভুক্ত মেয়েরাও অস্তিত্বসংকটে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকায় চেষ্টিত হয়েছে। সমস্যা অতিক্রম করতে টাকার অভাব মেটাতে তারাও বাইরে বেরিয়ে অফিসে চাকরি করেছে, নিছক পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে আর থাকেনি। নারীস্বাধীনতাকে হাতিয়ার করে আধুনিক নাগরিক নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে।

'বজ্রে বাজে বাঁশী' (১৩৭৯) নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে নির্মিত। এ সময়ে চারিদিকে এক মারাত্মক আন্দোলন গড়ে ওঠে; মারামারি হানাহানি, খুন-ধবংস, সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া অর্থনৈতিক দুরাবস্থার দরুণ নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের অবস্থা তখন সঙ্গীন। এমন এক উত্তাল সময়, যন্ত্রণাময় পরিস্থিতিতে শহরে নারীদের অবস্থানকে লেখক তুলে ধরেছেন।

আশ্রিত সুভদ্রা দীপ্তা তার বোন তীপু,ভাইসহ তার বাবা-মা এদের অভাবের সংসারে অন্নের ব্যবস্থা করে – "প্রতিদিন অসম্ভব সম্ভব করার সাধনা তার। যেখানে এক পয়সাও আয় নেই, সেখানে ন-দশটি প্রাণীর আহার্যের সংস্থান করা।

কানাইদা চিবকালই এমনি।

অমানুষ, দায়িত্বজ্ঞানহীন।"[১০] আর তারা বেঁচে থাকে কোনরকমে কৃচ্ছ্রতায় – "সুভদ্রা তার ওপরও রাস্তার ধারে দূর্বা ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে যে গয়লানটে শাক হয়ে ছিল, সেগুলো সংগ্রহ ক'রে এনে বেছে গরম জলে ধুয়ে নিয়ে ভাজা করল।"[১১] বোঝা যায়, শহরে নারী বা মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনধারণ বা জীবনযাপন কতটা কঠিন, দুর্ভাবনাময়। অর্থকষ্টে তারা জর্জরিত, বাস্তবিকই তৎকালীন আর্থসামাজিকতা, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনসমস্যা নাগরিক নারীদের জীবনাচরণে প্রকট।

সেই কারনেই নারীরা সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে চায়। বস্তুত পুরুষের পরিবর্তে মেয়েরাই সংসারের অন্নসংস্থানের কথা ভাবে –"সেটা ভাবে শোভা ও সুভদ্রা।

....

আশ্চর্য ! কোথা থেকে যে আসছে এই বিরাট সংসারের বিপুল খরচা, সে কথাটা একবারও ভাবে না কানাইদা !"[১২] তার জন্য সুভদ্রা লোকের বাড়ি রাঁধুনিবৃত্তি করে বা কানাইয়ের স্ত্রী শোভা লোকের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে প্রদীপের মা অভাবের মধ্যেই সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন –"প্রদীপের মা চিরদিন লোকের কাছে ভিক্ষে ক'রে ওদের বই-খাতা সংগ্রহ করেছেন, মেগে-পেতে ইস্কুলের সেক্রেটারী

মেম্বারদের ধরে ফ্রী হাফ-ফ্রী করিয়ে নিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করেছেন।“[১৩] অর্থাৎ নারী নিছক ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ না করে জীবনযুদ্ধে সামিল হয়েছে। দায়িত্বপরায়ণ হয়ে উঠেছে। পুরুষের প্রভাবকে কার্যত এড়িয়ে নিজেরাই পারিবারিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে গণ্ডীবদ্ধ না থেকে।

আর এই বেঁচে থাকার তাগিদে বা ভালভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছায় মূল্যবোধ বিচ্যুতি ঘটে যায়। ভদ্র ঘরের সুভদ্রার পরের বাড়ি কাজ করা বা শোভার মানসম্মান, চক্ষুলজ্জা বির্সজন দিয়ে লোকের কাছে হাত পেতে দাঁড়ানোয় তার প্রমাণ। দীপ্তা জীবনকে ভোগ করতে চায়, বিলাসচাহিদা তারও আছে। আর অল্পবয়সী তীপু সত্যেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে, জীবনকে উপভোগ বা ভোগ করে পুরুষের হাত ধরে –“তীপু সত্যেনের সঙ্গে সিনেমায় বা অন্য কোথাও গিয়েছিল, সে খেয়েই ফিরেছে।

আজকাল প্রায়ই এমনি বাইরে থেকে খেয়ে আসে সে।“[১৪] এইভাবে নিজেদের মর্যাদা বিকিয়ে দেয় মেয়েরা। শেষে তীপু গর্ভবতী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কলকাতার উপকণ্ঠে শহরাঞ্চলে মেয়েদের ভোগবাদীতা, জীবনোপভোগ, প্রবল জীবনতৃষ্ণাসহ আদর্শহীনতা লক্ষণীয়।

আর এই অর্থনৈতিক ভগ্নতার মধ্যে দন্ডায়মান মেয়েরা প্রতিনিয়ত কষ্ট সহ্য করতে করতে একসময় সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন করে সচ্ছলতাময় জীবনের বাসনায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, রাজনীতিতে যোগ দেয় – “শুধু যদি ওরা ওদের বিশ্বাস ও ধারণা নিয়েই থাকত তো কিছু বলবার ছিল না। ঘরে বসে যা কিছু ভাবুক, যত খুশি রাজার মাকে ডাইনী বলুক – কার কি আপত্তি।

কিন্তু এরা ঐখানেই আবদ্ধ নেই, এ অসন্তোষের যা অবশ্যম্ভাবী ফল – ধীরে ধীরে রাজনীতির আবর্তে গিয়ে পড়ছে। ...”[১৫] জীবনের তৃষ্ণা না মেটায়, দৈন্য সচেতনতা, অভাবের জন্যে অপমান-যন্ত্রণাবোধেতাড়িত মেয়েদেরও সরকার, রাষ্ট্রের প্রতি আক্রোশ, ঘৃণা, অসন্তোষ থেকে রাজনৈতিক চেতনা এভাবে জাগ্রত হয়। তারা বেপরোয়া ভঙ্গিতে চলে এক দৃঢ় সংকল্পে, দেশের পরিবর্তন আনতে – “দিন দিনই বেপরোয়া হয়ে উঠছে, বিশেষ নিমাই,সবু আর দীপ্তা।

....

আগের সেই ক্ষুধার্ত লুব্ধ ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিটা পাল্‌টে এই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।“[১৬] ফলে এভাবে সরকারের সমাজের বিরোধিতা স্বরূপ নানা রাজনৈতিক কার্যকলাপসহ, রাজনীতির নামে খুন-ধবংস, হিংসায় এসবে মেয়েরা মেতে ওঠে – “মেয়ে দুটোকে চেপে ধরে মধ্যে মধ্যে ।...

‘কেন এমন ক’রে বেড়াস তোরা, এই মানুষ খুন, এই অরাজকতা ?...’...”[১৭]

লেখাপড়া, চাকরিবাকরি করা, সংসারধর্ম স্বাভাবিকত্বে অল্পবয়সী দীপ্তা এদের তত আগ্রহ নেই। চাহিদা আর অপ্রাপ্তি এভাবে নগরের জীবনদৃষ্টিকে পরিবর্তন করে

দেয় ও রাজনীতির অংশীদার করে তোলে। নারীদের জীবনবোধ উক্ত প্রেক্ষাপটে বদলাছে, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে বৃহত্তর এক চেতনা বা মুক্তিকামিতা বা অন্য দেশগঠনের প্রয়াস তাদের মধ্যে। এভাবে নারীর স্বাধীনতা, বহির্গমন এসবের সোপান বেয়ে বিশ শতকী স্বাধীনোত্তর রাজনীতিতে নারীদের অনুপ্রবেশ, গুরুত্ব এবং এদের রাজনীতির ভাবনায় সহিংস, বিধ্বংসী নীতি, প্রতিহিংসাপরায়ণতা লক্ষণীয়। বাস্তবিকই তখন রাজনীতিতে আন্দোলনে যোগদান করে এবং এরূপ উত্তেজনা, ক্রিয়াকর্মে মেতে ওঠে। শেষে সুভদ্রাও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে ও দীপ্তার স্বার্থে প্রদীপকে বাঁচতে পুলিশের কাছে গিয়ে গোপন তথ্য প্রকাশ করে। এভাবেই নারীর ক্ষুদ্র, ব্যক্তিজীবনে বাহ্যিক এক বৃহৎ রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

কিন্তু উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনাভাব, ভ্রান্ত রাজনীতির আবর্তে পড়ে মেয়েদের জীবনে মুক্তি ঘটে না। রাজনীতি তাদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে। প্রদীপের জেলবাসে বা দাদা যে রাজনীতির জন্য তীপুকে সত্যেনের কাছে ভিড়িয়ে দেয় সেই সত্যেনের প্রতারণায় দুই নারীর জীবনে কার্যত অন্ধকার-বিচ্ছেদ নেমে আসে। তাছাড়া দৈন্যও থেকে যায় অব্যাহত। দীপ্তা বলে – 'টাকা ! এ বাড়িতে ! ...'[১৮] এদের রাজনীতির দরুণ সুভদ্রা পার্টির ছেলেদের হাতে খুন হয় নির্মমভাবে। মতাদর্শগত ত্রুটি, ব্যর্থতা-ভুলের কারণে, পুলিশি দমননীতির প্রভাবে নারীরা এভাবে আত্মঘাতী রাজনীতির ফাঁদে পড়ে। শুরু হয় এক অন্য জটিলতা-দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণাভোগ-বিপর্যয়।

'হায়নার দাঁত' (১৩৮২) উপন্যাসে শহর কলকাতায় আধুনিক নারীদের জীবনযাপন, জীবনদৃষ্টিতেও সময়ের নাগরিকতার প্রতীতি। তখন টাকা, ব্যয়বাহুল্য, বৈভব, আড়ম্বরময়তা- এসব ঘিরে নগরে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত মানুষের জীবনচিন্তা আবর্তিত হত। বিলাসিতা, শৌখিনতা, বস্তুবাদীতা যেমন এতে প্রকাশিত, তাই যেন Status বা মর্যাদার দ্যোতক ছিল। উচ্চাশা, high living এর ধারণা, ধনে অহং, দেখনদারিতে মগ্নতা – এই চিন্তাভাবনা এ উপন্যাসের নারীদেরও বা শহরে এ জীবন নারী চরিত্র দ্বারা উপস্থাপিত।

পরেশ চাকলাদারের বৌ স্বামীর প্রভূত বিত্তে, মেয়ের জন্মদিনের ব্যয়বহুলতাসহ বাড়ি-বাড়ি নিয়ে রীতিমত বিলাসবহুল উচ্চমানের জীবন কাটায়। সেই সব খবর প্রচার করে অর্থগরিমা প্রকাশ করে অহং তৃপ্ত করে। প্রতিবেশী নলিনাক্ষের বৌদি তার এ সম্পর্কে বলেন- '...ওই ঢাউস গাড়ি কিনেছে কোন কন্সালেটের, ছিয়াত্তর হাজার টাকা নাকি দাম, জানি নে বাবু – বৌ তো বলে বেড়ায়। ... স্ত্রীর গাড়িও অস্টিন, কেম্ব্রিজ, পুরো এয়ার-কন্ডিশান করা।...এই তো ছোট মেয়ে অঞ্জুর জন্মদিনে কেটারার ডেকে পাঁচশো লোক খাওয়ালে ! ওই ডিশ, কোন্ না ষোল টাকা করে নিয়েছ ওরা !.. নাৎনীর পুতুলের বিয়ে হল – সানাই বাজিয়ে যজ্ঞি করে । ....'[১৯] আসলে তিনিও ঐ ধরনের জীবনের প্রতি প্রলুব্ধ, আকাঙ্খিত। তাই তার বিরক্তিতে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা। ঐ পরেশ চাকলাদারের স্ত্রী ও মেয়ে সম্বন্ধে তার উক্তি- 'বড়লোকের মেয়ে, ঐশ্বয্যি দেখাতে আসা

! হাড়পিত্তি জ্বালা করে। তা নয় – জাঁকের গল্প যেমন মা করে যায়, তেমনি ওরও করবার লোক চাই তো ! ...'[২০] অথচ পরেশ চাকলাদারের এই বৈভবের হেতু সম্বন্ধে তার রীতিমত আগ্রহেই ঐ ঈর্ষা মনোভাব বোঝা যায়। আর নলিনাক্ষের বৌদির মুখে উক্ত 'ঐশ্বয্যি' বা 'হাড়পিত্তি' প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে 'ঐশ্বর্য', 'পিত্ত' বা 'হাড়পিত্ত' শব্দের বিকৃত রূপ। শহরে আধুনিক নারীদেরও মুখের ভাষাবৈশিষ্ট্য এতে স্পষ্ট। তাতে শব্দের যথাযথ উচ্চরণ হয় না, বিচ্যুতি ঘটে।

'একাল চিরকাল' (১৩৫৬) উপন্যাসে শহরাঞ্চলেই নিম্নমধ্যবিত্ত নারীদের জীবনভাবনায় এসেছে বিশ শতকী ভোগবাদ, যৌনতা-বিচ্যুতি ইত্যাদি। তাই মন্দা ফ্ল্যাট-টাকা, রীতিমত সম্পত্তি বাগিয়ে নিয়ে স্বামীকে ডিভোর্স দেয়। অভাবী পরিবারের মেয়ে নীলা গয়না-শাড়ি, হোটেলে খাওয়াদাওয়া, সিনেমা দেখা এসবের লোভে বিবাহিত বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, শেষে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, আত্মহত্যা করে।গরীবের মেয়ে অসীমাও বিলাসবহুল, সুখী জীবনযাপন করবে বলে, ঐ বিবাহিত বিদ্যুতকে বিয়ে বা সহবাস করে – "সে লোকটা, বিদ্যুৎ নাম, তার নাকি আগের একটা বৌ আছে, ছেলেমেয়েও - ...। ...নন্তুর দিদি অসীমাকে বালিগঞ্জে আলাদা বাড়ি ভাড়া ক'রে রেখেছে। ঝি, চাকর, বামুন নিয়ে রাজার হালে আছে সে।"[২১] অর্থাৎ নারীদের অস্তিত্বসংকট, স্বল্পতায় সন্তুষ্ট না হওয়া, তৎকালীন উপাদানকেন্দ্রিকতা, ক্রমবর্ধমান চাহিদা, বিলাসিতা-বাহুল্যকামনায় কার্যত নাগরিক high living-এর ধারণার প্রভাব, জীবনোপভোগ্যতা লক্ষণীয়। শহরে জীবনযাপনে জীবনতৃষ্ণার প্রাবল্যে প্রয়োজনে সম্মানবিসর্জন আত্মবিক্রয়, মূল্যবোধ ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে নারীদের মাধ্যমে।

আর নানাকারণে প্রবল জীবনাসক্তি থেকেই বা তার অন্য রূপ প্রতিফলিত হয় নারীদের আসামাজিক সম্পর্ক নির্মাণে, ব্যভিচারে।কৃতজ্ঞতায় অশ্রুকণা শেষ পর্যন্ত নিমুর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে স্বামীর জ্ঞাতসারেই। ভাড়াটে বৌ আশা হারুকে ঘনিষ্ঠ হতে ইঙ্গিত করে; ইশারে করে বারবার; তার ভাবেভঙ্গিতে কামনাবাহ্নির প্রকাশ। মিলি কাকীমা প্রভাব দেখিয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ পুত্রসম হারুর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হতে দ্বিধাহীন – "অগত্যা ভদ্রতার খাতিরে ঘরে ঢুকতে হ'ল, ... – মিলি কাকীমা কোথায়। একেবারে কাছাকাছি এসে দেখল একখানা-ইঁট-দিয়ে-উঁচু-করা খাটের ওপর বসে পা দোলাচ্ছেন।

সেখান থেকে ওর হাত ধরে কাছে টেনে নেওয়া এক লহমার ব্যাপার।

....

এক কথায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নাবালক ঢুকেছিল ও বাড়িতে, সাবালক হয়ে বেরিয়ে এল দশ মিনিটের মধ্যে।"[২২]এভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতার অপব্যবহারে নারীরা স্বেচ্ছাচার, বহুগামিতা, অবাধ অবৈধ যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে সমাজের, অন্যের পরোয়া না করেই, যা শহরে সামাজিক অবক্ষয়কে মূর্ত করে তুলেছে। লোভ-লালসা-

কাম-মোহ এই নিয়েই নারীদের জীবন-দৃষ্টিভঙ্গির যা নগরের সমাজের যে নৈতিক ভ্রষ্টতা তার এক রূপ।

আর এ ব্যক্তিচেতনা, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক, স্বার্থ এসবের কারণে পারিবারিক আদর্শ বিপর্যস্ত হয়। অসীমা, আশা,অশ্রুকণা, মিলি প্রতিটি বিবাহিতা নারী অন্য পুরুষে আসক্ত বা আগ্রহী। অর্থাৎ শহরে নারীদের পাতিব্রত্যের ধারণা বদলাচ্ছে এক আত্মকেন্দ্রিকতা, দেহজ বাসনা চরিতার্থ করার প্রবণতায়। তাছাড়া অসীমা স্বামীর বিপদে বা লবঙ্গ স্বামী মাধববাবুর পরনারীতে আগ্রহে কার্যত নির্বিকার থাকে। বোঝা যায় মেয়েদের স্বামীর সঙ্গে একাত্মতা পতিগতপ্রাণা মনোভাব নেই তেমন। স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্কের গ্রন্থি আলগা, দাম্পত্যচেতনায় ক্রমশ শিথিলতা আসছে। নাগরিক নারীচেতনার পরিবর্তন পরিবারতন্ত্রের অভ্যন্তরে একটা ফাটল যে ধরেছে তা অনুমেয়।

নারীজীবনের নিপুণ স্রষ্টা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসে স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে নারীদের বিকাশ-বিবর্তন চিত্রিত হয়েছে নগর পটভূমিতে। পরিবর্তনশীলতা, আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নারীদের জীবনদৃষ্টি, জীবননির্মাণের প্রয়াস লক্ষণীয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বাতাবরণে নারীর চাওয়াপাওয়া, জীবনের ওঠাপড়া, সমস্যার-তা অতিক্রান্তের অভিব্যক্তি উপন্যাসগুলিতে।

দ্বিতীয়ত, নারী বাঁচার আকাঙ্খায় স্বেচ্ছায় ও অধিকার নিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে চেয়েছে। তাদের লড়াই কেবল অস্তিত্ব রক্ষার্থে বা প্রাচুর্যে বেঁচে থাকার নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠারও। তাদের নারীত্ববোধ, চিরাচরিত ভূমিকা পালন যেমন আছে, তেমনই তারাও যে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, তাদের মতামত, জীবনও যে মূল্যবান হওয়া বাঞ্ছনীয় তা প্রতিপন্নের চেষ্টাও আছে। নিজেকে মানুষ, এক স্বাধীন, স্বতন্ত্র সামাজিক উপযোগী সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি আদায় বা প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের তৎপরতা মতামত প্রকাশে, দাবি আদায়ে, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে, অন্তঃপুরের গন্ডী পেরিয়ে বৃহৎ সমাজে বিচরণ করে। আধুনিকতার এ এক কথা। সমাজ-নগর পটভূমিতে নারীর এই অবস্থা-অবস্থান এ আদতে নগরেরই অবস্থান। তাদের জীবনভাবনা আদতে নগরেরই বৈশিষ্ট্য। কারণ তারা নগরসংস্কৃতি, জাতির এক অংশ। বস্তুত লেখক গজেন্দ্রকুমার মিত্র সমকালের আবহে নগরের মধ্যে নারীর অস্তিত্ব, জীবনকে অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, প্রদীপ, 'নারী উন্নতি ও বাঙালি পরিবারে নতুন স্বাস্থ্যবিধি', চন্দ্র, পুলক (সম্পাদনা), নারীবিশ্ব, গাঙচিল, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণঃআগষ্ট ২০১৮, পৃ. ১১৫

২. বসু, রাজশ্রী, নারীবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর ২০১২/এ/২, পৃ. ৪১

৩. দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা কথাসাহিত্যের একালঃ ১৯৪৫-১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ৪৭
৪. তদেব, পৃ. ৬০
৫. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, 'জ্যোতিষী', রায়, সবিতেন্দ্রনাথ, চক্রবর্তী, মণীশ (সম্পাদনা), গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণঃ আষাঢ় ১৪২৪, পৃ, ২৮৬
৬. তদেব, পৃ. ৩০৫
৭. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, 'জন্মেছি এই দেশে', রায়, সবিতেন্দ্রনাথ, চক্রবর্তী, মণীশ (সম্পাদনা), গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণঃ ভাদ্র ১৪২১, পৃ. ৩৬
৮. তদেব, পৃ. ৮০
৯. তদেব, পৃ.৫৬
১০. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, 'বজ্রে বাজে বাঁশী', রায়, সবিতেন্দ্রনাথ, চক্রবর্তী, মণীশ (সম্পাদনা), গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী, দশম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পারলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ মাঘ ১৪১৭, পৃ. ৪২৮
১১. তদেব, পৃ. ৪৭০
১২. তদেব, পৃ. ৪৩৪
১৩. তদেব, পৃ. ৪৪৬
১৪. তদেব, পৃ. ৪৭১
১৫. তদেব, পৃ. ৪৩৯
১৬. তদেব, পৃ. ৪৪০
১৭. তদেব, পৃ. ৪৪১
১৮. তদেব, পৃ. ৪৯০
১৯. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, 'হায়নার দাঁত', রায়, সবিতেন্দ্রনাথ, চক্রবর্তী, মণীশ (সম্পাদনা), গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, তৃতীয় মুদ্রণঃ আষাঢ় ১৪২৪, পৃ. ৩২০
২০. তদেব, পৃ. ৩৫৮
২১. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, 'একাল চিরকাল', রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশঃ কার্তিক ১৩৫৬, পৃ. ১৪২
২২. তদেব, পৃ. ২২

বাঙালি মুসলিম নারীর আত্মসচেতনতা ও নবজাগরণ: নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী

শিবানী মন্ডল
গবেষক
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: অশিক্ষার অন্ধকার ও কুসংস্কারের তিমির বিদীর্ণ করে এক ক্ষণজন্মা জ্যোতির্ময়ীর আবির্ভাব ঘটেছিল, তিনি নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম নারী যিনি নবাব ছিলেন। মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারী বেগম রোকেয়ার জন্মের প্রায় সাত বছর পূর্বেই তিনি নারী শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হন। এমনকি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত নারীর জন্যই কাজ করেছেন তিনি। শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে তিনি মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। ১৮৯৩ সালে কুমিল্লা শহরে 'ফয়জুন্নেসা জানানা হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ফয়জুন্নেসা প্রথম মুসলিম নারী যিনি গদ্যে-পদ্যে লিখেছেন। তাঁর লেখক জীবনের সার্থক নিদর্শন হল 'রূপজালাল', এটি ১৮৭৬ সালে প্রথম ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। মুসলিম নারী রচিত এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম। বাংলা, আরবি, ফার্সি, উর্দু ভাষার মিশ্রণে এটি একটি কল্পকাহিনিমূলক কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে ফয়জুন্নেসা নারীর বহুবিবাহ বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি নারীর অধিকারচেতনা ও আত্মমর্যাদার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। লেখক ও নারীশিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন সফল জমিদার যিনি বহু প্রজাকল্যাণকর কাজ করেছেন। বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীর শিক্ষিত, সুন্দরী, দায়িত্ববান এই নারীকে মহারানী ভিক্টোরিয়া নবাব উপাধি দিয়েছিলেন। ২০০৪ সালে তাঁকে বাংলাদেশ সরকার মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করে।

সূচক শব্দ: জ্যোতির্ময়ী, ফয়জুন্নেসা, নারীশিক্ষা, নবাব, রূপজালাল।

মূল আলোচনাঃ

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার বারংবার।
তাই চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।"

'শাহজাহান' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী সম্পর্কে একথা বললে একেবারেই অত্যুক্তি করা হবে না। কে এই নবাব ফয়জুন্নেসা? তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া যাক। মোগল সম্রাট শাহ আলমের শাসনকালে শাহজাদা জাহান্দরের পুত্র আমির মির্জা আব্রু খাঁ হোমনাবাদ পরগনার জমিদারী লাভ করেন। তাঁর ষষ্ঠ বংশধর আহমদ আলী চৌধুরীর প্রথম মেয়ে হলেন ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। অশিক্ষার অন্ধকার ও কুসংস্কারের তিমির বিদীর্ণ করে এই ক্ষণজন্মা জ্যোতির্ময়ীর আবির্ভাব ঘটেছিল। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মহিলা নবাব ছিলেন ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারী বেগম রোকেয়ার জন্মের প্রায় সাত বছর পূর্বেই তিনি নারী শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হন। এমনকি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত নারীর জন্যই কাজ করেছেন তিনি। শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি তিনি মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। ১৮৯৩ সালে কুমিল্লা শহরে 'ফয়জুন্নেসা জানানা হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ফয়জুন্নেসা প্রথম মুসলিম নারী যিনি গদ্যে-পদ্যে লিখেছেন। তাঁর লেখক জীবনের সার্থক নিদর্শন হল 'রূপজালাল' এটি ১৮৭৬ সালে প্রথম ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। মুসলিম নারী রচিত এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম। বাংলা, আরবি, ফার্সি, উর্দু ভাষার মিশ্রনে এটি একটি কল্পকাহিনীমূলক কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে ফয়জুন্নেসা নারীর বহুবিবাহ বিষক আলোচনার পাশাপাশি নারীর অধিকারচেতনা ও আত্মমর্যাদার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীর শিক্ষিত, সুন্দরী, দায়িত্ববান এই নারীকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া নবাব উপাধি দিয়েছিলেন। ২০০৪ সালে তাঁকে বাংলাদেশ সরকার মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করে।

ব্রাহ্ম সমাজের সূচনা হওয়ার ফলে অনেক হিন্দুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবার নারী স্বাধীনতার কথা বলেন। তার ফলে মেয়েরা একা ইচ্ছেমতো বাড়ির বাইরে যাওয়া, পুরুষের সাথে মেলামেশা করা এমনকি পড়াশুনার জন্য বিদেশযাত্রা পর্যন্ত করতে পারতো। এই পরিবর্তন তখনও কিন্তু মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। তখনও তারা প্রাচ্যের মুসলিম সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত যা নারীস্বাধীনতার পক্ষে একেবারেই ছিল না। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি নিয়ম প্রয়োগ করে মুসলিম নারীদের নিয়ন্ত্রনে রাখা হত। ঠিক এমন এক সময়ে আবির্ভাব হন নবাব ফয়জুন্নেসা। মুসলিম শিক্ষার পথপ্রদর্শক এই নারী মেয়েদের অর্থনৈতিক ও নিজ স্বাধীনতার কথা বলেন। 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেহ নাহি দিবে অধিকার?' রবীন্দ্রনাথের এ জিজ্ঞাসা যাঁর আত্ম জিজ্ঞাসার অনুরণন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নজির সৃষ্টিকারী সেই তিনি দেখিয়ে দেন নিজ চেষ্টায় নারী আপন ভাগ্য জয়ের পথ তৈরী করতে পারে।

১৮৩৪ সালে বর্তমান কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিমগাঁ (সে সময়ের হোমনাবাদ পরগনা) অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়। পিতা জমিদার আহমদ আলী চৌধুরী, মা আরাফান্নেসা চৌধুরানী। বাল্যকাল থেকেই তাঁর জ্ঞানস্পৃহা প্রবল। তাঁর পরিবার যথেষ্ট আধুনিক ছিল যার অনেকখানি প্রভাব রয়েছে তাঁর জীবনে। যে সময় মেয়েদের পুরুষ শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করাই ছিল একপ্রকার নিষিদ্ধ সেই সময় মেয়ের প্রবল আগ্রহ দেখে ফয়জুন্নেসার পিতা তাঁর জন্য পুরুষ গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করেন। গৃহশিক্ষক তাজউদ্দিনের সহায়তায় তিনি বাংলা, আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত এই চারটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। পরবর্তীকালে 'রূপজালাল' কাব্যগ্রন্থে শিক্ষকের অবদানকে তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন-

"ওস্তাদের পদ বন্দি শিবের উপর,
অন্ধকে জ্যোতি দিয়ে করিল পসর।
শ্রীযুত তাএজ উদ্দিন মিঞা তাঁর নাম,
প্রভু আগে মাগি তাঁর স্বর্গে, হৈতে স্থান।"

গভীর পান্ডিত্য শুধু তাঁকে একজন ভালো মানুষই করেনি এমনকি তিনি সবরকম সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের উর্ধ্বে বাঁচতে শিখিয়েছেন সবাইকে। তাঁর জীবন প্রতিটি নারীর কাছে আদর্শ হয়ে রয়ে যাবে। বাল্যকালে ফয়জুন্নেসার পিতা জীবিত থাকাকালীন সৈয়দ মোহাম্মদ গাজী চৌধুরী তাঁকে বিয়ে করতে চান। গাজী চৌধুরী সম্পর্কে তাঁর ফুফাত ভাই। তখনকার দিনে মেয়েদের প্রায় ১৩ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যেত কিন্তু ফয়জুন্নেসার পিতা কখনও বাল্যবিবাহের সমর্থক ছিলেন না। ১৮৪৪ খ্রীঃ পিতার মৃত্যুর পরে ২৬ বছর বয়সে ১৮৪৪ সালে সৈয়দ মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর সাথে ফয়জুন্নেসার বিয়ে হয়। বিবাহের পর তিনি জানতে পারেন এটি তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ। সতীনের ঘরে জীবন বিষিয়ে উঠতে থাকে। বাধ্য হয়ে স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করে চলে আসেন। অন্য নারীদের মতো নিজের সঙ্গে হওয়া অন্যায় মুখ বুজে মেনে নেননি। গাজী চৌধুরীর বিরূদ্ধে মামলা করে এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি আদায় করেন। অবরোধ বাসিনী নারীদের যুগে এ এক নজির বলা যেতে পারে। যদিও এই কাজে তিনি পরিবারের সাহায্যও পেয়েছেন। ঐ এক লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি নিজে একটি বাড়ি তৈরি করেন। বাড়িটি ডাকাতিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। বাড়ির একদিকে প্রবেশদ্বার, দ্বিতল বাড়ি, একটি কাছারিঘর, বাগানবাড়ি, মসজিদ ও কবরস্থান আছে। বর্তমানে দীর্ঘদিন অযত্ন ও অবহেলার কারণে বাড়ির দেওয়ালে শ্যাওলা ও আগাছা জন্মানোর কারণে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বাড়িটির সংস্কার করে। সেসময় এই বাড়িতে থেকে জমিদারির প্রশিক্ষণ নেন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দায়িত্ব সহকারে জমিদারি সামলান। যদিও তিনি অনেক আগেই তাঁর মাকে দেখে শিখেছিলেন নির্ভিকভাবে জমিদারি সামলাতে। জমিদারির আওতায় হোমনাবাদ পরগনায় (যা বর্তমান সময়ে কুমিল্লা) মোট ১৪টি মৌজা ছিল। ১৪টি মৌজাতে রাজস্ব আদায়ের জন্য ১৪টি কাছারিঘর

ছিল। তিনি একজন দৃঢ়চেতা নারী এবং প্রজাহিতৈষী জমিদার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। শাসক হিসাবেও তিনি ছিলেন দক্ষ কারণ তাঁর রাজত্বে কোনোরকম দাঙ্গার কথা শোনা যায়নি। ঝিনুকে আঘাত লেগে ক্ষরণ হলে যেমন মুক্তো সৃষ্টি হয় তেমন ভাবে ফয়জুন্নেসার জীবনের দুর্ঘটনা তাঁর মধ্যে মুক্তো রূপ 'রূপজালাল' এর সৃষ্টি করেছে।

রূপজালাল তাঁর বিবাহিত জীবনের অনুপ্রেরণায় লিখিত। তৎকালীন সময়ে হিন্দু মুসলিমদের লেখা নারীবাদী বইগুলির মধ্যে অন্যতম। এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে মূলত তিন ধরনের বিষয়ে লেখালেখি হত- রোমান্টিক, ঐতিহাসিক কল্পকাহিনি, ধর্মীয় ঐতিহাসিক। রূপজালাল মূলত কল্পকাহিনিমূলক কাব্য। তিনিই প্রথম মুসলিম নারী যিনি প্রথম কল্পকাহিনীমূলক কাব্য রচনা করেছেন। এখানে তাঁর জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে রূপকের আড়ালে। তাঁর লেখার ধরন একেবারে নতুন ছিল। কবিতা ও গদ্যের মেলবন্ধনে বাংলা, আরবিক, উর্দু, পার্সিয়ান ভাষার প্রয়োগ তাঁর অগাধ পান্ডিত্য প্রদর্শিত করে। গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি তাঁর দাদু মোজাফফর গাজী চৌধুরীর সম্পর্কে লেখেন যিনি ইংরেজ শাসনের সামনে মাথা নত না করে আত্মহত্যা করেন। ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতা তিনি রূপকের মাধ্যমে লিখেছেন যার মধ্যে পুরাণ ও লোককাহিনির ব্যবহার, উপমায় মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব, শব্দচয়ন ও অন্ত্যমিলে নিপুনতার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর লেখার মধ্যে অতীতের সংস্কার ও কাব্যরীতি এবং আধুনিক ভাবের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থের চরিত্রদের মধ্যে দিয়ে নারীজীবনের দুঃখ-কষ্ট বর্ণনা করেছেন তিনি। পুরুষরা কিভাবে নারীকে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখত সুচারু রূপে তার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। এই গ্রন্থ হয়ে উঠেছে মুসলিম সমাজে নারী জাগরণের আওয়াজ।

কেবল সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনই নয়, তাঁর জীবন আরও অনুপ্রেরণামূলক। স্বামীর সংসার থেকে ফিরে এসে ফয়জুন্নেসা হোমনাবাদ পরগনার জমিদারীর ভার নেন। শুরু হয় নতুন জীবনসংগ্রাম। জমিদারী লাভের পর থেকেই তিনি জনগণের সেবায় নিয়োজিত হন। তাঁর করা কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হল-

- জমিদারীর ১৪টি মৌজায় ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
- ফয়জুন্নেসা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় যা বর্তমানে ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে সুপরিচিত।
- ফয়েজিয়া মাদ্রাসা নামে অবৈতনিক মাদ্রাসা স্থাপন যা বর্তমানে নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি ডিগ্রি কলেজ নামে পরিচিত।
- পশ্চিমগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
- পশ্চিমঙ্গের নদিয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে একটি স্কুল স্থাপন করেন।
- মক্কা শরীফে মাদ্রাসা-ই-সওলাতিয়া ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ব্যয়ভার বহনে সহায়তা করতেন।

- কুমিল্লার চর্থায় ফয়জুন্নেসা জেনানা হাসপাতাল বর্তমানে ফয়জুন্নেসা ফিমেল ওয়ার্ড নামে পরিচিত।

এছাড়া সাধারণ মানুষের জলের কষ্ট দূর করার জন্য দিঘী বা পুকুর খনন এবং চলাচলের সুবিধার জন্য অনেক রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা করেন।

বাংলার নিভৃত অঞ্চলের একজন মুসলিম নারী জমিদারের সমাজসেবা ও উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী রানী ভিক্টোরিয়া অভিভূত হন। তিনি তাঁর সভাসদদের পরামর্শমতো মি. ডগলাসকে পাঠান মহারানির আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে ফয়জুন্নেসাকে 'বেগম' উপাধি দিয়ে সন্মানিত করতে বলেন। কিন্তু ফয়জুন্নেসা আগে থেকেই বেগম তাই এই উপাধি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর এই তেজদিপ্তী দেখে মহারানি ক্ষুব্ধ হন। তিনি ইংল্যান্ড থেকে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান ফয়জুন্নেসার যথাযোগ্য অবস্থান বোঝার জন্য। প্রতিনিধি দল যখন ফয়জুন্নেসার সাক্ষাৎলাভের জন্য আসেন তখন তিনি জমিদারী দেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সময়নিষ্ঠ ফয়জুন্নেসা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই হাতিতে আরোহণ করে জমিদারি দেখতে চলে যান। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধ দেখে প্রতিনিধি দল এতই মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হন যে তারা ফয়জুন্নেসার জন্য 'নবাব' খেতাবই উপযুক্ত মনে করলেন। ১৮৮৯ সালে কুমিল্লাতে জাঁকজমক করে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার দ্বারা 'নবাব' খেতাব দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে তৎকালীন ৩৫,০০০টাকা ব্যয় করা হয়। শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে মহামূল্যবান পদক, রেশমী চাঁদর ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

তাঁর সাহিত্য রচনার সময়কাল ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যুগ। তাঁর রচনা সম্ভারে রয়েছে 'রূপজালাল'(১৮৭৬) কাব্যগ্রন্থ। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬সালে ঢাকার গিরিশ চন্দ্র ছাপাখানা থেকে ৮৭২ পৃষ্ঠার 'রূপজালাল' প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি 'সংগীত লহরী' ও 'সংগীত সার' নামে আরও দুটি গ্রন্থ লেখেন। ফয়জুন্নেসা বাংলা ভাষাকে নির্বাচন করেন বই লেখার জন্য। বাড়িতে এবং অফিসে তিনি বাংলা ভাষা ব্যবহার করতেন। নিজস্ব লাইব্রেরিতে রামায়ণ, মহাভারত, কোরান, বাইবেল ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়তেন। এছাড়া তিনি স্বর্ণকুমারী দেবীর তৈরী নারী প্রতিষ্ঠান 'সখী সমিতি'র সদস্য ছিলেন। এর ফলে পাঠক এবং লেখক হিসাবে তাঁর সচেতনতা প্রকাশ পায়। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ সরকার ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করেন। তাঁর ১৬০তম জন্মবার্ষিকীতে বাংলাদেশ সরকার একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর এই মহান আত্মা সৃষ্টিভূমি ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন।

তথ্যসূত্র :

১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৬৪ (১ম প্রকাশ)

২. নিশাত আমিন, সোনিয়া, The world of Muslim women in colonial Bengal, Brill এর অনুবাদ-বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন, পাপড়ীন নাহার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা২০০২
৩. অধ্যাপক মজিরউদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৬৭
৪. কামাল, বেগম আকতার, বিশ শতকে বাঙালি মুসলিম নারীর সাহিত্যচর্চার পরিসর ও তাৎপর্য, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ খন্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪
৫. Hasanat, Fayeza S, Recasting Muslim Women: A Translation of Nawab Faizunnesa’s Rupjalal, with commentary, Florida, University Of Florida, 2005
৬. Sinha, Mrinalini, Colonial Masculinity: Manly English Man and the Effeminate Bengali in the Late Nineteenth Century, Manchester, Manchester University Press, 1995

ঔপনিবেশিক সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজ্ঞানভাবনা ও বিজ্ঞানচর্চা

শুভেন্দু বিশ্বাস
স্টেট এডেড কলেজ টিচার
পলাশী কলেজ

সারসংক্ষেপ: ঔপনিবেশিক সময়ে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে ব্রিটিশ সরকার তাদের সাম্রাজিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে তৎপর হয়। সেই বিজ্ঞানচর্চায় ভারতীয়দের স্থান ছিল নগণ্য। মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতীয়দের বিজ্ঞানচর্চার সাথে যুক্ত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স'(১৮৭৬)। সূচনা হল জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার। মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, সতেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিজ্ঞানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। অন্যদিকে গবেষণাগারে বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব না হলেও, বিজ্ঞানভাবনার ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার অগ্রগামিতা লক্ষণীয়। প্রাথমিকভাবে খ্রিস্টান মিশনারীদের হাত ধরে এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটে। মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু রাজপরিবার শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে কাশিমবাজার রাজপরিবারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদাবাদে বিজ্ঞানভাবনার প্রাথমিক সূচনা এই পরিবারের হাত ধরেই হয়েছিল। প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা হয়ত বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে তাঁদের অর্থদান, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাহায্য করেছিল। এই জেলা থেকে ঔপনিবেশিক সময়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন এই জেলার সন্তান। তিনি মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন, তা জেলাবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যা পরবর্তী সময়ে জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছিল। আলোচ্য গবেষণানিবন্ধে মুর্শিদাবাদ জেলায বিজ্ঞান ভাবনার সেই ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : বিজ্ঞান, মিশনারী, স্বাস্থ্য, মাতৃভাষা, আন্দোলন।

বিজ্ঞানভাবনা ও বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করার পূর্বশর্ত হিসেবে বিজ্ঞান নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হয়। আবার বিজ্ঞান ভাবনার ফল হিসেবে যুক্তিবাদী মননের বিকাশ ঘটানো, বিজ্ঞানের সুফলগুলি সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে সাহায্যদানও হতে পারে। এখানে বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাভাবনা করাটাই আসল। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষাগারে নিত্য-নতুন বিষয়ের অনুসন্ধান, বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশকে বোঝায়। সামগ্রিক ভাবে দেখলে, বিজ্ঞানের বিষয় এতই সুবিস্তৃত যে, কোন একটা বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে রেখে তা আলোচনা করা সম্ভব নয়।

ঔপনিবেশিক সময়ে দুই ধরনের বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে।[১] এক, কলোনিয়াল সায়েন্স বা ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান ঔপনিবেশিক পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয় এবং ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে ব্যবহার করা হয়। আর দ্বিতীয় হল ন্যাশনাল সায়েন্স বা জাতীয় বিজ্ঞান। এই জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেন মহেন্দ্রলাল সরকার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, সতেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বিজ্ঞানী। ঔপনিবেশিক সময়ের জাতীয় স্তরের বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে বহুবিধ আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, আঞ্চলিক স্তরেও বিজ্ঞান নিয়ে ভাবনার একটা নিজস্ব রূপ আছে। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজ্ঞানভাবনা ও বিজ্ঞানচর্চার বিষয়টি কিভাবে উঠে আসছে, তা তুলে ধরার এই প্রয়াস।

বিজ্ঞান আমাদের কোন কিছুকে অন্ধভাবে গ্রহণ না করে, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শেখায়। বিজ্ঞানের প্রাক-শর্ত হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে মুর্শিদাবাদ জেলাতে খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারিত হয়েছিল।[২] মিশনারীদের উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি মানুষের মনে নানান যুক্তির বীজরোপন করার প্রয়াস তারাই প্রথম করেছিলেন। আসলে বিজ্ঞান ভাবনার সাথে শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ইউরোপীয় মিশনারীদের পাশাপাশি ভারতীয়দের উদ্যোগও ছিল স্মরণীয়। মুর্শিদাবাদ জেলাতে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কাশিমবাজার রাজপরিবার। জেলাতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রদীপ জ্বালাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলাতে নবজাগরণের ফলে সমাজের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে যে উদারমনা, কু-সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী চিন্তা-ভাবনা জাগ্রত হয়েছিল, তা কাশিমবাজারের মহারাজা কৃষ্ণনাথ রায়কে প্রভাবিত করেছিল। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, একমাত্র আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা বিজ্ঞান শিক্ষা মানুষকে যুক্তিবাদী করে তুলবে এবং তার মাধ্যমে উন্নত সমাজ গড়ে উঠবে। সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য বানজেটিয়াতে তিনি একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন, যেখানে পড়ানো হবে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান।[৩] সেই মতো তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মুর্শিদাবাদ জেলাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে ব্যয় করার জন্য উইলও করে যান তিনি। পরবর্তী সময়ে তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবের রূপ দিতে এগিয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী মহারাণী স্বর্ণময়ী। ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'বহরমপুর কলেজ' যেটি বর্তমানে কৃষ্ণনাথ কলেজ নামে পরিচিত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলাতে যে বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তাতে কৃষ্ণনাথ কলেজের অবদান ছিল সবথেকে বেশি। রাজা কৃষ্ণনাথ চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রথম ৫ জনকে এক হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন এবং মেডিক্যাল কলেজকে ৭০০ টাকা

দান করেন।[৪] এখানেই শেষ নয়, তিনি কাশিমবাজার ও লন্ডনের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ চালাবার পরিকল্পনা করেন এবং সৈদাবাদে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানাও স্থাপন করেন।[৫]

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কাশিমবাজার রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মহারাণী স্বর্ণময়ী শিক্ষাখাতে যে দান করেছিলেন, তার মধ্যে বিজ্ঞানও ছিল। তিনি যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেছিলেন, তার বেশিরভাগই ছিল শিক্ষাখাতে। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের বিষয়ে যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে নারীদের চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু মফঃস্বল এলাকায় তা সম্ভবপর নয় ভেবে, মহিলা চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে দেড় লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এসম্পর্কে তিনি ১৮৮৪ সালের ১২ নভেম্বর মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে পত্র লেখেন – ".....The want of properly educated female medical practitioner for the treatment of persons of my sex has been felt by me for a long time, and gradually with the advance of my age, a deep impression had been made in my mind. I had thought of establishing an Institution in this district of Moorshidabad for imparting medical education to the female through the medium of the Bengali and English languages. But, as the present advised, I have been convinced that an Institute of the kind is not likely to be a success here , whereas one, if located in Calcutta and Incorporated with the Medical College there , is sure to succeed and realize my long cherished hopes......"[৭] তৎকালীন সময়ে যেখানে নারীদের শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল সীমিত, সেখানে মহারাণীর এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় বহন করে। জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার জন্য মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স'। এই সংগঠনটিকে প্রতিষ্ঠার সময় ৫০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন মহারাণী স্বর্ণময়ী।[৮] মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রযুক্তিগত শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান প্রশংসনীয়।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর কাশিমবাজার রাজপরিবারের সুযোগ্য সন্তান মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (১৮৬০ - ১৯২৯) বিজ্ঞানের অগ্রগতির লক্ষ্যে 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' কে দুই লক্ষ টাকা দিয়ে অর্থ সাহায্য করেন।[৯] মণীন্দ্রচন্দ্র মনেপ্রাণে চাইতেন, বাংলাতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হোক। ফলত বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ যাতে কোন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে তিনি নজর দিয়েছিলেন। তাই তিনি কৃষ্ণনাথ কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে 'অনার্স কোর্স' চালু করার উদ্যোগ নেন এবং সেই মতো বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আনিয়েছিলেন। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে

অনার্স চালুর প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। ঠিক এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি একটি বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের পর গবেষণার গৃহ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, সেই প্রয়াসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জানতে পারেন যে, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কৃষ্ণনাথ কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বেশ কিছু যন্ত্রপাতি কিনেছিলেন। তাই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেই মূল্যবান যন্ত্রপাতি কলকাতার বিজ্ঞান কলেজকে দান করেন।[১০] তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান জানার জন্য আধুনিক মানমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও নিয়েছিলেন এবং এই বিষয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও করেন। তবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্রের এই উদ্যোগ তাঁর বিজ্ঞানপ্রীতির পরিচয় দেয়।

কাশিমবাজার রাজপরিবারের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হন শ্রীশচন্দ্র নন্দী (১৮৯৭ - ১৯৫২)। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল থেকে। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে তিনি বি. এ পাশ করেন। তিনি কলা বিভাগের ছাত্র হলেও, বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন, যে কারণে বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করতেন।[১১] তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দেশকে সমৃদ্ধ করা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূরীকরণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ আবশ্যক। বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধা কিভাবে গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা-ভাবনা করতেন। কিভাবে বাংলার বুজে যাওয়া নদীগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুনরায় চলাচলের উপযোগী করা যায়, সেই বিষয়ে গবেষণা করতেন। তিনিই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা শুরু করেন এবং বাংলার নদী অঞ্চলের ঢালের জরিপের ব্যবস্থা করেন।[১২] তাঁর এই নদী গবেষণার ফসল হল - বাংলার নদী সমস্যা, বন্যা ও তাহার প্রতিকার, বাংলার নদী ও আমাদের আর্থিক উন্নয়ন প্রভৃতি গ্রন্থ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, হরিণঘাটাতে যে নদী নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার নেপথ্যে ছিলেন শ্রীশচন্দ্র নন্দী।[১৩]

জেলার বিজ্ঞানচর্চার কথা বলতে গেলে ভূমিসন্তান রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪ - ১৯১৯) কথা অবশ্যই উঠে আসে। তিনি ১৮৬৪ সালের ২০ আগষ্ট কান্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭৬ সালে কান্দী ইংরেজি পাঠশালায় ভর্তি হন। এর পরবর্তী পঠন-পাঠন থেকে মূল কর্মক্ষেত্র সবই ছিল কলকাতার মধ্যে। মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে রচনা করেছিলেন একাধিক গ্রন্থ। আসলে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে বিজ্ঞান ছিল একটি নেশার বস্তু। বিজ্ঞানের রসাস্বাদনের মাধ্যমে শুধু নিজেকে নয়, অপরকেও মাতিয়েছেন।[১৪] তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - প্রকৃতি(১৮৯৬), ভূগোল(১৮৯৮), জিজ্ঞাসা(১৯০৪), বিচিত্র জগৎ(১৯২০), জগৎ

কথা(১৯২৬)। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উপর লেখা প্রবন্ধগুলি নিয়ে প্রকাশিত হয় - শব্দ কথা(১৯১৭)। যদিও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মূল কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা এই জেলার বিদ্বান সমাজকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল।

লালগোলার মহারাজ রাও স্যার যোগীন্দরনারায়ণ রায়ও দান-ধ্যানের দিক থেকে পিছিয়ে ছিলেন না, যে কারণে ইতিহাসে তিনি স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন। চিকিৎসা তথা স্বাস্থ্য কাঠামোতে উন্নতির জন্য তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেছিলেন।[১৫] বহরমপুর হাসপাতালের উন্নতিকল্পে তাঁর দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞানচর্চার সাথে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে। ঔপনিবেশিক সময়ে এই জেলাতে স্বাস্থ্যচর্চার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ে বিভিন্ন মফঃস্বল জেলা থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ, অনেকাংশে বিরল বলে মনে হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদের উদারমনস্ক মানুষ সেই উদ্যোগে পিছিয়ে ছিলেন না। ঔপনিবেশিক সময়ে এই জেলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল দুটি স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে বহরমপুরের সৈদাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় ‘কিউরোপ্যাথিক চিকিৎসা’।[১৬] এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিপিন বিহারী দাশগুপ্ত। তবে তথ্যগত অপ্রতুলতার জন্য আর বিশেষ কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক দ্বিতীয় পত্রিকাটি ছিল ‘গঙ্গাধর মনীষা’(১৯১১)। মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ চিকিৎসক গঙ্গাধর কবিরাজের মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রকাশিত রচনাগুলি প্রকাশের জন্য এই পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জ্ঞ্যানেন্দ্রনাথ সেন ও গঙ্গাধরের পৌত্র ত্র্যম্বকেশ্বর রায়।[১৭]

সুতরাং মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজ্ঞান ভাবনার বিষয়ের বহুমাত্রিকতা রয়েছে। ঔপনিবেশিক সময় থেকেই বিজ্ঞানচর্চার সূচনা এই জেলায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অবশ্য সেই বিজ্ঞানচর্চা গবেষণাগারে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ বলা যায়। মুর্শিদাবাদের মতো মফঃস্বল জেলাতে নারীদের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা সাফল্য লাভ করবে না বিবেচনা করে, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী নিবাস নির্মাণের জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ীর অর্থ প্রদান সেই দিকেই ইঙ্গিত করে। আসলে বিজ্ঞানচর্চার ধারক ও বাহক ছিল কলকাতা। তাছাড়া জেলাগুলিতে শিক্ষার অভাব, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার বিজ্ঞান ভাবনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অপরদিকে এইসব অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার দূরীকরণে বিজ্ঞানই ভরসা। তবে এ কথাও ঠিক যে, যুক্তিবাদী ভাবনা ও বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যার ফল হিসেবে ১৯৪৬ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জেলার বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে কৃষ্ণনাথ কলেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

তথ্যসূত্র:

১. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞান যখন আন্দোলন, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২ ।

২. আশীষ কুমার মণ্ডল, মুর্শিদাবাদ জেলায় খ্রিষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ, শিল্পনগরী, মুর্শিদাবাদ, ২০১৪ পৃ.২১।

৩. বিষাণ কুমার গুপ্ত, মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের প্রেক্ষাপটে শহর বহরমপুর(১৭০৭ - ১৯৫৪), ইতিহাসের আলোকে বহরমপুর পৌরসভা, বহরমপুর পৌরসভা, বহরমপুর, ২০০৮, পৃ. ৬৬)।

৪. কৃষ্ণনাথ কলেজ ১৫০ বছর কমেমোরেশন ভলিউম (১৮৫৩ - ২০০৩), কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর, ২০০৩, পৃ. ১১৯ ।

৫. তদেব, পৃ. ১১৮ ।

৬. শ্রীকমল চৌধুরী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, কৃষ্ণনাথ কলেজ ১৫০ বছর কমেমোরেশন ভলিউম (১৮৫৩ - ২০০৩), কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর, ২০০৩, পৃ. ২৩৮-৩৯ ।

৭. তদেব।

৮. পবিত্র দাস, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার ভারতীয় পথিকৃৎ ড. মহেন্দ্রলাল সরকার, এবং কি কে ও কেন, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ১৪।

৯. কমল চৌধুরী, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস: প্রথম পর্ব, দে'জ প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ৮০৫ ।

১০. অরূপরতন ভট্টাচার্য, বাঙ্গালীর বিজ্ঞান ভাবনা ও সাধনা, দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩৯৭ ।

১১. প্রতিভারঞ্জন রায়, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ও কৃষ্ণনাথ কলেজ, কৃষ্ণনাথ কলেজ ১৫০ বছর কমেমোরেশন ভলিউম(১৮৫৩ - ২০০৩), কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর, ২০০৩, পৃ. ২৬১ ।

১২. তদেব।

১৩. তদেব।

১৪. ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ.১৯ ।

১৫. ডাঃ উৎপল সিংহ চৌধুরী ও রমাপ্রসাদ ভাস্কর, বহরমপুর শহরের চিকিৎসা পরিষেবার সেকাল ও একাল, সূর্যসেনা প্রকাশনী, বহরমপুর, ২০১১, পৃ. ১৩।

১৬. প্রকাশ দাস বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদের সংবাদ ও সাময়িকপত্র, কল্যাণ কুমার দাস (প্রকাশক), বহরমপুর, ২০১৮, পৃ. ৮৭।

১৭. তদেব।

মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের বাংলায় আগমন ও তাদের বাণিজ্যিক সাফল্যের ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক)

ইমরান সেখ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিগত তিন শতাব্দী বা তারও আগে রাজস্থানের মরু প্রান্তর থেকে ভাগ্যান্বেষণে এক বৈশ্য জাতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্ভাবত ঊনিশ শতকের সূচনা থেকে এই বৈশ্য জাতি 'মাড়োয়ারি' নামে আধিক পরিচিতি লাভ করে। রাজশক্তির সমর্থন লাভ করায় অষ্টাদশ শতকে বাংলা তথা ভারতে মাড়োয়ারিরা ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের শুরুতে তারা ইংরেজ অফিসগুলিতে দালালির কাজ শুরু করে এবং শীঘ্রই অফিসগুলিতে প্রভাবশালি হয়ে ওঠে। কিন্তু সবসময় যে মাড়োয়ারিরা নৈতিক পদ্ধতি আবলম্বনে ব্যবসা করেছিল তা নয়, আধিক মুনাফার লোভে ফটকা, জুয়া ও খাদ্যে ভেজাল মেশানর মত ইতাদি অনৈতিক কাজ গুলি ও করেছিল। মূল প্রবন্ধে আমার আলোচনার বিষয় হবে মাড়োয়ারিরা কোন সময় বাংলায় এসেছিল এবং কিভাবে তারা বাংলায় অভাবনীয় বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সাফল্য লাভ করেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান।
সূচক শব্দ: মাড়োয়ারি, জগৎশেঠ, বাসা, শক, বানিয়ান, হুন্ডি, ফটকা।

বিগত তিন শতাব্দী বা তারও আগে রাজস্থানের মরু প্রান্তর থেকে ভাগ্যান্বেষণে এক বৈশ্য জাতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইহারা রাজস্থানের বিভিন্ন স্থান, জাতি (অগ্রবাল, অসওয়াল, মহেশ্বরী) ও ধর্মীয় পরিচয় (হিন্দু ও জৈন) থেকে এসেছিল। এই জাতি ঊনিশ শতকের শেষের দিকে এক অনভিপ্রেত উপাধি 'মাড়োয়ারি' দ্বারা অধিক পরিচিতি লাভ করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ভারতবর্ষের বাইরে মাড়োয়ারিদের অভিপ্রায়ন ঘটলেও উপনিবেশিক কালে ও স্বাধীনতা-উত্তরকালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা সব থেকে বেশি সাফল্য লাভ করেছিল বাংলায়। মাড়োয়ারি লেখক বালচাঁদ মোদী স্বীকার করেছেন, বাংলায় আসার পরে মাড়োয়ারিদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।[১] মাড়োয়ারিদের বাংলায় অভিপ্রায়নের বিষয়টি সব সময় সরাসরি রাজস্থান (রাজপুতানা) থেকে হয়েছিল তা নয়, বাংলার মাড়োয়ারি পরিবারগুলির বেশ কয়েকটি বাংলায় আগমনের পূর্বে মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও আসাম সহ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করেছিল। এই প্রবন্ধে আমার আলোচনার মূল বিষয় হবে মাড়োয়ারিরা কোন্ সময় বাংলায় এসেছিল

এবং কিভাবে তারা বাংলায় অভাবনীয় বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সাফল্য লাভ করেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান।

মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

আমরা সাধারণ অর্থে 'মাড়োয়ারি' বলতে বুঝি রাজস্থান থেকে আগত এক জনসমুদয়কে, যারা নির্দিষ্ট পোশাক, ভাষা, খাদ্যভ্যাস সর্বোপরি ব্যাপক অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। বৈশ্য, রাজপুত, রাজস্থানী, বানিয়া ইত্যাদি শব্দগুলি থেকেও 'মাড়োয়ারি' শব্দটি আজ বহুল পরিচিত। সম্ভাবত, ঊনিশ শতকেই প্রথম মাড়োয়ারি শব্দটির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। 'মাড়োয়ারি' শব্দটির প্রথম কোন্ সময় ব্যবহার হয়েছিল তা নিয়ে মতানৈক্য বর্তমান। আধুনিক গবেষকদের মতে, 'মাড়োয়ারি' শব্দটি উপনিবেশিক সরকার কর্তৃক রাজস্থানী ব্যবসায়ীদের উপর প্রথম আরোপিত হয়। প্রথমদিকে রাজস্থানের মারোয়ার আঞ্চলের বাসিন্দাদের বোঝানোর জন্য মূলত 'মাড়োয়ারি' শব্দটি ব্যবহার হত। রাজস্থানী্রা 'মাড়োয়ারি' শব্দটি দ্বারা 'মারোয়ার' থেকে আগত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে বোঝাত কিন্তু শব্দটি যখন রাজস্থানের বাইরে ব্যবহৃত হয়, তখন সকল পরিযায়ী মানুষদের বোঝায় যারা মারোয়ার সহ রাজস্থানের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এসেছিল। কলকাতার প্রভাবশালী মাড়োয়ারি পরিবারগুলির বেশিরভাগ-ই *অসওয়াল, অগ্রবাল বা মহেশ্বরী* জাতির মানুষ যারা শেখাওয়াতি অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছিল যেমন ঝুনঝনু, শিখর, পিলানী, রামগড়, চিরাবা ইত্যাদি।[২]

ধর্মীয় দিক থেকে মাড়োয়ারিরা ছিল মূলত হিন্দু ও জৈন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। কর্নেল জেমস টড তাঁর গ্রন্থে, রাজস্থানে ১২৮ টি বণিক গোষ্ঠীর উপস্থিতির কথা বলেছেন,[৩] তাদের কয়েকটি প্রধান উপজাতি হল *অগ্রবাল, অসওয়াল, মহেশ্বরী, সিরমল, খাণ্ডেলওয়াল* ইত্যাদি।[৪] প্রথমদিকে যে মাড়োয়ারিরা বাংলায় এসেছিল তারা ছিল মূলত অসওয়াল জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ। Anne Hardgrove তাঁর '*Community and Public Culture: the Marwaris in Calcutta,1897-1997*' গ্রন্থে বলেছেন, "Marwaris legitimized their tenure in Bengal by claiming Oswal Jain and the Jagat Seth as Marwari"। মাড়োয়ারি ঐতিহাসিক ভিমসেন কেরিয়া মাড়োয়ারিদের সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন- "এমন একটি জনসমুদয় যারা পূর্ণরূপে সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী অথবা সম্পূর্ণ অহিংসার সমর্থক জৈন; যাদের নিজস্ব পোশাক আছে; যারা সম্পূর্ণ নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও করবে; যারা ভারতের প্রাচীন রীতি নীতির অনুসারী; সম্পূর্ণরূপে আস্তিক; যারা দীন-দরিদ্র অসহায় কে সর্বদা সাহায্য করে; দেশ-প্রদেশ ভেদাভেদ না করে সব জায়গায় ধর্মশালা নির্মাণ করে এবং মানুষের মধ্যে সততা প্রচার করে; তাছাড়াও যারা নিজেদের ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও সাহসের জন্য সর্বত্র প্রসিদ্ধ, তাদেরকেই মাড়োয়ারি বল, আমাদের

মত মাড়োয়ারিদের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত।"[৫] *অখিল ভারতীয় মাড়োয়ারি পরিষদ* , কলকাতা, তাদের সংবিধানে মাড়োয়ারি কারা? এ প্রসঙ্গে বলেছে, 'রাজস্থান, হরিয়ানা, মালব ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী একই ভাষা-সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস যুক্ত মানুষেরা নিজে বা তাদের পূর্ব পুরুষেরা দেশ বা বিদেশে যে কোন স্থানে বসবাস করছে, তারাই মাড়োয়ারি।'[৬]

মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের বাংলায় আগমন:

কোন সময় ও কিভাবে রাজপুতানার বানিয়া সম্প্রদায় তাদের জন্মভূমি ছেড়ে জীবিকার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পাড়ি জমিয়েছিল এবং কিভাবে তারা বাংলায় পৌঁছেছিল তা এই অংশের আলোচ্য বিষয়। মাড়োয়ারিরা রাজস্থান (তৎকালীন রাজপুতানা) থেকে অভিপ্রায়ন শুরু করেছিল মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ভারতের বিভিন্ন অংশে স্বাধীন রাজ্যের সূচনা হয়। নব গঠিত রাজ্যগুলি আর্থিক সমস্যার কারনে ব্যবসায়িদের নানান সুবিধা দিয়ে নিজেদের রাজ্যে আহ্বান জানাত। স্বাধীন রাজ্যগুলিতে ক্রমবর্ধমান উত্তরাধিকার জনিত সমস্যার কারনে রাজ্যগুলি বণিক ও বাণিজ্যপথ গুলিকে সুরক্ষা দিতে অসমর্থ হয়, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৭] ফলস্বরুপ, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বণিকরা দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব ভারতের দিকে আভিপ্রায়ন শুরু করে। বাংলায় মাড়োয়ারিদের আগমন মুলত দুটি পর্যায়ে হয়েছিল— প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকে অষ্টাদশ শতকের মঝামাঝি সময় পর্যন্ত (যোধপুর-মারোয়ার অঞ্চল থেকে) এবং দ্বিতীয়, ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে উনিশ শতকের শেষ (শেখাওাতি, বিকানির অঞ্চল থেকে)।

মাড়োয়ারিদের প্রথম বাংলায় আগমন সম্পর্কে মাড়োয়ারি লেখক বালচাঁদ মোদি বলেছেন, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় শাসক মুকুন্দদেবের (১৫৬০-৬৮) আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাংলার শাসক সুলেমান খান করানী (১৫৬৬-৭২) দিল্লির বাদশাহ আকবরের বশ্যাতা স্বীকার করে নেন, পরিবর্তে বাদশহ্ সুলেমান এর সাহায্যার্থে বাংলায় সেনা পাঠান।[৮] লেখক এর মতে সেই সময় যে সেনা বাংলা এসেছিল তারা ছিল রাজপুত এবং সেনাদের রসদ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য যোধপুর অঞ্চল থেকে কিছু বৈশ্য বাংলায় এসেছিল। সম্ভবত এই ভাবে প্রথম বাংলায় মাড়োয়াড়িদের আগমন ঘটে। এরপর ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে যখন মানসিংহ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন তখন তাঁর সাথে আসা বেশ কিছু রাজস্থানী ব্যক্তিকে তিনি বাংলার প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত করেন।[৯] এসময় যারা বাংলায় এসেছিল তারা প্রধানত সেনাবাহিনীর সঙ্গে আসা মানুষ, পরবর্তীতে তারা রাজ আনুকূল্যে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি করেছিল।

এখন জানব বিখ্যাত জগৎশেঠ পরিবার সম্পর্কে, যারা অষ্টাদশ শতক জুড়ে বাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি তে পরিণত হয়েছিল। যাদের ব্যাংকিং

এর কারবার অষ্টাদশ শতকে ভারাতব্যাপী অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল, দিল্লির বাদশাহ থেকে শুরু করে ইউরোপীয় বণিক সকলকে এই পরিবারের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রাজস্থানের মাড়োয়ার অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে হীরানন্দ শাহু বিহারে আসেন এবং ব্যাংকিং এর কারবার শুরু করেন। হীরানন্দ শাহু সেই সময় পাটনা এসেছিলেন যখন ইংরেজরা পাটনায় বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে, ফলে ইংরেজদের আনুকূল্যে হীরানন্দ -এর কারবার বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১০] হীরানন্দ শাহু -এর মৃত্যুর পর তার সাত পুত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন, তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র মানিকচাঁদ ঢাকায় কুঠি নির্মাণ করেন। সেই সময় ঢাকা ছিল মুঘল বাংলার রাজধানী এবং পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। যখন মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের আসেন সেইসময় প্রিয় পাত্র মানিক চাঁদ কেউ সঙ্গে আনেন। মুর্শিদকুলি খাঁ –এর অনুগ্রহে মানিকচাঁদ ব্যবসা-বানিজ্যে প্রভূত উন্নতি করে। মানিকচাঁদ এর মৃত্যুর পর তার ভাগ্নে ফতেচাঁদ দায়িত্ব গ্রহণ করেন (মানিকচাঁদ আপুত্রক ছিলেন) যিনি ১৭২২ সালে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ এর কাছ থেকে 'জগৎশেঠ' উপাধি লাভ করেন। ফতেচাঁদের সময় জগৎশেঠদের গৌরব মধ্যগগনে পৌঁছায়। 1717 খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ ফতেচাঁদ কে মুর্শিদাবাদের টাঁকশালের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করেন, ফলে ফতেচাঁদের প্রভাব এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ইউরোপীয় বণিকরা শত চেষ্টা করেও মুর্শিদাবাদের টাকশাল থেকে নিজেদের জন্য মুদ্রা ছাপাতে পারেনি। ইংরেজ বণিকরা কলকাতা কাউন্সিলকে জানিয়েছিল –"While Fatehchand is so great with the Nawab, they can have no hopes of that grant, he alone having the sole use of the mint, nor dare any other Shroff buy or coin a rupee's wroth of silver."(Wilson Annals lll, p.369).[১১]

ফতেচাঁদের উত্তরাধিকারী জগৎশেঠ মাহতাব রায় ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ *১৭৫৭-এর* ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন এবং সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন চ্যুতি ঘটান। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর ইংরেজদের প্রভাব বাড়তে থাকে এবং নবাব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব জগৎশেঠদের হাত থেকে কোম্পানির হাতে চলে যায়। এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দ্বারা জগৎশেঠ মাহতাব রায় ও স্বরূপচাঁদ নিহত হন (১৭৬৩)। জগৎশেঠদের হত্যার ফলে মাড়োয়ারিরা রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে থাকে এবং পুরোপুরি ব্যবসায় মনোনিবেশ করে । পূর্বে যে মাড়োয়ারিরা (মারোয়ার-যোধপুরের বাসিন্দা) বাংলায় এসেছিল তারা মূলত শাসক শ্রেণীর ব্যাংকার হিসাবে কাজ করত। বাংলা তথা ভারতে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইউরোপীয় ছাপ পড়ে, ফলে দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে, ফলে এদেশে বাণিজ্যের জন্য

তাদের অর্থের চাহিদা কমে যায়। ঊনিশ শতকে সূচনায় এই মাড়োয়ারিরা প্রধানত উৎপাদক ও গ্রাহকদের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা নেয় এবং দোকানদার, আড়তদার, বণিক বা গ্রাম অঞ্চলে মহাজনী কারবার শুরু করে।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন এবং মুর্শিদাবাদ থেকে কোম্পানির কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট –এ ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের আবসান হয়, ফলত, অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতে বাণিজ্যের সুযোগ পায়। এই সময় ইউরোপীয় কোম্পানি গুলিতে কাঁচামাল সরবরাহ ও বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্য এদেশের বাজারে বিক্রয়ের জন্য এদেশীয় মানুষের সাহজ্য প্রয়োজন ছিল। এই সময় মাড়োয়ারিদের বাংলায় অভিপ্রয়াণের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এদের আভিবাসন সবথেকে বেশি হয়েছিল ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়, যখন রেলপথ বিস্তার শুরু হয়। কলকাতা নতুন বাণিজ্য নগরী হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করলে, ব্যবসাদার জাতি মাড়োয়ারিদের কলকাতায় আগমন শুরু হয়। এই সময় মাড়োয়ারিরা মূলত বিকানির ও শেখাওয়াতি অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে বাংলায় এসেছিল এবং এরা ছিল প্রধানত অগ্রবাল ও মহেশ্বরী জাতির মানুষ। প্রথমদিকে যখন তারা কলকাতায় আসে,বসবাসের জন্য বড়বাজার অঞ্চলে বাঙ্গালীদের থেকে মাটির বাড়ি ভাড়া নিতো এবং একটা বাড়িতে ৫ থেকে ১০ জন করে থাকতো। এই বাড়িগুলিকে বলা হত 'বাসা,' যেখানে স্বদেশ থেকে আসা নবাগতর কাজের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত।[১২] বাংলায় আসার পরও তারা তাদের প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার গুলি কে আঁকড়ে ধরে ছিল। তারা পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করে নিত।[১৩] সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তারা বাঙালি সংসর্গ সচেতনভাবে এড়িয়ে চলে ছিল।

বাণিজ্যিক সাফল্যে:

আজ আমরা মাড়োয়ারি জাতিকে উন্নতির শিখরে উপবিষ্ট দেখি কিন্তু তাদের এই সাফল্য রাতারাতি আসেনি, প্রথমদিকে মাড়োয়ারিদের অর্থনৈতিক সাফল্যের পিছনে তাদের পরিশ্রমের পাশাপাশি রাজশক্তির সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজশক্তির সহায়ক হিসাবে কাজ করায় অষ্টাদশ শতকে বাংলা তথা ভারতে তারা ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে যে মাড়োয়ারিরা কলকাতায় এসেছিল তারা নানা প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়, তা সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের সাহায্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু সবসময় যে তারা নৈতিক পদ্ধতি অবলম্বনে ব্যবসা করেছিল তা নয়, অধিক মুনাফার লোভে তারা নানান অনৈতিক পন্থাও আবলম্বন করেছিল যা পরবর্তীতে আলোচনা করব।

ব্যবসা-বানিজ্য এমন একটি কাজ যেখানে একজন, উৎপাদন বা ক্রয়-বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে, সহজ ভাবে “any activity or enterprise entered into for profit”।[১৪] ব্যবসা সবসময় লাভজনক হবে এমন না, এখানে ক্ষতিরও (Loss) সম্ভাবনা থাকে, Thomas Timberg তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, “the business world reward those who take risk”। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি (Risk) নিতে ভয় পায়নি ফলে সফলতাও লাভ করে। রামকৃষ্ণ ডালমিয়া তাঁর ‘*Some Notes and Reminiscences*’ গ্রন্থে জীবনের প্রথম দিকের একটি ঘটনার কথা বলেছেন, তাড়াতাড়ি ধনী হওয়ার ইচ্ছায় তিনি রুপোর ফটকা বাজারে বিনিয়োগ করেন এবং রুপোর দাম কমে যাওয়ায় তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে যান, সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারার জন্য ব্যবসায়ীরা তার সাথে সমস্ত ব্যবসায়িক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। এক সময় তিনি খবর পান আন্তর্জাতিক বাজারের রুপোর দাম বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু তাঁর কাছে বিনিয়োগ করার মতো সেই সময় কোনো টাকা ছিল না, তিনি স্ত্রীর গয়না 200 টাকায় বন্ধক দিয়ে বিনিয়োগ করেন এবং রুপোর দাম আশ্চর্যজনক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তার কয়েক গুণ লাভ হয়।[১৫] এভাবে ধীরে ধীরে তিনি ব্যবসার জগতে পা রাখেন ও পরবর্তীতে নিজেকে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতিদের তালিকায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

মাড়োয়ারিরা ব্যবসার জগতে আর একটি বিষয়কে খুবই গুরুত্ব দিয়েছিল তা ছিল বিশ্বাস (Trust), ব্যবসার জগতে যা পরিচিত ছিল ‘শক্’ (Shak) নামে।‘শক্’ ছিল ঋণদান ব্যবস্থা ও শুদ্ধ ব্যবসার মুল আধার, যা আর্থিক সম্পদের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত।‘শক্’ অর্জন করার জন্য কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ছবি নিস্কলঙ্ক, দরিদ্রের প্রতি উদার ও সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত থাকতে হতো।[১৬] আমরা ডালমিয়ার ক্ষেত্রে দেখলাম, সময় মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ব্যবসায়ী সমাজ তার সাথে সব রকম লেনদেন অস্বীকার করল। মেধা কুডাসিয়া তাঁর ‘*The Life and Times of G.D. Birla*’ নামক গ্রন্থে জি. ডি. বিড়লা সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর পাটের ব্যবসায় পাট কেনা ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়, সবরকম লেনদেন চলত ব্যবসায়ী দের মুখের কথায়। Shak এর মূর্তরূপ হিসাবে আমরা Hundi –এর কথা বলতে পারি।[১৭]

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার আইনে কোম্পানির ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার শেষ হয়, ফলে বিভিন্ন ইংরেজ বণিক ব্যক্তিগত বাণিজ্যে উদ্যোগী হয় এবং কলকাতায় অফিস স্থাপন করে। এই অফিসগুলি বাংলায় উৎপাদিত পাট, নীল ও সুতিবস্ত্র ইংল্যান্ডে রপ্তানি করত এবং ইংল্যান্ডে উৎপন্ন পণ্য সামগ্রী এ দেশের বাজারে বিক্রি করতো।এই কাজে তাদের সাহায্য করার জন্য এদেশীয় লোক প্রয়োজন ছিল, প্রথমদিকে বাঙালিরা এই অফিস গুলিতে দালাল হিসেবে নিযুক্ত হয় কিন্তু শীঘ্রই মাড়োয়ারিরা তাদের জায়গা দখল করে নেয়।[১৮] মাড়োয়ারিরা ইংরেজদের অফিসে

দালালির পাশাপাশি 'বানিয়ান ব্যবস্থা' (Guarantee Broker) শুরু করে।[১৯] এই ব্যবস্থায় নগদ টাকার প্রয়োজন না থাকায় অনেক মাড়োয়ারি এ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল, ফলস্বরূপ ইংরেজ অফিস গুলিতে মাড়োয়ারি দের প্রতিপত্তি বেড়েছিল। বিংশ শতকের সূচনায় মাড়োয়ারিরা এদেশে ইউরোপীয় পণ্যের (বিশেষ করে মিলে তৈরী কাপড়) একমাত্র এজেন্ট হয়ে উঠেছিল।

এই পর্যায়ে আমি আলোচনা করব সেই সব অনৈতিক পন্থা গুলি সম্পর্কে যেগুলি মাড়োয়ারিরা অবলম্বন করেছিল তাদের সফলতার পথে। বিংশ শতকের সূচনায় মাড়োয়ারিরা অধিক মুনাফার লোভে ফটকা (speculation), জুয়া (gambling) ও খাদ্যে ভেজাল মেশানোর (food adulteration) মত ইত্যাদি অনৈতিক কাজ গুলি ও করেছিল। ভিমসেন কেরিয়া লিখেছেন, 'Speculation এবং Agency system ছিল মাড়োয়ারি দের সম্পদের প্রধান উৎস'।[২০] আফিম, পাট, সুতিবস্ত্র, রুপো ইত্যদি পণ্যের সব থেকে বেশি ফটকা হত। যেসব মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী ফটকা থেকে উন্নতি করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হরদত্তরায় চামড়িয়া, বিড়লা পরিবার, স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ, জীবনমল চাঁদমল ফার্ম, সুরাজমল জালান, প্রনয়চাঁদ সিংহী প্রমূখের মতো বড়-বড় মাড়োয়ারি নাম যারা ফটকা থেকে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।[২১]

মাড়োয়ারি দের মধ্যে জুয়া বা সাট্টা (gambling) ছিল অবসর বিনোদনের একটি সাধন কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তা ব্যবসার রূপ নিয়েছিল। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সবথেকে প্রচলিত জুয়া যা সরকারের চিন্তার কারণ হয়েছিল তা হল Rain Gambling যা স্থানীয়দের কাছে পরিচিত ছিল 'বরষাত কা সাট্টা' নামে।[২২] এখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতটা বৃষ্টি পড়ছে তার ওপর betting করা হতো। মাড়োয়ারিদের বিরোধিতার সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে আইন করে Rain Gambling নিষিদ্ধ করেন। সরকার জানায় শহর ও মফস্বলের মানুষের উপর এর কু-প্রভাব পড়ছে, জুয়ার নেশায় তারা কর্মবিমুখ হয়ে পড়ছে এবং পরিবারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।[২৩]

মাড়োয়ারিরা ছিল ইউরোপীয় কাপড়ের একমাত্র এজেন্ট, স্বদেশি আন্দোলনের সময় মাড়োয়ারিদের কাপড়ের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে British War Loan Fund –এ মাড়োয়ারিরা একটা বড় অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের প্রমান হিসাবে, এছাড়াও যুদ্ধের সময় তিন কোটি টাকা চাঁদা হিসাবে দেয়। সমসাময়িক কয়েকটি সংবাদপত্রে বলা হয়, যুদ্ধে ঋণদান করার ফলে যে ক্ষতি হয়েছিল তা পুষিয়ে নেবার জন্য তারা শাড়ি, ধুতি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল।[২৪] ফলস্বরূপ, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বার মাসে কলকাতার বড়বাজারে 'কাপড়ের দাঙ্গা' (Cloth Riot) হয়।[২৫] ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে, জানুয়ারিতে বড়বাজারে বেশ কিছু অঞ্চলে দোকান লুট হয় কাপড়, লবণ ও

অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য গুদামজাত করার জন্য। এছাড়াও কোন কোন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোর মতো (Food Adulteration) গর্হিত কাজও করেছিল। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ভেজাল ঘি (Ghee) নিয়ে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, অধিক মুনাফার লোভে ব্যবসায়ীরা ঘি (Ghee) -এর মধ্যে উদ্ভিজ্জ তেল, চর্বি ইত্যাদি ভেজাল দিত। পরবর্তীকালে সরকার হস্তক্ষেপ করে ও ৩ জুলাই ১৯১৯ সালে The Bengal Food Adulteration Bill পাশ হয়।[২৬]

পরিশেষে বলা যায়, বাংলায় মাড়োয়ারিদের আগমন বহু পূর্বে শুরু হলেও তা সব থেকে বেশি হয়েছিল ঊনিশ শতকে। প্রথমদিকে আসা মাড়োয়ারিরা শাসকশ্রেণীর সহায়ক ও ব্যাংকার হিসেবে বাংলায় কাজ শুরু করে এবং ঊনিশ শতকে সূচনায় ইংরেজ অফিসগুলোতে দালালির কাজ শুরু করে। দালালির কাজে প্রথমে বাঙ্গালীদের প্রাধান্য থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে মাড়োয়ারিরা বাঙ্গালীদের সরিয়ে দেয়। বাঙ্গালীদের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে আচার্য প্রফুল্ল রায় তাঁর '*The Life and Experience of a Bengali Chemist*'- গ্রন্থে বলেছেন "The two essential elements to ensure success in trade and commerce are sadly lacking in the Bengali character- I mean a spirit of enterprise and a business instinct"।[২৬] অন্যদিকে ব্যবসায় সফল হওয়ার জন্য যেসব গুণ থাকা দরকার তা সবই মাড়োয়ারিদের মধ্যে ছিল, তারা ছিল পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল,সব রকম পরিবেশে অভিযোজন করতে পারত সর্বোপরি ঝুঁকি নিতে ভয় পেত না। তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবসার মধ্যে পরিবর্তন করেছে। সময়ের সাথে সাথে তারা মহাজনি থেকে ব্যঙ্কিং আবার ইউরোপীয় অফিসে দালালি থেকে আফিম ও কাপড়ের ফটকাকারী সব রকম কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে, ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বেশিরভাগটাই মাড়োয়ারিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। পরবর্তীকালে তারা শিল্পে বিনিয়োগ শুরু করে এবং ১৯৭০ সালের মধ্যে ভারতীয় শিল্পের সিংহভাগ মাড়োয়ারিরা দখল করে নেয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. বালচাঁদ মোদী, *দেশ কে ইতিহাস মে মাড়োয়ারিরা জাতিকা স্থান*, কলকাতা: ১৯৪০, পৃ. ২১১।

২. Almost all the largest contemporary industrial connections belong to this group: Birla (Pilani), Dalmia (Chirawa), Singhania (Bisau), Jatia (Bisau), Surajmal- Nagarwmal (Ratangarh) and Goenka (Ramdutt Ramkissendas - Dundlod)." Timberg, "*A Note on the Arrival of Calcutta's Marwaris,*" 75-

84. Cited in অ্যানি হার্ডগ্রভ, *কমিউনিটি অ্যান্ড পাবলিক কালচারঃ দি মাড়োয়ারিস ইন কলকাতা, ১৮৯৭-১৯৯৭,* নিউ ইয়র্ক, ২০০৪, পৃ. ৭৪।

৩. জেমস টোড, *আনালস অ্যান্ড আন্টিকুইটিস অফ রাজস্থান,* দুই খণ্ড, লন্ডন, ১৮২৯-১৮৩২, প্রথম খণ্ড পৃ. ১২০-২১।

8. রাহুল বি. পারসন, *দি বাজার অ্যান্ড দি বাড়ি: ক্যালকাটা মাড়োয়ারিস অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড অফ হিন্দি লেটারস,* A dissertation submitted the degree of Doctor of Philosophy, University of California, Berkeley, ২০১২, পৃ. ১৪।

৫. ভিমসেন কেরিয়া,*ভারত মে মাড়োয়ারিরা সামাজ,* কলকাতা: ন্যাশনাল ইন্ডিয়া পাবলিকেশন, ১৯৪৭, পৃ. ২।

৬. ডি. কে. তাকনেট, মাড়ওয়ারি সমাজ, জয়পুর: 1989, পৃ. ৩।

৭. তীর্থাঙ্কার রায়, *ডায়াস্পরা মাড়োয়ারিরা,* প্রিন্টেড ফ্রম অক্সফোর্ড হ্যান্ড বুক অনলাইন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮, (www.oxfordhand books.com)।

৮. মোদী, *দেশ কে ইতিহাস মে মাড়োয়ারিরা জাতিকা স্থান,* পৃ. ২২১-২২।*ওড়িশার ইতিহাস,* (https://www.historyofodisha.in/mukundadeva/)। গুলাম হোসেন সেলিম, রিয়াজ-উস-সালাতিন, এ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, (আনুবাদ, মৌলভি আব্দুস সেলিম) কলকাতা, ১৯০২, পৃ. ১৫১-৫৩।)

৯. *Ibid.* পৃ. ২৫৮-৫৯।

১০. *Ibid.* পৃ. ৩৭৫-৭৬।

১১. জে. এইচ. লিটিল, *হাউস অফ জগৎশেঠ,* কলকাতা, ১৯৬০ (ইন্ট্রডাক্সন, এন. কে. সিনহা), পৃ. Viii।

১২. মোদী, *দেশ কে ইতিহাস মে মাড়োয়ারিরা জাতিকা স্থান,* পৃ. ৪০৩।

১৩. The first public organization for Rajasthani up countrymen in Calcutta, the 'Bari Panchayat' brought together traders by late 1828 to discuss business matters and some social concerns—হার্ডগ্রভ, *কমিউনিটি অ্যান্ড পাবলিক কালচার,* পৃ. ২১১।

১৪. *বিজনেস,* উকিপিডিয়া, http://en.m.wikipedia.org/wiki/Business. Visited on 1/1/2021।

১৫. থমাস টিমবার্গ, *দি মাড়োয়ারিস: ফ্রম জগৎশেঠ টু দি বিড়লা,* পেঙ্গুইন বুক ইন্ডিয়া, ২০১৪ (Introduction by Gurucharan Das), পৃ. xvii।

১৬. টিমবার্গ, *দি মাড়োয়ারিস: ফ্রম জগৎশেঠ টু দি বিড়লা,* (Introduction), পৃ. Xxii।

১৭. Hundi-"the Hundi served as a letter of credit, a promissory note, as well as remittance note". For more details on Hundi and its various categories*, see L. C. Jain's,* 'Indigenous Credit Instruments and Systems'*,* in Meddha Kudaisya (ed.) *The Oxford Indian Anthology of Business History,* New Delhi: Oxford University Press, 2011.

১৮. Bengali merchants were all powerful in all cases of important trade such as rice, jute, sugar, salt, etc. But from this date Ralli Bros. changed brokers from a Bengali to a Marwari firm. Few names of Bengali Brokers who were ousted by the Marwaris- Gora Chand Dutta (Crook Rome & Co.) who was replaced by Ghursamal Ghanasyamdas, Abhoy Charan Ghosh (Graham & Co.) etc. আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, *লাইফ অ্যান্ড এক্সপ্রিয়েন্স অফ এ বেঙ্গালী কেমিস্ট,* কলকাতা, ১৯৩২ পৃ.৪৬৪।

১৯. The importing houses used the device to minimise the credit risk in import trade: "the guarantee broker of Bombay and the Banians of Calcutta. A native merchant of standing, the guarantee broker or Banian brought in orders and financed and guaranteed the bills. For about 1.5 per cent commission be undertook to guarantee that the bazar merchant would pay in full the bill for the order which the broker had brought in and financed." See R.K. Ray, 'Bazaar' in Meddha Kudaisya (ed.), *The Oxford Indian Anthology of Business History*।

২০. কেরিয়া, *ভারত মে মাড়োয়ারিরা সামাজ,* পৃ. ২৫২।

২১. মোদী, *দেশ কে ইতিহাস মে মাড়োয়ারিরা জাতিকা স্থান,* পৃ. ৫৫২-৫৭১।

২২. "It was immensely popular and profitable pastime in local trading circles. Rain gambling was introduced to Calcutta public life by the Marwaris sometimes in the 19th century, either by the 1820s (as Marwaris claimed) or by the 1870s (as the colonial government claimed). Rain gambling was confined to Cotton Street in the Heart of Burrabazar in northern Calcutta"– হার্ডগ্রভ, *কমিউনিটি অ্যান্ড পাবলিক কালচার,* পৃ. ১৫২।

২৩. হার্ডগ্রভ, *কমিউনিটি অ্যান্ড পাবলিক কালচার*।

২৪. বারিসাল হিতৈষী, মে ২৭, ১৯১৮, বেঙ্গালী, জুন ১৯, ১৯১৮, cited in হার্ডগ্রভ, *কমিউনিটি অ্যান্ড পাবলিক কালচার,* পৃ. ১৭৫।

২৫. বেঙ্গালী, ডিসেম্বার ১৫, ১৯১৭, cited in হার্ডগ্রভ, *কমিউনিটি অ্যান্ড পাবলিক কালচার,* পৃ. ১৭৫।

২৬. This Bill was a supplement to the Calcutta Municipal Bill of 1917. The Bengal Legislative Department stated, "The adulteration of food, particularly of articles of common consumption, such as milk, ghee, mustard-oil, etc., is extremely prevalent, and the existing law has entirely failed to check the evil. The present Bill has been framed for the purpose of remedying the defects in the law, which make this practice possible, and of ensuring the purity of the staple articles of food which are most liable to adulteration." The Bengal Food Adulteration Bill. 1919. (NAT). Legislative Department, August 1919, No. 11-13. Quoted from "Statement of Objects and Reasons," 33, cited in হার্ডগ্রভ, *কমিউনিটি অ্যান্ড পাবলিক কালচার,* পৃ. ১৯৭।

২৭. কি ভাবে অবাঙ্গালীরা (*মাড়োয়ারি, ক্ষত্রি, বিহারি*) ব্যবসা-বানিজ্যা থেকে শ্রমিক-কুলি প্রতিটি জায়গা বাঙ্গালীদের সরিয়ে দখল করেছিল তাঁর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, *লাইফ অ্যান্ড এক্সপ্রিয়েন্স অফ এ বেঙ্গালী কেমিস্ট নামক* গ্রন্থে (Chap. xxvi), পৃ.৪৪০।

লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির আলোকে নলিনী বেরার উপন্যাস; শবরচরিত

বিন্দেশ্বর টুডু
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরার জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর কথাসাহিত্যে গ্রামবাংলার নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ, তাদের বিচিত্র কুসংস্কার, লৌকিক বিশ্বাস, দারিদ্র অসহায়তা জীবন্ত হয়ে উঠে। লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকশিল্প, লোককথা, লোকপ্রবাদ তথা লোকসংস্কৃতির 'লোক' শব্দটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণত 'লোক' বলতে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে বোঝায় না। 'লোক' অর্থে সমাজ-উপেক্ষিত দিনমজুর, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলিকেই বোঝায়। যে সব সম্প্রদায় আ-মৃত্যু একটি বিশেষ স্থানে বসবাস করে, পূর্বে প্রচলিত সংস্কার, বিশ্বাসকেই লালন করে, যারা আধুনিক শিক্ষার আলোকে আলোকিত নন, সেই সব তথাকথিত নিতান্ত সাধারণ দরিদ্র মানুষগুলিকেই লোক-বিজ্ঞানীরা 'লোক' অর্থে অভিহিত করেন। এমনই এক 'শবর' সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চালচিত্র আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এদের ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণে রক্ষণশীলতার ছাপ দেখা যায়। শত অভাব-অনটন, জ্বালা-যন্ত্রণা, হতাশা-ব্যর্থতার মাঝেও বারো মাসে তেরো পার্বণের আয়োজন করে।

মূল আলোচনা:

নলিনী বেরা ১৯৫২ সালের ২০শে জুলাই অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার সুবর্ণরেখার নদীর তীরবর্তী সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, খেড়িয়া, শবর, ভুঁইয়া, ভূমিজ অধ্যুষিত জঙ্গলাকীর্ণ বাছুরখোঁয়াড় গ্রামের এক সাধারণ চাষী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরার সাহিত্য জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। সে অঞ্চলের ভাষাও বাংলা নয়, হাফ বাংলা হাফ উড়িয়া। সেই ভাষাতেই নলিনী বেরা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন প্রাণরস সঞ্চার করলেন। তাঁর সাহিত্যে জগৎ একটি নিদির্ষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি যে এলাকাটি বেছে নিয়েছেন সেই এলাকার ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর - জমি, খাল, বিল, গাছপালা, লতা-পাতা, পশু-পাখি, ফুল-ফল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদে যেমন পরিপূর্ণ ঠিক তেমনই অন্যদিকে সেই বনজঙ্গলকে কেন্দ্র করে একাধিক আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে আদিমতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক সোহারাব হোসেন বলেছেন– "ঐ সব অঞ্চলের বহুবিচিত্র মানুষজন, তাদের সরল ও জটিল মন-মহব্বত, এলাকার ভূগোল ও প্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা, কিংবদন্তী, ইতিহাস, বিশ্বাস-আচার-প্রথা,

কথনরীতি আর সর্বোপরি জঙ্গলমহলকে মহাকাব্যিক বিস্তারে ও গভীরতায় কখনও কখনও নির্মেদ ঝরঝরে পেটানো অবয়বে নলিনী বেরা তাঁর উপন্যাসে তুলে এনেছেন। বিভিন্ন উপন্যাসে এই একই অঞ্চল ও তার মানুষজন উঠে এলেও কখনও ঔপন্যাসিক-সন্দর্ভে কোনও পুনরাবৃত্তি ঘটে না। বরং উপন্যাসে-উপন্যাসে ঐ এলাকা পৃথক হয়ে ধরা দেয়।”[১] তাঁর রচিত সাহিত্যের প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে রয়েছে সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের কথা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না'র কথা ইত্যাদি। অতি শৈশবকাল থেকেই জন্মভূমির মাটির সঙ্গে তাঁর একটা নাড়ীর সম্পর্ক ছিল। সেই মাটির ভিজে সোঁদা রুক্ষ গন্ধ, সেখানকার মানুষের সঙ্গে আশৈশব প্রাণের নিবিড়তা, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, রাগ-অভিমান, ব্যথা-বেদনা, ঈর্ষা-দ্বেষ সব কিছুই কমবেশি করে প্রতিনিয়ত তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেন- “...... মেয়েরা হাটেবাজারে গ্রামে গঞ্জে ‘কুরকুট পটম’ অর্থাৎ ডিমওয়ালা লালা পিঁপড়ের চাক বিক্রি করে। তেলনুন মাখিয়ে শিলে বেটে, পাতায় মুড়ে, পোস্ত-পোড়ার মতো পুড়িয়ে খায়। খেতেও বেশ, টক টক ঝাল ঝাল। শহর থেকে আসা দিদিমণি নাকে রুমাল চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ‘এসব পোকামাকড়, পিঁপড়ে-তোমরা খাও?’ হঁ খাই, হামরা যে লদ্ধা বঠিন।’ তো, এরা সবাই আমার আত্মীয়, বড় আপনার জন। এদের ছেড়ে, শহরে এসে মাঝেমাঝেই মনে হত, তারা সব কোথায় পড়ে আছে একলা, একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। লেখার ভিতর দিয়ে সেই দ্বীপের সঙ্গে, সেইসব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি, দেখা হয়, একটু আধটু কথাও বলি। মনুষ তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কথা বলে, সেই আর কী!”[২] তিনি এই প্রত্যন্ত এলাকার অন্ত্যজ সম্প্রদায়রা(আদিবাসী) পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করেও, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৬% হয়েও এদেশের সকল রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিতই থেকে গেছে, জীবনযুদ্ধে তারা প্রতিনিয়ত নিপীড়িত, পরাজিত এইসব সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, খেড়িয়া, শবর, ভুঁইয়া, ভূমিজ প্রভৃতি জনজাতির প্রতি মমত্ববোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি বারবার তাদের কাছেই ফিরে গেছেন। তিনি সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী অন্ত্যজ সম্প্রদায়দের আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়া কোনও জাতির জীবনই সম্পূর্ণ নয়। হোক না সে আদিবাসী জীবন অথবা উন্নত নাগরিক জীবন। আদিবাসী অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জীবনকে বাস্তবসম্মতভাবে তাঁর লেখায় তুলে ধরতে চেয়েছেন তাই সঙ্গতভাবেই আদিবাসী সংস্কৃতি ছাড়া আদিবাসী জীবন একান্তভাবে অপূর্ণ। তাই তিনি সুবর্ণরেখা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির আকর লোকভাষা, লোকখাদ্য, লোকবাদ্য, লোকগান আয়ত্ত করতে শুরু করেন। উপন্যাসে বর্ণিত স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থানটিও অন্য রকম। বাংলা, উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ডের পূণ্যার্থীরা বালিজাত্‌ উৎসব পালন করে। লোকবিশ্বাস, মহাভারতের অজ্ঞাতবাস পর্বে যুধিষ্ঠির এখানে বারি তর্পণ করেছিল, যা পরবর্তীকালে হয়ে উঠে নলিনী বেরার সাহিত্য

চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাঁর সাহিত্য চেনা লোকেরাই বারবার ফিরে আসে, আর এইসব চরিত্র নিয়েই সৃষ্টি হয় 'শবরচরিত'র মতো এক কালজয়ী উপন্যাস।

নলিনী বেরার আলোচ্য উপন্যাস রচনার আগে দীর্ঘদিন ধরে শবর জাতির সঙ্গে একটা আত্মীক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। শবর জাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানারকম প্রতিচ্ছবি তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। এক সময় শবর জাতিকে ব্রিটিশ সরকার 'অপরাধপ্রবণ' জাতি বলে ঘোষণা করেছিল। এই অপবাদ থেকে আজও তারা বের হতে পারে নি। এরফলে এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা আজও বিপর্যস্ত। উপন্যাসে সেইসব শবরদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তবতার দিকটাই তুলে ধরা হয়েছে।

উপন্যাসে উল্লেখিত শবররা মূলত উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা দুই মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম(বর্তমান জেলা) মহকুমার নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানার পার্শবর্তী এলাকায় বসবাস করত। ঔপন্যাসিক এদের কখনো 'লোধা শবর' বলে চিহ্নিত করেছেন কখনো শুধু লোধা অথবা শুধু 'শবর' বলে চিহ্নিত করেছেন। শবররা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। লোধা-শবর পুরুষরা বন বনজ সম্পদ(কাঠ, মধু,) ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে। অন্যদিকে নারীরাও বন জঙ্গল থেকে ফুল, ফল, শাক, পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ব্যবহার করে। ১৯৮০ সালে বন সংরক্ষণ আইন পাশ হওয়ার পর লোধা-শবররা সপ্তাহে একদিন বনে প্রবেশ করার অনুমতি পায়। এরফলে এদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো ভেঙে পড়ে। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটাতে গিয়ে বাধ্য হয়ে তাদেরকে দিনমজুরের কাজে নিযুক্ত হতে হয়। সেখানেও তাদের শোষণ ও বঞ্চনার মুখ দেখতে হয়। আবার সরকারের তরফ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত, লোধা-শবরদেরকে পশু পালন করার জন্য টাকা দেয়। কিন্তু বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয় নি, সে টাকা তারা দারিদ্র্যের তাড়নায় পেট পূজার কাজে লাগিয়েছে। সরকারের দেওয়া 'ইন্দিরা আবাস যোজনা' ঘরগুলিও পেটের দায়ে টিকিয়ে রাখতে পারে নি, এভাবেই 'দারিদ্রতা' তাদের জীবনের চলার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তারা আবার জীবনযাপনের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেছে, এভাবেই তাদের লৌকিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঔপন্যাসিক তাঁর রচিত উপন্যাসে বনজঙ্গলে বসবাসকারী লোধা-শবরদের দীর্ঘ খাদ্য তালিকার বিবরণ দিয়েছেন। এদের খাদ্যাভাস অন্যান্য আদিবাসীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থনৈতিক বৈষাম্যের জন্যই তাদের এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শবরদের ভাত খাবার ইচ্ছা থাকলেও, বেশিরভাগ দিনই ভাত এদের ভাগ্যে জোটে না। তাই তারা বাধ্য হয়ে বন থেকে সংগৃহীত ফুল, ফল, কন্দ, শাক-সব্জী, মেটে আলু, মহুল ফুলের উপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও ছোট ছোট বন্য জীবজন্তুকেও শিকার করে। উপন্যাসে আদিত্য সেনগুপ্ত ও উপেনের কথোপকথনের সে ছবিই স্পষ্ট হয়ে যায়-

"এরা কী খায় ?"
সাপ, উন্দুর ব্যাঙ। বনের ফলমূল, কেঁদ-বহড়া-ভেলা-ভুড়ুক। খাম আলু-পানআলু-আঁউলা-বাঁউলা-চুরকা। বাঁশকোরল- শালপঙড়া-কাড়হান-কুড়কুড়িয়া- ভাত খায় না ?"[৩]
উপন্যাসে দেখা যায় গুড়খা, গুড়খার বউ ঢালো এবং তাদের ছোট ছেলে এক সঙ্গে বসে সবাই মিলে ইঁন্দুর পোড়া খায়। এদের কাছে ইঁন্দুর পোড়া সৌভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই গুড়খার ছেলে তার বাবা-মায়ের কাছে আবদার করে - "বড় উন্দুর তার চাই না, ছোট ছোট লাল লাল, এখনও চোখ ফুটেনি- এমন উন্দুরই তার চাই, অন্তত তিনটা।"[৪]। শবরদের দৈনন্দিন জীবনের খাদ্য সমূহ শহুরে মানুষদের চোখে অন্যরকম মনে হলেও সেটাই তাদের কাছে অমৃত সমান। লোধা-শবররা পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা সীমান্তবর্তী জঙ্গলমহল এলাকায় বসবাস করে। শবরদের বাড়ি-ঘর ইঁট-পাথর দিয়ে তৈরী নয়, মাটির দেওয়াল ও পাতার ছাউনি দিয়ে ছাওয়া তাদের ভাষায় একে 'কুঁড়িয়া' বলে। রাজ্য সরকার শবরদেরকে টিনের ঘর দেয়, কিন্তু অভাবের তাড়নায় ঘরের টিন খুলে বিক্রি করে দিয়েছে- "রাইবুলোধার ঘুপচীর চালের দুটো টিন কবে থেকে কোথায় যে উধাও হয়ে গেছে ! রাইবুর তো গেছে দুটি, আর আর লোধাদের গেছে তিনটে-চারটে।"[৫]

লোধা-শবরদের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদের বহর দেখা যায় না। অভাবের সংসারে লজ্জা নিবারণের জন্য সামান্যতম এক টুকরো বস্ত্র জোগাড় করতেই তাদেরকে নাজেহাল হতে হয়। উপন্যাসে দেখা যায় রাইবু হাট থেকে তার বাবার জন্য চার হাতের একটা নতুন গামছা কিনে দিতে চাইলেও অর্থাভাবে কিনে দিতে পারে নি। তাই রাইবুর বাবা লজ্জা নিবারণের জন্য ধুতি ছেঁড়ার নেঙটই একমাত্র সম্বল- "নাঙা নাঙা। খালি যা টেনেটুনে পাছাটুকু ঢাকা লাল ডুরে গামছায়।"[৬] মেয়েদের ক্ষেত্রেও সেই একই রকম লক্ষ্য করা যায়, চার হাত লম্বা একটা গামছায় যতটা পারা যায় শরীরটাকে ঢেকে রাখার প্রয়াস করে। উপন্যাসে দেখা যায় বনজঙ্গলে মহুল ফুল কুড়তে যাওয়া লোধা মেয়েদের পোশাকের বর্ণনা পাওয়া যায় যেমন – "ঠেকে-পাছিয়া বগলে প্রায় উলঙ্গ দু-দুটো মেয়ে, লোধামেয়্যা, একটার ছেঁড়া-ফাটা হাফ-পেন্টুল আর কোমরে গোঁজা ততোধিক ছেঁড়া 'নুগা' কোনমতে বুকে জড়ানো, আরেকজনের এতটাই ঝিল্‌ঝিল্‌ গামছা, 'বোস-ওঠা' শরীরটাকে ঢেকেও ঢাকতে পারছে না......।"[৭] লোধা-শবর মেয়েদেরকে খুব বেশি অলংকার ব্যবহার করতে দেখা যায় না। তবে প্রয়োজনের তাগিদে তারা বসন্ত কামিল্লার কাছ থেকে রূপার আঙট তৈরী করে নেয়। অন্যদিকে সুযোগ সন্ধানী বসন্ত কামিল্লা যার বৃত্তি গয়না তৈরী করা, সে লোধা শবর নারীদের সংসর্গ পেতে পায়ের ছোট ছোট আঙট তৈরী করে দেয়। প্রথমদিকে লোধা-শবর নারীদের বিশেষ কিছু অলংকার ছিল না। বনের ফুল, লতা দিয়ে হাতে মাথায় গলায় জড়িয়ে নিজেদেরকে সাজাত। ঔপন্যাসিকের ভাষায়- " ঐ তো তারা দিব্যি হেলতে-

দুলতে চুড়ির দোকানে গেল। আর কেউ চুড়ি পরবে না, ঠুনকো কাচের চুড়ি পরে তারা পয়সা নষ্ট করবে না, তাদের জঙ্গলের দুধিয়ালতাই ভালো,...।”[৮]

শিকার দক্ষিণবঙ্গের লোধা-শবর সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের কাছে এক মহা উৎসব। শিকারে হাতিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিচ্ছক আনন্দের জন্য নয়, জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য শিকারে যাওয়ার সময় শবররা বেশ কিছু হাতিয়ার ব্যবহার করে। সেগুলি হল- গুজিয়া, বিষমাখানো তীর, গুলতি, সাতনলা, আঠকাঠি, ফাঁসিজাল ইত্যাদি। উপন্যাসে 'গুজিয়া' নামক এক শিকারের যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 'গুজিয়া' দিয়ে কাঁকড়া শিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে- “খালধারে জলো জমিনের আলধারে, গর্তের মুখে যেখানে জল নেই, শুধুই থকথকে কাদা আর সে-কাদার উপর যদি ছাপ থাকে কাঁকড়ার ট্যারাবেঁকা পায়ের, তবে ‘গুজিয়া’ মারতে হবে ঠিক গর্তে নয়, গর্তের পাশেই। গুজিয়ার চাপে পড়ে কাঠকম্ বা কাঁকড়া বুজে-আসা নিজের গর্ত ছেড়ে উপরে উঠে আসবে। আর উঠলেই 'গুজিয়া' চেপে ধরে করাতমুখী বড় বড় দাঁড়া দুটো পটপট করে ভেঙে দাও।”[৯] 'গুলতি' শবরদের একটা শিকারের যন্ত্র, গুলতি দিয়ে কাঠবিড়ালী শিকার করে। নীলেশ্বরের প্রসঙ্গে একস্থানে বলা হয়েছে- “রাদ্দিন খেলা আর খেলা, গুটুল লিয়ে চিঁড়ুরা মারা।”[১০] মাশুড়িয়া গ্রামের শবররা 'সাতনলা' নামক শিকারের যন্ত্র দিয়ে পাখি ধরে। বাঁশ নলের মুখে লোহার শিক লাগিয়ে উঁচু ডালে বসা ঘুমন্ত পাখিকে শিকে গেঁথে নেয়। 'কুঁচিফাঁস' নামক শিকারের যন্ত্র দিয়ে শবররা পায়রা ধরে। গরুর লেজের মোটা চুল দিয়ে বানানো হয়। রাইবুর বাবা 'কুঁচিফাঁস' বানিয়েছিল- "বাঁশবাউশের কুঁচি বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে, গোল গোল দরজায় মতো করে, সুতো দিয়ে বর্ফির মতো বেঁধে তার মধ্যে আলগা গিঁট দেয়া চুলের ফাঁস।”[১১]

আলোচ্য উপন্যাসে লোধা-শবরদের বেশ কিছু ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে বেশিরভাগ ছড়াই তাদের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। যেমন উপন্যাস শুরুর প্রথমদিকে রাইবুর সাকরেদ গুড়গুড়িয়ার মুখে এক ছড়া শোনা যায় -

“রাম-লখোন দুই ভাই।
বাণ মারে ঠুই-ঠাই।”[১২]

ফুলটুসির কথা অনুযায়ী ছড়াটির অর্থ হল, রামায়ণে কথিত শবরীর বংশধররাই হল আজকের লোধা-শবর। আমরা আগেই জানি লোধা-শবররা বনে বসবাস করে। উৎসব-অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে নিত্য যাতায়তের রেয়াজ ছিল। পাহাড়ের দুর্গম পথকে নির্দ্বিধায় অতিক্রম করে নেয়। আত্মীয়দের বাড়ি পায়ে হেঁটে যেতে প্রচুর সময় লেগে যেত এর মধ্যে পথে খাদ্য হিসেবে যা পায় তা-ই খেয়ে নেয়। এ সম্পর্কে কিছু ছড়া পাওয়া যায়- “বনে বনে আইলি বাবু, কী খাঞে আইলি? এত কেনে দেরি বাবু, এত কেনে দেরি? তোর বহিন বাহিরাঁই গেল, ভাত দিতে দেরি-”[১৩]

বনজঙ্গলে বসবাসকারী লোধা-শবরদের মুখেও নানা ধরনের প্রবাদ শুনতে পাওয়া যায়। বনে-জঙ্গলে আত্মরক্ষা ও শিকারের জন্য লোধা-শবররা হাতিয়ার হিসেবে শর ব্যবহার করে। তাই তাদের প্রবাদের মধ্যে 'শর'র স্থান রয়েছে। শিকারের উদ্দেশ্য বের হওয়া রাইবু এবং গুড়গুড়িয়ার মুখে 'শর' নিয়ে প্রবাদ শোনা যায়। "যেখানে শর সেখানে শব্বর?"[১৪]

শবরেরা পঞ্জিকা দেখে দিন গণনা করে না কারণ তারা পঞ্জিকাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না। দিনকাল সমস্তই তাদের নখদর্পণে। অথবা ছঁচমাটি দিয়ে লেপা দেওয়ালে রেখা কেটে এরা হিসেব করে। তাই এদের জীবনে পঞ্জিকার গুরুত্ব নেই এ নিয়েও প্রবাদ রয়েছে- "যতই দেখ পাঁজিপুথি আষাঢ় মাসের সাতদিনে হয় অম্বুবাচী।"[১৫] তাদের বিশ্বাস আষাঢ় মাসের সাতদিনে ধরিত্রী মাতার ঋতুস্রাব হয়, এসময় কোনো মাঙ্গলিক কাজে হাত দেয় না।

লোকসাহিত্যের সঙ্গে ধাঁধার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ধাঁধা হল প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক এক ধরনের খেলা। আলোচ্য উপন্যাসেও লোকসমাজে প্রচলিত বেশ কিছু ধাঁধার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলি হল-

১. "এক থালা সুপারি গুনতে নারি।"[১৬]

উত্তর- তারা।

২. "তিন কুনিয়া পোখরে ন্যাকড়া ভাসে।
পিছুতে কাঠি দিলে ফিক্ ফিক্ হাসে।।"[১৭]

উত্তর- প্রদীপ।

৩. "আস দেওর কাজ করবে - দু-জাঙের মাঝে -"[১৮]

উত্তর- জাতা।

সঙ্গীতের ইতিহাস মানবজীবনের ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই ইতিহাস আজকের নয়, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করেছে। সঙ্গীত হল মানব মনের জমে থাকা আবেগ প্রকাশের প্রাচীনতম মাধ্যম। আদিম মানুষ একত্রে মিলিত হয়ে নাচ ও গানের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে জমে থাকা আবেগ একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে আনন্দ অনুভুতি প্রকাশ করেছে। আলোচ্য উপন্যাসের লোধা-শবরদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। উপন্যাসে উল্লেখিত বেশিরভাগই গানই উৎসব ও অনুষ্ঠানভিত্তিক। শবরদের জীবনে 'চাঙুগানের'র প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও কয়েকটি 'করম' গীতির উল্লেখ রয়েছে। করম পূজা হল প্রকৃতি পূজারই একটি অন্যতম রূপ। করম পূজার গানগুলি হল-

"হাতি চড়ি আয়ো ত ইন্দর রাজা ঘোড়া চড়ি আয়ো ত করম রাজা...."[১৯]

কখনো কখনো আবার তাদের করম পূজার আখড়ায় ঝুমুর গানও শোনা যায়-

"তুই হামার সরু সিঁথা তুঁই গলার মালাগাঁথা

তুঁহেই সাধের আয়না কাঁকই লো, হে ওহে ধনি।

....

তুঁহেই চইখের চঞ্চল চাহনি লো, হে ওহে ধনি।”[২০]

লোককথা হল লোকসংস্কৃতিরই একটি অন্যতম অঙ্গ। মানুষের মধ্যে গল্প বলা ও গল্প শোনার প্রবণতা সুদূর অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমান গুরুত্বের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। ভারতীয় লোকসমাজ থেকে উঠে আসা নানান ধরণের কথা-কাহিনি সেগুলো অধিকাংশই সম্ভব-অসম্ভবের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি মূলত শ্রুতিবাহী(Oral Tradition)’র অংশ বিশেষমাত্র। উপন্যাসে লোধা-শবরদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানান ধরণের কথা ও কাহিনির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। শবরদের এক লোককথার কাহিনি থেকে জানা যায়, তারা নাকি ব্রাহ্মণ জাতি থেকেও উঁচু জাত। আদি কাহিনিটি হল- কোনো একসময় একবার স্বয়ং ভগবান গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। সেই সময় পা দুটি তার পদ্মফুলের মতো রাঙা এবং সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। জরা শবর সেই পা দেখে মৃগীর কান ভেবে দেরি না করে তীর ছুঁড়ে দেয়। আর সেই তীরের আঘাতেই ভগবান মারা যায়। কিন্তু মরবার আগে ভগবান জরা শবরকে বলে যায়- “জরা রে তুঁই বেড়ে পুণ্যিমান, এবার থেক্যে তোর জাত হবে বেরাম্ভণের থিক্যেও বড়।”[২১] এ থেকেই শবরদের বিশ্বাস জরাশবরদের বংশধরই হচ্ছে আজকের শবরেরা। বর্তমানে তাদের সামাজিক বা আর্থিক পরিস্থিতি যেরকমই থাকুক না কেন, জাতি বিচারে নিজেদেরকে সবার উঁচু স্থানে বসিয়েছে।

শবর সম্প্রদায়ের সমাজে বিবাহ মূলত লৌকিক আচার-সংস্কারে লালিত। লোধা-শবরদের সমাজে বিবাহে প্রচলিত বেশ কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও লৌকিকতা উপন্যাসে উঠে এসেছে। লোধা-শবরদের কাছে বিবাহ হচ্ছে একটি সামাজিক প্রথা যার মূল উদ্দেশ্য হল বংশ রক্ষা করা। এরা ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে বংশ বিস্তারে বিশ্বাসী, তাই রাইবু এবং শিশুবালার সন্তান না জন্মালে রাইবু তার নিরুদ্দেশ হওয়া বোনের কথা ভেবে বলে- “সোমবারিটা ছিল। ছেলের ঘরে না হোক, থাকলে মেয়ের ঘরেও তো মেয়ে কিংবা ছেলে হতে পারত।...একটা বংশের লতা চলত, চলতই, থামত না।”[২২] অন্যান্য সমাজের মতো লোধা-শবরদের সমাজেও বিবাহে পণ প্রথা প্রচলিত আছে। এই পণ টাকা-পয়সা বা জিনিস-পত্র নেওয়ার পণ নয়, এ পণ দায়িত্ব গ্রহণের পণ। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-“লোধা ‘জাইতের’ বিয়েতে আছে, বিয়ের পরে বর ঘরের টুইয়ে কী গাছের ডালে উঠে পড়ে, কিছুতেই নামে না। বরঞ্চ ভয় দেখিয়ে বলে, “মুই পড়িড মরি যামু!” কনেকে দাঁড়াতে হয় নিচে, আর বলতে হয়, “অলি আস-অ, তুঙ্গা তাড়ি খাওয়ামু।”[২৩]

মানুষের চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই, তাই তাদের মনে নানা রকমের বিশ্বাস সংস্কারের জন্ম নেয়। সাধারণ মানুষ ইহজগতের চাওয়া পাওয়ার চাহিদা মেটাবার জন্য

অনেক সময় লৌকিক দেব-দেবীর কাছে মানত করে। অন্যান্য সমাজের মতো লোধা-শবর সমাজেও মানত করার রীতি প্রচলিত আছে। সেই চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে বিশ্বাস করে লোধা-শবররা বেশ কিছু তাদের লৌকিক দেব-দেবীর কাছে মানত করতে শুরু করে। লোধা-শবর পাড়ায় বিপদ নেমে আসায় রাইবু 'বড়াম মায়ের' থানে পাঁঠা মানত করে। "…..বিপদ সমগ্র লোধাদের, বড়ো বিপদ, তাই একটা পাঁঠা খুঁজছে, চুরি করা নয় নগদানগদি টাকায় কেনা। বড়াম থানে দেবে, মানত আছে।"[২৪] শবরদের বিশ্বাস পুকুরের জলে পান সুপারি দিয়ে মানত করলে পুকুর থেকে সোনার কলসি উঠে আসে। গুরভা পুকুর ধারে বসে ভাবে-"একটা গুয়া একটা পান দিয়ে 'মানত' করলে পুকুরের জল থেকে থালা-বাসন-বারকোশ তো বারকোশ, সোনার গহনা-টাকার গাগরাও উঠে আসে।"[২৫] শবররা রাতের আকাশে 'তারা খসা' দেখলে অশুভ মনে করে। এই 'তারা খসা'কে লোধা-শবররা পাপীতারা বলে। সেই অশুভ শক্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা আঙুল কামড়ে বুকে থুতু ছেটায়। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-"পাপীতারা দেখতে নেই, দেখলেই পাপ। তবু তো ঢুলু ঢুলু চোখে ঠিক পড়ে যায়। তখন কী আর করার থাকে? বড়জোর কঁড়ে আঙুল দাঁতে কামড়ে বুকে থুতু ছেটাও আর মুখে বল ছিছি পাপীতারা!"[২৬]

মানব ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকেই খিদে আমাদেরকে দারুনভাবে তাড়িত করে আসছে। ভারতীয় আদি বাসিন্দা আদিবাসীরা যখন গুহায় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করে জীবনযাপন করত, দৈনন্দিন জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য যখন তারা ফল-মূল কিংবা পশু-পাখি শিকার করার পর নিজেদের মধ্যে ভাগের সময়, তাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন সাময়িকের জন্য খিদের কথা ভুলে গিয়ে গুহার গায়ে একটা সেই শিকারের ছবি আঁকলেন। অর্থাৎ খিদেকে জয় করেই তাকে যেতে হয়েছিল শিল্পের দিকে। সে দিক থেকে বিচার করলে অঙ্কন বা লিখন কেন্দ্রিক সংস্কৃতি অতি প্রাচীন। আদিবাসী সম্প্রদায় কর্তৃক সৃজিত আলপনা, দেওয়ালচিত্র, নক্‌সা ইত্যাদিকে লিখন কেন্দ্রিক সংস্কৃতি বলা হয়। চিত্রের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ পেত, তবে পরবর্তীকালে সৌন্দর্যবর্ধক কারুকার্য হিসাবে পরিণত হয়। লোধা-শবর সমাজে তেমন কোনো রীতি প্রচলন নেই। তবে পার্শ্ববর্তী সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেওয়াল চিত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায়, কুমোর পাড়ার দেওয়ালচিত্র দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে লোধা পাড়ার সাবিত্রীও দেওয়ালচিত্র করতে শুরু করে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-"নুকু ঘুপচীর পিছনটার এসে দেখল সাবিত্রীবিটি ঘরের সামনের দিকের দেয়ালে ছঁচ দিয়ে যত না ছবি এঁকেছে, তার চেয়ে পিছনের দেওয়ালটায় নক্সা করেছে বেশি। গোল গোল ফুল, গোলের উপর গোল, গোলের ভিতর ঢুকে তৈরী করেছে আরেকটি গোল।"[২৭]

ঔপন্যাসিক নলিনী বেরা তাঁর 'শবরচরিত' উপন্যাসে শবরদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে বর্ণগত শ্রেণিবৈষাম্য ও অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষাম্যের কথা বলতে গিয়ে তাদের লোকজীবন ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে উপন্যাসে

ফুটিয়ে তুলেছেন। লোধা-শবরদের আচার-সংস্কার, রীতি-নীতি জীবনযাপনের প্রত্যকটি উপাদানের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। যা সামাজিক ইতিহাসে লোধা-শবরদের এক জীবন্ত দলিল।

তথ্যসূত্র:

১. সোহারাব হোসেন, ‘দেশজ-লোকজ ঘরনার কথাকার নলিনী বেরা’, এই সময়ের অন্য ধারার উপন্যাস’, ‘কোরক’ প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫; সম্পাদক তাপস ভৌমিক; পৃ-২৫৬।
২. নলিনী বেরা, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ ‘আমার কথা সুবর্ণরেখা একটি নদীর নাম’ ২০০৩, ‘করুণা প্রকাশনী’ ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ-xxiv)
৩. নলিনী বেরা, ‘শবরচরিত', 'করুণা' প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭, নভেম্বর পৃ-৯৭।
৪. পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৯।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ-১৬৪।
৬. পূর্বোক্ত, পৃ-১২৩।
৭. পূর্বোক্ত, পৃ-৩৩৩-৩৩৪।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ-৬৯৩।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ-১৭৩।
১০. পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৮।
১১. পূর্বোক্ত, পৃ- ১১৮।
১২. পূর্বোক্ত, পৃ-২৩।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ-৬০৮।
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ-২১।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ-৫৯।
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ-৩২২।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ-৫২২।
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ-৫৩২।
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ-৬৮৪।
২০. পূর্বোক্ত, পৃ-৯১।
২১. পূর্বোক্ত, পৃ-৩২।
২২. পূর্বোক্ত, পৃ-২২৩।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ-৪৯১।
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ-৩৯।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ-৫৫৫।
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ-৩২৭।
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ- ১৯৩।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা', ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩।
২. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'পঞ্চাশের দশকের কথাকার' (সম্পাদিত) ১৯৯৮, 'পুস্তক বিপণি' ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।
৩. দীপঙ্কর ঘোষ, 'আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি' ২০০৯, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-৭০০০৬৮।
৪. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ' (১ম খণ্ড), ২০১৩, 'বাস্কে পাবলিকেশন' ১৮/১, শান্তিনগর, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৭০০০৪০।
৫. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ২০১৮-২০১৯, 'মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড' ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩।
৬. ডঃ সত্যবতী গিরি, ডঃ সমরেশ মজুমদার 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' ১ম খণ্ড,(সম্পাদিত) ২০১৩, 'রত্নাবলী' ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯।

পত্রিকা পঞ্জী:

১. 'গল্প সরণি', 'মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা', অমর দে, ষোড়শ বর্ষ; বার্ষিক সংকলন; ১৪১৮।
২. 'তবু একলব্য' 'মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা', দীপঙ্কর মল্লিক, ১৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা, জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০১৮।
৩. 'বারণরেখা',আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি' (ভারতের ভিতর ও বাহির) ষষ্ঠ সংখ্যা,অরূপ বসু, ২০১৭।
৪. 'সৃজন' 'বিষয়ঃ নলিনী বেরা বিশেষ সংখ্যা' লক্ষ্মণ কর্মকার, নভেম্বর, ২০১৯।
৫. 'সমকালের জিয়ন কাঠি', 'মহাশ্বেতাদেবী বিশেষ সংখ্যা', নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, জানুয়ারী-জুন, ২০১৫।

সুন্দরবনে মনুষ্য বসতির গোড়াপত্তনের ইতিহাস

কৃষ্ণ কুমার সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রাজা নরেন্দ্র লাল খান ওমেন'স কলেজ (অটোনমাস)
পশ্চিম মেদেনীপুর

অনুচিন্তন:
'সুন্দরবন'—দুই বাংলার বঙ্গোপসাগর উপকূলে বিস্তৃত লবণাম্বুজ বা ম্যানগ্রোভ বনভূমি দ্বারা আবৃত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। প্রাকৃতিক শোভায় সজ্জিত, ভরা সম্পদের ভাণ্ডার সুন্দরবন। ভাঙা-গড়ার জলন্ত ইতিহাস, মঙ্গলকাব্যের গল্পকথায় সমৃদ্ধ সুন্দরবন। জীববৈচিত্রে পরিপূর্ণ বিশ্বের আকর্ষনীয় তত্ত্ব ও তথ্যের স্থান সুন্দরবন। এই 'সুন্দরবন'-এর নামকরণের উৎস নিয়ে নানা মত আছে। কেউ বলেন সুন্দরী গাছের কথা, কেউ বলেন 'সুন্দর' বনের কথা আবার কেউ বলেন 'সুদূর' বনের কথা। এই বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে ৭৯ প্রজাতির লবণাম্বুজ উদ্ভিদ এবং ২৬২৬ প্রজাতির প্রাণীকুল। তবে ঠিক কোন সময় থেকে এখানে মানুষ বসবাস করতে শুরু করেছিল সেটা জানা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সুন্দরবনে মনুষ্য বসতির গোড়াপত্তনের সেই ইতিহাসকে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি।
সূচক শব্দ: সুন্দরবন, সমুদ্র উপকুল, মনুষ্য বসতি, গোড়াপত্তন, ইত্যাদি।

মূলপ্রবন্ধ:
গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ হল সুন্দরবন। পশ্চিমে ভারতের হুগলি নদী থেকে পূর্বদিকে বাংলাদেশে অবস্থিত বালেশ্বর নদী পর্যন্ত সুন্দবনের পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার। সুন্দরবনের মোট আয়তন ১০,২৭৭ বর্গকিলোমিটার। পৃথিবীর বৃহত্তম এই ম্যানগ্রোভ বনভূমির ৪,২৬০ বর্গকিলোমিটার ভারতের এবং ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই সুবিস্তীর্ণ এলাকায় মানুষ কোন সময় থেকে বসবাস করতে শুরু করেছিল সেটা নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক মহলে মতবিরোধ আছে। বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এর সূত্র ধরে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন সুন্দরবনে মনুষ্য বসতির সূচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। তবে এই অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মানুষের বসতি ছিল বলেও জানা যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংকুল এই ভূমিতে আজ থেকে এত বছর আগে কিভাবে মানুষের বসতি স্থাপন সম্ভব হয়েছিল সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সম্ভবত সেই সময় উপকূলের ভূমির উচ্চতা বর্তমান সময়ের তুলনায় বেশি ছিল অথবা সাগরের জলস্তর তখন কিছুটা নিম্নগামী ছিল। আনুমানিক ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ভূমিকম্প বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে বর্তমান সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে

যায় এবং সাগর এসে এলাকাটিকে গ্রাস করে নেয়।[১] বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সুন্দরবনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বসতি স্থাপনের নজির আমরা পেয়ে থাকি। এখানে কালানুক্রম অনুযায়ী সেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করছি।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পতন হয়। ক্লাইভের মদতে ষড়যন্ত্রী মীরজাফরের নবাবি লাভ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং চুক্তি অনুযায়ী ক্লাইভ তথা ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতার জমিদারী পায়। সাবেক ২৪ পরগনা মহল ছিল কলকাতার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। মীরজাফর ক্লাইভকে যে জমিদারি উপহার দিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে ও'ম্যালির *'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ২৪ পরগনা'* থেকে তথ্য পাওয়া যায়।[২] ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে একটি সনদের মাধ্যমে ক্লাইভকে ২৪ পরগনার সার্বভৌম মালিকানা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল সুন্দরবনের শ্বাপদসংকুল বনভূমি।

ওয়ারেন হেস্টিংস ২৪ পরগনাকে একত্রিত করে একটি পৃথক জেলা গঠন করেছিলেন। তখন থেকে এর নামকরণ হয় ২৪ পরগনা। এই ২৪ পরগনা জেলাকে একসময় 'আঠারো ভাটির দেশ' বলা হত। সমুদ্র উপকূল বেষ্টিত এই সুন্দরবনে ভয়াল হিংস্র বাঘ, কুমির, সাপ, হরিণ, বুনো শুকর, অজস্র পাখি আজও বিরাজমান। বেশিরভাগ পন্ডিতের মতে সুন্দরী বৃক্ষের আধিক্য থাকার জন্যই সুন্দরবন নাম। দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলে সুন্দরী গাছের আধিক্য থাকার জন্য যে সুন্দরবন নামের উৎপত্তি তার স্বপক্ষে ফার্মিংগারের রিপোর্ট থেকে আমরা তথ্য পাই।[৩]

১৭৭০ থেকে ১৭৭৩ এই পর্বে ২৪ পরগনার কালেক্টর জেনারেল মিস্টার কল্ড রাসেল ব্যক্তিগতভাবে শর্তসাপেক্ষে সুন্দরবনের কিছু জমি ইজারা প্রদান করেন। দেশি ও বিদেশি ইজারাদার বা জমিদারদের কাছে এইসব জমি দেওয়া হয়। জমি লিজ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত ছিল জঙ্গলে জমি হাসিলের ক্ষেত্রে প্রথম সাত বছর এইসব আবাদি জমি করমুক্ত থাকবে এবং পরবর্তী বছর থেকে জমির গুণাগুণ অনুসারে বারো আনা, আট আনা ও ছ'আনা খাজনা স্থির হবে। কল্ড রাসেলের লিজ দেওয়া জমিগুলো পরবর্তী পর্যায়ে 'পতিতাবাদি তালুক' নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে পূর্বদিকে ক্যানিং থেকে দক্ষিণে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত জঙ্গল হাসিলের কাজ চলে।[৪]

১৭৮১ থেকে ১৭৮৩ সালে টিলমান হেঙ্কেল ছিলেন যশোহর জেলা জর্জ ও ম্যাজিস্ট্রেট। সাত বছরের মধ্যে ৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করে দেওয়ার শর্তে তিনি ১৭৮৩ সালে হরিণঘাটা নদীর পূর্বে রায়মঙ্গল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা লিজ নেন। জমিকে ছোট ছোট খন্ডে ভাগ করে চাষীদের মধ্যে বন্টন করার বন্দোবস্তের চেষ্টা তিনি করেছিলেন। কথামতো ওয়ারেন হেস্টিংস সুন্দরবনের প্রায় ৬৪,৯২৮ বিঘা জমি সংস্কারের অনুমতি দেন। পরবর্তীতে হেঙ্কেল সাহেব সুন্দরবনের সুপারিনটেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হয়ে ৬৪,২৯৮ বিঘা জমির পত্তন করেন।[৫]

১৭৮৫ সালে নোনাজল ও হিংস্র জন্তু সংকুল জঙ্গলকে কৃষির উপযোগী করে তোলার জন্য ১৫০ জন চাষীকে জমির স্বত্ব প্রদান করা হয়েছিল। জল-জঙ্গলের দেশে চেইন্ দিয়ে জমি পরিমাপের অসুবিধার জন্য চার হাত লম্বা লাঠি দিয়ে জমির মাপ করা হয়। ১৭৮৬ সালে জঙ্গলের উত্তরাংশের সীমানা বাঁশের খুঁটি দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়। ১৭৯২ সালে উত্তর দিকের সীমানা নির্দেশকারী ষোলটি বাঁশের খুঁটি খুঁজে পাওয়া যায়। এই ষোলোটি চিহ্নিত অঞ্চলকে তালুক বলা হত। একসঙ্গে সমগ্র অঞ্চল 'হেঙ্কেলের তালুক' নামে পরিচিত। এই ভূখন্ডের ৬৪,৯২৮ বিঘা জমি ১৪৪ টি লটে ভাগ করে রায়তদের মধ্যে বিলি করেন হেঙ্কেল সাহেব। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের স্থানীয় জমিদারদের বিরোধিতায় এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হয়। চাষীদের প্রয়োজনে হেঙ্কেল কালিন্দী নদীর ধারে একটি বাজার (হাট) প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানটি প্রথমে হেঙ্কেলগঞ্জ পরবর্তীকালে হিঙ্গলগঞ্জ নামে পরিচিত হয়।[৬]

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ও বাংলার জমিদার ও স্বাধীন তালুকদারদের মধ্যে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু হয়। এই চুক্তির ফলে জমিদার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভূসম্পত্তি নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকারী হন। এর ফলে জমিদাররা স্বত্বাধিকারের সুবিধা এবং চিরস্থায়ীভাবে অপরিবর্তনীয় এক নির্ধারিত হারে রাজস্ব জমিদারিস্বত্ব পান।

১৮১১-১৮১৪ এই পর্বে সুন্দরবন অঞ্চল জরিপের কাজ করেন ডব্ল্যু.ই. মরিসন। ১৮১৪ সালে সুন্দরবনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুবিধার জন্য একটি কমিশনার পদ সৃষ্টি করা হয় এবং ১৮১৪ সালে নবম রেগুলেশন এর মাধ্যমে মিস্টার স্কটকে প্রথম কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। ১৮১৭ সালে নতুন আইন করে কোম্পানি সুন্দরবন অঞ্চলকে তাদের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে। আলিপুরে স্থাপিত হয় সুন্দরবনের হেডকোয়ার্টার।

১৮১৮ থেকে ১৮৩১ এই পর্বে ডব্ল্যু.ই. মরিসনের জরিপ পরীক্ষা করেন তাঁর ভাই হোজেস মরিসন। এই কাজে তার সহযোগী ছিলেন ডাম্পিয়ার সাহেব। ডাম্পিয়ার ও হোজেসের জরিপ কাজ থেকে সুন্দরবনের উত্তর সীমা-নির্ধারক একটি কাল্পনিক রেখা নির্দিষ্ট করা হয়। হোজেসের এই কাজটি শেষ করতে সময় লেগেছিল ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত । এই সময় মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ১৭, ০২, ৪২০ একর বা ২৬৬০ মাইল।[৭] সুন্দরবনে জমি জরিপের ক্ষেত্রে ডাম্পিয়ার-হোজেস যুগ্ম ক্রিয়াটি ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত একটি মানচিত্রে 'ডাম্পিয়ার-হোজেস' লাইন নামে চিহ্নিত হয়।

আবার ১৮২১ সালে মিস্টার ডালের নেতৃত্বে সুন্দরবন অফিসের কাজ শুরু হয়। ১৮২২ সালে এনসাইন প্রিন্সেপ সুন্দরবনের জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমির মধ্যে এক নতুন জরিপ কাজ করেন। জরিপ কাজ শেষ হওয়ার পর সুন্দরবনের বন হাসিল করার

জমিকে ইংরেজি ‘এ’ থেকে ‘এন’ হরফ দিয়ে বারোটি প্লটে এবং ১৬৩টি মতান্তরে ১৬৭টি ‘লট’-এ ভাগ করা হয়।[৮]

১৮৫৩ সালে সুন্দরবনের যাঁরা জমি ‘লিজ’ নেবেন তাদের আগ্রহী করে তোলার জন্য উদার শর্তে একটি আইন পাস করা হয়। এখানে বলা হয় ৯৯ বছরের লিজ এবং জমির এক-চতুর্থাংশ পুকুর ও বসবাসের জন্য আজীবন ভোগ করার সুযোগ দেয়া হবে। বাকি তিন-চতুর্থাংশ জমিতে ২১তম বর্ষ থেকে বিঘাপ্রতি দু'পয়সা থেকে ৫০তম বর্ষে পূর্ণ খাজনা দু’আনা নির্ধারিত হয়। এই আইনের শর্তে লেখা ছিল প্রথম দশবছরে এক চতুর্থাংশ, বারো বছরে অর্ধেক, তেরো বছরে তিন-চতুর্থাংশ জঙ্গল হাসিল করতে না পারলে ‘লিজ’ বাতিল করা হবে। আবার, এই বছরেই বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এর সেক্রেটারি টি.এম. রবিনসন বড়লাট লর্ড ডালহৌসির কাছে কলকাতার বিকল্প বন্দর হিসেবে মাতলা নদীর তীরে, ক্যানিংকে গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। যার ফলশ্রুতি হিসাবে ক্যানিং বন্দর গড়ে ওঠে এবং খুব শীঘ্রই কলকাতার সঙ্গে ক্যানিং-এর সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অল্প কয়েক বছর পরে অবশ্য নাব্যতার অভাব এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বন্দরটি অচল হয়ে যায়।[৯]

১৮৫৬ সালে ‘লিজ’ গ্রহীতাদের জমি কেনা-বেচার অধিকার দেয়া হয়। ১৮৭৯ সালে সুন্দরবনের জমি বিলি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজিবাদী ও ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়। ১৯০৪ থেকে ১৯০৫ সালে বৃহৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা স্থগিত রেখে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯১০ সালে পতিত জমি বন্দোবস্তের জন্য আবার বৃহৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে জাগিয়ে তোলা হয়। ১৯১৫ সালে নতুন আইনে সুন্দরবনকে রায়তি ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়। ১৯৩৯ সালে কিছু বনভূমি ইজারাদারদের মধ্যে ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে ১৭৮ জনের মধ্যে জমি বিতাড়ন করা হয়েছিল।[১০]

সুন্দরবনের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলকে কৃষি যোগ্য করে তোলার পিছনে কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ইংরেজরা নানা আইন প্রণয়ন করে জমি বিলিবন্টন করলেও জমির প্রকৃত মালিকানা কখনোই চাষীদের কাছে পৌঁছায়নি। জমিদার বা লাটদাররা লক্ষ লক্ষ বিঘার মালিকানা পেতেন। তাদের রায়তরা জমিদারদের কাছ থেকে পাওয়া জমি ভূমিহীনদের দিয়ে কৃষিযোগ্য করে তুলতো। কৃষিযোগ্য হওয়ার পর কখনোই তাদের স্বত্ব দেওয়া হতো না। নানা অজুহাতে বঞ্চিত করা হতো সেই সব কৃষকদের। যারা প্রাণ হাতে নিয়ে অনেক সময় প্রাণ দিয়েও শ্বাপদসংকুল অরণ্যকে কৃষিযোগ্য করে তুলতেন সামান্য জমির আশায়। দেশ স্বাধীন (১৯৪৭) হওয়ার পরও চাষীদের অবস্থা খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। চাষীদের নিজস্ব ভূমির দাবিতে তেভাগা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত চাষীদের দাবিকে কিছুটা প্রতিষ্ঠা করে। তেভাগা আন্দোলনই তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভাকে ভূমি সংস্কার ও জমিদারি বিলুপ্ত প্রণয়ন করতে কার্যত বাধ্য করে।[১১] ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭১ সাল

পর্যন্ত সুন্দরবনের কিছু অঞ্চল সংস্কার করা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়। সমগ্রদেশের মত সুন্দরবনের চাষিরা ও খাতায়-কলমে অন্তত জমির অধিকার পান। এরপর ১৯৬৩ সালে সুন্দরবনের হেড়োভাঙা ও ঝড়খালি অঞ্চলে ৫০০০ একর বনাঞ্চল সংস্কার করা হয়।[১২]

সুন্দরবনে বসতি স্থাপন ও জঙ্গল হাসিলের এই দীর্ঘ পর্বের দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন ভূমিহীন মানুষের জীবন বাজি রেখে কৃষিজমি প্রাপ্তির সংগ্রাম, অন্যদিকে তেমনি এক সমৃদ্ধ বাস্তুসংস্থান তন্ত্রের নির্মম ধ্বংস। জঙ্গল হাসিল পর্ব যখন খাতায়-কলমে শেষ হয় ঠিক তখনই সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে মাত্র কয়েকটি দ্বীপে জঙ্গল টিকে থাকে আর বাকি অংশে গড়ে ওঠে মনুষ্যের স্থায়ী বসতি। বর্তমানে সুন্দরবনের মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি। তারমধ্যে ৫৪ টি দ্বীপে জঙ্গল হাসিল করে কৃষিজমি আবাদ হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪৮ টি দ্বীপে সংরক্ষিত বনাঞ্চল, যেখানে কোন জনবসতি নেই। কমল চৌধুরীর লেখা *‘২৪ পরগনা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন’* নামে বইটিতে ভারতীয় সুন্দরবনের মনুষ্য বসতিযুক্ত দ্বীপের নাম পাওয়া যায়।[১৩] সাম্প্রতিক উপগ্রহ চিত্র থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে ভারতীয় সুন্দরবনের জঙ্গল অংশে ১০০ টি এবং মনুষ্য বসতিযুক্ত ৩৫টি দ্বীপের উজ্জ্বল উপস্থিতি।[১৪]

II

ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর পরোক্ষ ফল হিসাবে সুন্দরবনে অধিবাসীদের আগমন প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। তবে জল-জঙ্গল ও প্রাকৃতিক বিপদসঙ্কুল সুন্দবনের মনুষ্যবসতিযুক্ত বিভিন্ন দ্বীপে বসবাসরত অধিবাসীরা কোন জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত তা গবেষণার বিষয়। মূলত টিলমান সাহেব যখন সুন্দরবনের কিছু অংশে জমি আবাদ করতে শুরু করেন তখন ওই অঞ্চলে দলে দলে জনগণ আসতে শুরু করে। কেউ ব্যবসার অভিপ্রায়ে, কেউ মধু সংগ্রহ করতে, কেউ কাঠ কাটতে, কেউ মাছ ধরার নেশায়, আবার কিছু ভূমি কাঙাল মানুষ এল বসবাসের কামনা নিয়ে। যারা লবণের ব্যবসা করতে এলো তারা মালাঙ্গী, যারা মধু সংগ্রহ করতে এলো তারা মৌলে, যারা কাঠ কাটতে এলো তারা কাঠুরে, যারা মাছের নেশায় এলো তাদের ধীবর/জেলে, যারা জমির বাসনা নিয়ে এল তাদের ভূমি কাঙাল বলা হত। বর্তমান সুন্দরবনের এরাই কিন্তু প্রথম অধিবাসী। ১৭৭০ সাল থেকে যারা বসতি স্থাপন করেছে তারা বন সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার কোনরূপ চিন্তা ভাবনা না করেই বন ধ্বংস করেছে। তখনকার উদ্দেশ্য বন ধ্বংস করে কৃষির সম্প্রসারণ করা, মাছ চাষের ভেড়ি বাড়ানো, লবণ তৈরির জায়গা বাড়ানো, কাঠের প্রয়োজন মেটানো।

বাঘ, সাপে ভরা কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল পরিষ্কার, নোনাজল প্রতিরোধে বাঁধ দেওয়ার জন্য বিহার রাজ্যের ছোটনাগপুর, রাঁচি ও হাজারীবাগ থেকে আগত আদিবাসী, সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ, হো, ওরাঁও প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমী জনজাতি সম্প্রদায়ের

মানুষদের নিযুক্ত করা হয়েছিল বলে জানা যায়। এছাড়া ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি শায়েস্থা খাঁ মগদের শায়েস্তা করার পরও থেকে যাওয়া কিছু মগেরা আবাদ পত্তনের কাজে যুক্ত হয়েছিল। বাঘের আক্রমণ, সাপের দংশন এবং প্রকৃতির প্রতিকুলতা সহ্য করে যারা গাছ-মাটি কামড়ে পড়েছিল তারাই পরবর্তী সময়ে আদি অধিবাসী হিসেবে ব্যবস্থাপত্র পেয়েছিল।[১৫] ধীরে ধীরে সুন্দরবনের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছিল।

সুন্দরবনে অধিবাসীদের আগমনের ধারাকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে সুন্দরবনের স্থানীয় অধিবাসীরা যারা মূলত গঙ্গারিডি সভ্যতার উত্তরসুরী হিসাবে এখনো সুন্দরবনের ভূমিপুত্র হিসেবে বসবাসরত। এক্ষেত্রে আমরা সুন্দরবনের অধিবাসী হিসাবে পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র, জেলে কৈবর্ত্য, কাওরা, বাগদী, চর্মকার, দলুই, হাড়ি, রাজবংশী এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর কথা বলতে পারি। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষরা সুন্দরবনের সমস্ত ব্লকেই তাদের উপস্থিতির ধারা বজায় রেখেছে। জনসংখ্যা তত্ত্বের দিক থেকে আজও সুন্দরবনের সমস্ত ব্লকে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে আমরা বিহার থেকে আগত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা বলতে পারি। এরা এখন সুন্দরবন অঞ্চলের আদিবাসী অর্থাৎ বুনো বা বনুয়া নামে পরিচিত বৃহৎ জনগোষ্ঠী। বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবনের সন্দেশখালি ব্লকে সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের যোগেশগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধবকাটিতে সাহেব খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর, কালিতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামসেরনগর এই সমস্ত জায়গাতে দীর্ঘদিন পাড়া জুড়ে বসবাস করছে এরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনে গোসাবা ব্লকে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। কাকদ্বীপ, সাগরদ্বীপে কিছু পরিমাণ সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, ভূমিজ, বেদিয়া, ওরাঁও, মুন্ডা, মাহাত, ঘাসি ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে দেখতে পাওয়া যায়।

সুন্দরবনের বসবাসরত অধিবাসীদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ অভিবাসনের প্রভাব দেখা যায়। তৃতীয় পর্যায়ের মধ্যে আমরা মেদিনীপুর থেকে আগত জনগোষ্ঠীর কথা বলতে পারি। হুগলি ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ের ঘূর্ণিঝড় প্রবণ মেদিনীপুর জেলা থেকে আগত জনগোষ্ঠীর মানুষজন সুন্দরবন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। পশ্চিম সুন্দরবন অঞ্চলের সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা থানা এলাকায় এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এছাড়া গোসাবা, বাসন্তী ব্লকে এই মেদিনীপুর থেকে আগত অনেকেই বসবাস করছে এবং তারা জমিদারীর পত্তন করেছিল।

চতুর্থ পর্যায়ের মধ্যে আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের যশোহর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি জেলা থেকে আগত জনগোষ্ঠীর কথা বলতে পারি। বর্তমানে সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, হাড়োয়া, কুলতলী, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, প্রভৃতি থানা এলাকায় এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

III

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সুপ্রাচীন কাল থেকেই সুন্দরবনে মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল। তবে প্রাকৃতিক কারণে মাঝখানে একটা বিস্তীর্ন সময় জুড়ে জনমানবহীন এলাকা রূপে সুন্দরবন ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোয় সেই পর্বেরও একটা ছেদ ঘটে এবং নতুন করে পুনরায় বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সুন্দরবনে জঙ্গল পরিষ্কার ও জমি দখলের সেই প্রক্রিয়া অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু করে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপর বিভিন্ন আইন, প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনকে রক্ষা করা চেষ্টা করা হয়। ১৯৭৩ সালে সুন্দরবনের একাংশকে 'বাঘ সংরক্ষণ অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭৭ সালে ঘোষিত হয়েছিল 'সুন্দরবন বন্যপ্রাণ স্যাংচুয়ারি'। ১৯৮৪ সালে সুন্দরবন জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা পায় এবং ১৯৮৭ সালে ইউনেসকো ভারতীয় সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল বলে স্বীকৃতি দেয়। ২০০১ সালে 'জীব বৈচিত্র সংরক্ষিত অঞ্চল' বলে ঘোষণা করে। এই সুন্দরবনে বর্তমানে পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র, জেলে কৈবর্ত্য, কাওরা, বাগদী, চর্মকার, রজক, ডোম, দলুই, হাড়ি, পাটনি, রাজবংশী, ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, মাহিষ্য, কর্মকার, কুম্ভকার, সদগোপ, তন্তুবায়, নাপিত, কাপালি, যুগী, সূত্রধর, তিলি, মালাকার, বর্ণব্রাহ্মণ, মুসলমান প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষ একত্রে বসবাস করছে। এছাড়া বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানুষরাও এখানে বসবাস করছে। কাজেই আমরা বলতে পারি প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও সুন্দরবনের জনগণ এক সমন্বয়ী সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরি করে বসবাস করছেন।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ:

১. কল্যাণ রুদ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী: ভারতীয় সুন্দরবন: একটি ভৌগোলিক রূপরেখা, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২১, পৃ. ১২।

২. রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্র কুমার মিস্ত্রী: *সুন্দরবনের অর্থনীতি, জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ,* কলকাতা, রিডার্স সার্ভিস, ২০০৭, পৃ. ৯। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন L.S.S. O'Malley: *Bengal District Gazeteer 24 Parganas*, পৃ. ৫৭।

৩. Firminger: *Fifth Report, Vol. VI.,* পৃ. ১৮৩।

৪. কল্যাণ রুদ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী: প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

৫. Pargiter Frederick Eden: *A Revenue History of Sundarbans from 1765-1870*, পৃ. পৃ. ২-৩।

৬. কল্যাণ রুদ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী: প্রাগুক্ত, পৃ.১৩।

৭. L.S.S. O'Malley: প্রাগুক্ত, ২৩৪।

৮. কল্যাণ রুদ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী: প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

৯. তদেব।

১০. তদেব, পৃ. ১৫।

১১. সুপ্রকাশ রায়: তেভাগা সংগ্রাম, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০০৯, পৃ.পৃ. ৫০-৮০।

১২. S.L. Dey, A.K. Bhattacharya: The Refugee Settlement in the Sundarbans, W.B. A Socio-Economikc Study, পৃ. পৃ. ৫-৬।

১৩. কমল চৌধুরী: *২৪ পরগনা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন,* কলকাতা, দেজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯।

১৪. কল্যাণ রুদ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ২৮-৩১।

১৫. কানাইলাল সরকার: সুন্দরবনের ইতিহাস, কলকাতা, স্বস্তিকা এন্টারপ্রাইজ, ২০১৭, পৃ.পৃ.-৮২-৮৩।

একাঙ্ক নাটকের রূপ বিশ্লেষণ—নভেন্দু সেনের ‘পোস্টমর্টেম’ অবলম্বনে

সুকুমার বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকে নাট্যসাহিত্যে এক নতুন ধারার উদ্ভব— একাঙ্ক। এরপূর্বে পাশ্চাত্যের থিয়েটারে একাঙ্কধর্মী কতগুলি ছোট নাটক অভিনয়ের প্রসঙ্গ জানা গেলেও তা কেবল সহযোগীর কাজ করত। কিন্তু ধীরে ধীরে সেগুলি স্বতন্ত্রধারার মর্যাদা লাভ করে। তবে নাট্যসাহিত্যের এই নতুন ধারাটির বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অনেকে অনেক মত পোষণ করেছেন। সার্থক বাংলা একাঙ্ক নাটকের রচনাকার হিসেবে মন্মথ রায়ের নাম উচ্চারিত। সমাজের বিভিন্ন দিক স্বল্প পরিসরে একাঙ্কে স্থান পেলেও, বিশ শতকের শেষদিকে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাহিনিকে নিয়ে লিখিত নভেন্দু সেনের ‘পোস্টমর্টেম’ নাটকটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ধর্মান্ধতার সেই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তের পাশপাশি মানুষের মানবিকতাকে জাগানোর প্রচেষ্টা নাট্যকার করেছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে, স্বল্প চরিত্র, পরিমিত সংলাপ, ব্যঞ্জনাধর্মীতা একাঙ্কের প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ‘পোস্টমর্টেম’-এ সার্থকভাবে লক্ষিত হয়।

সূচক শব্দ: ১) নো নাটক ২) প্রারম্ভিক ও অন্তিম নাটক ৩) ঘটনার ঘনঘটা ৪) দ্রুত ও একমুখীভাব ৫) ব্যঞ্জনাধর্মীতা ৬) বাবরি মসজিদ ধ্বংস ৭) ভয়ঙ্কর কালিমা ৮) কাটাছেঁড়া ৯) কল্যান সিং ১০) ভারতীয় দূরদর্শন ১১) ধর্মান্ধতা।

বাংলা একাঙ্ক নাট্যধারা বিশ শতকে সৃষ্টি হয়েও সহজেই পাঠক ও দর্শকদের সম্মুখে সমাদৃত হয়েছে। স্বভাবতই এই ধারা প্রসঙ্গে মনে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। প্রথমে আসা যেতে পারে একাঙ্কের প্রাচীন উৎস প্রসঙ্গে। গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত সাতুর (Satyr) নাটক, যীশুখ্রীষ্টের জীবনকেন্দ্রিক মিষ্ট্রি প্লে (Mystery Play) বা সাধু-সন্তদের জীবনকেন্দ্রিক মিরাকেল প্লের (Miracle Play) সমন্বয়ে গঠিত মর‍্যালিটি (Morality) প্লে-তে একাঙ্কের বীজ খোঁজার চেষ্টা করেছেন সমালোচকেরা। চতুর্দশ শতকে জাপানে ‘নো’ (Noh) নাটক অভিনয়ের মধ্যবর্তী হাস্যরসাত্মক এক ধরণের নাটক অভিনয়ের কথা জানা যায়, তাতেও একাঙ্কের লক্ষণ রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।[১] অষ্টাদশ শতকে জার্মান নাট্যকার ও নাট্যতত্ত্ববিদ্ Gotthold Ephraim Lessing একাঙ্কের ধারায় ‘Die Juden’ নামে একটি নাটক লেখেন।[২] উনিশ শতকের নাট্যকার ইবসেন, স্ট্রীনবার্গের একাঙ্ক ধারায় নাটক লিখেছেন। উনিশ শতকের শেষদিকে একাঙ্কধর্মী কতগুলি ছোট নাটক অভিনয়ের কথা জানা যায়, কিন্তু সেগুলির স্বতন্ত্র কোনো নাট্যধারা হিসেবে মর্যাদা ছিল না। মূল নাটকের আগে অভিনীত এই শ্রেণির নাটকগুলিকে

'Curtain Raiser' বা 'প্রারম্ভিক নাটক', আবার গুরুগম্ভীরনাটক অভিনয়ে দর্শকের ভারাক্রান্ত মনকে হালকা করার জন্য শেষে অভিনীত হাস্যরসাত্মক ছোট ছোট নাটকগুলিকে 'After Piece' বা 'অন্তিম নাটক' বলা হত। এগুলি সাধারণ সহযোগীর কাজ করত। কিন্তু সহযোগীর এই ভূমিকা উনিশ শতক শেষ এবং বিশ শতকের শুরুরদিকে ধীরে ধীরে মুক্তি পেল। একাঙ্ক স্বাধীন শিল্প রূপে মর্যাদা পায়। প্যারিসে দীর্ঘদিন ধরে স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে একাঙ্কের অভিনয়ের কথা জানা যায়। ইংল্যাণ্ডে 'পিটার প্যান' নামক প্রথম একাঙ্কনাটক লেখেন জেম্‌স ম্যাথিউ ব্যারি।[৩] তবে নাটকের এই ধারণাটি তিনি ইউরোপ থেকে গ্রহণ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ক্ষেত্রে এই ধারায় সর্বসম্মুখে উচ্চারিত নাট্যকার ভাস-এর নাম। তাঁর 'দূত ঘটোৎকচ', 'মধ্যম ব্যায়োগ', 'দূতবাক্য', 'উরুভঙ্গ' নাটক এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

সাম্প্রতিককালে সংক্ষিপ্ত পরিসরে, স্বল্প সময়ের মধ্যে নাট্যকাহিনির রসাস্বাদনে ঝোঁক বেশি পরিমানে লক্ষিত হয়। একাঙ্কের চাহিদাও তাই ক্রমশ বেড়েছে। তবে কেবল অভিনয় ক্ষেত্রেই নয়, পাঠকের উদ্দেশ্যেও নাট্যকারেরা এই ধারায় নাটক লিখে চলছেন। উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলা একাঙ্কের ধারার সূত্রপাত হলেও এ পর্যন্ত ধারাটি বেশ সমৃদ্ধ। প্রাবন্ধিক পবিত্র সরকারের মতে— "'একাঙ্ক' কথাটি এখন একটি পৃথক নাট্যরূপের পরিভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে—তা ছোটো নাটকও নয়, বড়ো নাটকের খণ্ডিত বা সংক্ষিপ্ত রূপান্তরও নয়। তার আরম্ভ যেভাবেই হোক না কেন, তার মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য এখন আর অস্পষ্ট নয়। ফলে 'একাঙ্ক' কথাটি এখনও পর্যন্ত Short play বা 'নাটিকা' কথাটির সঙ্গে তুল্যভাবে ব্যবহৃত হলেও 'একাঙ্ক' নামটিই বেশি গ্রাহ্যতা লাভ করছে। এই নামের মধ্যে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিত আছে—যে নাটক পঞ্চাঙ্ক নয়, চার বা তিন অঙ্কের নয়, এমনকি দু-অঙ্কেরও নয়—তাই একাঙ্ক।"[৪]

একাঙ্ক নাটককে ইংরেজিতে বলা হয় 'One Act Play'। 'একাঙ্ক নাটক'—শব্দটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তা এক অঙ্কে পরিবেশিত নাটক।তবে একাঙ্কে ক'টি দৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়—এ বিষয়ে যথেষ্ঠ মতভেদ রয়েছে। একাঙ্ক একদৃশ্যে সমাপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে মন্মথ রায় মনে করেছেন। তবে সেখানে আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বয় থাকা জরুরি বলে তিনি জানিয়েছেন। দৃশ্য বিভাজন প্রসঙ্গে মন্মথ রায়ের সঙ্গে একই মত পোষণ করেছেন প্রখ্যাত নাট্যবিদ্ অজিতকুমার ঘোষ, সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য। তবে নাট্যতত্ত্ববিদ্ পবিত্র সরকার মতভিন্ন। তাঁর মতে, একাঙ্ক নাটকে এক বা একাধিক দৃশ্য থাকতে পারে। একাঙ্কের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়— একটি অঙ্কে, এক বা একাধিক দৃশ্যে, সীমিত সময়ে পরিবেশিত, মূলত প্রতিযোগিতা মূলক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে, দ্রুত একমুখী গতিতে পরিবেশিত নাটকে যেখানে ঘটনার ঘনঘটা লক্ষিত হয়, তাকে একাঙ্ক নাটক বলাযেতে পারে।একাঙ্কের সঙ্গে বাংলা ছোটগল্প ধারার যথেষ্ঠ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। একাঙ্কের বৈশিষ্ট্যগুলি হল— i) নাটকের কাহিনি আকারে সংক্ষিপ্ত হবে। ii) একাঙ্ক—শব্দটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, কাহিনিটি এক অঙ্কে সম্পন্ন হবে। তবে

একাধিক দৃশ্য থাকতে পারে। iii) চরিত্রের আধিক্য এইধারায় বর্জনীয়, স্বল্প চরিত্র নিয়ে কাহিনি পরিবেশিত হয়। iv) নাট্যকাহিনি দ্রুত এবং একমুখীভাবে পরিবেশিত হবে। v) কাহিনিতে মূলত একটি চরিত্র বা কাহিনির প্রতিই লেখকের জোর প্রকাশ পাবে। vi) চরিত্রগুলির মধ্যে দোলাচলতা ও একটা জীবন সংশয় কাজ করবে। vii) ব্যঞ্জনাধর্মিতা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহৃত। তবে সব নাটকে তা লক্ষিত হয় না। viii) ঘটনা ও চরিত্রের পাশাপাশি নাট্যসংলাপের দিকে নাট্যকারকে দৃষ্টি রাখা দরকার। অবান্তরতাকে বর্জন করে, যতদূর সম্ভব সংলাপে তীক্ষ্নতা ব্যবহৃতহয়। ix) কাহিনি অনুরণন শেষ হয়েও শেষ হবে না। অর্থাৎ একটা অসম্পূর্ণতার ভাব কাজ করে।

বাংলা একাঙ্ক নাটকের লক্ষণ প্রসঙ্গে সমালোচকদের মতভেদ বিস্তর। শ্রীশচন্দ্র দাশ এপ্রসঙ্গে 'সাহিত্য-সন্দর্শন' গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রের 'বৃষকেতু' ও 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটক দুটির কথা জানিয়েছেন। তবে তিনি মন্মথ রায় ও প্রমথনাথ বিশীর কথা অধিক জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎজলযোগ', অমৃতলাল বসুর 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে' প্রভৃতি নাটকে অনেকে একাঙ্কের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। প্রকৃত অর্থে একাঙ্ক নাটকের সূচনা মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' থেকে। তবে মধুসূদন দত্ত 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে একাঙ্ক ধারার পথ প্রদর্শকের কাজ করে গেছেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ২৫ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে 'মুক্তির ডাক' প্রথম অভিনীত হয়। লোভ-লালসা বর্জন করে দয়া, করুণা এবং ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ অনুসন্ধানই নাটকটির মূল বিষয়। সেসময় দর্শক 'মুক্তির ডাক'-এর দ্রুত প্রতিফলন, ঘাত-প্রতিঘাত ও সংক্ষিপ্ত কাহিনি উপভোগ করতে পারদর্শী হয়ে ওঠেনি। নাটকটিতে বেশ কিছু খামতি লক্ষিত হলেও সার্থক একাঙ্কের শিরোপা পায়। ড. সনাতন গোস্বামী ভাষায়—

" "মুক্তির ডাক" নান দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক। বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, গঠনশৈলি—সবদিক বিচারেই এর সামগ্রিক শিল্প নৈপুণ্যও যথেষ্ঠ। কিন্তু এটি একেবারে ত্রুটিমুক্ত, একথা বলা যায়না। একাঙ্ক নাটকের প্রধানগুণ—একক প্রতীতি (Single impression)—এ নাটকে কিছুটা অভাব আছে। বহু ঘটনার ভীড় এর কাহিনীবৃত্তকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। এ নাটকের গতিসঞ্চার করতে নাট্যকার কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় দ্রুততা ও উত্তেজনামূখর নাট্যমুহূর্তের সৃষ্টি করেছেন। অতি আবেগমিশ্রিত যাত্রাধর্মী সংলাপের প্রাচুর্য কোন কোন চরিত্রকে কিছু অতিনাটকীয় (melodramatic) করে তুলেছে। এত ঘটনাবাহুল্যের সমাবেশ যেন পঞ্চাঙ্ক নাট্যকাহিনী আভাসিত হয়েছে।

তবু তাঁর কীর্ত্তি এই যে, কাহিনীর বিশালতা, বিভিন্ন চরিত্রের বহুরূপী সমস্যা, ঘটনা প্রবাহের বিস্তৃতিকে নাট্যকার একাঙ্কের অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে অতি সার্থকভাবে প্রতিফলিত করতে পেরেছেন।"[৬]

মন্মথ রায়ের পরবর্তীকালে প্রমথনাথ বিশী, বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, বাদল সরকার, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অমল রায়, শ্যামলতনু দাশগুপ্ত, মনোজ মিত্র, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, নভেন্দু সেন প্রমুখ নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রত্যেক নাট্যকারই এই ধারায় সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের লিখিত নাটকগুলিতে সমসাময়িক সমাজ-পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দোলাচলতা, মানবতাবোধ, থিয়েটারি জীবন, দাম্পত্য কলহ, ধর্মান্ধতা,মধ্যবিত্তের সঙ্কট, কৃষক জীবন, পারিবারিক সমস্যা প্রভৃতি বিষয় পরিস্ফুট। বিশ শতকের শেষদিকে মানবিকতার মূল্যবোধ হারিয়ে ধীরে ধীরে সমাজ-ভাবনার পরিবর্তে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। তবে এ সঙ্কট কেবল বিশ শতকেই নয়, একুশ শতকেও বর্তমান। ব্যক্তিস্বার্থের জন্য মানুষ হারিয়ে ফেলেছে মনুষ্যত্ববোধ। উচ্চ পদস্থ রাজনৈতিক নেতারাও নিজেদের স্বার্থ ও শাসন বজায় রাখায় জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। একদিকে যেমন মূল্যবোধের হানি ঘটে, অন্যদিকে তেমনি জাতি-ধর্মের আফিমে সাধারণ মোহগ্রস্ত হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ ১৯৯২-এ বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়। মানবতার ইতিহাসে এ যেন ভয়ঙ্কর কালিমা। সেই দাগ ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে। শুরু হয় হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা। রাজনৈতিক নেতারা মানুষকে ধর্মান্ধতার আফিম খাইয়ে কূটনৈতিক চালে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে ব্যস্ত— সেই অস্থির পরিস্থিতিতে নভেন্দু সেন লেখেন 'পোস্টমর্টেম' নামক একাঙ্কটি। অন্তরের বিবেককেও সত্যিই যেন পোস্টমর্টেম অর্থাৎ কাটাছেঁড়া করতে সক্ষম হয়েছেন নাট্যকার। তবে ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ তিনি দিতে চাননি, কেবল ধর্মান্ধতাকে বর্জন করতে বলেছেন। কারণ ধর্মের নামে একজন মানুষ যেমন আপিমখোরের মতো আচরণ করতে পারে, অন্যের কাছে তা তেমনি প্রাণশক্তি ও মনোবলের কাজ করতেও সক্ষম। নাট্যকারের জানান— "এদেশে ধর্ম ব্যাপারটা অ্যাদ্দিন প্রধান কন্ট্রাডিকশন ছিল না। আরে মশাই, জনগণ বা মানুষ তো একটা তালগোল পাকানো পিণ্ড নয়। কার হাঁড়িতে কী চড়ে বা কার পেটে কী জাতের দানাপানি পড়ে— তার হিসেব কষলে, সোজাসাপটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে— হ্যাভস, আর হ্যাভ নটস। ধর্ম একদলের কাছে আপিম, আবার এক দলের কাছে প্রাণশক্তি।"[৭] কাহিনিটি উত্তরবঙ্গের শহরতলির এক স্টেশনের ধারের ডরমিটরিতে সংগঠিত। নাট্যকার স্টেশনের নাম বা বর্ণনা কিছু দেননি। ডরমেটরিতে রাত্রি যাপনের জন্য পাঁচজন যাত্রী সহাবস্থান করছে। রাত্রে ট্রাঞ্জিস্টারে হঠাৎ উঠে আসে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সংবাদ। স্বভাবতই দেশে দাঙ্গা বাধাই স্বাভাবিক। কিন্তু দাঙ্গার আঁচ থেকে নিজেদের বাঁচাতে ডরমেটরির দরজা তারা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু নগরে আগুন লাগলে দেবালয় কি বাদ যাবে? তাই ডরমেটরির পাশে অবস্থিত চায়ের দোকানের বৃদ্ধটির পায়ের রক্ত ঘরে ঢুকিয়ে নাট্যকার ব্যঞ্জনার ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা আগুন থেকে যতই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুক তা সমগ্র দেশবাসীর জীবনকে প্রভাবিত করবেই। তাই মানবিক বিচার-বুদ্ধির দরজা

বন্ধ না রেখে বরং শুভবোধ জাগিয়ে রাখা দরকার। স্বল্প পরিসরে এভাবে নাট্যকার কাহিনিটি তুলে ধরেছেন।

সম্পূর্ণ কাহিনিটি মোটসাতটি চরিত্রের জবানিতে বর্ণিত। ম্যানেজারবাবু, প্রথম ক্যানভাসার, দ্বিতীয় ক্যানভাসার, ট্রাঞ্জিস্টারবাবু, কাগজবাবু, কালিবাবু এবং চা বুড়ো— এই সাত চরিত্র। যে ডরমেটরিতে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে সেখানকার ম্যানেজার কাহিনি সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ডরমেটরির অন্যান্য তিন চরিত্রের সঙ্গে দুই ক্যানভাসারকে একত্রিত করতে চরিত্র কাহিনিতে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ডরমেটরিতে আশ্রিত পাঁচ চরিত্র ও তাদের কথোপকথনই নাট্যকারের প্রধান অবলম্বন। নিজেদের গণ্ডিতে থেকে প্রত্যেকেই সমাজের নানাদিক তুলে ধরেছে, বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে সমকাল, রাজনৈতিক নেতাদের ছলাকৌশল, মানসিকতা, ধর্মান্ধতা, উত্তর প্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কল্যান সিং, জনপ্রিয় রামানন্দ সাগরের ভারতীয় দূরদর্শনে 'রামায়ণে'র ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রসঙ্গ। বিপদের দিনে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জাগিয়ে না রেখে বরং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিকতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে চা-বুড়ো চরিত্রটির ব্যবহার। দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকলেও চু-বুড়োর পায়ে বয়ে আনার রক্তের মতোই তা সবাইকে প্রভাবিত করে।

হিংসা, দলাদলি, ঈর্ষা বড় হয়ে ওঠে সবার কাছে। কিন্তু মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে কখনই সুন্দর দেশ ভাবা সম্ভব নয়। কাহিনিতে উল্লিখিত এক ছোট্ট মেয়ে তার বাবার কাছে গল্প শুনতে চাইলে তিনি মেয়েকে আগে পৃথিবীর একটি মানচিত্রের টুকরো করে সেটাকে মেলাতে বলেন।কিন্তু স্বল্পসময়েই মেয়েটি তা মিলিয়ে দেয়। কারণ, মানচিত্রের বিপরীত দিকে এক লোকের ছবি ছিল, আর তা মেলাতেই মানচিত্রও সহজ মিলে যায়। এভাবেই নাট্যকার কাহিনিতে ব্যঞ্জনাধর্মীতা ব্যবহার করেছেন। ব্যক্তিস্বার্থতাই যে সব নয়, তার উর্দ্ধে মানবিকতা— তা এভাবেই নাট্যকার কাহিনিতে তুলে ধরেছেন। যেখানে মানুষের প্রতিকৃতি মেলালে সহজেই দেশ মিলে যায়, সেখানে ম্যাপের টুকরো নিয়ে ভাববার কোনো প্রয়োজন নভেন্দু সেন দেখেননি। তিনি জানান— "আসলে ওই মানুষের ছবিটা আমাদের চোখ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই জাতের নামে, ধর্মের নামে আমরা এমন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছি।"[৮] ব্যক্তিস্বার্থ বা ধর্মান্ধতা— যে কারণেই হোক মানুষ এতখানি স্বার্থবাদী হয়ে উঠছে যে সহজেই নিজেদের মানবিকতা বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করছে না। আর এই মানবিকতার জাগরণই কাহিনিতে বর্ণিত। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কঠিন পরিস্থিতিতে নাট্যকার মানবিকতা জয়গান গাওয়ার চেষ্টা করলেন 'পোস্টমর্টেম'-এর মধ্য দিয়ে। সঙ্কটের মুহূর্তে শুভবোধকে জাগানোর জন্য তাই নাট্যকারের আবেদন— "শুনছেন, দরজাটা খুলুন— প্লিজ, শুনছেন...।"[৯]

'পোস্টমর্টেম'-এ প্রত্যেকটি চরিত্রের সংলাপ ব্যবহারে নিজের নাট্যদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার নভেন্দু সেন। স্বল্প চরিত্র নির্মাণের পাশাপাশি তাদের

জবানিতেও সংক্ষিপ্ত, অর্থবোধ্য ও ব্যঞ্জনাধর্মী সংলাপ লক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি চরিত্র বিশেষ এক কেন্দ্রবিন্দুকে ভিত্তি করে নিজেদের মন্তব্য ব্যক্ত করেছে। তাদের কথাবার্তায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সাধারণের কর্তব্যবোধই যেন লক্ষ্যবস্তু। ট্রাঞ্জিস্টারে বিবিসি-র বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সংবাদে ডরমেটরির অবস্থিত পাঁচ নিজেদের মধ্যে যে বাক্যালাপ করেছে তা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে কীভাবে প্রত্যেকটি চরিত্র নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, অর্থ্যবোধ্য ও ব্যঞ্জনাধর্মী সংলাপ ব্যবহার করেছে—

"প্রথম ক্যানভাসার খবরটাতে দাদা খুব যোশ পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে?

দ্বিতীয় ক্যানভাসার ছাড় না! ওনার মতো উনি আঁচ পোয়াচ্ছেন, পোয়াতে দে। মজা পুকুরে এমন একখানা ঢেলা পড়েছে—

ট্রাঞ্জিস্টারবাবু টিজ করবেন না! আপনারা ইয়ংম্যান। যা ঘটে গেল তার কনসিকোয়েন্সটা কী দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখেছেন?

দ্বিতীয় ক্যানভাসার ওসব আপনি ভাবুন দাদা। কাল থেকে যদি 'বনধ'-এর পঁয়জারি শুরু হয়, তাইলে তো চিত্তির। দিন আনা দিন খাওয়া পার্টি মশাই। আড়াই দিনে গোটা চত্বরটা কভার করার কথা ছিল।

ট্রাঞ্জিস্টারবাবু (কানে ট্রাঞ্জিস্টার) সর্বনাশ! ওদিকে তো কেলেঙ্কারি!

কালিবাবু কী হল?

ট্রাঞ্জিস্টারবাবু ইউপি গভমেণ্ট ডিজলভ্‌ড! বাবরির সাথে সাথে কল্যান সিংয়ের গদিও সাফ!

কাগজবাবু ন্যাকা!

কালিবাবু কিছু কি বললেন?

কাগজবাবু প্রথমে ছেড়ে দিয়ে এখন তেড়ে ধরার ভণ্ডামি। প্রাইম মিনিস্টারের চালটা দেখেছেন? ভাবটা যেন, আগে কিছুই বুঝতে পারেননি। কতবড় ট্রেচারি ভেবে দেখুন।

ট্রাঞ্জিস্টারবাবু ছাড়ুন মশাই। লেফটিস্টরাও তো তিনি যা করেন বলে চুপচাপ ছিল। এখন 'ট্রেচারি' 'ট্রেচারি' বলে চেঁচালে চিঁড়ে ভিজবে?"[১০]

'পোস্টমর্টেম' এক অঙ্কের নাটক। নাট্যকার কাহিনিতে কোনো দৃশ্য বিভাজন করেননি। বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা অভিপ্রেতও ছিল না। কারণ সম্পূর্ণ কাহিনিটি একটি ডরমেটরিতেই উপস্থাপিত এবং এক রাতের।

নভেন্দু সেনের 'নয়ন কবিরের পালা', 'সমবেত সওয়াল জবাব', 'প্যান্টোমাইম', 'মল্লভূমি', 'প্রজায়িনী' প্রভৃতি নাটকে যে জনচেতনার প্রয়াস করেছিলে তারই আর এক রূপ 'পোস্টমর্টেম'-এ দেখা যায়। তাঁর শুরুর দিকের নাটকগুলি অ্যাবসার্ডধর্মী হলেও তাতে সমাজ বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। পরবর্তীকালে অ্যাবসার্ডধর্মীতার পরিবর্তে সরাসরি সমাজ-সঙ্কটকে কাহিনি-রূপ দিয়েছেন তিনি। সমাজ-সঙ্কট বর্ণনার পাশাপাশি সার্থক একাঙ্কের উদাহরণ 'পোস্টমর্টেম' নাটকটি।

তথ্যসূত্র:
১. সরকার পবিত্র; নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ; দে'জ পাবলিশিং, প্রথম খণ্ড, ফাল্গুন ১৪১৪, পৃ. ১০৯
২. ঘোষ অজিতকুমার; নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ; দে'জ পাবলিশিং; চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৭, পৃ. ১১৩
৩. সরকার পবিত্র; নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ; দে'জ পাবলিশিং, প্রথম খণ্ড, ফাল্গুন ১৪১৪; পৃ. ১১২।
৪. ঐ, পৃ. ১০৯
৫. দাশ শ্রীশচন্দ্র; সাহিত্য-সন্দর্শন; চক্রবর্তী চাট্যাজ্জি অ্যাণ্ড কোং লি., দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৯।
৬. রায় মন্মথ; নাটক সমগ্র, সনাতন গোস্বামী (সম্পাদিত); প্রজ্ঞাবিকাশ; দ্বিতীয় প্রজ্ঞা সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৩, ভূমিকাংশ, পৃ. ৪৪-৪৫।
৭. চক্রবর্তী রথীন (সম্পাদিত); ৬০ বছরের বাংলা থিয়েটার ও ৪০ টি একাঙ্ক; নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন; প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭; পৃ. ৫০৩।
৮. ঐ; পৃ. ৫০৪।
৯. ঐ; পৃ ৫১২।
১০. ঐ; পৃ. ৪৯৯।

এপিকিউরাস: প্রসঙ্গ সুখবাদ

সুদর্শন দাস
গবেষক, দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: এপিকিউরাস (341-270 B.C.) ছিলেন খ্রিঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গ্রীক দার্শনিক। প্রাচীন গ্রীক নীতিবিদ্যায় এপিকিউরিয়ান সুখবাদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সুখী জীবন কি উপায়ে লাভ করা সম্ভব, সে বিষয়ে অন্যান্য দার্শনিগণের মতো তিনিও তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। এপিকিউরাসের নিজের লেখা গ্রন্থ তেমন ভাবে পাওয়া না গেলেও বিশেষ কিছু গ্রন্থ যেমন — Diogenes laertius-এর *Lives of Eminent Philosophers,* Cicero-এর *On Moral Ends, The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia* প্রভৃতিতে তাঁর দর্শনের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। এপিকিউরাস দৈহিক এবং মানসিক যন্ত্রণামুক্ত অবস্থাকেই ব্যক্তির সর্বোচ্চ আনন্দময় অবস্থা বলে বিবেচনা করেছেন। আর এই প্রকার অবস্থায় উন্নীত হওয়াকেই জীবনের মূল লক্ষ্য বলে তিনি মনে করেন। দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণামুক্ত অবস্থাকেই তিনি স্থিতসুখ (katastematic pleasure) বলে নির্দেশ করেছেন। এই স্থিতসুখ মনোরম চিন্তা এবং অনুভূতির সহযোগী হতে পারে, যেটাকে আবার গতি (kinetic pleasure) সম্বন্ধিত সুখ বলে তিনি সম্বোধন করেছেন। আবার অন্যদিকে, মৃত্যু-ভয় আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তাই তিনি এই ভয় থেকে মুক্ত হয়ে মানব প্রকৃতির সামর্থ্য অনুযায়ী আনন্দ উপভগের উপদেশ দিয়েছেন।

সূচক শব্দ: এপিকিউরাস, নৈতিকতা, সুখ,ডায়োজেনেস, সিসেরো।

প্রাচীন গ্রীক নৈতিকতায় দুটি বিকল্প যাপন বা জীবনের উল্লেখ পাওয়া যায়—একটি কঠোর নৈতিক নিয়মানুসারী জীবন আর অন্যটি সুখলাভের সহজ জীবন। সুখ-কে সাধারাণত নৈতিক জীবনের পরিপন্থী হিসাবে বিবেচনা করা হত। সোফিস্ট প্রডিকাসের (Prodicus) মতানুসারে গ্রীকবীর হারকিউলিস (Hercules) নৈতিকতার কঠোরপথ ও সুখলাভের সহজপথ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি সুখ লাভের সহজপন্থা পরিত্যাগ করে নৈতিক সদগুণের (virtue) পথই অবলম্বন করেছিলেন। অ্যারিস্টটল ব্যতিরেকে প্রায় সকল গ্রিক দার্শনিকই এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নৈতিক সদগুণ সম্পন্ন জীবনযাপন এবং আরামদায়ক জীবনযাপনকেই ব্যক্তির দুটি মৌলিক বিকল্প বলে স্বীকার করেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন নৈতিক নিয়মানুসারী জীবনযাপন ব্যক্তিকে বৌদ্ধিক সত্তা রূপে নৈতিক উৎকর্ষে উন্নীত করে, আর সহজে সুখ অন্বেষী জীবনযাপন আমাদেরকে পশুসুলভ আচরনে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু এপিকিউরাস সুখদায়ক জীবনকে সত্য বলে গ্রহণ করাকেই সর্বোচ্চ শুভ এবং মানব জীবনের চরম

লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকগণ তাঁর নৈতিকতত্ত্ব বিষয়ে নানা আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, এপিকিউরাসের তত্ত্ব দৈহিক ইচ্ছাপূরণকেই অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়েছে। একথার প্রত্যুত্তরে অনেকে বলে থাকেন যে, সমালোচকদের এই ভ্রম এপিকিউরাসের তত্ত্বকে ভুল বোঝার কারণবশত হয়ে থাকে। তবে অনেকে দাবী করেন এপিকিউরাস ও তাঁর অনুগামী, তাঁদের তত্ত্বের উন্নতি সাধন করেছেন সাইরেনিক সুখবাদের সঙ্গে বৈষম্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। সমকালীন সময়ে যুবক অ্যারিস্টিপাস(380/370BCE) ও অনেকটা একইরকম মতামত পোষণ করতেন বলে জানা যায়। অ্যারিস্টিপাস ব্যক্তির বর্তমান সুখের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তাকেই নৈতিক জীবনের লক্ষ্য রূপে বিবেচনা করেছিলেন। অন্যদিকে, এপিকিউরাস তাঁর সুখবাদী তত্ত্বকে তুলনামূলক সংযত ও বিপরীত রূপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। এপিকিউরাসের মতে দীর্ঘস্থায়ী সুখকেই সম্পূর্ণ সুখ বলা যায় এবং তা শুধু ব্যক্তির বর্তমান অভিজ্ঞতার উপরেই নির্ভর নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতে সুখের প্রত্যাশা বা পূর্বানুমানকেও তিনি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করেছেন। ব্যক্তির সাধারণ এবং সংযত জীবনযাপনের মাধ্যমেই সুখী জীবন লাভ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। তবে কিছু ব্যা খ্যাকার দৈহিক পরিতৃপ্তি সাধনকেই এপিকিউরিয়ান নৈতিকতার লক্ষ্য বলে দাবী করে থাকেন। তাঁরা বলেন সমস্ত শুভ-র মূল ভিত্তি পাকস্থলীর সুখেতেই নিহিত। আর এই ইন্দ্রিয়সুখ বা ভোগসুখের কারণে তাঁরা বিশেষ ভাবে সমালোচিত হয়ে থাকেন।

সমকালীন হেলেনীয় বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এপিকিউরাসের বিদ্যালয় ছিল অন্যতম। এপিকিউরাসের অনুগামীগণ নিজেদেরকে সক্রেটিসের উত্তরিধাকারী হিসেবে দাবী করেননি বরং তারা সক্রেটিয় (socratic) প্রথা থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিজেদেরকে স্টোয়িক বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে এপিকিউরিয়ান সুখবাদের সঙ্গে স্টোয়িকদের কঠোর নৈতিকতার শুধু যে বৈসাদৃশ্যই ছিল তাই নয়, সেই সঙ্গে সাইরেনিক নৈতিকতার সঙ্গেও এঁদের অমিল লক্ষ্যণীয় ছিল। এপিকিউরিয়ান সক্রেটিয় প্রথাস্বীকৃত পদার্থ বিদ্যার পরিধি থেকে দূরে সরে গিয়ে ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদকে এক উন্নত রূপ প্রদান করে ছিলেন বলা যায়। তাঁর দর্শনের জড়বাদী ব্যাখ্যা বা আলোচনা আমরা বিশেষ কিছু গ্রন্থে যেমন — *On Nature, Letter to Herodotus and Letter to Pythocles* পেয়ে থাকি। তবে লুক্রেসিয়াস (Titus Lucretius Carus)-এর ল্যাটিন কবিতাতেও এই জড় জগতের সমস্ত ঘটনার জড়বাদী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে মানব আত্মার গঠন-প্রকৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধেও জড়বাদী ভাবধারাই প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে তাঁরা জগত সম্বন্ধে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত ধারণা বহন করে চলেছেন এবং পরমাণুবাদকেই তাঁদের সুখবাদের ভিত্তি রূপে উপস্থাপিত করেছেন। এই সকল পর্যালোচনা থেকে আমরা জানতে পারি, তাঁরা

জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে এবং সেইসঙ্গে নৈতিক বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমর্থন করতেন। সুতরাং এপিকিউরিয়ান সুখবাদের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে এসকল বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন।

ডায়োজেনেস (Diogenes Laertius-3rd century C.E.) এপিকিউরিয়ান দর্শনের চারটি মূল ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, গতি সম্বন্ধিত সুখ ও স্থিতসুখ। দ্বিতীয়তঃ, মানসিক সুখ-দুঃখ দৈহিক সুখ-দুঃখের তুলনায় অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন। তৃতীয়তঃ, সুখলাভ করাই সকল প্রাণীর মূল উদ্দেশ্য এবং তা জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মাধ্যমেই আহরিত হবে। এবং চতুর্থত, নৈতিকতা বা নৈতিক সদগুন (virtue) আমরা কামনা করি তাদের নিজস্ব গুণাবলীর কারণে নয় বরং তা আমাদের সুখলাভে সহায়তা করে থাকে বলেই আমরা তা অনুশীলন করি। অর্থাৎ ভার্চু হল সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়। যেমন আমরা ঔষধ সেবন করি স্বাস্থ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তেমনি, সদগুন চর্চা করি আনান্দলাভের উদ্দেশ্যে। তবে এই নৈতিক সদগুণ-কে আনন্দ থেকে কোনো ভাবেই পৃথক করা যায় না বলে তিনি মনে করেন।[১]

সুখের প্রকারভেদ :

সিসেরো-এর(Marcus Tullius Cicero 106-43 B.C.)*On Moral Ends* গ্রন্থে টরকুয়াতাস (Torquatus) এপিকিউরিয়ান নৈতিকতা বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে এপিকিউরাস একমাত্র সুখ-কেই (pleasure) স্বকীয় মূল্যবান বিষয় আর ব্যথা-বেদনাকে (pain) একমাত্র মূল্যহীন বিষয় রূপে গণ্য করতেন। আর অন্য সমস্ত মূল্যযুক্ত বিষয়ই এই দুই-এর নিরিখেই মূল্যায়িত হয়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন কোন শিশুর স্বাভাবিক ব্যবহার বা আচরণ থেকেই আমরা এবিষয়ে সহজেই অনুমান করতে পারি। শিশু জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সুখ অন্বেষণ করে থাকে ও ব্যথা-বেদনা পরিহারের চেষ্টা করে থাকে। যেমন সুখ সম্বন্ধে এপিকিউরাস নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা প্রথম এবং সহজাত। কেননা সমস্ত প্রাণী-ই প্রকৃতিগত ভাবে সুখ উপভোগ করতে চায় এবং বেদনা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। তাই অন্যান্য প্রাণীদের মত আমাদেরও এমন লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। এক্ষেত্রে আমরা তা নির্বাচন করতেও পারি, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারি। এই কারণে পরবর্তীতে এপিকিউরিয়াস সুখের শুভত্ব বিষয়ে এবং ব্যথা-বেদনার মন্দত্ব বিষয়ে যুক্তি প্রদানের প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি বলেন কিছু কিছু বিষয় যেমন আগুনের উত্তাপ, বরফের সাদা বর্ণ, মধুর মিষ্টতা ইত্যাদি বিষয় আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভব করতে সক্ষম— এবিষয়ে বিশদ কোনো যুক্তি-বিচারের প্রয়োজন হয় না; একটু মনোযোগ নিবন্ধন করলেই আমরা এদের গুণ বা ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি।[২]এপিকিউরাস এই সত্যকে স্বত:প্রমাণ রূপে স্বীকার করেন। শৈশবাবস্থায় প্রাণীদের প্রকৃতিগত আচারণ আমরা সকলেই স্বাভাবিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকি।

এই অর্থে তা প্রমাণ করার জন্য আলাদা করে অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। আর এটাই হল তাঁর সুখবাদের সর্বপ্রথম সত্যতারমানদণ্ড।

এপিকিউরাস প্রদত্ত নৈতিকতার মূল বা কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল সুখবাদী গণনা প্রণালী (the hedonistic calculus)। কোন ব্যক্তিই সুখ প্রত্যাখ্যান করেন না কারণ তা সুখ তাই। আর ভবিষ্যতে কি উপায়ে আরও বৃহৎ সুখ উপভোগ করা যায় এবং ব্যথা-বেদনা এড়িয়ে চলা যায় সে বিষয়ে পরিকল্পনা করে থাকেন। কোন ব্যক্তিই ব্যথা-বেদনাকে মনোনীত করেন না কারণ তা ব্যথা-বেদনা তাই। আর ভবিষ্যতেও বৃহৎ বেদনাকে প্রতিহত করে ভবিষ্যতের সুখ সুরক্ষিত করেন। এভাবেই ব্যক্তি তার পছন্দের বিষয়কে পরস্পরের সাপেক্ষে মূল্যায়নের দ্বারা (গণনাপ্রণালী) তার নৈতিকলক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকেন। এপিকিউরাসের মতে সুখ-কে দীর্ঘ মেয়াদের সাপেক্ষে বিবেচনা করা উচিত এবং ব্যথা-বেদনা প্রতিহত করার মত সমক্ষমতাসম্পন্ন বিষয়রূপে গণ্য করা উচিত।

এপিকিউরাস-ই হয়তো প্রথম ব্যক্তি যিনি দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সুখের ধারণাকে পৃথক করেছেন —katastematic pleasure এবং kinetic pleasure। যার বঙ্গানুবাদ করা যায় স্থিতসুখ বা অবিচল সুখ ও গতি বা আন্দোলন সৃষ্টিকারী সচল সুখ। এপিকিউরাস তাঁর *on choices* গ্রন্থে বলেন মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত (ataraxia) এবং দৈহিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত অবস্থা (aponia) হল অবিচল বা অচঞ্চল সুখাবস্থা (katastematic pleasure)। আর আনন্দ বা পুলকিত অবস্থা হল সচল সুখাবস্থা (kinetic pleasure)।[৩] তবে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এই দুই বিভাগকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাই আমরা প্রথমে এই দু-প্রকার সুখের তুলনামূলক আলোচনা করব।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে এপিকিউরিয়ান সুখানুভবের এই দুই শ্রেণীবিভাগের মূল মানদণ্ড হল চলমানতা (motion) বা পরিবর্তন। Kinetic সুখ মূলত kinesis বা গতি বা পরিবর্তন সম্পর্কিত। কিন্তু অন্যটি (katastematic) আবার তেমন নয়। এক্ষেত্রে সুখের গতিশীল অবস্থা দৈহিক সম্পূরণ বা মানসিক ইচ্ছার পরিপূরণের সঙ্গে যুক্ত নাও থাকতে পারে। তবে গতি সম্পর্কিত সুখ অনেকটা স্থিত বা অবিচলসুখের মতই শরীরে অথবা মনে অবস্থান করে। যেমন ব্যথা বা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়াকে দেহের অবিচল বা অচঞ্চল অবস্থা বলা যায়। আবার বিভিন্ন ঝামেলা থেকে মুক্ত মানসিক অবস্থাকেও স্থিতসুখ বলে উল্লেখ করা যায়। তবে এই প্রকার সুখের সীমাবদ্ধতা হল, এদের বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। গতি বা চলমান সুখ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। তা দৈহিক হতে পারে আবার মানসিক হতে পারে। গতি সম্পর্কিত সুখ যেমন বর্তমানকালে উপভোগ করা যায় তেমনই কেউ অতীত সুখস্মৃতি স্মরণ করে অথবা ভবিষ্যতের সুখলাভের প্রত্যাশা বা পূর্বানুমানের মাধ্যমে এই সুখ

উপভোগ করতে পারেন। আবার অন্যদিকে অবিচল সুখানুভব-ও (katastematic) স্মৃতি এবং পূর্বানুমানের বিষয় হতে পারে। স্থিতসুখ আসলে শরীরের একটি স্বাভাবিক অবস্থা বা একটি সুস্থ ও সুচিন্তিত মানসিক অবস্থা।

গতিময় সুখ আমাদের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত, যেমন খাদ্য গ্রহণ, তৃষ্ণা নিবারণ ইত্যাদি। আর স্থিতসুখ গঠিত হয় আমাদের শরীরের তৃপ্ত অবস্থার মাধ্যমে। যেমন- যখন কোন ব্যক্তির খাদ্যগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ ক্ষুধার যে বেদনা অনুভূত হয় তা নিরসন হয়েছে এবং সেই ঘাটতি পূরণ হয়েছে, তখন ঐ অবস্থাকে স্থিতসুখ বলা যায়। আর খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া, যা একপ্রকার ক্রিয়া বা চলমানতা হল গতিময় সুখের উৎস বলা যায়। ব্যথা-বেদনা নিরসনের প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়েছে তখন তা স্থিতসুখ। আর যখন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সক্রিয় থাকে যেমন— কোন বিশেষ খাদ্যের স্বাদ যখন আমাদের জিহ্বায় অনুভূত হয়, আমরা যখন বলে থাকি খাবারটি মসলাদার বা নোনতা- এমন অবস্থা হল গতিময় সুখ।[৪]

গতি সম্বন্ধিত সুখের ক্ষেত্রে সকল গবেষকের বক্তব্য একই রকম নয়। পরম্পরাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এপিকিউরাস সেই সমস্ত সুখগুলিকে গতি সম্পর্কিত বলেছেন, যেগুলি ব্যক্তির কামনার তৃপ্তিসাধন প্রক্রিয়ায় সহযোগী হয়। আর তৃপ্তি সাধনের পর যে অনুভূতি তা স্থিতসুখ বলে বিবেচনা করেছেন। যেমন সিসেরো বিষয়টি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করে বলেন- কোন ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ প্রক্রিয়া থেকে যে সুখ অনুভূত হয় তা গতি সম্পর্কিত সুখের দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে। অন্যদিকে, তৃষ্ণা নিবারণের পর যে তৃপ্তি অনুভূত হয় সেটা স্থিতসুখ বলা যায়।[৫] তবে সিসেরো এই দুই প্রকার সুখানুভবের ব্যাখ্যায় নিজে কোনো অর্থ করেননি। আবার অন্যদিকে, তিনি এপিকিউরাসের সুখানুভব সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাগুলির উদ্ধৃতি তুলে বলেন যেমন — রসাস্বাদন, শ্রবণ, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বা সংবেদনের মাধ্যমে যে সুখ আমাদের অনুভূত হয় তা গতি সম্পর্কিত সুখ বলে চিহ্নিত করা যায়। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গুলি আসলে আমাদের শরীরে এক প্রকার দৈহিক জাগরণ বা চলমানতা (motion) সৃষ্টি করে বলে তিনি দাবী করেছেন।

সুখ-দুঃখের ভারসাম্য বজায় রেখে, সর্বোচ্চ শুভ কিছুর প্রাপ্তিতে দৈহিক এবং মানসিক সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা বিচার করে এপিকিউরাস বলেন দৈহিক সুখ ও যন্ত্রণাকে মৌলিক তখনই বলা যাবে যদি কোনো মানসিক অনুভূতি শরীরে উৎপন্ন হয় এবং তা দেহের উপর ভিত্তি করেই হয়। অর্থাৎ সহজভাবে বলতে গেলে যদি ওই মানসিক অনুভূতির ভিত্তি দেহ বা শরীর হয়ে থাকে। তবে যে-কোনো দৈহিক অনুভূতির তুলনায় মানসিক অনুভূতি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন বলে এপিকিউরাস মনে করেন। আর ব্যক্তিজীবনে মানসিক অনুভূতির প্রভাবই তুলনামূলক বেশি বলা যায়। দৈহিক সুখ বা যন্ত্রণা কেবল বর্তমান সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু মানসিক সুখ-দুঃখ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ — এই তিন কালেই ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।[৬]আর আমাদের বিশ্বাসের

সঙ্গেও এটি বিশেষ ভাবে যুক্ত থাকে। অনেক সময় আমাদের বিশ্বাস দ্বারা মানসিক অনুভূতির ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মানসিক অনুভূতির পরিধি, তীব্রতা ও ক্রিয়া-কলাপ দ্বিগুণ বলা যায়, যা তীব্র দৈহিক যন্ত্রণাকেও প্রতিহত (counterbalance) করতে সক্ষম। আবার অন্যদিকে, ব্যথা-বেদনাকে অধিক তীব্র করার ক্ষমতাও আমাদের মনের আছে। বর্তমানে আমরা যে সকল দৈহিক সুখ উপভোগ করে থাকি তা অতিক্রম করার ক্ষমতা মনের আছে বলে তিনি মনে করেন।

বিশ্বাস ও কামনার স্বরূপ:

কী উপায়ে আমাদের মন ইচ্ছা বা কামনার (desire) সঙ্গে যুক্ত হয়ে শুভ জীবনলাভে সহায়তা করে থাকে সে বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি ইচ্ছা বা কামনার স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এক বিশেষ পদ্ধতিতে আমাদের মন বিশ্বাস (beliefs) ও কামনা-বাসনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সুখ নির্বাচন করে থাকে। এপিকিউরাস কামনা বা অভিপ্রায়কে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন — একটি প্রাকৃতিক (natural) বা স্বাভাবিক এবং অপরটি অপ্রাকৃতিক (non natural) বা শূন্য। প্রথমটিকে(প্রাকৃতিক কামনাকে) আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে- আবশ্যক (necessary) এবং অনাবশ্যক (non necessary)। আমাদের এই মূল্যায়িত বিশ্বাস কামনার সঙ্গে কখনো আবশ্যক ভাবে আবার কখনো অনাবশ্যক ভাবে যুক্ত হয়। তবে এক্ষেত্রে যদি কোনভাবে শূন্য কামনা বা বিশ্বাস (empty desires) যুক্ত হয় তবে সেক্ষেত্রে উভয়ই মিথ্যা এবং ক্ষতিকারক হওয়ার সম্ভবনা থাকে।[৬] যেমন—খাদ্য গ্রহণ বা বস্ত্র পরিধান সম্বন্ধিত কামনাগুলি প্রাকৃতিক এবং আবশ্যক কিন্তু বিলাসিতা (luxury), ক্ষমতা লাভ (power) বা সম্মান আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সবই হল শুন্য কামনা (empty)। এগুলির প্রকৃত কোন মূল্য (real value) তিনি স্বীকার করেননি। স্বাভাবিক কামনাই (natural desires) ব্যক্তির সন্তোষ প্রদানে সক্ষম বলে তিনি বিবেচনা করেছেন। শুন্য কামনার ক্ষেত্রে সন্তোষ প্রদানের সম্ভবনা তুলনামূলক অনেক কম। এপিকিউরাস অনুগামী ফিলোদেমাস(Philodemus) এপ্রসঙ্গে একটি বিষয় যুক্ত করে বলেন আমাদের কামনার উৎসগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অনেক সময় আমরা বিষয়কে যেমনভাবে অনুভব করে থাকি তা থেকেই কামনা-বাসনার উদ্ভব হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের অনুভূতি থেকেই ইচ্ছা বা কামনার উদ্ভব হতে পারে। আবার অনেক সময় এদের উত্থান ঘটে আমাদের ব্যক্তি প্রকৃতি থেকে। আবার বাহ্যিক কোন কারণ থেকেও কামনার উদ্ভব হতে পারে। ব্যক্তির উপর এই কামনা-বাসনার প্রভাব কখনও গভীর আবার কখনও স্বল্প হয়ে থাকে। আর বিভিন্ন কামনা-বাসনার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে আমরা সক্ষম না হওয়ার ফলে নৈতিক বিভ্রান্তির (moral error) সৃষ্টি হয়। যেমন অন্য কারুর কামনা বাসনাকে ভ্রান্তি বসত নিজের প্রকৃতির উপযোগী মনে করা এবং

তাকে লক্ষ্য রূপে স্থির করা। উচ্চাভিলাষ বা বিলাসিতাকে অভীষ্ট বস্তু রূপে বিবেচনা করা ইত্যাদি আমাদের উচিত নয় বলে তিনি দাবী করেন।

চার মৌলিক সত্য :

এপিকিউরাস চারটি মূলনীতি বা উদ্দেশ্যের কথা তাঁর তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন এবং তা পালনে অনুগামীদের উপদেশ দিতেন। যদি এই চারটি মৌলিক সত্য অনুসরণে জীবনযাপন করা সম্ভব হয় তাহলে ব্যক্তি আনন্দময় অবস্থা লাভ করতে সক্ষম হবে বলে তিনি মনে করেন।

প্রথমত, তিনি বলেন 'ঈশ্বরকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই'- এপিকিউরাসের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, যেহেতু ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা আছে।[৭] এ প্রসঙ্গে তিনি ব্যক্তির সাধারণ ও প্রচলিত ধারণার কথা উল্লেখ করে বলেন-ঈশ্বর হলেন সুখী, অমর, শাশ্বত, পবিত্র প্রাণী। ঈশ্বর সর্বদা নিজের আনন্দে সমাহিত হয়ে আছেন। মানব জগতে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর কোনভাবেই অনিষ্টকরণের সঙ্গে যুক্ত নন। মানব জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। সুতরাং, ঈশ্বরের কোনো প্রভাব আমাদের বাস্তবিক জীবনযাপনে পড়ে না। আর সে কারণেই ঈশ্বরকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত,'মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই'- মৃত্যু আমাদের কাছে কোনো কিছুই নয় কারণ সমস্ত শুভ এবং অশুভ কিছু আমরা ইন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারাই বুঝে থাকি। আর দেহত্যাগ হলে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ সম্ভব হয় না। আর যার অনুভূতি সম্ভব নয় তা আমাদের কাছে কিছুই নয়।[৮]যখন আমাদের দেহাবসান হয় সেই সঙ্গে আত্মার অস্তিত্বও বিনষ্ট হয়। আত্মা যেহেতু খুব সূক্ষ্ম মসৃণ পরমাণু দ্বারা নিবন্ধিত তাই দেহাবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বিচ্ছুরণ ঘটে থাকে। শরীর তাদের আর একত্রিত করে রাখতে সক্ষম থাকে না। সুতরাং যখন ব্যক্তি মৃত তখন মৃত্যুর সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ থাকতে পারেনা। আবার যখন ব্যক্তি জীবিত তখন মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা মৃত্যু তখনও এসে উপস্থিত নয়। তিনি মনে করেন দেহত্যাগের পর জীবের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী কোন জীবনের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। এইভাবে যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিকে মৃত্যু ভয় থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন।

তৃতীয়ত, 'ভালো বা শুভ কোন বিষয় আমরা সহজেই লাভ করতে সক্ষম'- এপিকিউরাসের দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হল খুব সচেতনভাবে সুখ নির্বাহ করা। তিনি মনে করেন সুখ আমাদের সহজলভ্য বিষয়। তবে তা তীব্রতা ও স্থিতিকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ। যেসকল বিষয় আমাদের ব্যথা-বেদনা প্রদান করে থাকে তা নিরসনের মাধ্যমেই আমাদের সর্বোচ্চ সুখ লাভ সম্ভব হতে পারে। আমাদের স্বাভাবিক প্রয়োজন সাধনের মাধ্যমেও আমরা সর্বোচ্চ সুখ লাভ করতে পারি। এক্ষেত্রে ওই অবস্থা লাভের জন্য কোন সম্পদ, ক্ষমতা বা কোন বাহ্যিক বিষয় আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন হয় না।[৯]

ব্যক্তি তার কামনার তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে অনেক সময় ভুল পথ বেছে নেয়। এপিকিউরাস ব্যক্তির কামনা-বাসনাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—১) প্রাকৃতিক এবং অত্যাবশ্যক ২) প্রাকৃতিক ও (অত্যাবশ্যক নয়) অনাবশ্যক ৩) অপ্রাকৃতিক এবং অনাবশ্যক।

প্রাকৃতিক এবং অত্যাবশ্যক কামনাগুলি পূরণের মাধ্যমে আমরা বেদনা মুক্ত অবস্থায় পৌঁছোই। এই কামনাগুলি পূরণ না হলে আমাদের পক্ষে সুস্থ থাকা বা সুখী হওয়া সম্ভব হয় না। এমনকি আমাদের জীবিত থাকার জন্য এগুলির তৃপ্তি সাধন প্রয়োজন। যেমন তিনি বলেন-খাদ্য, পানীয়, আশ্রয় ও অন্যান্য প্রাণী দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়া থেকে সুরক্ষা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হয়। আর এক্ষেত্রে তিনি মনে করেন ব্যক্তির এই মৌলিক প্রয়োজনগুলি পরিপূরণ আদৌ অসাধ্য বিষয় নয়।

আবার কিছু প্রাকৃতিক কামনা আছে যা পূরণ না হলেও আমাদের তেমন কোন ব্যথা-বেদনা অনুভূত হয় না। সেগুলিকে অনাবশ্যক কামনা বলা যায়। যেমন- সুস্বাদু অথচ ব্যয়সাপেক্ষ খাবার গ্রহণের ইচ্ছা। অবশ্যই এটি সুখদায়ক তবে সাধারণ খাবারের তুলনায় মানসিকভাবে এগুলি বেশি লোভনীয় হলেও এটি যে বেশি বেদনা দূর করে এমন নয়। অনাবশ্যক কামনা পরিপূরণের ক্ষেত্রে অসুখী হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে বলে তিনি মনে করেন। ব্যক্তি কেবল প্রাকৃতিক এবং অত্যাবশ্যক প্রয়োজনগুলি পূরণের মাধ্যমেই সুখী জীবন পেতে পারেন বলে তিনি দাবী করেন।

অপ্রাকৃতিক এবং অনাবশ্যক কামনার উদাহরণ দিয়ে বলেন–সম্মান প্রাপ্তির বা পুরস্কার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হল অপ্রাকৃতিক এবং অনাবশ্যক কামনা। এই ইচ্ছা বা কামনাগুলি ব্যক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে সীমিত করে এবং এক্ষেত্রে অসুখী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এই কামনাগুলির পশ্চাদ্ধাবন না করাই মঙ্গলজনক। কারণ এগুলি অনেক সময় সুখ প্রদানের পরিবর্তে ব্যক্তিকে ঝামেলা বা অশান্তিতে নিয়োজিত করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন দ্বিধাহীনভাবে আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য পালনে সহায়তা করে এবং সময়ের অপব্যয় না করে সুখী জীবন প্রদান করে।[১০]

চতুর্থত,'ভয়জনক বিষয় আমরা সহজেই সহ্য করতে পারি' –শুভ বিষয় আমাদের সুখ প্রদান করে থাকে আর অশুভ বিষয় দুঃখ প্রদান করে থাকে। এপিকিউরাসের মতে আমরা ব্যথা-বেদনা সহজেই জয় করতে পারি কারণ গভীর যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হয় না আর দীর্ঘস্থায়ী বেদনা স্বল্প যন্ত্রণা প্রদান করে।[১১]আর এই বেদনা থেকে পরিত্রাণের উপায় রূপে আমরা এর বিপরীত কোন সুখদায়ক বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করার চেষ্টা করতে পারি। তার ফলে ওই বেদনা কিছুটা লাঘব হবে বলে তিনি মনে করেন। আমাদের অতীত সুখদায়ক স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের আনন্দদায়ক পূর্বানুমান অনেক সময় আমাদের দৈহিক যন্ত্রণার উপশমক হয়।

এপিকিউরাস অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তুলনা করে বলেন প্রাণীদের ক্ষেত্রে কেবল ব্যথা-বেদনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং সুখ উপভোগ করাই তাদের সুখী থাকার জন্য যথেষ্ট কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা পর্যাপ্ত নয়। ব্যক্তির সুখী অবস্থার জন্য ঐ শর্তের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ বা দুঃশ্চিন্তামুক্ত মানসিক অবস্থার প্রয়োজন হয়। আর এই দুই শর্তই মানবিক আনন্দের ভিত্তি স্বরূপ বলে এপিকিউরাস বিবেচনা করেন।[১২]

পরিশেষে, এপিকিউরাসের দর্শনকে একপ্রকার চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত দর্শন (therapy) বলা যায়। এর উদ্দেশ্য ছিল মূলত ব্যক্তিকে ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন অশান্তিকর পরিস্থিতি থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরিয়ে আনা। আর এটা সম্ভব হতো ব্যক্তির ক্রোধ (anger), লিপ্সা (greed), ভয় ইত্যাদি আবেগ-অনুভুতির যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এপিকিউরাসের সুখবাদী ধারণা বর্তমানে সুখ বা আনন্দ বিষয়ক বাকবিতণ্ডার ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান পেতে পারে বলা যায়। বস্তুগত বা জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আনন্দকে কেবল উল্লাস বা আত্মতৃপ্তি রূপে না দেখে সুখা-কে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেও দৈহিক ও মানসিক মঙ্গলময় সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন কামনা করা যেতে পারে। আর এই সমস্ত কিছু নিয়েই এপিকিউরান নৈতিক তত্ত্ব গঠিত হয়েছে।

সূত্র-নির্দেশ:

১. 'we choose the virtues too on account of pleasure and not for their own sake, as we take medicine for the sake of health.' Laertius, Diogenes, and R. Hicks. *Diogenes Laertius: Lives of Eminent Philosophers, Volume II, Books 6–10 (Loeb Classical Library No. 185).* Harvard University Press, 1925, p. 663.

২. as fire is perceived to be hot, snow white, and honey sweet. In none of these examples is there any call for proof by sophisticated reasoning; it is enough simply to point them out.' Cicero, Marcus Tullius, et al. *Cicero: On Moral Ends (Cambridge Texts in the History of Philosophy).* Cambridge University Press, 2001, p. 13.

৩. 'Peace of mind and freedom from pain are pleasures which imply a state of rest ; joy and delight are seen to consist in motion and activity.' Laertius, Diogenes, and R. Hicks. *Diogenes Laertius: Lives of Eminent Philosophers, Volume II, Books 6–10 (Loeb Classical Library No. 185).* Harvard University Press, 1925, p. 661.

৪. Konstan, David. "Epicurean Happiness: A Pig's Life?" *Journal of Ancient Philosophy*, vol. 6, no. 1, 2012. *Crossref*, doi:10.11606/issn.1981-9471.v6i1p1-22, p. 13.

৫. 'A quenched thirst is a "static" pleasure, whereas the pleasure of having one's thirst quenched is "kinetic".' Cicero, Marcus Tullius, et al. *Cicero: On Moral Ends (Cambridge Texts in the History of Philosophy).* Cambridge University Press, 2001, p. 29.

৬. 'at any rate the flesh endures the storms of the present alone, the mind those of the past and future as well as the present.' Laertius, Diogenes, and R. Hicks. *Diogenes Laertius: Lives of Eminent Philosophers, Volume II, Books 6–10 (Loeb Classical Library No. 185).* Harvard University Press, 1925, p. 661.

৭. '.. For gods do exist, since we have clear knowledge of them.' Epicurus, et al. *The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia (Hackett Classics).* 1/30/94 ed., Hackett Publishing Company, Inc., 1994, p. 28.

৮. '..has no feeling, and that which has no feeling is nothing to us.' Laertius, Diogenes, and R. Hicks. *Diogenes Laertius: Lives of Eminent Philosophers, Volume II, Books 6–10 (Loeb Classical Library No. 185).* Harvard University Press, 1925, p. 663.

৯. Tsouna, Voula. "Epicureanism and Hedonism." *The Cambridge History of Moral Philosophy*, 2017, p. 66. *Crossref*, doi:10.1017/9781139519267.006.

১০. Epicurus, et al. *The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia (Hackett Classics).* 1/30/94 ed., Hackett Publishing Company, Inc., 1994, p. 30.

১১. '..that severe pain is short-lived and long-lasting pain is light.' Cicero, Marcus Tullius, et al. *Cicero: On Moral Ends (Cambridge Texts in the History of Philosophy).* Cambridge University Press, 2001, p. 57.

১২. Konstan, David. "Epicurean Happiness: A Pig's Life?" *Journal of Ancient Philosophy*, vol. 6, no. 1, 2012, p. 10. *Crossref*, doi:10.11606/issn.1981-9471.v6i1p1-22.

শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের মহিলা উত্তরসূরী : প্রথম প্রজন্ম-সুখলতা রাও থেকে লীলা মজুমদার

শম্পা লাহা
সহকারী অধ্যাপক, পাঁচথুপী হরিপদ গৌরীবালা কলেজ
মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ : শিশুসাহিত্য বলে ঠিক কোন ধরনের সাহিত্য সম্ভার কে চিহ্নিত করা হবে এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রকৃতপক্ষে শিশু যাদের বলা হয় তারা সাহিত্যের রস গ্রহণে সক্ষম নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিশু সাহিত্য হিসেবে দাবি করতে পারে একমাত্র সেই রচনা শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত এবং যাতে শৈশবের রস উপস্থিত। আর বাংলায় উপেন্দ্রকিশোর পূর্ববর্তী যুগের শিশুদের জন্য যে ক'টি শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার বেশির ভাগই নীতিকথা মূলক। উপেন্দ্রকিশোরই প্রথম ঘটিয়েছিলেন প্রাচীন লোককথার নবরূপায়ন যেখানে বিদ্যাসাগরের নীতিশিক্ষা অনুপুস্থিত, অনুপস্থিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গাম্ভীর্য, যেখানে পশুপাখি পরিবেষ্টিত প্রকৃতির মাঝে ছোটোরা খুঁজে পাইয় আপন জগত। আর সেখানে নীতি শিক্ষা বা উপদেশও দেওয়া হয়েছে মজার ছলে। আর উপেন্দ্রকিশোরের এই শিশুসাহিত্যের উত্তরাধিকার সার্থকভাবে বহন করেছে তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম। শুধু পুরুষরাই নয় মহিলারাও। সুখলতা, পুণ্যলতা, শান্তিলতা, লীলা মজুমদারের অগুনতি সৃষ্টিকর্মে লুকিয়ে আছে তার প্রমাণ। প্রমান আছে রায় পরিবারের পারিবারিক পত্রিকা সন্দেশের লেখকগোষ্ঠী তে।

সূচক বা মূল শব্দ : শিশুসাহিত্য, উপেন্দ্রকিশোর, রায়চৌধুরী, বুদ্ধদেব, বসু, সুখলতা, পুণ্যলতা, শান্তিলতা, লীলা।

মূল আলোচনা

যদি পৃথিবীর দুটি নিষ্পাপ বস্তুর কথা বলতে হয় আর তার একটি যদি ফুল হয় অন্যটি নিঃসন্দেহে শিশু। দুইজনেই চেয়ে থাকতে পারে অবাক বিস্ময়ে, আমাদেরকে কাছে টানতে পারে। চাহনির মায়াতে সৃষ্টি করতে পারে হাজারো কৌতূহল । তাই মনে হয়, মানুষের জীবনের এই শৈশবকাল টাই হলো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত । আমাদের বয়স যতই বাড়তে থাকে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বারে বারে ছোট্টবেলা টিই কেবল দৌড়ে যায় আর আসে।

হয়তো সে জন্যই ছোটরা যা চায়, ঠিক যেমনটি চায়, ঠিক তেমনটি তাদের সামনে এনে হাজির করা বেশ কঠিন কাজ। আর সেই কাজে নিরন্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে নানান মজার হাসির গল্প ছড়া উপহার দিয়ে চলেছেন লেখকরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় "ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতন এমন পুরাতন আর কিছুই

নাই। দেশ-কাল-পাত্র-শিক্ষা-প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানুষের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু শিশু শত শত বৎসর পূর্বে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশু মূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে শিশু প্রকৃতির সৃজন।” [১]

বিশ্ব সাহিত্য সম্ভারে শিশু-কিশোর সাহিত্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ, কারণ দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি--- এককথায় আগামীদিনের মানব সভ্যতার ধারক ও বাহক হল শিশু-কিশোর সমাজ। তারা এদেশের ভবিষ্যত নাগরিক। ভবিষ্যতের আশাভরসা। তাদের জন্য রচিত সাহিত্য তাই নিঃসন্দেহে মূল্যবান। আমরা জানি, মানুষের জীবনের প্রথম অবস্থাটি হল শৈশব, যা ধীরে ধীরে উন্নীত হয় কৈশোর স্তরে। তারপর আসে মানবদেহ ও মনের পরিপূর্ণতা। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জীবনে এই শৈশব-কৈশোরের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায় কখনো বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমার মুখে ছড়া ও কাহিনী শুনতে শুনতে, কখনও বা সচিত্র মনোহারী গল্প, কবিতা, উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে ছোটদের মনের মধ্যে গড়ে ওঠে কল্পনাশক্তি, ভাষা জ্ঞান ও রসবোধ। বলা যায় যে কোন মানুষের মনে প্রথম সুস্পষ্ট ভাষাবোধ ও সাহিত্য রসের আস্বাদন ঘটে শিশু কিশোর সাহিত্যের মাধ্যমে। সে দিক থেকেও এই সাহিত্যধারার একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে। যে কোন দেশের সাহিত্যের বিশেষ পরিচয় বহন করে সেই দেশের শিশুসাহিত্য, বাংলা শিশুসাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়ঃ—

“বাংলা শিশুসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে সারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনো কোনো বুদ্ধি, মহোত্তম কোনো কোনো মনঃ যার আদিপুরুষ বিদ্যাসাগর, যাকে রবীন্দ্রনাথ নানা স্থলে স্পর্শ ক’রে গেছেন, যাতে আছেন অবনীন্দ্রনাথের মত হৃদয়বান ও সুকুমার রায়ের মতো গুণী পুরুষ, তার দুটো একটা রোগলক্ষণে ভীত হবার কারণ দেখি না, কেননা তার আপন ঐতিহ্যেই আরোগ্যশক্তি সঞ্চিত আছে।” [২]

প্রাচীনকালে শিশু সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি ছিল না বললেই চলে। এই সময় শিশুদের উপযোগী সাহিত্য বলতে বিষ্ণুশর্মার ‘পঞ্চতন্ত্র’, ‘হিতোপদেশ, সোমদেবের ‘কথাসরিৎসাগর’ এবং কালিদাসের নামে প্রচলিত ‘দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা’র নাম করা যেতে পারে।

এরপরেই নাম করা যায় বাংলা গদ্যের জনক বিদ্যাসাগরের। তাঁর ‘বোধোদয়’, ‘কথামালা’, ‘ভ্রান্তিবিলাস’ প্রভৃতি শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত মনোরম সাহিত্য। তারপর অক্ষয় কুমার দত্ত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নিয়ে শিশু-কিশোরদের জন্য রচনা করেন তাঁর ‘চারুপাঠ’ গ্রন্থ। কেশব চন্দ্র সেন তাঁর সম্পাদনায় শিশু-কিশোরদের জন্য

প্রকাশ করেন 'বালক বন্ধু' পত্রিকা। শিশু পত্রিকার প্রথম পথিকৃৎ এই পত্রিকাটি পরবর্তীকালে 'মুকুল', 'সখা', 'সাথী' পত্রিকা প্রকাশের পথকে সুগম করে। ১৮৮৩ সালে প্রমদাচরণ সেন প্রকাশ করেন শিশু পত্রিকা 'সখা'।

উনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য শিশু পত্রিকা 'সখা'। ছোটদের জন্য নির্মল আনন্দ, সৎ শিক্ষা এবং সর্বকল্যাণকামী এক উদার আদর্শবাদ এই পত্রিকার এক বিশেষ সম্পদ ছিল। আর অপর সম্পদ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম রচনা 'মাছি' সহ আরো বহু রচনা প্রকাশিত হয় 'সখা'তে। শিশুসাহিত্য জানতে গেলে তাই জানতে হয় উপেন্দ্রকিশোর কেও। তাঁর বেশিরভাগ রচনাই রচিত হয়েছিল শিশু-কিশোরদের জন্য। শুধু রচনাই নয় তাঁর সম্পাদিত 'সন্দেশ' নিয়ে এসেছিল শিশু উপভোগ্য সব রচনার সম্ভার। গল্প-কবিতা-পুরাণ কি না প্রকাশিত হতো সন্দেশে। রায়বাড়ির প্রায় প্রত্যেকেই সমৃদ্ধ করেছিলেন শিশু-কিশোর পত্রিকার অন্যতম এই পথিকৃৎ কে। উপেন্দ্রকিশোরের দুই পুত্র সুকুমার ও সুবিনয় কন্যা সুখলতা উপেন্দ্রকিশোরের দুই ভাই কুলদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন এর মেজো মেয়ে স্বনামধন্য লীলা মজুমদার--------- তালিকা শেষ হবার নয়। এমনকি 'সন্দেশ' সম্পাদনা কর্মেও রায়বাড়ির অনেকেই অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ।

প্রথম শিশুদের জন্য কলম ধরতে রায়বাড়ি থেকে এগিয়ে এসেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর রচিত 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'মহাভারতের গল্প', 'পুরাণের গল্প', 'কবিতা ও গান', 'টুনটুনির বই', 'গল্পমালা', 'সেকালের কথা' এমন কত। সবদিক থেকেই বাংলা শিশুসাহিত্যের সার্থক রূপকার ছিলেন তিনি।

আরে এহেন রূপকারের হাতের সার্থক ফসল 'টুনটুনির বই'। প্রাচীন উপকথার নব রূপায়ণ। যেখানে অনুপস্থিত বিদ্যাসাগরের নীতিশিক্ষা, অনুপস্থিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গাম্ভীর্য, যেখানে পশুপাখি পরিবেষ্টিত প্রাণবন্ত প্রকৃতির মাঝে ছোটোরা খুঁজে পায় তার নিজস্ব জগৎ। গল্পগুলি শিক্ষামূলকই সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই নীতি শিক্ষা উপদেশও দেওয়া হয়েছে মজার ছলে। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে যে সুগভীর মননশীলতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তাঁর স্বল্পসংখ্যাক সৃষ্টিকর্মে, সেগুলিকে গণনার অন্তর্ভুক্ত না করলেও কেবলমাত্র 'টুনটুনির বই' গ্রন্থটির জন্য উপেন্দ্রকিশোর চিরকাল বাংলা শিশু কিশোরদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ছোটদের প্রতি যে স্নেহ ভালোবাসা নিয়ে তিনি পদার্পণ করেছিলেন শিশুসাহিত্যের আঙিনায় তার কিছু ভগ্নাংশ ধরা পড়ে উপেন্দ্রকিশোর কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'ছেলেবেলার দিনগুলি'তে। "ছোট ছেলেমেয়েদের বাবা বড় ভালবাসতেন। শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতোই আনন্দে তিনি হাসি-খেলা, নাচে-গানে মেতে উঠতেন। ছোটদের ভালোবাসতেন, তাদের মন বুঝতেন বলেই বুঝি এমন সুন্দর, সহজ, মিষ্টি হতো তাঁর লেখা।" [৩]

এমন বিষয় নেই যা নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর লেখেননি। শিশুর মনভোলানো উপকথা, ছড়া, গল্প, নাটিকা, ভয়ঙ্কর সব জীবজন্তুর কথা, তারার কথা। তাঁর লেখায় মানুষ আর পশু একই পরিবারভুক্ত। পশুপাখিরা এখানে নির্বিবাদে মানুষের ভাষায় কথা বলে, মানুষের সঙ্গে তাঁদের বিয়ে হয়, বন্ধুত্ব হয়, আবার ঝগড়াঝাঁটিও হয়।

বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যক্ষেত্রে রায় পরিবার এক বিশাল প্রতিষ্ঠান। কয়েক প্রজন্ম ধরে এই পরিবারের সদস্যরা শিশু-কিশোর সাহিত্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত আছেন। উপেন্দ্রকিশোর এর মূল উদ্যোক্তা। ছোটদের সাহিত্য নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যতম ফসল হলো 'সন্দেশ' (১৯১৩) পত্রিকা। তাঁর সাহিত্যচর্চার দ্বিতীয় পর্যায় এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল। রায় পরিবার এবং তৎকালীন বহু বুদ্ধিজীবী ও লেখক সম্প্রদায়ের কাছে উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন এক বিশাল অনুপ্রেরণা। সন্দেশে তিনি বহু বিখ্যাত লোকের সমাগম ঘটিয়েছিলেন। সর্বোপরি নিজের পরিবারে এক অনন্য সাহিত্য ধারার জন্ম হয়েছিল মূলত তাঁকে দেখেই। তাঁরই অনুপ্রেরণায় সন্দেশকে ভালোবেসে রায় পরিবারের অন্যান্য অনেক সদস্যই হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন এবং এই ধারা অব্যাহত ছিল তাঁর মৃত্যুর পরেও।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীরা ছিলেন পাঁচ ভাই, তিন বোন। তাদের মধ্যে বড় সারদারঞ্জন রায় ও তৃতীয় মুক্তিদারঞ্জন রায় কে বাদ দিলে তাঁর অন্য দুই ভাইই ছোটদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া উপেন্দ্রকিশোরের তিন পুত্র সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল, কন্যা সুখলতা, পুণ্যলতা, শান্তিলতা, ভ্রাতুষ্পুত্রী মাধুরীলতা রায়, লীলা মজুমদার এবং সর্বোপরি পৌত্র সত্যজিৎ রায় ছোটদের সাহিত্য রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

উপেন্দ্রকিশোরের বিরল প্রতিভাধর পুত্র সুকুমার রায় এবং পৌত্র সত্যজিৎ রায় বাংলা শিশুসাহিত্যে নতুন দিক উন্মোচিত করেছেন। সুবিনয়, সুবিমলও শিশুসাহিত্যে দিয়ে গেছেন আপন আপন পারদর্শিতার পরিচয়। আর উপেন্দ্রকিশোরের কন্যাদের মধ্যে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যিনি, তিনি হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুখলতা রাও, পুণ্যলতা তারপরেই, শান্তিলতার সৃষ্টিকর্ম নেহাতই কম। বাংলা শিশুসাহিত্যের অঙ্গনে রায় পরিবারের পুরুষদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে রায় পরিবারের মহিলারাও সবিশেষ পারদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন শিশু সাহিত্য রচনায়।

সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯) সমাজসেবামূলক কাজের জন্য প্রাণ কাইজার-ই-হিন্দ পদক। শিশুসাহিত্যের জগতকে বৈচিত্র অভিনবত্ব ও ব্যাপকতা দিয়েছেন তিনি। বাংলা ও ইংরেজিতে সম্পাদনা করেছেন 'আলোক' নামে একটি পত্রিকা। প্রধানত শিশু সাহিত্যিক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন যে সব রূপকথা ও উপকথা-আশ্রিত বই গুলির জন্য সেগুলি হলঃ 'গল্পের বই' (১৯১২), 'আরো গল্প'(১৯১৫), 'গল্প আর গল্প'(প্রথম দুটি

বই একত্রে প্রকাশিত হয় ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায়)(১৯৫৪), 'আলিভুলির দেশে' (১৯৫৭), 'নানান গল্প' (১৯৬০), 'খোকা এল বেরিয়ে' (১৯৬১), 'ঈশপের গল্প' (১৯৬৩), 'নানান দেশের রূপকথা' (১৯৬৪)(রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত), 'হিতোপদেশের গল্প' (১৯৬৫), 'নতুনতর গল্প' (১৯৬৯), 'কিশোর গ্রন্থাবলী' (১৯৬৬), 'সোনার ময়ূর'। ছোটদের জন্য লেখা দুটি উপন্যাস 'দুই ভাই' ও 'অনুসন্ধান'। দুটি ছড়ার বই 'নতুন ছড়া' (১৯৫২) ও 'বিদেশি ছড়া'(১৯৬২)(মোট ছড়ার সংখ্যা ১৮৩) আত্মস্মৃতি মূলক রচনা 'পথের আলো' (১৯৫৫), 'আজবপুর', 'তারার ঘর', 'পাষাণী', তাঁর লেখা কাব্য নাট্য। ঋতু নাট্য 'ফুলের ভাষা', গদ্য নাটিকা ,'বনে ভাই কত মজাই' আর 'যাত্রাপথে'। 'শুভা' পদ্যতে লেখা রূপক নাটক। তাঁর লেখা পাঁচখানি প্রাথমিক শিক্ষার বই হলো 'পড়াশোনা'(১৯১৬), 'নূতন পড়া'(১৯২২), 'নিজে পড়' (১৯৫৬), 'নিজে শেখ'(১৯৫৭), ও 'খেলার পড়া'(১৯৬১) লিখেছিলেন তিনটি ইংরেজি গ্রন্থ 'Behula', 'New steps', 'Leading light'। 'মাটির মানুষ' তাঁর অনূদিত রচনা।

জ্যেষ্ঠ কন্যা সুখলতার মতোই উপেন্দ্রকিশোরের সার্থক উত্তরসূরি ছিলেন দ্বিতীয় কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী। তাঁর রচনার কর্মের স্বল্পতা অনায়াসে ঢেকে দেয় তাঁর অনবদ্য গদ্য। তাঁকে অমরতা দান করেছে আত্মস্মৃতি মূলক রচনা 'ছেলেবেলার দিনগুলি' (আশ্বিন ১৩৬৫) শিশু ও পশু পক্ষী বিষয়ক সাতচল্লিশটি গল্প সমন্বিত পুণ্যলতার 'ছোট্ট ছোট্ট গল্প' অগ্রহায়ণ (১৩৮১) ছোটদের জন্য লেখা তাঁর একমাত্র গল্পের বই। 'রাজবাড়ী' (ভাদ্র-আশ্বিন) (১৩৭১) নামে 'সন্দেশ' এ একটি উপন্যাসও প্রকাশিত হয় তাঁর। রবিবারের আনন্দবাজারে ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন 'একাল যখন শুরু হলো'। এটি পড়ে গ্রন্থভুক্ত হয় ২০০৭ সালে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু গল্প 'শান্তশীলা' (১৩২৫), 'প্রতিজ্ঞার দায়' (১৩২৬), 'ভেলকিরাম' (১৩৩১), 'পুরস্কার' (১৩২৯), 'পালোয়ানজী' (১৩৩০), 'তাজ্জব ডিম', 'পরলোকের মানুষ', 'উৎসবের রাজা' প্রভৃতি। ১৯৬১ সালে 'সন্দেশ' পুনঃপ্রকাশিত হলে প্রথম সংখ্যাতেই লেখেন 'পুরনো সন্দেশের কথা'।

এঁদের ছোট বোন স্বল্পায়ু শান্তিলতা চৌধুরী (১৮৯২-১৯১৯) মারা যান মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সের নিউমোনিয়ায়। তবু সামান্য কটি রচনাতেই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন তিনি। সন্দেশে প্রকাশিত 'বাঘমামা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩) 'নিমন্ত্রণ' (১৩২৫ বৈশাখ), 'যমজ রাজা' (আষাঢ় ১৩২৫) প্রভৃতি গল্পগুলি কিংবা 'পাকা রাঁধুনি' (শ্রাবণ ১৩২৩) কবিতায় পাওয়া যায় সেই পরিচয়।

আর উপেন্দ্রকিশোরের মতো সুকুমার রায়ও রায় পরিবারের অন্যান্যদের সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। যার অন্যতম দৃষ্টান্ত লীলা মজুমদার। ছোটবেলা থেকেই লীলা মজুমদার তাঁর জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দেখানো পথ ধরে এগিয়ে রায় পরিবারের যোগ্য সন্তান হবার বাসনা পোষণ করতেন। সাহিত্যচর্চায় তিনি গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন সুকুমার রায়কে। বুদ্ধদেব বসু একদা তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেনঃ

"তিনি নতুন যুগের স্বাদ এনেছেন, বিষয়গত বৈচিত্র্য দিয়ে নয়, রূপায়ণের অভিনবত্বে। নতুন বিষয়ের নিজস্ব একটি আকর্ষণ আছে। তার প্রভাবে লেখাটা গৌণ হয়ে যায় অনেক সময়, কিংবা ভুল কারণে মূল্য পায়। এই আকর্ষণ লীলা মজুমদারে নেই, আর নেই ব'লেই তাঁর লেখায় দুই যুগের পার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে--- বস্তুর দিক থেকে নয়, চরিত্রের দিক থেকে। প্রেমেন্দ্রের মত, বা অন্নদাশঙ্করের মতো তিনি অপূর্ব কোনো উপাদান আমদানি করেননি; তিনি লিখেছেন সেই পুরনো ছোট ছেলেরই গল্প, যে ছেলে চেয়ে দ্যাখে, অবাক হয়, স্কুলে যায়--- যেতে চায় না; এখানে কৃতিত্ব টুকু সমস্ত তাঁর লেখায়, নতুনত্ব সমস্ত তাঁর দৃষ্টিতে।" (৪)

তাই লীলা মজুমদারের স্বতন্ত্র একটি আসন বাংলা শিশুসাহিত্যের কোঠায় থেকেই যায়। এবং যে গ্রন্থপঞ্জীর জন্য এই আসন চিরস্থায়ী সেগুলি হলঃ

লীলা মজুমদারের গ্রন্থপঞ্জীঃ

ছোটদের উপন্যাসঃ

পদিপিসির বর্মী বাক্স, হলদে পাখির পালক, গুপির গুপ্তখাতা, বকধার্মিক, টংলিং, মাকু, নাকুগামা, বাতাস বাড়ী, নেপোর বই, ভুতোর ডাইরি, ময়না শালিখ, হাওয়ার গাড়ি, নোটোর দল, কুশলদার কৌশল ভস্তক, জলমানুষ, টাকাগা্ছ, হট্টমালার দেশে।

ছোটদের গল্প সংকলনঃ

বদ্যিনাথের বড়ি, দিনে-দুপুরে, ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাঘের চোখ্, ছোটদের ভালো ভালো গল্প, গুণু পন্ডিতের গুণপনা, বাঘের বই, হাস্য ও রহস্যের গল্প, লীলা মজুমদারের হাসির গল্প, নতুন ছেলে নটবর, দুলিয়ানাথ, হাতি হাতি, ভূতের গল্প, গুপি পানুর কীর্তিকলাপ, ভূতের বাড়ি, কাগ্ নয়, জানোয়ার, কল্পবিজ্ঞানের গল্প, আজগুবি, সব ভুতুড়ে, কুকুর এবং অন্যরা, অন্য গল্প, শুধুই গল্প নয়, গল্প স্বল্প, আষাঢ়ে গল্প, গবুর গবেষণা, শিবুর ডায়েরি, চকমকি মণি, আগুনি বেগুনি, খোঁজা, বেড়ালের বই, নদীকথা, বড় পানি ইত্যাদি।

ছোটদের নাটকঃ

বকবধ পালা, লঙ্কা দহন পালা, ছোটদের নাটক সমগ্র।

জীবনীঃ

এই যা দেখা, কবি কথা, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, রামমোহন।

স্মৃতিকথা এবং অন্যান্যঃ

অবনীন্দ্রনাথ, আর কোনোখানে, রান্নার বই, খেরোর খাতা, একবছরের গল্প, পাকদণ্ডী(স্মৃতিকথা), ঘরকন্যার বই, আমিও তাই, যে যাই বলুক।

বড়দের উপন্যাসঃ

শ্রীমতী, জোনাকি, মণিমালা, মণিকুন্তলা, চীনে লণ্ঠন, ঝাঁপতাল, নাটঘর, আয়না, ফেরারি, পাখি, যাত্রী, ঠাকুমার ঠিকুজি ভস্তক।

বড়দের ছোটগল্প সংকলনঃ ইষ্টকুটুম, আমি নারী, লাল নীল দেশলাই, বাঁশের ফুল।

উল্লিখিত লেখকরা ছাড়াও রায় পরিবারের শিশু কিশোর সাহিত্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত আরো কয়েকজন অপ্রধান লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন উপেন্দ্রকিশোর পুত্র সুবিনয় রায়ের স্ত্রী পুষ্পলতা রায় এবং কুলদা রঞ্জন রায় এর দুই কন্যা মাধুরীলতা ও ইলা রায়। পুষ্পলতা রায় সন্দেশের জন্য গল্প, খেলাধুলা সংক্রান্ত লেখা ও নানা তথ্য মূলক রচনা লিখেছিলেন। 'হেঁড়ে গর্জন দৈত্য' (মাঘ ১৩২৭), 'সত্যি বলার দেশ' (জৈষ্ঠ, ১৩২৯), 'দেশলাই কাঠির ছবি' (পৌষ ১৩২৯), 'দাবা বোড়ে খেলা' (চৈত্র ১৩৩০) ইত্যাদি। মাধুরীলতা রায়ের লেখা কয়েকটি গল্প সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে একটি হলো 'নেড়ুর ভয়' (শ্রাবণ ১৩২৬) এছাড়া 'গাছের কথা' (আষাঢ় ১৩৩০) নামে তাঁর লেখা একটি বিবরণ ধর্মী রচনাও সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যদিকে সন্দেশে প্রকাশিত লাবণ্যলতা তথা ইলা রায়ের লেখা কয়েকটি গল্প হল 'কালা আর অন্ধ' (অগ্রহায়ণ ১৩২২), 'চুপ রও' (চৈত্র ১৩২৩), 'বড় গদাই আর ছোট গদাই' (মাঘ ১৩২৯), 'অদ্ভুত চাকর' (কার্তিক, ১৩৩০), 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (মাঘ ১৩৩০) ইত্যাদি।

তাই সবদিক বিচারে কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটি যথার্থ বলে মনে হয়----

"সেই প্রথম অধ্যায়ে প্রাচুর্য ছিলনা, মনভোলানো অন্ততপক্ষে চোখ ভোলানো রকমারি ছিল না এত, কিন্তু যেটুকু ছিল, সেটুকু একেবারেই খাঁটি। বই ছিল কম; কিন্তু যে ক'টি ছিল তাদের অধিকাংশেরই আজ পর্যন্ত জুড়ি মেলেনি, অধিকাংশই আজকের দিনে ক্লাসিক বলে গণ্য হয়েছে। তখনকার শিশুচিত্তের যাঁরা প্রতিপালক, তাঁরাই যে বাল্যবঙ্গের নিরন্তর ভোগ্য মধুচক্র বানিয়েছেন এই কথাটা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। সংখ্যায় তাঁরা মাত্রই কয়েকজন। প্রাতঃকালীন, প্রাতঃস্মরণীয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নানা রঙের রূপকথার দক্ষিণারঞ্জন, আর সেই বিস্ময়কর রায় চৌধুরী পরিবার, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে একটি মাত্র পরিবারের আসন, মাত্রাভেদে যত বড়ই হোক না, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরেই। কোনো একটা সময়ে এরকমও আমাদের মনে হয়েছিল যে বাংলা শিশুসাহিত্য এই রায়চৌধুরীদেরই পারিবারিক এবং মৌরশি কারবার ভিন্ন কিছুই নয়। উপেন্দ্রকিশোর এই উজ্জ্বল যুগের আদিপুরুষ। [৫]

সে দিক থেকে রায় পরিবার সম্বন্ধে অন্তত এই কথাটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পরিবারকেন্দ্রিক পরিচিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রতিভায় ভাস্বর। ছোটদের সাহিত্যকে সম্পূর্ণ নব কলেবরে উপস্থাপন করে রায় পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের ভাবনা চিন্তাকে সেই দিকে পরিচালিত করেছেন উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র-কন্যারা। পিতার সৃষ্ট এই সাহিত্যধারাকে উৎকৃষ্ট করে তুলেছিলেন যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্রকন্যারা। আর লীলা মজুমদার এরই ভিত্তিতে ছোটদের সাহিত্যকে করে

তুলেছেন আধুনিক বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মিশ্রন বিশেষ। তাঁর রচনা যেমন পুষ্ট হয়ে উঠেছে তেমনি সেখান থেকে তাঁর মজ্জাগত পারিবারিক উত্তরাধিকারের ছবিও ফুটে উঠেছে। এখানেই এর সার্থকতা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. 'অনর্ঘ পত্রিকা'(মূল্য নয় মূল্যবোধের পত্রিকা), তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায় বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি, ডায়মন্ড হারবার।

২. 'প্রসঙ্গঃ শিশু-কিশোর সাহিত্য', সম্পাদক প্রকাশকাল ও স্থান অনুলিখিত, প্রাপ্তিস্থান লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র কলকাতা।

৩. নবেন্দু সেন, 'প্রসঙ্গায়নে বাংলা শিশু সাহিত্য', সাহিত্য লোক, কলকাতা, সাহিত্যলোক নতুন সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮/ আশ্বিন ১৪২৫

তথ্যসূত্রঃ

১. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শিশু-কিশোর সাহিত্য সংখ্যা, শারদীয় ১৩৯৯, প্রবন্ধঃ শিশুসাহিত্যের সাম্প্রতিক কয়েকজন লেখক লেখিকা, লেখক- আমিনুল হক, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৭

২. বুদ্ধদেব বসু, 'সাহিত্যচর্চা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬/ মে ২০০৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা- ৬৪, প্রবন্ধঃ বাংলা শিশুসাহিত্য।

৩. পুণ্যলতা চক্রবর্তী, 'ছেলেবেলার দিনগুলি', আনন্দ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৮৫

৪. পূর্বোক্ত, 'সাহিত্যচর্চা', পৃষ্ঠাসংখ্যা-৫০

৫. পূর্বোক্ত, ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা-৩৮

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তায় সামাজিক মূল্যবোধ ও বর্তমান সমাজ

বাসুদেব হালদার
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন

সারসংক্ষেপ: প্রত্যেক সমাজের সামাজিক আদর্শ, রীতি-নীতি, ভাবধারা, প্রথা, সংস্কৃতি থাকে, যেগুলির সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্য বিধান করে চলাই কর্তব্য। আদর্শনিষ্ঠ সামাজিক জীবনের ধারাবাহিকতা পরুষানুক্রমে অব্যাহত থাকে সমাজের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমের, যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শনিষ্ঠ সামাজিক ভাবধারা বর্তমানে মহা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান শিক্ষাব্যাবস্থায় চরিত্র গঠনের পরিবর্তে প্রথাগত শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে সমাজ তথা মানুষের মধ্যে স্বার্থান্বেষী, আগ্রাসী, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হচ্ছে এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উচিত অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই স্বামীজী এমন একটি শিক্ষা ব্যাবস্থা প্রচলনের কথা বলেছেন যা সমাজকে আত্মনির্ভর হতে যেমন সাহায্য করবে তেমনি মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত দেবত্বের পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শনিষ্ঠ চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে। তিনি দেখা বার চেষ্টা করবেন যে, শিক্ষাব্যাবস্থা এমন হতে হবে যেখানে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান এবং ভারতীয় ধর্মের সমন্বয় সাধন হয়। ধর্ম ব্যতীরেকে বিজ্ঞান নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা সমাজকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সমাজের আদর্শবোধ যেমন নষ্ট হবে তেমনি নৈতিক মূল্যবোধও বিলুপ্ত হবে। স্বামীজী যুবসমাজের আদর্শবোধ, নৈতিক মূল্যবোধের জন্য নারী শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অতএব এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল স্বামীজীর সামাজিক আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্য এবং বর্তমান যুবসমাজের প্রতি তার প্রাসঙ্গিকতা।

বিষয়সূচক শব্দ : শিক্ষা, মূল্যবোধ, দেবত্ব, চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্ব বিকাশ

ভূমিকা : মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের মধ্যে থেকেই, সমাজকে কেন্দ্র করে মানুষের সম্পূর্ণ জীবন অবর্তিত হয়। প্রত্যেক সমাজের নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক আদর্শ, রীতি-নীতি, ভাবধারা, প্রথা, সংস্কৃতি থাকে, যেগুলির সঙ্গে ব্যক্তি তথা মানুষের সামঞ্জস্য বিধান করে চলাই কর্তব্য, যাকে সামাজিকীকরণ বলা হয়। এই প্রসঙ্গে গিলিন এবং গিলিন বলেন "সামাজিকীকরণ বলতে আমরা এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝি, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি একটি গোষ্ঠির সদস্য হিসাবে তার মূল্যবোধ, মানদন্ড ও ঐতিহ্য

অনুসারে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আর এভাবে সে নিজেকে সামাজিক অবস্থার সাথে মানিয়ে নেয়[১]।

সামাজিকীকরণ মানব ও সমাজ উভয় জীবনের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা নিরবচ্ছিন্নভাবে মানব ও সমাজ জীবনে বিরামহীনভাবে চলতে থাকে। সামাজিকীকরণ এক ধরণের সামাজিক শিক্ষা, যার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন শিক্ষা লাভ করে সমাজের একজন উপযুক্ত সদস্য হিসাবে গড়ে ওঠে। সমাজের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজের আদর্শ, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি ও জীবনের ধারাবাহিকতা পুরুষানুক্রমে অব্যাহত থাকে, যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে প্রচলিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যক্তিকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষাই সর্বাধিক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এবং সমাজ জীবন স্বচ্ছন্দ, সুসংহত, শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই শিক্ষা হতে হবে এমন যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে সমাজ তথা সমগ্র বিশ্ব বিজ্ঞানের আধুনিক যন্ত্রচালিত প্রযুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ, মানব জীবন তথা সামাজিক পরিবর্তনে যার গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক প্রযুক্তির সৌজন্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং একই সঙ্গে শিক্ষার মানেরও উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে সমাজের উন্নতি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং সমগ্র বিশ্বে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে - এবিষয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল আধুনিক প্রযুক্তির সৌজন্যেশিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর উন্নতি, শিক্ষার মানের উন্নতি সাধন সম্ভব হলেও তা কি ব্যক্তত্বের যথার্থ বিকাশের সহায়ক হয়েছে? কারণ বর্তমান সমাজের মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় চরিত্র গঠনের পরিবর্তে প্রথাগত শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।সমাজ তথা মানুষের মধ্যে স্বার্থান্বেষী, আগ্রাসী, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমনি পারস্পরিক অসহনশীল মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা ক্রমশঃদুর্বল হয়ে পড়ছে। প্রসঙ্গত স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী বক্তৃতা প্রসঙ্গে তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান বলেছিলেন, “ আজ আমরা এক মহা সংকটের সম্মুখীন। অনেকেরই ধারণা, আমরা সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। সমাজের মূল্যবোধ বিকৃত, জীবনের নৈতিক মান অবনমিত। সর্বগ্রাসী নৈরাশ্যবাদ ও সর্বজনীন উন্মত্ততায় আমরা আক্রান্ত, হতাশায় উদ্‌ভ্রান্ত, পরাজয়ে আমরা অধঃপতিত। কিন্তু মানুষের আত্মার প্রতি এই অবিশ্বাস - মানুষের মর্যাদার প্রতি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা। যদি স্বামীজির কোন বাণী আমাদের স্মরণ করিতে হয় তাহা হইলে আমাদের আত্মিক মহিমার প্রতি নির্ভরতার আহ্বান। মানুষের মধ্যে অনন্ত আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা নিহিত আছে। মানুষের

আত্মাই সর্বোচ্চ, মানুষ অদ্বিতীয়, অপূর্ব – শুধু আমাদের আশা রাখিতে হইবে। বিবেকানন্দ আমাদের যন্ত্রনার মধ্যে আশ্রয় দিয়াছেন, দুঃখের মধ্যে দিয়াছেন আশা, নৈরাশ্যের মধ্যে সাহস"[২]।

স্বামীজী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে এমন একটি শিক্ষাব্যাবস্থার প্রচলন যার দ্বারা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যেপূর্ণতার অস্তিত্ব পূর্বথেকেই বর্তমান তাকে প্রকাশ করা। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে বেদান্তকে ছড়িয়ে দিতে পারলে, বেদান্তের প্রকৃত তত্ত্বের সত্যতা ও সেই সত্যের প্রতি মানুষের মনে বিশ্বাস জাগ্রত হলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন সম্ভব এবং সেই সত্য জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের অন্তরের আবরণ দূরীভূত হয়ে যে অনন্ত শক্তি রয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ সম্ভব। তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে - যার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্ভব হয় এবং সামাজিক মূল্যবোধও জাগ্রত হয়।

উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে যে কয়েকজন মহান ব্যক্তি আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম।তিনি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চেতনার সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষপাতি ছিলেন।কারণ তিনি জানতেন যে, ভারতবর্ষের নিরিখে ধর্মকে বাদ দিয়ে, আধ্যাত্মিক চেতনাকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবল পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান চেতনার উপর নির্ভর করে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করলে তার সাফল্য সুদূর প্রসারিত হবে না। তাঁর মতে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা মানুষকে যুক্তিবাদী আত্মনির্ভর করে তোলে, আর ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশসাধনের মধ্যে দিয়ে মূল্যবোধ, নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান করে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান ভিত্তিক যন্ত্রচালিত আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তিকে যুগোপযোগী করে তুললেও মূল্যবোধ, নৈতিকতাকে অবলুপ্ত করে ব্যক্তিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে এবং ব্যক্তির পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত শিক্ষার দ্বারাই প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে এই দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করে পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব। এই প্রেক্ষিতে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার গুরুত্ব যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি সুদূর প্রসারিত।

প্রসঙ্গতঃ স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সংস্কৃত ভাষায় আমরা দয়া, ধর্ম ও দান এই তিনটি শব্দ পাই যা নৈতিক গুণের অন্তর্গত।এই নৈতিক গুণগুলিকে অস্বীকার করে নিজেকে কেবল ভালবাসার নাম স্বার্থপরতা। এই আত্মকেন্দ্রিক ভালবাসা সংকীর্ণ। সুতরাং এটি বন্ধন ও অন্ধকারের নামান্তর। নৈতিক গুণগুলি অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রেম ও মৈত্রী, যা মনের সংকীর্ণ অন্ধকারকে দূর করে আত্মবিশ্বাসের দ্বার উন্মুক্ত করে, নিজের ব্যক্তিত্বকে আশাদীপ্ত, সতেজ ও বলীয়ান করে। সূর্য যেমন দোষী ও নির্দোষী সকল মানুষের উপর নির্বিচারে কিরণ বর্ষণ করে; প্রত্যেক

মানুষেরও তেমন উচিত জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রাণীকে ভালবাসা ও তাদের উপকার সাধন করা; আর তাহলেই নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণতায় আধ্যাত্মিকচেতনার দ্বার যেমন উন্মুক্ত হবে তেমনি সামাজিক মূল্যবোধও জাগ্রত হবে।[৩]কিন্তু প্রশ্ন হল মূল্যবোধ কী? মূল্যবোধ কিভাবে জাগ্রত হবে? স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন?

ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যবোধ বলতে সাধারণতঃ নৈতিক মূল্যবোধ বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে বোঝায়। যে কোন সমাজের সামাজিক উন্নতির জন্য এই মূল্যবোধ বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তাই বলা হয় – 'Moral values of a society is the backbone of that society'।[৪] অবশ্য নৈতিক মূল্যবোধ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধের কথা পাওয়া যায়, যেমন রাজনৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি। কিন্তু যে কোন মূল্যবোধের ভিত্তি হল আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ।

মূল আলচ্যবিষয় : মুল্যবোধ বলতে পাশ্চাত্য দর্শনে 'Value' এই শব্দের দ্বারা বোঝান হয়, যা প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়না। পাশ্চাত্যের কোন কোন চিন্তাবিদ মনে করেন মানুষ জিনগতভাবে মূল্যবোধের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জীব বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিনস্ তাঁর 'দি সেলফিস জিন' গ্রন্থে বলেছেন যে, অন্যান্য প্রাণীদের মত মানুষও জিন দ্বারা গঠিত এক যন্ত্র বিশেষ। জিনগতভাবে দেখলে দেখা যায় যে মানুষ মাত্রই স্বার্থপর। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কখনও কখনও আমরা স্বার্থপরহীনতার ভান করি। ফলে মূল্যবোধের কোন ধারণা মানুষ জিন থেকে পায়না। এই চিন্তার মূলে রয়েছে জড়বাদের প্রবল প্রভাব। ক্ষুদ্র আত্মবুদ্ধির মধ্যেই মানুষকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চেতনায় সর্বজীবের কল্যান বা পরার্থপরতার কথা বারবার পাওয়া যায়। মূল্যবোধ জড়বাদ ও আধ্যাত্মবাদের মধ্যে সেতুবন্ধন করে। এই মূল্যবোধই মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার উপলব্ধি জাগায়। মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে করুণা, ভালবাসা, সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়। এবং মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনার উদয় হয়।

কিন্তু বর্তমান সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের যে অবক্ষয় তার একটি মূল কারণ হল ধর্মহীন বিজ্ঞান নির্ভর তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি। পাশ্চাত্যের মানুষ বিজ্ঞান নির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত বলেই যে তাদের মধ্যে মূল্যবোধ বা নৈতিকতা নেই এমনটি নয়। বরং পাশ্চাত্যের মানুষের ব্যবহারিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা আমাদের থেকে অনেক বেশি, সামাজিক দায়বদ্ধতাও বেশি। এই প্রসঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞান মানব সমাজকে কতটুকু শিক্ষা দান করেছে সেই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাশিয়ান দার্শনিক প্রিন্স ক্রোপোট্নিক বলেছেন, "বর্তমান বিজ্ঞানের দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। একটি মানুষকে দিয়েছে মূল্যবান নিরহংকার বিনয়ের শিক্ষা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার তুলনায় মানুষ

কত ক্ষুদ্র, কত অসহায় – একথাই মানুষ শিখেছে বিজ্ঞানের কাছ থেকে, যাতে তার সীমাবদ্ধ অহঙ্কারের গণ্ডী গেছে ভেঙে, বুঝেছে বিরাট বিশ্বেরই একটি কেন্দ্রবিশেষ সে – স্রষ্টা ভগবানের একান্ত আকর্ষণের বস্তু। বিজ্ঞানই মানুষকে শিখিয়েছে যে ঈশ্বরকে ছেড়ে দিলে স্বতন্ত্র সত্তা তার অতি তুচ্ছ, 'তুমি' অর্থাৎ ভগবান ছাড়া ক্ষুদ্র 'আমি'-র অস্তিত্ব অর্থহীন একেবারে। আবার অপরদিকে আত্মচৈতন্যের উদ্বোধন করে বিজ্ঞানই মানুষকে শিখিয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত শক্তিকে কাজে লাগাতে যাতে ক্রমোন্নতির পথে সে হতে পারে অনন্তশক্তিশালী।পাশ্চাত্যে ধর্মের বহিঃপ্রকাশ যতটা বাইরে প্রতিফলিত হয়েছে, তার থেকে কাজে প্রতিফলিত হয়েছে অনেক বেশি।অর্থাৎ আচরণে নৈতিক মূল্যবোধ আছে, নৈতিকতা আছে; কিন্তু নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পিছনে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি নেই, আধ্যাত্মিকতার বিশ্বাস নেই। নৈতিকতাকে সার্থক করতে হলে, মূল্যবোধকে স্থায়িত্ব দিতে চাইলে তার পিছনে একটি সচেতন আধ্যাত্মিক চেতনা দরকার। বিবেকানন্দের মতে একমাত্র ধর্মের দ্বারাই সম্ভব আধ্যাত্মিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা। তাই আধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রশংসা করলেও তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন "যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয় তবে উহা আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই সমূলে বিনষ্ট হইবে। ...জড়শক্তির লীলাভূমি ইউরোপ যদি নিজ সম্পদের ভিত্তি পরিবর্তন করিয়া আধ্যাত্মিকতার উপর স্থাপিত না করে, তবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে"।[৫]স্বামীজীর এই উক্তি কতটা সত্য ও বাস্তব - তা বর্তমানে পাশ্চাত্যে দেশগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

স্বামীজী যেমন বিজ্ঞান নির্ভর পাশ্চাত্যকে সাবধান করেছিলেন তেমনি বিজ্ঞানশক্তিকে আশ্রয় করে তার দুষ্ট প্রভাব প্রাচ্য জীবনেও ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে তারই হুঁশিয়ারী দিয়ে ভারতবাসীকে বলেছিলেন, "তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তাহা হইলে তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙ্গিয়া যাইবে, যে ভিত্তির উপর সুবিশাল জাতীয় সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া যাইবে, সুতরাং ফল দাঁড়াইবে সম্পূর্ণ ধ্বংস"।[৬] সুতরাং প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্য সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তিছিল ধর্মকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি হলেও সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। সমাজের উন্নতি তখনই সম্ভব যদি ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ঘটে, আর সেক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তাই স্বামীজী বলেছেন ধর্মকে বাদ দিলে " ...জগৎ থেকে সমস্ত আধ্যাত্মিকতা দূর হয়ে যাবে, সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ বিলুপ্ত হবে, ধর্মের প্রতি সমস্ত মধুর সহানুভূতির ভাব চলে যাবে, সবরকম আদর্শবোধ নষ্ট হয়ে যাবে..."।[৭] স্বামীজীর মতে ধর্মই হল আধ্যাত্মিকতার ভর কেন্দ্র। ধর্মকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি যেমন সম্ভব নয় তেমনি মূল্যবোধের প্রকৃত জাগরণ সম্ভব নয়।প্রসঙ্গত স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী বক্তৃতায় উইল ডুরান্ট বলেছিলেন যে, স্বামী

বিবেকানন্দ তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলছেন "আমরা চাই সেই ধর্ম যা মানুষ তৈরী করে... দুর্বলকারী অতীন্দ্রিয়বাদগুলো পরিত্যাগ করো, সাহসী হও... পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের জন্য... অন্যান্য সব অর্থহীন দেবতা আমাদের মন থেকে বিদায় নিক। একমাত্র দেবতা যিনি জাগ্রত সে আমাদের জাতি – সর্বত্র তাঁর হাত, সর্বত্র তাঁর পা, সর্বত্র তাঁর কান; তিনি সর্বব্যাপী... । আমাদের চারদিকে যাঁরা আছেন তাঁদের পূজা সর্বাগ্রে প্রয়োজন... . এঁরাই আমাদের ভগবান, এঁরা সকলে – মানুষ এবং ইতর জীবজন্তুরা; এবং প্রথম আমাদের যে দেবতাদের পূজা করতে হবে তাঁরা হলেন আমার স্বদেশবাসী"[৮]।

স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার প্রথম কথাই হল "মানুষ গড়ে তোলা" এবং তার মাধ্যমে সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা। কিন্তু বর্তমানের শিক্ষা পদ্ধতি প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলতে পারে না, কারণ শিক্ষা ব্যাবস্থার উপর একটা অনাস্থামূলক নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশিত হয়ে চলেছে, যে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষা ভয়াবহ। তাই স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে যা মানুষের মধ্যে সৎ আদর্শ ও ভাবগুলি সুনিপুণভাবে প্রকাশিত হতেও পারে, যার দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত চরিত্র ও জীবন গঠিত হতে পারে। আমাদের ভুল চিন্তাভাবনা ও ভুল জীবনযাপনের জন্য আমাদের মধ্যে যে দেবত্ব আবৃত হয়ে রয়েছে তাকে জাগ্রত করতে হবে, বৈদিক সত্ত্বার বিকাশ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী স্মরণ করিয়ে দিলেন – "Each soul is potentially divine"[৯]। প্রথম থেকেই প্রত্যেকের মধ্যে দেবত্ব বর্তমান, তাকে জাগ্রত করতেই তিনি বারেবারে অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপিত করেছেন, সম্বোধন করেছেন – 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে। জন্ম থেকেই তোমাদের মধ্যে সুপ্তভাবে রয়েছে অনন্ত শক্তি, অনন্ত সম্ভাবনা, দিব্যচেতনা। তার উন্মেষ সাধনের মাধ্যমের আত্মমুক্তির দিকে এগিয়ে যাও।

তিনি মনে করতেন কেবল আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে কখনও মুক্তি আস্তে পারে না, বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়ের মাধ্যমেই সামাজিক উন্নতি ও অসাম্য দূরীকরণসহ প্রকৃত মুক্তি আসতে পারে যদি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের যথার্থ উপলব্ধি তখনই সম্ভব যদি ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ঘটে, আর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য চাই শিক্ষা, প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষাই মনের অন্ধকার দূর করে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত পূর্ণতা বিকাশের সহায়ক হবে এবং মানুষের অন্তরে আছে যে ব্রহ্মত্ব তারই প্রকাশ হবে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন যে, সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, যার দ্বারা মানুষের সৎবুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি সঠিকভাবে বিকশিত হয়ে সৎভাবে চালিত হয়। প্রকৃত শিক্ষা হল, যে শিক্ষা মানুষের অন্তরে নিহিত পশুত্বকে বিনাশ করে দেবত্ব প্রকাশের সহায়ক হয়। তিনি চাইতেন সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি মানুষ নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখে মাথা উঁচু করে এই পৃথিবীতে বাঁচুক।

মানব জীবন তথা সমাজের মঙ্গল তখনই সম্ভব যদি ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ঘটে, সেক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধ বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আধুনিক প্রযুক্তিও মানব জীবনের মঙ্গলার্থে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হবে না, যদি না সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রত্যেক মানুষকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায়।

স্বামীজী মতে শিক্ষার "মূল লক্ষ্য" – চরিত্র গঠন ও মানুষ তৈরী করা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় যেভাবে প্রতিযোগিতা মূলক মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে শিক্ষার লক্ষ্য যে চরিত্র গঠন, মানুষ তৈরী করা, তা ব্যহত হচ্ছে এবং সমাজের প্রকৃত উন্নতিও বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। কারণ আধুনিক শিক্ষার প্রধান ত্রুটি দুটি –শ্রদ্ধার অভাব ও নৈতিকতার অভাব। অথচ শ্রদ্ধা না থাকলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, আর নৈতিকতার অভাবে শিক্ষার মাধ্যমে 'মানুষ' তৈরীও সম্ভব নয়। তাই স্বামীজী বলেছেন সমাজের উন্নতি জন্য ছাত্র-সমাজকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তার অন্তরে নিহিত আছে যে দেবত্ব তার প্রকাশ হয়, আর তা যদি সম্ভব হয় তাহলে মানুষের মনুষ্যত্ব, নৈতিকতা, সততা ও দৃঢ় চরিত্র গঠন সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে স্বামীজী শিক্ষার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে দেবত্ব প্রথম থেকে বিদ্যমান তারই প্রকাশ"[১০]। কিন্তু শিক্ষা মাধ্যমের কিভাবে দেবত্বের প্রকাশ হতে পারে? স্বামীজীর মতে প্রত্যেক কাজের শেষে সংস্কারসমূহই অবশিষ্ট থাকে এবং সেগুলো মনের মধ্যে জমা হতে থাকে। এইভাবে সংস্কারসমূহ জমা হতে হতে সেগুলো একত্রিত হয়ে অভ্যাসে পরিণত হয়। মানুষের স্বভাব ঐ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যদি আমাদের বর্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাসবশতই হয়ে থাকে তাহলে আমরা যখন ইচ্ছা ঐ অভ্যাস দূর করতে পারি। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন কায়িক বাচিক মানসিক ভাবে সৎ হওয়া। কারণ আমরা যে কাজ করি, যা বলে থাকি এবং যা ভাবি - সেগুলো আমাদের মনের মধ্যে একটা ছাপ (Impession) রেখে যায়, সংস্কারগুলো তাদেরই সমষ্টি। আমাদের চরিত্র সেই অভ্যাস জনিত সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপ। আমাদের মনের মধ্যে যে অসৎ অভ্যাসের সংস্কার সমষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে সেগুলোকে সৎ অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রন করতে হবে। এইভাবে নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে অসৎ সংস্কার দূরীভূত হয়ে সৎ অভ্যাসের সংস্কার সমষ্টিবদ্ধ হয়ে সৎ চরিত্র গঠিত হবে এবং ক্রমশ মানুষের ভিতর যে দেবত্ব পূর্ব থেকে বর্তমান তার পূর্ণবিকাশের পথ প্রশস্থ হবে। যদিও অনেকের মতে এটি সম্ভব নয়, কারণ মানুষ হিসাবে আমরা দেবত্বের চরম অবস্থায় নিজেদের উন্নীত করতে পারি না। আবার কেউ কেউ মনে করেন এটি সম্ভব, কারণ আমরা মূলত পরমাত্মার আদলেই সৃষ্ট, আমরা একই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। দেবত্বই হল মানুষের প্রকৃত স্বরূপ।

শিক্ষার আধুনিকতার বার্তায় স্বামীজী যুবসমাজের মধ্যে যে দেবত্ব সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যা সকল প্রাণীর প্রকৃত স্বরূপ তা শিবজ্ঞানে জীবসেবার মধ্য দিয়ে জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ করলেন, উদ্বুদ্ধ করলেন দিব্য চেতনায়, সাধারণকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সর্বোচ্চ মর্যাদায়, 'দেবত্বে' –এই পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীকে

বললেন – "Arise, Awake and Stop not still the goal is reached"[১১]। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হতে পারে যদি নেতিবাচক ভাবনাগুলোকে দূর করে ইতিবাচক শিক্ষার মাধ্যমে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়, অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা যুবসমাজকে শিক্ষিত করা যায়, তাহলেই মানুষের ভিতর যে দেবত্ব পূর্ব থেকে বর্তমান তার পূর্ণবিকাশের সম্ভব হবে এবং সমাজের মূল্যবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

স্বামী বিবেক্‌নন্দ চারিত্রিক এবং নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর গিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছিলেন। স্বামীজী তাঁর জীবনের আদর্শরূপ লক্ষ্য ভারত ভগিনী নিবেদিতার কাছে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলেছেন " মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে"। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে যদি মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল না হতে পারে তাহলে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা গ্রামের জন্য পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলেই দেখা যাবে যে, কিছু ব্যক্তি শিক্ষাকে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের জন্য নিজেদের মতো করে ব্যবহার করেছে যুগের পর যুগ,আর সাধারণ মানুষ পিছিয়ে পড়েছে সময়ের সাথে সাথে। বিবেকানন্দ সমাজের এই ত্রুটিপূর্ণ অসাম্যের কথা মনে প্রাণে অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন 'সত্যিকার জাতি – যারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে'। তিনি মনে করতেন যদি কাকেও অধিক, কাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্বলের অধিক সুবিধা দিতে হবে তাহলেই সমাজের মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর হয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। শিক্ষাই একমাত্র উপায় যা সমাজের মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাই স্বামীজীর মতে বাস্তব শিক্ষা ব্যতীত কোনও জাতির তথা সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়[১২]।

স্বামীজীর মতে সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন দেশের সর্বত্র নারীশিক্ষার বিস্তার। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "নারীজাতির উন্নতি এবং জনমার্গের জাগরণ–এই দুটিরই প্রয়োজন সর্বপ্রথম এবং তখনই দেশের মধ্যে তথা সমগ্র জগতের প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে"। তিনি বুঝেছিলেন যে, সমাজের বিকৃত মূল্যবোধের কারণ হল স্ত্রী শিক্ষার অবনতি, যা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। তাঁর মতে মা যদি শিক্ষিত না হয় তবে সন্তান কিভাবে শিক্ষিত হবেন, সমাজের আদর্শ হয়ে উঠবে। মায়েরাই প্রত্যেক সন্তানের প্রথম শিক্ষক বা শিক্ষাগুরু। মায়ের স্বাভাবই এক শিশুর মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, যা তিনি নিজের জীবনের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন যে তাঁর জ্ঞানের বিকাশের জন্য তিনি তাঁর মায়ের কাছে কতটা ঋণী।

নারীশিক্ষার ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা – মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার না হলে কিছুই হবার নয়। শুধু তাই নয় তাঁর কাছে ভারতীয় নারীর সংজ্ঞা ছিল–পরম শুদ্ধ স্বভাবা, পতি পরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মত হওয়া, তাই তিনি বলেছেন–"আর কোন পৌরাণিক কাহিনীতে এমন কোনো চরিত্র নেই যা সীতার আদর্শের মতো সমগ্র জাতির জীবনে পরিব্যপ্ত হয়েছে।... ভারতে যা কিছু সৎ, বিশুদ্ধ ও পবিত্র, সীতা হচ্ছে তারই নাম"[১৩]। শুদ্ধ সভাব সম্পন্ন আদর্শ নারী যখন একজন সন্তানের মা হন তখন তার সেই শুদ্ধ সভাব তার সন্তানের মধ্যে প্রতিফলিত হবেই – এই ছিল বিবেকানন্দের বিশ্বাস। শুদ্ধ সভাবের বিকাশের জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার। তাই তিনি বলেছেন পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। মা যদি শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন তাহলেই তার হাত ধরেই তৈরী হবে ভবিষ্যত যুবসমাজ, প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিককল্যাণ, নৈতিক মূল্যবোধ।

উপসংহার : আধুনিকতার প্রতিযোগীতায় সমাজ তার নিজস্ব পথ ধরে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, চলবেও। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উত্থান পতনের মধ্যে সমাজের সামাজিক মূল্যায়ন নানা কারণে বাধা প্রাপ্ত হয়ে চলেছে, সেখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিষেধ অনেক – তার পরিমার্জনা বহু দূরের কথা, বরং পরিমার্জনের কোন সম্ভাবনাই নেই। সামাজিক পরস্থিতি এমন হওয়ার জন্য মূল্যবোধ ক্রমশঃ হারিয়ে যাওয়াই কি কারণ? আসলে মূল্যবোধটাই মনুষ্যত্ববোধ, যা সকল দেশের সকল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, হয়তো তার সংখ্যাটা কম হয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনার একটি ধারাবাহিক কাঠামো বর্তমান, সামাজিক শৃঙ্খলা বর্তমান সেহেতু বলা যায় যে মূল্যবোধ এখনও সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় নি। সমাজে কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বর্তমান, যা সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে চলার পথ দেখায়। আর ঠিক এখানেই স্বামী বিবেকানন্দের বানী ও রচনার বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর বানী ও রচনার নিরন্তর চর্চার প্রয়োজন, যা ভবিষ্যত যুবসমাজকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। তাই দেশকে উজ্জীবনের জন্য স্বামীজী যুব সমাজকে ডাক দিয়েছিলেন। কারণ সমাজের প্রতিটি অন্যায় বা কুসংস্কারের প্রতি যুব সমাজই প্রথম প্রশ্ন তোলে, সমাধানের প্রশ্নে তারাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই যুব সম্প্রদায় এখনও রয়েছে তেমনই সজীব, প্রয়োজন শুধু জ্ঞানের খানিক আলো তাদের মনে জ্বালিয়ে তোলা। সে জ্ঞান হবে দেশ বিষয়ক, সমাজ বিষয়ক, শিক্ষা বিষয়ক এবং পরহিত বিষয়ক।

তথ্য সূত্র:

১. 'By the term 'Socialization' we mean the process by which individual develops into a functioning member of the group according to its standards, conforming to its modes, observing its traditions and adjusting himself to the social situations. Cultural Sociology, Gill & Gill, p. 112
২. সার্ধশত জন্মজয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, ২য় খণ্ড, শাশ্বত নির্ভিক পথিক, সম্পাদক শ্রী সুশান্ত দত্ত, পৃঃ ৮৯।
৩. স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, অভেদানন্দ দর্শন, পৃঃ ১৬১।
৪. ভারতীয় দর্শনে মূল্যবোধ ও বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা, The changing system of values and present socity, Suparna Ghosh, p. 60
৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃ.১৯৫
৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃ.৪০১
৭. Complete work of Swami Vivekananda, Advata Ashram, Calcutta, 1986. Vol. IV, P – 318
৮. সার্ধশত জন্মজয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, ২য় খণ্ড, শাশ্বত নির্ভিক পথিক, সম্পাদক শ্রী সুশান্ত দত্ত, পৃঃ ৮৮।
৯. Complete work of Swami Vivekananda, Advata Ashram, Calcutta, 1986. Vol.I, P – 124
১০. স্বামীজীর বানী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩২৫
১১. Complete work of Swami Vivekananda, Advata Ashram, Calcutta, 1986. Vol.III, P – 430
১২. রাজেশ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ, সার্ধশত জন্মজয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, ২য় খণ্ড, শাশ্বত নির্ভিক পথিক, সম্পাদক শ্রী সুশান্ত দত্ত, পৃঃ ৩৩১।
১৩. রামায়ণ,বিবেকানন্দের রচনা সমগ্র,১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৩।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ(সম্পাদনা), কলিকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউড অব কালচার, ২য় সং, ১৯৮৮।

২. সেনগুপ্ত, পূর্বা, স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা, গোলপার্ক, কলিকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউড অব কালচার, ২০১১।
৩. স্বামী বিবেকানন্দ, জাতি সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র, কোলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম সংস্কার, ১৯৮৬।
৪. স্বামী গোম্ভীরানন্দ, যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৮৭।
৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬৪।
৬. সার্ধশত জন্মজয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, ২য় খণ্ড, শাশ্বত নির্ভিক পথিক, সম্পাদক শ্রী সুশান্ত দত্ত, চারু প্রেস, কলিকাতা ৫৪।

রাঢ়ের কবিগান ও মহাভারতের কৃষ্ণ মাহাত্ম্য

সুবীর ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: দ্বন্দ্বমূলক চাপান-উতোরের গান কবিগান। প্রাচীন কবিগান সখীসংবাদ, ভবানীবিষয়ক, বিরহ, লহর ও খেউর – এই পাঁচটি পর্ববিন্যাসে গীত হলেও, আধুনিক কবিগান পালাকেন্দ্রিক গান। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রসঙ্গের দ্বন্দ্বমূলক কোনো একটি বিষয়কে অবলম্বন করে শুরু দুই প্রতিপক্ষ কবিয়ালের সংগীত-সংগ্রাম। আর এক্ষেত্রে পালা নির্বাচনে এমন বিষয়কে গ্রহণ করা হয়, যেখানে দুটি চরিত্রই হয় ভিন্ন ও প্রতিমুখী। তাহলেই জমে উঠবে কবিগানের লড়াই। রামায়ণ কেন্দ্রিক কবিগানে দুটি পক্ষ – রামপক্ষ ও রাবণপক্ষ। রামায়ণ কেন্দ্রিক প্রায় প্রত্যেকটি পালাই এসে দাঁড়ায় রাম-রাবণের দ্বন্দ্বে। আর সেখানে প্রবল দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও টানাপোড়েন থাকলেও, অধিকাংশ পালায় 'নবদূর্বাদলঘনশ্যাম' রামের প্রতি নীরব আত্মনিবেদন দিয়েই কবিগান শেষ হয়। অন্যদিকে মহাভারত কেন্দ্রিক কবিগানের পালায় কৃষ্ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলেও, এখানে আত্মনিবেদন অপেক্ষা তীব্র লড়াই ও বিদ্রূপের সুরই যেন বেশি। তাছাড়া মহাভারতের ব্যপ্তি অনেক বেশি হওয়ায় কৃষ্ণ বর্জিত পালার সংখ্যাও অনেক বেশি। কেননা মহাভারতে দ্রোপদীর স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণের প্রথম আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই মহাভারতের কাহিনি ক্রমপ্রসারিত। তবে রামায়ণ-মহাভারত – দুটি মহাকাব্যকেই কবিয়ালরাও বিশেষ প্রতীকধর্মিতার চোখেই দেখেন। পার্থক্য শুধু এক জায়গায় রামায়ণ যেমন আর্য জয়গাথা, মহাভারত আসলে অনার্যের বুদ্ধির জয়।রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি মুনি আর্য। অন্যদিকে অনার্য কন্যা সত্যবতীর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ছিলেন অনার্য। অনার্যের হাতে সৃষ্ট মহাভারতে যে আর্যায়ণ হবে না সেটাই স্বাভাবিক। কৃষ্ণ তো অনার্য শক্তির আধার। বেদের ধর্ম আর্যদের ধর্ম, আর কৃষ্ণের ধর্ম অনার্যের। রামায়ণেঅনার্য শক্তির পুরী লঙ্কায় আর্যের জয় হয়েছে, আর কুরুক্ষেত্র কৃষ্ণবিরোধী কুরুকুলের ক্ষেত্র, যেখানে কৃষ্ণভক্ত জয়লাভ করেছে। কৃষ্ণ যুদ্ধে অংশ না নিয়েও অলক্ষ্য থেকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ তো কালো মানুষের বুদ্ধির প্রাখর্যের জয়। প্রকারান্তরে অনার্যের জয়। তাই রাঢ়ের কবিয়ালরা মহাভারতের লোকায়ত মৌখিক এবন অভিজাত লিখিত আখ্যানের সাযুজ্য রচনা করে কৃষ্ণমহিমাকে অন্য এক স্তরে নিয়ে যায়। আর এখানেই রাঢ়ের কবিগান অনন্য।

সূচক শব্দ: সখীসংবাদ, লহর, খেউর, প্রাখর্য, লোকায়ত, স্বয়ম্বর।

বাঙালি মাত্রেই মহাভারতের কৃষ্ণ মহিমা এবং গীতার আধ্যাত্মিকতাকেই বোঝেন। যদিও ভাগবত গীতাকে অনেকে মহাভারতের পরবর্তী সংযোজন বা প্রক্ষিপ্তবলার পক্ষপাতি। সেযাইহোক, শাস্ত্রগ্রন্থ ও মহাকাব্য হিসাবে বাঙালির কাছে মহাভারত আদরণীয় ঠিকই, কিন্তু মহাভারতের আখ্যান ও নীতিবোধের সঙ্গে বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতি, নীতিবোধ, ন্যায়দণ্ড কোথাও যেন মেলে না। কুন্তী, দ্রোপদী, রুক্মিণী, সত্যবতীর কাহিনি অথবা ব্যাস, ভীম, বিদূর, কর্ণ প্রমুখের জন্মবৃত্তান্ত, ক্ষেত্রজ সন্তান তত্ত্ব, বহুপতি গ্রহণ, কানীন মাতৃত্ব, এমনকি কৃষ্ণের কূটকৌশলও বাঙালি জীবনাদর্শের কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয় বলেমনেহয়। ঠিক এই কারণেই মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণঅনেক বেশি আপন বাঙালিরকাছে। তবে এই ক্ষেত্রে মহাভারতের কৃষ্ণমহিমা এবং তাঁর ঐশ্বর্যরূপকে গ্রহণ করে বাঙালি যেন খানিকটা তৃপ্তি খুঁজে পান। এই কারণেই সমগ্র বাঙালিদের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ়ের কবিওয়ালারা কৃষ্ণের অপার্থিব লীলামাধুর্যকে আস্বাদন করে এবং পরিবেশন করে আনন্দ খুঁজে পান। আর এখানে মহাভারতের কৃষ্ণের সঙ্গে ভাগবতের কৃষ্ণ যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কোথাও কোথাও আবার মহাভারতের কৃষ্ণকে ছাপিয়ে ভাগবতের কৃষ্ণই মুখ্য হয়ে ওঠে। আসলে বাঙালি জীবনে ভাগবতের প্রভাব অসীম । আর সেই প্রভাবকে কবিওয়ালরাও অতিক্রম করে যেতে পারেন না। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই কৃষ্ণ কে ? তিনি মথুরার রাজা। বাসুদেব-দেবকীর পুত্র । তিনি মগধরাজ জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি মহাভারতের যুদ্ধের হোতা। তিনি বিষ্ণুর অবতার হয়েও এই মর্ত পৃথিবীরই মানুষ। তবুও তিনি দেবোচিত গুণাবলির অধিকারী। তাঁর সঙ্গে মিশেছে বৈদিক সূর্যদেবতা, উপনিষদের বাসুদেব, ব্রাহ্মণ ও মহাভারতের নারায়ণ।[৭]মহাভারতের আদিপর্বেই বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষ ও ভগবান বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ছিলেন অর্জুনের সমবয়স্ক তথা সখা। তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের রাজন্যবৃন্দ পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মত্ত থেকে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যপ্রয়াসকে করেছিলেন সুদূরপরাহত। সর্বভারতীয় এক রাষ্ট্রগঠনের মনোভাব বা দূরদর্শিতা তাদের ছিল না। বলা হয়ে থাকে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতে একটি দৃঢ় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে যুধিষ্ঠিরই ছিলেন সেই প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের কর্ণধার হওয়ার পক্ষে সবদিক থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি। দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ।

অন্যান্য লোকজ সংগীত অপেক্ষা কবিগানে কিছুটা হলেও মহাভারতের কৃষ্ণের দুর্বল জায়গাগুলি উঠে আসে। কেননা কৃষ্ণের বিপক্ষে কবিগান করতে নেমে কবিয়ালরা এমন সব যুক্তি পরিবেশন করে কবিগান করেন, তাতে কৃষ্ণচরিত্র কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে পড়ে। আর ঠিক তখনই কৃষ্ণপক্ষাবলম্বী কবিয়ালকে ভাগবতের কৃষ্ণের শৌয-বীর্য, ঐশ্বর্য, ঈশ্বরত্বকে এনে ড্যামেজ-কন্ট্রোল করতে হয়। কেননা আমরা জানি মহাভারতের কৃষ্ণের দেবত্ব অপেক্ষা মানবত্বই বেশি। তথাকথিত ধর্মরাজ্য স্থাপনের অছিলায় যে ধ্বংসযজ্ঞ তিনি রচনা করেছিলেন, কূটনীতি ও রাজনীতির অপূর্ব মেলবন্ধনে যেভাবে

কাঙ্ক্ষিত বাসনাকে চরিতার্থ করেছিলেন, সুদক্ষ সারথ্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির মাধ্যমে যেভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, সেখানে হয়তো কৃষ্ণ নায়কত্ব দাবি করতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনায় কৃষ্ণকেই মহাভারতের নায়কপদে অভিষিক্ত করেছেন। কেননা তিনি পাণ্ডবদের জয়ের কাণ্ডারি। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবরা জয়লাভ করলে কি শকুনিকে নায়ক বলা যেত? অন্যদিক থেকে বলতে হয়, কৃষ্ণ কুরুবংশ ধ্বংস করতে যতটা সক্রিয়, যদুবংশের ধ্বংস আটকাতে কি ততটাই দক্ষ ছিলেন? আধুনিক মনোভাবাপন্ন কোনো কবিয়াল এ প্রশ্ন আসরে তুলতেই পারেন। কিন্তু কবিগানের আসরে তা যদি কেউ তোলে তা শুধু ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজে বাসুদেব কৃষ্ণ কেবল মহাভারতের কূটকৌশলী রাজনীতিজ্ঞ বা রণনিপুণ সেনাধ্যক্ষ নন, - তিনি সচ্চিদানন্দ, পরমব্রহ্ম, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পরমেশ্বর ভগবান। আর এই মিথটিই কবিগানের কেন্দ্রস্থলে থেকে সমস্ত কবিয়ালদের ভগবান কৃষ্ণের প্রতি আত্মনিবেদনে উদবোধিত করে থাকে। তাই মহাভারত কেন্দ্রিক কবিগানের পালায় বারবার ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণ এসে ভিড় করে। সুতরাং কৃষ্ণ যে পক্ষের অভিভাবক সে পক্ষের ত্রুটি যে ধরার নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই কারণেই মহাভারত কেন্দ্রিক পালার প্রারম্ভে অনেক কবিয়ালকেই 'ধরণগানে' গানে গাইতে শোনা যায় –

মহাভারত মহাতত্ত্ব কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র
যার যেমন কর্ম, সে তেমন ফল পায়।
ভক্তি রেখে গুরুপদে যে নেমেছে জীবন-যুদ্ধে
তার পক্ষে জয় সুনিশ্চয়।।
ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধমন শত কামনা তার পুত্রগণ
কুমতি হয় তাদের জননী।
ভীষ্ম আর দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য
অহংকার-অধৈর্য জয়দ্রথ-শকুনি।।
এঁরা ছয়জন ষড়রিপু ক্ষয় করে নরবপু
হিংসা-নিন্দা এঁদের আচরণ।
কুন্তী-মাদ্রীর ভক্তিগুণে দৈব শক্তি এলো নেমে
পঞ্চপ্রাণ স্বরূপে এনে পঞ্চপাণ্ডব হন।।
পাণ্ডবের অন্তর শুদ্ধ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির যুদ্ধ
পিতৃস্বত্বা রক্ষার কারণ।
রণ-নদী করতে পার কৃষ্ণ হয়েছেন কর্ণধার
পার করতে ভক্ত পাণ্ডবগণ।।

মহাভারত অমৃতকথা শুদ্ধভক্তি বীজের লতা
ছন্দেগাথায় ব্যাসদেব মনুষ্য শিক্ষা দিতে।
অন্তর যাদের ভক্তিহীন দুর্ভোগ তাদের চিরদিন
ধর্মের জয় চিরকাল এই পৃথিবীতে।।
এই কাব্যসুধা করলে পান হবে তাদের দিব্যজ্ঞান
কাটবে তাদের ভবের বন্ধন।
না জেনে এই তত্ত্ব বিষয়-বিষে হন মত্ত
নরাধম এই দীন কাঞ্চন।।[২]

রামায়ণের মতো মহাভারতেও কবিয়ালরা রূপকের দিকটিকে ধরতে চেষ্টা করেন। রামায়ণকে যেমন অনেক কবিয়াল আর্য-অনার্য বিরোধের আধুনিক দৃষ্টিতে দেখার সাহস করেন, পাশাপাশি মহাভারতেও তথাকথিত নেতিবাদী চরিত্রের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে মহাভারত কেবল কৌরব-পাণ্ডব দ্বন্দ্বে সীমাবদ্ধ না থেকে কৃষ্ণকথা অর্থাৎ কালো মানুষদের (অনার্য বিজয়কথা) বীরত্ব গাথায় পরিণত হয়। তবে কবিগান যেহেতু দ্বন্দ্বমূলক সংগীত-সংগ্রাম, সেহেতু কবিগানে দুটি বিরুদ্ধ মতাদর্শ ক্রিয়াশীল। সেখানে একটি মতাদর্শ জয়লাভ করে, অন্যটির পরাজয় হয়। এমনকি কৃষ্ণের বিরুদ্ধ পক্ষে কবিগান করে, কৃষ্ণচরিত্রকে কলঙ্কিত প্রমাণ করে কবিয়াল যতখানি জয়তিলক লাভ করেন, তার চেয়েও বেশি জয়মাল্য লাভ করতে পারেন যদি কৃষ্ণের প্রতি গভীর আত্মনিবেদনের প্রকাশ ঘটান। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি কৃষ্ণকেন্দ্রিক সমস্ত পালাই গিয়ে থামে সেই ‘ভক্ত-ভগবান’ পালায়? কবিগানে যুক্তি-তর্ক, বাকবিতণ্ডা যাই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা গিয়ে থামে জনমনোরঞ্জনে। আর এই কারণেই জনরুচির দিকটিকে মাথায় রেখে কৃষ্ণতত্ত্ব ও তাঁর আধ্যাত্মিক দিকটিকে তুলে ধরতে হয়। তাই কবিয়ালদের চোখে পঞ্চপাণ্ডব উপলক্ষ মাত্র। তা আসলে মানুষের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের উৎস – দৃষ্টি, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ ও ধ্বনি। আর একশ কৌরব হল, মানুষের একশত দোষ, যা নিত্য বা স্বাভাবিক। প্রতি মুহূর্তে এই দোষসকল আমাদের ইন্দ্রিয় সকলকে আক্রমণ করে। কিন্তু কৃষ্ণ সারথি অর্থাৎ চালিকাশক্তি থেকে সেই দোষগুলিকে ধ্বংস করেন। কৃষ্ণ হলেন জীবের সেই অন্তরতম ধ্বনি, জীবের পরমাত্মা, সেই পথপ্রদর্শনকারী আলোকস্তম্ভ, যার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে পারলে, জীবের কোনো চিন্তা থাকে না। তাহলে কর্ণ কে ? তাঁকে হত্যা করতে কেন কপটতার আশ্রয় নিতে হল ? কবিয়ালদের চোখে কর্ণ জীবের বাসনা মাত্র। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মিকতা থাকলেও সে কেবল দোষেরই সঙ্গ দেয়। অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হলেও, নিজেকে সঠিক প্রমাণ করতে সর্বদা বিরুদ্ধ যুক্তি জোগায়। যেমন ভাবে জীবের বাসনা মিথ্যা যুক্তি দিয়ে আত্মতুষ্টিতে মজে থাকে। তাই অনাথবান্ধব কৃষ্ণ-কেশবের প্রতি গভীর আত্মনিবেদনই সর্বোত্তম পন্থা, তা প্রায় সমস্ত কবিয়ালই বলে গেছেন। এ প্রসঙ্গে

কিশোরী ওস্তাদের (দাঁড়কা, বীরভূম) লেখা তেমনি একটি কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য সংকীর্তনের পাঁচালি উল্লেখ করা হল –

অনাথ বান্ধব তুমি হে মাধব।
তোমায় সম্ভাষে যতেক সাধক।।

প্রথম কলি – তুমি হে অচিন্ত্য অনন্ত অক্ষর,
তব যশ গানে দিগন্ত মুখর।
সাকারেতে ঘর কিরণ প্রখর,
অক্ষরে অক্ষরে বিরাট বৈভব।।

দ্বিতীয় কলি – নানা ছন্দে তুমি বিশ্বে আবির্ভূত,
ক্ষিতি আদি পঞ্চ সূক্ষ্ম স্থূলভূত।
তোমাতে সম্ভূত তুমি মূলীভূত,
আদি মহাভূত ওঙ্কারে প্রণব।।

তৃতীয় কলি – পুরুষ আকারে প্রতিটি পুরুষে,
মিশায়ে রয়েছ অতীব চৌরুশে।
পুরুষে পুরুষে প্রকাশ পৌরুষে,
এই মহা ভারত দেশে, ওহে ভবার্ধব।।

চতুর্থ কলি – তব লীলা বিশ্বে অতীব পবিত্র,
প্রতি চিত্ত পটে শোভে তব চিত্র।
সে চিত্র সুচিত্র অতীব বিচিত্র,
নির্মল চরিত্র অতীব গৌরব।।

পঞ্চম কলি - প্রকৃতির ক্ষেত্রে তুমি হে ক্ষেত্রজ্ঞ,
সর্বগর্ব হারি তুমি হে সর্বজ্ঞ।
জানে যত বিজ্ঞ তুমি কেমন বিজ্ঞ,
অজ্ঞ কি অনজ্ঞ আশ্রিত তব।।

ষষ্ঠ কলি - তোমারই চালিত পালিত এ বিশ্ব,
সর্বাশ্চর্যময় নহে তুমি নিঃস্ব।
তুমি গুরু তুমি শিষ্য, স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য,
অপরূপ দৃশ্য হে কৃষ্ণ-কেশব।।

সপ্তম কলি - তব তত্ত্ব বোঝে কার হেন সাধ্য,
সাধ্যবস্তু তুমি সাধনাতে সিদ্ধ।
নতুবা কি সাধ্য, তুমি যে অসাধ্য,
জগত আরাধ্য বাধ্য বিধি ভব।।

অষ্টম কলি - ভক্ত প্রাণধন তিক্ত বিষহারি,
ত্রিদিবে রক্ষিলে গরলে সংহারি।
আলোকবিহারী মুকুন্দ-মুরারি,
প্রেমসুধাহারি শ্রীরাম-রাঘব।।
নবম কলি - আত্মারময়তি শ্রীরামকমল,
কর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বল শ্যামল।
রূপ নির্মল রূপে কর ঝলমল,
কঠিন কোমল তোমাতে সম্ভব।।
দশম কলি - তুমি রসরাজ শ্রীরাসমণ্ডলে,
সঙ্গে লয়ে যত গোপীকা মণ্ডলে।
বনমালা জলে নিবিড় জঙ্গলে,
বিশ্বের মঙ্গলে ব্যস্ত উৎসব।।
একাদশ কলি - কিশোরী কহিছে আমি অতি দীন,
দীনবন্ধু দেখা দিও হে সেদিন।
শমনে যে দিন বাঁধিবে যেই দিন,
পায় যেন এ দীন শ্রীপদপল্লবে।।[৩]

রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের ব্যপ্তি অনেকবেশি। ফলে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের কবিগানের পালার সংখ্যাও অনেকবেশি। তাছাড়া মহাভারতের চরিত্রসংখ্যা এবং তাঁদের ঘাত-প্রতিঘাত রামায়ণ অপেক্ষা অনেকবেশি। কাহিনির বিস্তার এবং বহুবিধ আখ্যানের সংমিশ্রণে মহাভারতের সুবিশাল অবয়ব। ফলে ঘাত-প্রতিঘাতধর্মী এবং দ্বন্দ্বমূলক সমস্ত চরিত্র নিয়েই তৈরি হয় কবিগানের পালা। তবে রামায়ণে যেমন রাম-রাবণের দ্বন্দ্ব এবং সীতাহরণের ফলশ্রুতিই প্রধান কাহিনি বৃত্তে উঠে আসে। মহাভারতে অবশ্য তেমনটা নয়। রাম মাহাত্ম্যকে আত্মস্থ করে এবং 'রাম-রাবণ' পালাটিকে ভালোভাবে তৈরি করতে পারলেই কবিয়ালরা রামায়ণকেন্দ্রিক যে কোনো পালায় কবিগান করতে পারেন। কিন্তু মহাভারত কেবল কৃষ্ণ মাহাত্ম্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা মহাভারতে কৃষ্ণের প্রথম আবির্ভাব দ্রোপদীর স্বয়ম্বর সভায়। সুতরাং তার আগে মহাভারতের একাধিক আখ্যান রয়েছে। এমনকি কৃষ্ণকে বাদ নিয়ে অন্যান্য দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র নিয়েও একাধিক কবিগানের পালার সন্ধান পাওয়া যায়। সেদিক থেকে মহাভারতকেন্দ্রিক রাঢ়ের কবিগানের পালাগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় – কৃষ্ণবর্জিত এবং কৃষ্ণকেন্দ্রিক। কৃষ্ণবর্জিত পালাগুলির মধ্যে শান্তনু-গঙ্গা, ভীষ্ম-সত্যবতী, ভীষ্ম-পরশুরাম, ভীষ্ম-অম্বা, ভীষ্ম-অর্জুন, কর্ণ-অর্জুন, অর্জুন-বভ্রুবাহন, কর্ণ-কুন্তী, দ্রোণাচার্য-একলব্য, কৌরব-পাণ্ডব প্রভৃতি। কৃষ্ণকেন্দ্রিক মহাভারতের পালাও খুব একটা কম নয় – কৃষ্ণ-দুর্যোধন, কৃষ্ণ-গান্ধারী, কৃষ্ণ-প্রভাবতী, কৃষ্ণ-উত্তরা, কৃষ্ণ-কর্ণ, কৃষ্ণ-শকুনি প্রভৃতি। কৃষ্ণবর্জিত পালাগুলি অধিকাংশই বক্তব্য প্রধান বা ঘটনা প্রধান। অন্যদিকে কৃষ্ণকেন্দ্রিক পালাগুলি

অধিকাংশই ভাবপ্রধান। এখানে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কটি কিছুটা হলেও এসে পড়ে। তবে মহাভারত কেন্দ্রিক রাঢ়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় পালা হল, কৃষ্ণ-দুর্যোধন এবং কৃষ্ণ-গান্ধারী। রামায়ণের মতোই মহাভারতেও মূল পালায় প্রবেশ করার আগে কবিয়ালরা ত্রিপদী ছড়ার মাধ্যমে বিষয়পত্তন করে থাকেন –

যদি মহাভারত মহাকাব্য অবলম্বন করি।
যেখানে লীলার কারণ, দেখা দিলেন শ্রীহরি।।
সাক্ষাৎ কলিমূর্তি রাজা দুর্যোধন।
ধর্মযুদ্ধে কৃষ্ণ যারে করিলে নিধন।।
তাই একপক্ষে কৃষ্ণধন বিপক্ষে তাঁর দুর্যোধন
নিত্যে আর অনিত্যে লড়াই।
কখনও বা মা গান্ধারী বিপক্ষে তাঁর শ্রীমুরারি
আড়াআড়ি আমরা করি বড়াই।।
কখনও বা দাতা-কর্ণ বিপক্ষে অর্জুন
লড়েছিল দ্বৈরথ সমরে।
কখনও বা দেবব্রত -অর্জুনে বাকযুদ্ধে রত
গুরুশিষ্য লড়াই হয় গুরু পরশুরামে।।
পিতা-পুত্রে মণিপুরে লিপ্ত হয় ঘোর সমরে
অর্জুন আর বভ্রুবাহন শুনি।
কখন আবার উত্তরা অভিমন্যু হয়ে হারা
কৃষ্ণে শোনায় অভিযোগের বাণী।।[৪]

রামায়ণকেন্দ্রিক রাঢ়ের কবিগানে রামই যেমন মুখ্য, মহাভারত কেন্দ্রিক কবিগানে ততখানি না হলেও, কৃষ্ণ যে অনেকখানি জায়গা অধিকার করে আছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মহাভারত কেন্দ্রিক রাঢ়ের কবিগানে কৃষ্ণকেন্দ্রিক ও কৃষ্ণবর্জিত – দুই ধরণের পালায় কবিগান গীত হয়। রামায়ণের পালায় কবিগান করতে গিয়ে কবিয়ালরা যেমন একদিকে রামপক্ষ অবলম্বন করেন, অন্যজন রাবণপক্ষ। মহাভারত কেন্দ্রিক কবিগানে তেমনটা হয় না । কেননা মহাভাতের ব্যপ্তি অনেক বেশি। কৃষ্ণ কেন্দ্রিক পালাতেই কেবল একজন বিপক্ষ কবিয়াল কৃষ্ণপক্ষ অবলম্বন করে কবিগান করেন। আর বিপরীত পক্ষে যিনি থাকেন, তিনিই কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কৃষ্ণের ত্রুটির দিকগুলিকেই তুলে ধরে কবিগানে অংশ নেন। রামায়ণে রামের বিরুদ্ধপক্ষে গান করলেও, এক ধরণের নীরব আত্মনিবেদনে এসে কবিগান পরিণতি পায়। কিন্তু মহাভারত কেন্দ্রিক কবিগানে কৃষ্ণের প্রতি নীরব আত্মনিবেদন অপেক্ষা কৃষ্ণের কুটিলতা ও ধর্মের দোহাই দিয়ে পক্ষপাতদুষ্টতার প্রতিই কবিয়ালরা বেশি আলোকপাত করেন। কৃষ্ণের নানান ত্রুটির কথা উল্লেখ করে বিপক্ষ ভূমিকাধারী কবিয়াল কৃষ্ণের

ঈশ্বরত্ব খর্ব করে সাধারণ পরশ্রীকাতর মানবের জায়গায় নিয়ে আসেন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কবিয়ালদের কাছে কৃষ্ণের ধর্মযুদ্ধের জিগীর আসলে একটি বড় ফেক। কৃষ্ণ চেয়েছিলেন বিরাট সমৃদ্ধিশালী কৌরববংশকে ধ্বংস করতে। কেননা একশো পাঁচ ভাইয়ের কুরুবংশ ছিল সমস্ত রাজাদের কাছে চরম ভীতির কারণ। মহাপরাক্রমশালী রাজাদের ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাঁদের নিধন করা এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখাই ছিল কৃষ্ণের বিদেশনীতির প্রথম ও প্রধান শর্ত। তাই অপ্রতিরোধ্য মগধরাজ জরাসন্ধকে ছলনার আশ্রয় নিয়ে ভীমকে দিয়ে মল্যযুদ্ধে হত্যা করিয়েছেন তিনি। চেদীরাজ শিশুপালকে সুদর্শনচক্র দিয়ে হত্যা করেছেন। এমনকি হস্তিনাপুরের শ্রীবৃদ্ধিও কৃষ্ণের মনকে ঈর্ষাপরায়ণ করে তুলেছিল। বৃন্দাবন লীলার দৃষ্টান্ত দিয়ে কবিয়াল দেখাতে চেষ্টা করেন যে কৃষ্ণের ব্যক্তিগত চরিত্র কালিমাশূন্য নয়। অথচ নিজপুত্র রূপবান শাম্বের (দুর্যোধনের জামাতা) সাময়িক চরিত্র স্খলনে কৃষ্ণ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন কুষ্ঠগ্রস্থ হওয়ার। অর্থাৎ কৃষ্ণের নিজের ক্ষেত্রে একরকম বিধান, অন্যদের ক্ষেত্রে অন্যরকম বিধান দুর্যোধনের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই কবিগানের আসরে কবিয়ালকে গাইতে শোনা গেছে –

সবাই বলে তোমায় কৃষ্ণ ভগবান।
এখন দেখি তুমিও সাধারণ সমান।।
তোমার মনেও কাম কামনা রয়েছে বর্তমান।
কামনা থেকে ঈর্ষা হিংসা রয়েছে প্রমাণ।।
তোমার ছেলে শাম্ব অনিন্দ্যসুন্দর।
কার্তিক তুল্য যার জানি কলেবর।।
এ জগতে সুন্দরের বড় আকর্ষণ।
মুগ্ধ করে থাকে জানি রমণীর মন।।
একদিন শাম্ব করে উদ্যানে ভ্রমণ।
দূর থেকে দেখে তোমার যত নারীগণ।।
শাম্বের কাছে তারা ছুটে চলে যায়।
নানা কৌতুকে পড়ে শাম্বের গায়।।
দূর থেকে নারদ মুনি করিয়া দর্শন।
তোমার কাছে জানাইল এসব বিবরণ।।
নারদের কথা শুনে দেখিলে থেকে দূরে।
রমণীগণ পড়ে শাম্বের উপরে।।
মনে মনে তোমার ঈর্ষা জন্মিল।
সেদিন শাম্বকে অভিশাপ দেওয়া হল।।
কুষ্ঠ হোক বলে শাম্বে দিলে অভিশাপ।

শাম্বের কী দোষ ছিল কীসে বল পাপ।।
যার জন্য নির্মম অভিশাপ দিলে।
কুষ্ঠ হল শাম্বের অভিশাপের ফলে।।
ভগবান যদি হবে মানুষের মতন।
এমন ব্যবহার বলো কীসের কারণ।।

কাম কামনা থাকতে পারে আমাদের মনে। (কীর্তনের আখর)
জীবে শিবে তফাৎ বল রয় কোনখানে।।
জীবের থাকে কাম কামনা।
ঈশ্বর হয়েও তুমি বশীভূত কেন হলে না।।[৫]

কবিগানের মূলকথাই হল জয়-পরাজয়। তাই কৃষ্ণের বিপক্ষে কবিগান করতে উঠে কবিয়াল কৃষ্ণ চরিত্রকে কলঙ্কিত করে আপন চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তোলার প্রয়োজনে নানান অনুষঙ্গ তুলে ধরেন। আবার সেই কবিয়ালই যখন কৃষ্ণ চরিত্রে অথবা কৃষ্ণের অনুগত কোনো পাণ্ডব চরিত্রের ভূমিকায় উঠে কবিগানে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁর গানের মধ্যে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের নানান মহিমাময় দিকগুলি তুলে ধরে কৃষ্ণের প্রতি অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন দিয়ে কবিগান পরিবেশন করেন। কৃষ্ণ ভূমিকাধারী কবিয়ালের পাঁচালি গানে কৃষ্ণের শৌয-বীর্য এবং ঈশ্বরত্বকে তুলে ধরার প্রয়াসই প্রাধান্য পায় সবক্ষেত্রেই। অনেকক্ষেত্রে কৃষ্ণ অবতারের মূলকথাও বলে দেওয়া হয় সেই সমস্ত পাঁচালি গানে। তেমনই একটি বহুল প্রচলিত রাঢ়ের কবিগানের পাঁচালি তুলে ধরে আলোচনা শেষ করা হল –

আমি জগদীশ্বর জগতের পতি। (ধুয়া)
বিশ্বমাঝে করছি খেলা সঙ্গে লয়ে প্রকৃতি।। (পরধুয়া)

প্রথমকলি – কেউ দেখে শ্যামসুন্দর
কেউ দেখে নটবর
চতুর্ভুজ চক্রধর নানা রূপ নেহারে
যে যেমন ভাবটি ধরে তার তেমন করি গতি।
দ্বিতীয় কলি – তত্ত্ব জেনে ভাব দেখে
স্থির ভাবে লক্ষ রাখে
সূক্ষ্ম পথে চলতে থাকে সেই তো কেশব হেরে
আছি অনল অনিলে ভূধর নীড়ে নভনীলে হয় বসতি।
তৃতীয় কলি – কত সব যোগী ঋষি
করতে আমায় খুশি,
ধ্যানে বসে দিবানিশি থাকে অনাহারে

কেবল ভক্তজনে ভজন ধনে লয়ে প্রেম ভকতি।

চতুর্থ কলি – নিজের মধু আস্বাদনে
ভক্ত ভ্রমর হই ভূবনে
এলাম আমি সাধ পূরণে বৃন্দাবন মাঝারে
করতে লীলা পুষ্ট এই ভুবনে প্রকাশিলাম জ্যোতি।

পঞ্চম কলি – যখন হয় ধর্ম হানি
অবতীর্ণ হই তখনি
অধর্মে বিনাশ করে বিশ্বে শান্তি দানি
আবার ধর্ম সংস্থাপন করি উদ্ধারিতে ক্ষিতি।[৬]

আধুনিক মনোভাবাপন্ন কবিয়ালরা কৃষ্ণকে একজন আদর্শ ধর্মরাজ্য-সংগঠকের ভূমিকায় এনে চতুর রাজনীতিজ্ঞ প্রমাণ করেন। সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্যই প্রয়োজনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন বলে কবিয়ালরা কবিগানের আসরে জানিয়ে থাকেন। মহাভারতের মর্ম কথাই হল ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়। মহাভারতে কৃষ্ণের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর সন্নিবেশ থাকলেও সর্বোপরি তাঁকে ভগবান রূপেই তুলে ধরা হয়েছে। মহাভারতে পাণ্ডবরা ছিলেন ধর্মপ্রাণ, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞচিত্ত এবং বীর। মহাভারতেই বলা আছে ধর্ম যেখানে, কৃষ্ণ সেখানে। আর কৃষ্ণ যেখানে জয় সেখানে। কেননা কৃষ্ণ চেয়েছেন ধর্মের প্রতিষ্ঠা। তাই যুদ্ধোন্মত্ত অধার্মিকদের বিনাশ করতে কৃষ্ণ সবসময়ই পাণ্ডবদের সহায় ছিলেন। পাণ্ডবদের সৈন্যবল অপেক্ষা ধর্মবল ছিল বেশি। তাই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় ও অপ্রতিরোধ্য কৌশলের সাহায্যে তাঁরা জয়লাভ করেছেন। অন্যদিকে কৌরবরা ছিলেন অহংকারী, দাম্ভিক, অসহিষ্ণু, পরশ্রীকাতর এবং অধার্মিক। তাই অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সর্বরকমে সুসজ্জিত বিপুল সেনার অধিকারী হয়েও ধর্মত্যাগের জন্য কৌরবদের অধঃপতন হয়েছিল। পাণ্ডব-কৌরব দু'জনেই ব্যাসদেবের বংশধর। অথচ মহাভারতে ব্যাসদেব পাণ্ডব-কৌরবের অপূর্ব তুলনা করেছেন এক জায়গায়। সেখানে তিনি বলেছেন, দুর্যোধন হলেন অহংকাররূপ মহাবৃক্ষ, কর্ণ সেই মহাবৃক্ষের স্কন্দ, শকুনি তার শাখা, দুঃশাসন সেই বৃক্ষের ফুল ও ফল। আর বৃক্ষটির মূল প্রজ্ঞাহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র। তাঁর দুর্বলতাই সমস্ত ধ্বংসের কারণ। অন্যদিকে যুধিষ্ঠির হচ্ছে ধর্মময় মহাবৃক্ষ। অর্জুন সেই বৃক্ষের স্কন্দ, ভীম তার শাখা, নকুল ও সহদেব সেই বৃক্ষের ফুল ও ফল। আর সেই মহাবৃক্ষের মূল হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

তথ্যসূত্র:

১. 'বাংলা সাহিত্যের কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ', সত্যবতী গিরি, রত্নাবলী, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, পাতা-১

২. ব্যক্তিগত সংগ্রহ, কবিয়াল কাঞ্চন মণ্ডলের রচনা। তাঁর খাতা থেকে প্রাপ্ত। তারানগর, মুর্শিদাবাদ। অগ্রহায়ণ ১৪২২।

৩. ব্যক্তিগত সংগ্রহ, কবিয়াল কিশোরী ওস্তাদের রচনা এই গানটি কবিগানের অনুরাগী ব্যক্তি অচ্যুদানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ। চুড়পুনি, পূর্ব বর্ধমান। শ্রাবণ ১৪২২।

৪. ব্যক্তিগত সংগ্রহ, গানটি কবিয়াল তপন চট্টোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শোনা। রচনাকার অজ্ঞাত। কোশীগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান। আষাঢ় ১৪২২।

৫. ব্যক্তিগত সংগ্রহ, 'কৃষ্ণ-দুর্যোধন' পালায় দুর্যোধন ভূমিকায় কবিয়াল কাঞ্চন মণ্ডলের গাওয়া গান। কবিগানের আসর থেকে সংগ্রহ। উদ্ধারণপুরের মেলা, উদ্ধারণপুর, পূর্ব বর্ধমান। ফাল্গুন ১৪২২।

৬. ব্যক্তিগত সংগ্রহ, উল্লেখিত পাঁচালিটি কবিয়াল অজিত কর্মকারের রচনা । তাঁর নিজের খাতা থেকে সংগৃহীত। কোশীগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান। শ্রাবণ ১৪২৪।

আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রান্তবর্গীয় জীবনচেতনা

কালিপদ বর্মন
গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্বে প্রান্তবর্গীয় মানুষ ও মানুষের জীবন কোনোরূপ প্রাধান্য না পেলেও দ্বিতীয় পর্বের শুরু থেকেই প্রান্তবর্গীয় স্বর ও সংকট ক্রমশই অনেক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় আখ্যানভূমি হয়ে ওঠে । প্রথম পর্বে বাংলা উপন্যাস বড় বেশি ব্যস্ত ছিল উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্প্রদায়ের জীবনচর্চা নিয়ে । সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়-ই প্রাধান্য পেয়েছে নরনারীর প্রেমতৃষ্ণা যৌনতৃষ্ণা এবং অন্তরকেন্দ্রিক বৈধ-অবৈধ রোমান্টিক রহস্যময়তা । অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অন্তত এই সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়। বাংলা উপন্যাস যখন দ্বিতীয়পর্বে প্রবেশ করলো তখন থেকেই দেখা গেল উচ্চবিত্ত তথা উচ্চমধ্যবিত্তদের আধিপত্যবাদ ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করেছে । অনেক ঔপন্যাসিক তখন পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণা প্রায় অস্বীকার করেই নতুন এক আখ্যানের খোঁজ করেছিলেন । দ্বিতীয় পর্বের এই ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রয়েছেন তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ এবং সতীনাথ ভাদুড়ী । নতুন আখ্যানের খোঁজ করতে গিয়েই এইসব ঔপন্যাসিকরা নজর দিলেন শ্রেণি বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থার একেবারে তলদেশে অবস্থানকারী প্রান্তবর্গীয় জীবনযাপনের সামাজিক দুর্দশা ও দুর্গতির দিকে।তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন—বাংলা উপন্যাসের আখ্যান দীর্ঘদিন ধরেই মানবীয় শ্রেণি প্রজাতিকে অচ্যুত করে রেখেছে-সমাজের বিভিন্ন স্তরে । এই মানবীয় শ্রেণি প্রজাতিকে যথাযত সম্মান ও মর্যাদাসহ বিন্দুমাত্র প্রতিষ্ঠা দেয়নি । সমাজের অন্তভুক্ত হয়েও এইসব প্রান্তবর্গীয় মানুষ সমাজের মূল অংশ থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত হয়ে আছে, তারা যে রক্তমাংসে আমাদেরই মতো সমপ্রাণের অধিকারী, এই সত্যটাই যেন বাংলা উপন্যাসের আখ্যান কিছুতেই স্বীকার করছিলোনা । ঠিক এই রকম ঘৃণ্য বিযুক্তি এবং ভয়াবহ অস্বীকৃতির যুগে বাংলা উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের চার ঔপন্যাসিক যেন মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন । শোনা গেল নতুন স্বর ও সমাজের কথা । শোনা গেল নতুন সমাজ এবং সংগ্রামী জীবন চেতনার কথা । এই সময়ে লেখা চারটি উপন্যাসের কথা, এই সূত্রে উল্লেখ করা দরকার । যেমন

১) হাঁসুলীবাঁকের উপকথা– তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
২) পদ্মানদীর মাঝি- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
৩) আরণ্যক- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪) ঢোঁড়াই চরিতমানস- সতীনাথ ভাদুড়ী

এই চারটি উপন্যাসকে বলা যায় বাঁকবদলের উপন্যাস যেন এক নতুন জীবনাবেগের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠল । ফলে আমাদের সামনে থেকে যেন দ্রুত অপসারিত হল অন্ধকারের ঝোলানো পর্দা । সেই পর্দা সরে যেতেই আমরা দেখলাম এতদিন বাদে এই প্রথম বাংলা উপন্যাসে কথা বলে উঠছে প্রান্তবর্গ বা নিম্নবর্গের চরিত্র । আমরা শুনতে পেলাম ঢোঁড়াই, করালী, ভানুমতি, ডোবরুপাননা ও কপিলা কুবেরের কণ্ঠস্বর । প্রাথমিক সূত্রপাতের এই পথ ধরেই পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের গতিপথ যেন অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে গেল । একদিন যা ছিল প্রাথমিক সূত্রপাত ক্রমশ তা হয়ে দাঁড়ালো বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে । এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পথ ধরেই একে একে এলেন— মহাশ্বেতা দেবী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য লেখকেরা । প্রত্যেকেই লিখলেন মাটির সাথে লেপটে থাকা মানুষের কথা । প্রত্যেকেই লিখলেন সেই বৃহৎ জনগোষ্ঠী কথা-যারা আজও অনাদ্রিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও অপাঙত্তেয় । লেখকেরা এদের মুখ ও মুখোশ্রীকে অবলম্বন করেই দেখালেন সত্যিকারের দেশ, কাল ও সমাজ জীবনের স্পন্দিত ইতিহাস । এই জাগ্রত জীবনমুখী স্পন্দিত ইতিহাস সামনে রেখেই আরো একজন ঔপন্যাসিক এই সময়পর্বের কথোপকথনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলন, তিনি অন্য কেউ নন— সাধন চট্টোপাধ্যায় । প্রান্তবর্গীয় মানুষদের ভূমি চেতনা ও স্বপ্নচেতনা নিয়েই তিনি আজ বাংলা উপন্যাস চর্চায় একটা সবিশেষ স্মরণীয় লেখক হয়ে উঠেছেন আমাদের কাছে। আর এই জন্যই আলোচ্য এই প্রবন্ধে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের গতিপথ ও অভিযাত্রা নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে।

‘গহিন গাঙ’ (১৯৭৯) বিশ্ববন্দিত কথাশিল্পী মার্কেজ একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন— কলম্বিয়ার প্রান্তিক জীবন তাঁকে টানে, সেখান থেকেই তিনি সংগ্রহ করেন তাঁর রচনার উপকরণ । তাই এই দিক থেকে ‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসের লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ও অনুরূপ দাবী করতেই পারেন । এই উপন্যাসটির আখ্যান বিন্যস্ত হয়েছে সুন্দরবনের গ্রামজীবনের পটভূমিতে । এই অঞ্চলে যেমন জীবিকার্জনের কোন সুস্থ পরিবেশ নেই, তেমনই নেই সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যভাবে জীবনযাপনের কোন উপযোগী পথ । অধিকাংশ মানুষ জীবনকে বাজি রেখে বিপন্নভাবে মধু সংগ্রহ করে। জীবিকা অর্জন করার প্রধান উৎস মাছ ধরা বা মৎস উৎপাদন করা, যার উপর সারাবছর ধরে নির্ভরশীল । কুমির ও বাঘের কাছে প্রতিনিয়ত প্রাণের ঝুঁকি রেখে এই প্রান্তীয় শহরের নিত্যদিনের পথ চলা । মৎস্যজীবিদের জীবিকার ক্ষেত্রে নানান ধরণের প্রতিকূলতার লড়াই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখানে লেখক দেখিয়েছেন ।

“মালো পাড়া থেকে শুরু করে গঞ্জ পেরিয়ে প্রায় মাইল খানেক পর্যন্ত বিন-জাল ঠাসাঠাসি । পালাবার ফাঁক নেই মাছেদের, কারও না কারও জালে ধরা তাকে দিতেই

হবে । বোঝা যায় মাছ মারাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গভীর জলের আনাচ-কানাচ থেকেও শিকরে তুলে পরিবারের মুখে অন্ন তুলে ধরতে মরিয়া ।”১
বেঁচে থাকার এই একটি কৌশলই জন্ম থেকে শিখতে হয় । কবে থেকে কেউ জানে না-কখন কার প্রাণ যাবে । এর সঙ্গে যুক্ত হয় মহাজনী ঋণের বোঝা । এই ঋণ নামক জালের থাবা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধে । বিস্ফোরিত হয় ক্ষোভ ও বিদ্রোহ । কাহিনির শুরুতেই লেখক সামাজিক জীবনের পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন—

‘মালোপাড়া’ আর ‘সোনার গাঁ’ দুই পাশাপাশি গ্রাম, সেখানকার মানুষের জীবিকা, জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য আছে এমনকি তা নিয়েই সামাজিকতার মানদণ্ড আলাদা হয়ে গেছে। আলোচ্য উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’ উপন্যাসের তাৎমাটুলি ও ধাঙড়টুলির বহমান সামাজিক দ্বন্দ্বের মতোই ‘মালোপাড়া’ আর ‘সোনা গাঁ’র মানুষদের সামাজিক বৈরিতা দেখা যায় ।

লেখক এখানে দেখিয়েছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রান্তিক জনবসতিতে সনাতন হিন্দু এবং খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মরত তথা ধর্মব্যবসায়ীদের ক্ষমতা বিস্তার ও ক্ষমতা রক্ষার লড়াই। ঔপন্যাসিক নিঁখুত পর্যবেক্ষণে দেখিয়েছেন এই অঞ্চলের মানুষের প্রকৃতি লগ্নতা ও মালোদের প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবনকে । উপন্যাসের মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলের মালোদের মাছ মারাকে কেন্দ্র করে লেখক একদিকে যেমন সমাজ অর্থনীতি এবং অন্যদিকে প্রান্তিক রাজনীতির বিন্যাসকে দেখিয়েছেন । এই শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই এবং জীবিকার তাগিদে সংগ্রামের ছবি তুলে ধরেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায় ।

‘পক্ষ বিপক্ষ’ (১৯৮৮) উপন্যাসে লেখক একটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের সাতের দশকের এক জটিল রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির শিকড় সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। যার ফলস্বরূপ সময় ও সমাজমনস্ক শিল্পীর দায়বদ্ধতার পরিচয় আমাদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে।সেদিক থেকে দেখতে গেলে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের আলোচ্য উপন্যাসটিও একটি নির্দিষ্ট সময়-সমাজ প্রেক্ষিতের ভাষিক নির্মাণ। এককথায় বলা চলে বিগত শতাব্দীর আটের দশকের পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তবর্তী গ্রাম পরিসর আলোচ্য উপন্যাসটির মূল পটভূমি । সাতাত্তর সালের কংগ্রেসি স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে তার অবসান ঘটিয়ে শুরু হয় তৎকালীন কমিউনিস্ট বা বামফ্রন্ট সরকারের বিজয়রথের জয়যাত্রা । সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নতুন সমাজ গড়ার । এমনকি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিল । যার ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা । গ্রামের মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে উন্নয়নের শরিক হয় স্বতঃস্ফূর্ততায় । জোতদারের জমি কেড়ে নিয়ে বন্টিত হয় ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। বর্গাদারী আইন বলবৎ হয় যার জন্য গ্রামবাংলার মানুষের মধ্যে আসে স্বস্তির হাওয়া। কিন্তু অনতিবিলম্বে সেই স্বস্তি বিলুপ্ত হয়ে যায় আর ‘power corrupts man’ এই আপ্ত বাক্য সত্যি হয় । গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে শুরু হয়ে যায় স্বজন পোষণের অন্তহীন পালা। স্বার্থের সংঘাতে তৈরী হয় লবি । অনাচারের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা । 'পক্ষ বিপক্ষ' উপন্যাস এই সমাজ ব্যবস্থারই এক শিল্পিত বয়ান । শুরুতেই লক্ষ্য করা যায় যুগবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বোর্ড মিটিংয়ের দৃশ্যপট । গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাদল কর্মকার ও পঞ্চায়েত সদস্য গোকুল এর আপসহীন উত্তপ্ত কথাবার্তায় মিটিং জমে উঠেছে । গোকুল একের পর এক দুর্নীতির প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে চলেছেন বাদল কর্মকারকে । এমনকি প্রতিবাদী গোকুলের মানসিক অবলম্বন হয়ে ওঠে দুলালী । এই পরিস্থিতিতে পার্টির ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী গোকুলদের ধীরে ধীরে কোণঠাসা বা কণ্ঠরোধ করবার চক্রান্ত শুরু হয় ।

লেখকের কথা অনুসারে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল অনেক সংগ্রাম, রক্ত ঝরিয়ে । কথা ছিল মেহনতী মানুষের উত্তরণের, ক্ষমতায়ণের স্বপ্ন । কিন্তু এক দশক যেতে না যেতেই পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি বাসাবাঁধে । সুবিধাভোগীরা পার্টিতে জাঁকিয়ে বসে । পার্টির দুঃখের দিনের একনিষ্ঠ কর্মীরা হতে থাকে কোণঠাসা । বিপক্ষে এইভাবে পক্ষভুক্ত হয় । আর পক্ষের লোকেদের ফেলে দেওয়া হয় বিপক্ষে পার্টির মধ্যে জন্ম নেয় উপদলীয় ক্ষমতাকেন্দ্র । এরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে প্রশান্ত, উৎপল, ধ্রুব প্রমুখের উল্লাস এবং গোকুলদের পিছিয়ে পড়ার মধ্যে দিয়ে ।

এইভাবে উপন্যাসে বিশ শতকের সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গের খাত-প্রতিখাত-গ্রামীণ বাস্তবতায় খেটে খাওয়া ভূমি চাষিদের জীবনে কি প্রভাব ফেলেছিল তা সাধন চট্টোপাধ্যায় নির্লিপ্ত শিল্পীর মতো চিত্রিত করেছেন।

'জলতিমির' (১৯৯৮) সাধন চট্টোপাধ্যায় বাংলা কথাশিল্পের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্বের অন্যতম একথা সকলেরই জানা । কারণ ফর্ম ভাঙ্গা, নতুন করে গড়ার সাধনায় এখানে যেমন তিনি সিদ্ধকাম তেমনি শিকড়ের সন্ধানে ঐকান্তিক,দৃঢ় । বিশেষত 'জলতিমির' উপন্যাসটির কথা না বললেই নয় । এপর্যন্ত লেখকের শিকড় সন্ধানী প্রচেষ্টার সর্বোৎকৃষ্ট ফল আলোচ্য উপন্যাসটি । মহাভারতের কালীয়নাগের মিথকে তিনি এখানে আধুনিক জীবনচর্চার সঙ্গে মিশিয়েছেন অনায়াস কুশলতায় ।

উপন্যাসের মূল বিষয় হল আর্সেনিক দূষণ ও তার ক্ষতিকারক প্রভাব। এই ধরনের সমস্যাকে নিয়ে সাধন চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস লেখেন। জলের মধ্যে আর্সেনিক দূষণের সমস্যা এবং তাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ রাজনীতি ও তার পরিবেশকে ভরকেন্দ্র করেই আলোচ্য উপন্যাস এগিয়ে গেছে। এমনকি সমাজ সচেতনতা, বিজ্ঞান সচেতনতা, মুক্তবাজার অর্থনীতির ভূমিকা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি ঔপন্যাসিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পরিবেশ সচেতনমূলক আলোচ্য উপন্যাসটি সর্বাধিক চর্চিত ও আলোচিত সমাজের বিভিন্ন স্তরে । সমকালীন গ্রামবাংলার ভাঙন ও চরিত্রগত পরিবর্তন উপন্যাসের অন্যতম দিক । উপন্যাসের শুরু হয় রবিদাস পাড়ার চাষী কন্যা ও গাজনা গ্রামের বউ আর্সেনিকে আক্রান্ত অন্নপূর্ণার মৃত্যু সংবাদের মধ্য দিয়ে । মৃত্যুর প্রাক্ মুহূর্তে অন্নপূর্ণা তার স্বামী পরান সর্দারকে শর্ত দিয়েছিল যে

মৃত্যুর পর যেন বনবিবিকে উপড়ে ফেলা হয় । এই উপন্যাসে যে রবিদাস পাড়া ও মালঞ্চের গ্রামীণ চরিত্র গুলির দেখা মেলে সকলেই নিম্নবর্গের দলিত চরিত্র।

একদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য, গ্রামীণ সমাজে শ্রেণি দ্বন্দ্বের বেড়াজাল, অন্যদিকে চিরন্তন মানব জীবনের সমস্যা, লড়াই এই আর্সেনিক সমস্যাকে কেন্দ্র করেই মূর্ত হয়েছে । আমরা জানি উপন্যাসের অন্বিষ্ট সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয় । উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তি মানুষ । এই সমাজ, সময় আর ইতিহাস ব্যক্তি মানুষের চরিত্র ও মানুষের সাঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল করে দেয় । ফলে মানুষের সংজ্ঞা বার বারই নতুন করে খুঁজতে হয় । তাই মানুষকে খুঁজতে গিয়ে সময়, সমাজ ও ইতিহাসকেও খুঁজতে হয় । কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যায় ‘জলতিমির’ উপন্যাসে উল্টো পথের যাত্রী । সময় সমাজকে বুঝতে তিনি ব্যক্তি মানুষের আশ্রয় নিয়েছেন, তার করুণ পরিণতির চিত্র এঁকেছেন । ফলে উপন্যাসের চেনা ছকের ধারণা চূর্ণ হয়েছে সচেতন অন্তর্ঘাতে, ছক ভেঙে ছক গড়ার চেষ্টাই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অভিজ্ঞান । কথা সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টি ‘জলতিমির’ এরকমই এক অভিজ্ঞান নয় কি !

‘মাটির অ্যান্টেনা’ (২০০০) ‘মাটির অ্যান্টেনা’ উপন্যাসটিকে বলা যায় পালটে যাওয়া সময়ের এক আখ্যান অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে পালটে যায় মাটির গন্ধ । গ্রামের মেঠো পথ, মোরাম রাস্তা, ভোর ও সন্ধ্যাকালে পাখির কলতান, বাঁশ বাগান রাখালের মাঠে গরুচড়া, আমবাগান এসবই ছিল সাম্প্রতিক কালের মনোরম ও বাস্তব । আজ কিন্তু কালের নিয়মে সেসব স্মৃতি বিলুপ্ত প্রায় । গ্রামজীবনের পতন নিঃশব্দে মিলিয়ে যায় । গ্রাম ভেঙ্গে গড়ে ওঠে নগরজীবন বা শহর । নেমে আসে পরিবর্তনের ছাপ বা চেতনা । আলোচ্য ‘মাটির অ্যান্টেনা’ এই পরিবর্তিত সময়েরই এক শিল্পভাষ বা রূপকার ।

উপন্যাসের আখ্যানের মূল কেন্দ্রভূমি ভাঙ্গি পরিবার। কর্ণাগ্রামে ভাঙ্গি পরিবারে বংশানুক্রমে বাস। একদা শোনা যায় বর্গীর যে দলটি বাংলা আক্রমণ করেছিল তাদেরই সামান্য একজন হানাদার নানা ঘাটের জল খেয়ে হাজির হয় এই গ্রামে । ‘দুকড়িবালা’-র কাহিনি দিয়ে উপন্যাসের শুরু হয় । মাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষের জীবন পরিবর্তের ইতিবৃত্ত-এই উপন্যাসের মূল পীঠস্থান । নিম্নবর্গের জীবনে ভাঙ্গি পরিবারের দিবাকর ও টুনির সাংসারিক জীবনের গ্রামীণ বাস্তবতার চিত্র লেখক খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন— দুকড়িবালা, গেঁড়ি বুড়ি, তাপসীর দিদিমা সেকালের অর্থাৎ অতীতের মানুষ, তহমিনা বিবি, নন্দিতা বা টুনি ধাঙ্গি হচ্ছে একালের মানুষ ,আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নীলু-তিলু, উৎপলা ও মানি -এই তিন প্রজন্মের প্রান্তবর্গীয় নারীদের গ্রামীণ জীবন পরিবর্তনের মানচিত্র রচিত হয়েছে । প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাস্তবতা, গ্রামীণ পরিবার, সমাজ ও রাজনীতিতে নারীর কল্যাণময়ী ভূমিকা লেখক আলোচ্য উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

'শেষরাতের শেয়াল' (২০০৩) কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন সন্ধানীকুলের আলোক পথের যাত্রী । তাঁর আলোচ্য 'শেষ রাতের শেয়াল' উপন্যাসটি সেই শিকড় সন্ধানেরই এক অভিনব প্রতিবেদন । উপন্যাসের মূল কাহিনি কেন্দ্রীয় চরিত্র তরুবালার জবানীতে ফুটে উঠেছে । 'শেষ রাতের শেয়াল' উপন্যাসে পরিবেশ চেতনার এক নব উন্মেষ ঘটেছে । গ্রীন বেঞ্চে সোনাই নদীর একদা অস্তিত্ব ও জনস্বার্থ মামলার প্রসঙ্গ দিয়েই কাহিনির সূচনা । তরুবালার কথা থেকেই জানা যায় জনৈক ভাস্কর নাইয়া তাঁর মনে প্রোথিত করেছিল এককালের পরিচিত নদী সোনাই এর পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন—

"—সেই নদীটির নাম সোনাই। ভাস্কর নাইয়া যে নদীটি খুঁজে পুনরুদ্ধারের গোপন মন্ত্রণা দিয়ে গেছল; তার নাম সোনাই । পুনরুদ্ধার কেন ? প্রশ্ন শুনে ও বলেছিল, যা ছি্ যা এখন নেই, তা খুঁজে পাওয়াই পুনরুদ্ধার !"২

ওঁরাও জনগোষ্ঠীর Cultivated তরুণী তরুবালা সোনাই নদীর পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে মামলা শুরু করে । অবশ্যই এককভাবে নয়— সংঘবদ্ধতার রাজপথে সেই লড়াই শুরু করে । এই দিকে ভাস্কর নাইয়া আড়াই বছর ধরে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে পচছে । তরুবালা সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি, প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা ও হুমকিকে অতিক্রম করে অবিরাম চলছে পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে ।

গ্রীন বেঞ্চে সেই মামলা উঠেছে । শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপাউনতর । পেশায় পিয়ন তরুবালা কর্মস্থলেও নানা ভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বিপন্নতায় পড়ে । তরুবালা সারারাত ঘুমোতে পারে না । মনে পড়ে পূর্বে শোনা বহু অসম্ভব কথা । আসলে লেখক উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে যে অভিনব বার্তা দিতে চেয়েছেন তার মূল কাণ্ডারী এই আদিবাসী মেয়ে তরুবালা । নদীকে দেখার মধ্যে দিয়ে তরুবালার মধ্যে পরিবেশ চেতনার উন্মেষ ঘটেছে । একটা নদী হারিয়েছে, সে নদীটি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে যাচ্ছে । মানুষের দখলে থাকা নদীকে খোঁজা ও সংস্কার করার মধ্য দিয়ে আমরা পাঠকরা তরুবালার জীবনের এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করি । তরুবালা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মেয়ে হলেও প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয়তে এবং বি.এ. পার্টওয়ান শেষ করার আগেই চাকরি পায় । লেখাপড়া শিখে তার জীবনে পরিবেশ চেতনার একটা ছাপ আসে । এই পরিবেশ চেতনা করতে গিয়ে তার আদিবাসী জনজাতির জীবনযাত্রা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নদীকে খোঁজা । এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে তার জীবনভাবনা ও প্রান্তবর্গীয় মানুষের জীবন চেতনা ফুটে উঠেছে ।

আমরা মধ্যবিত্ত মানুষরা এখন ভোগবাদে বিশ্বাসী । আমরা জীবন সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে সচেতন নই । অথচ আদিবাসী সমাজ থেকে উঠে আসা একটি অল্প শিক্ষিত মেয়ে সামান্য শিক্ষার আলোয় তার মনে সমাজ পরিবর্তনের ধারণা, আজকে তার চিন্তার অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় । এখানে আধুনিক জাদুবাস্তবতা (Magic

Realism) এর কিছু ব্যবহার আছে এবং আকরণ ও প্রকরণের বিষয়ে নতুন চিন্তা ভাবনার ছাপ পড়েছে ।

'সাতপুরুষ ডটকম্' (২০০৫) লেখক আলোচ্য উপন্যাসে সাম্রাজ্যবাদী উন্নয়নের প্রকৃতি, এদেশে সেই উন্নয়নের ধারাবাহিক মূল্যবোধহীন অগ্রগতির স্বরূপকে তুলে ধরেছেন । উপন্যাসটিকে বিচার করলে দেখা যায় পুরোটাই এক ঐতিহাসিক ব্যাপার । উন্নয়নের যে ধারাটাকে আজকে আমরা দেখছি সেটা কিন্তু আজকের নয় । একদা রেলপথ বসানোর হাত ধরে যে কর্পোরেট কালচারের সূচনা হয়েছিল সেই কর্পোরেট কালচারের বিকাশ এখন মূল্যবোধহীন । প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহমান মূল্যবোধহীন উন্নয়ণ যাত্রারই আখ্যান 'সাত পুরুষ ডট কম্' ।

নৃসিংহ রায় ও নলিনী কুমার দুই ভাইয়ের জমিদারি নিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ এই উপন্যাসের অতীত বাস্তবতা তুলে ধরেছে । উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসনকাল, সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও চিহ্নগুলিকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায় । এই দুই প্রবীণ প্রতিপক্ষের মধ্যে নলিনী কুমার সংস্কারপন্থী বুদ্ধিমান, উদার ও নতুনের পূজারী । অপরদিকে নৃসিংহ রায় সংস্কৃতিগত দিক থেকে পশ্চাৎ পদ ও রক্ষণশীল ।

অতীতে দেখা যায় নলিনী কুমার পাঁচমুড়া থেকে ট্রেনযাত্রার সওয়ারি হতে নিজস্ব ঘোড়া হৈমিকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন, চলে এসেছেন আগর পাড়ায় । উপস্থিত হয়েছেন শশধরের বাড়িতে আগর পাড়া এখন অনেক পরিবর্তিত । এখানে সবুজের চিহ্নটুকু মুছে যেতে বসেছে । গড়ে উঠেছে বহুতল ফ্ল্যাট । একালের আগর পাড়ায় সাত পুরুষের সময়ের ব্যবধান ঠেলে ঘোড়ার পিঠে করে চলে এসেছেন নলিনী কুমার । এমনকি শশধরকে বিস্ময়াহত দেখে অকপটে পরিচয় দেন, আমি তোমার ওপরের সাতপুরুষ ।

অন্যদিকে শশধরের কাছে সেই বর্তমান আসলে বহুদুরের অতীত । মাঝখানে সাত পুরুষের ব্যবধান । এককথায় 'সাত পুরুষ ডট কম্' শুধু উপন্যাসমাত্র নয়, প্রবাহমান সময়ের এক অনবদ্য প্রতিবেদন, বাংলা কথাসাহিত্যের সম্মুখ গতির এক নিশ্চিত প্রমাণরেখা । এইভাবে বর্তমান ও অতীত এক সূত্রে মিলে যায় । শশধর নিজের মনের ভাবনাকে পরিবর্তন করে বলে জগৎ কেমনভাবে পুরোনো সব সম্পর্ককে ছিন্ন করে নতুন যুগে ঢুকেছে, ইতিহাসও তার কালের নিরিখে বদলে যাবে । এই দুটো ইতিহাসের সংযোগ এবং সেই সময়ের প্রান্ত মানুষ এবং এখনকার মানুষ তারা এই উন্নয়নকে কিভাবে দেখছেন- এটাই 'সাত পুরুষ ডট কম্'।

'উদ্যোগ-পর্ব' (২০১৯) আলোচ্য উপন্যাসটি ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওঁরাও জনগোষ্ঠীর কমিউনিটিকে নিয়ে লেখা । লেখকের মতে, 'সময় ও সামাজিক স্রোতের পরিবর্তে কিছু কিছু নতুন রচনার ফাঁকে মাটি ও মানুষ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল ।'৩

এই আদিবাসী কমিউনিটির মানুষজন কিভাবে প্রাচীন ও আধুনিক ভাবনা এই দুইয়ের সংঘাতে এক নতুন অবস্থায় অবতীর্ণ হয়ে উঠেছেন তারই রূপান্তর ঘটেছে আলোচ্য 'উদ্যোগ-পর্ব' উপন্যাসে। এই ওঁরাও জনগোষ্ঠীর লোকেরা যারা একসময় ইংরেজের রেললাইন তৈরি করতে আসে সুদূর ছোটনাগপুর থেকে। তারা আমাদের এখানে থেকেই বসবাস স্থাপন করে। এমনকি এখানে থেকেই তাদের জনগোষ্ঠীর ভাবনা-চিন্তা পুরোনো ধ্যান-ধারণাকে ভেঙ্গে সেই সময়ের নতুন রাজনৈতিক চেতনায় যুক্ত হয়ে যান। তাদের জনগোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি সেখানে থেকেই সোসাইটির সাথে নানারকম সংগ্রাম করেছেন- তার স্বরূপ ধরা পড়েছে আলোচ্য উপন্যাসে ।

একশো-দেড়শো বছর পূর্ব থেকে বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওঁরাও সমাজে এই ভাঙনের এই প্রভাব গভীর ও মর্মান্তিক । বর্তমানে চব্বিশ পরগণা,হুগলী,হাওড়া অঞ্চলে এদেরই ছিন্নমূল উত্তরপুরুষরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে বিরাজ করছে । উপন্যাসের পটভূমিকায় তেমনই একটি গোষ্ঠীর স্বাধীনতাত্তোর কালের বহুমাত্রিক ভাঙচুরের কাহিনি । প্রান্তবর্গীয় জনজাতিকে পরিবর্তন করে তারই এক প্রকট রূপ এখানে রূপায়িত হয়েছে ।

পরিশেষে বলা যায় ইতিহাসের সময় ও উপন্যাসের সময় একখাতে বয়ে না গেলেও ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না । ইতিহাসের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিবর্তন ঘটতে থাকে, আর প্রান্তবর্গীয় জীবনের পালে লাগে সেই পরিবর্তনের হাওয়া; স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় আসে নানারকম ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত । রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ সংস্কৃতির মূলকে কেন্দ্রবিন্দু করে বয়ে নিয়ে যায় ঘটনার ধারা-আজীবন এই প্রান্তবর্গীয় মানুষগুলি । আসলে লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে এক সমান্তরাল শিল্পরূপ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন । বিভিন্ন জনজাতির প্রান্তবর্গীয় মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম, লড়াই এবং একাল সেকালের মধ্যে সচেতনভাবে মানসিক বিবর্তন করে সমাজের বিশ্বস্ত দলিল রূপে তুলে ধরতে চেয়েছেন ।

গ্রন্থপঞ্জি:

ক. তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (১ম খণ্ড), কলকাতা-০৯, করুনা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৪১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১ ।

২. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (১ম খণ্ড), কলকাতা-০৯, করুনা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২১৫ ।

৩. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (৩য় খণ্ড), কলকাতা-০৯, করুনা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২২ শে ডিসেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১ ।

খ. সহয়ক গ্রন্থ

১. গোস্বামী, অর্জুন : উত্তাল ষাট সত্তর (রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি), কলকাতা-০৯, চয়নিকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬ ।

২. ঘোষ, প্রসূন : উপন্যাসের নানা স্বর, কলকাতা-০৯ এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৫।

৩. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : কেন উপন্যাস লিখি, কোরক, এই সময়ের অন্য ধারার উপন্যাস, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪১৫,মে-আগস্ট, ২০১৮।

৪. দাস, সঞ্জীব : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ক্ষমতার অন্তঃস্বর, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ২০১৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, প্রথম প্রকাশ ২৮শে নভেম্বর, ২০০৫, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯।

৬. সরকার, পবিত্র : কথাসূত্র আখ্যান তত্ত্ব : উপন্যাস তত্ত্ব : বাখতিন' প্রভৃতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৪১০।

৭. সেন মজুমদার, জহর : নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৭ ।

গ. পত্র-পত্রিকা:

১. দাশগুপ্ত, বাসব (সম্পাদক) : নীললোহিত, সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, কলকাতা-৪৯, বর্ষ অনুল্লিখিত, সংখ্যা-১০, সেপ্টেম্বর, ২০০২।

বৈষ্ণব তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের আলোকে রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস : একটি অন্বেষণ

সুবর্ণা সেন
গবেষক, ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ’, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

সারসংক্ষেপ (Abstract) : বাংলা সাহিত্য সুদীর্ঘ যাত্রাপথে বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে বর্তমানকালে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীন যুগের বহুধা বিস্তৃত সড়ক অতিক্রম করে দীর্ঘ দুশো বছরের ব্যবধানের পর বাংলা সাহিত্যে মুখরিত হয়েছে তিনটি প্রধান ধারা। প্রথমত ‘মঙ্গলকাব্য’, দ্বিতীয়ত ‘অনুবাদ সাহিত্য’, তৃতীয়ত’ বৈষ্ণব পদাবলী’। ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ধারা রূপে ‘বৈষ্ণব পদাবলী’ সাহিত্যিক পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে সকল বাঙালি প্রাণের পরম সুখৈশ্বর্যপূর্ণ আস্বাদক কাব্যরূপে পরিগণিত হয়েছে। আধুনিক কথাসাহিত্যে ‘বৈষ্ণব তত্ত্ব’ ও ‘দর্শন’গত প্রভাবের প্রেক্ষাপটকে নির্মাণের ক্ষেত্রে ষড়গোস্বামীগণ সহ অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ সমূহের বিশেষ ভূমিকা এক্ষেত্রে বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে জীব গোস্বামী বিরচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ‘ষটষন্দর্ভ’ বা ‘ভাগবত সন্দর্ভ’ গ্রন্থ ছাড়াও ‘বৈষ্ণবতোষণী’, বৃহৎ ভাগবতামৃত’, ‘হরিভক্তি বিলাস’, ‘লীলাস্তব’ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরেই সর্বপ্রথম ‘বৈষ্ণব পদাবলী’ বিশ্বসাহিত্যে উৎকৃষ্ট কাব্য রূপে সাহিত্যিক পদমর্যাদায় ভূষিত হয়। রবীন্দ্র মানসপটে এই বৈষ্ণব ভাবনার ভিত্তিরূপে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল— শৈশবে ভাগ্নে জ্যোতিপ্রকাশ গাঙ্গুলির সান্নিধ্য, শিক্ষক শ্রীকণ্ঠ মহাশয়ের কাছে বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের আস্বাদন, বিদ্যাপতির পদাবলীর ছন্দ ও মাধুর্যের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। যার ফলশ্রুতি রূপে ১৮৮৪ সালে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় তাঁর ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ রচনার মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছেন— একদিন মধ্যাহ্নে মেঘলাদিনে ছায়াঘন আকাশের আনন্দে তিনি ‘গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে’র মতো গীত রচনা করে অত্যন্ত আনন্দিত হন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে এই পদ সাহিত্যের ভাষা, অভিনব ছন্দ, অপরূপ ভাবতন্ময়তা, রসবৈচিত্র্য তাঁর হৃদয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাই পরবর্তী সময়ে তাঁর ‘ঘরে-বাইরে’ (১৯১৬) উপন্যাসের নানা কৌণিক আখ্যানে প্রতিফলিত হয়েছে। ‘বৈষ্ণব পদাবলী’র পরকীয়া প্রেমতাত্ত্বিক ভাবনা, শ্রীরাধা কৃষ্ণের মিলনবিরহ, সম্পর্কের গভীরতা, অসীমতা, ধর্মকেন্দ্রিক গণ্ডীর ঊর্ধ্বে যে আর্তি তার সঙ্গে ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপের মতো চরিত্রের বহুব্যাপ্ত অবস্থান ও সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ বিনির্মাণ তথা উত্থান

পতনময় আবহকে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে বা অনুষঙ্গীয় রীতিতে প্রতিবিম্বিত করেছেন। যা প্রবন্ধ মধ্যে যথাযথ বিশ্লেষণে তুলে ধরে বৈষ্ণব তত্ত্বগতদিক ও আধুনিক নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে অভূতপূর্ব মেলবন্ধনে উদ্ভাসিত হয়ে পাঠককে নবচেতনার আলোকে বারম্বার ভাবিয়েছে।

তাই রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের মতো দৃপ্ত পুরুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বিদ্যাপতির রাধা বিরহের বহুখ্যাত 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর'—উক্তি। যা নিখিলেশের হৃদয়ে বিমলার অস্তিত্বের দ্যোতক হয়েছে। এছাড়া বিমলা নিখিলেশের কথোপকথনের এক ব্যাপক অংশ জুড়ে স্থান লাভ করেছে বিদ্যাপতির বিরহতাত্ত্বিক পদ মাধুর্য। সেই সঙ্গে প্রিয় বিহনের অন্তর্জ্বালা, গোষ্টলীলার প্রসঙ্গ, বৈষ্ণবীয় হ্লাদিনী শক্তির প্রসঙ্গ, রসতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্বের উত্থাপনে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে বৈষ্ণবীয় ভাবের জোয়ারে ভাসমান এক তটিনী স্বরূপ। এই সকল দিকের সামঞ্জস্যপূর্ণ যথাযথ বিশ্লেষণ প্রবন্ধটিতে স্থানলাভ করেছে।

সূচক/ মূল শব্দ (Key Words) : ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২। ঘরে-বাইরে উপন্যাস, ৩। বৈষ্ণব তত্ত্ব, ৪। চরিত্রের অন্তর্নিহিত দোলাচলতা, ৫। মধ্যযুগের কাব্য ও আধুনিক উপন্যাসের মেলবন্ধন।

মূল প্রবন্ধ (Discussion) :

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি **১৩২২** বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন সংখ্যায় 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রেমের নানা অন্তর্গামী ও বহির্গামী চিত্ত প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ আত্মকথন রীতির এক ব্যাপ্তময় আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে কলকাতা সহ অন্যান্য নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় উচ্চবিত্ত শ্রেণির ব্যক্তিদের হৃদয়ে এক সামাজিক আদর্শের জন্ম হয়। যার মূল মন্ত্র ছিল দেশোদ্ধার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। উচ্চবিত্তদের এই আদর্শ ও দেশাত্মবোধের সংকীর্ণতায় বাংলাদেশের নগর জীবনের এক অদ্ভুত দোলাচলতার মধ্যে নর-নারীর হৃদয়জাত প্রবৃত্তি, অনুভূতি তাদের পারস্পরিক জীবনকে কতটা ঝঞ্জামুখর করে তুলেছিল, তা থেকে কিভাবে আত্মনিষ্কৃতি পেলেন, বাইরের প্রতিকূলতার দ্বন্দ্বে কীভাবে নর-নারীর দাম্পত্য জীবন দোদুল্যমান হয়ে ওঠে এই নিয়েই আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী। আর এরই সঙ্গে উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে বৈষ্ণব তত্ত্ব দর্শনের ভাবানুকূল এক অনন্য দৃশ্যপট।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে তাই দুটি স্তরকে আলোচিত হতে দেখা যায়; প্রথমত সমাজ সমস্যামূলক, দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক। নিখিলেশের মতো চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ সনাতনী ভারতীয় ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করেছেন, উচ্চশিক্ষার প্রতিপত্তিতে সে নিজের গরিমাকে প্রবহমান আত্মম্ভরি জোয়ারে মিলিত না করে, দেশমাতৃকার চরণে নিজ সত্তাকে উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন। একদিকে রাজনৈতিক আবর্তে সন্দীপের মতো চরিত্রে স্বদেশী আন্দোলনের জনজোয়ার, উচ্ছ্বসিত দেশ প্রীতির আত্মপ্রচার ও নীতিজ্ঞান

বিসর্জিত এক ভোগবহুল পঙ্কিল লোলুপতাকে তুলে ধরেছেন লেখক। আর অন্য দিকে বিমলার মতো নারী জীবন ধর্মের পূর্ণ রূপ নিয়েই উপন্যাসে আবির্ভূত হয়ে প্রতিটি স্তরে অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব জর্জরতার সঙ্গে নানাবিধ শিক্ষার মধ্য দিয়ে পরিণত হয়েছেন। নিখিলেশের কাছ থেকে প্রাপ্ত স্বাধীনতা, স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউয়ে সন্দীপের মতো ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে, দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণের আহ্বান, প্রণয়ের তীব্র প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির যন্ত্রণায় সে যেন যথার্থ আধুনিক নারী রূপেই নিজেকে আত্মবিকশিত করতে পেরেছেন, সন্দীপের আকর্ষণে দুর্বল হলেও বিমলা শেষ পর্যন্ত তার কদর্যতা, অসংযমী মনোবৃত্তির মোহজাল ছিন্ন করে নিখিলেশের আদর্শবাদ ও ত্যাগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। নিখিলেশকে সে প্রকৃত অর্থেই বুঝেছে এবং অমূল্যের মতো ছেলের প্রতি পুত্র স্নেহে উপন্যাস মধ্যে হয়ে উঠেছেন বাৎসল্যময়ী, পতিপ্রাণা, আত্মশক্তিতে বলীয়ান এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা। আর এই দাম্পত্য প্রেমময় পরিবেশে মধুর রসের অঙ্কুরিত মুকুলের স্নিগ্ধ সুবাসের বাতাবরণ নিয়ে এসেছে বৈষ্ণবীয় কবিতার অভাবনীয় সুরধ্বনি।

বিমলা, সন্দীপ, নিখিলেশের আত্মকথনের রীতিতে বর্ণিত উপন্যাসের বহু অংশে বৈষ্ণব চেতনার প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে। উপন্যাসের একটি অংশে সন্দীপের আগমনের সংবাদে সুসজ্জিতা বিমলা বৈঠকখানার ঘরের দিকে নির্দ্বিধায় এগিয়ে যাবার সময় তার মেজো জা জিজ্ঞাসা করেন তিনি কি গোষ্ঠলীলায় চলেছেন? বিমলা নিরুত্তর থাকলেও মেজজা গানের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে —

"রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে।
অগাধ জলের মকর যেমন,
ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই।"[১]

অর্থাৎ মেজো জার এই উক্তিতে স্পষ্টতই বোঝা যায়, রাই যেমন কানুর আকর্ষণে অগাধ জলে মকরের ন্যায় তার দিকে ধাবিত হয়েছে, ঠিক তেমনি বিমলাও তার প্রতি আকর্ষিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের 'গোষ্ঠলীলা'য় তার ব্রজ গোপীরা কেউ বাৎসল্য রসে, কেউ মধুর রসে, কেউ সখা রূপে, কেউ ধ্যানবস্তু রূপে শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন করেছেন, কেবল রাই মধুর রতি সম্পন্ন ভাবাবেগে কানুর পিরিতির আশায় নিমজ্জিত থেকেছেন, আর মেজো জা এদিকের ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাসে উক্ত বৈষ্ণব আঙ্গিক ব্যবহার করে সেই অনুরূপ ভাব পরিমণ্ডল গঠন করেছেন। এ যেন শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ-অনুরাগের সূচনা ভূমি রূপে সন্দীপের প্রতি বিমলার মানসিকতাকে প্রতিপন্ন করতে ব্যবহৃত হয়েছে।

নিখিলেশের আত্মকথনের একটি স্থানে তিনি বিমলাকে শুধু জীবনসঙ্গী হিসেবেই নয়, প্রাণের স্পন্দন স্বরূপ অনুভব করেছেন। বিমলার নয় বছরের দাম্পত্য জীবনে এক মুহূর্তের জন্য পুরোনো হয়ে যায়নি। কিন্তু নিখিলেশ নিজের সত্তায় এক

গভীরতর অপূর্ণতাকে অনুভব করে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে নব প্রেমের দীপ্তি আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিমলাকে তিনি সর্বদা নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন, স্নেহে আগলে নিয়েছেন, জীবনের তীব্র বিঘ্নের পরিস্থিতিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, কিন্তু বিমলাকে স্বাভাবিক দাম্পত্য অধিকার দিতে কোথাওবা কুণ্ঠিত হয়েছেন। ফলে ধীরে ধীরে তাদের সহজ, সরল নিস্তরঙ্গ দাম্পত্য জীবনে এক প্রচ্ছন্ন বেদনা, নিঃসঙ্গতার স্রোত শীতল প্রবাহে বাহিত হতে থাকে। বিমলার যে বেদনাবিধুর অবস্থা তা দিন শেষে নিখিলেশ অনুভব করেছে বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির দৃষ্টির আলোকে—

"এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,/ শূন্য মন্দির মোর !"[২]

এমনকি নিখিলেশ নিজেও স্বীকার করেছেন—

"আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যই তৈরি, ওর যে দরজা বন্ধ। আমার যে দেবতা ছিল সে মন্দিরের বাইরেই বসে ছিল, এতকাল যা বুঝতে পারিনে। মনে করেছিলুম অর্ঘ্য সে নিয়েছে, বরও সে দিয়েছে— কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর।"[৩]

অর্থাৎ বিদ্যাপতি পূর্বরাগ ও অভিসার নিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃতিত্ব দেখালেও মাথুর ও ভাবসম্মিলনের পদে এক অপরূপ দৃষ্টিনন্দন, অনুভূতিপ্রবণ আবহ নির্মাণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেলে শ্রীরাধা বিরহ ব্যাকুলা হয়েছেন। বিরহের যন্ত্রণাকে কবি বিদ্যাপতি বর্ষা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিষ্ট করে, হৃদয়ার্তিপূর্ণ আবেদনকে দয়িত সঙ্গ ছাড়া বিলাপের আবর্তে তুলে ধরে জানিয়েছেন, তার এই বিরহের যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা কারও নেই। রতির ভাবকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে তাত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র প্রেমপাত্রের অর্ঘ্য উপহার দিতে চান। উপন্যাসে ঠিক এই সমগোত্রীয় ভাবনাকেই রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশের বিমলা বিরহের যন্ত্রণায় প্রতিস্থাপিত করেছেন।

প্রতিবছর ভাদ্রমাসে নিখিলেশের সঙ্গে বিমলার এই ভরা যৌবনে একসঙ্গে চারিচক্ষুর মিলন হত শুক্লপক্ষে শামলদহ'র বিলে। তারা একসঙ্গে বোটে ভ্রমণ করতেন, কৃষ্ণা পঞ্চমীতে জ্যোৎস্নার শেষ অন্তিম প্রহরে তারা বাড়ি ফিরে আসতেন। উন্মুক্ত প্রকৃতিতে মিলন সংগীতের মধ্য দিয়ে উচ্ছলিত জলের কলধ্বনি, পূর্ব বায়ু বহমান গতিতে শ্যামল পৃথিবীর অবগুণ্ঠনে স্ত্রী-পুরুষের যে মিলন, যা আদিম মিলনের ন্যায় তাদের জীবন রাগিণীতে সংযোজিত করেছিল নতুন সুরধ্বনি। তাদের এই বিবাহের মধুর পর্বের দীর্ঘ সাত বছর পর আজ আকাশের নীলিমায়, কুমুদবন প্রান্তে অদৃশ্য নীরব শঙ্খধ্বনিত ভাদ্র মাসের সেই শুক্লপক্ষে, এক অভুতপূর্ব বৈষ্ণবীয় প্রেক্ষাপটে নিখিলেশ বারম্বার বিমলাকে স্মরণ করেছে ভরা যৌবনে, ভাদ্র মাসের পুণ্যতিথিতে যৌবন উদ্দীপনার প্রবল তাড়নায়। কিন্তু নিয়তির খেলায় বিমলা তার সাংসারিক গৃহে থাকলেও মনের গৃহে অনুপস্থিত রয়ে গেছে। তার সে মন-মন্দির আজ শূন্য। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় তা জানিয়েছেন বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতায় বাঁশি বাজে;

কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড় নিস্তব্ধ; সেখানে কান্নার সুরও বেসুরো শুনায়। তাইতো বিমলাকে অন্তর থেকে চাইলেও তিনি তাকে বন্দী করতে চান না। অর্থ্যাৎ ভালোবাসা যেখানে মিথ্যাপ্রায় সেখানে সে ক্রন্দনের সুরে মিথ্যাকে বাঁধতে চান না। নিখিলেশের বেদনার গভীরে নিমজ্জিত থেকে হয়তো সে তাকে ভালোবাসবে কিন্তু বিমলাকে সে ভালো রাখতে অসমর্থ হবেন। তাইতো সে বিমলাকে পূর্ণ মুক্তি দিতে চান তার মনের আকাশে। শুধুমাত্র মায়াজালে জড়িয়ে রাখলে বিমলার মঙ্গলসাধন হবে না। স্ত্রী পুরুষের এই গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রণয় ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আবহ নির্মাণে, তাদের হৃদয়জাত অতৃপ্ত বেদনার রাগিনীকে বাস্তবগ্রাহ্য করে তুলতেই রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশের মুখ দিয়ে বিদ্যাপতির বিরহের পদসমূহের উচ্চারণ করিয়েছেন। তার সমস্ত জীবনে সাধনার ফলে গড়ে তোলা নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রাসাদ কেন শূন্য হল? এই প্রশ্নের উত্তর নিখিলেশকে আরো বেশি বিরহ সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছে।

তাইতো নিখিলেশ বাস্তবকে যতবেশি একান্তভাবে উপলব্ধি করেছে, ততই তার মধ্য থেকে সত্য উন্মোচিত হয়েছে; সে মুক্তি অনুভব করেছেন। বিমলার অনুভূতিই তাকে বাস্তবের প্রতি গভীর আকর্ষণে মোহিত করেছে। তাইতো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও নিখিলেশ তার দুঃখের সীমা পাচ্ছেন না। চন্দ্রনাথবাবুর মতো বিচক্ষণ মানুষের মনের গভীর থেকে জীবন বাতায়নে যে সত্যকে তিনি দেখতে পান, তাকে গানের পংক্তিতে তুলে ধরেন—

“বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোইয়াঁয়বি/ হরি বিনে দিনরাতিয়া ?”[৪]

জীবনে এই সত্যকে না পেয়েই নিখিলেশের এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা। সেই সত্য উপলব্ধির পথেই নিখিলেশ আজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। অতৃপ্ত হৃদয়ে তাই তিনি প্রেম সত্য ও আত্মচৈতন্যের সত্যকে তার জীবন সমুদ্রের শূন্য মন্দিরে স্থান দিতে কাতর প্রার্থনা করেছেন, বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির ভঙ্গিমায়। যে বিরহে রাধাকৃষ্ণের হৃদয় বারবার দগ্ধ, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তারা যেন সেই বিরহ দহন জ্বালাকে অতিক্রম করে অনন্ত অসীমে মিলিত হয়েছেন। জীবনের এই নিত্য-অনিত্য লীলাই যেন নিখিলেশের অনুভূতিতে প্রকটিত হয়েছে।

এদিকে সন্দীপের মতো ভোগসর্বস্ব পুরুষ বিমলার মতো বিবাহিত নারীকে শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদার নিরিখে কামনা করেছিল, বিমলার সঙ্গে তার কোনদিনই শুদ্ধ প্রণয় বা আত্মিক সম্পর্ক হাজার ঘনিষ্ঠতার পরও গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। কারণ সন্দীপের মানসিকতা তার অনুকূলে ছিল না। বিমলার আত্মকথার বহু অংশে সন্দীপের কামনার আভাস তার উক্তি থেকেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বিমলা তার প্রতি আকৃষ্ট হলেও কখনোই তিনি নিজেকে সন্দীপের মতো উগ্র জাতীয়তাবাদী ও লোলুপ মানসিকতার পুরুষের কাছে ধরা দেননি। সে বিমলাকে ‘মক্ষীরাণী’ সম্বোধনের মধ্য দিয়ে প্রলোভিত করতে উদ্যত হয়েছে—

"আমার নিকড়িয়া রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে।
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।"[৫]

এইপ্রকার উক্তিতে যেভাবে প্রেমিক রসিক নাগর তার প্রেয়সীকে আহ্বান করেছে, ঠিক সেভাবেই সন্দীপ আড়ালে নিজ মনোবাঞ্ছাকেই এর মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বিমলা কোন ভ্রুক্ষেপ না করে নিখিলেশের হৃদয় মাহাত্ম্যকে অনুভব করেছেন। সন্দীপ তার মধ্যে শক্তি দেখেছেন। কিন্তু এই শক্তির ব্যাখ্যাও নিখিলেশই বিমলাকে শিখিয়েছেন প্রত্যক্ষ 'বৈষ্ণবতত্ত্ব' অবতারণার মধ্য দিয়ে। বিমলার কথায়—তিনি বলেন, আমরা বৈষ্ণবতত্ত্বে 'হ্লাদিনী শক্তি'কে প্রত্যক্ষ দেখবার জন্যেই এত ব্যাকুল হয়ে বেড়েচ্ছি, যখন কোথাও দেখতে পাই তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি আমার অন্তরের মধ্যে যে ত্রিভঙ্গ বাঁশি বাজাচ্ছেন তার বাঁশির অর্থটা কী। বলতে বলতে তিনি একদিন গান ধরতেন—

"যখন দেখা দাওনি রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশি।
এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেল ভাসি।
তখন নানা তানের ছলে।
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,
এখন আমার সকল কাদা রাধারূপ উঠল হাসি।"[৬]

প্রকৃতপক্ষে নিখিলেশের এই উক্তি বিমলার সকল চেতন সত্তাকে বিলুপ্ত করে। তিনি বলেন তিনিই 'শক্তিতত্ত্ব', তিনিই 'রসতত্ত্ব', অর্থাৎ হৃদয়ের পরশমণির স্পর্শেই ব্যক্তি চৈতন্যকে নব নব রূপে জন্ম দেয়, আর নিখিলেশের এই বুদ্ধির তেজস্বিতায় সে বিমলার কাছে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেই পূর্ণশক্তিমান হয়েছেন; এমনকি প্রেমের পরাকাষ্ঠায় মধুর রসের ধারক রূপে বিমলার জীবনকে আনন্দ ধারায় সিক্ত করেছেন। আর এভাবেই রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, পূর্ণতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সঙ্গে বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনগত চেতনাকে সমান্তরাল প্রবাহে সঞ্চারিত করেছেন। এ 'হ্লাদিনী শক্তি'র কথা নিখিলেশ উপন্যাস মধ্যে তুলে ধরেছেন, সেই 'হ্লাদিনী' হল ভগবত সত্তার অন্যতম একটি অংশ। আনন্দ সম্পর্কিত বিষয় 'হ্লাদিনী'র অংশ বিশেষ। এই শক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ আনন্দানুভূতি লাভ করেন এবং জাগতিক জীবনের আনন্দ বিধান করতে পারেন। এই 'হ্লাদিনী'র সহকারী দুটি ধর্ম 'সন্ধিনী' অর্থাৎ অপর সত্তাকে জানা, দ্বিতীয়ত 'সংবিৎ' অর্থাৎ ভগবানের নিজের আত্মচৈতন্যকে লাভ করা। এই তিনটি গুণের মধ্যে 'হ্লাদিনী শক্তি'ই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই 'হ্লাদিনী'র দ্বারাই প্রভু বিচিত্র রস উপভোগ করে থাকেন। এই আনন্দের সারভূত হলেন শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধা নিজে প্রেম স্বরূপিনী হয়ে জগতে নিত্য প্রেম প্রদান করেন। তাইতো প্রভুর হৃদয়ে শ্রীরাধাই অনন্ত 'হ্লাদিনী' রূপে বিরাজমান। এই 'হ্লাদিনী'র বিন্দুমাত্র কণিকা জীবের উপর প্রবাহিত হলে সে অনন্ত প্রেমরস ধারার আস্বাদক হন। আর 'হ্লাদিনী শক্তি'তে পরম করুণা, ঐশ্বর্য বিদ্যমান থাকায় এর মাধুর্য এত জগৎ ব্যাপী প্রসারিত। তাইতো ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ

ঘরে-বাইরে উপন্যাসে নিখিলেশের মাধ্যমে এই বৈষ্ণব তত্ত্ব অবতারণা করিয়ে বিমলাকেই তার 'হ্লাদিনী শক্তি' রূপে অধিষ্ঠিত করেছেন। কারণ একমাত্র বিমলাই তাকে অপার আনন্দ সমুদ্রে পতিত করতে পারেন, আবার পরাধিন দেশবাসীর জন্য নিত্য সহানুভূতির রসে তাদের দিশা দেখিয়ে পরম আনন্দে কাছে টেনে নিতে সমর্থ হন। বিমলাও উপন্যাসে নিজেকে জানিয়েছেন— নিখিলেশের কাছ থেকে এই তাত্ত্বিক আলোচনায় সে নিজেই অনুভব করেছেন যে তিনি 'শক্তিতত্ত্ব', তিনিই 'রসতত্ত্ব'। তার কোন বন্ধন নেই, তার মধ্যেই সম্ভব, সে যা কিছু স্পর্শ করেছে, তাতেই তিনি সৃষ্টি করেছেন তার এই জগৎকে। তার হৃদয়ে পরশমণি ছোঁয়াবার আগে শরতের আকাশে এত সোনা ছিলনা।

'শক্তিতত্ত্ব' এর আলোচনার মাধ্যমে বিমলা নতুন করে তার হৃদয় বীরকে, ঐ সাধককে ঐ ভক্তকে ঐ জ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল আলোর তেজে, ভাবের রসে অভিষিক্ত করে তার প্রতিভাকে সে স্পষ্ট অনুভব করেছে। সেকারণেই নিখিলেশের প্রাণে সে প্রাণ ঢেলেছে, নিজ সৃষ্টি তথা 'হ্লাদিনী'র সারভূত অনুধাবন করে। সেই তার অন্তরে কৃষ্ণপ্রভু। অন্যদিকে নিখিলেশের অন্তরেও বিমলাই শ্রীরাধা রূপী 'হ্লাদিনী' ও আনন্দের মূর্ত ধারা রূপে বিরাজমান থেকেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক চেতনায় বৈষ্ণব ভাবানুকূলতার প্রবাহ কৈশোরের প্রথম থেকে শুরু করে এবং তার প্রভাব পরিণত বয়সের রচনাতেও ফুটে ওঠে। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে তাই বিমলা-নিখিলেশের দাম্পত্য রাজ্যে নিখিলেশই তার কাছে হয়ে উঠেছেন একমাত্র প্রাণপুরুষ। স্বামীর উন্মুক্ত স্নেহ, ভালোবাসার গভীরতা বোঝার মনোবৃত্তি প্রথম জীবনে না থাকলেও সময়ের কালচক্রে সন্দীপের মতো কুটিল মোহগ্রস্ত ব্যক্তির আকর্ষণ বিকর্ষণে সে নিজের ও তার স্বামীর মূল্য বুঝতে শিখেছেন। নিখিলেশের আদর্শবাদ, সংযমী রূপ, সন্দীপের নগ্ন নির্জনতা ও স্থূল ভোগলীপ্সার কাছে ধীরে ধীরে বিমলার অন্তঃকরণে প্রকৃত ভালোবাসার প্রতিচ্ছবিকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করেছে। আর এই স্নেহ মায়ার প্রতিবেশকে শক্ত মজবুত করতে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে একবার সন্দীপ বিমলার কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চাইলে বিমলার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সে একটি গানের সুরে বলে পাঁচ হাজার টাকা তোমাকে এনে দেব। ঠিক যে সুরে শ্রীরাধা গেয়েছিলেন—

"বধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্ত্যে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল।
বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে,
সবার কানে বাজবে না সে—
দেখ্ লো চেয়ে, যমুনার ওই ছাপিয়ে গেল কূল।"[৭]

সে আরো জানায় বাঁশির অভ্যন্তরের ফাঁক সরু ও বাধাময় বলেই এমন সুর নির্গত হয়। কিন্তু অধিক চাপে তা ভেঙে যেতে পারে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট জানিয়েছেন রাধিকার গানের সঙ্গে বাস্তবের বিমলার একটি কথারও মিল নেই। এই বাঁশির রূপক বিমলা উদ্ধৃত করেছেন শুধুমাত্র মোহকে বোঝানোর জন্য। মোহকে বাদ দিলে সেটিই হচ্ছে ভাঙা বাঁশির ভিতরের ফাঁকা অংশ। অর্থাৎ মোহ সত্য, সেটিই বাঁশি। সেই নির্মল শূন্যতার যে অভাবনীয় আস্বাস নিখিলেশই একমাত্র পেয়েছেন তা তার মুখচ্ছবির মধ্যে বিমলা স্পষ্ট দেখেছেন। নিখিলেশ সেই বাঁশির মোহহীন শূন্যতাকেই প্রকৃত মানবানুভূতির মধ্য দিয়ে তার জীবনে অনুভব করেছেন। কিন্তু বিমলার মানসিকতায় মোহের প্রতি এক বিষম পক্ষপাতিত্ব ছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। কারণ সন্দীপের ব্যক্তিত্বই তাকে সন্দীপের প্রতি পতঙ্গের প্রতি বহ্নির মোহের মতো আকৃষ্ট করেছিল। তাইতো সে যমুনার তীরে বাঁশির শব্দে উন্মত্ত হয়ে তার কেশে প্রণয় পুষ্প পরিধান করতে চেয়েছেন ঠিকই কিন্তু জীবন তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে এ প্রেম এ মোহ শাশ্বত নয়। সে জীবনের একপর্যায়ে নিখিলেশকে উপলব্ধি করে সন্দীপের মতো স্বার্থান্বেষীর সঙ্গ পরিত্যাগ করতে দ্বিধান্বিত হননি।

তাইতো পরিশেষে একথাই বলা যায়, গোষ্ঠলীলায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতির প্রয়োগে বিমলার চিত্তচাঞ্চল্যকে ব্যাখ্যা করেছেন মেজো রাণী, নিখিলেশের বিমলা বিহনের আবহ তথা তার স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে ভাদ্রমাসের এক নিঃসঙ্গ বেলায় বিদ্যাপতির মাথুরের পদের মধ্যে লৌকিক প্রেমের এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক তথা স্মৃতি মেদুর এক রোমান্টিক আঙিনায় রবীন্দ্রনাথ পাঠককে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। সর্বোপরি শ্রীরাধার ‘হ্লাদিনী শক্তি’, বৈষ্ণবীয় ‘শক্তিতত্ত্ব’ অর্থাৎ ‘পরম-স্বরূপতত্ত্ব’, ‘কৃষ্ণতত্ত্ব’, ‘রাধাতত্ত্ব’ ও ‘রসতত্ত্ব’-এর স্পষ্ট উচ্চারণে নিখিলেশ সহ অন্যান্য চরিত্রের মাধ্যমে অবতারণা করিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিমলাকে তার প্রতি প্রকৃত প্রেমের মূল্যবোধ জাগরণে উজ্জীবিত করেছেন। এভাবেই ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস রবীন্দ্রচেতনায় প্রকৃত আধুনিক হয়েও মধ্যযুগীয় রোমান্টিক আবহের চরণ স্পর্শ করেছে। তিনি তাঁর বহু কাব্যে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, তাই যথাযথ বলেছেন— অসীম চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা। পদাবলীর প্রয়োগে তাঁর উপন্যাসে এই বক্তব্যই যথার্থ হয়েছে—

“আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
এখনো যে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে
এখনো প্রেমের খেলা সারা দিন সারা বেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।”[৮]

তথ্যসূত্র (References) :

১. ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’, চতুর্থ খণ্ড : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, ১২৫ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১০, পৃষ্ঠা ৫১২।

২. তদেব : পৃষ্ঠা ৫২১।

৩. তদেব : পৃষ্ঠা ৫২১।

৪. তদেব : পৃষ্ঠা ৫২৫।

৫. তদেব : পৃষ্ঠা ৫২৭।

৬. তদেব : পৃষ্ঠা ৫৩০।

৭. তদেব : পৃষ্ঠা ৫৪৭।

৮. ‘পদাবলী সাহিত্য’ : শ্রীকালিদাস রায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম করুণা সংস্করণ : আগস্ট ২০০৪, পৃষ্ঠা ৩১।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography):

১. গঙ্গোপাধ্যায়, ড. সুখেন্দু সুন্দর : ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা’, সোনার তরী, ৪এ নর্থ নওদাপাড়া রোড, কলকাতা-৫৭, প্রথম চলিত ভাষার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭।

২. রায়, কালিদাস : ‘পদাবলী সাহিত্য’, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ২০০৪।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, সপ্তম সংস্করণ : ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯-২০১০।

৪. বসু, অরুন কুমার ও বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল (সম্পাদিত) : ‘নব সংস্করণ বৈষ্ণব পদাবলী’, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রামনাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১০।

স্বদেশপ্রীতি ও দ্বিজেন্দ্রলালের ‘রাণা প্রতাপসিংহ’ নাটক

অভিজিৎকুমার ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ (Abstract): বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা সাহিত্যের নানা প্রকরণে বিচিত্র বিষয় উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে তাঁর রচিত নাটকগুলিতে নানাবিধ বিষয় রূপায়িত। সেই বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম স্বদেশপ্রীতি। তাঁর ‘রাণা প্রতাপসিংহ’ নাটকে দেশভক্তির কথা স্পষ্টাকারে উচ্চারিত। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালি স্বদেশপ্রীতির কোন গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন রাখতে পারেনি। ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে নীলবিদ্রোহের সময় থেকে বাঙালিরা বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করে দেশপ্রেমের পরিচয় রাখে। সেই সঙ্গে হিন্দুমেলা, ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা খবরের কাগজের প্রকাশ সাধারণ মানুষকে দেশের ইতিহাস জানতে সহায়তা করে। তাদের মধ্যে জেগে ওঠে জাতীয়তাবাদ। অন্যদিকে ব্রিটিশরা নিজেদের রাজত্বকাল নিষ্কন্টক করতে ‘নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন’, ‘ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট’ প্রভৃতি চালু করে। কিন্তু দমে না গিয়ে আরো বেশি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ভারতীয়রা। হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজের জিনিস বর্জন করার পাশাপাশি সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে উৎসাহী হয়। লেখা হয় স্বদেশ অনুরাগের বিখ্যাত বিখ্যাত নাটক। সেগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘রাণা প্রতাপসিংহ’।

টডের ‘রাজস্থানের কাহিনী’ অবলম্বনে লেখা ‘রাণা প্রতাপসিংহ’ নাটকে প্রতাপসিংহের মাধ্যমে শৌর্য-বীর্য ও দেশপ্রেমের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। প্রতাপ ভ্রাতা শক্তসিংহের মধ্যে নিজস্ব যুক্তি, সাহসিকতা, উদারতা, ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার ছাপ লক্ষণীয়। নারী চরিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে বিচিত্র গুণের সমাবেশ। যাইহোক ‘রাণা প্রতাপসিংহ’ নাটকটিতে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও স্বদেশপ্রেমের চিত্রাঙ্কনে নাটককার সফল।

মূলশব্দ (Key Word): সাঁওতাল বিদ্রোহ, অগ্নিসংযোগ, নীলবিদ্রোহ, হিন্দুমেলা, পুরাতত্ত্ব, দেশপ্রেম, ন্যাশনাল পেপার, ন্যাশনাল থিয়েটার, জাতীয়তাবাদ, বয়কট, প্লেগ, মহামারী, সম্প্রীতি, দেশাত্মবোধ, শৌর্য-বীর্য, সংকীর্ণতা, পরোপকারী, সীমাবদ্ধতা, অতিনাটকীয়তা, অন্তর্দ্বন্দ্ব।

মূল আলোচনা (Discussion):

কবি, নাটককার, গীতিকার ও সুরকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। এছাড়া বিচিত্র ধরনের গদ্যসাহিত্য সৃষ্টিতেও তাঁর অবদানের কথা মনে রাখতে হবে আমাদের। ‘আষাঢ়ে’, ‘মন্দ্র’, ‘আলেখ্য’, ‘ত্রিবেণী’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের স্রষ্ঠা যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তেমনি তাঁর কলম থেকেই বেরিয়েছে ‘সমাজ বিভ্রাট ও কল্কি

অবতার', 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পুনর্জন্ম', 'আনন্দ বিদায়'-এর ন্যায় প্রহসন ও নাটিকা। তিনিই লিখেছেন 'পাষাণী', 'সীতা', 'ভীষ্ম'— এই তিনটি পৌরাণিক নাটক এবং 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' নামে দুটি সামাজিক নাটক। তবে 'রাণা প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'নূরজাহান', 'মেবার পতন', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে অমর হয়ে আছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এছাড়া দু'খণ্ডের 'আর্যগাথা' এবং 'হাসির গান' বইতে যেমন তাঁর গানগুলি সঙ্কলিত তেমনি কাব্য ও নাটকের মধ্যে অজস্র গান ব্যবহার করেছেন তিনি। আবার 'জাতিভেদ', 'ইংরাজী ও হিন্দু সংগীত', 'বাঙ্গালায় রঙ্গভূমি', 'খুকুমণির ছড়া', 'নবীনচন্দ্র', 'উপমা' প্রভৃতি মননশীল প্রবন্ধের রচয়িতার নাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। আসলে সাহিত্যের নানা প্রকরণে বিবিধ বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন যুক্তিবাদী, স্বাধীনচেতা এই লেখক। সেই বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম স্বদেশচেতনার রূপায়ণ। তাঁর রচিত সাহিত্যে বিশেষত নাট্যসাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির প্রকাশ, বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে উনিশ শতকের স্বদেশপ্রীতির প্রভাব কতখানি পড়েছে তা আলোচনা করার পূর্বে সে সময়ের সমাজ ইতিহাসের কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ, এমনকি ১৯৬০ পর্যন্ত বাঙালির যে স্বদেশচেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। আমরা জানি ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানানো হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সেই আন্দোলন। অমানবিক নিষ্ঠুরতায় সেই বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ। সাহেবরা গ্রামের পর গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে, সাঁওতালদের উপর বলপ্রয়োগ করে তাদের বিরুদ্ধে দানা বাধা বিদ্রোহকে রুখে দেয়। এরপর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সারা ভারতের সঙ্গে বাংলাতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহে সিপাহীরা গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিদ্রোহ বাংলার ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর প্রভৃতি জায়গায় মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বাঙালি তখনও পর্যন্ত ইংরেজ শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হতে পারেনি। তাই অনেকেই এগিয়ে আসেনি, এই বিদ্রোহকে স্বাগত জানাতে। ইংরেজকে 'ঈশ্বরের দূত' ভেবে তাদের রাজত্বে থেকে যেতে চেয়েছে অধিকাংশ বাঙালি।

বাঙালির এই ভাবধারার পরিবর্তন ঘটে ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে নীলবিদ্রোহের সময় থেকে। বিদ্রোহীরা অস্ত্র ছাড়া শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু করে। তাঁরা নীলকুঠিতে কাজ করতে অসম্মত হয়। সাহেবদের পালকি বহন করা থেকে নিজেদের বিরত রাখে। এ সবের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ইংরেজের কার্যকলাপের প্রতি প্রতিবাদ শুরু হয়। তারা অনুভব করে ভারতবর্ষ ইংরেজদের নয়, বাঙালি তথা ভারতবাসীর।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সম্পাদিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করে, তৎপর হন দেশের গৌরব প্রচারে। এর আগে প্রতিষ্ঠিত 'দেশহিতৈষণী সভা',

'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন', 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি', 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি সভাগুলি কাজ করত উচ্চবিত্তের ব্যক্তি স্বার্থরক্ষায়। রাজনারায়ণের সভা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে দেশের হিতসাধনে এগিয়ে আসে।

এরপর ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সহায়তায়, নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে 'চৈত্রমেলা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০-এ এই মেলার নাম হয় 'হিন্দুমেলা'। 'চৈত্রমেলা' বা 'হিন্দুমেলা'-র মাধ্যমে তুলে ধরা হয় দেশের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতিকে। এর দ্বারা সাধারণ মানুষ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে নবগোপাল মিত্র বার করেন 'ন্যাশনাল পেপার'। দেশের জিনিস ব্যবহারের জন্য প্রচার চালাতে থাকে এই পত্রিকা। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে নাটকের অভিনয় দেখে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে বাঙালিরা। ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় বাংলা নাটকে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'চাকর দর্পণ', অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ' প্রভৃতি নাটকে ইংরেজের অমানবিক অত্যাচারের কথা রূপ লাভ করে। লুন্ঠনকারী, অত্যাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করল বাংলা খবরের কাগজ। বিশেষ করে 'অমৃতবাজার', 'সোমপ্রকাশ', 'ভারত মিহির', 'ভারত দর্পণ', 'সাধারণী' প্রভৃতি পত্রিকা ইংরেজের মুখোশ খুলে দিতে সচেষ্ট হয়।

ব্রিটিশ সরকার নিজেদের রাজত্বকালকে নিষ্কণ্টক করতে পরপর কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন' চালু করে বন্ধ করা হয় ব্রিটিশ বিরোধী নাটকের অভিনয়। দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণের উদ্দেশ্যে ১৮৭৮-এ 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টে'র প্রচলন করল ইংরেজরা। 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টে'র পাশাপাশি এ বছরেই 'আর্মস অ্যাক্টে'র দ্বারা দেশীয় মানুষ যাতে আত্মরক্ষার জন্যও অস্ত্র রাখতে না পারে তার ব্যবস্থা করল ব্রিটিশ সরকার। বাঙালিরা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে দেখে পরীক্ষার্থীদের বয়সসীমা করে দেওয়া হল একুশ থেকে কমিয়ে উনিশ। যাতে বাঙালিরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অথচ বয়স সীমার কোন পরিবর্তন হল না ইংরেজদের ক্ষেত্রে। এমনকি যোগ্যতা থাক বা না থাক সমস্ত সরকারি উচ্চপদ কুক্ষিগত ছিল ইংরেজদের জন্য। ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতে বাঙালির মধ্যে চেতনা লক্ষ্য করা গেল। তারা উদ্বুদ্ধ হল জাতীয়তাবাদে। হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে দেশের কাজে এগিয়ে এল।

অতঃপর ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড রিপন গভর্ণর জেনারেল হয়ে এসে তুলে নেয় 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি ফিরে পায় স্বাধীনতা। লবণ কর প্রত্যাহার করা হয়। ইলবার্ট বিল চালুর মধ্য দিয়ে কালো চামড়ার ভারতীয় বিচারকরা, সাদা চামড়ার ইংরেজদের বিচার করার অধিকার পায়। ইংরেজ এ সবের বিরোধিতায় সরব হয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে ডাক দেওয়া হল ইংরেজের জিনিস বয়কটের। পত্র-পত্রিকায় দেশের স্বাধীনতার প্রয়োজন একথা প্রচার শুরু হল। সেই সময়ে বাংলাদেশে প্লেগ মহামারী আকার ধারণ করে। ইংরেজরা প্লেগের চিকিৎসার নামে বাঙালির গোপন অঙ্গে হাত দিয়ে অত্যাচার চালাতে থাকে। এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে বাঙালি সমাজ। তারা হত্যা করে প্লেগ অফিসার ব্যান্ড ও আর্থারকে। এদের হত্যা করার কারণে গ্রেপ্তার করা হয় চাপেকার ভাইদের। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করেন বাল গঙ্গাধর তিলক। প্রতিবাদ করার জন্য তিলককেও জেলে পাঠায় ব্রিটিশ সরকার। তখন ভারতবাসী এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সরব হয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'সিরাজদৌল্লা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই বইতে সিরাজকে প্রজাবৎসল, দেশপ্রেমী হিসাবে দেখিয়ে তাঁকে জাতীয় নায়কের মর্যাদা দেওয়া হয়। নানা কারণে ভারতীয়রা যখন সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে তখন লর্ড কার্জন বড়লাট হয়ে এসে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ভাঙতে সচেষ্ট হন। তিনি ১৯০৩ থেকেই বঙ্গ বিভাজনের প্রচেষ্টা শুরু করেন। বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করা হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। দেশ নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটকে এ সময়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সুর ধ্বনিত হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো নাট্যকাররা তাঁদের নাটকে স্বদেশপ্রেমের কথা বলতে শুরু করেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে সর্বপ্রথম জাতীয় ভাবোচ্ছ্বাসকে রূপদান করেন। এছাড়া তাঁর 'পদ্মিনী', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'চাঁদবিবি', 'বাঙ্গালার মসনদ' প্রভৃতি নাটক জাতীয়তাবাদের বার্তা বহন করে। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদৌল্লা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি নাটক ব্যক্ত করে স্বদেশপ্রীতিকে। একই ভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে শোনা যায় জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের সুর। রাজপুত ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়ে, তাদের ত্যাগ, শৌর্য-বীর্য ও দেশপ্রেমের কথা উপস্থাপন করা হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) এবং 'মেবার পতন' (১৯০৮) নাটকে। এগুলির মধ্যে 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যে দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টডের 'রাজস্থানের কাহিনী' থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটক রচনা করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এ নাটকে প্রতাপসিংহের শৌর্য-বীর্য এবং দেশপ্রেমের কাহিনী চিত্রিত। মুঘল সৈন্যের আক্রমণে প্রতাপ হয়েছেন রাজ্যহারা। পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন অরণ্যে। তাঁর আদেশে মেবারের অধিবাসীরা পরিত্যাগ করেছে নিজ রাজ্য। ফলে মেবার শ্মশানের রূপ ধারণ করেছে। এরূপ অবস্থায় আকবর, প্রতাপসিংহকে বশীভূত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে তাঁর প্রধান সেনাপতি মানসিংহের ওপর। হলদিঘাটে বিশাল মুঘল বাহিনীর সঙ্গে সামান্য সৈন্য বল

নিয়ে বীর বিক্রমে লড়াই করেন প্রতাপসিংহ। মুঘল সৈন্যরা তাকে বারবার বন্দী করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। একবার মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও, সারাজীবন লড়াই চালিয়ে মেবারের কিছু অংশ উদ্ধার করেন তিনি। রাজধানী চিতোর উদ্ধারে ব্যর্থ হলেও তাঁর লড়াকু মানসিকতা এ নাটকে উনিশ শতকীয় স্বদেশপ্রেমের বার্তা বহন করে এনেছে।

এই নাটকে প্রতাপসিংহ ছাড়া উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্র হল শক্তসিংহ ও মানসিংহ। প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ জটিল চরিত্রের মানুষ। জন্মভূমি মেবারের প্রতি তাঁর খুব একটা আকর্ষণ ছিল না। এমনকি অগ্রজ প্রতাপের সঙ্গে সম্পর্কও খুব মধুর ছিল না। তিনি তাঁর মতো যুক্তি দিয়ে সবকিছুকে বিশ্লেষণ করতেন। তবে তিনি যে স্পষ্টবাদী, সাহসী মানুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এমনকি প্রচলিত সামাজিক বিষয়গুলিকে অস্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই তাঁর। তিনি প্রণয় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন আকবরের ভাগিনেয়ী দৌলতউন্নিসার সঙ্গে। কিন্তু একথা ঠিক প্রতাপসিংহের দেশপ্রেমের আদর্শ শক্তসিংহ কে জীবনের নতুন পথ খুঁজে বার করতে সহায়তা করেছে।

অন্যদিকে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ সামাজিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। তিনি রাজপুত হয়েও মুসলমান ধর্মাবলম্বী মুঘলদের সঙ্গে নিজের পরিবারের সদস্যের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। কিন্তু এ কাজের জন্য প্রতাপসিংহের কাছে সে অপমানিত হয়েছে। আসলে মানসিংহ চরিত্রের এই বৈশিষ্টের মধ্য দিয়ে নাট্যকার ব্যক্ত করেছেন নিজের ব্যক্তিগত মতামত। অনুদারতা ও সামাজিক সংকীর্ণতা বর্জন করতে না পারলে দেশাত্মবোধ যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তা নাট্যকার তুলে ধরেছেন এ নাটকের মধ্য দিয়ে। এদিক থেকে মানসিংহ চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

নারী চরিত্রগুলির বেশীরভাগই নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত। এ নাটকে ইরাকে দেখানো হয়েছে পরোপকারী মানুষ হিসাবে। সে মনে করে মানুষের কাজের সীমা শুধু স্বদেশে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, তা ব্যপ্ত হওয়া উচিত সারা বিশ্বজুড়ে। সে বলে—

> "না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন স্বর্গ হবে। যেদিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার প্রীতি, ভক্তি বিরাজ করবে। যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে—সেই স্বর্গ।"

অন্যদিকে প্রেম যে বিশ্বজয়ী তা ব্যক্ত হয়েছে দৌলতউন্নিসার চরিত্রে। আর মেহেরউন্নিসা মানবতাবাদী নারী। সবার উপরে যে মনুষ্যত্ব তা তার কথায় প্রকাশিত। রাজপুত রমণীর সাহস, বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে যোশী চরিত্রে।

আসলে প্রতাপসিংহ দেশপ্রেমিক হলেও নিজেকে জাতপাতের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারেননি। এজন্য তিনি মানসিংহকে অপমান এবং ভাই শক্তসিংহের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে দ্বিধা করেননি। এই সব সংকীর্ণতার কারণে প্রতাপসিংহ ট্রাজেডির নায়কের

মর্যাদা পেতে যেমন ব্যর্থ হয়েছেন তেমনি সামাজিক সংকীর্ণতা অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে দেশাত্মবোধের পথে।

'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা যে রয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। ঘটনাগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যুদ্ধের সময়ে বয়স্ক শক্তসিংহের কাছে উপস্থিত হয়ে, হঠাৎ করে তাঁকে প্রেম নিবেদনের বিষয়টি নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ। আকবরের সঙ্গে মেহেরউন্নিসার কথোপকথনে যে সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে তা যথার্থ হয়নি। এছাড়া কয়েকটি চরিত্রের সন্নিবেশ সঠিক বলে মনে হয় না। এমনকি অতিনাটকীয়তা, অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতার অভাব প্রভৃতি নেতিবাচক বিষয় এ নাটকে পরিলক্ষিত। তা সত্ত্বেও একটা নির্দিষ্ট সময়ের ইতিহাসের কিছু বিষয়কে যেমন এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে তেমনি উনিশ শতকের স্বদেশপ্রেমের বিষয়টি সুচারুরূপে চিত্রিত। সে দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকটির সার্থকতা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

সহায়ক গ্রন্থ (References) :

১. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, জুন-১৯৯৯।
২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার মিত্র সম্পাদিত, বিষয়-প্রবন্ধ, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল-১৯৯৬।
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, মে-২০০৩।
৪. রথীন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার, বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ-১৪১৬।
৫. রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, মে-২০০৪।
৬. সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ-১৯৯৭।
৭. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর-১৯৯৪।
৮. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কার্তিক-১৪০৩।
৯. সুধীর চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণ বিস্মরণ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ-২০০৮।
১০। স্বপন বসু, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর-২০০০।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজন–অভিবাসন এবং পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু নারী সমাজ

সঙ্ঘমিত্রা দাস
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: র‍্যাডক্লিফের লাল কলম বাংলা ও পাঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ মানুষের কপালে এক নিমেষে দেগে দিয়েছিল দেশভাগের ক্ষতচিহ্ন- সেই ক্ষতচিহ্ন সমগ্র নারী সমাজে এক গাড়ো ছাপ রেখেছিল। দেশভাগ, অভিবাসন এবং রাজনৈতিক জটিলতায়- মেয়েদের জীবনে নেমে আসে করাল ছায়া। তিরিশ লক্ষ শহীদ, চার লক্ষেরও বেশি ধর্ষিতা মেয়ের চোখের জলে মুক্তি এনেছিল বাংলাদেশ। ইতিহাসের পাতা উল্টোলে দেখা যায়- পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশ, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে নির্যাতন করে - নারীকে পদানত করতে চেয়েছে পুরুষ-তবে একথাও সত্য যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ঘটেছে। যেখানেই যত যুদ্ধ হয়েছে, তাতে প্রথম শিকার হয়েছে নারী। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাজনও এমন এক ঘটনা যার মধ্য দিয়ে গোটা মানব জীবনের চিত্রপট একেবারে পাল্টে গিয়েছিল এক লহমায় এবং নারী সমাজ- এর ব্যতিক্রম নয়। এই ঘটনায় সাক্ষী হতে গিয়ে, নারী নির্যাতনের সর্বোচ্চ স্তর ধর্ষণ এবং তারপরে হত্যার মধ্য দিয়ে সমগ্র নারী জীবন এক নতুন ইতিহাস তথা নতুন জীবনের জন্ম দেয়- এবং এই কারণেই ১৯৪৭ সালের দেশবিভাজন, উদ্বাস্তু অভিবাসনের ইতিহাস নিয়ে যখন আমরা চর্চা করবো তার সাথে আবশ্যিক ভাবেই উদ্বাস্তু নারী সমাজের বিষয়টিও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। নারীদের লাঞ্ছনার বর্ননা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাওয়া গেলেও তা সীমিত- কারণ এই মহিলারাই নিজেদের যন্ত্রণার কথা মুখ ফুটে বলতে পারেননি বা বলতে চাননি, প্রায় সকলেই নিশ্চুপ ছিলেন। পরিস্থিতি স্থিত হলেও সমাজ সংসার তাঁদেরকে ফিরিয়ে নেয়নি, অনেকেই আত্মহত্যা করে জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। দেশবিভাজন অভিবাসন সমগ্র নারী সমাজে এক তাৎপর্যময় পরিবর্তন সাধন করেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সূচক শব্দ: দেশবিভাগ, অভিবাসন, নারী সমাজ, সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু নারী জীবন।

ইতিহাস, সাহিত্য কিংবা ইতিহাসের চিত্রপট যেখানেই আমরা নারী প্রসঙ্গে আলোচনা পাই, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীকে নির্যাতিত , লাঞ্ছিত বা ধর্ষিতা রূপেই দেখানো হয়ে থাকে , কিন্তু দেশভাগ ও তার পরিপ্রেক্ষিতে অভিবাসন বা উদ্বাস্তুজীবন যে এই চেনা ঘেরাটপের বাইরে বা 'victimised' চরিত্রের বাইরে একটা সংগ্রামী, দৃঢ় মনোভাবাপন্ন ,পরিশ্রমী, রুচিশীল নারীসমাজের জন্ম দিয়েছিল তা নিয়ে যথাযথ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার

পরিমণ্ডল নির্মাণের দায়বদ্ধতা তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। এই বিষয়টিকে আমাদের মনে রেখে উদ্বাস্তু নারী প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাই এই প্রসঙ্গে আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমি ইতিহাস যেমন দেখবো তেমনিভাবে সাহিত্য এবং স্মৃতিকথার মানসপটে কীভাবে নারীপ্রসঙ্গ উঠে এসেছে তা আমি দেখানোর চেষ্টা করবো। ইতিহাসের গবেষণা করার ক্ষেত্রে আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না, যে কথা, যে দর্শন, যে ঘটনা ইতিহাস সবসময় স্থাপন করতে পারে না তা কিন্তু অনেক সময়ই মানুষের স্মৃতিপটের- গভীরে লুকোনো থাকে, তাই আমাদের কাজ হবে সেই স্মৃতি পটের গভীরতা থেকে অজানা বিষয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করা।[১]

দেশভাগ লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য মানুষের বাস্তু ভিটে এবং সহায়সম্বলই কেবল ছিনিয়ে নিয়েছিল তাই নয়, একই সঙ্গে ছিনিয়ে নিয়েছিল আত্মসন্মানবোধকেও। সবক্ষেত্রে সেই চেষ্টা যে হয়নি তা বলাইবাহুল্য । এরফল হয় মারাত্মক।এর থেকে উদ্ভুত অন্তর্দ্বন্ধ ও সমঝোতার যন্ত্রণা সেইসব হতভাগ্য মানুষের জীবনকে ক্ষত বিক্ষত দুর্বিসহ করে তুলেছিল। অশোক মিত্রের 'Calcutta Diary'র 'The song of mother courage' রচনা তে এমন এক বৃদ্ধার কথা পাই যাঁর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন পরিস্থিতি জানা যায়।[২] জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে স্বাভাবিকভাবে তাঁরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদের মত দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেননি, তাই ব্যর্থতা তাঁদের মধ্যে এক তীব্র মনঃস্তাত্বিক সংকট তৈরী করে। কর্মহীন, উপার্জনহীন এই ছিন্নমূল প্রবীনেরা স্বাভাবিকভাবেই পরিবারে তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য হারান, ফলে ক্রমশ তাঁরা পরিবারের বোঝা তে পরিণত হন। অভিবাসনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিবির গুলিতে আশ্রিত উদ্বাস্তু মানুষদের মধ্যে মেয়েদের জীবন যাপনে কীরূপ পরিবর্তন এসেছিল তা একটি বিশেষ বিচার্য বিষয়। উদ্বাস্তু মানুষদের দুর্দশার সাথে সাথে মেয়েদের অতিরিক্ত একটা দুর্দশার ভার নিতে হয়েছিল-নারীত্বের অবমাননা-শারীরিক ও মানসিক ভাবে দাঙ্গার দিনগুলিতে মেয়েরাই হয়ে উঠেছিল দাঙ্গাবাজদের আক্রমণের সাধারণ লখ্য বস্তু-অন্য সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদা ও অস্তিত্বের সুরক্ষিত অংশে অমোঘ হানার প্রকৃষ্টতম মাধ্যম।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে লাঞ্ছিত বহু নারী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বা পরিবারের সদস্য দের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে আশ্রয় নেন সরকারি ও বেসরকারি নারী আশ্রয়গুলিতে। যেখানে তাঁদের জীবন অতিবাহিত হয় সীমাহীন নিঃসঙ্গতায়, লাঞ্ছনায়, অপমানে। ১৯৫২ সালে কলকাতায় অবস্থিত ২০ টির মত বেসরকারি নারী আশ্রমের কাজকর্ম সম্পর্কে কলকাতা পুলিশের একটি মহিলা তদন্তকারী দল ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ছিল তিনমাস ধরে এবং ১০০জন নারীকে জিঙ্গাসাবাদ করা হয়েছিল। তদন্তে জানা গিয়েছিল এইরূপ প্রতিষ্ঠানে থাকা নারীদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন পূর্ববঙ্গ এবং ৪০ জন পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রীলোক। এঁদের মধ্যে ৭০ জন নিজ নিজ পরিবারের আর্থিক

দূর্গতির জন্য ঘর ছেড়ে এইসব প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শতকরা ৭ জন দূর্নীতির পাঁকে পতিত হয়ে এসেছিলেন এবং শতকরা ১০ জন স্বগৃহে নিগৃহীত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, এইসব আশ্রিতাদের কাউকে কাউকে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপর প্রদেশবাসীর সাথে বিবাহ দেওয়া হত। কেউ কেউ অসৎকার্যে নিযুক্ত হওয়ার অভিযোগও করে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে আশ্রমবাসী অবিবাহিতা অন্তঃসত্বাদের সন্তান প্রসবের ব্যাবস্থাও রেখেছিল।৩ অবৈধ সন্তান পালনের আয়োজনও কোথাও কোথাও ছিল। যদিও তদন্ত রিপোর্টে এ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত নেই। তবুও এই অনুমান করা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদের সঙ্গে যে সমস্ত নারীর জোর করে বিবাহ দেওয়া হয়, তাঁদের জন্য সুন্দর জীবন অপেক্ষা করেনি বরং তাঁদের অধিকাংশের স্থান হয় কোনো না কোনো পতিতালয়ে। কিন্তু অনেকে আবার দেশবিভাগ নারী সমাজের উপর দ্বিবিধ প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে করে থাকেন। দেশবিভাগ বঙ্গীয় নারী সমাজের কাছে একদিকে ছিল স্বপ্নভঙ্গ ও লাঞ্ছনার কালো অধ্যায়, অন্যদিকে তাঁদের দিয়েছিল মুক্তির আস্বাদ ও এক নতুন জীবনের পথ চলার প্রতিশ্রুতি।এ প্রসঙ্গে শৈবাল মিত্রের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য- 'দেশ বিভাগের অভিশাপ জর্জরিত কোটি কোটি নিরাশ্রয় মানুষের কাছে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়ালো, পরিচয়হীনতা কাটাতে তারা যে নতুন আত্মপরিচয় তৈরি করল, তার নাম রিফিউজি কালচার- উদ্বাস্তু সংস্কৃতি। নতুন সংস্কৃতির মূল কথা জোর যার, মুলুক তার। আত্মরক্ষার জন্য জীবন ধারণা বদলাতে তারা বাধ্য হল।' ৪

পূর্ববাংলার ভয়াবহ লাঞ্ছনার কদর্য অভিজ্ঞতা, রেলের প্ল্যাটফর্ম ও উদ্বাস্তু ক্যাম্পে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা বাংলার নারী সমাজকে এক নতুন পথে, এক নতুন চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যের দিকে নিয়ে চলে। যে বাংলার নারী সমাজ দেশবিভাগের পূর্বে- পূর্ব বঙ্গে ছিলেন 'গৃহলক্ষী' ,তাঁরাই দেশবিভাগের অভিঘাতে বাইরের জগতের মুখোমুখি হন এবং বাইরের জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতায় অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত হন। নারীদের অনেক বেশি লড়াকু মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল।

ইতিহাসের পাতায় পাতায় যেমন উদ্বাস্তু মহিলাদের ইতিহাসচর্চা স্থান পেয়েছে, একইভাবে সাহিত্যের লেখনীধারাতেও উদ্বাস্তু নারী প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে, তাই উদ্বাস্তু নারী প্রসঙ্গে আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা ইতিহাসের সাহায্য যেমন নেব একইসাথে সাহিত্যের অমোঘ ভান্ডারকেও ব্যবহার করব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাহিত্যের বিচরণ অবাধ- গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, সিনেমা- প্রতিটি ক্ষেত্রেই খুব সুন্দরভাবে উদ্বাস্তু নারী সমাজের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

উদ্বাস্তু জীবনের সংগ্রাম ও সংকটের কাহিনী দেশভাগে ক্ষতবিক্ষত বাংলার বিপন্নরূপ ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০),'সুবর্নরেখা' (১৯৬৫), 'কোমলগান্ধার' (১৯৬১)এ স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একজন মহিলার তাঁর নিজের শরীরের উপরেও নিজেস্ব কোনও অধিকার ছিল না-অধিকার ছিল তাঁর পরিবার

ও জাতির। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল ‘it was on the bodies of women that the new national border was marked out; the edifices of the two nation states on south Asia were constructed.’৫ পাঞ্জাবি উদ্বাস্তু মহিলা প্রসঙ্গে বহু চর্চা হলেও বাঙ্গালী উদ্বাস্তু মহিলা প্রসঙ্গে খুব কম আলোচনা করা হয়েছে। নিবেদিতা দেবী 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ‘Voice of women’ নামে একটি প্রবন্ধে লেখেন, ‘The East Bengali women had to pay the cost of independence by her chastity, her life and the life of her husband and children.’৬ সরকারী পুলিশকর্মী অফিসারদের কাছে মহিলারা তাদের খিদে মেটানোর যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছেন। পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে যখন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে এসে পড়লেন তখন শুরু হয়েছিল জীবনের একটা ভিন্ন অধ্যায়। শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটাতে হয়েছিল পশুর ন্যায় খোলা জায়গায়, অজস্র বুভুক্ষ মানুষের লোভী, নৃশংস ক্ষুধার্থ চোখের সামনে পোষাক পরিবর্তন, স্নান করা-এসব করতে হয়েছিল- একটা সময়ের অন্দরমহলের সুরক্ষিত জীবন থেকে এখানে তাঁরা এসে পড়েছিলেন সম্পূর্ণ একটা আলাদা পৃথিবীতে-যেখানে তাঁদের সন্মান প্রতিমুহুর্তে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। সহজ সরল জীবন একটা রাত্রিতেই হয়ে উঠেছিল কঠিন নগ্ন জীবন। নতুন জায়গায়, নতুন লোকেরা তাঁদের এই সরলতা কে কাজে লাগিয়ে ভুল পথে চালিত করেছিল, পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়ানোর পরিবর্তে তাঁদের জীবনকে দূর্বিসহ করে তোলা হয়েছিল।৭ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মুসলিম পরিবারের আশ্রিতা বা মুসলিম পরিবারে বিবাহের পর যখন তাঁরা নিজেদের পাড়ায়, আত্মীয়মহলে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন তখন তা সম্ভব হয়নি, তাঁদের সমাজ, তাঁদের পরিবার- তাঁদের কে ফিরিয়ে নেয় নি । তাই অনেকেই আত্মহননের পথে এগিয়ে গেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৎকালীন কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় কোনো ব্যবস্থা এর সমাধান করতে পারেনি। খুব কম সংখ্যক মহিলারাই বাস্তব জীবনে, সুস্থ জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। কোনোরকম ভাবে ধর্মান্তরকরণ এড়ানো গেলেও ক্যাম্প ,কলোনি গুলিতে প্রতিমুহুর্তে মহিলাদের সন্মুখীন হতে হয়েছে নতুন নতুন বিপদের। দীর্ঘ দিন ধরে বাঙালী মহিলাদের দেখানো হয়েছে ‘অন্নপূর্না’রূপে, যাঁর দায়িত্ব ছিল পরিবারে অন্ন সংস্থান করা। কিন্তু দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র পারিবারিক জীবনের ছবি ক্রমশ বদলাতে শুরু করলে, মহিলাদের মধ্যে সেই চিরাচরিত অন্নপূর্না রূপের রদবদল ঘটে। বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, পারিবারিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে প্রবল গ্লানিতে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। আঞ্চলিক মানুষদের অসহিষ্ণুতা নৃশংসতা বারংবার প্রকাশ পেয়েছে উদ্বাস্তু মহিলাদের স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্বাস্তু মহিলাদের মুসলিম দ্বারা ‘উপভোগ্য’, ‘অস্পৃশ্য’ভাবা হয়েছে। এমন একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল যেখানে নিজেদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মূল প্রশ্ন।৮

জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার তাগিদ থেকেই, বন্ধ দরজার আগল খুলে জীবন সংগ্রামের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন উদ্বাস্তু মহিলারা। বলা হয়, 'In West Bengal, in particular, the historic assertion of the refugee women as the tireless bread winner changed the digits of feminine aspirations of the Bengali bhadramohila and altered the social landscape irrevocable.' Private domain এর ঘেরাটপকে অতিক্রম করে public domainএর পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তৎকালীন উদ্বাস্তু মহিলারা। এই বিষয়টাকে দেশবিভাগজনিত একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিকৃয়াস্বরূপ চিহ্নিত করা যেতে পারে। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট কে সঙ্গে করেই বা তারই প্রেক্ষিতে, মহিলারা বন্ধ দরজার আগল খুলে বাইরের জগতে বেরিয়ে আসেন, অজানা অচেনা জগতের সন্মুখ সমরে।[৯] পড়াশোনা জানা শিক্ষিত মেয়েরা বিভিন্ন সরকারী স্কুল, অফিসে কাজের সন্ধান করেছেন। কিন্তু যাঁরা পড়াশনা জানতেন না তাঁরাও কিন্তু পিছিয়ে থাকেননি। নিজেদের ঘরকন্যার গুন কে কাজে লাগানোর কথা ভেবেছেন তাঁরা। বাড়িতে তৈরী আঁচার, পাপড়, বড়ি, ডাল এসব বিক্রী করে উপার্যনের চেষ্টা করেছিলেন। এমনকী বহু সাহসী মহিলারা জেলখানার মহিলা ওয়ারডেন এর কাজও করেছেন, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা অভিনয় জগৎ কে নিজেদের উপার্জনের রাস্তা বানিয়েছিলেন। কলকাতার ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রি বা থিয়েটার গুলি হয়ে উঠেছিল বহু উদ্বাস্তু মহিলাদের রুজিরোজগারের পথ। এপ্রসঙ্গে আমরা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এর কথা বলতে পারি। হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের মতোই নিজের পরিবারের সাথে কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতার ভবানিপুর অঞ্চলে পূর্ন সিনেমা হলের সামনে একটা ছোট্ট মুদীর দোকান দেন তাঁর পিতা।[১০] প্রচন্ড দারিদ্র্যতার তাড়নায় এক প্রকার বাধ্য হয়েই তিনি অভিনয় জগতে আসেন। সলিল সেনের নাটক 'নতুন ইহুদী' তে একটি রিফিউজি মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করে খুব সীমিত সময়ের মধ্যেই সকলের নজরে আসেন এবং একটি পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। **১৯৫২** তে সুবীর মুখোপাধ্যায়ের 'পাশের বাড়ী' তে অভিনয় করেন-বাংলা সিনেমার জগতে একজন নামজাদা অভিনেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর চরিত্রে দুঃখ ও হাস্যরস সমানভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত,যা দর্শক দের মুগ্ধ করেছিল।[১১]

বাংলার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে দেশভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় - এপ্রসঙ্গে আমরা অনেকেই প্রায় অবগত। দেশভাগ সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নিয়ে বহুবিধ সাহিত্য রচিত হয়েছে, একক মানুষ বা সামাজিক স্মৃতির ভিতর থেকে উঠে আসা ঘটনা সেসব সাহিত্যের মূল উপজীব্য। শিকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণা ও নতুন পরিচয়ে বাঁচার চেষ্টা দেশভাগ বিষয়ক সব সাহিত্যে এই পরিচয়হীনতার যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে, যদিও অনেকক্ষেত্রে নারীর দৃষ্টিভঙ্গিকে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া না হলেও, দেশভাগ বিষয়ক সাহিত্য একেবারে নারীর বয়ান বিবর্জিত একথা ঠিক নয়।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস' এবং হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি'- দুটি উপন্যাসই নারীর বয়ানে লেখা দেশভাগের কাহিনী। নির্বাস উপন্যাসের বিমি এবং আগুনপাখির মেতের বৌ এই দুই মেয়ের চোখ দিয়ে পাঠক দেখেছেন দেশভাগকে, বুঝতে চেষ্টা করেছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি। সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকী শিক্ষার দিক থেকেও চরিত্র দুটি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, তবুও দেশভাগ নিয়ে তাঁদের চিন্তাস্রোতে মিল থেকে যায় অনেকখানি।[১২]

১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগষ্ট মধ্যরাতে কলোনিয়াল যে ভারতবর্ষের অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবার কথা ছিল, সেই অন্ধকার মুক্তির কাঙ্খিত দিন অধরাই থেকে গিয়েছিল।কারণ স্বাধীন এই তকমা ভারতবর্ষের নামের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল এক ভয়ংকর ত্যাগের বিনিময়ে। এটা সেই ত্যাগ যা ভারতবর্ষকে প্রথম চিনিয়েছিল কাঁটাতারের সীমারেখা। দেশভাগ ও দেশত্যাগ এই দুটি শব্দ যদিও অনেকক্ষেত্রেই একত্রে উচ্চারিত হয়, কিন্তু দেশভাগের ফলে যদি দেশত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হয়, অর্থাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে দেশত্যাগ তা কখনোই স্বেচ্ছায় দেশত্যাগের সমার্থক নয়। কারণ দেশ কেবলমাত্র এক ভূখন্ড মাত্র নয়। মানুষের কাছে দেশ মানে তার ঘরবাড়ি, আপনজন, নদীর জল, গাছের ফুল ফল, আরো অনেক কিছু।দেশ ভৌগলিক পরিধির বাইরেও টুকরো স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এক অস্তিত্ব। মানুষের 'আত্ম' পরিচয়ের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে তার দেশ। ফলে দেশভাগ এক অর্থে তার আত্ম সংকটের কারণ হতে পারে।যে দেশের মাটিতে বড় হওয়া, পরিণত হওয়া, সেই দেশ সরকারি নথিতে কলমের আঁচড়ে এক রাতের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে তা স্বাভাবিকভাবে মানুষের অভ্যস্ত নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রায় আঘাত হানে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি আঘাত হানে তার আত্ম পরিচয়ে। সাদাত হাসান মান্টোর সেই বিখ্যাত টোবা টেক সিং গল্পের মতো অনেকেই ছিন্ন পরিচয়কে আপন করে নিতে চায় না, বা আপন করে নিতে পারেনা।বিষাণ সিং এর মতো 'নো ম্যানস ল্যান্ড'কে নিজের দেশ বলে আঁকড়ে নিতেও পারেনা অনেকেই ।তাই তাদের বেছে নিতে হয় কোনো একটা ভূখন্ডকে। হয় নিজের জন্মভূমি বা নিজের ধর্মপরিচয়ের ভিত্তিতে নতুন করে একটা ছিন্ন ভূখন্ডকে 'নিজের দেশ' বলে আপন করে নিতে হয় তাদের। কিন্তু চাইলেই কি তা সম্ভব হয়?দেশভাগের আগে ও পরে নিজের দেশও বা কি সত্যিই এক থাকে? এক থাকে তার প্রতি ভালোবাসা, টান বা আবেগ? কোনো স্পষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। নতুন করে কোনো দেশকে আপন করে নেওয়া ঠিক যতটা মুশকিল, উত্তর দেওয়াও ততটাই। হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' উপন্যাস এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে আত্মপরিচয়ের সংকট, সংকট কাটিয়ে নতুন পরিচয় খুঁজে নেওয়ার অদম্য জেদ কিংবা এক দৃঢ় প্রত্যাখ্যান। প্রত্যাখ্যান রাষ্ট্রকে, সংসার সমাজ ধর্মের সেই বেড়াজালকে যা প্রতিপদে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে নির্দেশ করে দিতে চায়

মানুষের পরিচয় এবং সামাজিক কর্তব্য। দেশভাগ তজ্জনিত আত্মপরিচয়ের সংকট এবং সেই সংকট7 কাটিয়ে উঠে নবপরিচয় নির্মাণের এক অনন্য উদাহরণ আগুণপাখি।আগুনপাখির মেয়েটির স্মৃতিকথায় দেশভাগের যন্ত্রণাকে তুলে ধরা হয়। এই মেয়েটি দেশভাগের হাই পলিটিক্স জানে না, অনুপ্রবেশ কি জানে না,এ জন্যই ব্যক্তিগত স্মৃতি গুলিকে কিছুতেই দেশের ঘৃণার আবহে মুছে যেতে দেয় না বলেই সে জোর পায় স্রোতের বিপরীতে চলার। তাই সে 'নিজের দেশ' বলতে ভারতবর্ষ নামক পরিসরকে বোঝে না- নিজের উঠোনকেই বোঝে।[১৩]

দেশভাগের যন্ত্রণায় তৎকালীন নারীসমাজের বুকফাটা কান্না, আশা-আকাঙ্খাকার স্বপ্নভঙ্গ, ভিটে মাটিসহ সর্বস্ব হারানোর বেদনা ও বীভৎস হত্যালীলা সামিল রেয়েছে। ফলে নারীসমাজের বর্হিজীবনে এবং মনস্তত্ত্বের গভীরে তৈরি হয় এক গভীর সংকট।এই সংকট ভারতীয় উপামহাদেশের সমগ্র নারী সমাজ তথা মানুষকে যে নতুন সমস্যার সন্মুখীন করালো, তা হল উদ্বাস্ত সমস্যা। উদ্বাস্ত মানে তো , বাসা আর ভাষা হারানো। এই হারানোর কারণ, হারানোর কাল, পরিণতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে পুনরায় এই বাস, বাসা ও ভাষা অনুসন্ধান , নির্মাণ বা লাভ করার আখ্যান সমগ্র উদ্বাস্ত সাহিত্য জুড়ে । এর সঙ্গে জুড়ে থাকে তাদের স্মৃতি।সেই স্মৃতিতে থাকে তাদের দেশভাগ পূর্ববর্তী বা উদ্বাস্ত জীবন পূর্ববর্তী জীবনের আশা আকাঙ্খার স্বপ্নভঙ্গ।

ইতিহাস, সাহিত্যে যেমন নারী প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, একইভাবে স্মৃতিকথাতেও তা ফুটে উঠেছে ভিন্নভাবে। মেয়েরা অত্যাচারিত হয়েছে ঘরে এবং বাইরে। যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন যেমন মেয়েদের উপর প্রভাব ফেলেছে, তেমনই সংখ্যালঘু মেয়েরা ধর্ষিত হয়েছে সংখ্যাগুরুদের দ্বারা। মেয়ে যদি সংখ্যালঘু এবং ছেলে যদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে হত, তবে প্রেম বা বৈবাহিক সম্পর্ককে 'অত্যাচারিত হওয়া' বা 'ধর্ষণ' রূপে অভিহিত করা হত। ইতিহাস সেভাবে আলোকপাত না করলেও নিম্নবর্গীয় মানুষদের অর্থনৈতিক সংকটের কথা জানা যায় স্মৃতিকথার সূত্রে।

অন্যদিকে, সাহিত্য যেহেতু সমাজের দলিল, তাই সাহিত্যের নানা আঙ্গিকে সমাজে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার প্রকাশ ঘটে। ভারতবর্ষের উদ্বাস্ত সমস্যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্থিতাবস্থাকে যেমন ভেঙ্গে দিয়েছিল, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এনেছিল এক গভীর পরিবর্তন। উদ্বাস্ত সমস্যা ও তার প্রভাব প্রসঙ্গে অনেক প্রগতিশীল লেখকদের চিত্তকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। উভয় দেশের লেখকগণই তৎকালীন পরিস্থিতি সকলের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কলম ধরেছিলেন। দেশভাগ পরবর্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যের নানা শাখায় নানারূপে উদ্বাস্ত সমস্যা শিল্পরূপ লাভ করেছে। কিছু ছোটগল্প এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, সুখময় ঘোষের 'সুরবালার নতুন স্বদেশ', ভীষ্মদেব ভট্টাচার্যের 'বাঁশের বুকে ফুল', শুভ্রভারতী মনিয়ানের 'উদ্বাস্ত' –গল্পগুলিতে উদ্বাস্ত মানুষের জীবনে যন্ত্রণা এবং জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি তাঁদের জীবনের অর্থনৈতিক সংকট, তাঁদের মূল্যবোধের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকটি ফুটে উঠেছে।[১৪]

অখন্ড বাংলার অধিবাসী হিসেবে জন্ম নিয়ে যে কয়েকজন কীর্তিমান কথাসাহিত্যিক নিজেদের লেখনীধারায় সমাজকে মুগ্ধ করেছিলেন এবং সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন হাসান আজিজুল হক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সারাবিশ্বে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল সেই দিনে হাসান আজিজুল হকের জন্ম। তিনি দেখেছিলেন পঞ্চাশের মন্বন্তর, দূর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ ও দেশভাগের পর দেশান্তর হওয়ার চিত্র। তিনি এপার কে যেমন জানেন, তেমনই ওপারকেও জানেন। তিনি জানেন দুই বাংলার গ্রাম, গ্রামের মানুষদেরকেও। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবাংলা ছেড়ে পূর্ববাংলার খুলনা পাড়ি দেন ,প্রায় ৫০ বছর পর লিখলেন-‘ আগুনপাখি’ উপন্যাস টি, সদ্য তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর রচিত এই উপন্যাসটি পড়লে মনে হয় যে, দেশভাগ তাঁকে পূর্ববঙ্গ যেতে বাধ্য করলেও তিনি জন্মভূমিকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন ঐ দেশে। জন্মভূমি হারা উদ্বাস্তু মানুষ সব ফেলে রেখে গেলেও সঙ্গে করে নিয়ে যায় তার আপন মনের ভাষাটি। এর সাথে একজন সাধারণ নারীর অসাধারণ হয়ে ওঠার কাহিনী, যিনি দেশভাগকে মেনে নিতে পারেননি। তাই পরিবারের সকলে পূর্ববাংলায় চলে গেলেও তিনি শ্বশুর বাস্তুভিটাকে আঁকড়ে ধরেই জীবনের শেষকটা দিন পার করে দিতে চেয়েছেন। তাই তিনি তার স্বামীর কাছে মাথা উঁচু করে বলতে পেরেছিলেন, চারাগাছ একজায়গা থেকে তুলে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলেও বাঁচে, কিন্তু বড়ো গাছকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তুলে নিয়ে গেলে তাকে বাঁচানো যায় না। আর বাঁচে না বলেই তাঁকে সকলে ছেড়ে চলে গেলেও তিনি পুরনো মাটিকে আঁকড়ে ধরেই রয়ে গেলেন, পুরনো মাটিকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চাইলেন।[১৫]

হাসান আজিজুল হকের যুগান্তকারী উপন্যাস তথা এটি যেন পূর্ণ সময়ের জীবন-দেশ-ইতিহাসের ঐতিহাসিক দলিল। সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি ও দেশভাগ নিয়েই শৈল্পিক কথন এই উপন্যাস। রাঢ়বঙ্গের এই নারীর জবানিতে লেখক তুলে ধরেছেন সাতচল্লিশ পূর্ব অখন্ড ভারতে উত্থান-পতন, রাজনীতি, বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ, দূর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িকদাঙ্গা, দেশভাগ, দেশগঠন ও সামাজিক অবক্ষয়ের কথা। লেখক প্রত্যন্ত একটি গ্রাম, একটি নারীকে, যে শ্বশুড়বাড়ির বাইরের চারপাশের মানুষজনকে চেনে না, তার ধারণা নেই। আশেপাশের মানুষজন যে হিন্দু আর তারা যে আলাদা সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। অথচ গভীর মমতায়, পরিশ্রমে গড়ে তোলে একটি সংসার। গভীর রাতে সে স্বামীর কাছে লেখা পড়া শিখে নিতে চায়। সকলের কাছে হয়ে ওঠে কাছের মানুষ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট। সংসারেও ভাঙ্গন নেমে আসে। দেশভাগের শাণিত আঘাতে সকলে যখন আতঙ্কিত , পাড়ার প্রতিবেশীরা যখন একে একে চলে যেতে লাগল, দেশত্যাগ করতে লাগল তখন কিন্তু মেয়েটি যেতে নারাজ । সে প্রশ্ন করে , ‘আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না ক্যানে আলাদা একটা দ্যাশ হয়েছে,.....এই দ্যাশটি আমার নয়।’[১৬] এইভাবে একটি নারীর মধ্য

দিয়ে গোটা দেশের চিত্র ফুটে উঠেছে। লেখকের সুনিপুন দৃষ্টিতে, নিপুন দক্ষতায় তুলির টানে এই দৃশ্য গুলিতে উপস্থাপিত করেছেন প্রান্তিক মানুষদের জীবন যাপনের অভিঘাতকে।

এইভাবে সাহিত্যের সুন্দর ও পরিশীলিত লেখণীধারাতে আমরা দেশভাগকেন্দ্রিক উদ্বাস্তু নারী প্রসঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেমন পাই একইভাবে ইতিহাসও তার নিজেস্ব প্রাসঙ্গিকতা দাবী করে। সে বিষয় কে স্মরণ করেই আমার এই আলোচনার পরিধি নির্মিত, যে পরিধি আমাদের পরিচয় করায় চেনা ঘেরাটপের বাইরের অন্য এক নারীসমাজের পরিমন্ডলের সাথে- যে নারীসমাজ প্রশ্ন করতে পারে, উপার্জন করতে শেখে। সাহিত্য, ইতিহাস, স্মৃতিপটের হাত ধরেই আমরা সমগ্র উদ্বাস্তু নারী সমাজকে জানার, বোঝার চেষ্টা করব।

সূত্রনির্দেশ:

১. Monika Mondal, Settling the Unsettled: A Study of Partition Refugees in West Bengal, Manohar Publication, 2011, pp.67-68

২. Paulomi Chakraborty, The Refugee Women: Partition of Bengal,Gender, and the Potitical, Oxford Publication, 2018,pp.45

৩. The Trauma and the triumph: Gender and Partition in Eastern India, edited by Jasodhara Bagchi and Subhoranjan Dasgupta, Stree, 2003,pp.34-36

৪. নীলেন্দু সেনগুপ্ত, দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানব, একুশ সতক,২০১৯,পৃঃ১২৬

৫. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, প্রান্তিক মানব,দ্বীপ প্রকাশণ,পৃঃ২৪১

৬. তদেব,পৃঃ৬৭-৬৮

৭. তদেব,পৃঃ৮৭

৮. সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়,দেশভাগ-দেশত্যাগ,কলকাতা, ১৯৯৪,পৃঃ৫১

৯. হাসান আজিজুল হক, আগুনপাখি, সন্ধানী প্রকাশনী,ঢাকা, ২০০৬, পৃঃ১৬-১৮

১০. তদেব,পৃঃ৪৬

১১. তদেব,পৃঃ৫৩-৫৬

১২. সৈয়দ তানভীর, মুসলমান,বাঙ্গালি ও নারীঃ সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ,পুলক চন্দ সম্পাদিত,'নারী বিশ্ব', কলকাতা,জুলাই,২০০৮

১৩. হাসান আজিজুল হক, আগুনপাখি, সন্ধানী প্রকাশনী,ঢাকা, ২০০৬, পৃঃ২০

১৪. তদেব, পৃঃ ২৩

১৫. নিলেন্দু সেনগুপ্ত,তদেব, পৃঃ১২৬

১৬. পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ইতিহাস অনুসন্ধান-২৪ –এ প্রকাশিত অনিন্দিতা ঘোষালের নিবন্ধ- একভিন্ন অস্তিত্ব নির্মাণের লড়াইঃ উদ্বাস্তু আন্দোলন (১৯৪৮-৬৫) কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি, ২০১০,পৃ. ৫৮০

স্বামী বিবেকানন্দ ও বেদান্ত ভাবনা : একটি দার্শনিক সমীক্ষা

জেনারুল সেখ
অতিথি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
সোফিয়া গার্লস কলেজ, নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

সারাংশ (Abstract) : ১৯৯৩ সালে বিশ্বধর্ম মহাসভায় ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেখানে তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল মূলত বেদান্ত ও সনাতন হিন্দুধর্ম নিয়ে। বক্তব্যগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, যার ফলে দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর বক্তব্য শোনার আমন্ত্রণ আসেন। এবং পরবর্তীতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, নানা শহরে বক্তব্য দিয়ে বেড়ান। তাঁর বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বেদান্ত দর্শন, মানব জীবনে বেদান্তের প্রভাব, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, মানুষের চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। এছাড়াও তিনি বেদান্ত দর্শনকে সাধারণ মানুষের জীবনে ছড়িয়ে দিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী, জাতিকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে জন্ম নেওয়া এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি একজন মহান সমসাময়িক দার্শনিক, নতুন অদ্বৈত বৈদান্তিক, বাস্তব শিক্ষাবিদ ও ঔপনিবেশিক ভারতে সমাজ সংস্কারক হিসেবে পরিচিত। তিনি ভারতে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনে একটি প্রধান শক্তি ছিলেন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণায় অবদান রেখেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হয়েও শাস্ত্র নিদিষ্ট পন্থানুযায়ী মূর্তিপূজা ও দেবদেবীর আরাধণা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ঐগুলির মধ্যেও গভীর সত্য অন্তর্নিহিত আছে। একদিকে ব্যক্তিগত মুক্তি-কামনা, অন্যদিকে সমষ্টি মুক্তি-কামনা – এই দুই আপাত বিপরীত আদর্শ বিবেকানন্দের সাধক ও পরিব্রজক জীবনে লক্ষ্য করা যায়।

সূচক শব্দ (Key word) : কর্মজীবনে বেদান্ত, সনাতন হিন্দুধর্ম, উপনিষদ, অদ্বৈতবাদ, জাতীয়তাবাদ, বিশ্বজনীন ধর্ম।

মূল আলোচনা (Discussion) :

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক ধর্ম ও সমাজসংস্কারক, সন্ন্যাসী এবং দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলকাতার শিমুলিয়া পল্লীর এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী তাঁর জন্ম হয় এবং ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তিনি ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করেন। ১৮৮১ সালের নভেম্বরে বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে স্বয়ং ভগবানরূপে গ্রহণ করেন। তাঁর দার্শনিক ভাবনায় আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দেখতে পায়। বিবেকানন্দের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন হত যদি না তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসতেন। সাধারণ মানুষের মতো

স্বামীজিও চেয়েছিলেন, কিভাবে তিনি নিজেকে মুক্তিগামী ব্যক্তিতে পরিণত করবে। তাই তিনি পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে গিয়েছিলেন নিজের মুক্তি কিভাবে হবে তার পথ অনুসন্ধান করতে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে তিরস্কার করে বলেছিলেন-

> *"নরেন তুই নিজের মুক্তি লাভের জন্য আমাকে বলছিস? তুই এতবড় স্বার্থপর কি করে হলি? আমি ভেবেছিলাম তুই হবি বিশাল বটগাছের মত। তোর সুশীতল ছায়ায় লক্ষ্য লক্ষ্য দুঃস্থ আতুর নরনারী শান্তিলাভ করবে।"*[১]

শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথা শুনে বিবেকানন্দ লজ্জিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন-

> *"যতদিন না প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তি লাভ হয়, ততদিন আমি নিজের মুক্তি কামনা করব না।"*[২]

হিন্দুধর্মের মধ্যে বিবর্তিত বিভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে যে জিনিসগুলি সাধারণ, তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হল বেদের প্রতি তাদের আনুগত্য। যদি কোন ঐতিহ্য বেদের কর্তৃত্বকে গ্রহণ না করে, তাহলে এটি আর 'হিন্দু' ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না। যে কারণে, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে হিন্দুধর্ম এবং বেদান্ত সমার্থকরূপে পরিচিত। এই দুটি শব্দ একটি এবং একই বিশ্বাসের ঐতিহ্যকে নির্দেশ করে, যদিও এটি অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে বৈদিক ধর্মে বেড়ে ওঠা বেশিরভাগ ভারতীয়রা নিজেদেরকে বেদান্তবাদী না বলে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। এর কারণ খুবই সাধারণ, যে সমসাময়িক বিভিন্ন মনীষিদের বক্তব্য ও বিভিন্ন হিন্দু সাহিত্যে 'হিন্দুধর্ম' শব্দটি 'বেদান্ত' শব্দের চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, বর্তমানে 'হিন্দু' শব্দটি শব্দভাণ্ডারের একটি জনপ্রিয় অংশ হয়ে উঠেছে। হিন্দুধর্ম নিয়ে গবেষণা করা সমসাময়িক দার্শনিকদের বেশিরভাগই বেদান্তকে সম্পূর্ণ হিন্দু চিন্তাধারার পরিবর্ত হিসেবে দেখে। এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও, তাঁর বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশীলনগুলি যেমন, বৈষ্ণব সাধনা, তন্ত্র সাধনা, বেদান্ত সাধনা এবং খ্রিস্টান সাধনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথন থেকে এটা স্পষ্ট যে, বৈদিক সাহিত্যের দুটি সম্প্রদায় রয়েছে: বেদান্ত এবং পুরাণ। বেদান্তের মতে এই জগৎ একটি 'বিভ্রমের কাঠামো', অর্থাৎ বলা যায়, সবই মায়াময়, স্বপ্নের মতো। কিন্তু পুরাণ অনুসারে ঈশ্বর নিজেই চব্বিশটি মহাজাগতিক নীতিতে পরিণত হয়েছেন। মজার ব্যাপার হল, শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে বেদান্তের উভয় অর্থই প্রকাশ পেয়েছে।

বিবেকানন্দের রচনায় আমরা দেখতে পাই 'বেদান্ত' শব্দটি তিনি বারংবার বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং মাঝে মাঝে তিনি উপনিষদের প্রতিশব্দ হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। বেশিরভাগ সময়ই তিনি সাধারণভাবে বেদান্ত দ্বারা বেদের দর্শন

এবং বিশেষ করে উপনিষদকে বুঝিয়েছেন। তিনি 'বেদান্ত' শব্দটিকে তার সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের ঊর্ধে তুলে ধরেছেন এবং আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের ভিত্তি বোঝাতে এটি ব্যবহার করেছেন। আমরা দেখেছি যে 'বেদান্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'বেদের শেষ বা সারমর্ম'। যদি আমরা ব্যুৎপত্তিগত অনুসন্ধানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাই, তাহলে এর অর্থ পাওয়া যায়: 'জ্ঞানের শেষ বা সারমর্ম' (বেদ = জ্ঞান; অন্ত=শেষ, সার)। বিবেকানন্দ যখনই ভারতের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বেদান্তের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি সর্বদা নীতি, পটভূমি, ভিত্তি যার উপর হিন্দু ধর্ম নির্মিত হয় সেগুলি খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি যা দেখাতে চেয়েছেন তা হল যে প্রতিটি প্রজ্ঞার ঐতিহ্যের নীতি, পটভূমি, ভিত্তি আসলে আলাদা কিছু নয়। একই মুদ্রার দুটি দিক মাত্র। ভারতীয় উপমহাদেশে বেদান্ত দর্শন মানুষকে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের পথ দেখায়। বেদান্তের শ্রেষ্ঠত প্রকাশ পাওয়া যায় উপনিষদে, যা হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদের একটি অংশ। সাধারণত উপনিষদ যেহেতু বেদের শেষের দিকে আলোচিত হয় সেহেতু উপনিষদকে বেদের অন্ত বলা হয়। আর উপনিষদের আরেক নাম বেদান্ত (বেদ+অন্ত)। বস্তুত বেদ বা উপনিষদ কোন গ্রন্থ নয়। বেদ হল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক নিয়মের সঞ্চিত ভাণ্ডার। বেদ গ্রন্থাকারে লিখিত হওয়ার পূর্বে বৈদিক প্রজ্ঞা মৌখিকভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অতিবাহিত হয়ে আসছে।

বিবেকানন্দ স্বীকার করেন যে প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিভিন্ন পথ থাকতে পারে কিন্তু লক্ষ্য একটাই হওয়া উচিত। তাঁর মতে, বেদান্ত কারও বিরুদ্ধে কিছু বলার অনুমতি দেয়না। হতে পারে আপনি খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ইহুদি, হিন্দু, যে মতবাদে বিশ্বাস করেন না কেন, আপনি যে কোন পয়গম্বের প্রতি আনুগত্য রাখেন না কেন এই নিয়ে বেদান্তের কোন সমস্যা নেই বা সমস্যা থাকার কথাও নয়। বেদান্ত কেবল সেই নীতি প্রচার করে যা প্রতিটি ধর্মের পটভূমি এবং যার মধ্যে সমস্ত পয়গম্বর, সাধু ও দার্শনিকের সামাজিক আচারণ নৈতিক গুণাবলীর চিত্র ফুটে ওঠে। স্বামীজির মতে, 'বেদান্ত' হল একটি চিরন্তন ধর্ম, যা অস্তিত্বের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন জনের মতামত ও বিভিন্ন জাতির উপর প্রয়োগ করা হয়। বেদান্ত একটি অসীম ধর্ম যা অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান ছিল ও চিরকাল থাকবে এবং এই ধর্ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে। এইভাবে বোঝা যায়, বেদান্ত এমন একটি অনুসন্ধান হয়ে ওঠে যা কোন নির্দিষ্ট ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতির দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে বেষ্টন করা যায় না। প্রতিটি ধর্মের, প্রত্যেক সংস্কৃতির, প্রতিটি জাতিগত ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সারমর্মকে নিজের দ্বারা নিজেকে উন্নীত করার জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে, কিন্তু অনুসন্ধানের জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সংজ্ঞায়িত করার কোন প্রয়োজন নেই। এটি সকল ধর্মের উর্ধ্বে অথবা জ্ঞানের সারাংশ যা আমাদের অজ্ঞতা, বন্ধন এবং অস্তিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়। এভাবে বোঝা যায়, বেদান্তের জাগতিক প্রাসঙ্গিকতা আছে কারণ এটি

ধর্মীয়, জাতিগত এবং জাতীয় সীমানা কেটে ফেলে এবং মানুষ হিসেবে আমাদের উদ্বেগের সমাধান করে।

আমরা বেদান্তকে বোঝার এবং চিহ্নিত করার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপায় দেখেছি। টেকনিক্যালি এটি বর্তমান হিন্দুদের দ্বারা পালন করা ধর্মের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত নাম। জনপ্রিয়ভাবে এটি হিন্দুধর্মের মধ্যে অনেক ঐতিহ্যের মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং প্রায়ই বাস্তবতার সাথে দ্বৈতবাদী পদ্ধতির সাথে চিহ্নিত করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সাধারণত 'বেদান্ত' শব্দটি জ্ঞানের সারাংশ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, বেদান্তের শিকড় না পূর্বে, না পশ্চিমে, না কোন বিশেষ সংস্কৃতিতে, না কোন বিশেষ ভাষায়। বেদান্তের শিকড় না কোন গ্রন্থে, না গ্রন্থাকারে, না কোন দেশে, বেদান্তের শিকড় আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে মধ্যে রয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আধুনিক সময়ের একজন ভারতীয় দার্শনিক। তিনি পশ্চিমা বিশ্বে ভারতীয় বেদান্ত ও যোগ দর্শন প্রতিস্থাপন করেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় হিন্দু ধর্মের সংস্কারের প্রধান শক্তি। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে ঈশ্বরের সন্ধান শুরু করেছিলেন, তাঁর অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় তিনি রহস্যময় রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাথে দেখা করেছিলেন এবং নব্য বেদান্তের একজন মহান আধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি সমাজের সাথে যুক্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অদ্বৈত বেদান্তের চর্চাকে উৎসাহিত করেছিলেন। স্বামীজির বলেছিলেন,

> *"Shankara left this Advaita Philosophy in the hills and forests, while of I have come to bring it out of those places and scatter it broadcast before the workaday world and society. The lion roar of Advaita must resound in every health and home, in meadows and groves, over hills and plains."*[৩]

অর্থাৎ শঙ্কর অদ্বৈত দর্শনকে পাহাড় ও অরণ্যে রেখে গিয়েছেন, কিন্তু আমি এসেছি সেগুলোকে কর্মজীবনের জগৎ ও সমাজের সামনে ছড়িয়ে দিতে। অদ্বৈতের সিংহ গর্জন অবশ্যই প্রতিটি শরীরে, গৃহে, বিভিন্ন স্থানে, পাহাড় ও সমতল ভূমিতে ধ্বনিত হবে।

আমাদের বুঝতে হবে পর্বতেরগুহা ও অরণ্য থেকে কিভাবে বেদান্তের মতবাদগুলি কর্মমুখী হয়ে রাজকার্যে পরিণত হয়েছে। আমরা জানি বেদান্ত অরণ্যবাসের ফল নয়, যে ব্যক্তিকে আমরা সর্বাপেক্ষ বেশী সামাজিক কর্মে ব্যস্ত বলে মনে করি,

সিংহাসনে উপবিষ্ট সেই রাজাগণই বেদান্তের প্রণেতা। এবিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ছান্দোগ্য উপনিষদের উল্লেখ করেন-

> *"শ্বেতকেতু[৪] আরুণি ঋষির পুত্র। এই ঋষি বোধ হয় বাণপ্রস্থী ছিলেন। শ্বেতকেতু বনেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাঞ্চাল-জনপদের সভায় রাজা প্রবাহণ জৈবলির নিকট গমন করিলেন। রাজা তাহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃত্যুকালে প্রাণীগণ কিরূপে এই লোক হইতে গমন করে, তাহা কি তুমি জান?' – 'না'। 'কিরূপে তাহাঁরা এখানে পুনরায় আসিয়া থাকে, তাহা কি তুমি জান?' – 'না'। 'তুমি কি পিতৃযান ও দেবযানের বিষয় অবগত আছ?' রাজা এইরূপ আরও অনেক প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিলেন না, তাহাতে রাজা তাহাঁকে বলিলেন, 'তুমি কিছুই জান না।' বালক পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়া ঐ কথা বলাতে পিতা বলিলেন, 'আমিও এ সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে কি তোমায় শিখাইতাম না?' তখন পিতা রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া রাজাকে এই রহস্য-বিদ্যা শিখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন, 'এই বিদ্যা – এই ব্রহ্মবিদ্যা কেবল রাজারাই জানেন, যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণেরা কখনই ইহা জানিতেন না।' যাহা হউক, তিনি এ সম্বন্ধ যাহা জানিতেন, তাহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ আমরা অনেক উপনিষদে এই কথা পাইতেছি যে, বেদান্তদর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নয়, পরন্তু ইহার সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি সাংসারিক কার্যে বিশেষ ব্যস্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই চিন্তিত ও প্রকাশিত।"[৫]*

আধুনিক যুগের জন্য বেদান্ত উপস্থাপনের স্বামীজি এর নতুন পদ্ধতি অনন্য। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে অদ্বৈত শেখানোর সাহসী চেষ্টা করেছিলেন। স্বামীজি বলেছিলেন-

> *"Conceptions of the Vedanta must come out, must remain not only in the forest, not only in the cave, but they must come out to work at the bar and the bench, in the pulpit, and in the cottage of the poor man, with the fisherman that are catching fish, and with the students that are studying."[৬]*

অর্থাৎ বেদান্ত বা উপনিষদের ধারণা শুধু জঙ্গলে বা গুহায় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না, এটাকে নিয়ে আসতে হবে জনসম্মুখে, যেমন কর্মক্ষেত্রে, ছাত্র জীবনে, গরিবের কুটিরে, জেলে যে মাছ ধরছে তার জীবনে।

বেদান্ত দর্শনে ব্যবহারিক রূপ দিতে বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেন যে, মানুষকে সমস্ত জীবনে ঈশ্বরকে দেখতে হবে। তিনি তার নিজের সন্তানদের পাশাপাশি অন্যদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখার পরামর্শ দেন। ঈশ্বর সকল জীবনে সমানভাবে উপস্থিত। তিনি সমগ্র বিশ্বকে ঈশ্বরপূর্ণ বলে মনে করেন। তিনিই সন্তানের মধ্যে, স্ত্রীর মধ্যে এবং স্বামীর মধ্যে: তিনিই ভাল এবং খারাপের মধ্যে আছেন; তিনি পাপ এবং পাপী মধ্যে আছে; তিনি জীবনে এবং মৃত্যুতে আছেন। অতএব, আমাদের উচিত শুধু মানুষের জীবনকেই নয়, সমস্ত জীবনকেও যথাযথ সম্মান দেওয়া। আমাদের দেখা উচিত তাদের মধ্যে ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান। আমাদের মধ্যে থাকা সমস্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতি দূর করা উচিত। এবং তখনই পৃথিবীতে একটি উন্নত মানব সমাজ দেখা সম্ভব।

স্বামীজির নব্য বেদান্তে একটি জীবন্ত এবং ব্যবহারিক দিক ফুটে উঠেছে। তিনি বেদান্তের নীতিগুলি সাধারণ মানুষের স্তরে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সময়ের পূর্বে অবশ্যই বেদান্ত দর্শন ছিল একটি আধ্যাত্মিক মূল্যবান তত্ত্ব। কিন্তু, তিনিই প্রথম মানুষ যিনি এটিকে ব্যবহারিক জীবনে তুলে ধরেছেন। নব্য বেদান্ত দর্শনে বিবেকানন্দ দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, বেদান্তের শিক্ষা কিভাবে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায়। তিনি এটাও বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বেদান্তের আদর্শ কেবল একটি আদর্শ জগতেই মূল্যবান নয় বরং এটি ব্যবহারিক জগতেও সমান মূল্যবান। তিনি নব্য বেদান্ত দর্শনে মানুষকে সমাজে সামাজিক সমতা ও নিঃস্বার্থ ক্রিয়াকলাপ করতে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। এইভাবে, তিনি বেদান্ত দর্শনে একটি নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন যা মানবজাতির উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত ব্যবহারিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনের একটি নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন যা ব্যবহারিক বেদান্ত দর্শন নামেও পরিচিত। আমরা জানি যে সারা জীবন বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর নব্য বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন তাঁর শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেন যে, তত্ত্ব খুব ভালো, কিন্তু যেকোন তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রকৃতি থাকা উচিত। কোন তত্ত্বের যদি ব্যবহারিক মূল্য না থাকে তবে তা কার্যকারী হতে পারে না। তাই তিনি বিশ্বাস করেন যে, ধর্ম হিসেবে বেদান্তকে অবশ্যই ব্যবহারিক হতে হবে। বেদান্ত আমাদের সবার মধ্যে একত্ব শেখায়। এটি ধর্ম এবং জাগতিক জীবনের সমস্ত বৈষম্য দূর করে। বিবেকানন্দ মনে করেন, বেদান্ত কখনো অসম্ভব কিছু শেখায় না। একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য যা উপনিষদে মহাবাক্য নামেও পরিচিত 'তত্ত্বমসি'[৭] বা তুমিই সেই, যার অর্থ আপনি ঐশ্বরিক। এটি সসীম আত্মা এবং অসীম আত্মার ঐক্য নির্দেশ করে। মানুষের আত্মা বিশুদ্ধ এবং সর্বজ্ঞ। এই ধরনের মহাবাক্যকে ব্যবহারিক অর্থ দিতে স্বামী বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন,

“বেদান্ত মানুষকে প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন। যেমন- জগতে কোন কোন ধর্ম বলে যে-ব্যক্তি নিজ হইতে পৃথক সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সে নাস্তিক; সেইরূপ বেদান্ত বলেন যে-ব্যক্তি নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। আত্মার মহমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলেন।”[৮]

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, পৃথিবিতে সকল প্রাণীর মধ্যে সমানতা বিদ্যমান। মানুষের জীবন যদি অমর হয়, পশুর জীবনও তাই। পার্থক্য শুধুমাত্র পরিমাণগত, প্রকারগত নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,

“আমিও যেমন, একটি ক্ষুদ্র জীবাণুও তেমন- প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, আর সেই সর্বোচ্চ সত্তার দিক হইতে দেখিলে এ প্রভেদও দেখা যায় না। অবশ্য তৃণ ও একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু যদি অতি উচ্চে আরোহণ কর, তবে তৃণ ও বৃহত্তম বৃক্ষ সমান বোধ হইবে। এইরূপ সেই উচ্চতম সত্তার দৃষ্টিতে এ সবই সমান; আর যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমাকে মানিতে হইবে, নিম্নতম পশু এবং উচ্চতম প্রাণী সমান, তাহা না হইলে প্রতিপন্ন হয় – ভগবান বড় পক্ষপাতী। যে-ভগবান মনুষ্যনামক তাহাঁর সন্তানগনের প্রতি এত পক্ষপাতসম্পন্ন, আর পশুনামক তাহাঁর সন্তানের প্রতি এত নির্দয়, তিনি মানুষের অপেক্ষাও অধম। এরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করা অপেক্ষা বরং আমি শত শত বার মরিতেও প্রস্তুত। আমার সমুদয় জীবন এরূপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত হইবে।”[৯]

স্বামীজি আরও বলেন, আমি নিজে হয়তো খুব কঠোর নিরামিষভোজী নই, কিন্তু আমি আদর্শকে বুঝি। আমি যখন মাংস খাই তখন আমি জানি এটা ভুল। এমনকি যদি আমি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এটি খেতে বাধ্য থাকি, আমি জানি এটি নিষ্ঠুর। আমি অবশ্যই আমার আদর্শকে বাস্তবে টেনে আনব না এবং এভাবে আমার দুর্বল আচরণের জন্য ক্ষমা চাইব। আদর্শ হল মাংস খাওয়া নয়, কোন প্রাণীকে আঘাত করা নয়, কারণ সব প্রাণীই আমার ভাই। শুধুমাত্র মানুষের ভ্রাতৃত্বের কথা না বলে! যদি আপনি তাদের আপনার ভাই হিসাবে ভাবতে পারেন, তাহলে আপনি সমস্ত আত্মার ভ্রাতৃত্বের দিকে একটু অগ্রসর হয়েছেন। আমরা সাধারণত দেখতে পায় এধরণের আচরণ ব্যক্তিকে চরম আদর্শের দিকে নিয়ে যায়। তাই স্বামীজি সেইসব ব্যক্তিদের আচরণের সাথে মিলিত করে একটি তত্ত্ব বের করেন, যা সম্পূর্ণ ব্যবহারিক বলে মনে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের নব্য বেদান্ত দর্শনের প্রাসঙ্গিকতায় পৌঁছানোর আগে, আমি বলতে চাই যে তিনি সমগ্র জীবন এবং সমস্ত দার্শনিক চিন্তাভাবনা আধুনিক যুগের

সাথে প্রাসঙ্গিক। যদি কোন অজ্ঞ বা জ্ঞানী ব্যক্তি স্বামীজীর দর্শনের কোন অংশের সংস্পর্শে আসেন তবে এটি দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং এটি তার চিন্তাভাবনা এবং চরিত্রের কিছু পরিবর্তন আনবে। যদি আমি স্বামীজীর নব্য বেদান্ত দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কিছু বলি, আমার বলা উচিত যে তাঁর নব্য বেদান্ত দর্শন বেদান্ত দর্শনের একটি বাস্তব রূপ দিয়েছে। তিনি বেদান্ত দর্শনকে সাধারণ মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছেন। আধুনিক বিশ্বে আমরা ধর্মের ভুল আলোচনাকে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের কারণ হিসেবে দেখতে পাই। এই পরিস্থিতিতে স্বামীজীর ধর্মের শিক্ষাকে স্মরণ করার প্রকৃত সময় যেখানে স্বামীজী সর্বজনীন ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা করেন। আমি ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি যে, তার নব্য বেদান্ত দর্শন সকল মানুষকে সমান হতে শেখায়। ব্যবহারিক বেদান্ত গ্রন্থে আমরা তার সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের চিন্তা খুঁজে পাই। সুতরাং, মানবজাতির সুরক্ষার পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য স্বামীজির শিক্ষা অনুসরণ করার এটাই আসল সময়। স্বামীজী বলেছেন যে, ভাল হওয়া এবং অন্যদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, এটাই ধর্মের মূল বিষয়। তিনি বিশ্বাস করেন সত্য তাই সকল ধর্মের ভিত্তি; তিনি পরামর্শ দেন যে মানুষের অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা থাকা উচিত - এটি হিন্দু, খ্রিস্টান, ইসলাম বা অন্য যে কোন ধর্ম হতে পারে। সবশেষে আমি বলতে চাই যে, স্বামী বিবেকানন্দের এই নব্য বেদান্ত দর্শন কেবল আধুনিক জীবনেই প্রাসঙ্গিক নয় বরং এটি চিরকাল সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থাকবে।

সূত্র নির্দেশ :

---

১. সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিবেকানন্দ স্মৃতি, ক্যালকাটা বুক হাউস, কোলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ১
২. তদেব, পৃ. ১
৩. Complete works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Kolkata 1989, Vol. VII, P 162.
৪. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৫।৩
৫. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, ২য় খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা, ১৯৬৪ পৃ. ১৬৭-৬৮
৬. Complete works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Kolkata 1989, Vol. VII, P 245.
৭. ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।১০।৩
৮. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, ২য় খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কোল, ১৯৬৪ পৃ.১৭০
৯. তদেব, পৃ. ১৭০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. বিবেকানন্দ, স্বামী (অনুবাদক সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ): বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ১৯৯৪.
২. বিবেকানন্দ, স্বামী: বাণী ও রচনা, ২য় খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৪.
৩. বিবেকানন্দ, স্বামী: জ্ঞানযোগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২.
৪. কুণ্ডু, ড. শিখা: অদ্বৈতবেদান্তী স্বামী বিবেকানন্দ, কৃষ্ণগঞ্জ দেববাণী মন্দির, হুগলী, ১৯৫৮.
৫. শাস্ত্রী, ডঃ আশুতোষ: বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদ, ১ম খন্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় , কলকাতা, ১৯৪২.
৬. মিশ্র, প্রভাত: শংকরের দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৯.
৭. বিশ্বরূপানন্দঃ, স্বামী: বেদান্তদর্শনম্, ১ম. খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮০.
৮. বিবেকানন্দ, স্বামী: বাণী ও রচনা, ১ম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৪.
৯. সেনগুপ্ত, সত্যপ্রসাদ: বিবেকানন্দ স্মৃতি, ক্যালকাটা বুক হাউস, কোলকাতা, ১৯৬৪.
১০. শংকর: আমি স্বামী বিবেকানন্দ বলছি, নির্মল-সাহিত্য, কোলকাতা, ২০১৬.
১১. গভীরানন্দ, স্বামী: যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৬.
১২. চেতনানন্দ, স্বামী: বেদান্তঃ মুক্তির বাণী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৬.
১৩. চৌধুরী, জামিল: বাংলা বানান-অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫.
১৪. Vivekananda, Swami: Practical Vedanta, Advaita Ashram, Kolkata , 2012
১৫. Vivekananda, Swami: My India the India Eternal, Ramkrishna Mission Institute, Kolkata, 1993.
১৬. Majumdar, R.C. (ed.): Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume, Calcutta, Swami Vivekananda Centenary, Kolkata, 1963.
১৭. Rama Krishna, R.: Swami Vivekananda : awakener of Modern India, Sri Rama Krishna Math, Mylapore, Channai. 1996.
১৮. Swadananda, Swami:The complete Works of Swami Vivekananda, Vol.1-8, Mayavathi Memorial Edition, Mayavathi, 1932.
১৯. Vivekananda, Swami: Address At the World's Parliament of Religions- Chicago, Advaita Ashrama, mayavathi, 1893.
২০. Kumar Lal, Basant: Contemporary Indian Philosophy, Motilal Banarsidas Publishers, Delhi, 2017.

নব্যকারকতত্ত্বের একটি অভিমুখ হিসেবে থিম্যাটিক রিলেশন তত্ত্ব

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কে. কে. দাস কলেজ

সারসংক্ষেপ : ফিলমোরের কেস গ্রামারের পর তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা বিরোধিতা করে অন্যান্য তাত্ত্বিকদের মতবাদ যখন এক অর্থে নব্যকারকতত্ত্বের সূচনা করে, তখন গ্রাবার এবং জ্যাকেনডফের থিম্যাটিক রিলেশন তত্ত্ব ভিন্নধর্মী বয়ান হিসেবে উঠে আসে। চমস্কিও থিটা তত্ত্বে তাঁর কারক-বিষয়ক ভাবনাকে প্রকাশ করেন। থিম্যাটিক তত্ত্ব এবং থিটা তত্ত্বের মধ্যেও রয়েছে অনেক তফাত। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে এই থিম্যাটিক ও থিটা তত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করব। সেই সূত্রে ফিলমোরের কেস্ তত্ত্বের সঙ্গে থিটা তত্ত্বের প্রভেদও উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ : কারক, থিম, থিটা, রিলেশন, বাগর্থ

প্রাচীনকাল থেকেই তো ভাষাচর্চায় কারক-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রাচ্যের সংস্কৃত ব্যাকরণ হোক বা পাশ্চাত্যের গ্রিক লাতিন গ্রামার - প্রাচীন বৈয়াকরণদের অনেকেই তাঁদের ভাষাচর্চায় কারককে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই বিচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণেও কারক গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও বলা যায়, দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত প্রথাগত স্কুল-পাঠ্য ব্যাকরণে হাজার বিভ্রান্তি সত্ত্বেও সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের মেদবহুল কারকের অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে কারক আলোচিত হলেও পদ-প্রকরণের সীমানা অর্থাৎ অন্বয়ের এলাকাতেই এই আলোচনা আবদ্ধ ছিল। কিন্তু অন্বয়ের অধোগঠনে (deep structure) বাগর্থের এলাকাতেই যে কারক-ভূমিকা (case role) সংলগ্ন থাকে, সেকথা প্রথম বলা হল, গত শতকের ছয়ের দশকে। আমাদের এই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পৃথক পৃথক ভাষার ব্যাকরণে পৃথক পৃথক ভাবে কারকচর্চার অভিমুখ গেল বদলে। প্রথাবাঁধা বৈয়াকরণদের উলটো কোটিতে দাঁড়িয়ে প্রথাভাঙা ভাষাবিজ্ঞানীরা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, কারকচর্চায় ভাষার বিশেষ থেকে নির্বিশেষের দিকে যাত্রার কথা। বিশেষ ভাষার ব্যাকরণে কারক আলোচনার পরিবর্তে রচিত হতে শুরু করল নির্বিশেষ কারকতত্ত্বের বয়ান। ব্যাকরণের কারকের বদলে কারককে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হল কারকেরই ব্যাকরণ। যেন আলাদা প্রস্থান হিসেবেই আবির্ভূত হল নব্যকারকতত্ত্ব। এই নব্যকারকতত্ত্বের পুরোধা চার্লস ফিলমোর। তাঁর ১৯৬৮-র দ্য কেস ফর কেস এই নতুন যুগের সূচনা করেছিল। খুলে দিয়েছিল কারকতত্ত্বের বিভিন্ন

অভিমুখ। তার মধ্যে অ্যান্ডারসনের লোকালিস্ট তত্ত্ব, কুকের মেট্রিক্স তত্ত্ব, স্ট্যারোস্টার লেক্সিকেস তত্ত্ব, চেফ্-এর ক্রিয়া বিষয়ক তত্ত্ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরও একটি অভিমুখ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা হল – থিম্যাটিক তত্ত্ব। আমাদের বর্তমান আলোচনায় জেফ্রি গ্রাবার এবং রে জ্যাকেনডফের থিম্যাটিক তত্ত্ব ছাড়াও আসবে তাঁর থেকে অনেকটা আলাদা চমস্কির থিটা তত্ত্ব।

গ্রাবার এবং জ্যাকেনডফের তত্ত্ব :

কারকতত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল বাক্যের ভাব বা 'থিম'-কে প্রাধান্য দিয়ে নির্মিত থিম্যাটিক রিলেশনের থিয়োরি (ভাবগত সম্পর্কের তত্ত্ব)। এই তত্ত্বের প্রবক্তা জেফ্রি গ্রাবার। ১৯৬৫-তে নিজের গবেষণা সন্দর্ভ 'Studies in Lexical Relation'-এ তিনি এই তত্ত্বের প্রস্তাব করেন। এর দু'বছর পর ১৯৬৭-তে গ্রাবার লেখেন — 'Functions of the Lexicon in Formal Descriptive Grammar'। এই দুটি লেখা একত্রিত করে বেশ কিছু পরিমার্জনার পর ১৯৭৬-এ প্রকাশিত হয় গ্রাবারের গ্রন্থ — Lexical Structure in Syntax and Semantics।

১৯৬৫ ও ১৯৬৭-তে এই থিম্যাটিক রিলেশন তত্ত্বের প্রাথমিক কাঠামো পেশের পর এই তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই আরেক ভাষাবিজ্ঞানী রে জ্যাকেনডফ। ১৯৭২-এ প্রকাশিত Semantic Interpretation in Generative Grammar গ্রন্থে এই তত্ত্বের বিকশিত চেহারা ধরা পড়ে। পরবর্তীকালে জ্যাকেনডফ এই বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন চমস্কি তাঁর 'GB Theory'–তে এই তত্ত্বের আপাত ধারণা গ্রহণ করেন।

চমস্কির (১৯৬৫)-র অন্বয়ের Standard Theory–র বিরোধিতা করেই 'Derivtional Semantic Theory' পেশ করেন গ্রাবার। বীজবাক্যের বাগর্থ এবং অন্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক সন্ধানই ছিল তাঁর তত্ত্বের মূল লক্ষ্য। অন্বয়ের অধোগঠনের চেয়েও গভীরতর গঠনের কথা বলেন গ্রাবার। তিনি বলেন -

> "A level at which semantic interpretation will be relevant will therefore be deeper than the level of 'deep structure' in syntax. This level will be derivationally prior to the manifestation of lexical items in the generated string, the appearance of which will constitute the syntactic interpretation. Thus the underlying structures generated before semantic and syntactic interpretation we will term the prelixical structure."
>
> (Gruber, 1965 : 2)

গ্রাবারের pre-lexical গঠন বাক্যে অবস্থিত পদসমূহের স্বভাব বা বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি তাদের পারস্পরিক আন্বয়িক ও বাগর্থ-তাত্ত্বিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবে। 'ক্রিয়া' হল এই পদ-পূর্ব-গঠনের (Prelexical Structure) কেন্দ্রীয় উপাদান এবং ক্রিয়া ছাড়া Noun Phrase ও Prepositional Phrase থাকে যাদের কারক ভূমিকা থাকে এবং ক্রিয়ার সঙ্গে বাগর্থতাত্ত্বিক সম্পর্ক থাকে। এই গঠন অন্বয়ের ভিত্তি নির্মাণ করার পাশাপাশি বীজবাক্যের বাগর্থ-সম্পর্ক নির্ধারণ করে বলেই গ্রাবার একে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন।

গ্রাবারের কারক ভাবনায় প্রধান কারক-ভূমিকা হল Theme যা obligatory element বা object। তিনি পাঁচটি কারকের কথা বলেন — Theme (O), Agent (A), Location (L), Source (S) এবং Goal (G)। তাঁর কারকতত্ত্ব অবশ্যই আধার প্রধান (Localistic), কেননা L, S ও G তিনটি Locative Case–এর কথা বলে। তিনি উদাহরণ দিয়ে Theme–এর প্রাধান্য ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন —

(১) John sent a book to Mary.
(২) Mary received a book from John.
(৩) John gave a book to Mary.
(৪) Mary obtained a book from John.
(৫) John sold a book to Mary.
(৬) Mary bought a book from John.
(৭) The book went from John to Mary

(১) থেকে (৬) সংখ্যক বাক্যে যথাক্রমে পাঠানো, দেওয়া, বিক্রি করা ক্রিয়া তিনটির বাচ্যভেদে ৬ রকম প্রকার দেখা গেছে। ক্রিয়াগুলোর অর্থভেদকে উপেক্ষা করে বলা যায়, সবক্ষেত্রে 'transition of possession' বা স্বত্ব বদল ঘটেছে। তাই pre-lexical structure–এ (১) — (৬) সংখ্যক বাক্যের সঙ্গে (৭) সংখ্যক-এর কোনও তফাত নেই। এক্ষেত্রে 'Book' Theme হলে 'John' হল Source এবং 'Mary' হল Goal।

আমরা আগে জ্যাকেনডফের কথা উল্লেখ করেছিলাম, যিনি গ্রাবারের তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। জ্যাকেনডফই তাঁদের উভয়ের তত্ত্বকে Thematic Relation নাম দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন —

> "The fundamental semantic notion in Gruber's analysis is the Theme of a sentence. The centrality of the Theme accounts for the term thematic relation with which I will refer to the entire system (The term is due to Richard Stanley). In every sentence there is a noun phrase

functioning as Theme. Gruber does not give totally explicit criteria for determining in every sentence which NP is the Theme, but some overall considerations emerge from his work.”

(Jackendoff, 1972 : 29)

জ্যাকেনডফ ফিলমোরের কেস গ্রামারের জায়গায় থিম্যাটিক রিলেশন-এর জন্য সওয়াল করে বলেন, এই তত্ত্ব একই রূপতাত্ত্বিক ক্রিয়ার বিবিধ প্রয়োগের সমন্বয় সাধন করতে পারে।

(৮) Herman kept the book on the shelf.

(৯) Herman kept the box.

এখানে দুটো ক্রিয়া-কে আলাদা ক্রিয়া বলা যাবে না। একই ক্রিয়া, কিন্তু (৮)-এ অবস্থানগত আধার (positional location) গুরুত্ব পেয়েছে, (৯)-এ স্বত্বগত আধার (possessional location)। জ্যাকেনডফ তিনটি কারকের কথা বললেন এবং location-এর তিন রকম বিভাজন করেন। তাদের ক্রমোচ্চ কাঠামো অনুযায়ী সাজালেন (i) Agent; (ii) Location, Source, Goal; (iii) Theme। Thematic Hierarchy-র সাহায্যে তিনি Passive, reflexive এবং NP-deletion নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

(১০) John was shaved by himself.

(১১) * Himself was shaved by John.

(১০)-এর অধোগঠনে John = object and Theme Himself = Subject and Agent তাহলে Thematic Hierarchy–তে ‘Himself’ ‘John’–এর চেয়ে উচ্চে অবস্থিত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভাবগত ক্রমোচ্চ অবস্থা (THC) মান্যতা পাচ্ছে না। (১১)-এ THC রক্ষিত হলেও বাচ্যগত অন্বয় বিঘ্নিত হচ্ছে। (১০)-এর কর্তৃবাচ্যে Agent Theme-এর বাঁ দিকে থাকে। ফলে বাচ্যগত অন্বয় এবং THC সমন্বিত হয়। গ্রাবারের সঙ্গে জ্যাকেনডফের তফাতের জায়গাটা হল, তাদের প্রয়োগের ধরন। গ্রাবার যেখানে Thematic Relation-কে সঞ্জননী বাগর্থতত্ত্ব (Generative Semantics)-এর আওতায় এনে তাকে চমস্কীয় অধোগঠনের গভীরতর স্তর হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, সেখানে জ্যাকেনডফ তার তত্ত্বকে Standard Theory–র অনুষঙ্গে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদানে প্রয়োগ করেন। তিনি পাঁচরকম বিধেয় (Predicate) তথা Semantic function–এর কথা বলেন যা সমস্ত ক্রিয়াকে প্রকাশ করতে সক্ষম। যথা — Be, Go, Stay, Cause and Let।

“This system of semantic functions enables us to express a rich range of semantic information with a rather small set of primitives. The strongest claim one could make is

that the five functions presented here are the only functions in semantic theory that when used alone represent verbs; i.e. one of these five must be the outermost function in the representation of any verb." (Jackendoff, 1976 : 110)

জ্যাকেনডফ তাঁর Semantic function–এর তালিকা দিয়েছেন –

	Positional	Possessional	Identificational
GO	go	receive	become
(motional)	fall	inherit	change
BE	be	have	be
(punctual)	contain	own	seem (?)
STAY	stay	keep	stay
(durational)	remain		remain
CAUSE (GO..)	bring	obtain	make (e.g. make it red)
	Take	give	elect
CAUSE (STAY...)	keep	keep	keep
	hold	retain	
LET (GO...)	drop	accept	
	release	fritter away	
LET (BE...)	leave	permit	leave
	allow	(e.g. permit him $ 5)	(e.g. leave it red)

(Jackendoff, 1976 : 110)

চমস্কির থিটা তত্ত্ব :

নোয়ম চমস্কির কারক-ভাবনা প্রধানত পাওয়া যাবে **১৯৮১**-তে প্রকাশিত 'Lectures on Government and Binding' (The Pisa Lectures)-এ। **১৯৬৫**-তে তিনি Aspects–এ কারককে গুরুত্ব দেননি। সেখানে তিনি বলেন, অধোগঠনের বদলে অধিগঠনে বিশেষ্যর অবস্থানের মাধ্যমে সাধারণত কারক নির্ধারিত হয়। যদিও অধিগঠনের শৈলীগত বিপর্যাস (stylistic inversion) কারককে প্রভাবিত করে না।

(১২) He was struck by a bullet.

(১৩) <u>He</u> is easy to please.

(১৪) <u>He</u> frightens easily. (Chomsky, 1965 : 221)

চমস্কি-র মতে 'he' সর্বনামটি প্রতিটি বাক্যেরই যৌক্তিক অবধেয় (logical object)।

১৯৮১-র G.B. Theory–তে চমস্কি কারককে গুরুত্ব দিলেন। এই তত্ত্বে তিনি x-bar তত্ত্বের কথা বলেন। খুব সংক্ষেপে বলা যায়, lexicon এবং categorical component মিলে তৈরি করে ভিত্তি (base)। এই ভিত্তি সূত্র তৈরি করে D-

Sturcture। এরপর প্রযুক্ত হবে transformational component যেমন move-α ইত্যাদি। পাওয়া যাবে S-Structure। এই S-Structure–এ প্রযুক্ত হবে Phonetic Form Component এবং Logical Form Component। এই সামগ্রিক গঠনের মধ্যে একাধিক নিয়ম আলাদা আলাদা কার্যকারিতার জন্য প্রযুক্ত হবে। যেমন —

(i) bounding theory
(ii) government theory
(iii) θ-theory
(iv) binding theory
(v) Case theory
(vi) Control theory

এর মধ্যে কারক নিয়ে আলোচনা করেছেন θ-theory এবং Case theory–তে। চমস্কি বলছেন — "θ-theory is concerned with the assignment of thematic roles such as agent-of-action, etc. (henceforth: θ-roles)... Case theory deals with assignment of abstract Case and its morphological realisation." (Chomsky, 1993 : 5-6)

θ-তত্ত্বের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চমস্কি প্রথমেই কাটজ্, গ্রাবার, জ্যাকেনডফ, ফিলমোর প্রমুখের নামোল্লেখ করেন। 'John Ran quickly' বাক্যের উদাহরণ দিয়ে বলেন, এখানে একটা even রয়েছে যেটা running এবং quick এবং John যার Agent। এর LF–এ John (The man/ he)–এর θ-role রয়েছে। তিনি একে argument বলবেন। বাক্যে বিধেয় ছাড়াও অনেক non-argument রয়েছে যাদের θ-role নেই। θ-ভূমিকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ θ–অবস্থান। θ-নীতি দিয়েই বাগর্থ-সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যাবে। প্রতিটি যুক্তিক (argument) একমাত্র একটি θ-ভূমিকাও একটি মাত্র যুক্তকের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। থিটা থিয়োরির মূলকথা theta criterion বা থিটা ভূমিকা গ্রহণ করার যোগ্যতা। (Chomsky, 1993 : 35-36)

Case Theory-তে কারক সংযুক্তির মূল উপাদানের কথা বলেছেন চমস্কি। প্রাথমিকভাবে তিনি পাঁচটি সূত্র দিয়েছেন। যথা —

(i) NP is nominative if governed by AGR
(ii) NP is objective if governed by V with the subcategorisation feature — NP
(iii) NP is oblique if governed by P
(iv) NP is genitive in [NP-X]

(v) NP is inherently Case-marked as determined by properties of its [-N] governor.

চমস্কি উপরের (i)-(iv)-এর ক্ষেত্রে কারককে বলেছেন গঠনগত (Structural) এবং (V)-এ কারক সহজাত (inherent)।

ফিলমোরের কেস্ এবং চমস্কির থিটা-র প্রভেদ :

আমাদের মনে হয়েছে ফিলমোরের কেস্ এবং চমস্কির থিটা — প্রতিস্পর্ধী এই দুই তত্ত্বের প্রধান প্রভেদের জায়গাগুলো তুলে ধরা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য এই দুই তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্যও রয়েছে অনেক স্থানে। তবে আমরা আপাতত তাদের পার্থক্যের এলাকাটাই শুধু চিহ্নিত করব।

প্রথমত, ফিলমোরের তত্ত্ব পুরোপুরি বাগর্থ (Semantics)-কে প্রাধান্য দিয়েছে। খণ্ডবাক্যের অন্তর্নিহিত সংসক্তির খোঁজ করে সেই তত্ত্ব। চমস্কি বাগর্থকে গুরুত্ব দিলেও থিটা তত্ত্বে আন্বয়িক গঠনে পদের অবস্থানের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয়ত, কেস্ প্রধানত বাক্যের অধোগঠনে খণ্ডবাক্যের সামগ্রিক গঠন ও নির্মাণের ব্যাখ্যা দেয়। থিটা-ভূমিকা যৌক্তিক গঠন (Logical Form)-এর স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পন্ন বিশেষ অবস্থানের কোনও পদে সংযুক্ত হয়।

তৃতীয়ত, ফিলমোরের তত্ত্ব অনুযায়ী বিধেয় (predicate)-এর ক্রিয়া বা বিশেষণ বিভিন্ন যুক্তক (argument)-এর সঙ্গে কারক-সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। অন্যদিকে চমস্কির তত্ত্ব অনুযায়ী কোনও পদগুচ্ছের উপাদানে থিটা-ভূমিকা আরোপ করতে পারে।

চতুর্থত, ফিলমোর-এর কেস্ গ্রামার মনে করে পদান্বয়ী কারক-চিহ্নগুলো ভাষা-সাপেক্ষে অধিগঠনে প্রযুক্ত হলেও তার স্বরূপ বা ধর্ম অধোগঠনে নিহিত থাকে। কারক-ভূমিকার ক্রমোচ্চ-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বক্তার মনোভাব বা কথনের প্রেক্ষিত গুরুত্ব পায়। ফিলমোর সেমান্টিক্স-কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই ব্যঞ্জনাতত্ত্ব (pragmatics)-এর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। ক্রিয়া নির্দিষ্ট বিশেষ্যগুচ্ছকে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে নির্বাচন করে এবং ক্রিয়াকে চিহ্নিত করে কারক-বিন্যাস (কেস্ ফ্রেম), যা নিয়ন্ত্রণ করে অধিগঠন-কে। অন্যদিকে চমস্কির থিটা-ভূমিকার ব্যাখ্যা কিছুটা অস্পষ্ট। তিনি মনে করতেন, আন্বয়িক স্তরে শ্রেণি এবং অবস্থান থিটা-চিহ্নিত হবে। মূলত যৌক্তিক গঠন (LF)-এর থিটা ভূমিকা থাকে। আবার যুক্তকগুলি D-গঠন থেকে তাদের থিটা-ভূমিকা লাভ করে। থিটা-ভূমিকার ক্ষেত্রে D–গঠন, S-গঠন, LF-গঠন-এর ভূমিকার প্রভেদ অনেকাংশে অস্পষ্ট বলে মনে হয়।

উল্লেখপঞ্জি :

1. Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge : The MIT Press.

2. ------- 1993. Lectures on Government and Binding. Berlin : Mouton de Gruyter.(7th Ed)
3. Fillmore, Charles J. 1968. The case for case. In Emmon Bach & Robert T. Harmes (eds).
4. Universals in Linguistic Theory. New York : Holt, Rinehart & Winston.
   (দ্রষ্টব্য : http://linguistics.berkeley.edu/~syntax-circle/syntax-group/spr08/fillmore.pdf)
5. Gruber, Jeffrey S. 1965. Studies in Lexical Relations. (PhD thesis). MIT.
   (দ্রষ্টব্য : http://www.ai.mit.edu/projects/dm/theses/gruber65.pdf)
6. ------1976. Lexical structures in syntax and semantics. Amsterdam : North Holland
7. Jackendoff, Ray S. 1972. Semantic Interpretation in Generative Grammar. Cambridge : The MIT Press.

৪২ এর আন্দোলনের পটভূমিকায় ভারতীয় সংবাদপত্রের অবস্থান

সোনালী নস্কর
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। গান্ধীজী ৮ ই আগস্ট এই আন্দোলনের সূচনা করেন এবং জনগণের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন – 'এই আমার শেষ সংগ্রাম- চাই পূর্ণ স্বাধীনতা'। গান্ধীজীর এই আহ্বানে ভারতবাসী এক দুঃসাহসিক গণ বিদ্রোহের সূচনা করে। ব্রিটিশ সরকার এই বিদ্রোহ দমনের জন্য কঠোর দমননীতির গ্রহণ করার সাথেসাথে ভারতবর্ষের নাগরিক অধিকার যেমন- বাক্ স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরও ফতোয়া জারি করে। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতি সংবাদপত্র সম্পাদনার অন্তরায় হয়ে ওঠে। এই দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি তীব্র প্রতিবাদ জানায়। All India Newspaper Editors Conference ও বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলি যৌথভাবে বৃটিশ সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সংবাদপত্র গুলি হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের রূপ। সংবাদপত্রগুলি শুধুমাত্র একটি সংস্থা বা লাভজনক ব্যবসা ছিল না, এগুলি ছিল জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার ও জনমত গঠনের মাধ্যম। সংবাদপত্র সম্পাদনার কাজ এই সময় ছিল জাতীয়তাবাদেরই অঙ্গ। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সংবাদপত্রের নির্ভীক অবস্থান ও ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতি এবং ঔপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তির উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রগুলো যে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল তা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সুচক শব্দ: সংবাদপত্র, স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, আন্দোলন, ঔপনিবেশিক শাসন, সম্পাদনা।

১৯৪২এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ছিল ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের সর্বশেষ গণ অভ্যুত্থান, যার প্রসার ছিল সমগ্র ভারত ব্যাপী। ৮ই আগষ্ট বোম্বাই এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আলোচনায় 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং অচিরেই তা গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ও ঔপনিবেশিক ভারতের দুর্গতি ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে জাগরিত করেছিল। ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা ভারতবাসীকে চূড়ান্ত হতাশ করেছিল। ভারতবাসীর এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে আপোস আলোচনায় ব্রিটিশ এ দেশ বাসীকে ক্ষমতা হস্তান্তর

করবেনা। গান্ধীজী এক দীর্ঘ ভাষণে আবেগ দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন – এই আমার শেষ সংগ্রাম। চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। জনগণের হাতে তুলে দিলেন এক নতুন অস্ত্র-নতুন মন্ত্র- করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। পরের দিনই গান্ধীসহ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন। নিষিদ্ধ হল কংগ্রেস। তবু দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল নিরস্ত্র, নেতৃত্বহীন ভারতবাসীর দুঃসাহসিক গণবিদ্রোহ। ব্রিটিশ সরকার এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে শুধু নির্বিচার গ্রেপ্তার নয়, ভারতবাসীর নাগরিক অধিকারও ধ্বংস করেন। বাক্ স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরও ফতোয়া জারি হয়।

সংবাদপত্র যে কোন গণ-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু থেকেই সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অসীম। জনমত গঠন ও আন্দোলনের আদর্শ প্রচারে সংবাদপত্র অপরিহার্য। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই সংবাদপত্র এই ভূমিকা পালন করে। এই সময়ে বহু হিন্দি-উর্দু পত্র যেমন- পেয়াম-ই-আজাদি বা সমাচার সুধাবর্ষণ বিশেষ ভূমিকা নেয় ভারতীয় স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারে ও ব্রিটিশ জনবিরোধী নীতি গুলির বিরুদ্ধে। ভারতের বহু জাতীয়তাবাদী নেতারাও সংবাদপত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে সংবাদপত্র সম্পাদনায় উৎসাহী হয়েছিলেন। যা ব্রিটিশ সরকারকে পরবর্তীকালে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' (১৮৭৮) এর মতন আইন পাশ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণে প্ররোচিত করে। ১৮৭১ সালে অমৃত বাজার পত্রিকাকে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করার জন্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়। শধুমাত্র অমৃত বাজার পত্রিকা নয় বহু ভারতীয় পত্র পত্রিকা এই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতার জন্য সম্পাদনা রোধে বাধ্য হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসক দেশীয় সংবাদপত্র রোধে এরপর এক নতুন আইন আনেন এবং বহু দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্র ইংরেজী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে নিজেদের সম্পাদনা কাজ যেমন অব্যাহত রাখেন তেমনি ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে সংবাদপত্র বা বিভিন্ন ছাপা মাধ্যম (Print Media) গুলি কেবলমাত্র লাভজনক ব্যবসা বা সংস্থা ছিল না, এগুলি ছিল জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার ও জনমত গঠনের মাধ্যম। বহু অকুতোভয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রচেষ্টায় এসময়ে সংবাদপত্র গুলি প্রচারিত ও সম্পাদিত হত। যেমন 'হিন্দুস্থান' পত্রিকা মদন মোহন মালব্য সম্পাদনা করতেন, 'ইয়ং ইন্ডিয়া', 'হরিজন', 'নবজীবন' মহাত্মা গান্ধী, 'ভয়েস অফ ইন্ডিয়া' দাদাভাই নৌরজী 'অমৃত বাজার পত্রিকা' শিশির কুমার ঘোষ, এবং মোতিলাল ঘোষ, 'মারাঠা' ও 'কেশরী' বাল গঙ্গাধর তিলক সম্পাদনা করতেন। সম্পাদনার কাজ সেই সময়ে জাতীয়তাবাদেরই অঙ্গ ছিল।

১৯৪২ সালে এই পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ নেয় একদিকে ভারতীয়দের তীব্র স্বাধীনতার আকাঙ্খা অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের সর্বাত্মক নীতি সংবাদপত্রের সম্পাদনার অন্তরায় হয়ে ওঠে। এই সময়ে প্রেস কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী "the

work of press advisory committee throws a considerable light on the efforts often AINEC (All India Newspaper Editors Conference) to protect newspapers during the difficult war yers."[1] এই সময়ে ভারত সরকার সমস্ত সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে যে আদেশ নামা জারি করে তা হল "I exercise of the powers conferred by clues (b) of sub rule (i) of the rule 41 of the Defense of India Rules, the Central Govt. is pleased to prohibit the printing or publishing by printer, publisher and editor in British India of any matter calculated directly or indirectly to foment opposition to the prosecution to the war to a successful conclusion or of any matter relating to the holding of meetings or the making of speeches for the purpose, directly or indirectly, of fomenting such opposition aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to apply to any matter communicated by central Govt. or a provincial govt. to the press for publication".[2] এই আদেশের ১৭ দিন বাদে সরকার এবং AINEC সঙ্গে বৈঠকে সামঝোতা হবার পর তা প্রত্যাহত হয়।

১৯৪১ সাল থেকে ভারত সরকার প্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা চালু করে। সরকার আসন্ন আন্দোলনের সম্ভাবনা বুঝতে পেরেছিল। ১৯৪২ সালে সরকার সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে যে আদেশনামা জারি করেছিল সেগুলি ছিল-সংবাদপত্র গুলিতে যেন কোনরকম আন্দোলন সম্পর্কিত খবর ছাপা না হয়, সরকার ও AINEC চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক সংবাপত্রের সম্পাদককে অনুরোধ করা হয় তারা যেমন যুদ্ধের খবর, আন্দোলনের খবর, বা কোন প্ররোচনামূলক এবং সরকার বিরোধী খবর প্রচারে বিরত থাকে। এবং এ ধরনের খবর ছাপা বা ছাপার সম্ভাবনা থাকলে সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। অর্থাৎ ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রাক্‌কালে ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্র বা প্রেসের কন্ঠরোধ সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ৮ই আগষ্ট ১৯৪২ স্বরাষ্ট্র সরকার এক আদেশনামায় ঘোষণা করে 'ভারত রক্ষা আইনের ৪২ নং ধারার বি (,) উপধারায় ভারত সরকার যে কোন আন্দোলন যুদ্ধ সংক্রান্ত এবং কংগ্রেস পরিচালিত যেকোন গণ আন্দোলন বা সরকার বিরোধী কোন আন্দোলনের খবর সংবাপত্রে ছাপার ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে এক্ষেত্রে প্রকাশক এবং সম্পাদক সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র নিম্নলিখিত উৎস থেকে প্রাপ্ত খবর ছাপার যোগ্য হতে পারে। -

১) সরকারি সূত্র থেকে প্রাপ্ত খবর

২) অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া, ইউ.পি.আই এবং ওরিয়েন্ট প্রেস অফ ইন্ডিয়া।

৩) যেসব খবরের কাগজের সংবাদদাতার নাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে নথিভুক্ত তাদের সূত্রে প্রাপ্ত খবর।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে ওরিয়েন্টাল প্রেস অফ ইন্ডিয়া তৎকালে সাম্প্রদায়িক সংবাদ সংস্থা হিসাবে পরিচিত ছিল। ফলে সরকারি অনুমোদন তাদের অন্তর্ভুক্ত জনমানসে তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদী প্রেসগুলি এই আদেশের বিরোধিতায় মুখর হয়ে ওঠে। এর পূর্বে বোম্বের সরকার ৪ই আগষ্ট ১৯৪২ এক সরকারি আদেশনামায় বোম্বের সংবাদপত্রগুলিকে সতর্ক করে ঘোষণা করে, আন্দোলনের প্ররোচনামূলক কোন প্রবন্ধ, বক্তব্য, আন্দোলনের ভবিষ্যত নিয়ে পরিকল্পনা সংক্রান্ত কোন খবর কিংবা কংগ্রেসের আন্দোলনকে ঘিরে কোন খবর প্রকাশ করা চলবে না। ফলে সংবাদপত্র গুলির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া সম্পাদকের কোন উপায় রইল না।

১৯৪২ সালের ১১ই আগষ্ট The Times of India সংবাদপত্রে একটি রিপোর্টে বলা হয় – 'Publication of News'-Government's restriction regarding the publication of news about the mass movement is intended to prevent propaganda which will assist the congress party but I understand the newspaper point of view would be given due weight of Government.

It is stated that here after contact between newspaper editors and the Government of India will not be through the Home Department but through Information Department and Sri C.P.Ramaswami Aiyar may be expected to hold a press conference shortly to thrash the matter cut with responsible newspaper interests. There is like hood of the preventive measures being relaxed if Government feel satisfied that the movement has been nipped it the bud.[3]

১৯৪২ সালের ২০ই আগষ্ট The Statesman পত্রিকা সংবাদপত্রের উপর এই নিষেধাজ্ঞার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং যেখানে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি তাদের বিরুদ্ধে সরকারি এই ফতোয়ার বিরোধীতা করে। রিপোর্ট টি ছিল নিম্নরূপ-

"Protest by Nationalist Press in Calcutta"- The Nationalist newspapers of Calcutta both English and Vernacular have decided to suspend publication for an indefinite period from the morning of Friday, August 21, as a protect against the latest restriction imposed on the newspaper by the Government of India and the provercial Government. This decision was taken at the meeting of the

proprietors and editor of the various newspapers held in Calcutta yesterday afternoon, with Mr. Hemendra Prasad Ghosh editor of Basumati presiding.

The newspapers to be effected by this decision are Amrita Bazar Patrika and Jugantar Hindusthan standard and Ananda Bazar Patrika, Audience, Vaswamita and Matribhumi, Basumati, Telegraph, Bharat, Lokemanya Daily Krishak, Jagriti and Pratyaha”.[4]

এই রিপোর্ট থেকে এটা স্পষ্ট যে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র গুলি সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের যৌথ প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিল এবং তারা তাদের সংবাদপত্রের প্রকাশনা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল এবং এর ফলে নিঃসন্দেহে সংবাদপত্র গুলির সঙ্গে সরকারের দ্বন্দ চরম রূপ ধারণ করে।

১৯৪২ সালের ২২শে আগষ্ট বিহারের রাজ্যপালের রিপোর্ট অনুযায়ী বিহারের স্থানীয় সংবাদপত্রের জগৎ আদৌ সরকারের অনুবর্তী ছিল না। ফলে ‘দি সার্চনাইট’ এবং ‘নেশন’ পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হয়। সার্চ নাইটের সম্পাদক কারারুদ্ধ হন। নেশন সংবাপত্রের কর্তৃপক্ষ সরকারী নোটিশ ছাপাতে অস্বীকার করে এবং সরকারের কাছে সেনসরের জন্য খবর পাঠাতেও অস্বীকার করে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সমকালীন পরিস্থিতিতে প্রেসের স্বাধীনতা হরণ এত কঠোর হয়ে উঠল যে বিপ্লবী কর্মীদের লিফলেট, চিঠি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল হতে হল। যুক্ত প্রদেশে লিফলেট প্রচার চালু হল গোপনে।

সরকারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪২ সালের ২৪ থেকে ২৯শে আগষ্ট AINEC সভায় দিল্লির ভদ্রলোকের চুক্তি সম্পাদকেরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। একদল এই চুক্তির পক্ষে থেকে তাদের সংবাদপত্রের উপর আসা কোন রকম বিপদকে এড়িয়ে সংবাদপত্র প্রকাশের উপর জোর দিলেন। আর একটি দল সরকারের সঙ্গে কোন রকম আপোসে যেতে চাইলেন না। বলা বাহুল্য এই দলটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ন্যাশানাল হেরাল্ডের শ্রী কে.রমা.রাও এবং হিন্দুস্থান টাইমসের শ্রী সুব্রাক্ষনিয়াম। বিদ্রোহী সংবাদপত্র গুলি একত্রিত হয়ে গঠন করল ‘সাসপেনডেড নিউজপেপার এডিটরস কনফারেন্স’।

ভারত সরকারের অতিরিক্ত সচিব আর.টটেনহ্যাম AINEC সভাপতি কে.শ্রীনিবাসকে লেখা চিঠিতে জানান যে সরকার ৮ই আগষ্ট ১৯৪২ এর সংবাদপত্রের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তা তুলে নেওয়া হল যদিও বোম্বে, বেঙ্গল, মধ্যপ্রদেশে পুরানো আদেশ কার্যকর রইল যতক্ষণ না এই প্রদেশগুলির প্রেস পরামর্শদাতাদের রিপোর্ট পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে AINEC বাক্‌স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণী ভূমিকা গ্রহন করে এবং এই

সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সংবাদপত্র গুলিকে বলা হয় জনগণকে গোপন কার্যকলাপ বা বেআইনী কাজে উৎসাহ না দিতে। পুলিশের কার্যকলাপ, সরকারের কার্যকলাপ বা জেলের পরিবেশ সম্পর্কে কোন অতিরঞ্জিত বা অভিযোগ সম্বলিত খবর প্রকাশ না করতে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন চলাকালে সংবাদপত্রের জগৎ ঘিরে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। যারা আপোষহীন সাংবাদিক তারা একদিকে যেমন আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন তাই তারা সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা বা মাথা নোয়ানোর অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারেননি তাই অকুতোভয় সংবাপত্র গুলির উপর সরকারী রোষ পড়েছিল আন্দোলনকারীদের মতই।

তথ্যসূত্র:

১. আবীর চট্টোপাধ্যায়, ভারত ছাড়ো আন্দোলন ফিরে দেখা, প্রগেসিভ পাবলিসার্স ২০০৫
২. ঐ
৩. The Times of India, 11th August 1942
৪. The Statesman, 20th August 1942

বাংলা শিশুসাহিত্যের ভিত্তিভূমি : প্রসঙ্গ বিদেশি শিশুসাহিত্য ও ভিক্টোরিয়ান লিটারেচার

দেবাংকৃতা সরদার
পিএইচ.ডি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী এক যুগান্তকারী অধ্যায়। এই সময় বাংলায় যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের উপরে দাঁড়িয়ে যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল, তার অনেকখানিই পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই শতকে দাঁড়িয়েই ইউরোপ, আমেরিকা তথা বিশ্ব সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যসমূহ রচিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ইংল্যান্ডে যে 'ভিক্টোরিয়ান লিটারেচার' গড়ে উঠেছিল, তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবীভাবে পড়েছে বাংলা শিশুসাহিত্যের মধ্যে। এই শতাব্দীতেই পাশ্চাত্যে শিশুসাহিত্য গড়ে ওঠার সমকালে ভারতবর্ষ তথা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মৌখিক সাহিত্যের উপাদানগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করার কাজ শুরু হয়। পরবর্তীকালে এই সাহিত্যগুলি সংগৃহীত ও সংকলিত ভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এইভাবেই বাংলা শিশুসাহিত্য প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিশুসাহিত্যের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

সূচক শব্দ : ঊনবিংশ শতাব্দী, শিশুসাহিত্য, শিশু, পাশ্চাত্য সাহিত্য, ভিক্টোরিয়ান লিটারেচার।

বাংলা শিশুসাহিত্যের মধ্যে যে সমস্ত বিদেশি রূপকথা আছে, সেগুলির কিছু অংশ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেছিল ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের মাধ্যমে। এর আগে পারস্য ও আরব্য ইত্যাদি নানারকমের গল্প এদেশে আবির্ভূত হয়েছিল জনচিত্তের মনোরঞ্জন করার কারণে। এর পরবর্তীকালে এদেশে জার্মান, রাশিয়া, চীন, জাপান, দিনেমার, ইতালি, ফরাসি, গ্রীক ইত্যাদি নানাদেশের রূপকথার সমন্বয় ঘটেছে। বিশ্ব শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত বিখ্যাত রচনাসমূহ, যেমন মিগুয়েল দ্য সার্ভেন্তিস সাভেদ্রার *ডন কুইকসোট*-এর স্যাঙ্কো পাঞ্জার অদ্ভুত অভিযানের কাহিনি, হ্যান্স অ্যান্ডারসনের *ফেয়ারি টেলস*, লুই ক্যারলের *অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড*, ড্যানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুসো, জোনাথন সুইফটের *গালিভারস ট্রাভেলস*, রবার্ট লুই স্টিভেনসনের *ট্রেজার আইল্যান্ড*, ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড প্রভৃতি কাহিনি যুগযুগ ধরে সব দেশের শিশুদের আনন্দ দিয়ে আসছে। এগুলির মধ্যে অনেক রচনা শিশুসাহিত্য হিসাবে গড়ে না উঠলেও শিশুরা তা পরম আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। শিশুদের জগতে অ্যানডারসন, লুই ক্যারল, গ্রিমভাইদের রূপকথা, ঈশপের গল্প আজও জনপ্রিয়। তবে লোকসাহিত্য, রূপকথা, উপকথা ইত্যাদির সমস্তটাই কিন্তু শিশুসেব্য নয়।

যেমন আরব্য, পারস্য রূপকথার কাহিনি, যেখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যৌনতা পরিপূর্ণ এবং নেশা, মাদকতা ইত্যাদির চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। আসলে যে সমাজব্যবস্থা যে নিয়মে চলে, তার যেরকম চিত্র, তাকে ভিত্তি করে লোকসাহিত্য তৈরি হয়ে থাকে। তার মধ্যে থেকে শিশু-উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলিকে শিশুসাহিত্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ, আমেরিকা তথা সারা পৃথিবীতে অনেক শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য নির্মিত হয়েছে। ভারতবর্ষের *পঞ্চতন্ত্রের* মতো ইউরোপে ঈশপের নীতিকথামূলক গল্প প্রচলিত ছিল। ইউরোপে সর্বত্র প্রচলিত ছিল *Animal Epic* । এর পাশাপাশি নানা দেশের ঘুমপাড়ানি গান (Nursery Rhymes) ও রূপকথার প্রচলন ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্যাকসটন (Caxton) ইংল্যান্ডে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেছেন এবং তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে *Reynard The Fox* (১৩৩১) এবং *ঈশপের গল্পাবলী* (১৩৩৪) সেই সময় থেকে সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর পরবর্তীকালে *গাই অফ ওয়ারউইক, রবিন হুড* এবং রাজা আর্থারের গোল টেবিলের গল্প ইত্যাদি নানান ধরনের শিশুসাহিত্যের সংমিশ্রণে ইউরোপের শিশুসাহিত্যের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে।[১]

১৬৬৮, ১৬৭৩, ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সে লা ফঁতেন (La Fontaine) বিখ্যাত উপকথাগুলি (Fables) প্রকাশ করেন। এই উপকথাগুলি ঈশপের গল্পকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। কল্পনা, ভাবাবেগ, সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এগুলি নিজস্ব শিল্পরূপ নিয়ে মাত্রা পেয়েছে। ১৬৭৮, ১৭১৯, ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ডে এমন তিনখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যেগুলির সঙ্গে সরাসরি শিশুসাহিত্যের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি শিশুদের কাছে পরম আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। গ্রন্থগুলি হল—জন বুনিয়ারনের *The Pilgrims Progress*, ড্যানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুসো, জোনাথন সুইফটের *গালিভারস ট্রাভেলস* । ইউরোপে প্রথম রূপকথার সংকলন প্রকাশ করেন ফ্রান্সের চার্লস পেরো ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে। বিশ্ব শিশুসাহিত্যের মধ্যে অনেক শ্রেষ্ঠ রূপকথাকে সংগ্রহ করে সংকলিত গ্রন্থ আকারে চার্লস পেরোই প্রকাশ করেছেন এবং এইভাবে শিশুসাহিত্যের জগতকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন । এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল--- *Cinderella, Puss in Boots, Blue Beard* ।[২]

১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি দার্শনিক জাঁ জ্যাক রুশোর *Emile* নামক বিখ্যাত উপন্যাসে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে চাপ মুক্ত জগতে শিশুকে স্বাধীনভাবে বিকাশের কথা প্রথম বলা হয়। এর পরবর্তী সময়ে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে টমাস ডে রচিত *Sandford and Merton* নামক গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে শিশুদের নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত মেরিয়া এজওয়ার্থ রচিত *The Parent's Assistant* গ্রন্থটি বাস্তব জগতের শিক্ষা নিয়ে রচিত উপদেশমূলক গ্রন্থ। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় তাঁর *Moral Tales*, ১৮০৩ সালে *Popular Tales*, ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর *Rosamond Series* এর

রচনাগুলি আরম্ভ হয়। মেরিয়া এজওয়ার্থের পিতা রিচার্ড এজওয়ার্থের উপদেশে ও সহযোগিতায় এই গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে।[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অলিভার গোল্ড স্মিথ *Goody Two Shoes* নামে একটি বিখ্যাত নীতিমূলক আখ্যান প্রকাশ করেন। জাতীয় ছড়া সংগ্রহের একটি মূল্যবান সংকলন প্রকাশিত হয়েছে এই সময়ে। সংকলনটি হল--- *Mother Goose's Melody*। সম্ভবত এই ছড়া সংকলনটি করেছেন গোল্ড স্মিথ।[৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শিশুসাহিত্যের স্বর্ণযুগের সূচনা হয় ভ্রাতা ও ভগ্নী চার্লস ও মেরী ল্যাম্বের হাত ধরে। তাঁদের রচিত *Tales form Shakespeare* নামক গ্রন্থটিতে তাঁরা শেক্সপিয়ার রচিত নাট্যকাহিনিগুলিকে শিশুদের উপযোগী করে রচনা করেন। নাট্যকাহিনিগুলি পড়ার মধ্যে দিয়ে শিশুমন শেক্সপীয়ারের মহত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় ও আনন্দ লাভ করে। হোমারের *ওডিসি* কে অবলম্বন করে চার্লস রচনা করেন *Adventures of Ulysses*। যা বিশ্ব শিশুসাহিত্যের কাছে একটি বিশিষ্ট উপহার।[৫]

১৮১২-২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জার্মান রূপকথার সংকলন *Kinder-und Hausmarchen* (*১৮১২-১৮১৫) প্র*কাশিত হয়েছে। এই রূপকথাগুলি সংগ্রহ করেন দুই ভ্রাতা জ্যাকব লুডভিগ কার্ল গ্রিম ও ভিলহেলম কার্ল গ্রিম। তাঁদের রচিত *গ্রিম সূত্র* ভাষাতত্ত্বের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই ভাষাতত্ত্বের গবেষণার সময় তাঁরা এই রূপকথার সংগ্রহ করেন। ইউরোপে সমস্ত ভাষায় গ্রিমের রূপকথা প্রকাশিত হয় এবং ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয় বিশ্ব শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে। তাঁদের *The Goose Girl* ইউরোপের শিশুদের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে।[৬]

স্যার ওয়ালটার স্কট রচিত ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে *Rob Roy*, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে *Ivanhoe*, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে *Talisman* বড়দের রচনা হলেও ছোটদের মনকে জয় করেছে। এজওয়ার্থ পরিবারের সহযোগিতায় স্কট *Tales of a Grandfather* (১৮২৮-১৮৩১) রচনা করেন। গ্রন্থের গল্পগুলি ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাজকাহিনী* (১৯০৯) রচনার পিছনে এই গ্রন্থের প্রেরণা থাকা অসম্ভব কিছু নয়।[৭]

ডেনমার্কে বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম রূপকথার সংগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর *The Ugly Duckling, The Wild Swans, The Tinder Box, The little Mermaid* পৃথিবী বিখ্যাত। তাঁর আত্মজীবনী *The Story of My Life* এর মধ্যে আধুনিক শিশুসাহিত্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থ *The Ugly Duckling* ও *The little Mermaid* অবলম্বনে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় *কুৎসিত হংসশাবক, মৎস্যনারীর উপাখ্যান* অনুবাদ করেছেন।[৮]

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড লিয়ার *The Book of Nonsense* নামে একটি কবিতার বই রচনা করেন। এই কবিতাগুলি লিমেরিকধর্মী। লিমেরিক হল পঞ্চপদী অর্থহীন ছড়া বিশেষ। তবে 'অর্থহীন' শব্দটিকে সন্দেহ করা যেতে পারে। গুরুসদয় দত্ত, সুকুমার রায় 'ননসেন্স রাইমস' এর অনুকরণে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। বিদেশী প্রাবন্ধিক জন রাস্কিনের গ্রন্থ *The King of the Golden River* ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে লিখিত হতে শুরু করে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে। এটি নীতিশিক্ষা বিষয়ক রূপকথার গ্রন্থ।[৯]

প্রাচীন গ্রীসের দেব-দেবী নিয়ে আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্যিক ন্যাথানিয়েল হথর্ণ *The Wonder Book* (১৮৫২) এবং *Tanglewood Tales* (১৮৫৩) নামে দুখানি গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে আর এম ব্যালাইনটাইন রচিত *Coral Island* ও ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে *Gorilla Hunters* গ্রন্থ দুটি শিশু মনে কল্পনাকে জাগরিত করতে সাহায্য করে। চার্লস কিংসলি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত শিশুসাহিত্য *The Water Babies* রচনা করেন। এই গ্রন্থে রূপকথার সঙ্গে প্রকৃতির এক অদ্ভুত মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে, যা এই শিশুসাহিত্যের সাহিত্যগুণকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।[১০]

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক রেভারেন্ড চার্লস ডজসন শিশুদের নানা ধরনের গল্প শোনাতেন। গরমকালে নদীর ধারে বসে তিনি শিশুদের নানান কাল্পনিক অথচ মজার কাহিনি শোনাতেন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন এইচ জি লিডেলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বিশেষ করে ডিনের ছোটো মেয়ে এলিস লিডলকে তিনি ভীষণ স্নেহ করতেন। চার্লস ডজসনের এই মৌখিক গল্পগুলি নিয়ে লুই ক্যারলের বিখ্যাত সেই গ্রন্থ *Alice in Wonderland* প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় লুই ক্যারলের *Alice through the Looking Glass* ।[১১]

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় আমেরিকার লুইসা এম অ্যালকট *Little Women* নামে শিশুসাহিত্য গ্রন্থটি। সুসান চাউনসি উলসি রচিত শিক্ষামূলক সাহিত্যের সিরিজ 'Katy Series' হল তাঁর বিশিষ্ট অবদান। *What Katy did* (১৮৭২), *What Katy did at School* (১৮৭৩), *What Katy did Next* (১৮৮৬), *Clover* (১৮৮৮), *In the High Valley* (১৮৯২) শিশুসাহিত্য ও শিক্ষাজগতের ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট উপহার। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন দুটি বিখ্যাত উপন্যাস শিশুদের উদ্দেশ্যে রচনা করেন— *The Adventures of Tom Sawyer* ও *Huckleberry Finn* ।[১২]

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রবার্ট লুই স্টিভেনসনের *Treasure Island* (ট্রেজার আইল্যান্ড) নামে অ্যাডভেঞ্চারধর্মী গ্রন্থ। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর *Kidnapped* নামক রচনা বড়দের জন্য রচিত হলেও তা শিশুমনকে পুলকিত করেছে। ১৮৮৮

খ্রিস্টাব্দে জমিদার তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে রচিত হয় তাঁর *Black Arrow* নামক উপন্যাস।[১৩]

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় টমাস হিউয়েসের *Tom Brown's School Days*, ডিকেন্সের নিকোলাস নিকেলবি বা ল্যামের *Eassys of Elia* প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে স্কুল জীবনের বাস্তব চিত্রকে আলোকপাত করা হয়েছে ও তার মধ্যে দিয়ে শিশুর উন্নত চরিত্র গঠনের দিকটিকে নির্দেশ করেছে।[১৪]

ইংল্যান্ডের স্বনামধন্য লেখক অস্কার ওয়াইলড রচিত ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের *The Happy Prince* এবং ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের *The House of Pomegranates* গ্রন্থ দুটি চমৎকার রূপকথা সংকলনের আদর্শ নিদর্শন। তাঁর বিখ্যাত রচনা *Selfish Giant* (১৮৮৮) , *The Nightingle and the Rose* (১৮৮৮)।[১৫]

ইতালির বিখ্যাত লেখক কার্লো লরেনজিনি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত শিশু-গ্রন্থ রচনা করেন *The Adventrues of Pinocchio* নামক বিশ্ববিখ্যাত শিশুসাহিত্য। তিনি কার্লো কলোদি ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত লেখক রুডিয়ার্ড কিপলিং রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলি প্রধানত বনভূমি ও জীব-জন্তুকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। যেমন *Jungle Book* (১৮৯৪- ১৮৯৫)---'Rikki Tikki Tavi', 'Toomai of the Elephants', 'Mowgli' শিশুসাহিত্য জগতের প্রাণ কেন্দ্র । *Kim* (1901) বয়স্কদের জন্য রচিত সাহিত্য হলেও শিশুরাও তার রস আস্বাদন করেছে।[১৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল, তা অনেকখানিই প্রভাবিত ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যধারার দ্বারা। বিশেষত এই সময়ে ইংল্যান্ডে যে 'ভিক্টোরিয়ান লিটারেচার' রচিত হয়েছে, তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবীভাবে পড়েছে বাংলা শিশুসাহিত্যের মধ্যে। এই ইংরেজি সাহিত্যধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মানবসমাজে চিন্তাভাবনার পুনর্নির্মাণ ঘটেছে। 'ভিক্টোরিয়ান লিটারেচার' এর নির্মাণ হয়েছে মহারানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে (১৮৩৭-১৯০১)। এই সাহিত্য গড়ে ওঠার আগে ছিল 'রোমান্টিসিজম যুগ' এবং শেষ হয়েছে 'এডওয়ার্ডিয়ান যুগ' (১৯০১-১৯১০, অনেকের মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বছরে ১৯১৪) দিয়ে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে ইংল্যান্ডে 'ভিক্টোরিয়ান লিটারেচার' রচিত হওয়ার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ প্রণোদনা ছিল। সমাজে বিপুল পরিমাণ শিল্পায়ন এবং তার ফলে শ্রেণীবিভাজন ও অভিজাত শ্রেণী নির্মাণ—এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে, বিজ্ঞান বনাম ধর্মের প্রশ্নে, উপযোগবাদ, পুরানোর প্রতি মানুষের টান অনুভব ও আকর্ষণ, উন্নতি ও উন্নয়ন, নারীবাদ ও নারী বিষয়ক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। নগর সভ্যতার উন্নয়নের ফলে ইংল্যান্ডে কলকারখানার যুগে মানুষ হাঁপিয়ে গিয়ে পুরানোর প্রতি টান অনুভব করে গ্রামীণ সভ্যতায় ফিরে যেতে চেয়েছিল। ফলে গ্রামসভ্যতায় মানুষ নিজেকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের শৈশবকে পুনর্নির্মাণ

করার কাল্পনিক চেষ্টা করে। এটা আসলে ছিল রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য। শৈশবকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে এইভাবে নতুন করে শিশুসাহিত্য নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে শিশুশ্রম বন্ধ করার বার্তা দেওয়া হয়েছিল এবং শিশুদেরকে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার প্রস্তাব ছিল। এইসময় বিদ্যালয় পাঠ্য-পুস্তক রচিত হতে শুরু করে। নীতিকথা, উপদেশমূলক নানা কাহিনি ছাড়াও শিশুদের আনন্দদানের জন্য শিশুসাহিত্য রচিত হয়। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সহজ-সরল, সুখময়, আনন্দময় জায়গাটি যাতে শিশুরা খুঁজে পায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে শিশুসাহিত্য নির্মিত হয়েছে। বিশেষত এই সময় রূপকথা ও উপকথা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তার প্রভাব বাংলা শিশুসাহিত্যের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। এই সময় অনেকে ননসেন্স ভার্সে কবিতা রচনা করেছেন, যেমন লুইস ক্যারল। এই ননসেন্স ভার্স থেকে ভারতবর্ষে ননসেন্স রাইমসের জন্ম হয়েছে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে সুকুমার রায়ও উপস্থিত ছিলেন। সুকুমার রায়ের রচনায় ননসেন্স ভার্সের প্রভাব লক্ষণীয়, যেমন-- *আবোল-তাবোল* (১৯২৩)। এই সময়ে ইংল্যান্ডে বিদ্যালয় জীবনের নানা কাহিনি নিয়ে ‘স্কুল স্টোরি’ রচিত হতে শুরু করে। ‘স্কুল স্টোরি’র প্রভাব সুকুমার রায়ের রচনায় সুন্দরভাবে পাওয়া যায়, যেমন— *পাগলা দাশু*-র কাহিনি। ব্রিটেনে যখন স্কুল জীবনের সাহিত্য রচিত হয়েছে, সেই সময় সুকুমার রায়ও বাংলায় তা রচনা করছেন। পরবর্তীকালে রসিপুরাম কৃষ্ণস্বামী আইয়ার নারায়ণস্বামী (আর. কে. নারায়ণ) রচিত *Malgudi Days* (১৯৪৩)-এর ‘রাজম অ্যান্ড মণি’ স্কুল জীবনের কাহিনি নিয়েই নির্মিত হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে, ইংল্যান্ডেও কন্যাশিশু ও পুত্রশিশুদের জন্য আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য নির্মিত হয়েছে। এই সময়ের ইংল্যান্ডের শিশুসাহিত্যে কন্যাশিশুদের বা মেয়েদের ঘরোয়া কাহিনি শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে গৃহজীবনের প্রতি আকৃষ্ট ও গৃহমুখী করে তোলার প্রবণতা লক্ষ করার মতো। অথচ ছেলেদের জন্য লিখিত কাহিনির অনেকখানিই অভিযানমূলক, অ্যাডভেঞ্চারাস কিংবা বীরত্বের গাথামূলক।[১৭] বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ভারতীয় শিশুসাহিত্যও এই প্রভাবগুলিকে ধারণ করেছিল। এই সময়ে দাঁড়িয়ে যিনি ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যচেতনার মধ্যে দিয়ে দেশীয় ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সাহিত্যিক মহাকাব্য বা লিটারেরি এপিকের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন মানবধর্মকে, মানুষকে বড় করে দেখালেন, দেবতাকে নয়। যা ছিল নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য *রচনার মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রজিৎকে তিনি মানুষ হিসাবে দেখালেন, রাক্ষস হিসাবে নয়। প্রবল প্রতাপশালী রাক্ষসাধিপতি রাবণ পুত্র মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিতের বধ বা হত্যার কাহিনির মধ্যে দিয়ে তিনি মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি রাম চরিত্রকে বড় করে দেখাননি।* এটাই হল নবজাগরণের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ইতালির রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই ছিল যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষজন ইংরেজি শিশুসাহিত্যকে নতুন আধারে বাংলায় পরিবেশন করেন। *সাথী* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় যোগীন্দ্রনাথ বসু, চিরঞ্জীব শর্মা *Reynard The Fox* অনুবাদ করেছেন। ভারতবর্ষে প্রথম হ্যান্স অ্যান্ডারসনের রচনার অনুবাদ করেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তিনি হ্যান্স অ্যান্ডারসনের রচনা থেকে 'কুৎসিত হংসশাবক', 'মৎস্য নারীর উপাখ্যান' অনুবাদ করেন। *Peter Pan* ও *Tom Thumb* এই গ্রন্থের কথা প্রথম বলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এডওয়ার্ড লিয়ারের লিমেরিক কবিতার অনুকরণে সুকুমার রায়, গুরুসদয় দত্ত প্রমুখ কবিতা রচনা করেন।[১৮] এছাড়াও সারা পৃথিবীর ছড়া, রূপকথা ও ঘুমপাড়ানি গান বহুলভাবে প্রচলিত ছিল ভারতবর্ষে।

বাংলা শিশুসাহিত্যে রূপকথা, উপকথা, ছড়া সংবলিত অনেক গ্রন্থ আছে। এগুলি প্রধানত লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। তবে বাংলায় এই সমস্ত রূপকথা বা উপকথা সংকলিত গ্রন্থগুলির সংগ্রাহকরা কেউই দিনেমার লেখক হ্যান্স অ্যানডারসেন বা সি এল ডজসনের (লুই ক্যারল) মতো মৌলিক রূপকথাকার নন। তাঁরা গ্রিমভ্রাতৃদ্বয়ের মতো সংকলক। তবে এই ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর রচিত শিশুসাহিত্য *ক্ষীরের পুতুল* আগাগোড়া রূপকথার গড়নে রূপায়িত হয়েছে। লক্ষ করা যায় যে বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত রূপকথাগুলি দেশি-বিদেশি সমন্বয়ে সংকলিত হয়েছে। বাংলা শিশুসাহিত্য জগতে সৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দেশি-বিদেশি বহু রূপকথা সংগ্রহ করেছেন। *চীলনীমা* তাঁর রূপকথাবিষয়ক প্রথম সংকলিত গ্রন্থ। দেশি রূপকথাগুলির মধ্যে বাংলা, হিন্দুস্থানি, আদিবাসী, ওড়িয়া, সাঁওতালি ইত্যাদি নানা ধরনের রূপকথা লক্ষ করা যায়। সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর *হিন্দুস্থানী উপকথা* শিশুমহলে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশের গল্প, জাতকের গল্প যে শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত তা আগেই বলা হয়েছে। এইসমস্ত কাহিনির পশুপক্ষী, জীবজন্তু চরিত্রগুলি মানবীয় গুণের অধিকারী। তাদের কথাবার্তার মধ্যে নানা রকমের বুদ্ধি-বিবেচনা আরোপিত হয়েছে। জাতকের গল্পগুলি রূপকথা বা উপকথা নয়, এগুলি প্রচলিত লোককথা কিংবা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত।[১৯]

বাংলার উপকথাকে পুস্তকাকারে প্রথম রূপ দেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে তাঁর *Folktales of Bengal* (১৮৮৩) গ্রন্থে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি মানবসমাজকে বাংলার লোকসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করা। এরপর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রকাশ করেন তাঁর *ঠাকু'মার ঝুলি* । যেহেতু বাংলার শিশুরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই রূপকথা শুনতে শুনতে বড় হয়েছে, তাই বলা যায় বাংলার সমাজমানস গঠনে এই রূপকথার কাহিনিগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর *টুনটুনির বই*-এর অসামান্য কাহিনিগুলি পূর্ববঙ্গে প্রচলিত লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। যেগুলিকে লিখিত রূপ দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। তাঁদের

রচনার গঠন শিশুচিত্তগ্রাহী এবং তাঁদের ভাষা সহজ, সরল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। দক্ষিণারঞ্জনের ভাষা কাব্যময়, উপেন্দ্রকিশোরের ভাষা মাধুর্যময়। শুধুমাত্র নীতিশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য তাঁদের কোনোভাবেই ছিল না। এইরকম সময়ে মৌখিক সাহিত্যগুলিও সংগৃহীত ও প্রকাশিত হচ্ছিল। এই সময়ের বিখ্যাত রূপকথা সংগ্রাহক হলেন সত্যচরণ চক্রবর্তী ও শিবরতন মিত্র। সত্যচরণ চক্রবর্তীর *ঠাকুরমার ঝোলা* (১৯১৮) ও শিবরতন মিত্রের *সাঁজের কথা* (১৯১৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও শিবরতন মিত্রের অন্যান্য রূপকথা সংকলন গ্রন্থ হল *নিশির কথা, কল্পকথা, ঊষার কথা* (অপ্রকাশিত গ্রন্থ) ইত্যাদি। তাঁর রচনা শিশু এবং বয়স্ক, উভয়ের জন্যই রচিত হয়েছে। *ঠাকুরমার ঝোলা*-য় আছে তিনটি ছড়া ও ষোলোটি গল্প। তবে এইখানে প্রাচীন রূপকথার মধ্যেকার সহজ-সরল কল্পনার, মানব মনের অন্তরঙ্গতার অনুভূতিগুলির অভাব দেখা গিয়েছে। এগুলির মধ্যে অতি নিপুণ ভাবে সতীমহিমা, দেবভক্তি, পরোপকার, লোভে পাপ ইত্যাদি বিষয়গুলির অবতারণা করা হয়েছে।[২০] অন্যদিকে বাংলার লোকজ ছড়া ও রূপকথাকে নতুন রূপে নির্মাণ করেছেন কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। তাঁর প্রথম ছড়ার গ্রন্থ হল *ফুলঝুরি* (১৯১৩)। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর *তাই তাই* নামক ছড়ার গ্রন্থটি। আনুমানিক ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর সংগৃহীত রূপকথাগুলি সাতখানি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *টুলটুল* (আনুমানিক ১৯২৩), দ্বিতীয় গ্রন্থ *সাতরাজ্যের গল্প* (১৯২৮)। তাঁর সংগৃহীত রূপকথাগুলি পূর্ববঙ্গে প্রচলিত লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। তাঁর রচনার ভাষা শিশুমনোগ্রাহী। দক্ষিণারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোরের পর তাঁর মতো সার্থক রচনা আর কারোর ছিল বলে জানা যায় নি।[২১]

পাশ্চাত্যে শিশুসাহিত্য গড়ে ওঠার পাশাপাশি সময়ে ভারতবর্ষ তথা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মৌখিক সাহিত্যের উপাদানগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করার কাজ শুরু হয়। অন্যদিকে দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা শিশুসাহিত্যের যে উন্মেষ পর্ব সূচিত হয়েছে তা অনেকখানিই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। আর এইভাবেই বাংলা শিশুসাহিত্যের মধ্যে পাশ্চাত্য শিশুসাহিত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে লক্ষণীয় হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. আশা গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)*, কলকাতা : ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৬৬, পৃ. ২৮৭-২৮৮

২. ঐ, পৃ ২৮৮-২৮৯

৩. ঐ, পৃ ২৯৭-৯৯৮

৪. ঐ, পৃ ২৮৯

৫. ঐ, পৃ ২৮৯-২৯০

৬. ঐ, পৃ ২৯০
৭. ঐ, পৃ ২৯৮
৮. ঐ, পৃ ২৯১
৯. ঐ, পৃ ২৯২
১০. ঐ, পৃ ২৯৩
১১. ঐ, পৃ ২৯৩-২৯৪
১২. ঐ, পৃ ২৯৪, ২৯৮
১৩. ঐ, পৃ ২৯৫
১৪. ঐ, পৃ ২৯৬
১৫. ঐ
১৬. ঐ, পৃ ২৯৬, ২৯৯
১৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Victorian_literature Accessed on 28/02/2020
১৮. আশা গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)*, কলকাতা : ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৬৬, পৃ ২৮৭
১৯. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শতাব্দীর শিশু সাহিত্য*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯, পৃ ২১৩
২০. ঐ, পৃ ২১৫-২১৮
২১. ঐ, পৃ ২১৯

বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত দেশভাগ

সুজিত দেবনাথ
গবেষক,
বিনোদবিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল ইউনির্ভাসিটি, ধানবাদ

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশভাগ বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক অন্যতম বেদনাদায়ক ঘটনা। দেশভাগের যন্ত্রনা, পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে উদ্বাস্তুর জীবনযাপন তাদের যে কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড় করিয়েছিল তা বর্ণনার অতীত। ইংরেজ সরকারের দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই হোক কিংবা ক্ষমতালোভীদের গদিপ্রাপ্তির লোভেই হোক ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। ঠিক দ্বিখণ্ডিত নয়, ত্রিখন্ডিত হয়েছিল বলা যায়। কেননা একদিকে হিন্দু প্রধান হিন্দুস্থান বা ভারত ভূখন্ড, অন্যদিকে মুসলিম প্রধান পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। এই সময় দেশনেতারা ক্ষমতার লোভে এতটাই আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন যে এমন একটি অনৈতিক দেশভাগকেও নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। ‘নির্দ্বিধায়’ কথাটি বললাম কেননা এই নিয়ে কোনরকম প্রতিবাদ প্রতিরোধ হতে দেখা যায়নি। নেতারা তখন টুকরো দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকেই পরম পাওয়া বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তাদের এই অবিমৃশ্যকারিতার ফলভোগ করতে হয়েছে লক্ষ-কোটি নরনারীকে। ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত জটিল একটি দেশে শুধু ধর্মীয় কারনে দেশভাগ কোনমতেই গ্রহণযোগ্য কোন সমাধান হতে পারেনা, যেখানে ভাষাগত, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত প্রচুর বৈচিত্র্য রয়েছে এই দেশে। পাঞ্জাব কিংবা কাশ্মীরের ভাষা সংস্কৃতির সাথে বাঙালিদের ভাষা সংস্কৃতির আকাশ পাতাল ফারাক। কিন্তু এর পরেও দেশভাগ হয়েছিল। কেউ বুঝে, অনেকে না বুঝেই পাকিস্তান গঠনের জন্য আন্দোলনে সামিল হয়। দেশভাগের প্রাক্-মুহূর্তে ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনি হামেশাই শোনা যেত। কোনো কোনো ব্যক্তির অর্থের লোভ এবং ক্ষমতার লোভের বিনিময়ে দেশভাগ হলো, অনেক অনেক মানুষ নিজের দেশ হারালো। তাই নিয়ে কত কত গল্প কাহিনি রচিত হলে। স্বজনহারা, ভিটেমাটি ছাড়াদের ক্রন্দন এখনও সমানভাবেই জারি আছে। দেশভাগের ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হবার পরেও আজও শোনা যায় দেশহারানোর নতুন যন্ত্রনার কাহিনি। বাংলাদেশ, পাকিস্তানে এখনও সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন চলছে যা অবশ্যই ৪৭- এর দেশভাগেরই পরোক্ষ ফল। আমার বর্তমান এই নিবন্ধের লক্ষ্য হল বাংলাসাহিত্যে প্রতিফলিত দেশভাগ, সেই সাথে দেখানো প্রয়োজন এই দেশভাগ আসলেই কোনো সমাধান ছিল না। এই দেশভাগ লক্ষ-কোটি মানুষকে ঠেলে দিয়েছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সংখ্যালঘুদের উপর বর্বর আক্রমন এই প্রবন্ধকে আরো প্রাসঙ্গিক করে তুলবে বলেই মনে হয়।

ভারত দ্বিখণ্ডিত হবার পর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন পাঞ্জাব এবং বাংলার মানুষেরা। কেননা দ্বিখণ্ডিত দেশের সীমানায় এই দুটি প্রদেশ পড়েছিল। পাঞ্জাবে যতটা না প্রভাব পড়েছিল তার অনেক বেশি প্রভাব পড়েছিল বাংলায়। উদ্বাস্তু সমস্যার মর্মান্তিক রূপ দেখেছে বাংলা। পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু শরনার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে। যার ফলে শুরু হয় তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে। উদ্বাস্তু সমস্যার নিরসনে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের সরকার নানা ভাবনাচিন্তা শুরু করে। ভারত অভিযোগ করে যে পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের পরিকল্পিতভাবে দেশত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। উল্টোদিকে ভারত থেকে খুব কম সংখ্যক সংখ্যালঘু মুসলিম পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে। উভয় রাষ্ট্রের টানাপোড়েনের পর উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে ১৯৫০ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ-র মধ্যে 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি বা দিল্লী চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এরপরেও ভারতে আগত উদ্বাস্তু স্রোত কমানো যায়নি। দেশভাগের পর নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষনা করা ভারতে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হলেও পাকিস্তান কিন্তু সে পথে যায়নি। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলতে থাকে সমানতালে। তাই দেশভাগের পর থেকে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংখ্যা কমতে কমতে একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। যাই হোক সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। এইভাবে যখন ক্রমাগত উদ্বাস্তু সমস্যায় জেরবার অবস্থা তখন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিচলিত হয়ে পড়েন অবস্থা বেগতিক দেখে। একসময় তাঁর মনে হয় এদের চলে আসা উচিত হচ্ছে না, এদের ওদেশেই থাকা ভালো। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের জন্য যথেষ্ঠ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হলেও বাংলার উদ্বাস্তুদের নিয়ে তাদের কোনো ভাবনা ছিল না। ফলে দেশভাগের ফলশ্রুতিতে বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা ক্রমশ জটিল হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটেমাটি থেকে বিতারিত হওয়া সংখ্যালঘু হিন্দুরা শিয়ালদা স্টেশন, হাওড়া স্টেশন, ফুটপাতে, নদীয়ার কুপার্স লেনে, ধুবুলিয়া পি এল হোম সহ অনেক উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। এছাড়া অনেকে দিনের পর দিন খোলা আকাশের নিচে তীব্র শীতে অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন। উদ্বাস্তু শিবিরে এরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, কেউ অনাহারে কেউ বা অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছেন। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অসহায় মানুষগুলিকে ঠেলে দেয় উড়িশ্যার দন্ডকারণ্য জঙ্গলের রুক্ষ, শুষ্ক, প্রতিকূল পরিবেশে। কাউকে বা পাঠানো হয় আন্দামানে দ্বীপান্তরে, যেখানকার জলহাওয়া বাঙালিদের পক্ষে অসহনীয়। ভারতের এই দেশভাগের ফলে দাঙ্গা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ও সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারত ও পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজের ভিটেমাটি ত্যাগ করতে

বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরিযানের ঘটনা বলা হয় একে। দেশভাগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক কোটির উপর মানুষ বাস্তুহারা হন। এর পরবর্তীকালে কয়েক দশক জুড়ে সেই পরিযান চলতেই থাকে। কেউ পায়ে হেঁটে, নদীপথে, ট্রেনে কেউ বা গোরুর গাড়িতে সওয়ার হয়ে চোখের জলে দেশত্যাগে বাধ্য হন। এরা সকলেই নিজেদের প্রিয় বসতভিটা ত্যাগ করেছে শুধুমাত্র সর্বনাশা দেশভাগের জন্য। লক্ষাধিক নারী ধর্ষিতা হন, পঞ্চাশ হাজারের বেশি অবৈধ সন্তান জন্মলাভ করে। সীমাহীন যন্ত্রনা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে এরা পাড়ি দেয় ভারতে। এই নিয়ে লেখা হয়েছে প্রচুর সাহিত্য। হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি, ও ইংরেজি মাধ্যমে প্রথমদিকে দেশভাগ-সংক্রান্ত সাহিত্য লেখা হয়েছে বেশি। পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যেও ধীরে ধীরে শুরু হয় দেশভাগ নিয়ে লেখালেখি।

৪৭ এর দেশভাগ নাড়িয়ে দিয়েছিল মননশীল সাহিত্যিকদের। যন্ত্রনার নানান দিক ফুটে উঠেছে তাঁদের কলমে। সেইসব সাহিত্যিকদের অনেকে নিজেরাও এই মর্মান্তিক দেশভাগের শিকার হয়ে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন। ক্ষমতার লোভ ও জাতিবিদ্বেষ শিল্প সাহিত্যের উপরেও আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ফলে আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, বিভিন্ন উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্পে দেশভাগ ও দেশত্যাগের প্রত্যক্ষ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার নানান দিক ফুটে উঠেছে। রীতু মেননের 'বর্ডারস অ্যান্ড বাউন্ডারিজ হাউ উওমেন এক্সপেরিয়েন্সড দ্য পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া', প্রফুল্ল চক্রবর্তীর 'মার্জিনাল ম্যান', ভীষ্ম সাহানির 'তমস', মুনশি প্রেমচাঁদের 'গোদান', সাদাত হোসেন মান্টোর 'টোবা টেক সিং', খুশবন্ত সিং এর 'ট্রেন টু পাকিস্তান' উর্বশী বুটালিয়ার 'আদার সাইড অব দ্য সাইলেন্স- ভয়েসেস ফ্রম দ্য পার্টিশন অব ইন্ডিয়া', আর কে নারায়ন-এর 'ওয়েটিং ফর দ্য মহাত্মা' প্রভৃতি গ্রন্থে ১৯৪৭- এর দেশভাগ, দাঙ্গা, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তুদের সীমাহীন দুর্দশা দরদী ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

শুরুতে পিছিয়ে থাকলেও বাংলাসাহিত্যে পরবর্তীতে দেশভাগ-সংক্রান্ত সাহিত্যের যথেষ্ট সম্ভার খুঁজে পাওয়া যায়। ভারত দ্বিখণ্ডিত হবার পর বাংলাসাহিত্যে প্রথম উপন্যাস পেতে দীর্ঘ ২০ বছর অপেক্ষা করতে হয়। এই ক্ষেত্রে সবার প্রথমেই পথিকৃৎ এর ভূমিকা পালন করেন রাজস্থানে অবস্থিত এক বাঙালি লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী। তাঁর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' বাংলায় লেখা প্রথম দেশভাগের উপর লেখা উপন্যাস। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর পরে পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেক সাহিত্যিক দেশভাগের উপর সাহিত্য রচনা করেছেন। আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী, শঙ্খ ঘোষের 'সুপুরিবনের সারি', সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ও 'যাপিত জীবন', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম' ও 'অর্ধেক জীবন' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ' হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' ইত্যাদি উপন্যাসে দেশভাগের অনিবার্য পরিণতি ফুটে উঠতে দেখি। এই সাহিত্যিকদের অনেকেই দেশভাগের শিকার

হয়েছেন। এছাড়া বেশকিছু স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনীতেও ফুটে উঠেছে দেশভাগের করুণ পরিণতি। দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'ছেড়ে আসা গ্রাম', সুনন্দা শিকদারের 'দয়াবতীর কথা', কিংবা কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'শিকড়ের সন্ধানে' এই জাতীয় গ্রন্থ।

দেশভাগের বেশিরভাগ উপন্যাস লেখা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের কলমে। অন্যদিকে দেশভাগের পর ওপার বাংলায় ঢাকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিক পরিমন্ডল গড়ে ওঠে তাঁদের হাতেই লেখা হয় দেশভাগকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি। তবে বাংলাদেশে লেখা উপন্যাসগুলিতে যতটা না দেশভাগের যন্ত্রনা দেখা দিয়েছে তার অনেকবেশি জায়গা জুড়ে অবস্থান করেছে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষার বিবরণ। বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকরা একইভাবে নিজেদের ফেলে আসা দেশ ও দেশভাগের মর্মান্তিক আলেখ্য ফুটিয়ে তুললেন তাঁদের লেখা উপন্যাস, ছোটগল্পে।

এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে কিছু কিছু ছোটগল্পের কথা বলা যায় যেখানে দেশভাগের যন্ত্রনা অপূর্ব মুনশিয়ানায় ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকারেরা। সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা', সমরেশ বসুর 'আদাব', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী', মহম্মদ ওয়াজেদ আলীর নেহায়েত গল্প নয়', মনোজ বসুর 'ইয়াসিন মিঞা', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'নেড়ে' দেশভাগের উপর লেখা হৃদয়স্পর্শী ছোটগল্প। এছাড়া আরো অনেক ছোটগল্প রয়েছে যেখানে দুই বাংলার সাহিত্যিকরাই মানুষের মর্মবেদনা, হাহাকার ও প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে আসার করুণ আর্তি তুলে ধরেছেন।

দেশভাগ, দেশত্যাগ, ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে অনেক অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। সেগুলো একত্র করলে রচিত হবে আর একটি বিস্তারিত সাহিত্য। সেই বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে প্রবন্ধের এই সীমিত পরিসরে উল্লেখযোগ্য কিছু উপন্যাসেরই আলোচনা করা হবে, যেখানে দেখানো হয়েছে দেশভাগের মর্মান্তিক ফল। শুধুমাত্র দ্বি-জাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে দেশভাগ যে কোনমতেই ঠিক হয়নি তা প্রতিটি সাহিত্যক তাঁদের নিজস্ব যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তুলে ধরেছেন।

দেশভাগ সংক্রান্ত উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ী দেবী পথিকৃতের মর্জাদা পান। তিনি তাঁর উপন্যাস 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'য় দেখিয়েছেন পূর্ববাংলার একটি বিধ্বস্ত পরিবারের ছবি। যেখানে একশ্রেণির উন্মত্ত মুসলমানদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়ে মারা যান পরিবারের কর্তা, তার স্ত্রী ও কন্যা খুন এবং ধর্ষিতা হন, তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। ছোটমেয়ে সুতারা কোনরকমে বেঁচে গিয়ে অবশেষে এক মুসলিম পরিবারে আশ্রয় পায়। সুতারা এবং তার পরিবারের এই দুর্দশা দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন তমিজসাহেব। সুতারাকে কি সান্ত্বনা দেবেন? ভেবে কুলোতে পারেননা। তার শুধু এই কঠিন মুহূর্তে মনে হতে থাকে-"এক নিমেষে পলকের মধ্যে একটি চিরকালের শান্ত গ্রাম-জীবনের মাঝে কোন বিধাতার ইঙ্গিতে কোন অজানা কারনে পুরুষের প্রাণ,

নারীর মান, পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি কেমন করে ধ্বংস লাঞ্ছিত লুপ্ত হয়ে গেল। এ জবাব কি করে কে দেবেন? আর গেল যারা তারা গেল, চিরকালের বন্ধু প্রতিবেশীদের হাত দিয়েই বিনা অপরাধেই। এ লজ্জার কথাই বা তমিজুদ্দিন সাহেব কি করে বলবেন?” ১ এই তো ছিল একজন সাধারণ শান্তিপ্রিয় মুসলমান প্রতিবেশির অন্তরের কথা। এই হিন্দু পরিবারটির পুত্ররা আগেই ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে তারা এই সাম্প্রদায়িক হামলার থেকে রেহাই পায়। যাই হোক সুতারা শেষপর্যন্ত সহৃদয় মুসলিম প্রতিবেশি তমিজ কাকার বাড়িতে নিরাপদে থেকে যায় কিছুদিন। উপন্যাসের একটি চরিত্র অমূল্যবাবুর মুখে শোনা যায় এই অবাঞ্ছিত, অপ্রয়োজনীয় দেশভাগের যন্ত্রনার কথা। তিনি বলেন-“ ভারত হলো সেক্যুলার স্টেট- সর্বধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আর পাকিস্তান হলো শরিয়ত-সম্মত ধর্মীয় রাষ্ট্র। আর ভয় নেই কারো। কিন্তু এত হিসাব নিকেশ করেও দেখা গেল কিছু সংখ্যায় অন্য সম্প্রদায় দু-দেশেই থেকে গেছে। তারা জন্মলব্ধ স্বদেশের মাটি ছেড়ে এলো না এবং গেল না। তবে? তবে দেশ ভাগ করে দেশ কে পেল? কারা পেল? অমূল্যবাবু বসে বসে ভাবতে থাকেন।”২ কিন্তু নিন্দা অপবাদ ও সমাজের ভয়ে শেষপর্যন্ত সুতারাকে পাঠাতে হয় কলকাতায় তার দাদার বাড়িতে। এখানে এসে চরম লাঞ্ছনার শিকার হয় সে, কেননা মুসলমানের ঘরে সে কিছুকাল প্রতিপালিত হয়েছে, মুসলমান যে তাকে জীবন বাঁচিয়েছে সেকথা কেউ উল্লেখ করে না।। দাদার শ্বশুরবাড়িতে সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয় তাকে। শেষপর্যন্ত হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পাশ করে দিল্লীর যাজ্ঞসেনী কলেজে অধ্যাপিকা হয়। এখানে এসে সে জানতে পারে দেশভাগ শুধু বাংলাকেই প্রভাবিত করেনি, পাঞ্জাবী মেয়ে আমাদের স্বাধীনতা এমনই যেখানে দু’দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ মারা গেল, মেয়েদের মান-ইজ্জত গেল, কত চুরি হল। এই হল আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। পুরুষের ক্ষমতাপ্রাপ্তির লোভে যে চিরকাল মেয়েরাই লাঞ্ছিত হয় তা ধরা পড়েছে তমিজসাহেবের স্ত্রীর একটি মন্তব্যে। তিনি বলেন- “তোমাদের দেশভাগ চাই, ঝগড়া করবে করো। আমাদের মেয়েদের মান-ইজ্জত-শরীর নিয়ে এ লাঞ্ছনা কেন? একি তোমাদের ধর্মে বলে? কোরানে লেখা আছে?”৩ এইভাবে জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর উপন্যাসে দেশভাগের প্রতিচ্ছবিতে একদিকে বাংলার দুর্দশা ফুটিয়ে তোলার সাথে পাঞ্জাবের ঘটনাটিও এক কলমে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা বাংলাসাহিত্যে বিরল বলা চলে।

দেশভাগের বিয়োগান্তক পরিণতি ফুটে উঠতে দেখি শঙ্খ ঘোষের লেখা ‘সুপুরিবনের সারি' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে দেখা যায় উপন্যাসের কিশোর চরিত্র নীলুর মামার বাড়ি দেশভাগের ফলে অন্য দেশে পড়েছে। ছোট নীলুর কাছে দেশভাগের অর্থ ঠিকমতো পরিস্ফুট না হলেও এর মধ্যে সে খারাপ কিছুর ইঙ্গিত পায়। যে নীলু মামাবাড়িতে এসে প্রতিবেশি মুসলমান বালক হারুনের সাথে এসে খেলা করেছে, ওদের বাড়িতে ইদের দাওয়াত নিয়েছে সে উপলব্ধি করে সবকিছু এখন আর আগের মতো নেই। একসময় হারুন তাকে ইদের দাওয়াত দিয়েছিল- “কয়দিন পরেই ইদ,

আমাগো ঘরে যাবি তো হেই দিন? দাওয়াত দিলাম কিন্তু।"৪ সেই নীলুই আজকে দেখছে বাড়ির বড়োরা হারুনকে একটু আলাদা চোখে দেখছে, কেননা সে মুসলিম ঘরের ছেলে। ছোট নীলু বুঝতে পারেনা তাদের দুজনের বন্ধুত্বের মধ্যে বাঁধা ঠিক কোথায়? কেনই বা বড়োদের এই আপত্তি? "ইদে গিয়েছিল তো নীলু। কত আদর করে সেমুই খাইয়েছিল হারুনের আম্মাজান। দেবার আগে বলেছিল অবশ্য খাবা তো মনু? বকপে না তো কেউ তোমারে?"৫ উপন্যাসে কিশোর চরিত্র হারুনের মধ্যেও দেখা যায় দেশভাগের হিংসাপূর্ণ বক্তব্য, বিভাজনের কথা। "এয়্যা তো আর তোগো দ্যাশ না, অ্যাহোন অইন্য দ্যাশের লোক।"৬ যাই হোক দেশ যখন ভাগ হয়েই গেথে গেছে ধর্মের ভিত্তিতে। দেশে টেকা তখন আর হয়ে ওঠেনা সংখ্যালঘু হিন্দুদের। অনেকেই প্রাণভয়ে, মেয়ে বৌদের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য কিংবা সন্তানদের ভবিষ্যতের লক্ষ্যে পাড়ি দেয় ভারতের উদ্দেশ্যে। বড়ো মামার মন্তব্যে সেই ইঙ্গিতই ফুটে ওঠে। তিনি বলেন- "হিন্দুরা যেখানে বেশি সেটা নাকি একটা দেশ, মুসলমানরা বেশি হলে সে হল আর একটা দেশ। ....এই যেখানে আমরা বসে আছি এটা তো এখন পাকিস্তান। তো এই পাকিস্তানে কি আর থাকা যাবে আর? থাকা উচিত? ....তাই ভাবছিলাম কলকাতার দিকে একটা আস্তানা তো খুঁজতেই হবে আমাদের – আপনারাও যদি সেখানে -মানে মা আর আপনি একা এখানে পড়ে থাকবেন- আসলে এতো বুঝতেই হবে যে এটা আর আমাদের দেশ নেই।"৭ সত্যিই কি মর্মান্তিক! আজীবন যেখানের জল হাওয়ায় বেড়ে ওঠা, যেখানকার ফল সবজি খেয়ে পুষ্ট হওয়া সেই জায়গাই আর 'নিজের দেশ' নয়! নিজের দেশ যখন নয়ই তখন সবাই নিজের নিজের ঠিকানা খুঁজে নেয় ভারতে। এতে কেউ কেউ যেমন সঠিক আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন তেমনি অনেকেই নিরাশ্রয় হয়ে অনিশ্চিতের জীবন বেছে নিয়েছেন। মাধবমামার কথায় বোঝা যায় মানুষ কত অসহায় হয়ে ভারতে পাড়ি দিয়েছিল। "থাকপে কে আর এহানে? দ্যাহেন না বড়োবাড়ির থিকা চইলা গেছে হগগলে, পালের বাড়ি বেবাক ফাঁকা, দত্তেরাও যাই যাই করে। ঠাকুত্তা-বাড়িতেই বা কয়জন আছে! ওই কেবল জইন্তা আর গোপাইল্যা, আর তো নাই কেউ।"৮ এইভাবেই বাংলাদেশের থেকে দলে দলে লোক ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। নিজের জন্মভূমির টান কি এত সহজে ভোলার? নাকি ভোলা যায়? পুকুরভরা মাছ, গোলাভর্তি ধান তাদের আছে, যেখানে রয়েছে তাদের পূর্বপুরুষদের সমাধি সেই টান মুছে কেউ সহজে আসতে চায় না। তাই কেউ কেউ একগুঁয়ে জেদ নিয়ে বলে বসে- "বলিস যে তোরা, খুকি ভাব, একবার এই কাছারি ঘরটার পিছনের সুপুরি গাছের সারি একটা একটা করে ওর সব কয়টা আমার নিজের হাতে লাগানো.......ঐখানে পড়ে আছে বাবার মঠ, ঠাকুরদার মঠ, এখনো তোর মা ওখানে নিত্য গিয়ে পিদিম জ্বালিয়ে আসে। এইসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, বল তো আমি যাই কোথায়, যাই কেমন করে?"৯ উপন্যাসের দাদুর মতো এমন উপলব্ধি ছিল অনেকেরই,

কিন্তু কোনো পিছুটানের বশেই তারা নিজের দেশে থাকতে পারেনি। যেই স্বাধীনতার জন্য তারা জীবনপণ লড়াই করেছে, সেই স্বাধীনতাই তাদেরকে দেশছাড়া করেছে। এমন দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা কে চেয়েছিল? যেখানে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দেশটিই আর 'নিজের দেশ' থাকলো না। উপন্যাসের বিশুমামা একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। দেশভাগের পর তার মনে হয়েছে-"এরই জন্য কি এতদিন লড়লাম আমরা? এই ভাঙা দেশের জন্য?"১০ এইভাবে এই উপন্যাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে দেশভাগের যন্ত্রনাদায়ক করুণ প্রতিচ্ছবি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম' দেশভাগ নিয়ে লেখা আর একটি মননশীল উপন্যাস। এই বিখ্যাত কথাসাহিত্যিকের জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতার সাথে চলে আসেন কলকাতায়। শৈশবের কিছু সময় বাদে জীবনের সবটাই কাটিয়েছেন কলকাতা তথা ভারতে। ছোটবেলায় পিতার সাথে ভারতে চলে এলেও জন্মভূমির টান তিনি ভুলতে পারেননি। তাঁর পিতার মনে দেশভাগের যে যন্ত্রনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তাই পরবর্তীতে তাঁকে দেশভাগ ভিত্তিক এমন মর্মস্পর্শী উপন্যাস লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। এই উপন্যাসটি দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটিতে বিভাজনপূর্ব পূর্ব বাংলার একটি পরিবারের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেই সাথে দেশভাগের সময়কার পরিস্থিতি, পরবর্তী দেশভাগ, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তু জীবনযাপন, নতুন প্রজন্মের চিন্তাচেতনা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গের নক্সাল আন্দোলন সবই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে দুই বাংলার বিভাজনই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। যাদের মুখের ভাষা এক, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার প্রায় একই, এরপরেও তাদের আলাদা হতে হল শুধুমাত্র ধর্মের কারনে। প্রিয় বাপ-ঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে উদ্বাস্তু জীবন বেছে নিতে হল তাদের। কেউ কেউ আশ্রয় পেলেন পরিচিতজনদের সহায়তায়। নিজদেশে স্বচ্ছল জীবনযাপন করা ব্যক্তিরা হয়ে পড়লেন গৃহহারা, কর্মহীন। পথের নিদারুণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন তারা। সব মিলিয়ে এক করুন , মর্মান্তিক অবস্থা। এই সমস্ত নির্যাতিত মানুষের ইতিহাস হয়ে পড়ল কলঙ্কিত। এইভাবে দেশভাগের ফলস্বরূপ কয়েকটি পরিবারের অসহায় অবস্থা, বিড়ম্বনা, চেনা আপনজনদের সাথে চিরকালের বিচ্ছেদ এসবই মরমী ভাষায় ফুটিয়ে তুললেন ঔপন্যাসিক। এই উপন্যাসের এক জায়গায় শোনা যায়- "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ফাটল ধরেছে। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ধূমায়িত হচ্ছে অসন্তোষ। পশ্চিমের জঙ্গী মনোভাব পূর্বের সংস্কৃতিমনস্ক শিক্ষিত মানুষ মেনে নিতে পারেনা।"১১ বোঝা যায় দেশভাগ, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তু সমস্যার সাথে বাংলাদেশের ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে যে আন্দোলন সেটাও এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যে দাবি তাই ক্রমশ জোরালো হতে থাকে। হিন্দু মুসলমানের ভিত্তিতে এই দেশভাগ যে আদৌ কোনো সমাধান নয় ঔপন্যাসিক তাই বুঝিয়ে দেন।

দেশভাগের যন্ত্রনার আর এক মর্মান্তিক আলেখ্য ফুটে উঠেছে প্রফুল্ল রায়ের ‘কেয়া পাতার নৌকা উপন্যাসে। মূলত ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর পাকিস্তান থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের ভারতে পাড়ি দেওয়ার কাহিনীই উপন্যাসের উপজীব্য। উপন্যাসটি প্রাণবন্ত হয়েছে এর ভাষা, চরিত্রের মানবিক উপস্থাপন, ও গল্পের সুনিপুন বয়নে। এই কারনে দেশভাগের চিত্রসম্বলিত কেয়াপাতার নৌকা মহাকাব্যিক উপন্যাস হলেও সুখপাঠ্য।

দেশভাগ হয়ে যাচ্ছে, চারদিকে গৃহহারাদের মিছিল। এমন সময় এক অবুঝ কিশোরের দৃষ্টিতে দেশভাগজনিত সমস্যা এবং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন তা ফুটে উঠতে দেখি উপন্যাসে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের এক অনবদ্য ছবি রূপায়িত হয়েছে এই উপন্যাসটিতে। একসময়ের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে হার্দিক সম্পর্ক ছিল সময়ের সাথে সাথে তা যে ক্রমশ বৈরিতার জন্ম দেয় তাও দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে।

দেশভাগসংক্রান্ত আর একটি হৃদয়স্পর্শী উপন্যাস হল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। মানুষের চিরকালের না-পাওয়ার আর্তিই যেন ফুটে উঠেছে ‘নীলকণ্ঠ পাখি’র রূপকে। মানুষ তার মনের গোচরে কামনা বাসনার বীজ বপন করে রাখে, ফলে সুখ দুঃখে গড়া জীবনে সবসময় এক নীল রঙে রাঙা পাখির সন্ধানে ফিরে বেড়ায়। এই উপন্যাসের চরিত্ররা সেই পাখির সন্ধান পায় কখনো সমুদ্রের অসীম নীলে, পুকুরপাড়ের বাঁশঝাড়ে, কখনো বা উদ্বাস্তু কলোনীর ভিড়ে, আবার কখনো অর্জুন গাছের ফাঁকে। যাই হোক রূপক নামধারী এই উপন্যাসের চরিত্ররা বাংলাদেশের চিরচেনা মানুষ। ধনকর্তা,মনীন্দ্রনাথ, শশীভূষণ, ভূপেন্দ্রনাথ, ঈশম, মালতী, সামু, ফতিমা, সোনাবাবুর চরিত্র এত জীবন্ত যে পড়লেই খুব কাছের লোক বলে মনে হয় তাদের। চরিত্রের ভাষানির্মান, উপস্থাপনা, ও বর্ণনাভঙ্গি অনবদ্য রূপ দিয়েছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসটিতে দেখা যয় একই গ্রামে বেড়ে ওঠা মানুষগুলোর পারস্পরিক সৌহার্দ্য কোনো অংশেই কম ছিল না, হিন্দু-মুসলমান সেখানে কোনো বাঁধা সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সব যেন কেমন পাল্টে যেতে থাকে। পাকিস্তান গঠনের দাবিদাররা হাওয়া ক্রমশ গরম করতে থাকে। চারদিকে একটা অস্থির দমবন্ধ করা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। চিরচেনা লোকগুলো একসময় সুর বদলে অচেনা হয়ে যায়। গ্রামের মেয়ে মালতী সাহসী বলেই পরিচিত, সামুর উপর সে তর্জন গর্জন করতেও পিছপা হয়না। সেই সামুই একসময়ে পাকিস্তান গঠনের দাবিতে গ্রামে গ্রামে পোস্টার মারে। শেষপর্যন্ত সামুর ইচ্ছাই বাস্তবে রূপ পায়। এতদিন ধরে তারা যে দাবি করে আসছিল অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজে হিন্দুরাই মাতব্বর, পাকিস্তান না হলে মুসলমানদের অধিকার কোনোদিনই প্রতিষ্ঠা পাবে না তার নিরসন হয়। উপন্যাসে ঈশম একেবারে একজন খাঁটি অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। সে বোঝেনা দেশভাগের অর্থ। লেখক তার সম্পর্কে

বলেছেন- “ঈশম বসে বসে কেবল শুনছে। সে ঠিক যেন বুঝতে পারছে না। সে এইটুকু বোঝে, দেশ ভাগ হলে এ দেশটার নাম পাল্টে যাবে। পাকিস্তান হবে। বাংলাদেশের নাম পাকিস্তান- ঈশমের কষ্ট হয় ভাবতে। আর একটা অংশ হিন্দুস্তানে চলে যাবে।”১২ পাকিস্তান সমর্থনকারীদের আন্দোলন সংগ্রামে দেশ দ্বিখণ্ডিত হলো, জন্ম হল পাকিস্তান নামে ইসলামিক ধর্মভিত্তিক দেশের। সেই দেশে হিন্দুদের বসবাস করার অধিকার নেই। শুরু হল জায়গায় জায়গায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতন। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাড়ি দিল ভারতের উদ্দেশ্যে। তখনকার পরিস্থিতিটা পরিস্কার হয়ে যায় দীনবন্ধু নামে এক চরিত্রের কথা শুনে। সে বলে- “থাকতে গেলে হিন্দু হইয়া থাকন যাইব না। মুসলমান হইতে হইব। যদি তা পার থাক।”১৩ এইভাবে জোর করে ধর্মান্তকরণ, নিষিদ্ধ মাংস খাওয়ানোর মতো ঘটনা চলতেই থাকে। সেই সাথে যুক্ত হয় নারী ধর্ষণ, জমিবাড়ি লুণ্ঠন ইত্যাদি।

কিন্তু উপন্যাসের শেষের দিকে এসে দেখা যায় দেশভাগ, পাকিস্তান গঠনের চেয়ে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাটি প্রাধান্য পেতে থাকে। পাকিস্তানের অনুগামীদের মোহভঙ্গ হয়। ধর্ম এক হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষা ও সংস্কৃতিকে মেনে নেওয়া বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই উপন্যাসের একটি চরিত্রকে বলতে শুনি- “তার চেয়ে বড়ো কথা বাপ-দাদার ভাষা বাদে অন্য ভাষা আমাদের জানা নেই। আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা।”১৪ কালজয়ী এই উপন্যাসের বাকী তিনটি পর্ব হল ‘মানুষের ঘরবাড়ি’, 'অলৌকিক জলযান’, ও ‘ঈশ্বরের বাগান’। ‘মানুষের ঘরবাড়ি’তে সোনার কিশোর জীবনের অবিনাশী আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। ‘অলৌকিক জলযান’ এক মহাকাব্যিক উপন্যাস, আর শেষ পর্ব ‘ঈশ্বরের বাগান’ এ আছে দেশভাগ জনিত উদ্বাস্তু পরিবারটির সংগ্রামমুখর জীবনের প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি চরিত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, কাহিনির পটভূমি ও বিস্তার, রোমাঞ্চকর অভিযান, লৌকিক-অলৌকিকের বর্ণমিশেল যেন খন্ডিত দেশের এক অখন্ড চিত্ররূপ। কিংবদন্তী তুল্য এই উপন্যাসটি ভারতের অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় যে কয়টি উপন্যাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি উপন্যাস হল ‘নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে'।

উপরে বর্ণিত উপন্যাসগুলির সবকয়টা এই বঙ্গের সাহিত্যিকদের কলমে লেখা দেশভাগের যন্ত্রনাদায়ক আলেখ্য। পাশাপাশি ওপার বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের কিছু সাহিত্যিকের নামকরা উপন্যাস সংক্ষেপে বর্ণনা করলে দেশভাগনির্ভর সাহিত্য কিছুটা পরিপূর্ণ হবে বলে মনে হয়। সেলিনা হোসেন, আবু ইসহাক, হাসান আজিজুল হক, শহিদুল্লাহ কায়সার, আবুল ফজল প্রমুখ সাহিত্যিক দেশভাগের চিত্রসম্বলিত মর্মস্পর্শী উপন্যাস রচনা করেছেন।

এই বিষয়ে প্রথমেই নাম করবো হাসান আজিজুল হকের। তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘আগুনপাখি’ রচনা করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন দুই বাংলার আপামর

পাঠকদের মধ্যে। 'আগুনপাখি' শুধু বাংলা ভাষারই নয়, পৃথিবীর যেকোন ভাষার অন্যতম উপন্যাস হবার দাবি রাখে। এই উপন্যাসে একজন নিরক্ষর নারীর মুখে সমগ্র উপন্যাসের ভাষারূপ দেওয়া হয়েছে। তার সরল, সহৃদয় মনে কোনো কুটিলতা নেই। এই বিদ্বেষপূর্ণ পৃথিবীতে তিনি যেন ভারতমাতার প্রতিরূপ। আর পাঁচটা সাধারণ মুসলিম নারীর মতো তারও কাজ স্বামী সন্তানদের যত্ন নেওয়া। নিজেদের অধিকার নিয়ে মাথা ঘামাতে খুব একটা দেখা যায়না তাকে। তবে চারপাশের ঘটনা সম্পর্কে তিনি মোটামুটি অবগত। স্বামীর দেশের স্বাধীনতা নিয়ে কার্যক্রম বা ছেলের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণে তার বুক কাঁপে। তবে একসময় সেই অশুভ ক্ষণ এসে উপস্থিত হয়। চারদিকে মানুষে মানুষে অবিশ্বাস, চোরা আতঙ্ক ও হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়। চিরকাল হিন্দুদের সাথে মিলেমিশে বাস করা পরিবারটিই হিন্দুদের সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চোরাগোপ্তা দাঙ্গার খবরও আসতে থাকে। চারদিকে আওয়াজ ওঠে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। এই মুক্তমনা নারীর প্রশ্ন স্বামীর উদ্দেশ্যে- "আগে বল, মোসলমানদের দ্যাশ যি বলছ, সেই দ্যাশ হলে সব মোসলমান সিখানে বাস করবে? কেউ তার বাইরে থাকবে না?"১৫ এই প্রশ্ন একজন অশিক্ষিত নারীর হলেও কত যুক্তিপূর্ণ এই প্রশ্ন। এমনটা যে কোনো দেশে কোনকালেই সম্ভব নয় তা তিনি বুঝেছেন। চারদিকের ঘটনাক্রম ও পরিস্থিতি দেখে কর্তাও বিরক্ত এবং বিচলিত হয়ে পড়েন। তার মনে হয়- "মোটকথা এখন আর স্বাধীনতা-টাধিনতার কথা নাই, স্বাধীনতা দাও আর না দাও, দেশভাগ করে দাও।"১৬ দেশীয় কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের লোভের ফলে দেশ দ্বিখণ্ডিত হল। আপামর মানুষের আবেগ অনুভূতির কোনো মূল্য দিল না। নিজ দেশেই পরবাসী হয়ে গেল অনেকে। মানুষের ভাষা সংস্কৃতি তথা আবেগের উপরে যেন খড়্গাঘাত করা হল। "হ্যা ইন্ডিয়া স্বাধীন হলো, দুশোবছর বাদে ব্রিটিশ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু যাবার সময় দেশটাকে কেটে দু-ভাগ করে দিয়ে গেল। দুভাগ কেন, তিন ভাগ! যেখানে হিন্দু বেশি সেইসব জায়গা নিয়ে হিন্দুস্থান, আর যেখানে যেখানে মুসলমান বেশি সেসব জায়গা নিয়ে পাকিস্তান। বাঙালি মুসলমানদের জন্য পুব পাকিস্তান। আর একটি ভাগ।"১৭ তাই গল্পকথিকার সন্তানেরা সব চাকরিসূত্রে পাকিস্তান চলে গেলে পিতা মাতাকেও সেখানে নিয়ে যাবার জন্য তোরজোড় শুরু করে। কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী কিছুতেই রাজি নন নিজের ভিটা ছেড়ে যেতে। এমনকি স্বামী তাকে শত বুঝিয়েও রাজি করাতে পারেননা। পুত্রদের শত অনুরোধেও তিনি অচল অটল। তার যুক্তিপূর্ণ কথায় পুত্রেরা নির্বাক। পুত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন- "পেথম কথা হচে তোমাদের যি একটো আলেদা দ্যাশ হয়েছে তা আমি মানতে পারিনা। একই দ্যাশ, একই রকম মানুষ, একই রকম কথা, শুধু ধম্মো আলেদা লেগে একটি দ্যাশ একটানা যেতে যেতে একটো জায়গা থেকে আলেদা আর একটো দ্যাশ হয়ে গেল, ই কি কুনোদিন হয়?.......কই ঐখানটোয় আশমান তো দুরকম লয়। শুধু ধম্মোর কথা বোলো

না বাবা, তাইলে পিথিমির কুনো দ্যাশেই মানুষ বাস করতে পারবে না।"১৮ এইভাবে এই উপন্যাসে সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় দেশভাগের বিষময় ফল দেখানো হয়েছে। একটি কথা জানিয়ে রাখি ঔপন্যাসিক হাসান আজিজুল হক নিজেও এই দেশভাগের শিকার হয়ে আশ্রয় নেন বাংলাদেশে।

আবুল ফজলের 'রাঙা প্রভাত উপন্যাসেও দেখানো হয়েছে দেশভাগ, পাকিস্তান গঠন, পাকিস্তান শাসিত পূর্ব বাংলার মানুষজনের রাজনৈতিক ও মানবিক আদর্শজনিত সংকট। শুধু ধর্মের কারনে দেশবিভাগের ফলে যে বাংলাদেশের কোনো ফায়দা হয়নি তাই ফুটে ওঠে উপন্যাসের পাতায় পাতায়। সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠেছে। একইসাথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস রূপও প্রতিফলিত হয়েছে।

আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ি' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে ১৯৪৩-এর পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে দেশভাগ ও দেশভাগ পরবর্তী সময়পর্বকে। এই উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় থেকে যারা উদরান্নের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে তারা স্বপ্ন দেখে এই অসময় একসময় কেটে যাবে। দেশ স্বাধীন হবে, তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর হবে। এই উপন্যাসের চরিত্র জয়গুনের মধ্যেও আশা ছিল একদিন দুর্ভিক্ষের অবসান হবে, দেশ স্বাধীন হবে, তাদের আর অন্নকষ্ট থাকবে না। চালের দাম কমে যাবে। ক্ষুধার যন্ত্রনা তাদের আর সইতে হবে না। "এপাশে আলোচনা হচ্ছে দেশ স্বাধীন হবে, চাল সস্তা হবে। ....দ্যাশ স্বাদীন অইব। আর দুকখু থাকব না কারুর, হুনছি আমি। স্বাদীন অইলে চাউলও হস্তা অইব। আগের মত ট্যাকায় দশ সের।"১৯ একসময় দেশ ঠিক স্বাধীন হয়, কিন্তু জয়গুনদের স্বপ্ন আশা পূরণ হয়না। সেটা যে একটা মিথ্যা খোয়াব ছাড়া কিছু নয়, কিছুদিন পরেই তারা বুঝতে পারে। শেষ সম্বল হিসেবে থাকা ভিটেমাটি থেকেও তাদের উৎখাত হতে হয়। দেশভাগের সুফল যে সাধারণ মানুষ পায়নি এই উপন্যাসেও তা দেখানো হয়েছে। তবে এই উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক হামলা, কিংবা হিংসার প্রতিফলন দেখানো হয়নি।

সেলিনা হোসেন বর্তমান সময়ের একজন নামকরা মহিলা কথাসাহিত্যিক। বাংলাদেশের এই লেখিকা তাঁর দুই খন্ডে রচিত উপন্যাস 'যাপিত জীবন', ও 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' য় দেশভাগের অভিঘাত ফুটিয়ে তুলেছেন মরমী ভাষায়। এক উত্তাল সময়ে উপন্যাসে এক অন্যতম প্রধান চরিত্র প্রতীকের জন্ম হয় ট্রেনে। অনেক অনেক উদ্বাস্তুদের মাঝে রয়েছে তার বাবা আলী আহমেদ, মা পুষ্পিতা, ও তার ছয় বছরের বড়দা প্রদীপ্ত। দেশত্যাগের পর তাদের সংগ্রামমুখর জীবনের প্রতিটি ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। পাশাপাশি পার্শ্বচরিত্র হিসেবে এসেছেন আরো অনেকেই। দেশ স্বাধীন হবার পর ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাক বাহিনীর হামলা, স্বাধীন বাংলার কন্ঠরোধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সবশেষে শেখ মুজিবের হত্যাকান্ড সবই চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসটিতে।

এইভাবেই দুই বাংলার ঔপন্যাসিকদের কলমে দেশভাগের যন্ত্রনাদায়ক প্রতিচ্ছবি মরমী ভাষায় ফুটে উঠেছে। এই যুগের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করেন দেশভাগের নিদারুণ ক্ষত কীভাবে আপামর মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। ছিন্নমূল মানুষগুলো সেই সময় বুঝতে পারছিল না কী করা উচিত? কীই বা এর প্রতিকার? আশ্রয়হীনভাবে রাতের পর রাত অতিবাহন করার পর কেউ হয়তো মাথা গোঁজার স্থান খুঁজে পেয়েছেন, অনেকে উদ্বাস্তু হয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের অনেকটা পর্ব। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও দেশভাগের ক্ষত বহন করে চলেছে দ্বিখণ্ডিত দেশের অসংখ্য মানুষ। তাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কবি সাহিত্যিকদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে এমন কঠিন মুহূর্তে। তাঁরা তাঁদের কলমের মাধ্যমেই প্রতিবাদী বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারেন কূটচক্রী রাষ্ট্রনেতা ও সাধারণ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। আর যেন কাউকে দেশভাগের,দেশত্যাগের যন্ত্রনা বহন করতে না হয়, সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে সকলকে।

তথ্যসূত্র :

১. জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন, সম্পাদক- সুবীর রায়চৌধুরী, সহ সম্পাদক- অভিজিৎ সেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- নভেম্বর, ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ১০৬
২. ঐ, পৃষ্ঠা- ১২২
৩. ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৫
৪. সুপুরিবনের সারি- শঙ্খ ঘোষ, অরুনা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- অগ্রহায়ণ ১৩৭০, পৃষ্ঠা- ১৪
৫. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪
৬. ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৯
৭. ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৩
৮. ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩
৯. ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৫
১০. ঐ, পৃষ্ঠা- ৮২
১১. পূর্ব পশ্চিম- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- ১লা বৈশাখ, ১৩১৫, পৃষ্ঠা- ২২
১২. নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে- অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল, ১৯৭১, পৃষ্ঠা- ৩৬১
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৬৩
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৬৯

১৫. আগুনপাখি- হাসান আজিজুল হক, পিডিএফ সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ২১৪
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৩০-৩১
১৭. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৩২
১৮. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৪৯
১৯. সূর্যদীঘল বাড়ী- আবু ইসহাক, নসাস প্রকাশনী- ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫৫, পৃষ্ঠা- ২১

চরক সংহিতা অনুসারে বিধিবিহিত আহারের প্রকৃতি ও গুণাগুণ বিচার

অমৃতা দাম
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
জামালপুর মহাবিদ্যালয়, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: “সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ”অর্থাৎ সত্ত্বঃ,রজঃ, তমঃ এই তিন প্রকার গুণ।[১] এই গুণসঙ্গবশতঃ পুরুষের সংসার বন্ধন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে- “আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ”[২] অর্থাৎ ত্রিবিধ আহার সকল ভোক্তার প্রিয় হয়ে থাকে।সাত্ত্বিক কর্মের ফল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ, তামসিক কর্মের ফল । গুণত্রয়ের বৈষম্যবশতঃ সৃষ্টিকার্য সম্ভব হয়ে থাকে। গীতার “গুণত্রয়বিভাগযোগ” নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ত্রিগুণাতীত না হলে মোক্ষ লাভ করা যায় না।[৩]। দেহে গুণের কার্য্য চলতে থাকলে ও যিনি উদাসীন এর ন্যায় সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করেন, সত্ত্বাদি-গুণধর্ম্ম সুখ দুঃখাদি কর্ত্তৃক বিচলিত হন না, তিনিই ত্রিগুণাতীত।সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি ভেদে আহার যজ্ঞ, তপস্যা ,এবং দান ত্রিবিধ হয়। শ্রুতি বলেন-“আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ”[৪]। অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হলে সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে।শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য “আহার” শব্দ খাদ্য অর্থেই গ্রহণ করেছেন-“আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ”,যা গ্রহণ করা যায় তাই আহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণই আহার। তাঁর মতে আহার শুদ্ধি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, মোহান্মদ এই ত্রিবিধ দোষ বর্জন করে ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ।এইরূপে ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করতে পারলে চিত্ত নির্মল ও প্রসন্ন থাকে।[৫] স্বামীজী বলেছেন-“খাদ্যাখাদ্যের বিচার মনের স্থিরতা রূপ লাভ করা যায় না। কিন্তু আজকাল আমাদের অনেক সম্প্রদায় এই আহারাদির বিচারের এত বাড়াবাড়ি, এত অর্থ হীন নিয়মের বাঁধাবাঁধি, এ বিষয়ে এত গোঁড়ামি যে, তারা যেন ধর্ম্মটিকে রান্না ঘরের ভেতরে পুরিয়াছেন। এইরূপে ধর্ম্ম এক বিশেষ প্রকার খাঁটি জড়বাদমাত্র। উহা জ্ঞান নহে, ভক্তি ও নহে, কর্ম্ম ও নহে [৬]। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত চরক সংহিতা আজও সমাদৃত।অধুনা উপলব্ধ চরক সংহিতায় আটটি স্থান বা বিভাগ এবং একশত কুড়িটি অধ্যায় বিদ্যমান।অধ্যায়গুলি নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত,যথা-সূত্রস্থান ত্রিশ অধ্যায়, নিদান স্থান আট, বিমান স্থান আট, শরীর স্থান আট, ইন্দ্রিয় স্থান বারো,চিকিৎসা স্থান ত্রিশ, কল্প স্থান বারো এবং সিদ্ধি স্থান বারোটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত।এই গ্রন্থটির কর্তা অগ্নিবেশ,এবং প্রতি সংস্কর্তা আচার্য চরক ,পরিপূরক দৃঢ়বল।[৭] আচার্য চরক চরকসংহিতার “বিমানস্থান”এর প্রথম অধ্যায়ে বিধিসম্মত উপায়ে আহার গ্রহণের কথা

উল্লেখ করেছেন। এই আটটি বিধি হল-প্রকৃতি, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, কাল, উপযোগসংস্থা ও উপযোক্তা।

সূচক শব্দ: ত্রিগুণ, ভগবদ্গীতা, আহারবিধি, ত্রিবিধ দোষ, চরক সংহিতা, রস, আহার সমূহের বর্গবিভাগ, গুণাগুণ বিচার।

ভূমিকা: আচার্য চরক বলেছেন-"বিধিবিহিতমন্নপানং প্রাণিণাং প্রাণিসংজ্ঞকানাং প্রাণমাচক্ষ্যতে কুশলাঃ" অর্থাৎ বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শবিশিষ্ট এবং বিধিবিহিত অন্ন ও পানীয়কে জীবগণের প্রাণস্বরূপ বলে নির্দেশ করেছেন। বিধিসম্মত উপায়ে অন্নপানাদির যথাযথ সেবন না হলে অনিষ্ট ঘটে থাকে [৮]। দ্বাদশটি বর্গে খাদ্যদ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করেছেন ও তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন-শূকধান্যবর্গ শমীধান্যবর্গ, মাংসবর্গ, শাকবর্গ, ফলবর্গ, হরিতবর্গ, মদ্যবর্গ, অম্বুবর্গ, গোরসবর্গ(দুগ্ধঘৃতাদি) এবং ইক্ষু বর্গ অর্থাৎ চিনি জাতীয়দ্রব্য এই দশটি দ্রব্যকে একটি বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এছাড়াও আরও দুটি বর্গ আছে কৃতাহারবর্গ ও তৈলবর্গের বিচারে খাদ্যদ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।তৈল প্রভৃতি আহার দ্রব্যের সংস্কারক হওয়ায় তৈল বর্গের অন্তর্গত এবং কৃতাহার বর্গের অন্তর্গত হল রন্ধন করা আহার দ্রব্য। ত্রিধাতুবিদ্যা বা ত্রিধাতুবিজ্ঞান বেদের কোনও সূক্তে স্পষ্ট ভাষায় নেই, তবে এটি আমরা পাই ব্যাসকৃত চরণব্যূহের একটি অংশে এবং ঋকের ১/৩/৬ সূক্তে-"ত্রির্ণো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজাং শং যো সোমা তেজসা যৎ তদস্তং ত্রিধাতু শর্ম বর্দ্ধতাং"এই সূক্তের ভাষ্যে আচার্য সায়ণ বলেছেন-"ত্রিধাতুবিতি বাত পিত্ত শ্লেষ্ম ধাতু ত্রয়োপশমং শর্ম বহতাং"-অর্থাৎ সূক্তোক্ত ত্রিধাতুর অর্থ ই বায়ু, পিত্ত, কফ এবং তারাই সোম, তেজস এবং অপ্। মানবাদি প্রাণীর মধ্যে বায়ু, পিত্ত কফের স্বাভাবিক প্রকৃতির মতোই বৃক্ষ, লতাদির তথা বিশ্বব্যাপী আকৃতি আকৃতি প্রকৃতিতে ত্রিধাতুর প্রাধান্য অপ্রাধান্য বিদ্যমান। রসনাগ্র্যাহ্য পদার্থের নাম রস। জল ও ক্ষিতি রসের আশ্রয় স্থান এবং এগুলি রসের অভিব্যক্তির প্রতি কারণ। রস ছয় প্রকার স্বাদু, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত এবং কষায়।আচার্য্য চরক বলেছেন ত্রিষষ্টি প্রকার রসের মধ্যে কটু, লবন, অম্ল, তিক্ত, কষায় এই পাঁচ প্রকার রস মিলিত হয়ে রস ছয় প্রকার হয়ে থাকে।[৯]এই ছয় প্রকার রসের মধ্যে মধুর অম্ল ও লবণ রস দ্বারা বায়ুর উপশম হয়,কষায়,মধুর ও তিক্ত রস দ্বারা পিতের এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রস দ্বারা শ্লেষ্মার নিবৃত্তি হয়।এই সকল রসের প্রকৃতিগত ভারসাম্য মানবশরীরে বিদ্যমান থাকলে তা উপকারসাধন করে থাকে। অন্যথায় তা বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিবিধ দোষ উৎপাদন করে থাকে। বায়ু, তিক্ত ও কষায় রস বায়ুর উৎপাদন করে এবং মধুর, অম্ল ও লবণ রস তার উপশম করে। বায়ু, অম্ল ও লবন রস পিত্ত উৎপাদন করে।[১০]।

আহারাদির গুণাগুণ বিচার: চরক সংহিতার 'সূত্রস্থানে' সপ্তবিংশ অধ্যায়ে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গে শূকধান্যবর্গে বিভিন্ন প্রজাতির ধান্যের পৌর্বাপর্য স্থান নির্ণয় করেছেন। ধান্যসমূহের মধ্যে রক্তশালি ধান্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন। এটি

তৃষ্ণানিবারক ও বায়ু, পিত্ত ও কফের শমতাকারক। ব্রীহিধান্য মধুর, অম্লপাক, পিত্তজনক ও গুরু। বেণু যব (বাঁশকাটি চাল)সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি প্রকৃতিগতভাবে রুক্ষ, কষায়ানুরূপ, মধুর, কফ ও পিত্তনাশক এবং বল বৃদ্ধি সহায়ক হিসাবে সুপরিচিত, শারীরিক মেদ হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মহাশালি, কলম, শকুনাহৃত, চূর্ণক, দীর্ঘশূক, গৌর, পান্ডুক,লাঙ্গল,সুগন্ধিক, লোহবাল, শালিকা, প্রমোদক, পতঙ্গ ও তপনীর ইত্যাদি ধান্যের বিভিন্ন প্রজাতি।শালিধান্যের গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গে আচার্য চরক বলেছেন, এটি শরীরের জন্য হিতকারী, রস বৃদ্ধিকারী, শীতল, মধুর প্রকৃতির, স্বল্প বায়ুকারক, স্নিগ্ধ, বৃংহণ এবং শুক্রবৃদ্ধি সহায়ক, সহজপাচ্য ও মূত্রকারক হিসাবে ভেষজ গুণাগুণ বিদ্যমান। কোরদূষ বা কোদোধান এবং শ্যামাক ধান্য সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রকৃতিগতভাবে এগুলি কষায়, মধুর, লঘু, বায়ু বৃদ্ধিকারী, কফ ও পিত্তজনক,শীতল, সংগ্রাহী,শোষক। পুষ্টিগত গুণাগুণ বিচারে হস্তিশ্যামাক, নীবার অর্থাৎ উড়িধান, গবেধূক অর্থাৎ গম বরক, প্রশাতিকা,জলশ্যামাক,চরুকা,বরক,শিবির,উৎকট এবং জুর্ণা প্রভৃতি তৃণধান্যকে শ্যামাক ধানের সমপর্যায়ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গমের উপকারিতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন এটি ভগ্নস্থানের সন্ধানকর, বায়ুহ্রাসকারী, স্বাদু, শীতল, জীবনীয়, বৃংহণীয়, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যজনক এবং গুরু। নান্দীমুখী নামক যব ও মধুলিকা নামক গোধূম এই দুটিও গমের শ্রেণীবিশেষ, এগুলি প্রকৃতিগতভাবে স্নিগ্ধ ও শীতল।গম ব্রণসন্ধানক, বাতহর, স্বাদু, শীতল।এরপর শমীধান্যশ্রেণীবর্গের বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে মুগডালের উপকারিতা সর্বাধিক এইরূপ স্বীকার করে বলেছেন- “বিশদঃ শ্লেষ্মপিত্তঘ্নো মুদ্গঃ সুপোত্তমো মতঃ”অর্থাৎ এটি কষায় প্রকৃতির, মধুর, রুক্ষ, শীতল, কটুবিপাক, লঘু, বিশদ এবং শ্লেষ্মা-পিত্তনাশক হওয়ায় অবশ্যই শরীরের জন্য উপকারী। চরকাচার্য্য মাষকলাই ডাল সম্পর্কে বলেছেন এটি শুক্রবৃদ্ধি সহায়ক,অতিশয় বায়ু নাশক, স্নিগ্ধ,উষ্ণ,মধুর,গুরু,শারীরিক বলপ্রদানে সহায়ক। কুলত্থ কলাই এর খাদ্যগত গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন,এটি কাস, হিক্কা, শ্বাসকষ্ট জনিত রোগে বিশেষ উপকারী, অর্শ রোগ উপশমে বিশেষ সহায়ক। এতদ্ব্যতীত ছোলা, মসূর,খন্ডিকা ও বর্ত্তুল কলাই সম্পর্কে বলা হয়েছে এগুলি প্রকৃতিগতভাবে লঘু, শীতল,মধুর,ঈষৎ কষায়,রুক্ষ,পিত্ত ও শ্লেষ্মায় উপকারী। খন্ডিকা অর্থাৎ মটর এবং হরেণু প্রভৃতি ডাল প্রকৃতিগতভাবে লঘু, শীতল, মধুর, কষায়, রুক্ষ প্রকৃতির এবং বায়ু কারক। এগুলির ভেষজ গুণাগুণ সম্পর্কে উল্লেখ প্রসঙ্গে আচার্য চরক বলেছেন এগুলি পিত্ত ও শ্লেষ্মা রোগনিরাময়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থে মসূর ডাল আমিষ রূপে উল্লিখিত হয়েছে। আঢ়কী অর্থাৎ অড়হর ডালের ভেষজ গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,এটি কফ ও পিত্তনাশক এবং বায়ুবর্দ্ধক হিসাবে গ্রহণীয়। কৃষ্ণ তিলকে উৎকৃষ্ট, শ্বেত প্রকৃতির তিলকে মধ্যম বলা হয়েছে। [১১] শূকধান্য ও শমী ধান্য প্রসঙ্গে

বলা হয়েছে এক বছরের অধিক পুরাতন হলে হিতকর নয়, এগুলি পুরাতন হলে রুক্ষ ও নিতান্ত অভিনব হলে গুরু হয়ে থাকে। [১২]

অষ্ট প্রকার পশু-পক্ষীর মাংসাদি ভক্ষণের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে সমস্ত পশু-পক্ষীর মাংসাদি ভক্ষ্য তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করেছেন। গো, গর্দ্দভ, অশ্বতর, উষ্ট্র, অশ্ব, দ্বীপী(চিতাবাঘ), সিংহ, ভল্লুক, বানর, বৃক(কেঁদো), ব্যাঘ্র, তরক্ষু(নেকড়ে) নকুল, পার্ব্বতীয়লোমশ, কুক্কুর, মার্জ্জার, মূষিক, লোপাক(খেঁকশিয়াল) জম্বুক, শ্যেনপক্ষী, কুক্কুর, চাষ(নীলকন্ঠ) বায়স, শশঘ্নী(বাঘ) মধুহা (মহুয়া), ভাস, গৃধ্র(শকুনি) উলুক (পেচক) কুলিঙ্গ, ধূমিকা (ফিঙ্গা) ও কুরর এদের প্রসহ বলে,কারণ এরা ভক্ষ্য দ্রব্যের উপর বলপূর্বক পড়ে [১৩]। গোধা অর্থাৎ গোসাপ, কুচিক অর্থাৎ কুঁচে, কৃষ্ণমৃগ, বিচিত্র কর্ণর্যুক্ত মৃগ, ভেক, নকুল, কদলী অর্থাৎ হরিণবিশেষ ইত্যাদি শ্রেণীর জন্তুকে ভূমিশয় বলে। জলার নিকটে যে সকল জন্তু বাস করে তাদের জাঙ্গল জন্তু নামে অভিহিত করেছেন। এছাড়াও রয়েছে পদ দ্বারা আহার্য্য দ্রব্য সমুদয় বিক্ষেপ করে ভোজন করে যারা, সে সকল বিষ্কির জন্তু এবং যে সমস্ত প্রাণী আহারীয় দ্রব্য সমূহ ঠোঁট দিয়ে খুঁজে ভক্ষণ করে যেমন শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবজীবক, কৈরাত,কোকিল, দাত্যুহ,গোপপুত্র, কুলিঙ্গক, কপোত, শুক,শারিকা ইত্যাদি প্রতুদ জন্তু নামে উল্লিখিত হয়েছে। [১৪] আচার্য চরক উপরিউক্ত পশু-পক্ষীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন প্রসহ, ভূমিশয়, আনূপ, জলজ ও জলচর প্রাণীগণের মাংস সহজপাচ্য নয়, এগুলি প্রকৃতিগতভাবে মধুর, শারীরিক বলবৃদ্ধি সহায়ক, শুক্রবর্দ্ধক, অত্যন্ত বায়ুনাশক, কফ ও পিত্তবৃদ্ধিকারক। পুষ্টিগত মান বিচারে এগুলি শরীরের জন্য উপযোগী। এবং অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম কারী ব্যক্তিদের পক্ষে হিতকর। এছাড়াও মাংসাশী প্রসহ প্রাণীর মাংস জীর্ণ রোগ ও যক্ষ্মা রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। বিষ্কির, প্রতুদ এবং জাঙ্গল পশু গণের মাংস প্রকৃতিগতভাবে লঘু, শীতল, মধুর এবং কষায় রস বিশিষ্ট। ছাগ মাংসের পুষ্টিগত গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন এগুলি অতিশয় শীতল, স্নিগ্ধ বা গুরু প্রকৃতির নয়। এটি ত্রিদোষজনক নয় এবং বলবর্দ্ধক। আবিক অর্থাৎ মেষ মাংস মধুর ও শীতল গুণ যুক্ত, গুরুপাক,শরীরের বল বৃদ্ধিসহায়ক। ময়ূরের মাংস চক্ষু, কর্ণ, মেধা, অগ্নি, আয়ুর পক্ষে হিতকর বলে উল্লিখিত হয়েছে। হংস অর্থাৎ হাঁসের মাংস গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুর, বলপ্রদ,পুরুষের শুক্রবৃদ্ধি সহায়ক ও বায়ুনাশক। চরণায়ুধ অর্থাৎ কুক্কুট মাংস প্রকৃতিগতভাবে স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বৃষ্য, বৃংহণ, স্বরশুদ্ধিকারী, অত্যন্ত বায়ুনাশক ও স্বেদজনক। গোধা অর্থাৎ গোসাপের মাংস বাত,পিত্ত রোগের উপশমে কার্যকারী। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিচারে মধুর, কষায়, কটুরস এবং শারীরিক বলবর্দ্ধনকারী।। গৃহবাসী কপোত বা পায়রার মাংস কষায়, মধুর, শীতল প্রকৃতির এবং পিত্ত নাশে সহায়ক। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মৎস্য ভক্ষণের উপযোগিতা ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেছেন। চরক সংহিতায় উল্লেখ পাই-"গুরূষ্ণমধুরা বল্যা বৃংহণাঃ পবনাপহাঃ। মৎস্যাঃ স্নিগ্ধাশ্চ বৃষ্যাশ্চ বহুদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ"। অর্থাৎ মৎস্য মাত্রেই গুরু, উষ্ণ, মধুর, বল করে, বৃংহণ,

বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, বৃষ্য বা শুক্র বিবর্দ্ধক এবং বহুদোষবিশিষ্ট। [১৫]রোহিত মৎস্য বা রুইজাতীয় সম্পর্কে বলেছেন-"রোহিত দীপনীয়শ্চ লঘুপাকো মহাবলঃ" অর্থাৎ এইরূপ মৎস্য অগ্ন্যুদ্দীপক, লঘুপাকো এবং চড়াই পক্ষীর ডিম ইত্যাদির ভোজনে কাস ও ক্ষত রোগের উপশমে হয়ে থাকে। তাছাড়া ও এটি হৃদরোগে বিশেষ উপকারী। যদিও আচার্য চরক গুণাগুণ বিচারে মাংস ভোজনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে- "শরীরবৃংহণে নান্যৎ খাদ্যং মাংসাদ্বিশিষ্যতে" অর্থাৎ শরীর পোষকের মধ্যে মাংসাপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ নয়। [১৬] ধার্ত্তরাষ্ট্র অর্থাৎ গেড়িহাঁস, দক্ষ অর্থাৎ কুক্কুট, ময়ুর এবং চড়াই পক্ষীর ডিম্ব ক্ষীণ শুক্র বিশিষ্ট পুরুষের পক্ষে হিতকর, এছাড়াও এগুলি কাস, হৃদরোগ ও ক্ষত রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

আচার্য চরক খাদ্যগত গুণাগুণ এর বিচারে বিভিন্ন পত্রশাক, মূলশাক এবং ফলশাক সম্বন্ধীয় আলোচনা করেছেন।আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আহার্য শাকসব্জি গুলিকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে ১.পালং, নটে, পুঁই, বাঁধাকপি ইত্যাদি পত্রশাক ২.ফুলকপি, মোচা, বকফুল ইত্যাদি পুষ্পশাক ৩.লাউ, কুমড়ো, বেগুণী, ঢ্যাড়স, পেঁপে হচ্ছে ফলশাক ৪.ওলকচু, লাউ কুমড়ো, শালুক ফুলের ডাটা গুলি নাল শাক ৫.আলু, ওল, কচু, কন্দ শাক ৬.পাতালকেড়ি, ভুই ছাতা হচ্ছে সংস্বেদজ শাক। এগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলি গুরুপাক অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে সব থেকে লঘু হচ্ছে পত্র জাতীয় শাক।আচার্য চরক শাক ভোজনের আহার প্রণালী সম্পর্কে বলেছেন-"স্বিন্নং নিষ্পীড়িতরসং স্নেহাঢ্যং তৎ প্রশস্যতে"।[১৭] অর্থাৎ শাক সিদ্ধ করে পরে জল ফেলে দিয়ে ও ঘৃত তৈলাক্ত সংমিশ্রণে ভোজন করা উচিৎ। চোদ্দো শাকবর্গের অন্তর্গত পাঠা অর্থাৎ আকনাদি শাক, তুধা শাক, শঠী, বাস্তুক অর্থাৎ বেথো শাক এবং সুনিষণ্নক বা শুষনী শাক এই সকল শাক গ্রহণ অর্থাৎ মলবদ্ধকারক এবং ত্রিদোষনাশক রূপে উল্লিখিত হয়েছে। বেথো শাক মল নিঃসারক। কাকমাচী অর্থাৎ গুড় কামাই শাক বায়ু, পিত্ত কফদোষনাশক হিসাবে পরিচিত। বৃষ্য ও রসায়ন অর্থাৎ জরা ও ব্যাধি উপশমে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতিগতভাবে এটি অত্যন্ত শীতল বা অত্যধিক উষ্ণ বীর্য নয়। এটি কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে বিশেষ উপকারী। রাজক্ষবক অর্থাৎ সর্ষপ শাক সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি ত্রিদোষনাশক, লঘু, ধারক এবং গ্রহণী। অর্শ রোগ নিরাময়ে এই শাক বিশেষ হিতকর। কালশাক কটু, অগ্নি উদ্দীপনকারক। করাল শাক লঘু, উষ্ণ, বায়ু সৃষ্টিকারী এবং রুক্ষ গুণসমন্বিত। অম্ল চাঙ্গেরী অর্থাৎ আমরুল শাক অগ্ন্যুদ্দীপক, উষ্ণ বীর্য্য, মলরোধক, কফ ও বায়ু রোগ নিরাময়ে বিশেষ উপকারী। এই শাক ভক্ষণে অর্শ রোগে বিশেষ উপকারিতা লাভ করা যায়। পুঁই শাকের আয়ুর্বেদিক নাম উপোদিকা। প্রাচীন গ্রন্থ তিন জাতীয় পুঁই শাকের উল্লেখ পাই-উপোদিকা, বনজ বা ক্ষুদ্র উপোদিকা এবং মূল পোতী। [১৮] পুঁই শাকের গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গে আচার্য চরক বলেছেন, এই শাক মধুর রসবিশিষ্ট, মধুর বিপাক, ভেদক এবং শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক। এছাড়াও এটি

শীতল প্রকৃতির এবং শুক্র বিবর্ধক হিসাবে পরিচিত। তণ্ডুলীয়ক অর্থাৎ চাঁপানটে শাক রুক্ষ প্রকৃতির, রক্ত-পিত্ত রোগে বিশেষ উপকারী। এটি মধুর রসযুক্ত, বিপাকে মধুর এবং শীতল প্রকৃতির। মণ্ডুকপর্ণী অর্থাৎ থুলকুড়ী শাক, বেত্রাগ্র অর্থাৎ কথ্য ভাষায় বেতের ডগা, কুচেলা, বনতিক্তক অর্থাৎ শ্বেতবুহ্না, কর্কোটক অর্থাৎ কাঁকুড় শাক,হুলহুলিয়া, কুলক, কার্কশ, নিম্বপত্র এবং পর্পটক অর্থাৎ ক্ষেতপাপড়া ইত্যাদি শাকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন এগুলি তিক্ত, শীতল প্রকৃতির, বিপাকে কটুরসবিশিষ্ট, কফ ও পিত্ত নাশে বিশেষ উপকারী। সুশ্রুত সংহিতার বলা হয়েছে যেসব দ্রব্য বিপাকে কটু সেগুলি অবশ্যই আগ্নেয় দ্রব্য। আচার্য চরক মুগ, ছোলা, মটর প্রভৃতি শাক কে সূপ্য শাক বলে উল্লেখ করেছেন। [১৯]। সকল প্রকার সূপ্য শাক, ফঞ্জী অর্থাৎ বামনহাটী শাক, চিল্লীক অর্থাৎ গৌড় বাস্তক, তুম্বুক এবং সর্ববিধ আলু ও আলু শাক, কাঞ্চন, শোণ, শাল্মলী ও সূর্যভক্তিকাপুষ্প, সীম, রক্তকাঞ্চন, শালি, ইন্দুরকানি, জীবশাক, নোড়া, পালংশাক, কলম্বী শাক, রাই শাক, কুসুম শাক, ভূমিশিরীষ, রাই শাক, কুসুম শাক, লুনুই শাক, যব শাক, কুষ্মাণ্ড শাক, সোমরাজী শাক, যাতুক, শালপর্ণী, শালিঞ্চি শাক, হংসপদিকা ও মোরগ শাক ইত্যাদি সমুদায় শাক গুরু, রুক্ষ, বিষ্টম্ভকারক, মধুর, শীতবীর্য্য এবং মলভেদক। পিত্ত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ হওয়ায় চরকাচার্য্য বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশত্থ, পাকুড় এবং পদ্ম ইত্যাদির পল্লব ভক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। [২০] বৎসাদনী অর্থাৎ গুলঞ্চ শাক বায়ুনাশক, গণ্ডীর বা শমঠ শাক এবং চিত্রক শাককে কফনাশক বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রেয়সী, বিল্লপর্ণী এবং বিল্বপত্র অর্থাৎ বেল গাছের পাতা কে ও আহারাদিরূপে ভক্ষণের কথা বলেছেন। বিল্বপত্রের ন্যায় ভাণ্ডী, শতাবরী, বেড়েলা, জীবণ্ডী, পর্ব্বণী ও পর্ব্বপুষ্পী এগুলি বায়ু ও পিত্তনাশে বিশেষ উপযোগী। শাকাদি ও বৃষপত্রাদির বিভিন্ন ভেষজ গুণাগুণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য্য চরক বিভিন্ন সব্জী যেমন শশা, কাঁকুড়, লাউ, কুষ্মাণ্ড ইত্যাদি র উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। শশা অত্যন্ত উপকারী, প্রকৃতিগতভাবে এটি রুক্ষ ও মূত্রকারক হিসাবে পরিচিত। পক্ক এর্ব্বারু অর্থাৎ পাকা কাঁকুড়, দাহ, তৃষ্ণা ও বেদনানাশক। লাবুনি অর্থাৎ লাউ ভেদন, রুক্ষ, শীতল এবং গুরু। পক্ক কুষ্মাণ্ড অর্থাৎ পাকা কুমড়োকে সর্বদোষ-বিনাশক বলে উল্লেখ করেছেন। এটি ক্ষারবিশিষ্ট, মধুরান্ন, লঘু প্রকৃতির এবং মল-মূত্র বিরেচক। কুমুদ ও উৎপলের নাল, পুষ্প, ফল ইত্যাদির নানা বিধ ভেষজ গুণাগুণ থাকায় চরক সংহিতায় এগুলি ভক্ষণের উল্লেখ পাই। এগুলি প্রকৃতিগতভাবে স্বাদু, কষায়, শীতল এবং কফ এবং বায়ু প্রকোপক, মধুর রসবিশিষ্ট এবং বিপাকে মধুর। বিদারী কন্দ অর্থাৎ ভূমিকুষ্মাণ্ড শুক্রবৃদ্ধি সহায়ক , রসায়নে প্রশস্ত ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। কণ্ঠ সম্বন্ধীয় নানাবিধ সমস্যায় বিশেষ উপকারী। অম্লীকাকন্দ অর্শ ও গ্রহণী রোগে বিশেষ হিতকর। লঘুপাক, অধিক উষ্ণ নয়, শরীরে কফ ও বায়ুর আধিক্য কমাতে বিশেষ সহায়তা করে। এছাড়াও মল-মূত্র রোধক হিসাবে আচার্য্য চরক এটির উল্লেখ করেছেন। সর্পচ্ছত্রক অর্থাৎ পাতাল কোঁড়ক ব্যতীত অপর যে সকল

কোঁড়ক আছে সেগুলি শীতল, পীনস রোগকারক, মধুর ও গুরু ইত্যাদিরূপে উল্লিখিত হয়েছে। শাকবর্গের মধ্যে দুই একটি পুষ্প ও আছে যথা- বাসক পুষ্প, শাল্মলী পুষ্প, আমরুল সম্পর্কে বলা হয়েছে-অগ্নিদ্দীপন, উষ্ণ বীর্য্য, এটি গ্রহণী ও অর্শরোগে হিতকর। পুঁই শাক রসে ও পাকে মধুর, ভেদন, শ্লেষ্মা বর্দ্ধন, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, শীতল ও মত্ততানাশক। মণ্ডূকপর্ণী অর্থাৎ থানকুনি, বেতের ডগা, বেতের কচি পাতা বা কুচেলা, কর্কোটক বা কাঁকরোল ফল ও বীজ, পটোল ফল, বাসকপুষ্প ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে কফপিত্তনাশক, তিক্ত, শীতল, পাকে কটু।বৎসাদনী বা গোলঞ্চ শাক বায়ু নাশ করে। সর্পচ্ছত্রক অর্থাৎ সাপের ছাতা ব্যতীত সকল ছত্রজাতি শীতল, পীনসকারক, মধুর ও গুরু প্রকৃতির বলা হয়ে চরক সংহিতায় আচার্য্য চরক ফলবর্গের অন্তর্গত বিভিন্ন ফলের আলোচনা প্রসঙ্গে মৃদ্বীকা অর্থাৎ কিসমিসের নানাবিধ ভেষজ গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেছেন, এটি তৃষ্ণারোধক, দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্ত-পিত্ত-কাস ক্ষতরোগ, যক্ষ্মা,বাত পিত্ত, উদাবর্ত্ত, মুখ-তিক্ততা, মুখ-শুষ্কতা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার সমাধানে বিশেষ উপকারী। প্রকৃতিগতভাবে এটি মধুর, স্নিগ্ধ এবং শীতল প্রকৃতির। [২২]। খেজুর ভক্ষণ ক্ষয়রোগে বিশেষ হিতকর। এটি মধুর, বৃংহণ, শুক্রবৃদ্ধিকারক, গুরুপাক এবং শীতল প্রকৃতির। ফল্গু অর্থাৎ কাক ডুমুর তর্পক,বৃংহণ, গুরু, বিষ্টম্ভজনক এবং শীতল। পরুষক ফল অর্থাৎ ফলসা এবং মধুর অর্থাৎ মৌয়া ফল বাতপিত্ত রোগ নিরাময়ে উপকারী। আম্রাত অর্থাৎ আমড়া মধুর, বৃংহণ, শারীরিক বল বৃদ্ধি সহায়ক। বিল্ব অর্থাৎ বেল সম্পর্কে অথর্ববেদিক উপবর্হণ সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪৩ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে-“মা ত্বানি বর্দ্ধনীয়াত্ মালূরঃ ধূমগন্ধিঃ যঃ। ইষ্টং বীতমভিগগূর্ত্তং বষটকারং বিগাহতু। [২৩]।বৈদিক শব্দাভিধানকার আচার্য যাস্ক অপক্ক ও পক্ক বিম্বফলের দোষগুণের বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন- “বেলের নাম মহিমা। বিল্ব বললেই তার আকৃতি প্রকৃতির বিচার হয়ে যায়। এই বিল্ অর্থ ছিদ্র, তার উত্তরে বন্ প্রত্যয় করে বিল্ব, চলতি কথায় আমরা একে বেল বলে থাকি। পাকা বেল দীর্ঘদিন খেলে অন্ত্রে সূক্ষ্ম ছিদ্র পথ তৈরি হতে পারে। কিন্তু কাঁচা বেল গুণকারী। এবং পাঁকা বেলের বিপরীত ক্রিয়া করে অর্থাৎ ছিদ্র গুলি বন্ধ করতে সাহায্য করে। আচার্য চরক বিল্ব সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন-“দুর্জরং বিল্বসিদ্ধন্তু দোষলং পূতি মারুতম্। স্নিগ্ধোষ্ণতীক্ষ্ণতদ্বালং দীপনং কফবাতজিত্ ।[২৪] অর্থাৎ পাকা বেল হজম হয় খুব কষ্টে এবং বহু দোষের আকর যার জন্য এটি উদরে দুর্গন্ধ বায়ুর সৃষ্টি করে, এটি ত্রিদোষ উৎপাদক। । কিন্তু কাঁচা বেল স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য অথচ তীক্ষ্ণ এবং অগ্নির উদ্দীপক, তার ফলে সে কফ ও বায়ুকে জয় করে। সব ফল পাঁকাতেই তার গুণোৎকর্ষ হয়। কিন্ত বেলের ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। বিল্ব সম্পর্কে প্রাচীন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এই বৃক্ষটির সমগ্র অংশেরই ভৈষজ্যগুণ প্রচুর। ফল্গু অর্থাৎ কাকডুমুর তর্পক্, বৃংহণ, গুরু, বিষ্টম্ভজনক এবং শীতল। পরুষক ফল অর্থাৎ ফলসা এবং মধুক অর্থাৎ মৌয়া ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি বাতপিত্ত রোগ নিরাময়ে

উপকারী। আম্রাত অর্থাৎ আমড়া মধুর, বৃংহণ, বলকারক, তর্পক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ শ্লেষ্মাকারক, শীতল, বৃষ্য ও বিষ্টম্ভকারক। পাঁকা তাল এবং নারিকেল সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি প্রকৃতিগতভাবে মধুর, অম্ল,কষায়, বিষ্টম্ভকারক, গুরুপাক, শীতল, পিত্ত-শ্লেষ্মানাশক। পক্ক আরুক একপ্রকার ওষধি বিশেষ এবং হিমালয় পর্বতে প্রসিদ্ধ এইরূপ উল্লেখ চরক সংহিতায় পরিলক্ষিত হয়। এই ফল অত্যধিক উষ্ণ নয়, গুরু, স্বাদুপ্রায়, মুখরোচক, রক্তবর্দ্ধক এবং বায়ু-পিত্ত-কফের অত্যধিক বৃদ্ধিকারক নয়। পারাবত ফল অর্থাৎ পেয়ারা দ্বিবিধ।শীত গুণ বিশিষ্ট পেয়ারা মধুর এবং উষ্ণগুণবিশিষ্ট পেয়ারা অম্ল। দ্বিবিধ প্রকারই অরুচি নাশক ও অত্যগ্নিনাশক।কাশ্মীর দেশজাত টঙ্ক ফল এর উল্লেখ চরক সংহিতায় পাওয়া যায়। [২৫] এটি প্রকৃতি গতভাবে কষায়, মধুর,বায়ুজনক, গুরু এবং শীতল প্রকৃতির। আম্র ফল বা আম অত্যন্ত সুস্বাদু এবং জনপ্রিয় একটি ফল, অথর্ব বেদ সংহিতায় এটিকে 'মাকন্দ'নামে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬]মাকন্দ এই বৈদিক নামটির অর্থ সার্থক বলা যেতে পারে কারণ অন্যান্য শিকড়ে চারিদিক থেকে বিস্তৃত হলেও অবশেষে গাছের প্রধান শিকড়টি পচে যায় এবং গুঁড়ির নিম্নাংশকে ধারণ করায় পরিমিত কন্দ তাই মাকন্দ এটির 'সহকার' নামে উল্লেখ ও পাওয়া যায়-"সহকারয়তি সঙ্গময়তি স্ত্রী-পুংসৌ,অর্থাত্ বায়ুর দ্বারা সৌরভ ছড়িয়ে যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে মিলিত করে দেয়।ভ্রুণাবস্থা থেকেই এর সৌরভ দূর থেকে পাওয়া যায় যা মাছি বা মৌমাছি কে আকৃষ্ট করে।আমের পুষ্প মধুর রস সম্পন্ন,এই স্বভাব থাকার জন্যই সে সহকার।[২৭]আচার্য চরক বলেছেন-" আম্রং বালং রক্তপিত্তকরং মধ্যং তু পিত্তলম্ পক্কং বর্ণকরং মাংস-শুক্র-বলপ্রদম্"। অর্থাৎ কচি আম রক্তপিত্তকর, একটু পরিণত আম পিত্তকর এবং কচি আম রক্ত পিত্তকর,একটু পরিণত আম পিত্তকর এবং পাঁকা আম বায়ুনাশক, মাংস, শুক্র ও বল দান করে। পাকা জাম কষায়, মধুর, গুরু, বিষ্টম্ভকারক, শীতল, কফপিত্তনাশক,ও অত্যন্ত বায়ু কারক।ইঙ্গুদী ফল তিক্ত, মধুর, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও কফ-বাত নাশক। আমলকীতে লবণরস ভিন্ন আর সকল রসই আছে। এটি স্বেদ, মেদ, কফোৎক্লেশ ও পিত্তরোগ নাশ করে।[২৮] টক আমড়া, দন্ডশঠ বা কামরাঙ্গা এবং করমর্দ্দ বা করমচাফল অম্ল ও পিত্তকারক। অশ্বত্থ, ডুমুর, পাকুড় ও বটের ফল কষায়, মধুর, অম্ল, বাতল ও গুরু। নাগরঙ্গফল অর্থাৎ কমলালেবু মধুর, কিঞ্চিৎ অম্ল ও হৃদ্য। পাকাজাম সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি স্বাদে কষায় প্রকৃতির, মধুর, শীতল ও সংগ্রাহী প্রকৃতির। পনস অর্থাৎ কাঠাঁল, কদলী ফল, পিয়ালফল এইগুলি কাঁচা অবস্থা থেকে পরিপক্ক অবস্থায় বেশি উপকারী বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছে কষায়, স্নিগ্ধ, শীতল ও গুরু প্রকৃতির। পক্ক অবস্থায় বিশেষ সুগন্ধযুক্ত হওয়ায় রুচিজনক হয়ে থাকে। লবনী ফল যাকে প্রচলিত ভাষায় নোনা ফল ও বলা হয়।চরক সংহিতার হরিতবর্গে রন্ধনাদির উপযুক্ত বিভিন্ন কাঁচা দ্রব্যের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে আদা ও শুঁঠ রোচন, দীপন ও বৃষ্য বাত- শ্লেষজনিত রোগে এর রস হিতকর। কচি মূলা ত্রিদোষ নাশক, পাকামূলা রোগে এর রস হিতকর। কচি মূলা

ত্রিদোষ নাশক, পাকামূলা ত্রিদোষকারক, স্নেহ যুক্ত সিদ্ধমূলা বায়ুনাশক। শুষ্ক মূলা বাতশ্লেষ নাশক। তুলসী হিক্কা, কাস, পার্শ্বশূলনাশক। গন্ডীর অর্থাৎ শমঠশাক, তুমুরু, নেপালী ধনে এগুলি উষ্ণ, কটু, রুক্ষ এবং কফ-বাতনাশক। ভূস্তৃণ বা গন্ধতৃণ পুংস্ত্বনাশক, কটু, রুক্ষ, উষ্ণ ও মুখশোধক বলা হয়েছে। খরাশ্বা অর্থাৎ কৃষ্ণজীরা কফ-বাত নাশক। ধনে, অজগন্ধা অর্থাৎ রাধুনী সুগন্ধি, অনতিকটু এবং ত্রিদোষের উৎক্লেশক। গৃঞ্জণক বা শালগ্রাম সংগ্রাহী, তীক্ষ্ণ ও অর্শরোগে উপকারী। রসুন ও পলাণ্ডুর বীজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি শুষ্ক হলে কফ-বাতনাশক হয়। এতদ্ব্যতীত মদ্যবর্গ, জলবর্গ এবং দুগ্ধবর্গের অন্তর্গত বিষয়ে পানীয় দ্রব্যের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। দুগ্ধবর্গে বিভিন্ন প্রাণীজ দুগ্ধের গুণাগুণ ও উপকারিতা আলোচনা করেছেন। জীবনীয়দিগের মধ্যে দুগ্ধকে উৎকৃষ্ট ও রসায়ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [২৯]গোরসবর্গে বিভিন্ন রকম ঘৃতাদির উপকারীতা বর্ণনা করেছেন। মধু, শর্করা জাতীয় দ্রব্যাদির সেবনে নানাপ্রকার হিতাহিতের উল্লেখ করেছেন ইক্ষু বর্গে। চরক সংহিতা অনুসারে মধু চার প্রকার-মাক্ষিক,ভ্রামর,ক্ষৌদ্র অর্থাৎ ক্ষুদ্র মক্ষিকাকৃত ও পৌত্তিক অর্থাৎ বৃহৎ পিঙ্গল বর্ণ পুত্তিকা নামক মক্ষিকার কৃত। সর্বপ্রকার মধুর মধ্যে মাক্ষিক মধুকে শ্রেষ্ঠ এবং ভ্রামর মধু সর্বাপেক্ষা গুরুতর বলে উল্লিখিত হয়েছে। [৩০] মক্ষিকা সকলপ্রকার পুষ্প থেকে মধু সংগ্রহ করে,অনেক সময় বিষপুষ্প ও থাকে।তাই মধুর সাথে বিষের সম্বন্ধ থাকায় মধুকে উষ্ণ করে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে ।[৩১]কৃতান্নবর্গের অন্তর্গত তন্ডুল অর্থাৎ চালের রন্ধনপ্রণালী প্রসঙ্গে বলেছেন তন্ডুল অর্থাৎ চালকে উত্তমরূপে জলে ধৌত করে সিদ্ধ করবে, সিদ্ধ হলে ফেন নিঃসরণ করে উষ্ণাবস্থায় ভোজন করলে এটি লঘু পাক হয়।[৩২] পৃথুক অর্থাৎ চিঁড়ে অতিশয় গুরু।সূপ্য এবং অন্নবিকৃতি অত্যন্ত বায়ু জনক, রুক্ষ ও লবণ ইত্যাদি সংযোগে অল্প মাত্রায় সেবন করার কথা বলেছেন। আহারের সাথে যুক্ত হয়ে স্বাদবর্ধক ও বিভিন্ন উপকারী রন্ধন সহায়ক দ্রব্যাদির বর্ণনা তৈলবর্গে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।বিভিন্ন প্রকার তেলের গুণাগুণ প্রসঙ্গে বলেছেন তিল তেল কষায়ানুরস, স্বাদু, সূক্ষ্ম, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক। এটি শ্লেষ্মাকারক নয়। বলপ্রদান করে, ত্বকের জন্য হিতকর এবং মেধা ও অগ্নিজনক। প্রাচীনকালে দৈত্যপতিগণ এইরূপ বিবিধ প্রকার তেল সেবনের দ্বারা অজর ও অতিশয় বলবান থেকেছেন এবং যুদ্ধে অপরাজেয় থাকার উল্লেখ পাই চরক সংহিতায় [৩৩] সার্ষপ তৈল অর্থাৎ সরষের তেল সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি কটু রস, উষ্ণগুণ শালী,রক্ত-পিত্ত-কফ ইত্যাদির প্রকোপ বিনাশক। পিয়াল ফলের তেল মধুর, গুরু ও শ্লেষ্মা বর্দ্ধনকারী এবং বায়ু-পিত্ত প্রশমনে সহায়ক, হিতকর। পিয়াল ফলের তেল মধুর, গুরু ও শ্লেষ্মা-বর্দ্ধনকারী, এটি বায়ু-পিত্ত সংমিলনে অনতিউষ্ণতাপ্রযুক্ত,বায়ু-পিত্ত প্রশমনে হিতকর। আতসী তৈল সম্পর্কে বলা হয়েছে মধুর, অম্ল, বিপাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু রোগে হিতকর এবং রক্ত-পিত্ত প্রকোপক। চরক সংহিতায় বলা হয়েছে যে সকল ফলজাত তৈল আহারের সঙ্গে

ব্যবহৃত হয়, ফলের গুণানুসারে সেই সমস্ত তেলের গুণ নির্দিষ্ট হয়ে থাকে [৩৪]। মরিচকে অল্প বৃষ্যজনক, লঘুপাক ও রুচিজনক বলা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার লবণাদির গুণাগুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে সৈন্ধব লবণ অগ্নির উদ্দীপক, রোচক, বৃষ্য, চক্ষুর পক্ষে হিতকারী, অবিদাহী, বায়ু-পিত্ত-কফাদিজাত দোষনাশক ও মধুর রস, এটিকে লবণোত্তমম্ অর্থাৎ সকল প্রকার লবণের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলা হয়েছে। [৩৫] সচললবণ সৌগন্ধপ্রযুক্ত, রুচিকর এবং মলমূত্র বদ্ধতানাশক, হৃদ্য ও উদ্ গারশুদ্ধিকারক। বিটলবণ সম্পর্কে বলা হয়েছে তীক্ষ্ণ , উষ্ণ, অগ্ন্যুদ্দীপক, ঊর্ধ্ব ও অধোবায়ুর অনুলোমকারক। কৃষ্ণলবণ গন্ধহীন এবং উদ্ভিদলবণ তিক্ত, কটু, ক্ষারযুক্ত, তীক্ষ্ণ এবং ক্লেদ উৎপাদনকারী। সকল প্রকার ক্ষারের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এগুলি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, রুক্ষ, ক্লেদজনক, পরিপাককারী, বিদারক, দগ্ধকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক,ছেদক এবং অগ্নিতুল্য গুণশালী।

উপসংহার: অন্ন হল প্রাণস্বরূপ। আয়ুর্বেদ অনুসারে সুষম খাদ্য বা সুষম আহার সুস্বাস্থ্য লাভের অন্যতম উপায়। সামবেদ সংহিতায় বলা হয়েছে-ভেষজের সাথে জীবের আয়ুর সম্বন্ধ জানা থাকলে আয়ুর্বেদ জানা যায়। ভেষজ ও আয়ু উভয়েই অবস্থান করে জঠরাগ্নি, অন্নাগ্নি ও ইন্দ্রিয়াগ্নিতে, জঠরাগ্নির ক্রিয়া সম্পন্ন হলে আয়ুর ভিত্তি গঠিত হয়।[৩৬]সামবেদ সংহিতা ২/১০/৭ ও ১৮৪) এই জঠরাগ্নি সর্বক্ষেত্রে সর্বশরীরব্যাপী বিদ্যমান থাকে যাকে বর্তমান যুগে বলা হয় মেটাবলিজম্(Metabolism) । এই অগ্নির পারিভাষিক রূপ হল পিত্ত। [৩৭] এটির আধিক্য বা ন্যূনতা রোগ সৃষ্টির কারক। গুণাগুণ ও প্রকৃতি বিচারে ব্যক্তিভেদে আহার গ্রহণের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন। দোষগুণবিচারে পরিমিত ও উপযুক্ত আহার গ্রহণ কর্তব্য। গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে- "কটুম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ"। এই শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলেছেন- 'অতি'শব্দঃ কণ্ঠাদিষু সর্বত্র যোজ্যঃ অর্থাৎ অতি শব্দটি কটু প্রভৃতি সকল শব্দের সাথে যোজ্য। চরক সংহিতায় বলা হয়েছে-"আত্মানমভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যক্ " অর্থাৎ প্রতিদিন সমাহিতভাবে মাত্রা, কাল বিবেচনা করে হিতকর অন্নপানরূপ সমিধ দ্বারা অন্তরাগ্নিকে আহুতি প্রদানের কথা বলেছেন [৩৮]।আচার্য মনু 'মনুসংহিতা 'গ্রন্থে যে সব খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি কারক সেগুলি যথাসম্ভব বর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন। [৩৯] চরক সংহিতায় 'অন্নপানবিধি' নামক অধ্যায়ে আহারবিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা মানবশরীরে প্রতিটি খাদ্য উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ, শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রভাব রয়েছে তাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। আহারাদির লঘু গুরুত্ব বিচারপূর্বক এবং যেগুলি একত্রে গ্রহণে শরীরে বিপরীত ক্রিয়ার সঞ্চার হতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থেকে প্রতিটি খাদ্যের গুণাগুণ বিচার পূর্বক পরিমিত গ্রহণ করার মাধ্যমে একজন মানুষ প্রকৃতরূপে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৪/৫)
২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৭/৭)
৩. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৪/২০)
৪. ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭ম প্রপাঠক, ২৬ খন্ডের শাঙ্করভাষ্য
৫. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২/৬৪)
৬. স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্তিযোগ, পৃ:৬৩
৭. আয়ুর্বেদের ইতিহাস, পৃ: ৫০-৫৩
৮. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/২)
৯. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৬/২৫)
১০. চরক সংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ৪ নং শ্লোক
১১. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/২৭)
১২. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/২৬৯)
১৩. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/৩৫)
১৪. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/৩৭)
১৫. চরক সংহিতা,সূত্র স্থান (২৭/৬০)
১৬. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/৬৬)
১৭. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/৭৬)
১৮. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/৭৩)
১৯. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/৭৬)
২০. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/৭৯)
২২. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/৯৮)
২৩. চিরঞ্জীব বনৌষধি, পৃ: ১০৬
২৪. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/১০৯)
২৫. চরক সংহিতা,সূত্র স্থান (২৭/১০৮)
২৬. অথর্ববেদ বৈদ্যকল্প (১৫৭/২৯-৩)
২৭. চিরঞ্জীব বনৌষধি, পৃ: ১১৩
২৮. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/১২১)
২৯. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/১৮০)
৩০. চরক সংহিতা,সূত্র স্থান (২৭/২০৭)
৩১. চরক সংহিতা,সূত্র স্থান (২৭/২১০)
৩২. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/৭৯)
৩৩. চরক সংহিতা ,সূত্র স্থান (২৭/২১৭)

৩৪. চরক সংহিতা,সূত্র স্থান (২৭/২৫৩)
৩৫. চরক সংহিতা, সূত্র স্থান (২৭/২৫৮)
৩৬. সামবেদ সংহিতা (২/১০/৭ ও ১৮৪)
৩৭. চিরঞ্জীব বনৌষধি, পৃ: ৬১
৩৮. চরক সংহিতা, বিমান স্থান, প্রথম অধ্যায়, ৩৭ নং শ্লোক
৩৯. মনুসংহিতা,পঞ্চম অধ্যায়, ৫-১১

গ্রন্থপঞ্জী:

বাংলা বই:

১. আচার্য শ্রী ভগবত স্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, "*সামবেদ সংহিতা*", চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ, গোপাল মন্দির লেন, চৌখম্বা, বারাণসী (উত্তর প্রদেশ) ।
২. আয়ুর্বেদাচার্য ভট্টাচার্য শিবকালী, "*চিরঞ্জীব বনৌষধি*", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯।
৩. চট্টোপাধ্যায় প্রভাকর, "*আয়ুর্বেদের ইতিহাস*",তৃতীয় খন্ড, কলিকাতা, ১৩৭০।
৪. বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু, "*মনুসংহিতা* ",সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮,বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬।
৫. বাসুদেবানন্দ স্বামী কর্তৃক অনূদিত "*শ্রীমদ্ভগবদগীতা*"১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩, জুলাই ২০১৮।
৬. শর্ম্মা সতীশচন্দ্র, "*চরক সংহিতা*" কলিকাতা, ১৩১১, ৫ই পৌষ।
৭. সপ্ততীর্থ ভূতনাথ ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম কর্তৃক অনুদিত,"*শ্রীমদ্ভগবদগীতা*",নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯, জানুয়ারি, ২০০৬।
৮. স্বামী বিবেকানন্দ, "*ভক্তিযোগ* ", ব্রহ্মচারী কপিল কর্তৃক প্রকাশিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩১৮।

ইংরেজি বই:

1. "*CHHA'NDOGYA UPANISHAD*", Translated by Ganganath Jha, third volume, , The India Printing Works,Madras, 1923.
2. Dutta K. K, "*The Cultural Heritage Of India* ".The Ramkrishna Mission Institute of Culture, vol-v, Calcutta, 2001.
3. Sharma Priyavrat, "*Charak Samhita* of *Agnivesha*", sutrasthan, Chaukhamba Sanskrit Publications, Varanasi, reprint 2007.

মহিষকুড়ার উপকথা : এক বিচ্ছিন্ন মানুষের ইতিবৃত্ত

উৎপল ডোম
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : অমিয়ভূষণ মজুমদার এর পরিচিতি মূলত উত্তরবঙ্গের কথাকার হিসেবে। তাঁর জন্ম উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার কোচবিহার শহরে। ইনি ডাক বিভাগে কর্মরত ছিলেন। আর এই কর্মের সুবাদে উত্তরবঙ্গের জল জঙ্গল, পাহাড় -পর্বত, নদী – নালা, ভূ- প্রকৃতি এনার পরিচিত জগতের বাইরে ছিল না। কাছে থেকে অনুভব করেছেন বন অরণ্যের সৌন্দর্য আর এই বন অরণ্যের কোলে গড়ে ওঠা গ্রাম, তার মানুষজনকে কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এর মাধ্যমে অনুসন্ধান করেছেন আদিমতার। কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার অঞ্চলের অরণ্যকেন্দ্রিক জনজাতির অভিজ্ঞতার ফসল ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ উপন্যাস। মহিষকুড়া একটি গ্রাম। এই গ্রামের যেমন একটা ইতিহাস আছে তেমনই একটা ইতিহাস আছে এই গ্রামের মানুষের। যেমন আছে – জাফরুল্লাহর, আসফাক এর, আছে কমরুন এর। মহিষকুড়ার অরণ্যেরও ইতিহাস আছে। আর এইসব ইতিহাস কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে অরণ্যচ্ছেদন এর কাহিনি, বাইসন – ভৈষীর বিলুপ্তির পাশাপাশি আদিম সম্প্রদায়ের বিনষ্টের কথা, সমাজ প্রভুদের ক্ষমতায়ন, জমিদার জোতদারদের রাজনীতি, পশু-অরণ্য-মনুষ্য শিকারের কাহিনি।

সূচক শব্দ : রচনার প্রেক্ষাপট – মহিষকুড়ার ইতিহাস- আসফাক এর ইতিহাস – কমরুন এর ইতিহাস – সমাজ প্রভুর প্রভুত্ব – বাস্তব অর্জিত অভিজ্ঞতা

মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসটির রচিয়তা হলেন উত্তরবঙ্গের কথাকার অমিয়ভূষণ মজুমদার। অমিয়ভূষণ মজুমদারের রচনা পরিসরে বারবার প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের নদী নালা, পাহাড়, অরণ্য, অরণ্যচারী মানুষ এবং অরণ্য বাসীদের জীবন কথা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনিক বিভাগ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলো হলো মেদিনীপুর বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিভাগ, জলপাইগুড়ি বিভাগ, বর্ধমান বিভাগ, মালদা বিভাগ। জলপাইগুড়ি বিভাগের মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা, কালিম্পং জেলা, কোচবিহার জেলা, জলপাইগুড়ি জেলা এবং দার্জিলিং জেলা নিয়ে এই বিভাগ গঠিত। বর্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিভাগ, মেদিনীপুর বিভাগ নিয়ে যেমন দক্ষিণবঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা হয়ে থাকে যেমন দক্ষিণবঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, দক্ষিণ বঙ্গের জেলা গুলির প্রান্তিক মানুষের জীবন নিয়ে যেমন সাহিত্য চর্চা করেছেন ভগীরথ মিশ্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, রামকুমার মুখোপাধ্যায় এছাড়া উল্লেখযোগ্য লেখকেরা। তেমনি উত্তরবঙ্গের জনজীবনের কথাকার হয়ে উঠেছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, তিলোত্তমা মজুমদার, সমরেশ মজুমদার প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য লেখকবর্গ। উত্তরবঙ্গের নদী-নালা পাহাড়-অরণ্য এবং এই প্রকৃতি ঘেরা মানুষের জনজীবন নিয়ে বর্ধিত উত্তরবঙ্গের পরিসর। আর এই উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি-পরিবেশ মানুষজন অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, তিলোত্তমা মজুমদার, সমরেশ মজুমদারের উপন্যাসে কাহিনির বর্ধিত পরিসর হয়ে হয়ে উঠেছে। এই উত্তরবঙ্গের কোচবিহার আলিপুরদুয়ার অঞ্চল পটভূমি হয়ে উঠেছে অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস ‘মহিষকুড়ার উপকথা’। মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসটি অমিয়ভূষণ মজুমদারের স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতার ফসল। এই প্রসঙ্গে উনার এক অকপট স্বীকারোক্তি— “নিজের চোখে দেখা মাটি, আকাশ, জল, গাছ আঁকা যত সহজ, অন্যের মুখে অপরিচিত সেসবের কথা শুনে সে আঁকা ততটা ভাল হয় না। সেই জন্য হয়তো পদ্মা থেকে শুরু করে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই ভূভাগ আমি বেশি এঁকেছি।”[১] আবার দুখিয়ার কুঠি উপন্যাসটির পাঠ-প্রতিক্রিয়া তার শিক্ষক ঊষা কুমার দাস মহাশয় অমিয়ভূষণ মজুমদারকে লিখেছেন “ডাকঘরের চাকরিতে শহর থেকে দূরে এখানে ওখানে ঘুরে ওইসব অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত অঞ্চলের প্রবাহমান জীবন শতকে প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছো বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছে তেমনি সাহিত্যিক প্রতিভা দিয়ে গড়ে তুলেছিল একটি অক্ষর কথার মালা।(১৯.০৬.৬৯ তারিখের পত্র)[২]। মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসটির অরণ্যের মাঝে অবস্থিত মহিষকুড়া নামে এক নগণ্য গ্রামকে ও তার চারপাশের পরিবেশকে উপজীব্য করে রচিত। এই অরণ্য কেন্দ্রিক গ্রাম উপন্যাসের যেমন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তেমনি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে সেই গ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকা, রাজনীতি, সর্বোপরি এক গ্রামীণ সভ্যতার আবেষ্টনী। এখানে মানুষগুলো যেমন নাগরিকসহ শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার স্পর্শ থেকে দূরে অবস্থান করেছে তেমনি এই মনুষ্যসমাজে এমন একজন মানুষ আছে যার নাম আসফাক এই মানুষটি তার নিজের সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছুরিত হয় বা বিচ্ছিন্ন হয়ে এই গ্রাম্য পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করছে। ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদার বিচ্ছিন্ন মানুষ আসফাকের কথা বলতে গিয়ে তিনি সেই কথা ব্যক্ত করেছেন যে কিভাবে অরণ্য থেকে অরণ্যচারী মানুষ বিতাড়িত হয়, প্রাচীন সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঘটে, কিভাবে অবলুপ্তি ঘটে মানব জাতির।

মহিষাকুড়া এক নগণ্য গ্রাম। এই গ্রামকে দেখলে মনে হয় সবুজ ঘেরা একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। এত ছোট চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা একে আবিষ্কার করার জন্য ছোট জিপ গাড়ির বহর সাজিয়ে অভিযান করলে মানিয়ে যায়। এই গ্রামে যাওয়ার পথে বনের হিংস্র জন্তুর দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই গ্রামটির আবহাওয়া পিকনিকের জন্য উপযুক্ত। এছাড়া সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে এই গ্রামকে কেন্দ্র করে। কারণ এই গ্রামে আসার পর মনে হয় এরা বনে পথ হারিয়ে যাওয়া এক মানব গোষ্ঠীর বংশধর যারা এই বিচ্ছিন্নতা, যারা এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপটিকে চোখের মণির মতো রক্ষা করে রেখেছে। এই গ্রাম জঙ্গলে ঘেরা। অরণ্যের শালসাড়ির ভেতর দিয়ে সরু সরু পায়ে চলা পথ কিংবা গরুর গাড়ি যাওয়ার মতো পথ এগিয়ে গেছে বনের বুক

চিড়ে, শেষ হয়েছে কোন কালো পিচের রাস্তা মিলিত হয়ে অথবা এই গ্রাম থেকে বেরিয়ে রাস্তা চলে গেছে তুরুককাটা, ভোটমারি, ছোট শালবাড়ি প্রভৃতি জঙ্গলে ঘেরা অন্যান্য গ্রামের দিকে। এইসব গ্রামের নামের মধ্যে ছোট ছোট ইতিহাস লুকিয়ে আছে। যেমন আছে মহিষকুড়া গ্রামের মধ্যে। মহিষকুড়া ছিল একটি নদীর নাম। এই নদী যখন বহত ছিল তখন এই নদীতে বারবার বুনো মোষ আড্ডা দিত। কিছু দূরে যেন নিজ চারণভূমির সীমানার মধ্যে ২৫-৩০টি করে মোষের এক একটি দল, কোন দল নাকি শতাধিক থাকতো। শীত পড়লে নদীর জল শুকাতে থাকলে এই অঞ্চলে এই বুনো মোষগুলো ধরার জন্য আসতো বেদিয়ার মতো মানুষ। জলের ধারে, আধ ডোবা চর ও ঘাস বনে এই বুনো মোষদের আড্ডা আর এই আড্ডায় ঢুকতো বেদিয়ার দল এরা কখনো খোলা আকাশের নিচে কখনো চোরের উপর বসানো ঘরের ছোট ছোট নড়বড়ে চালার তলে তাদের মূল ঘাঁটি বসাতো। এইখান থেকে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে জলে নেমে মোষেদের ভয় দেখিয়ে, দড়িদড়ার ফাঁদে দমিয়ে ধরে ফেলার কৌশল চালাত। মোষ ধরার তোড়জোড় থেকে শুরু করে তাদের কিছুটা পোষ মানিয়ে তারপর বিক্রি করতো। এই নিয়ে এই সময় এসব নিয়েই এই অঞ্চলের তিন-চার মাস বেদিয়ার দল অবস্থান করত। তখন থেকেই এই জায়গার নাম হয়েছে মহিষকুড়া।

আসফাক এর জীবনেও ইতিহাস আছে। তা বছর সাত আগেকার কথা। ক্ষুধা নিবৃত্তির তাড়নাই আসফাকের পথ চলা শুরু হয়। অবশেষে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছায় এখানে উত্তরের আকাশের গায়ে নীল নীল মেঘের মতো পাহাড়, পাশে শালের জঙ্গল, তারপর কৃষকদের ঘরবাড়ি, জমিজমা, জমির হলুদ ফসল, তারপর আবার সবুজ বন, আসফাক চলতি পথে ঘুরে আবার পথ চলতে শুরু করে পরের দিন আবার একটা শশার জমি হয়তো সে খুঁজে পাবে পরের দিনের ক্ষুধানিবৃত্তি করবে। কিন্তু এমন একটা জায়গায় গিয়ে সে হঠাৎ করে থামল যেখানে শসা ক্ষেত্র, ছোলা মটর চাষও নেই সামনে একটা শালবন আর সেই জঙ্গলের মধ্যে নিল আলো জ্বলছে। তার কাছাকাছি সাদা সাদা কি যেন। মনে কৌতূহল নিয়ে সে সামনে দিকে এগিয়ে যায় এগিয়ে অদ্ভুত দৃশ্যের সম্মুখীন হয় বনের অন্ধকার হয়ে আসা গাছগুলোতে গাছের ফাঁক গুলোতে আট-দশটা মোষ চড়ছে্। আর এই মোষ গুলোর পেছনে কয়েকটি তাবু। সেই তাঁবুর মধ্যে পুরুষ মেয়ে শিশু। আগুন জ্বালিয়ে রান্না হচ্ছে। এক জায়গায় এক সঙ্গে কথা বলছে। এদেরকে দেখে আসফাকের মনে হয় যে ওখানে গেলে কিছু খেতে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ নিছক খাদ্যেরই একটা সুগন্ধ পোরাপোরা ময়দার তাল হোক কিংবা আধভোঁটা চালের এর গন্ধ পাচ্ছিল আর এই তাবু গুলোর মধ্যে, এই অরণ্যের মধ্যে সে কমরুনকে আবিষ্কার করেছিল।

পরের দিন আসফাক লুকিয়ে দেখেছিল তাবু খুলে নিয়ে লোক গুলো কোথায় যাওয়ার জোগাড় করছে। একটি করে তাবু ওঠে আর একটি করে তাবুর সরঞ্জাম

একটি মোষের পিঠে চাপিয়ে দু-তিনজন প্রাণির একটা করে দল রওনা হয়। সব পরিবারই রওনা হয়ে গেল আর খানিকটা দূরে একটা মোষ বাঁধা ছিল একটা লম্বা দড়িতে আর একটা তাবুর মধ্যে অন্যান্য তাবুগুলোর মতোই ছেড়া জীর্ণ ছিল আর এই ছেঁড়া জীর্ণ তাবুতে আসফাক আবিষ্কার করেছিল কমরুনকে। যে কমরুনকে বেদিয়া সম্প্রদায়ের দল ত্যাগ করে চলে গেছে। কারণ কামরুনের স্বামী বসন্ত রোগে মারা গেছে। এই দল পরিত্যাক্তা কমরুনকে নিয়ে আসফাকের পথ চলা শুরু হয়। তবে এখানে ক্ষুধা নিবৃত্তির চেতনা একবারেই ছিলনা। হাঁটার পথে বনমোরগ, তিতির, ডাহুক, মেটে আলু, চই, চ্যাং শাঁটি, কুচলা, গজার সংগ্রহ করে ক্ষুধা নিবারণ করে। আর সম্বল বলতে আছে একটি মাদি মোষ।

আসফাক বোকার মতো কমরুনকে বলেছিল, এখানে সারাজীবন থাকলে চলে কিনা? কমরুন বলেছিল দুজনে দল হয় না। একথা শুনে আসফাক অবশ্য বলেছিল, কমরুনের অনেক বাচ্চা হলে দলটা বাড়বে। "তখন কমরুন বলেছিল তা হলেও মোষ কোথায়? এই বুড়ি মোষের আর বাচ্চা হবে না। কী বিক্রি করবে যে কাপড় শাড়ি কিনবে, চাল, নুন, আটা কিনবে? তুমি কি বনের মোষ ধরতে জানো? তাদের দলের কর্তা যেমন মোষের ডাক ডেকে বন চরা অন্যের বাথানের মোষকে বিপথে টেনে নিয়ে ধরে ফেলে, তাই কি আসফাক পারে? না এসব কিছুই সম্ভব নয়। আসফাক কি দু-তিনটে ভাষায় কথা বলতে পারে যে, দলকে শোনপুরের মেলায় নিয়ে যাবে, আসফাক কি পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে দল নিয়ে রাতের অন্ধকারে ভাগতে পারে? আসফাক সেসবের পক্ষে একেবারেই বাচ্চা, কমরুনের চাইতেও ছ-সালের ছোট। আসফাক নিজের অযোগ্যতার এই তালিকা শুনে মলিন মুখে বনের দিকে চেয়ে বসেছিল।"[৩] ক্রমে বর্ষা শুরু হলো। এই বর্ষা বাউদিয়ার কাছে ভয়ের ব্যাপার। তাবু খাটানোর শক্ত মাটি পাওয়া যায় না, পাখিরা পালায়, নদীতে তেমন মাছও ধরা যায় না। বর্ষা শুরু হলেই বন থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে হয়। মোষের নতুন গোবর দেখে এদিকে একদল মোষ গিয়েছে, এই ভেবে এরা যে দিকে রওনা দিয়েছিল, সেটা যে মহিষকুড়ার পথ তা এরা জানত না। এই কমরুন এখন মহিষকুড়ার জোতদার, ব্যাপারী জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি। জাফরুল্লার একমাত্র উত্তরাধিকারীর মা। আর আসফাক জাফরুল্লার ব্যাপারির খামারে – বলদ, মোষ, গরু দেখাশোনা, রাখালদের খবরদারি করা, দড়ি পাকানো, তামাক বানানো, বাজার সওদা করা প্রভৃতি কাজ করে দিন কাটায়।

কমরুন বলেছিল "আ আসফাক, ব্যাপারির এক গাবতান ভৈষী ধরি না পালান কেনে? এ তো বোঝাই যাচ্ছে, সেটা বর্তমানের অনুরোধ ছিল না। তারও চার বছর আগে আসফাক যা করতে পারেনি, সেজন্য অনুযোগ। কমরুন জাফরুল্লার বিবি হওয়ার আগে আসফাক খেত-নিড়ানো শেষ করার পর মোষ চরাত তখন। তখন যদি সে সেই সুযোগে একটা গাবতান ভৈষী নিয়ে পালাতে পারত, তাহলে হয়তো সে আর কমরুন হারানো দলটাকে খুঁজে বার করার জন্য আবার বনের পথে চলে যেতে পারত। নতুবা

সেই গর্ভবতী ভৈষীর সাহায্যে নিজেরাই একটা দল তৈরি করে নিতে পারত।”[৪] আসফাক মাচায় শুয়ে ভাবছিল “কমরুন বলেছিল, তাদের বাউদিয়াদলের কর্তা মোষের মতো ডাকতে পারত। আর তার সেই আঁ-আ-ড় ডাক শুনে অন্য বাথানের মাদি মোষ, বাচ্চামোষ, এমনকী বুনো মোষের বাচ্চাও তাদের দলের কাছে আসত। আর কখনো কখনো তাদের গলায় দড়ি দিয়ে সরে পড়ত তাদের দল।”[৫]

“তা দেখো কমরুন, আসফাক মনে মনে বলল যেন, এখনো জাফরুল্লার বাথানে গর্ভবতী মোষ আছে। সে রকম একটাকে পেলে ধীরে ধীরে একটা মোষের দল গড়ে তোলা যায় বটে। আর তাহলে সেই মোষের দলকে অবলম্বন করে দুটো মানুষ থেকে ক্রমশ এক ঝাঁক বাউদিয়ার এক দলও হয়ে ওঠে। কিন্তু সেকথা তুমি তখন বলোনি। বললে তিন সাল বাদে। তখন, যখন বুড়ি মোষটা মরল আর আমরা মহিষকুড়ার খামারে, আর বৃষ্টি বাদলে বন ভিজে গিয়েছে, আর জাফরুল্লার মধ্যে তুমি তোমার পুরানো দলপতিকে খুঁজে পেয়েছিলে, বোধহয় আমিও ভেবেছিলাম এটাই ঠিক হল।”[৬] আসফাক আবার ভাবল “আসল কথা বাথানে গাবতান মোষ থাকতে পারে কিন্তু বন কোথায় আর ? চাউটিয়া যা বলে, বড়বিবি যা বলে, তা মানাই ভালো। এখন এক ছটাক জমি নাই যা কারো না কারো, একহাত বন নাই যা কারো না কারো। বনে যে হারিয়ে যাবে তার উপায় কী ? এখন বোঝা যাচ্ছে, গাবতান মোষ আর গাবতান কুমরকে নিয়ে বনে গিয়েও কিছু হত না।”[৭] কারণ – একসময় জাফরুল্লার বড় বিবির সঙ্গে আসফাকের বড় কথা হতো। বড়বিবি বলেছিল “তা আসফাক, এই পিথিমিতে যত জমি দেখো, তা সবই কোনো না কোনো জাফরের। এই যে বন দেখো, তাও একজনের। আসফাক বলেছিল, এই এত বড় বন। যে বনের মালিক সে কি এতবড় বনকে আগাগোড়া চোখেই দেখেছে, যে তার হবে? বড়বিবি ফুরসিতে ঠোঁট লাগিয়ে বলেছিল, এই দেশের সীমার মধ্যে যত কিছু দেখো সবই কারো না কারো। বন তো শুনি এক মালিকের। তা তুমি যত দূরে যেখানে যাও, বনে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে, সেই বনও, যাকে তুমি নতুন মনে করো, তাও সেই মালিকের।”[৮]

আসফাক ‘পায়োর’ অর্থাৎ ‘পাওয়ার’ শব্দটা শিখেছিল জঙ্গলে আসা ভোট বাবুদের কাছে। এই ‘পাওয়ার’রের জন্যই এ অঞ্চলের অনেক মোষ আকারে প্রকারে এখন অন্য মোষ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে। এই পাওয়ারের জন্য জমির পর জমি তৈরি হয়ে চলেছে, অন্যদিকে বন ছোট হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে বন, বন্য প্রকৃতি, বন্য প্রাণি, বন্য আদিম প্রজাতি। কমরুনের বাউদিয়া দল যেমন হারিয়ে গেছে, আসফাক যেমন তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। বাইসন বা বুনো মোষের দল যেমন হারিয়ে গেছে। একবার একটা সাহেব চাউটিয়াকে বলেছিল— “তো, বুনো মোষও হতে পারে। মানুষে মানুষে চেহারার পার্থক্য থাকে। যেমন দেখো আসফাককে, ওর গায়ের রং মুখের চেহারা এখানকার অন্য সকলের থেকে আলাদা। জন্মের সময় ধাক্কাধুক্কি লেগে হয়তো

মোষটার কাঁধের হাড় উঁচু হয়ে গিয়ে থাকবে।”[৯] আসফাক শহরে ঔষধ আনতে যাওয়ার সময় বনের মধ্যে শুকানো গোবর দেখে, একটা ঘাস চিবোতে চিবোতে 'আঁ-আঁ-আঁ-ড়' শব্দ করে ওঠে। কান পেতে শুনেছিল প্রতিধ্বনি। সেই মূহুর্তে সে অনুভব করেছিল সে একটা মোষ হয়ে গেছে। একটা বুনো মোষ সে নিজেই, এই ভেবে তার নিঃশ্বাস গরম হয়ে ফোঁসফোঁস করতে লাগে। তাই সে প্রাণ ভরে ডেকে ওঠে 'আঁ-আঁ-ড়'। পাওয়ারের জন্য জাফর এই অঞ্চলের প্রধান হয়। লেল্যান্ডের ট্রাক কিনে আনে। যে ট্রাকে পাওয়ারের ফলে মহিষকুড়ার জঙ্গলের বড় বড় গাছ চলে যাবে বনের বুক চিড়ে শহরের প্রান্তে। আসফাকের হাসি পায় যার নামে সে হাকিমের কাছে নালিশ করেছিল সেই জাফরই হল পঞ্চায়েত প্রধান।

আসফাক বলদগুলোকে খুঁটিতে বাঁধতে বাঁধতে ভাবে “... সব বনই কারো না কারো, যেমন সব জমিই কারো না কারো। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য তুমি বুনা ষাঁড় – মোষ হতে পারো, কিন্তু বন আর বনের নয়, তাও অন্য একজনের।”[১০] আর, মনে পড়ে সেই সাহেবের গল্পটা, কোচবিহার শহরে এক রাজা শেষ বাইসন মোষটাকে গুলি করে মেরেছে। তারপরে এদিকে বুনো মর্দামোষ কেউ দেখেনি, এদিকে মোষ নিশ্চিহ্ন। “শহরের রাজারা, যারা রাজ্য চালায়, তারা পোষ না মানা কোনো মর্দামোষকে নিজের ইচ্ছা মতো বনে চরতে আর কোনো দিনই দেবে না। যদিও হঠাৎ তোমার রক্তের মধ্যে এক বুনা বাইসন আঁ-আঁ-ড় করে ডেকে ওঠে।”[১১]

তথ্যসূত্র :

১. মজুমদার অমিয়ভূষণ, 'নিজের কথা', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ১ম খন্ড; দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ , দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১,পৃষ্ঠা – ১৬

২. মজুমদার অমিয়ভূষণ, 'রচনা প্রসঙ্গ, মহিষকুড়ার উপকথা', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ষষ্ঠ খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৮, পৃষ্ঠা -৫৪৮

৩. মজুমদার অমিয়ভূষণ, 'মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮১ , পৃষ্ঠা- ৭৩

৪. তদেব, পৃষ্ঠা – ৭৭

৫. তদেব , পৃষ্ঠা – ৮৫

৬. তদেব , পৃষ্ঠা – ৮৫-৮৬

৭. তদেব, পৃষ্ঠা – ৮৭

৮. তদেব, পৃষ্ঠা – ৫৬-৫৭

৯. তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৪-৩৫

১০. তদেব, পৃষ্ঠা – ৮৯

১১. তদেব, পৃষ্ঠা – ৯০

সহায়ক গ্রন্থ :

১. মজুমদার অমিয়ভূষণ, 'নিজের কথা', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র **১**ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ; জানুয়ারি ২০১১।

২. মজুমদার অমিয়ভূষণ, 'রচনা প্রসঙ্গ, মহিষকুড়ার উপকথা', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ষষ্ঠ খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৮ ।

৩. মজুমদার অমিয়ভূষণ, 'আমার সম্বন্ধে' , অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র চতুর্থ খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩,প্রথম প্রকাশ : ২০০৭।

৪. মজুমদার কুমার উজ্বল, 'উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, প্রবন্ধ; পটভূমি, আঞ্চলিকতা, ইত্যাদি প্রসঙ্গ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা ২০০৮।

৫. ভট্টাচার্য তপোধীর, 'উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, দীপাবলী ২০১০ ।

৬. ভট্টাচার্য তপোধীর, 'উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, বৈশাখ ১৪১২।

৭. সিকদার অশ্রুকুমার, 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, ২ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, অক্টোবর ১৯৯৩ ।

৮. রায় অলোক 'বাংলা উপন্যাসে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, অক্ষর প্রকাশনী, ২ বিডন রোড়, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০০।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পে দ্বন্দ্বময় দাম্পত্য ও বিচ্ছেদ

টুম্পা নস্কর
গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা কথাসাহিত্যে জনপ্রিয় কথাকার সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তাঁর সচেতন লেখনী আমাদের মনকে ভাবিত করে তোলে। বিশেষত মেয়েদের জীবন যন্ত্রণা তাঁর লেখনীতে যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তা যেন আমাদের নিজেদের জীবন যন্ত্রণা। তাঁর গল্প পড়তে পড়তে আমরা যেন সেই চরিত্রের সঙ্গে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পাই। শিক্ষিত নারীর জীবনের যন্ত্রণা বা সমস্যা তিনি নিখুঁত ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। নারী-পুরুষের টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব, বিচ্ছেদ, তাঁর গল্পে যেমন চিত্রিত হয়েছে, তেমনি চিত্রিত হয়েছে বাঙালি মেয়েদের ঘরে-বাইরে বদলে যাওয়ার ইতিহাস। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে আত্মাভিমান, আর কমে যাচ্ছে সহিষ্ণুতা বা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীতে খুব সামান্য কারণে শুরু হয়ে যায় দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তাদের আর একসঙ্গে থাকা হয়ে ওঠে না। তাই এই দ্বন্দ্বের একমাত্র পরিণাম হয় বিচ্ছেদের। সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসে কেউ নতুন করে জীবন শুরু করে, কেউ আবার নীরবে এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে চলে।

সাংকেতিক শব্দ : সুচিত্রা ভট্টাচার্য : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পে দাম্পত্য জীবন : দাম্পত্য জীবনে দ্বন্দ্ব : বিচ্ছেদ : সন্তানের উপর বিচ্ছেদের প্রভাব : মানসিক যন্ত্রণা।

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। ভারতীয় সমাজ সংসার সর্বদা নারীর দোষ-গুণ বিচার করে। ভারতীয় সমাজে মেয়েদের নানা রকম অধিকার স্বীকৃত থাকলেও আদপে মেয়েদের কোনো অধিকার দেওয়া হয় না। শুধু আইন থাকলেই নারী নির্যাতনের প্রতিরোধ করা যায় না। আইনের প্রয়োগ জরুরি। সেই সঙ্গে নারীদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নও জরুরি। আর লাগবে সামাজিক সচেতনতা।

আর্থসামাজিক সূচকে আমাদের যত অর্জন, তার পেছনে দেশের নারী সমাজের অসামান্য অবদান আছে। কিন্তু দেশের অর্থনীতি তথা সামাজিক উন্নয়ন হলেও নারীদের অবস্থার তেমন উন্নয়ন হয়নি। বিশেষ করে ক্ষমতায়নের প্রশ্নে নারীরা এখনও অনেক পেছনে পড়ে আছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। সব শ্রেণির পেশার নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য রাষ্ট্রকে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর আরো অংশগ্রহণ জরুরি। শিক্ষায় নারীর অগ্রগতি, সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ আরো বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নের দিকটিও দেখতে হবে। এখনও পান থেকে চুন খসলেই নারীকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু

আর কতদিন নারী মুখ বুজে সব সহ্য করবে। আজ নারীর সহ্য করার সীমা লঙ্ঘন হয়ে গেছে। তাই নারী আজ প্রতিবাদী, আপন অধিকার বুঝে নিতে সক্ষম।

নারী মানে এখন আর অর্ধেক আকাশ নয়, নারী মানে সম্পূর্ণ আকাশ। তাই মেয়েরা আজ স্বপ্ন দেখতে শিখে গেছে, স্বপ্ন বুনতেও শিখে গেছে। আজ নারী শিক্ষিত, স্বনির্ভর। বিনা দ্বন্দ্বে সে নিজের একচুল জমি ছেড়ে দিতে নারাজ। আর যখন নারী তার অধিকার, তার সাম্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখনই শুরু হয় তাকে দমানোর – তখন শুরু হয় দ্বন্দ্বের।

দাম্পত্য সুখের চাবিকাঠি হল, একে অপরের সম্মান করা। একে অপরকে বোঝা, একে অপরকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসা। এগুলো থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই বিপদ, তখন দাম্পত্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সেকালের নারীরা শ্বশুর বাড়িতে নিজেদের মানিয়ে নিত, আপস করত। কিন্তু বর্তমান কালের নারীরা মেনে নেয় না, আপস করেও নেয় না। সেকালের মেয়েরা ছিল অন্তঃপুরবাসী, অশিক্ষিতা ও পুরুষের বশীভূতা। আর তাইতো সেকালেও নারী কণ্ঠে পুরুষ তান্ত্রিকতা নিয়ে খেদ শোনা যায়- 'নারী জন্ম কি অধর্ম- সমালোচনার প্রতিবাদ' এ মায়াসুন্দরী নামক এক নারী লেখেন—

> "ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, যে বঙ্গদেশের পুরুষেরা নারীদিগের অপেক্ষা অধিকতর স্বার্থপর। তাহা না হইলে কেন তাঁহারা নারীদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে দেন না।... পুরুষ গৃহে স্বাধীন, বাহিরে অধীন, আমরা বাহিরেও অধীন ঘরেও অধীন।"[১]

এখন দিনকাল বদলেছে, মেয়েরা এখন সুশিক্ষিতা ও স্বাধীকার সম্পূর্ণা। আর তাই বর্তমান কালের নারীরা পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য মেনে নিতে নারাজ।

বর্তমান আধুনিক কালের দম্পতিরা এখন আর একান্নবর্তী পরিবারে থাকতে চায় না। তারা নিজেদের মতো ছোটো পরিবারে আলাদা থাকতে চায়। ফলে তাদের মধ্যে বেড়েছে আত্মাভিমান, আর কমেছে সহিষ্ণুতা। আর এরই পরিণামে দাম্পত্য জীবনে দেখা দিচ্ছে দ্বন্দ্ব, আর দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ হচ্ছে বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ এখন খুব স্বাভাবিক ঘটনা। আজকের দম্পতিরা বিবাহ বন্ধনকে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন বলে মানতে চায় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিচ্ছেদ পরবর্তী জীবনেও এর রেশ থেকে যায়।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর ছোটোগল্পে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বের পাশবিক রূপ এঁকেছেন। বলাবাহুল্য এই দ্বন্দ্বে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সন্তানরা। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটোগল্পের নারী চরিত্ররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষিতা, আধুনিক, স্বনির্ভর, আত্মাভিমানী। বলাবাহুল্য সুচিত্রা ভট্টাচার্য মেয়েদের চেতনার জগতে বিপ্লব এনেছেন। এই চেতনা সম্পন্ন মেয়েরা নিজেদের অধিকার বুঝে নেয়। তারা সহজেই মানিয়ে নিতে চায় না, আপসও করতে চায় না। তা সে তার একান্ত আপন দাম্পত্য সম্পর্কেও। ফলস্বরূপ

দাম্পত্য জীবনে লাগে দ্বন্দ্ব, লাগে অশান্তি। ‘সাত বছর এগারো মাস আট দিন’, ‘ভিন দেশ’, ‘বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায়’, ‘সম্পর্ক’ প্রভৃতি গল্পে দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর মতবিরোধজনিত দ্বন্দ্ব। কেউ কাউকে মানিয়ে নিতে চায় না। তাই তাদের মধ্যে হয়ে যায় বিচ্ছেদ।

‘সাত বছর এগারো মাস আট দিন’ গল্পের সুদেষ্ণা ও চন্দন আজ বিচ্ছেদের মুখোমুখি। দুজনে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছে কীভাবে তাদের বিচ্ছেদের পথ সুগম হবে। কিন্তু কেন এই বিচ্ছেদ? এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। সুদেষ্ণা চোখ বন্ধ করলে এখনও, তার বিয়ের দিনের রঙিন ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চারিদিকে হাসি, কোলাহল, সানাইয়ের বুক তোলপাড় করা সুর। একটা পরিপূর্ণ আলোকময় সন্ধ্যা – যেখানে সুদেষ্ণা রাজেন্দ্রানী হয়ে বসে আছে। সুদেষ্ণার মনে পড়ে গরদের কাপড়ে চন্দনকে কী সৌম্য লাগছিল সেদিন। বিয়ের দিন গাঁটছড়া বাঁধার আগে কেউ যেন বলেছিল— বিয়ে হলো জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন। কিন্তু আজ সুদেষ্ণার মনে হয়—

> “মিথ্যা। সব ভাঁওতা। ভাবের ঘরে চুরি। মনকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা। বন্ধন কোথাওই কোনও দিন তৈরী হয় না। কারুর সঙ্গেই না। যা হয় সবটাই এক ধরনের মায়া মাত্র।”[২]

সত্যই কি মায়া। তাই বুঝি সুদেষ্ণা আজও ভুলতে পারে না পুরনো দিনগুলি। ভুলতে পারে না যেদিন সে সদ্য মা হয়েছিল। সেদিন সুদেষ্ণা চন্দনের মুখে নতুন পিতৃত্বের গৌরবমাখা এক অপূর্ব নির্মল হাসি দেখেছিল। সেদিন চন্দন, সুদেষ্ণাকে বলেছিল—

> “-থ্যাংকস ফর দা সুইট ডটার।”[৩]

বুকের গভীরে জ্যান্ত পুতুলটার শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে তখন কেমন যেন সুদেষ্ণাও লজ্জা পাচ্ছিল। সুদেষ্ণার চোখ ছাপিয়ে যাচ্ছিল থিরথির খুশি। চন্দনের সেই বিনয়ী ভাব, সেই ভালোবাসা কোথায় হারিয়ে গেল। কালের গতিতে, সংসার চক্রে কী তুমুল অশান্তি শুরু হয় সুদেষ্ণা আর চন্দনের মধ্যে, মেয়েকে কে দেখবে এই নিয়ে।

সংসারের দায়-দায়িত্ব সবসময়ই মেয়েদেরকে সামলাতে হবে, এমনি চলে আসছে। এর থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই বিপদ। সুদেষ্ণার জীবনেও ঘনিয়ে আসে এই বিপদ। সুদেষ্ণা চাকুরিরতা নারী, ঘর সংসার দু'ই সামলায়। কিন্তু সেদিন চন্দন সুদেষ্ণাকে কাজে যেতে বারণ করে। সুদেষ্ণা বলে, মেয়ে ঝিমলি তো এখন ভালো আছে, খেলা করছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সর্বদা নারীদেরকে দমিয়ে রাখতে চায়। তাই চন্দন সুদেষ্ণাকে জোর করে কাজে যেতে বারণ করে। কিন্তু সুদেষ্ণা জানায় তার চাকরির কনফার্মেশন হয়নি, তাই তাকে যেতেই হবে। তখন চন্দন বলে—

> “- চুলোয় যাক তোমার চাকরি। মেয়ে ফেলে...”[৪]

শিক্ষিতা নারী আজ মুখ বুজে সব অন্যায় মেনে নেয় না। তাই সুদেষ্ণা চন্দনকে বাড়িতে থাকার কথা বলে। আর তখনই—

"-চমৎকার! তোমার জন্য আমি অফিস কামাই করব?"[৫]

সুদেষ্ণাও ছাড়ার পাত্রী নয়, সুদেষ্ণা বলে—

> "-আমার জন্য কেন? নিজের মেয়ের জন্য করবে। ঝিমলি তোমার মেয়ে নয়? একটা দিন তুমি থাকতে পারো না বাড়িতে? মেয়ের কাছে?" [৬]

সেই প্রাচীনকাল থেকে সংসার-সন্তান সামলানোর দায়িত্ব শুধুই মেয়েদের। এর অন্যথা হলেই বাঁধে দ্বন্দ্ব, বাঁধে বিবাদ। চন্দনরা তো এই পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধি, তারা জোর করে নারীদের সংসারে বাঁধতে চায়। আর আধুনিক, শিক্ষিতা, চাকুরিরতা নারী কিছুতেই এই পিতৃতন্ত্রের বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে চায় না। সুদেষ্ণাও নিজেকে উজাড় করে, এই বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে চায়নি। ফলে সুদেষ্ণা আর চন্দনের মধ্যে তুমুল চিৎকার শুরু হয়। একে অপরকে ভয়ংকরভাবে আক্রমণ করে। দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে, হঠাৎ চন্দন সুদেষ্ণাকে চড় মারে—

> "প্রচণ্ড শব্দে ঠাস করে গালে চড় পড়ল একটা। ছিটকে গেল সুদেষ্ণা।"[৭]

নারীরা তো চিরকালই অত্যাচার সহ্য করে এসেছে। আর পুরুষ তো চিরকালই নারীকে আঘাত করে এসেছে। তাই চন্দন খুব সহজেই সুদেষ্ণাকে চড় মারতে পারল। এ আর নতুন কি। আমরা অবাক হই না। তাইতো স্বাধীনতার পূর্বে, বোয়ালিয়াস্থ কোনো ভদ্রমহিলা 'বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের স্বাধীনতার বিষয়' এই শিরোনামে লেখেন—

> "স্ত্রীলোকদিগের উপর পুরুষদিগের অতীব প্রভুত্ব। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাহাতে কিছুই আপত্তি করিতে পারিবেন না। কী আশ্চর্য!"[৮]

এই আধুনিক যুগে এসেও সমাজ পালটায়নি এতটুকু। কিন্তু সুদেষ্ণার মতো মেয়েরা সমাজ পালটানোর চেষ্টা করে চলেছে। তাই সুদেষ্ণা আর চন্দনের সঙ্গে থাকতে চায়নি। আজ সুদেষ্ণা চন্দনের মুখোমুখি, চিরকালীন বিচ্ছেদের জন্য।

'ভিনদেশ' গল্পের নায়িকা তৃষ্ণা। 'সাত বছর এগারো মাস আট দিন' গল্পের সুদেষ্ণা আর 'ভিনদেশ' গল্পের তৃষ্ণার জীবনকাহিনি প্রায় একই। দুজনকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু দুজনেই ডানা মেলে উড়তে চেয়েছে।

মেয়েদের কোনো নিজস্ব বাড়ি হয় না। বিয়ের আগে বাপের বাড়ি, আর বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি। বাপের বাড়ি ছেড়ে মেয়েরা যখন শ্বশুর বাড়িতে যায়, সব কিছু মানিয়ে আপন করে নেয়। কিন্তু সেই বাড়িতে যখন আর ঠাঁই হয় না, তখন পুনরায় সেই বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়। তৃষ্ণারও তাই, স্বামী পিয়ালের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসতে হয়। তৃষ্ণা শিক্ষিতা স্মার্ট আধুনিক নারী। তৃষ্ণা একজন আর্কিওলজিস্ট। আরকিয়োলজিক্যাল কনফারেন্সের জন্য লন্ডনে এসেছে।

আর সেখান থেকে রোম বেড়াতে এসেছে। একা ভিনদেশে ঘুরতে ঘুরতে তৃষ্ণার মনে পড়ে স্বামী পিয়ালের কথা। পিয়াল একদিন রোমান্টিক মুহূর্তে তৃষ্ণাকে বলেছিল—

"-আমরাই পৃথিবীর সব থেকে সফল সুখী কাপ্‌ল তৃষ্ণা।"[৯]

কিন্তু আজ পিয়াল আর তৃষ্ণার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তারা আর একসাথে থাকে না। পৃথিবীর সবথেকে সফল সুখী কাপ্‌ল কেন আর একসাথে থাকে না। কারণ তৃষ্ণার সফলতা। তৃষ্ণার সফলতায় পিয়াল ঈর্ষান্বিত হয়ে গেছিল, আর তাইতো পিয়াল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেল। তৃষ্ণার পাসপোর্ট পাওয়ার দিন, পিয়াল হিংস্রভাবে ঝগড়া শুরু করে—

"-তুমি তাহলে যাবেই? আমার এত আপত্তি সত্ত্বেও?"[১০]

তৃষ্ণা তখনই বলে—

"-তোমার আপত্তিটা কোথায় খোলসা করে বলোই না।"[১১]

আর তখনই পিয়াল বলে—

"-ঘরসংসার ফেলে সারাদিন তোমার এই উড়ে বেড়ানো আমার পছন্দ নয়।"[১২]

মেয়েদের সব সময় তার স্বামীর পছন্দ-অপছন্দের দায়ভার বহন করে চলতে হয়। পিয়াল চায় না তৃষ্ণা এই সম্মানে অংশীদার হোক। আসলে তৃষ্ণার এত বড়ো সম্মান, পিয়ালের সহ্য হচ্ছিল না। আর শুধুমাত্র পিয়ালের পছন্দ নয় বলে তৃষ্ণাও এত বড়ো সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। তাই অহেতুক আক্রোশে ভেঙে চুরে যাচ্ছিল পিয়ালের মুখ—

"-মেয়ে ফেলে, সংসার ফেলে... আমি তোমার মেয়ে সামলাতে পারবো না।"[১৩]

দশ বছর সংসার করার পর, পিয়ালের মুখে এমন কথা শুনে তৃষ্ণা অবাক হয়ে যায়। তৃষ্ণার পরিচিত চেনা ভালোবাসার মানুষটা ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছিল। তৃষ্ণা বলে—

"-বারে, মেয়ে তোমার নয়? তুমি যেতে না এরকম একটা চান্স পেলে? আমাদের রেখে? একা একা...." [১৪]

সমাজে ছেলেদের ক্ষেত্রে এক নিয়ম আর মেয়েদের ক্ষেত্রে আর এক নিয়ম। যে কাজটা পিয়াল করতে পারে, তৃষ্ণা পারে না। তাই তৃষ্ণার মনে হয়—

"নাহ, পিয়ালকে দোষ দেওয়া যায় না। পিয়ালের মতো বহু মানুষই এরকম মানসিক জড়তায় পঙ্গু হয়ে রয়েছে আজও।"[১৫]

তৃষ্ণার মতো উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন মেয়েরা তো এমন মানসিক পঙ্গুময় জড়তা মেনে নেবে না। নেয় ও না। তাই দাম্পত্য জীবনে তাদের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আর দ্বন্দ্বের কারণে হয় বিচ্ছেদ। তৃষ্ণা আর পিয়ালের মধ্যেও বিচ্ছেদ হয়ে যায়। যেদিন তৃষ্ণা যাদবপুর থেকে মানিকতলায় চলে এল সেদিনও খুব কষ্ট পেয়েছিল, ভেঙে পড়েছিল।

তৃষ্ণার চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছিল বার বার, নিজের অজান্তেই। তবুও তৃষ্ণারা জীবনযুদ্ধে হেরে যায় না। একবুক কষ্ট নিয়েও জীবনে এগিয়ে চলে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পের নারীরা যেমন অন্যায়ের সাথে আপস করে না, তেমনি তারা স্বনির্ভর। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তারা ভেঙে না পড়ে বরং তারা শক্ত হয়ে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা দেখি 'ঘৃণার চেয়ে বড়' গল্পের অরুণা এমনি এক চরিত্র। অরুণার মাতাল স্বামী যৌবনের অহংকারে মত্ত হয়ে একসময় অরুণাকে আর তার ছোট্ট মেয়েকে বাড়ি থেকে বার করে দেয়—

> "মেয়েটা তখন কতটুকুই বা, সাড়ে তিন কি চার সবে। একরত্তি শিশুটা ছাড়া মাথার ওপর ছেঁড়া তেরপলের মতন পাশে শুধু একজনই। মা। দুজনেই সম্বলহীন। সমান নিঃসহায়। সেখান থেকে লড়াই করে এই অবধি পৌঁছোনো তিলে তিলে। ট্রেনি নার্স থেকে সিনিয়ার সিস্টার। যৌবন থেকে যৌবনপ্রাপ্ত।"[১৬]

অরুণার মাতাল স্বামী এখন অরুণার কাছে আসে একটু সাহায্যের জন্য, দুটো টাকার জন্য। অরুণাও করুণা করে টাকা দেয়। অরুণা আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সমাজে তার একটা সন্মান আছে। ঘরে তার কলেজে পড়া মেয়ে আছে, তাই অরুণা চায় না মাতাল লোকটা বারে বারে তার বাড়ি আসুক, পাড়ার লোকেরা দেখে নানা রকম কথা বলুক। কিন্তু রক্তের টান যাবে কোথায়? তাই অরুণার মেয়ে তার বাবাকে ঘরে নিয়ে আসে, খেতে দেয়। আর যখন অরুণার মাতাল স্বামী চলে যাওয়ার সময় অরুণার কাছে টাকা চায়, তখন অরুণা বলে—

> "এক পয়সাও তোমাকে আর দেব না, বুঝেছ।......আমার মুখের রক্ত তোলা পয়সায় তুমি ফুর্তি মেরে যাবে এভাবে? ...আবার নতুন করে সংসার ভাঙতে এসেছ আমার?... শয়তান।-মেয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তুমি মদ খাও, লজ্জা করে না তোমার?...বুড়ো হয়ে চিতায় উঠতে চলেছ... ছি ছি... রাস্তায় বেহেড হয়ে পড়ে থাকো রোজ?... তোমার লজ্জা না থাকতে পারে, আমার আছে। তোমার জন্য কোথাও মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছে...পাড়ায়, হাসপাতালে..." [১৭]

আর যখন অরুণা দেখে মেয়ে তুলি বাবার পক্ষ নিয়ে কথা বলছে, তখন অরুণা আর্তনাদ করে ওঠে। তুলি বলে তার বাবাকে নিজেদের কাছে রেখে ভালো করে তোলার কথা। তুলি অরুণাকে প্রশ্ন করে, কেন অরুণা তার বাবাকে হাসপাতাল থেকে মদের পয়সা দিয়ে বিদায় করে দেয়। কেন তার মা তুলির কাছে সব কিছু গোপন করেছে। তুলি অরুণাকে দোষারোপ করে, সব কিছুর জন্য। অরুণা অবাক হয়ে যায়। নিঃস্ব অরুণা যে মেয়েকে তিল তিল করে বহু কষ্টে মানুষ করেছে, সেই মেয়ে যখন বলে—

> "-বেশ, তা এতই যখন ঘেন্না, মাথায় সিঁদুর দিয়ে রেখেছ কেন ঢং করে? সতী সাজার জন্যে? নাকি সাজগোজের জন্যে? শাঁখা লোহা কেন রেখেছ হাতে? ডিভোর্স করোনি কেন?"[১৮]

তুলির এমন কথায় অরুণার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। অথচ যার জন্য এমন হৃদয় বিদারক কথা শুনতে হল অরুণাকে, সে একেবারেই নির্বিকার। অরুণার মাতাল স্বামীর কোনো হেলদোল নেই। তাই ক্রোধে অরুণা টান মেরে খুলে ফেলে শাঁখা, লোহা- ছুঁড়ে ফেলে দেয় জানালার বাইরে। আঁচল তুলে ঘষে ঘষে মুছে ফেলে মাথার সিঁদুর। হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে অরুণা।

রাতে তুলির ঘুম আসে না মায়ের জন্য। জীবনে কোনোদিন মা'কে ওভাবে কাঁদতে দেখেনি তুলি। তুলির বুকটা হুহু করে ওঠে। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয় তুলির। অন্ধকারে তুলি পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে যায়। গ্রিলের দরজা খোলা দেখে তুলি অবাক হয়ে যায়। তবে কি তার মা চলে গেছে, উদভ্রান্তের মত সিঁড়ি দিয়ে তুলি নীচে নেমে যায়। আবার ফিরে এসে সিঁড়িতে বসে পড়ে। নিমেষে সব শূন্য হয়ে গেল তুলির চারিদিক। তুলি কাঁপতে লাগলো থরথর করে। মায়ের জন্য তুলির দুশ্চিন্তা হয়। তুলি দেখে, কে যেন চলাফেরা করছে গলিতে। আর তখনই তুলি দেখে—

> "নোংরা সরু কাঁচা গলিতে রাত্রির অন্ধকারে বসে নর্দমা ঘাঁটছে মা। দু'হাতে।... ঘেঁটে ঘেঁটে কাদামাখা শাঁখার টুকরো তুলল একটা। লম্বা নর্দমা হাতড়ে ধীরে ধীরে সব ক'টা ভাঙা অংশ তুলে বাঁ হাতের মুঠোয় চেপে রেখেছে প্রাণপণে।"[১৯]

যে স্বামী অরুণাকে কোনোদিন কোনো ভালোবাসা, সম্মান দেয়নি, দিয়েছিল শুধুই যন্ত্রণা। আর সেই স্বামীর মঙ্গলের জন্য অরুণা পাগলের মতো শাঁখা, লোহা খুঁজতে থাকে। আসলে মেয়েদের হৃদয়ে স্বামী নামক সংস্কার গেঁথে থাকে। এই স্বামী নামক সংস্কারের হাত থেকে মেয়েদের রেহাই নেই। শুধুই কি সংস্কার? নাকি ভালোবাসা? নাকি সংস্কার আর ভালোবাসা দুটোই।

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, অশান্তি, দ্বন্দ্বে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তানরা। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায়' এমনই একটি গল্প। রুমি আর ঝুম দুই বোন। বাবা-মা'র দ্বন্দ্বের কারণে তারা মামার বাড়িতে থাকে। রুমি তার দাদুর সঙ্গে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করে। রুমি বলে হিরোশিমা, নাগাসাকিতে কত লক্ষ লক্ষ লোক মরে গিয়েছিল। রুমির দাদু বলেন, হাজার হাজার গুণ শক্তিশালী বোমা এখন রাশিয়া আর আমেরিকার হাতে। এবার যুদ্ধ বাধলে এই গ্লোবটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। হিরোশিমাতে বোমা পড়ার পর কত মানুষ বিকলাঙ্গ হয়েছিল। যুদ্ধের পরও জন্ম হয়েছিল কত বিকলাঙ্গ শিশুর। কী নিষ্ঠুর এই পৃথিবীটা। রুমির নরম মুখ জুড়ে দুঃখ ঝেঁপে এল। হিরোশিমায় বোমা পড়ার কথা বললে, রুমির দাদু বলেন—

> "-এই তো দুনিয়ার নিয়ম রে। দুই শক্তিমানে যুদ্ধ হলে মরে নিরীহ মানুষেরা। শিশুরা বিকলাঙ্গ হয়। এখন রাশিয়া আমেরিকার লড়াই হলে নিরপেক্ষ দেশগুলো সব..."[২০]

রুমির বাবা-মা'য়ের মধ্যেও ক্রমাগত লড়াই চলতে থাকে রাশিয়া আর আমেরিকার মতো। রুমির মনে হয়—

> "বাবা-মার মধ্যে রাশিয়া কে? কেই বা আমেরিকা?" [২১]

রাশিয়া আর আমেরিকা যেমন কেউ কাউকে এক চুলও জমি ছাড়তে চায় না। রুমির মনে হয় রাশিয়া আর আমেরিকার মতো, তার বাবা-মাও একে অপরের প্রতিপক্ষ। আর এই দুজনার লড়াইয়ে রুমির মতো সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে—

> "রাশিয়া বলছে, এভাবে আর চলতে পারে না। তুমি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছ।" [২২]

আর তখনই আমেরিকা বলছে—

> "সহ্যের সীমা আমি ছাড়াইনি। তুমি ছাড়িয়েছ। তোমার সঙ্গে আর কোনওরকম অ্যাডজাস্টমেন্ট আমার সম্ভব নয়।"[২৩]

এরপর রাশিয়ার কণ্ঠস্বর আরো চড়ে যায়—

> "মেয়ে দুটোকে রেখে গিয়ে তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারো।... তোমার মতো একটা নোংরা মেয়েছেলের হাতে আমি আমার মেয়েদের কিছুতেই তুলে দেব না।" [২৪]

আর তখন—

> "তোমার মতো একটা ডিবচের কাছেও আমার মেয়েরা থাকবে না। আমি কালই ওদের নিয়ে যাচ্ছি।"[২৫]

দাম্পত্য দ্বন্দ্বের কাদা ছোঁড়াছুড়িতে তাদের কদর্য রূপ বেরিয়ে পড়ে। আর এই কদর্য রূপ দেখে তাদের সন্তানরা ভীত হয়ে পড়ে। যেমন রুমি আর তার ছোট্ট বোন ঝুম, ভীত হয়ে পড়েছে বাবা-মার কদর্য ঝগড়ার রূপ দেখে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সর্বদা নারীকে দমিয়ে রেখে নিজে জয়ী হতে চায়। নারী যদি পুরুষের থেকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়, তাহলে পুরুষের সম্মানে লাগে। তার হৃদয়ে ঈর্ষার মেঘ জমা হয়। ফলস্বরূপ তার অধীনস্ত নারীর জীবনে নেমে আসে ঈর্ষা আর হিংসা জনিত অন্ধকার। 'সম্পর্ক' গল্পে রজতের ঈর্ষার মেঘ ইন্দ্রাণীর জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছে। কারণ ইন্দ্রাণী, রজতের থেকে ভালো সরকারি চাকরি করে। আর রজত বেসরকারি অফিসে চাকরি করে। ইন্দ্রাণীর চাকরি সূত্রে পাওয়া ফ্ল্যাটে থাকতে রজতের সম্মানে লাগে—

> "রজত কোনোদিনই এই ফ্ল্যাটটাকে নিজের বাড়ি বলে ভাবতে পারেনি। ইন্দ্রাণীর নামে, ইন্দ্রাণীরই চাকরি সূত্রে পাওয়া ফ্ল্যাটে থাকতে রজতের

পৌরুষে লাগত। এই নিয়েও কম অশান্তি কম বাকবিতণ্ডা হয়েছে একসময়ে? রজতের কাছে এই ফ্ল্যাট হোটেল ছাড়া আর কীই বা !" [২৬]

রজত আর ইন্দ্রাণী দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশি সময় হল, আলাদা থাকে। তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে। মেয়ে মুনিয়ার জ্বর হওয়ার জন্য, দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আজ রজত ইন্দ্রাণীর ফ্ল্যাটে এসেছে মেয়ের খোঁজ নিতে। যে মেয়ের জন্য রজত আজ এত উতলা, একদিন এই মেয়েকে কেন্দ্র করে রজত আর ইন্দ্রাণীর মধ্যে তুমুল অশান্তি হয়। আর তার থেকেই হয়তো আজ রজত আর ইন্দ্রাণীর এই বিচ্ছেদ। বহুদিন পর সেই মেয়েকে কেন্দ্র করে রজত আর ইন্দ্রাণী আজ একে অপরের মুখোমুখি। রজতকে দেখে ইন্দ্রাণীর পুরোনো কথা মনে পড়ে যায়। রজতের সঙ্গে কাটানো তাদের দাম্পত্য প্রেম, রঙিন জীবন সবই। আর সেই সঙ্গে ইন্দ্রাণীর মনে পড়ে সেই দিনটার কথা। সেদিন ইন্দ্রাণী অফিসে বার হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। সেদিনও মুনিয়ার গা-টা জ্বর জ্বর করছিল। রজত কিছুতেই ইন্দ্রাণীকে অফিস যেতে দেবে না। ইন্দ্রাণী বলে এটা এপ্রিল মাস, এর মধ্যে তার চোদ্দটা সি এল শেষ। মেয়ের জ্বরের কথা অফিসে বলে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলে ইন্দ্রাণী। কিন্তু রজত রেগে বলে—

"বাহ! এই না হলে মা।"[২৭]

ইন্দ্রানীও প্রত্যুত্তরে বলে—

"-তুমিও তো বাবা। তুমি ছুটি নিয়ে থাকো না একদিন।"[২৮]

আর তখনই রজতের ঈর্ষা প্রকাশ পায়—

"-আমি তোমার মতো সরকারি চাকরি করি না। প্রাইভেট ফার্ম, খেটে পয়সা রোজকার করতে হয়।" [২৯]

ইন্দ্রাণী তখন রজতকে বিয়ের আগের সেই সব দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন রজত বলেছিল তারা দুজনে সব কাজ সমান ভাগে ভাগ করে নেবে। সমস্ত ঝড়ঝাপটা দুজনে একসঙ্গে সামলাবে। আর আজ রজত বলে—

"আমি জ্বোরো মেয়েও সামলাব? অফিস কামাই করে? আর তুমি নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাবে?" [৩০]

আর তখনই ইন্দ্রাণী বলে—

"-বাজে কথা বোলো না। ক'দিন তুমি মেয়ের জন্য অফিস কামাই করেছ? মেয়ের যখন হাম হল কে আর্নড লিভ নিয়ে বাড়িতে বসেছিল? দেড়বছরে আমার কতগুলো ছুটি চলে গেল হিসেব করেছ?"[৩১]

পুরুষ তান্ত্রিকতার প্রতিনিধি রজত বলে—

"-সেটা তোমার ডিউটি।"[৩২]

দীপ্ত নারীবাদী কণ্ঠে ইন্দ্রাণীও বলে ওঠে—

"-ডিউটি শুধুই আমার একার? তোমার নেই?"[৩৩]

এভাবে বাদ-প্রতিবাদ দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে। আর ক্রমশ রজত, ইন্দ্রাণী একে অপরের থেকে দূরে সরতে সরতে একেবারেই আলাদা হয়ে যায়। চিরদিনের জন্য। রজত নতুন করে সংসার পাতে, কিন্তু ইন্দ্রাণী মেয়েকে নিয়ে একা রয়ে যায়। একেবারেই একা।

রোজকার জীবনে এমন দ্বন্দ্ব, অশান্তি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলতে থাকে। ক্রমে তারা মানুষ থেকে পশুর মতো আচরণ করে। একে অপরের প্রতি নোংরা ভাষায় আক্রমণ করে। দ্বন্দ্বের ময়দানে কেউ কাউকে একচুলও জমি ছেড়ে দিতে নারাজ।

তথ্যসূত্র :

১. সুতপা ভট্টাচার্য (সম্পা.), *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য,* ষষ্ঠ মুদ্রণ: ২০১৮, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ৮-৯

২. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, *গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড,* জানুয়ারি ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১২৫

৩. তদেব, পৃ. ১২৮

৪. তদেব

৫. তদেব

৬. তদেব

৭. তদেব, পৃ. ১২৯

৮. সুতপা ভট্টাচার্য (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫

৯. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৫০

১০. তদেব

১১. তদেব

১২. তদেব

১৩. তদেব, পৃ. ১৫০-১৫১

১৪. তদেব, পৃ. ১৫১

১৫. তদেব

১৬. তদেব পৃ. ২১০

১৭. তদেব, পৃ. ২১৪

১৮. তদেব, পৃ. ২১৫

১৯. তদেব, পৃ. ২১৬

২০. তদেব, পৃ. ৪০৩

২১. তদেব

২২. তদেব

২৩. তদেব

২৪. তদেব
২৫. তদেব
২৬. তদেব, পৃ. ৫৮৭
২৭. তদেব, পৃ. ৫৯৪
২৮. তদেব
২৯. তদেব
৩০. তদেব
৩১. তদেব
৩২. তদেব
৩৩. তদেব

আনন জামানের 'জুঁইমালার সইমালা': মৈমনসিংহ-গীতিকার মলুয়ার পুনর্নির্মাণ

ফারজানা আফরীন রূপা
সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ : সাহিত্যে পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ তত্ত্ব প্রয়োগের ইতিহাস সুপ্রাচীন। পুনর্নির্মাণ তত্ত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে সাহিত্যে শিল্পীরা শিল্পের অতীতের সকল ব্যাখ্যাকে ধারণ নিজ অঙ্গে ধারণ করে নতুন দিক আবিষ্কারে এগিয়ে চলেন, যা মূল শিল্পে অনাবিষ্কৃত বা অনুল্লিখিত। মৈমনসিংহ- গীতিকার আশ্রয়ে বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ বাংলা সাহিত্যে একটি অধিক চর্চিত বিষয়। বিশেষ করে নাট্যসাহিত্যে গীতিকাকে ঘিরে বহুল চর্চিত বিষয়ের চর্চা যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি কোন কোন নাট্যকার মূল বিষয়বস্তুকে স্পর্শ করে যুগ কালের পরিপ্রেক্ষিতে গীতিকার আশ্রয়ে এমন পুনর্নির্মাণও করেছেন, যা তার মৌলিক শিল্পগুণেই পাঠকের নিকট সমাদৃত হয়েছে। তেমনি এক রচনা মৈমনসিংহ- গীতিকার মলুয়া পালার আশ্রয়ে রচিত নাট্যকার আনন জামানের নাটক 'জুঁইমালার সইমালা'। নাট্যকার গীতিকার মলুয়ার সমাজের বিরুদ্ধে সর্বংসহা রূপের সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট চরিত্র দেহোপজীবিনী জুঁইমালাকে তুলে ধরেছেন। জীবনের পরিণতি হিসেবে স্বেচ্ছামৃত্যুকে বেছে নেয়া জুঁইমালা, মৃত্যুর আগের নয় দিবসে তার জীবনের প্রতি অন্যায় করা সামাজিক জীবদের সাথে শেষ হিসাব মিটায়। চাচা- চাচির তাকে বিক্রি করে দেয়ার অপরাধে জুঁইমালার কাছ থেকে শাস্তি হিসেবে মিলে নিদারুণ বাক্যবাণে অপমান, বেশ্যা জীবনে তাকে বাধ্য করায় সমাজের চোখে স্বামী নামে পরিচিত গওহরের কাঁধে অস্ত্রের আঘাত করে জুঁইমালা। মিথ্যা ভালোবাসায় তাকে কেনার চেষ্টা করা আক্কাকে কামনা লালসায় ভরা কুকুর বলে আখ্যায়িত করে অপমান করে তাড়ায়। সমাপ্তিতে মলুয়ার মত আত্মহত্যাকে বেছে নিলেও নাট্যকারের জুঁইমালা একুশ শতকের পটভূমিতে দাঁড়ানো সম্পূর্ণই ভিন্ন এক চরিত্র- যে সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখ বুঁজে না থেকে প্রতিবাদী হয়ে নিজ হাতে শাস্তি নিশ্চিত করে। পরিশেষে নিজ জীবনের দুঃখের ভার বইতে অক্ষম জুঁইমালা আত্মহত্যা করে ঠিকই কিন্তু মৃত্যুর আগে সমাজের চোখে দেখা লোভনীয়, ভোগ্য, ব্যবহার যোগ্য নারী মাংসপিণ্ড পরিচয় ছাড়িয়ে নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিয়ে যায়। মৈমনসিংহ- গীতিকার আশ্রয়ে রচিত এই নাটকে সাহিত্যে পুনর্নির্মাণ তত্ত্বের আলোকে নব আবিষ্কৃত দিক অন্বেষণই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

সূচক/ মূল শব্দ: বিনির্মাণ, প্রেম, নারী, বিদ্রোহ, সতীত্ব, সমাজ, প্রতিশোধ

পুনঃ পুনঃ পাঠ ও বিশ্লেষণ পূর্বক, শিল্প মধ্য প্রকৃত গূঢ় রহস্য উন্মোচন ও নব ব্যাখ্যায় তার উপস্থাপন সাহিত্যে বিনির্মাণ তত্ত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। অপরপক্ষে শিল্পের অতীতের সকল ব্যাখ্যাকে ধারণ করে পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ায় শিল্পী এমন নতুন কোন দিক অন্বেষণের চেষ্টায় রত হন, যা পূর্বতর শিল্পে ছিল অনুল্লেখিত বা অনুপস্থিত। বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যে বিনির্মাণ- পুনর্নির্মাণ তত্ত্ব প্রয়োগের ইতিহাস সমবয়সী। গ্রিক নাট্যসাহিত্য থেকে মধ্যযুগের ইউরোপে বাইবেল ও গির্জা কেন্দ্রিক পুনর্বার জাগরিত হওয়া নাটক, এমনকি বাংলা নাট্যসাহিত্যও আবির্ভাব কাল বর্তমান পর্যন্ত নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে সাহিত্যের বিনির্মাণ - পুনর্নির্মাণ রীতির সুচিন্তিত ও মৌলিক প্রয়োগে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকে বিশেষত বর্ণনাত্মক বাঙলা নাট্যচর্চায় আচার্য সেলিম আল দীনের যোগ্য উত্তরসূরি বলে বিশেষ ভাবে পরিগণ্য তরুণ নাট্যকার আনন জামান (১৯৭৮-)। দুই দশকের অধিক কাল ধরে চলমান তাঁর নাট্যচর্চার এক বিশেষ অংশ অলংকৃত করে আছে পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার সুচিন্তিত ও মৌলিক প্রয়োগ। সিক্রেট অব হিস্ট্রি, নিশিমন- বিসর্জন, নীলাখ্যান, জুঁইমালার সইমালা প্রভৃতি তাঁর পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার আধারে লিখিত নাটকগুলোর অন্যতম। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট নিদর্শন মৈমনসিংহ গীতিকার বিখ্যাত পালা ‘মলুয়া’র আশ্রয়ে নাট্যকার আনন জামান রচনা করেন নাটক ‘জুঁইমালার সইমালা’ (২০১৭)।

মৈমনসিংহ গীতিকার ‘মলুয়া’ পালায় গ্রন্থকারের কোন নাম উল্লেখ নেই। বন্দনাংশে চন্দ্রাবতীর নামোল্লেখ থাকলেও গবেষকরা এই পালা চন্দ্রাবতীর রচনা নয় বলে মতামত প্রদান করেছেন বিস্তর। গীতিকার ‘মলুয়া’ পালার কাহিনি আবর্তিত হয়েছে গাঁয়ের মোড়ল হীরাধরের পাঁচ পুত্রের পর জন্ম নেয়া একমাত্র কন্যা মলুয়া ও চান্দ বিনোদের প্রেম- পরিণয় এবং পরবর্তীতে ভাগ্যের ফেরে আত্মঘাতী হতে বাধ্য হওয়া মলুয়াকে কেন্দ্র করে। অভাবের তাড়নায় শিকারে এসে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়া চান্দ বিনোদকে দেখে প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়ে মলুয়া। মলুয়ার অপার্থিব সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাকে নিজের করে পাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে চান্দ বিনোদও। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে মলুয়াকে স্ত্রী রূপে লাভ করে চান্দ বিনোদ। ভাগ্যের ফেরে লম্পট কাজীর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে মলুয়ার উপর। কাজীর কুপ্রস্তাবের জবাবে মলুয়া কাজীর পাঠানো কুটনীকে করে বিস্তর অপমান, বিনিময়ে কাজী পরোয়ানা জারি করে বিনোদের জমি সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। দৈন্যাবস্থায় কোনোক্রমে জীবন ধারণ করে দিনতিপাত করে মলুয়া বিনোদের সাথে। চান্দ বিনোদ ফের শিকারে গিয়ে আর্থিক অবস্থা ফিরিয়ে আনলেও দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়ে না মলুয়ার। এবার কাজী পরোয়ানা জারি করে বিনোদের নামে- মলুয়াকেই নজরানা হিসেবে প্রেরণ করতে হবে দেওয়ানের কাছে। আদেশ্য অমান্য করায় বিনোদের শাস্তি হিসেবে ধার্য হয় জীবন্ত মাটিচাপা অবস্থায় মৃত্যু। মলুয়ার বুদ্ধিতে পাঁচ ভাই এর সাহায্যে মুক্তি পায় চান্দ বিনোদ কিন্তু মলুয়াকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় দেওয়ানের হাউলীতে। মলুয়ার রূপে পাগল দেওয়ান

মেনে নেয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন মলুয়ার শর্ত- তিন মাসের ব্রত চলাকালীন মলুয়াকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকবে সে। শর্তকাল শেষে মলুয়া জানায় আরো দুই মনের খায়েশ- যে কাজী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী তার বিনাশ আর শিকারে যাবার ইচ্ছার কথা। দেওয়ান কাজীর মৃত্যু আদেশ কার্যকর করে শত্রুর বিনাশ ঘটায় একদিকে, অন্যদিকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শিকারে গিয়ে বিনোদ আর পাঁচ ভাইয়ের সহায়তায় নিজেকে মুক্ত করে মলুয়া। ফিরে আসে বিনোদের সাথে বিনোদের বাড়ী কিন্তু দুর্ভাগ্য তবুও পিছু ছাড়ে না মলুয়ার। প্রতিবেশী- আত্মীয় স্বজন প্রশ্ন তোলে মলুয়ার সতীত্ব নিয়ে। বিভ্রান্ত হয় বিনোদ, পাঁচ ভাই মলুয়াকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় বাবার বাড়ী। কিন্তু মলুয়া অনড়- বিনোদের বাড়ির বাইরের দাসী রূপে জীবন ধারণ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিনোদের নতুন বিবাহিত জীবন নিশ্চিত করে। জীবন আবার নতুন পরীক্ষায় ফেলে মলুয়াকে, শিকারে গিয়ে সাপের ছোবলে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফিরে আসে বিনোদ। বিনোদকে নিয়ে নদীতে ভাসে মলুয়া, ওঝার সহায়তায় প্রাণ ফিরিয়ে আনে বিনোদের। পাড়া প্রতিবেশী সতী সতী বলে রব তুললেও আত্মীয় স্বজন মলুয়ার চরিত্রের পূর্বতর কলঙ্কের প্রসঙ্গ তুলে ঘরে উঠতে বাধা দেয়। মলুয়া নিজ জীবনের মায়া ত্যাগ করে বিনোদকে অপবাদ থেকে চিরমুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে চড়ে বসে মন-পবনের ভাঙা নাওয়ে। ছলকে ছলকে ভাঙা নৌকায় পানি ওঠে, প্রবল জলের ঘূর্ণিতে বিলীন হয় মলুয়া আর তার মন পবনের নাও।

মৈমনসিংহ গীতিকার পালার নারী চরিত্রগুলো মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষকদের কৌতূহল অপরিসীম। নারী চরিত্রগুলো পালার প্রাণ হওয়ার পিছনে পূর্ব মৈমনসিংহের জনগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যই মূল বলে গবেষকরা অভিমত ব্যক্ত করেন। ইন্দো- মোঙ্গলয়েড জাতির বিশিষ্ট শাখা থেকে আবির্ভূত এই বোড়ো জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। গবেষক ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর লোক সাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন:

> পূর্ব ময়মনসিংহের সাধারণ জন-সমাজ কয়েকটি প্রবল আর্যেতর জাতি দ্বারা গঠিত এবং এদের মধ্যে অনেকেই কোঁচ। এরা মূলত ইন্দো- মঙ্গোলয়েড জাতিরই এক প্রধান শাখা বোড়ো জাতি থেকে উদ্ভূত এবং এই জাতিরই এক প্রধান শাখা হল পূর্ব ময়মনসিংহের গারো হাজং ও রাজবংশী। বলাবাহুল্য এরা সবাই মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) সমাজভুক্ত এবং এই গারো জাতিরই বাংলা ভাষাভাষী শাখা হাজং নামে পরিচিত।... ...ইচ্ছামতো বর গ্রহণ, বয়সকালে বিবাহ, স্বাধীন প্রেম ইত্যাদি সবই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য।[১]

নারী প্রাধান্যের এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিচায়ক নারীর সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা, প্রেম, স্বেচ্ছায় পছন্দের পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনের আগ্রহ প্রকাশ সুলভ বৈশিষ্ট্য তাই মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলোর অন্যতম পালা মলুয়াতেও দৃষ্ট হয়। কালপ্রবাহে দীর্ঘকাল প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকা মধ্যযুগের বিশিষ্ট্য সাহিত্যিক

নিদর্শন এই পালাগুলোর অমিয় ধারার সান্নিধ্যে আসার সূচনালগ্নেই তাই শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মলুয়া চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন:

> 'মলুয়ার পূর্ব্বরাগ, বাসরঘরে স্বামীর সহিত আলাপ কাজীর ধৃষ্ট প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর- এই সমস্ত কি অপূর্ব্ব! এই অতুলনীয় চিত্র জীর্ণ গৃহে, অনশনে, স্বামীবিরহে, দেওয়ানের হাবলিতে, সর্পদষ্ট স্বামীর পার্শ্বে এবং শেষ দৃশ্যে ডুবন্ত মন-পবনের নৌকায় বিচিত্রভাবে সর্ব্বত্র অনুরাগের অরুণরাগে উজ্জ্বল। অভাব, উৎপীড়ন, চূড়ান্ত দুঃখ, এক দিনের জন্যও তাহাকে ম্লান করে নাই। রাগে উজ্জ্বল, বিরাগে উজ্জ্বল, সহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল এই মহীয়সী প্রেমের মহাসম্রাজ্ঞীর তুলনা কোথায়?...।'[২]

অজ্ঞাত লোককবি-গায়েনের প্রত্যক্ষ জীবন দর্শন, বোধ ও প্রত্যক্ষণের ফসল 'মলুয়া' পালার প্রথমাংশে বর্ণিত হয়েছে বিবাহ পূর্ব অনুরাগ, প্রার্থিতকে লাভ করার তীব্র মনোস্কামনা। বিবাহ পূর্ব প্রথম জীবনে মলুয়া সম্পন্ন গৃহস্থ হালুয়া দাসের ঘরে পঞ্চ পুত্রের পর জন্ম নেয়া অতি আদরের কন্যা। কোন এক সন্ধ্যায় শিকারে এসে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে যাওয়া শ্রান্ত বিনোদকে দেখে নিজের অজান্তেই মন-প্রাণ সমর্পণ করে তাকে। শুরু হয় নাম না জানা প্রেমিক পুরুষকে ঘিরে তার মনে জন্ম নেয়া নানা কল্পনা- যেখানে বিনোদকে ঘিরে অমঙ্গল জনক কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কাই প্রধান। পরবর্তীতে এই আশঙ্কার আড়ালে জন্ম নেয়া প্রেম ভাবনা অনুন্মোচিত না থাকলেও - বিনোদের প্রতি মলুয়ার প্রেমে শুধু প্রেমিক পুরুষকে নিজের করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই যে শুধু ছিল না, ছিল সর্বোপরি মনের মানুষকে সর্বদা ভাল অবস্থায় দেখার কল্যাণ ভাবনাও তা অসতী অপবাদ মেলার পর বিনোদকে নিজ উদ্যোগে বিবাহ দিয়ে সুখী দেখার প্রচেষ্টার মধ্যেও মিলে। প্রেম পর্বে পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রীকে গোপন করে দ্বিতীয় বার আবার পুকুর ঘাটে স্নানের ছলে বিনোদের প্রত্যাশায় আসে মলুয়া। প্রার্থিত বিনোদও প্রথম দেখাতেই পাগল হওয়া মলুয়ার অপেক্ষাতেই ছিল। পরিচয় পর্বেই উভয়ের মনের অবস্থা প্রকাশিত হলে, মলুয়া বিনোদকে বাপের বাড়িতে এক রাত্রি আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানায়। অতিথি রূপে মলুয়ার বাড়িতে একরাত্রি কাল যাপন করে বিনোদ পাগলপ্রায় হয়ে উঠে মলুয়াকে স্ত্রী রূপে লাভের আশায়। বিবাহ প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায় বিনোদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায়। নাছোড়বান্দা বিনোদ প্রত্যাশিতকে পাওয়ার আশায় নিজ ভাগ্য ফেরাতে তৎপর হয় এবং মলুয়ার বাবা নিজে উচ্ছ্বসিত হয়ে কন্যাকে সমর্পণ করেন বিনোদের কাছে।

'মলুয়া' পালার দ্বিতীয়াংশে বিবাহিত জীবনে স্বামীকে পরম আশ্রয়স্থল বিশ্বাসে সমাজের সাথে লড়ে যাওয়া, অভাব উৎপীড়নে নত না হওয়া, তীব্র বুদ্ধিমত্তার জোরে স্বামীকে দু'বার মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনা- নিজের চরিত্রকে অমলিন হতে না দেয়ার মাধ্যমে নত না হওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত এক নারীর বিদ্রোহী রূপ দেখা যায়। দাম্পত্য জীবনের প্রথম ধাপে সুখী হয় চান্দ বিনোদ- মলুয়া। কিন্তু কাজীর চক্রান্তে সব

হারিয়ে যখন অন্ন বস্ত্রের অভাবে শুধুমাত্র জীবন ধারণ করে কোনোক্রমে বেঁচে থাকে চান্দ বিনোদের সাথে, তখনও বিনোদের অনুরোধে বাবার বাড়ীর ঐশ্বর্যময় জীবনকে সাময়িক আশ্রয় স্থল হিসেবে বেছে নেয়নি মলুয়া। উপরন্তু বিনোদ দ্বিতীয়বার শিকারে গেলে দুরাবস্থায় পতিত বোনকে নিতে পঞ্চভাই এলে মলুয়া করুণ কণ্ঠে কিন্তু স্বামী গৃহকে বিবাহিত নারীর পরম আশ্রয়স্থল জ্ঞানে দৃঢ়তার সাথে জানায়:

ভালা ঘরে দিছলা বিয়া ভালা বরের কাছে।
কেমনে খন্ডাইবা দুঃখ কপালে যা আছে।।
শ্বশুরবাড়ীত থাকবাম আমি করিয়াছি মন।
সেইত আমার গয়া-কাশী সেইত বৃন্দাবন।।[৩]

আর্থিক অবস্থা ফিরাবার অভিপ্রায়ে গৃহত্যাগী বিনোদ সম্পদশালী হয়ে ফিরে আসলে কাজী- দেওয়ানের মিলিত ষড়যন্ত্রে বিনোদের জীবিতাবস্থায় মাটিতে পুঁতে মৃত্যুর দন্ড ঘোষিত হয়। মলুয়া আপন বুদ্ধিবলে বিনোদকে রক্ষা করলেও তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় দেওয়ানের হাউলীতে। প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারিনী মলুয়া পুরাণের সীতার মত রাবণ রূপী দেওয়ানের হাত থেকে নিজেকে বাঁচায় ব্রতের কথা বলে। ব্রত শেষ হওয়া মাত্র এক শত্রু দেওয়ান দ্বারা অপর শত্রু কাজীকে বিনাশে অগ্রসর হয়। কাজীর মৃত্যুর পর শিকারে যাবার ইচ্ছার কথা বলে নিজেকে পাঁচ ভাই আর স্বামীর সহযোগিতায় মুক্ত করে ফিরে। বিনোদের সাথে দাম্পত্য জীবনের প্রথম পর্বে গীতিকার এই নারী রাগে- অনুরাগে- বিদ্রোহে- বুদ্ধিদীপ্ততায় উজ্জ্বল পুরাণের সীতাসম অথচ অপরাজয়ী চরিত্র হিসেবেই পাঠকের সামনে আবির্ভূত হয়।

পৌরাণিত সীতা চরিত্রের সাথে মলুয়া চরিত্রের জীবনের মিল পরবর্তী পর্যায়েও পাওয়া যায়। সীতা যেমন রাবণের অশোক কাননে অবরুদ্ধ কাল কাটানোর পর মুখোমুখি হয় প্রজানুরঞ্জক রামের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হওয়া সন্দেহ বাক্যবাণের, তেমনি মলুয়ার জীবনেরও প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হয় দেওয়ানের হাউলী থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেরার পর। প্রতিবেশী- আত্মীয়- স্বজন মলুয়ার দিকে অসতীত্বের আঙুল তুলে বাধা দেয় বিনোদের সাথে গৃহপ্রবেশে। মলুয়ার এত কালের যুদ্ধে সাথী ছিল যে বিনোদ, সমাজের আরোপ করা কলঙ্ক কথায় সেই বিনোদেরও ভাবান্তর হয় । মলুয়াকে পরিত্যাগ করে বিনোদ। এতকাল শত্রুর সাথে প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য যুদ্ধে বাক্যবাণ আর বুদ্ধিমত্তার জোরে জয়ী নারী মলুয়ার এবার আর স্বামী নামের পরম আশ্রয় থাকে না। তাই সবাইকে লুকিয়ে অবলম্বনহীন মলুয়া নিজের সাথেই নিজের অন্তঃবেদন ব্যক্ত করে এরূপে:

কোথা যাই কারে কই মনের বেদন।
স্বামীতে ছাড়িল যদি কি ছাড় জীবন।।[৪]

বিনোদের ত্যাগ করা স্ত্রী মলুয়া জীবনকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আত্মসম্মান বোধ রক্ষার কঠিন পরীক্ষায় অগ্রসর হয়। বরাবর নিজ ভাগ্য নিজ হাতেই লিখতে অভ্যস্ত মলুয়া, সমাজের অবশ্যম্ভাবী অপমানজনক সিদ্ধান্তের আগেই নিজে নিজের উপর কঠিন শাস্তি চাপিয়ে সমাজের মুখ বন্ধ করতে তৎপর হয়। বিনোদের বাড়ীর বাইরের কামিন হয়ে জীবন কাটানোর ঘোষণা দেয় সাথে বিনোদের নতুন বিবাহ নিশ্চিত করে। জীবনের কঠোরতায় নত না হওয়ার মন্ত্রে বিশ্বাসী এই নারী নিজের মনকে এমন এক কঠিন তপস্যায় রত করে, যেখানে বিনোদের নতুন স্ত্রীর আগমন, বিনোদের নব দাম্পত্য জীবন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে সক্ষম হয় না। বরং মলুয়ার নব এ ব্রতের উদ্দেশ্য হয়- স্বামী- শাশুড়ির নিরন্তর সেবা এবং স্বামী পরিত্যাক্তা অসম্মানিতা নিজেকে বাপের বাড়ীর মহলে পরাজিত হিসেবে ফেরত না পাঠানো। কিন্তু জীবন আরো এক নতুন পরীক্ষা নিয়ে হাজির হয় মলুয়ার সামনে। সাপের দংশনে মৃতপ্রায় বিনোদ ঘরে ফিরে এলে বৈধব্য নামক অদৃষ্টের লিখন পাল্টাতে আবার তৎপর হয়ে উঠে মলুয়া। বেহুলার ন্যায় মৃত স্বামীকে ক্রোড়ে নিয়ে ওঝার বাড়ী পৌঁছে বিনোদের জীবন ফিরিয়ে আনে। এ পর্বেও সমাজ ও নিজের সাথে যুদ্ধ শেষে মলুয়া বিজয়ী বেশেই ফিরে।

জীবনের অন্তিম যুদ্ধে মলুয়া স্বেচ্ছায় নিজেকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করে। বেহুলার মত বিনোদকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনা মলুয়াকে ঘিরে পাড়া-প্রতিবেশী যতই সতী রব তুলুক, স্বজনদের অসতীপনার অভিযোগের তীরের ঘা এবার মলুয়ার মর্মমূলে আঘাত করে। এ পর্যায়ে মলুয়ার বোঝা হয়ে যায় বেঁচে থাকতে তার আর মুক্তি নেই। বিনোদের রক্ষা নেই এই অপবাদের হাত থেকে। জমে ওঠা জীবনের দুঃখের ভাগের বোঝা বহনে অপারগ মলুয়া নিজের জন্য স্বেচ্ছামৃত্যুকেই আহ্বান করে, উঠে পড়ে মন- পবনের নৌকায়। প্রাণের দোসর বিনোদ জল নিমগ্ন মলুয়াকে দেখে হাহাকার করে বলে ওঠে:

চান্দসুরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাই চাই।।
তুমি যদি ডুব কন্যা আমার সঙ্গে নেও।
একটিবার মুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও।।
ঘরে তুইল্যা লইবাম তোমায় সমাজে কাজ নাই।
জলে না ডুবিও কন্যা ধর্ম্মের দোহাই।।[৫]

বিনোদের এই উদাত্ত আহবান মলুয়াকে ফেরাতে সক্ষম হয় না। কারণ সর্প দংশনে প্রাণ ফিরিয়ে আনায় মলুয়ার প্রতি প্রেম পুনর্বার জাগরিত হলেও এই বিনোদকে সে প্রকৃত অর্থে সে চিনেছিল স্বজনের কথায় তাকে পরিত্যাগ করার মুহূর্তেই। মলুয়ার অন্তরের এই বেদনা পালাকার গোপন রেখেই মলুয়ার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করান:

আমি নারী থাকতে তোমার কলঙ্ক না যাবে।

জ্ঞাতি বন্ধু জনে তোমায় সদাই ঘাটিবে।।
... ...
কপালে আছিল দুঃখ না যায় খন্ডনে।
কোন দোষের দোষী নয় আমার সোয়ামী।।[৬]

ঝড়ের কবলে পড়ে নিরুদ্দেশ হয় মলুয়া সহ মন পবনের নাও। প্রেম- দাম্পত্য - নিজের সম্মান টিকিয়ে রাখতে সর্ব্বস্ব বাজী ধরা মলুয়া, জীবনের সর্বকূল ব্যাপী নিশ্চিত দুঃখ আর অপমান জেনে, নিজ ইচ্ছা বলে নিজেকে মৃত্যুর কোলে বিলিয়ে দিয়ে সর্বত্যাগী মহান প্রেমের জয়গান গায়। মৈমনসিংহ গীতিকার পালা 'মলুয়া' প্রসঙ্গে গবেষক সাইমন জাকারিয়া বলেন:

> মলুয়ার কাহিনী গড়ে উঠেছে সামন্ততান্ত্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক গোঁড়া সমাজের অভ্যন্তরে। এই সমাজে মলুয়া বিপন্ন হয়েছে বিভিন্ন প্রকারে। কখনও সে বিপন্ন হয়েছে দুশমন কাজী কর্তৃক স্বামী হরণে ও কাজীরই জুগুপ্সার পথে দেওয়ানের হাউলিতে বা গৃহে, কখনও- বা আত্মীয়দের গোঁড়ামিতে। এত কিছুর মধ্যেও বিপন্ন মলুয়া প্রতিনিয়ত প্রজ্বলিত থাকতে চেয়েছে অনির্বাণ এক দৃঢ়তায়। সে দৃঢ়তা হচ্ছে তার প্রতিপ্রেম এবং সতীত্ব। সতীত্বের পরীক্ষায় সে যেন সীতা- বেহুলার অবিচ্ছিন্ন রূপ।[৭]

পুনর্নির্মাণ তত্ত্বের মূল লক্ষ্য শিল্প সংক্রান্ত সকল ব্যাখ্যাকে ধারণ করে নতুন দিক অন্বেষণে রত হওয়া। গীতিকার 'মলুয়া' পালায় মূলত আঁকা হয়েছে মলুয়া চরিত্রের প্রেম, বিবাহ পরবর্তী দাম্পত্যে স্বামীর জীবনকেই নিজের বলে মেনে নেয়ার সাহসী সামর্থ্য, দাম্পত্য প্রেমে কাঁটা হয়ে আসা অনাসৃষ্টিকে নিজ প্রেম বলে বলীয়ান হয়ে উৎপাটনের শক্তি কিন্তু পরিশেষে সমাজের কাছে পরাভূত হয়ে নিজ জীবনকে স্বেচ্ছায় শেষ করে দেওয়ার ঘটনাবহুল কাহিনি। অপরদিকে 'জুঁইমালার সইমালা' নাটকে প্রধান চরিত্র জুঁইমালা। সমান্তরালে প্রবাহিত অপর ছায়া চরিত্র সইমালা- গীতিকার মলুয়া। নাট্যকাহিনিতে ঘটনার ঘনঘটা নেই... শুধু জুঁইমালার জীবনের অতীত বর্তমান উন্মোচিত হয়েছে আত্মকথন- সইমালার সাথে কথোপকথন আর কিছু চরিত্রের সাথে বাক্য বিনিময়ে।

মৈমনসিংহ গীতিকার পালা 'মলুয়া'র আশ্রয়ে রচিত 'জুঁইমালার সইমালা' নাটকে- আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া জুঁইমালার জীবনের শেষ নয় দিনের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। জুঁইমালা পেশায় দেহোপজীবিনী, তার সার্বক্ষণিক সাথী মধ্যযুগ থেকে কালপ্রবাহে চলে আসা মলুয়ার কাসার কলস আর গীতিকার মলুয়ার ছায়ারূপ- যাকে সে সইমালা বলে ডাকে। জুঁইমালা, তার কাছে ছুটে আসা বিচিত্র পেশার পুরুষ, স্ত্রী পরিচয়ে জুঁইমালাকে বেশ্যার জীবন যাপনে বাধ্য করা স্বামী গওহর, জুঁইমালাকে অর্থের

লোভে বিকিয়ে দেয়া রক্তের সম্পর্কের চাচা- চাচির সাথে যাপিত জীবনের হিসাব মিলানোর কথোপকথনে জুঁইমালার অতীত সামনে আসে। অপরদিকে সমান্তরালেই চলে সইমালা মলুয়ার সাথে আত্মহত্যার প্রস্তুতি নেয়া কল্পময় দৃশ্য সৃজন, মলুয়ার আত্মঘাতী হওয়ার কারণ জানতে চাইলে মলুয়া ইতিহাস ঘেঁটে সামনে আনে তখনকার চরিত্রগুলোকে। ক্রোধে অস্থির হয় জুঁইমালা। শেষ দিবসে কথামতো মলুয়া নিরুদ্দেশ হয়। ধলাই নদীর তীরে মিলে মলুয়ার সেই কলসটি, আরেক দুঃখী কন্যা নাইওরী জুঁইমালার মতই কলসটিকে আঁকড়ে ধরে।

নাট্যকার আনন জামানের 'জুঁইমালার সইমালা' নাটকে জুঁইমালা জনম দুঃখী। জন্মের পূর্বেই পিতার মৃত্যুতে যে আগাম দুঃখী জীবনের সংকেত সে বহন করে পৃথিবীতে এসেছিল, তা ত্বরান্বিত করে জন্ম পরবর্তী কালেই মায়ের মৃত্যু। আশ্রয় জুটে দরিদ্র চাচা-চাচির কাছে। নাট্যকার স্বল্প কথায় জুঁইমালার পূর্বজীবনের দুঃখ গাথা আঁকেন: "...বাজী মরছে আমরারে মাওর গর্ভে থুইয়া। মাওর গর্ভে ছোট্ট ভ্রূণটায় তামাম জীবনের দুঃখ কেমন কইরা ছিল। মাও মরছে তোমরার থাবার নিচে থুইয়া।"[৮] জুঁইমালার জন্ম থেকে বয়ে বেড়ানো দুঃখই পরবর্তী জীবনে স্থায়ী রূপ পায়। কিন্তু মধ্যে প্রেমের এক বর্ণাঢ্য সোনালী- রূপালী অধ্যায় আছে জুঁইমালার জীবনে। দারিদ্রের চরম সীমায় দাঁড়িয়ে থাকা একুশ শতকের এক কিশোরী কন্যা জুঁইমালার কল্পময়তা তার বাস্তবতাকে অতিক্রম করেছিল প্রথমবারের মত কোন এক অমাবস্যার রাতে- শীর্ণ বেড়ার ঘরের জানালায় গওহরের আগমনে। গওহর সেই রাতে জুঁইমালার মুঠোয় ভরে দিয়েছিল রক্তচন্দনের দানা ভরা এক রূপার কৌটা। জুঁইমালার জীবনে ভালোবাসার বর্ষণ হয়ে ঝরেছিল সেই রক্তচন্দনের উনিশটি দানা। জীবনে ভালোবাসা আর গওহরের আগমনকে জুঁইমালা ব্যক্ত করে এভাবে:

> জুঁইমালা :...রাতে সিথানের কাছে রাখি চন্দনের রূপার কৌটা। নাইরলের তেলে চন্দনের দানা ভিজাইয়া সাজাই চুল। স্বপ্নে দেহি আসমান থিয়া ঝুপ ঝুপ চন্দন পড়তেছে কী যে তার বরণ- আলতার মত লাল। ঘর উঠান ঘাটলা ভরে যায় লাল চন্দনের দানায়। ভাবি স্বপ্নের ভেতর ভূবনের শূণ্য থিয়া আমরার জন্য পরম পুরুষ নামছে।[৯]

প্রেম আর বিবাহ পর্ব মধ্য সময়ের হ্রস্বতায় প্রেম কল্পনা আকাশ ছোঁয়ার অবকাশ পায় না জুঁইমালার জীবনে। প্রেমপর্ব বিবাহের দিকে অগ্রসর হয় অতিদ্রুততার সাথে কারণ এই বিবাহ নামক বিকিকিনি খেলায় জুঁইমালার চাচা- চাচি গওহরের কাছ থেকে বিনিময় স্বরূপ পেয়েছিল কুড়ি হাজার টাকা আর তিন বিঘা জমি। বিবাহ- বাসর অতিক্রান্ত ভোরে নিজেকে সর্বস্ব খোয়ানো এক নারী রূপে আবিষ্কার করে জুঁইমালা:

> জুঁইমালা :...তারপর বাসরের বিহানে দেহি সম্ভ্রম আর শিথানের সুরভি থুইছি যেই পুরুষের পায়- সে

গওহর না অন্য পুরুষ। বাসরের বাহিরে গওহর খিকখিক করে হাসে আর কয় জগতে নানান বিকিকিনি আছে। আমি রুপ বিকিকিনি করি- রুপ রাখবাইন রুপ।[১০]

রক্তচন্দনের দানার রঙে রাঙা ভালোবাসায় বিভোর হয়ে, নিজের যে জীবন গওহরের হাতে বিবাহ অন্তে সঁপে দিয়েছিলো জুঁইমালা, তার সমাপ্তি ঘটে কিশোরী জীবনের সম্ভ্রম বিবাহ বাসরে অন্য পুরুষের হাতে খোয়ানোর মাধ্যমে। জুঁইমালার জীবন দুঃখের ছোট জলাধার থেকে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয় গওহরের সাথে বিবাহ পর্বের পর। দুর্ভাগ্যের করাল গ্রাস থেকে ফিরতে চেয়েছিল জুঁইমালা। খোলা থাকা একমাত্র পরিচিত রাস্তায় চাচার আশ্রয়ে নিজেকে নিয়ে ফিরলে জুঁইমালা বুঝে যায়, এ রাস্তা একমুখী- ফেরার পথ চিরতরে বন্ধ :

জুঁইমালা :শরীরটা টেনেটুনে যহন নিয়ে আসি আমনের আশ্রয়ে। আমনে জবরদস্তি ফেরত পাঠায়ছুইন-

ভালো হয়ে যাইপে। আমি ব্রত নিলাম মতি ফেরাবো তার- পারি নাই।[১১]

সম্ভ্রম হারানোর ঘটনাকে অঘটন ভেবে জুঁইমালা জীবনকে আঁকড়ে ধরে, বেঁচে থাকায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় নিজের ভালোবাসার শক্তির উপর ভর করে। সরল জুঁইমালা ভাবে তার ভালোবাসায় সে ফিরিয়ে আনবে গওহরকে এই পাপের পথ থেকে। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে খুব বেশী সময় নেয় না। কারণ- গওহরের কাছে জুঁইমালা কিনে নেয়া লাভজনক পণ্য হিসেবে গণ্য - তাই তার অবাস্তব ভালোবাসায় নিজের পথ পরিবর্তন করার মত বোকামির পথে সে অগ্রসর হয়নি। পরিণতিতে সব পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া জুঁইমালা বেঁচে থাকার তাগিদে বেছে নিতে বাধ্য হয় বেশ্যাবৃত্তি । আর সমাজের চোখে স্বামী পরিচয় পাওয়া গওহর শুধুমাত্র একবার জুঁইমালার সম্ভ্রমকে বিক্রি করে থামে না, বার বার ফিরে এসেছে জুঁইমালার কাছে। কখনও নেশার টাকা আদায়ে আবার কখনোও নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ঘুঁটি হিসেবে জুঁইমালার কাছে টাকাওয়ালা খদ্দের এনে নিত্য নিত্যই জুঁইমালার পুরোনো ক্ষতকে আবার রক্তাক্ত করেছে গওহর। প্রতিবাদে জুঁইমালার রুখে দাঁড়ানোর জবাবে শারীরিক নির্যাতনেও পিছ পা হয়নি গওহর।

তারপরও নাট্যকারের জুঁইমালা ভালোবাসার আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে বেঁচে থাকে- বেশ্যাবৃত্তির জীবনও তার ভালোবাসার প্রতি মোহ দূর করতে পারে না। গওহরের প্রতারণা পর কলঙ্কময় জীবন যাপনে বাধ্য হওয়া জুঁইমালাকে দেখা যায় আক্কা ভাই এর দেয়া ইমিটেশনের গয়নাকে স্বর্ণের জেনে, এটাকে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ভেবে আক্কাকে ভালবেসে ফেলতে। প্রথম ভালোবাসার মত কল্পময়তা এই ভালোবাসায় না থাকলেও, খানিক সম্মান যেন জুঁইমালা নিজের প্রতি অর্জন করে আক্কার দেয়া এই

উপহার প্রাপ্তিতে। গিল্টি গয়নার চাকচিক্য খসে গেলে আবার বাস্তবে পা রাখতে বাধ্য হয় জুঁইমালা। কিন্তু আক্কা যখন তাকে ময়নালের লালসার হাত থেকে বাঁচাতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে, আবার সেটাকে ভালোবাসা তুল্য মূল্য দিয়ে বসে ভালোবাসার কাঙ্গাল জুঁইমালা। কিন্তু ভালোবাসায় বারবার প্রতারণার শিকার হওয়া জুঁইমালা অবস্থার ফেরে এবার খানিকটা বাস্তববাদী হয়, রাতের ভালোবাসার মূল্য যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে দিনের আলোয় আক্কার মহলে উপস্থিত হয় । আবার ভ্রম ভাঙ্গে আক্কার আচরণে জুঁইমালার:

> আক্কা :তোমরারে কেমনে কয়াম- আমরার মহলে নানা ধরনের মানুষ আছে। তোমরারে দেখলে...
>
> জুঁইমালা :সেদিন ময়নালের চোখে আমরার জন্য লালচ দেখে অস্থির হইলেন। ভাবলাম বেঁচে থাকলে
>
> আমনের সিনার উপর জীবন থুয়ে দিতাম। ও মেয়ে মানুষ সোন্দর শুধু বিছানায় আর শিথানে।[১২]

জুঁইমালার বেশ্যাবৃত্তির জীবনে সব ধরনের পুরুষ তার নিজের লোভ আর অধিকারের থাবা বসাতে চায়। তাই- অগণিত পুরুষ যখন ইচ্ছা জুঁইমালার ঘরের ঝাঁপ ধাক্কায়। কিন্তু জীবনের অভাব আর তাড়নার বেশ কিছুটা কাল পার করে, বিশেষত মৃত্যুর সিদ্ধান্তে অটল হওয়ার পর সকলের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার পাত্রী জুঁইমালা আর থাকে না। ওসমান, ময়নাল, হোদ্দা, জনৈক ভদ্রলোককে সে ফিরিয়ে দেয় অপমান করে। আবার তরুণের প্রথম পদস্খলনের পথে বাড়ানো পা, সে বাৎসল্যের সাথে ফিরিয়ে নিতে বলে কোমল কণ্ঠে। আক্কার প্রকৃত রূপ চেনার পর, আক্কার উপর অঙ্গুলী তুলে পৃথিবীর সকল পুরুষ তথা সমাজের প্রতিই যেন উচ্চারণ করে:

> জুঁইমালা :...ই মা আপনের গড়ন এমন কা। হাত মুখ নাক নাভি কিছুই আলাদা করে চিনন যায় না।
>
> গোটা শরীরটাই একটা জিব্বা। ভাদরের উষ্ণ রইদ পশমে মাখা পেছনের দুই পা ভাঁজ করে থাকা কুকুরের লোল জিব্বা। ই- ঘিন ঘিন লাগে-।[১৩]

জুঁইমালার বিদ্রোহী রূপ দেখান নাট্যকার- ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিক্রি করার ষড়যন্ত্রে, মতের বিরুদ্ধে তাকে ভোগের পায়তারায়। একুশ শতকের জুঁইমালার অস্ত্ররূপে অবলম্বন করে কথার অপমান, হাস্যরসপূর্ণ কথার বাণ আর সত্যিকারেই শাণিয়ে রাখা দা- কাটারি। জুঁইমালা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার জীবনকে যারা এ পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে সরাসরি তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে তৎপর। জমানো অর্থের লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে ক্ষোভ মিটিয়েছে চাচা- চাচির উপর। অমানুষ প্রমাণ করে গালাগাল দিয়ে নানা কথায় অপমান করে চাচা- চাচিকে ফেরত পাঠিয়েই ক্ষান্ত হয়নি জুঁইমালা, গওহর হোদ্দাকে খদ্দের হিসেবে বিছানায় নিতে জোর করলে আজীবনের ক্ষোভ নিয়ে তার কাঁধে ধারালো দায়ের কোপ বসিয়ে দেয়। দিনের আলোয় রাতের ভালোবাসা ভুলে

যাওয়া আক্কা আবার রাতের আঁধারে জুঁইমালাকে লালসা মিশানো মিথ্যা ভালোবাসা প্রকাশে উদ্যত হলে কাটারি উঁচিয়ে ধরতে পিছপা হয় না জুঁইমালা। কিন্তু জুঁইমালার দ্রোহীসত্ত্বার সবচেয়ে যোগ্য পরিচয় মিলে শেষ দৃশ্যে- মলুয়ার সতীত্ব প্রমাণে অতীতকালের মানুষগুলো জড়ো হয়ে যখন সাজানো নাটকের সংলাপের মত মলুয়াকে অসম্ভব ঘটনাবলী ঘটিয়ে সতীত্ব প্রমাণের রব তোলে। সমাজ যে অসঙ্গত আচরণ আর অবিশ্বাস্য পরীক্ষায় নারীকে অবলীলায় হাজার বছর আগেও অসম্মান করেছে, বর্তমানেও করছে তার প্রতিবাদে শেষবারের মত ফুঁসে উঠে জুঁইমালা বলে:

জুঁইমালা :হাজার বছরের গোপন আন্ধারি থিয়া বার হয়ে আসা চরিত্র সকল- ঠোঁটের নড়াচড়া বন্ধ
করুইন। যেই ঠোঁটে ঐ মন্দ উচ্চারণ সেই ঠোঁটে আজন্মের মত খেজুর কাটার সেলাই দেওয়া প্রয়োজন।[১৫]

শেষ পর্যন্ত একসময়ের আঁকড়ে ধরা জীবন ফাঁস হয়ে ঠেকে জুঁইমালার কাছে। তাকে ঘিরে বেচাকেনার অদ্ভূত এই বেশ্যাবৃত্তির জীবন শেষ করতে সে এগিয়ে যায়। থেকে যায় শুধু জুঁইমালার আওড়ানো একটি কথাই:

জুঁইমালা :...সেই দুঃখ এমনি দুঃখ ঈশ্বরের কাছে থুয়ে দিলে তিনি সইতে পারবাইন না।[১৬]

নাট্যকার আনন জামান মৈমনসিংহ গীতিকার 'মলুয়া' পালার আশ্রয়ে 'জুঁইমালার সইমালা' রচনা করলেও নাটকের কোথাও গীতিকার মলুয়ার গল্পের কিংবা চরিত্রের ছায়া না পড়তে না দেয়ার দিক থেকে শতভাগ সফল। ফলশ্রুতিতে 'জুঁইমালার সইমালা' নাটক দাঁড় হয়েছে একুশ শতকের নিম্নবিত্ত শ্রেণির নারীর প্রতিনিধি জুঁইমালা নামের একজনের জীবনকে কেন্দ্র করে। আঁকা হয়েছে ভালোবাসাহীন এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পটভূমিতে লোভ লালসা আর মানুষের অমানবিকতার প্রেক্ষিতে, এক নিষ্পাপ কিশোরীর পঙ্কিল জীবনে বাধ্য হওয়া জীবন যাপনের করুণ ছবি। মলুয়ার জীবনের উত্থান- পতনের ঘটনা এখানে নেই, জুঁইমালার জীবনে আছে সহজ দুঃখ থেকে কঠিন দুঃখের সমুদ্রে ক্রমে নিমজ্জিত হবার গল্প। অবলম্বনহীন জুঁইমালার যে জীবন গওহরের মিথ্যা ভালোবাসার করালগ্রাসে, রক্ত সম্পর্কীয় চাচা- চাচির অর্থ- সম্পদের লোভে বেশ্যাবৃত্তিতে এসে থিতু হয়, তার পরিসমাপ্তি সমাজকে অক্ষত রেখে ভালোবাসাকে মহান করে মৃত্যুতে অসম্ভব, যেমনটা গীতিকার পালা 'মলুয়া'য় দেখা যায়। তাই সাধারনের ঘৃণাকে প্রাপ্য বলে মানলেও, গওহর- চাচা-চাচির বার বার তাকে বিকানোর প্রচেষ্টা কিংবা মিথ্যা ভালোবাসার অভিনয়ে আক্কা, ওসমানদের জুঁইমালাকে কেনার ইচ্ছা তার বাঁচার ইচ্ছাকে তলানীতে এনে ঠেকিয়ে বিদ্রোহী করে তোলে। সাথে যুক্ত হয় ছায়াসাথী সইমালা মলুয়ার হাজার বছরের পূর্বের স্মৃতির পুনরাভিনয়। হাজার বছর আগের সমাজ বিনাদ্বিধায় অসতীত্বের অপবাদ দিয়ে মলুয়াকে অসম্ভবকে সম্ভব ঘটিয়ে

সতী অভিধা আদায় করতে বলেছিল। তেমনি বর্তমানে দাঁড়িয়ে জুঁইমালার মত নারীরা সমাজের চাপে সমাজের সব অন্ধকার নিজের জীবনে নিয়ে অপমানিত হয়ে বেঁচে থাকে অথচ আঁধারে তাদের সঙ্গী হওয়া বিপরীত লিঙ্গের মানুষগুলো দিনের আলোয় সম্মানের অধিকারী হয়ে পথ চলে। এই পথে ঠেলে দেয়া মানুষগুলো আবার দিব্যি তাদের কেনা-বেচা করেই টিকে থাকার প্রচেষ্টা চালায়। কোথাও ঠাঁই বা সম্মান মিলে না শুধু জুঁইমালাদের।

গীতিকার মলুয়া সমাজের লালসার বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করেছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে কিন্তু সমাজ তার মর্যাদা না দিয়ে অসতীত্বের তকমা গায়ে জড়িয়ে দেয়। নিজের সতীত্ব প্রমাণে পালার মলুয়া কোন পরীক্ষায় রত না হয়ে নীরবে পরাজয় মেনে নেয়। পরবর্তী পর্যায়ে স্বামীকে জীবিতাবস্থায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেও, সেই অসতীত্বকে ঢাল করেই সমাজ মলুয়াকে অপরাধী করে। ভাগ্যের সাথে আজীবন লড়াই করা মলুয়া শেষে কোন প্রতিবাদ না করে নিজের মৃত্যুকে আহবান করে স্বামী আর সমাজকে স্বস্তি দিয়ে যায়। বলা বাহুল্য মৈমনসিংহ- গীতিকার মলুয়া পালার মলুয়া চরিত্রের পরিচয় জ্ঞাপক প্রধান দু'টি অভিধা আজ অবধি পতিপ্রেম আর সতীত্ব। কিন্তু গীতিকার মলুয়ার জীবনে যা অপবাদ, নাটকের জুঁইমালার জীবনে তাই প্রধান বৃত্তি। মলুয়া শত্রু গণ্য করেছে শুধু তার রূপের লালসায় পড়া মানুষগুলোকে, লড়েছে তাদের বিরুদ্ধে। সমাজ নামের যে নারী বিরূদ্ধ প্রধান শত্রু তার বিরুদ্ধে অপবাদ তুলেছিল, তার মুখোমুখি অসহায়ের মত গুটিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু জুঁইমালা শত্রুরূপে শত হাজার লক্ষ লোভ লালসা পূর্ণ সেই মানুষের দলকেই বারবার চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত করেছে, যারা নারীকে পুরুষের যৌন উত্তেজনার খোরাক একদলা মাংসপিণ্ড রূপে পরিণত করে এবং তার অমর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে মুনাফাও তাদের ঝুলিতেই পুরতে উদগ্রীব। দু'চরিত্রই সমাপ্তিতে স্বেচ্ছামৃত্যুকে বেছে নেয়ার মাধ্যমে জীবনের শেষরেখা টানলেও, জুঁইমালা প্রথম থেকেই শেষ সময়ের মলুয়ার সর্বংসহা রূপের সম্পূর্ণ বিপরীত, প্রতিবাদমুখর এবং প্রতিশোধ পরায়ন। উপরন্তু গীতিকার মলুয়ার মত নারীত্বের পরিচায়ক পতিপ্রেম আর সতীত্বের কাঠামোয় নিজেকে অবরূদ্ধ না রেখে জুঁইমালা শেষ পর্যন্ত মানুষ রূপে নিজেকে চিনিয়ে যায় 'জুঁইমালার সইমালা' নাটকে- যা একবিংশ শতাব্দীর নারীর প্রধান ভাষ্য। নাট্যকার একুশ শতকের বাস্তবতায় জুঁইমালাকে দাঁড় করিয়ে বিপরীতে হাজার বছরেরও অধিক কাল পুরোনো নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির অনড় অবস্থান দেখান। পার্থক্য নির্ণিত হয় নারীর ভূমিকায়, হাজার বছর পূর্বে মলুয়ার মত নারীরা সমাজের অন্যায় মুখ বুঁজে সহ্য করত, বিনিময়ে মিলত পতিব্রতা, সতী নামক প্রশংসা উপাধি। কিন্তু এ কালের নারী জুঁইমালা প্রতিবাদে- বিদ্রোহে আঘাত হানে সেই ঘৃণ্য সমাজের বিরূদ্ধে। পরিশেষে তাই বলা যায়, মৈমনসিংহ- গীতিকার 'মলুয়া' পালার আশ্রয়ে রচিত হলেও

আনন জামানের নাটক 'জুঁইমালার সইমালা', সাহিত্যে পুনর্নির্মাণ তত্ত্বের আধারে রচিত এক সার্থক পুনর্নির্মাণ।

তথ্যসূত্র:

১. ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, লোক সাহিত্য (২য় খন্ড) , মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮০, পৃ. ৫৪
২. শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত, মৈমনসিংহ- গীতিকা, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস, কলিকাতা ১৯৯৩, পৃ.৮
৩. তদেব পৃ. ৮৩
৪. তদেব, পৃ. ৯২
৫. তদেব, পৃ. ৯৮
৬. তদেব, পৃ. ৯৯
৭. সাইমন জাকারিয়া, নাটক সংগ্রহ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা , প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ৩৯
৮. শফিক আজিজ সম্পাদিত, কার্পাস, নীলক্ষেত, ঢাকা, প্রথম সংখ্যা ২০১৭, পৃ. ২৭০
৯. তদেব, পৃ. ২৮২
১০. তদেব, পৃ. ২৮৩
১১. তদেব
১২. তদেব, পৃ. ২৭৭
১৩. তদেব, পৃ. ২৮৫
১৪. তদেব, পৃ. ২৮৬
১৫. তদেব, পৃ. ২৮৭
১৬. তদেব, পৃ. ২৮৩

আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর গল্প: নিবিড় পাঠ

তন্ময় দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর (১৯২৭-২০২০) সাহিত্য জগতে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল একজন প্রতিশ্রুতিমান কবি হিসেবে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতার বই *তালেব মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা*। দেশভাগের কারণে শান্তিনিকেতনের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই দেশে ফিরে যাওয়ার পর নতুন সমাজব্যবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিবিধভাবে সত্য সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর কৈশোর জীবনে এনেছিল প্রবল বেদনা, যার প্রথম প্রকাশই হল তালেব মাষ্টার কবিতা। দেশভাগের ফলে অভাবের তাড়নায় এক মাষ্টারের সপরিবারে আত্মহত্যার ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই কবিতায়। কবিতার পাশাপাশি তিনি লেখেন বেশকিছু গল্প, উপন্যাস ও শিশুসাহিত্য। প্রায় রচনাগুলিতে তিনি প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সময়ের পরিবর্তন ও পরিণতিকে মিলিয়ে দেখার সংগত চেষ্টা করে গেছেন।

গল্পকার আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর গল্প বলতে আমরা প্রথমেই বুঝি নিতান্ত সহজ-সরল ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীতে উপস্থাপিত সংক্ষিপ্ত পরিসরের টুকরো কাহিনি। সমাজের সবচেয়ে নিন্দনীয়, করুণ এবং স্পর্শকাতর ঘটনাগুলিকেই তিনি গল্পের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন—কিংবা কখনো সমাজের অবহেলিত ও শুভাকাঙ্খী মানুষগুলোর কথা বলতে গিয়ে তাদেরকেই তিনি গল্পের বিষয় হিসেবে গড়ে নিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মানুষরা কেবলমাত্র নিছক এক একটি চরিত্র হয়ে থাকেনি গল্পের ছলে তারা হয়ে উঠেছে নিজস্ব সমাজের প্রতিনিধি। সমাজ সম্পর্কে নেতিবাচক অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে সমাজের বিপক্ষে তাদের প্রতিটি জিজ্ঞাসাই হয়ে উঠেছে এক একটি স্লোগানতুল্য। ধ্বংসমুখি সমাজের ভিত নাড়াতে যেমন করে লেখক জন্ম দিয়েছেন তাঁর প্রতিটি প্রতিনিধি চরিত্রকে তেমনি জন্ম নিয়েছে সমস্ত জিজ্ঞাসা তথা স্লোগানগুলি। যেমন—'গলির ধারের ছেলেটি' গল্পে অবহেলিত দশ-এগারো বছরের বালক লাডু মিয়ার হয়ে লেখক নিজেই বলছেন, "দরিদ্রের টাকায় গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। কিন্তু গরিবের কতটুকু অধিকার!"[১]

নিদেনপক্ষে দাঙ্গা ও দেশভাগ, মন্বন্তর, ব্ল্যাক মার্কেট প্রভৃতি নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নবজাত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আদর্শ ও বাস্তব এবং নীতি ও দৈনন্দিনের মধ্যে যে একটি সুদূরপ্রসারী পার্থক্য তৈরি হয়েছিল ব্যক্তি আশ্‌রাফ সিদ্দিকী হাতে-কলমে তার বহু প্রমাণ পেয়েছিলেন। ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সমাজের একজন দায়িত্ববান কর্মী হিসেবে মনে করবার জায়গা থেকেই তাঁর কলমে জন্ম নিয়েছে

'যৌতুক' ও 'মর্মন্তুদ'-এর মতো গল্পগুলি। সেইসঙ্গে প্রেম ও পরিণতি, মন ও মনঃস্তত্ত্ব, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, উৎসাহ ও দুরাশা এবং সময় ও সময়ের ব্যবধান প্রভৃতি তাঁর গল্পের বিষয় হিসেবেও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। প্রত্যেকটি গল্প একের পর এক যে প্রকার অভিঘাতকে চিহ্নিত করে তার কোনোটাই বহিরাগত নয়, বরং রাষ্ট্রীয় অন্তর্কাঠামো নির্ভর। নির্দিষ্ট প্রতিটি সমস্যাই অসাম্যের।

দুই

সময় প্রকাশন থেকে ২০০২-এ প্রকাশিত হয় আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর ২০৭ পৃষ্ঠার গল্পসমগ্র। মাত্র দুটি গল্পগ্রন্থ নিয়েই তৈরি এই সমগ্র। প্রথমটি *গলির ধারের ছেলেটি* (১৯৮১) এবং দ্বিতীয়টি *শেষ নালিশ* (১৯৯২)। প্রথম গল্পগ্রন্থে আছে মোট নয়টি গল্প এবং দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থে আছে মোট উনিশটি গল্প।

প্রথম গল্পগ্রন্থ *গলির ধারের ছেলেটি,* উৎসর্গ "আয়েশা আপাকে"। গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'রাবেয়া আপা'। খুবই গুরুত্বপূর্ণ গল্প এটি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাবেয়া আপা তথা রাবেয়া বেগম একজন সাহসী ও উৎসর্গীত নারী চরিত্র। তাঁর চোখেমুখে পবিত্রতা ও গাম্ভীর্যের ছাপ। গল্পটি দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পূর্ব থেকে ভাষা-আন্দোলন পরবর্তী। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও রাবেয়া বেগম বাড়ি থেকে পালিয়ে দুঃস্থ-জরাজীর্ণ আলাউদ্দিনকে বিয়ে করে। তবে এই বিয়ে নিছক কোনো বিয়ে নয় দেশের প্রতি রাবেয়া বেগমের নিজেকে উৎসর্গ করার একটি রূপক। কেননা, আলাউদ্দিন একজন স্বাধীনতাকামী মানুষ, দেশমাতৃকার যোগ্য সন্তান। কায়েমী স্বার্থবাদী ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশে স্বাধীনতা আনার স্বপ্নে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিঙড়ে দিয়েছেন তিনি। তাই তাঁকে বিয়ে করে তাঁরই আদর্শে এক হয়ে যান এই রাবেয়া বেগম। তবে তাঁরা যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল তা পূরণ হয়নি, কেননা ইংরেজরা দেশ ছাড়লেও দেশে সামাজিক সমতা রক্ষিত হয়নি। কিন্তু এই সামাজিক সমতাকে রক্ষা করাই যে ছিল তাদের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য। যে কারণে আজাদীর লড়াই-এ আততায়ির গুলি খেয়ে মারা যাওয়ার সময় আলাউদ্দীনের মুখে শোনা গেছে "আমাকে হিন্দু মারেনি...আমাকে মুসলমান মারেনি...মেরেছে মানুষ।"[২] স্বামীর মৃত্যুতে এতটুকুও পিছোপা হননি রাবেয়া বেগম। স্বাধীনতার পরে এলো বাংলা ভাষার আন্দোলন। এই আন্দোলনের শোভাযাত্রায় মুকুল ফৌজের মনিমেলার ব্যাজ বুকে নিশান হাতে সকলের আগে যোগ দিয়েছিল এক দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র, রাবেয়া বেগমের কচি বাচ্চা স্বপন। আন্দোলনে পুলিশের ভারি বুটের নিচে দুমরে গিয়েছিল তার কচি বুক। তখনও কাঁদেনি রাবেয়া বেগম। আবার ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পরবর্তী অজানা কোনো আন্দোলনের জন্য তৈরি করতে থাকেন নিজেরই তিন বছরের দ্বিতীয় ছেলেকে। কেননা, 'এখনো যে দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা আসেনি!' তাই লেখক বলছেন- "নিজের জীবন তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিয়েছো। স্বামীর তাজা রক্ত অঞ্জলী ভরে তুলে

দিয়েছো দেশের জন্য। দুধের সন্তানের হৃৎপিন্ড ছিঁড়ে বিলিয়ে দিয়েছ মানুষের উপকারে। কিন্তু কই? সেই আজাদী, মানুষের আজাদী, গরিবের আজাদী এসেছে কি? ব্রহ্মপুত্র তীরে ম্যাজিস্ট্রেট হাকিম আমির-উজিরদের ঘরে এখনো রাতের বেলা ডজন ডজন আলো জ্বলে। ব্রহ্মপুত্র তীরের সেই গরিব বস্তিবাসীদের ঘরে এখনো আলো জ্বলে নাই। অন্ধকারের বন্ধ কারায় রাত কাটায় দিন কাটায় দেশের হাজার হাজার দরিদ্র জনগণ।...সন্ত্রাস-চোরা কারবার-জালিম এবং জুলুমে এখনো ছেয়ে আছে তোমার স্বপ্নের দেশ। স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে লাল হয়ে ওঠে তোমার দেশের মাটি। শেষ হয় নাই মানুষের অপমান।...”[৩] অর্থাৎ আন্দোলনের ফলাফল ও দেশের পরিণতি লেখককে শান্তি এনে দিতে পারেনি। তাই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা বুকে করে দেশকে পুনরায় তৈরি করার আশা নিয়ে দেশেরই কোটি জনতার সামনে আশ্‌রাফ সিদ্দিকী তাঁর রাবেয়া আপাকে গল্পের মাধ্যমে আদর্শের পরিপূরক হিসেবে তুলে ধরলেন। তিনি এখানে প্রত্যক্ষভাবেই দেশের প্রতিটি মা-বোনকে রাবেয়া আপা হয়ে উঠতে বলছেন। কেননা তাঁদেরই কোলে জন্ম নেয় “স্বপ্ন” অর্থাৎ স্বপনরা। আবার এঁরাই পারে স্বপনদের দেশের উপযুক্ত হিসেবে তৈরি করতে। সেহেতু লেখকের বিশ্বাস “স্বপ্নের দেশ” তৈরি করতে পারে একমাত্র এই রাবেয়া আপারাই।

উদ্বাস্তু সমস্যা দেশভাগ পরবর্তী সময়ে অন্যতম। ঠিক এই সমস্যার কথা বলতে গিয়েই দ্বিতীয় গল্প ‘পুকুরওয়ালা বাড়ী’ লেখা। এই গল্পে ছিন্নমূল মানুষের অসহায়তার সুযোগে তৎকালীন ঢাকার ধনী বাড়িয়ালাদের স্বার্থান্বেষী পরিচয়কে যেমন স্পষ্টভাবে দেখান হয়েছে তেমনি সেইসব ছিন্নমূল মানুষের প্রতি সাধারণ মানুষকে সহানুভূতিশীল করে তোলার চেষ্টাও রয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র আনোয়ার নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত একটি স্থায়ী বাসস্থানে পৌঁছোয়, এবং সেখানেই জন্ম নেয় তার শিশু সন্তান। আর এখানেই অর্থাৎ গল্পের শেষ দু’লাইনে লেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্য ধরা পড়ে—“এ দেশ এ শিশুর জন্মভূমি। ধীরে ধীরে সে তার ন্যায্য অধিকার বুঝে নেবে। ইতিমধ্যে আনোয়ার-সেলিনাও এ বাড়িকে আবার সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে তুলবে।”[৪] অর্থাৎ অস্থির যুদ্ধক্লান্ত দেশের ভবিষ্যতকে সুন্দর করে তোলার বাসনা।

আবেদীন সাহেবের দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। বড়ো মেয়ে জোহরা, গায়ের রং শ্যামবর্ণ, অসুন্দর। ছোট মেয়ে সেতারা, ফরসা ও সুন্দর। অল্প বয়সেই তাদের মা মারা যায়। সুতরাং পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব বড়ো মেয়ে জোহরার ওপর। তবে শুধু দায়িত্ব পালন নয় যথারীতি নিজেকে বাবা-বোন-ভাইয়েদের প্রতি একরকম ভাবে সোঁপে দিয়েছে এই জোহরা। কিন্তু এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে সবকিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারলেও তাকে শেষমেশ হার মানতে হয়েছে নিজেরই রূপের কাছে। কেননা, তার এই অসুন্দর রূপই স্বামী ও সংসারের স্বপ্নের পথে একমাত্র বাঁধা। যারাই তার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে তারা প্রত্যেকেই এই একটিমাত্র কারণে মুখ ফিরিয়ে

নিয়েছে। আবার কেউ যেতে যেতে বলে গেছে বড়ো নয় ছোট অর্থাৎ জোহরা নয় সেতারাকে তারা নিজেদের পুত্রবধূ করতে রাজি আছে। এইভাবেই এক একটি তিরস্কারের কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলে 'জোহরা' গল্পটি। এখানে কালো মেয়েদের নিয়ে বৃহত্তর সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে কেন্দ্রীভূত সমস্যা তা নারীর ব্যক্তিবেদনার কারণ হয়ে উঠেছে এবং তাই-ই ক্রমে সঞ্চারিত হয়েছে। নারীহৃদয়ের এই বেদনার পরিচয় এর আগে আমরা শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়াতে পাব। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মেজাজ' কবিতাতেও ঠিক এই ধরনের সমস্যার কথা বলা হলেও সেখানে কবি সংকীর্ণ সামাজিক গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের আবহে পৌঁছে যান—যেখানে দেশীয় সমস্যা বিশ্বজনীন সৃজনের পরিচয় দেয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'তে বিন্দুর পরিণতি ছিল মর্মান্তিক। এখানে 'জোহরা' গল্পের উত্তরণ আবার ভিন্ন স্থানীয়। গল্পটি জোহরার প্রতি সমাজের নানা তিরস্কারের কথা বললেও লেখক শুধুমাত্র এই সংকীর্ণ সামাজিক মানচিত্রের মধ্যে আটকে থাকতে চাননি আর এই না-চাওয়ার জায়গা থেকেই তিনি বলতে পেরেছেন "পৃথিবীতে নেমেছে গাঢ় অন্ধকার। চাঁদ ডুবে গেছে। বুজে আসে জোহরার দুটি টানা টানা কাজল চোখ। উত্তর আকাশে জোহরা তারা উঠেছে। মিটিমিটি তার আলো। জানালার ফাঁক দিয়ে জোহরার মুখের ওপর এসে পড়ে। যদি কেউ দেখত কি স্নিগ্ধ আর পবিত্র তার আলো।"[৫] রূপের এই অনন্য বিচারই জোহরার শাশ্বত হয়ে ওঠার একমাত্র পরিচয়।

'একটি আত্মহত্যার কাহিনী' গল্পটি মনঃস্তত্বধর্মী। অধ্যাপক আলমগীর চৌধুরী; ছাত্রজীবন থেকেই উচ্চ মেধাবী। ইতিহাসের ছাত্র তিনি। তার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান সমস্তটাই 'ইতিহাস'। তাই নিজের বাড়ির নামও পর্যন্ত রেখেছেন মহেঞ্জোদারো। আলমগীরের ভালো লাগত আমিনা রহমানকে। আমিনা রহমান ছিল তার গবেষণামূলক প্রবন্ধের মুগ্ধ পাঠিকা। কিন্তু আমিনারা গরিব বলে তার সঙ্গে বিয়ে হয়নি আলমগীরের। বিয়ে হয় শিক্ষিতা এবং রুচিসম্পন্ন পরিবারের মেয়ে কুলসুমের সঙ্গে। কুলসুম আলমগীরের গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের বিষয়ে মোটেই কৌতূহলী নয়। একদিন বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে বাইরে যাওয়ার জন্য আলমগীরের অনুমতি না পাওয়ার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে পদাঘাতে আলমগীরের দশ বছরের সঞ্চিত সমস্ত ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন ভেঙে তছনছ করে দেয় কুলসুম। এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করে আলমগীর। এখানে রক্ত-মাংসের মানুষ আলমগীর ও তার জীবনের বৃহত্তম সারস্বত সাধনার মধ্যেকার একত্রীকরণের সম্পর্কটি নিবিড়। কিন্তু আত্মহত্যা হল একটি অনাকাঙিক্ষত ঘটনা। গল্পের মধ্যেকার এই ঘটনাটি স্ত্রীর আচরণ ও আলমগীরের মানসিক অবস্থার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। অনাকাঙিক্ষত ঘটনার পর মানসিক ভারসাম্য হারানোর ফলে প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারেনি আলমগীর। তবে একথা ঠিক স্ত্রীর থেকে পাওয়া চরম অপমানের মুহূর্তকালে আলমগীরের পাশে

যদি সহানুভূতিশীল কোনো চরিত্র থাকত তাহলে হয়তো আলমগীরের এমন পরিণতি আমাদের দেখতে হত না। যাইহোক এই গল্পের যে পরিণতি তা এক কথায় কাকতালীয়। কেননা আলমগীরের মৃত্যুর কিছুদিন পরে কুলসুমের ডান পাটি অকারণেই অবশ হয়ে যায়। "...ইহা প্রকৃতির প্রতিশোধ?"[৬]

পরবর্তী গল্প 'ভাঙা হারমোনিয়ম'। শহুরে শিক্ষিত মেয়েদের সম্পর্কে গ্রামের মানুষদের আজন্মের খাটো সংকীর্ণ ধারণাকে ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা থেকেই লেখা হয়েছে এই গল্পটি। গল্পে সেই শহুরে শিক্ষিতা মেয়েটি খুরশিদ। রসুলপুর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে রাশেদ জামালের সঙ্গে বিয়ে হয় তার। বিয়ের পর গ্রামের লোকেরা নাক সিটকিয়ে বলেছিল "শহরের বিদ্যাধরী – কত খাপ্ খাবে এ সংসারে"। কিন্তু এই শহরের বিদ্যাধরীই গ্রামে নতুন খুশী এনে দিয়েছিল, তাই তার আর এক নাম খুশী। তার গ্রামের ছোট-বড়ো, ধনি-গরিব প্রত্যেকের প্রতি সমান সহনশীল হয়ে ওঠা ও গ্রামে সাহিত্য-সংস্কৃতির আবহে সবাইকে একসূত্রে বেঁধে ফেলার দক্ষতা দেখে সেই মানুষরাই আবার পরে বলেছে "শিক্ষার গুণই আলাদা"। তবে সবকিছু ঠিকই চলছিল হঠাৎ গল্পের শেষে ঘটলো সেই ট্রাজেডি। খুরশিদ ওরফে খুশী মৃত বাচ্চা জন্ম দিয়ে মারা গেল। মুহূর্তের মধ্যে সব নিশ্চিহ্ন। চলে গেল সে, শুধু পড়ে রইলো তার প্রিয় হারমোনিয়মটি। "অযত্নে অব্যবহারে সবগুলি রিড-ই অকেজো হয়ে গেছে! এ হারমোনিয়ম আর বাজবে না!"[৭] লেখকের এই তুলনা আশ্চর্যজনক নয়।

'নানী আম্মা' গল্পটি প্রাচীন রমণীর খাঁটি নক্সা। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নব্বই বছরের বর্ষীয়সী নানী আম্মা। তিনি যেমন গৃহকর্মে নিপুণা, তেমনি ধর্মপ্রাণা। বাড়ির যিনি গৃহিণী তিনি একাধারে যেমন পত্নী, তেমন অন্যদিকে কর্ত্রী হিসেবে সুযশ অর্জন না করতে পারলে সমাজে তিনি প্রশংসিত হন না। কিন্তু নানী আম্মার পত্নী পরিচয়ের বর্ণনা গল্পে না থাকলেও কর্ত্রী পরিচয়ের কথা পড়ে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা তৈরি হয়ে যায়। সুতরাং তিনি দু'দিক থেকেই প্রশংসিত এবং অদ্বিতীয়। তবে গল্পটি পড়তে শুরু করলে আমাদের প্রথমেই রাসসুন্দরী দাসীর কথা মনে পড়ে যেতে পারে। দু'জনেই স্বামী তো দুরস্থ স্বামীর ঘোড়ার সামনেও মাথা থেকে ঘোমটা ফেলতে দেন না। নানী আম্মা পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ের মা। সবাই নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে থাকে। এদিকে বয়স্কা এই সরল সাদাসিধে রমণী দ্বিধাহীন চিত্তে স্বার্থহীনভাবে গ্রামে সবার আপদে বিপদে পাশে দাঁড়ান। টাকা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নানা জিনিসপত্র দানে কখনো আপত্তি করেন না। তার এই সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ তাকে ঠকালেও তিনি সব সময় উদার ও সহনশীল থেকেছেন। কিন্তু আজ সময় পাল্টেছে। মানুষ ক্রমশ আত্মমুখী হয়ে উঠছে। তৈরি হয়েছে নতুন যুগ। অচেনা ছাড় অতি নিকট আত্মীয়দের মধ্যেই দীর্ঘ ব্যবধান জন্ম নিয়েছে। "সেকাল এবং একাল। নানী আম্মা এবং এরা।" যেন দুই যুগের ব্যবধান। তাই লেখক বলছেন—"যুগ-সন্ধিক্ষণের শেষ প্রতিনিধিত্ব করে

যাচ্ছেন সম্ভবত আমাদের নানী আম্মা। নানী আম্মাকে দিয়েই সে যুগের শেষ যবনিকা উঠবে।”[৮] অর্থাৎ গল্পরসের আড়ালে রয়ে গেছে সামাজিক শিক্ষাদানের চেষ্টা।

‘কোথায় স্বর্গ : কোথায় নরক’ গল্পটি কেন্দ্রীয় চরিত্র মাসুদের ধীরে ধীরে বাস্তবমুখী হয়ে ওঠার গল্প। সে সরকারের আয়কর বিভাগে চাকরি করে। তার স্ত্রী সাহানা। সাহানা অসুন্দরী নয়, তবে যথাযথ এবং গৃহিণী। কিন্তু মাসুদ চায় “তার স্ত্রী হবে মডার্ন – তার সঙ্গে সর্বত্র যাবে – থাকবে টিপটাপ ওয়েল ড্রেসড্ – প্রয়োজনে ম্যাক্সিও পরবে, ওষ্ঠ গন্ডদেশে লাগাবে বিদেশী দামি কসমেটিকস। নিত্যনতুন শাড়ি পরবে – বদলাবে।”[৯] ঠিক যেমন তার আমেরিকা প্রবাসী বন্ধু সাবেরের স্ত্রী ডরোথী। সাহানার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে সাবেরের জন্য আরও দু’তিন জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ চলেছিল। তাদের প্রত্যেকেই কমবেশি সাবেরের পছন্দের ছিল। তাই সে বিবাহিত জীবনে স্ত্রী সম্পর্কে খানিক উদাসী। কিন্তু একটি সময়ের পর জানা গেল সাবেরের পছন্দের পাত্রীরা কেউই চরিত্রের দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। এই কারণে তারা কেউ সাহানার সমপর্যায়ের হয়ে উঠতে পারেনি। সুতরাং মাসুদ নিজের ভুল ভেঙে স্ত্রী সাহানাকে ঘনিষ্ঠভাবে আপন করে নেয়। গল্পে কবি শেখ ফজলল করিমের ‘কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক’ কবিতার কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। “কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে-বলে তা বহুদূর। মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতেই সুরাসুর।...”[১০] বলতে দ্বিধা নেই, লেখক এখানে সামাজিক ও নৈতিকতার শিক্ষা দিতে গিয়ে হয়তো একপ্রকার জোর করেই গল্পের পরিণতিতে পৌচেছেন। কেননা এই গল্পে উপস্থিত সমস্ত নারী চরিত্র কী করে অসৎ হতে পারে! সাহানাকে প্রশংসাযোগ্য এবং মাসুদের চরিত্রমোচন করার প্রবৃত্তি থেকেই কি এমন পরিণতি?

বিখ্যাত গল্প ‘গলির ধারের ছেলেটি’ প্রকাশিত হওয়ার পরই আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর গল্পকার হিসেবে বহুল পরিচিতি ঘটেছিল। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে, নাম লাডু মিয়া। ভিক্ষে করে খায়। ডান হাত অবশ হওয়ার কারণে কোনো কাজ করতে পারে না। একদিন ছেলেটি হঠাৎ জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পথের ধারে পড়ে থাকে, এবং কেউ একজন তাকে তুলে হাসপাতালে ফেলে আসে। এরপর হাসপাতালের চার নম্বর ওয়ার্ডের চোদ্দ নম্বর বেডের লাডু মিয়া ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও সেই হাসপাতাল ছাড়তে চায় না। কেননা এখানে সে খাবার ও নিশ্চিত আশ্রয়ের শান্তি পেয়েছে। এদিকে আবার নার্স রোকেয়া এই লাডু মিয়ার মধ্যে নিজের মৃত ছোট ভাইকেও খুঁজে পায়। সুতরাং দিনে দিনে দু’জনের সম্পর্ক আরও নিবিড় ও স্নিগ্ধমধুর হয়ে ওঠে। কিন্তু হাসপাতাল যে সুস্থ মানুষদের জন্য নয়। তাই কিছুদিন পর লাডু মিয়া সুস্থ হয়ে ওঠা মাত্রই ডাক্তার তাকে হাসপাতাল ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান। লাডু মিয়া অনড়, সে কিছুতেই এ স্থান ছাড়তে রাজি নয়। সেই কারণে সুস্থ হওয়ার পরেও বুদ্ধি করে সে কাঁচ দিয়ে নিজেই নিজের পা কেটে ফেলে। কিন্তু

এইভাবে আর কতদিন, তারপর আবার তাগাদা। তাই চিরদিন অসুস্থ থাকার ইচ্ছায় এবং নিশ্চিত আশ্রয় থেকে বঞ্চিত না হওয়ার বাসনায় অবুঝ বালক ওষুধ ভেবে টিনচার আইওডিন খেয়ে ফেলে। তারপর সব শেষ। গল্পের পরিণতিতে নেমে আসে গভীর অন্ধকার। হৃদয়স্পর্শী একটি কাহিনি। ভিক্ষুকরা সারা জীবন নিশ্চিত আশ্রয় পেতে চায় কিন্তু তারা ভিকিরি বলে সমাজের দ্বারা ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক দুইভাবে নির্যাতিত হতে থাকে। হাজার কসরদ করলেও তাদের সামনে নিশ্চিত আশ্রয় বলতে একমাত্র মৃত্যু। এদের সম্পর্কে লেখক চমৎকারভাবে বলছেন "এরা মানুষ নয়। এরা অভিশপ্ত আদমের সন্তান। কবে কোন দূর প্রভাতে বিবি হাওয়া আর আদম নিষিদ্ধ গন্ধম খেয়েছিলেন, তারই প্রায়শ্চিত্ত করে চলে এরা দিনের পর দিন!" গল্পে লাডু মিয়ার মৃত্যু যেমন গল্পের নিষ্ঠুর পরিণতি ঘটিয়েছে তেমনি সারা গল্প জুড়ে নার্স রোকেয়ার সঙ্গে তার সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল সম্পর্কও পাঠক মনে এনে দিয়েছে অদ্ভুত ভালো লাগা। লাডু মিয়ার জীবনে মৃত্যুর মতো করুণ ঘটনা নাও যদি ঘটতো তাহলে শুধুমাত্র এই সম্পর্কের জোরেই সে জীবনের অন্য স্বাদ হয়তো পেতে পারত।

লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *শেষ নালিশ,* উৎসর্গ "রীমা, রিয়া ও রিফি তিন কন্যার হাতে"। প্রথম গল্প 'মণিবুবু'। প্রথম গ্রন্থের প্রথম গল্পের সঙ্গে দ্বিতীয় গ্রন্থের এই প্রথম গল্পটিকে অনেকাংশে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। প্রথমত, দুটি গল্পেরই নাম রাখা হয়েছে গল্পের প্রধান দুই নারীচরিত্রের নামে। দ্বিতীয়ত, গল্পের উপস্থাপন ভঙ্গী। গল্প দুটোই উত্তমপুরুষ কথকের বয়ানে রচিত। তৃতীয়ত, বিষয়। স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ ও ভাষা-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ পরিস্থিতি নিয়ে যেমন 'রাবেয়া আপা' লেখা হয়েছে তেমনি দেশভাগ পরবর্তী মানুষের জীবন নিয়ে লেখা হয়েছে 'মণিবুবু'। জানি না এমনটা ঘটানো লেখকের পূর্ব পরিকল্পিত কোনো পরিকল্পনা কিনা! তবে 'মণিবুবু' গল্পের বিশেষত্ব হল গল্পটি সাপুড়ে মানুষের কথা বলছে। স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে লেখকের মণিবুবু। পাহাড়ি অঞ্চল থেকে আসা মাষ্টার সেকান্দর মিয়া তার বয়ঃসন্ধিকালের প্রথম পুরুষ। তার মুখোমুখি দাঁড়ানোর পর থেকেই চঞ্চল ও দুরন্ত প্রকৃতির মেয়ে মণিবুবু হঠাৎ শান্ত ও ধীর স্থির হয়ে যায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে গ্রামে আসামের কামরূপ কামাখ্যা থেকে সাপুড়েরা আসত সাপ ধরতে। একসময় এক সাপুড়ে ওস্তাদের কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে তাদেরই দলে মিশে যায় মাষ্টার সেকান্দর। মণিবুবুও একদিন বাড়ির অমতে পালিয়ে গিয়ে সেই মাষ্টারকে লুকিয়ে বিয়ে করে এবং দুজনে আসামে গিয়ে ওঠে। একসঙ্গে থাকতে থাকতে মণিবুবুও সাপুড়ে বিদ্যা রপ্ত করে ফেলে। এরপর হল দেশভাগ। ভবঘুরে সাপুড়ে সেকান্দর ও তার স্ত্রী মণিবিবি গিয়ে পৌঁছালো কুড়িগ্রাম, রংপুর এবং জামালপুর অঞ্চলে। সেখানে তারা অস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থাকল। তারপর কেটে গেল এক যুগ। মানুষ এবং সমাজের পরিবর্তন ঘটলো। জীবনের শেষ পর্যায়ে নিজের জন্মভূমিতে এসে দেশের মানুষের তিরস্কার ও তাচ্ছিল্য পেল মণিবিবি ওরফে লেখকের মণিবুবু। তার কারণ হিসেবে গল্পে বলা আছে তারা সাপুড়ে অর্থাৎ নীচু

জাত সুতরাং সমাজে তাদের জায়গা নেই। সেইসঙ্গে মণিবিবি "কুলত্যাগী বেশরা"। সুতরাং মণিবুবুর ভাই যদি তাদের আশ্রয় দেয় তাহলে সমাজ থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করা হবে। তবে যে কারণটি এখানে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না তা হল বাড়ি ও জমির বেদখলকারীদের আন্দোলন। এরপর সেকান্দর ও মণিবুবুর রংপুর যাত্রায় গল্প শেষ হয়েছে। গল্পটিতে দুটি বিষয় লক্ষ করার মতো—এক. দেশভাগ পরবর্তী দুই শ্রেণির মানুষের অবস্থান, এক শ্রেণির মানুষ নিজের বাড়ি-জমি হারিয়ে ভিন দেশের অস্থায়ী বাসিন্দা আর এক শ্রেণি সেই বাড়ি-জমির বেদখলকারী। দুই. সাপুড়ে এবং সভ্য—এই দুই সমাজের সামাজিক দ্বন্দ্ব। লেখক এখানে কোনো আড়ম্বর ছাড়াই খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন।

'শেষ স্পর্শ', 'একটি উপন্যাসের খসড়া', 'রাণী বিলাসময়ী বিদ্যা-নিকেতন' গল্পগুলো এক একটি প্রেমের গল্প। নাম, চরিত্র ও কাহিনিগত ভাবে আলাদা আলাদা হলেও বিষয় ও পরিণতির বিচারে প্রত্যেকটি গল্পই এক। পড়লে মনে হয় লেখক যেন নির্দিষ্ট একটি বিষয়কেই ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রেম যথেষ্ট সংশয়পূর্ণ এবং পরাজিত। তার অস্তিত্ব কেবলই স্মৃতিচারণায়। প্রতিটি গল্পের শুরুতেই নায়ক নায়িকার প্রেমের প্রথম অনুভূতি জাগলেও তা শুরুতেই শেষ হয়ে গেছে, তারপর বহু বছরের ব্যবধানে শুরু হয় গল্পের তথা জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়—যেখানে নায়ক নায়িকার আচমকা সাক্ষাৎ এবং স্মৃতিচারণার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে কোথাও বর্তমানকে তুচ্ছ করে অতীত প্রেমের শরীরে ঢুবে যাওয়া নেই। কখনো সামাজিক জিজ্ঞাসা, কখনো পারিবারিক টানাপোড়েন আবার কখনো সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বাসনার কাছে প্রেম মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। তবে, 'সই' গল্পে মৃত্যুর কারণে বিচ্ছেদের পর স্বপ্নে প্রেমের মিলন কাহিনি গল্পের পরিণতিকে ঐশ্বরিক মাত্রা দিয়েছে। এবং 'কুন্তলাকে নিয়ে গল্প'-এ প্রেম ও অনুভূতির পাশাপাশি সরাসরি প্রেমের প্রত্যাখ্যানও লক্ষণীয়। তবে, 'রাণী বিলাসময়ী বিদ্যা-নিকেতন' ও 'কুন্তলাকে নিয়ে গল্প'-এ নারীর সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিক মর্যাদাদানের বিষয়টি চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। সেইসঙ্গে সমাজে নারীর স্বনির্ভর চরিত্র গঠনে শাহিনা ও কুন্তলা বেশ উল্লেখযোগ্য। দেশের নারীদের সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার জন্য লেখক তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র হিসেবে গড়ে নিয়েছেন।

'ফটো' গল্পে পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়ে আমিনার সঙ্গে বিয়ে হয় আশি বছরের এক বৃদ্ধের। সতীন ও সতীনপুত্রদের অকথ্য অত্যাচারে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা আমিনা। আমিনার বিয়ের আগে শহর থেকে আসা রকিব তার ছবি তুলে নিয়ে যায় এবং তা পল্লীবধূ নাম দিয়ে প্রকাশ করলে পরে রকিব আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কারের কিছু টাকা দিতে এসে যখন শোনে আমিনা আত্মহত্যা করেছে তখন তার

এই আত্মহত্যার কাহিনি রকিব জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে কেননা এর নিউজ ভ্যালু অনস্বীকার্য। গল্পটি একটি বিশ্বজনীন অনিবার্য পতিত সত্যের কথা বলে, তা হল শহরের ব্যবসায়ীক মানুষদের চোখে প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েদের অবস্থান শুধুমাত্র পণ্যের উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর গল্পে শহরজীবন ও গ্রামজীবন দুইই বিষয় হয়ে এসেছে, তবে গ্রামজীবনের কথাতে যেন তিনি একটু বেশিই আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সেইসঙ্গে গ্রাম এবং তথাকথিত গ্রামের উন্নতির ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট সংবেদনশীল। 'স্বপ্ন সফল' গল্পটি তারই বড় প্রমাণ। সোহেল, ইব্রাহিম, রাকিবা প্রভৃতি চরিত্রদের ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির পাশাপাশি তাদের গ্রামকেন্দ্রীক উন্নয়নশীল মানসিকতা ও কর্মকাণ্ড তারই পরিচয় দেয়। গল্পে সোহেল বেশকিছু বই আনে—চাষবাস, মৎস্য খামার ও হাঁস-মুরগির খামার সম্বন্ধীয়, সে চায় গ্রামের ছেলেমেয়েরা এসব পড়ুক, পড়ে গ্রাম বাঁচাক। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল নারী চরিত্রের প্রতি লেখকের আস্থা। কেননা আমরা প্রথম থেকেই লক্ষ করছি সমাজ কিংবা রাজনীতি যেকোন বিষয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের গঠনমূলক কাজে নারীরাই যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। এবং নারীদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত অবস্থানকে তিনি বিশ্বজনীন প্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। এখানেও ঠিক তাই "রাকিবা নিজেই লেগে গেলো ... দুষ্প্রাপ্য দর্শনীয় সব গাছ লাগাতে।"[১১]

তবে, রাবেয়া আপা, খুরশিদ, কুন্তলা, শাহিনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্রগুলির পাশাপাশি সৈয়দ আলরাজির মতো শিক্ষিত, সৎ ও নিষ্ঠাবান পুরুষ চরিত্রকেও কেন্দ্র করে 'আলরাজি' গল্পটি লেখা হয়েছে। গল্পটির শুরুতে হালকা প্রেমের স্পর্শ এবং গল্পের একটি বড়ো অংশ জুড়ে উচ্ছৃঙ্খল স্ত্রীচরিত্রের চরিত্রমোচনের প্রসঙ্গ থাকলেও শেষ পর্যন্ত আলরাজির মতো একজন সরকারি কর্মচারীর উন্নত ব্যক্তিত্বের কথাই প্রধান হয়ে থাকে। হয়তো দেশের সকল সরকারী কর্মচারীদের সামনে আদর্শ একটি খাঁটি চরিত্র উপস্থাপনের পরিকল্পনা থেকেই লেখকের এমনি একটি গল্প লেখার প্রয়াস। স্বাধীন বাংলাদেশে সৈয়দ আলরাজিরই মতো একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান সরকারি কর্মচারীর যে প্রয়োজন ছিল তা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'যুগলবন্দি' গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়।

'মহর খা' গল্পটি বিষয়গতভাবে আলাদা। বংশকৌলিন্য এবং প্রকৃত বাস্তবের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। মুসলমানদের সম্মানজনক বংশগত উপাধি হল সৈয়দ। বর্তমানে এই বংশের কেবল আড়ম্বর ছাড়া বাকি সবকিছুই যে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে তা এই গল্পটি খুব সহজেই বুঝিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে আবার এই সৈয়দ বংশের মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ির আড়ম্বর বিধি অনুযায়ী চলতে গিয়ে অল্প বেতনের সামান্য এক কেরাণি মহর উদ্দিন খানের দৈনন্দিন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াইয়ের কথাও বলে এই গল্প।

স্বার্থবুদ্ধি ও অপরিসীম লোভ আজও পণ বা যৌতুক প্রথাকে টিকিয়ে রেখেছে। এর ফলেই নির্যাতনের মুখে নববধূকে হত্যা কিংবা আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়। এই সামাজিক কুপ্রথার চিত্রই ধরা পড়ে 'যৌতুক' গল্পে।

'একটি বকুল গাছের কথা' গল্পটি আর সমস্ত গল্পের থেকে আলাদা। এক কথায় গল্পটি একটি প্রেমের গল্প। দুই বিপরীত ধর্মের অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়ের প্রেম। তাদের প্রেম ও গোপনে মালা বদলের একমাত্র সাক্ষী একটি বকুল গাছ। এই গাছই এই গল্পের কথক। গাছের কোনো ধর্ম হয় না তাই হয়তো দুই ভিন্ন ধর্মী ছেলেমেয়ের প্রেমের কথা বলার জন্য লেখক সচেতন মনেই গাছকে কথক হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাছাড়া এই প্রথম আমরা লেখকের কলমে কোনো হিন্দু চরিত্রকে পাব তাও সে নারী। নাম কমলা। ধর্মের কারণে বাড়িতে প্রেমকে মেনে না নেওয়ায় এই বারো তেরো বছরের কমলার আত্মহত্যা পাঠকমনে বিষাদের জন্ম দেয়।

সমকালীন নারী ধর্ষণ ও খুন এবং ধর্ষিত জীবনের অসহ্য যন্ত্রণার ফলে আত্মহত্যা তথা নারীর বিপর্যস্ত জীবনের কাহিনি নিয়ে লেখা মর্মান্তিক কিছু গল্প 'মর্মন্তুদ', 'পাশবিক', 'দৈত্য' ও 'শেষ নালিশ'। এর পাশাপাশি ধর্ষিতা না হয়েও ধর্ষণের অপবাদ মাথায় নিয়ে অন্য আর এক নারীর আত্মহত্যার কথা বলে 'সোনিয়া' গল্প। এ ছাড়াও সমকালীন ভয়াবহ রাজনীতি ও মানুষের সংকটময় জীবনের কিছু মুহূর্ত ধরা আছে 'সন্ত্রাস' ও 'পত্রমিতা' গল্পে। শেষের এই কয়েকটি গল্প তৎকালীন সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের ভয়াবহ ও নিরাপত্তাহীন সময়ের কথা খুব সরাসরি ভাবেই বলেছে।

এই দুটি গল্পগ্রন্থের পাশাপাশি তিনি লিখেছেন মাত্র তিনটি উপন্যাস। *'শেষ কথা কে বলবে', 'আরশিনগর' ও 'গুণীন'*। প্রত্যেকটি উপন্যাসের গতিশীলতা অনবদ্য। তবে এগুলির মধ্যে 'আরশিনগর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবহমান বাংলা ও তার প্রকৃতি এবং লোক-ঐতিহ্যের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসটি খুবই প্রশংসাযোগ্য। *আনন্দবাজার পত্রিকা*-তে একসময় এই উপন্যাসের বিশুদ্ধ আলোচনা হয়েছে। এমনকী তৎকালীন *দেশ* প্রত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ উপন্যাসটির রি-প্রিন্টের ইচ্ছেও প্রকাশ করেছিলেন।

তিন

১৯৬২ সালে *'রাবেয়া আপা'* গল্প দিয়ে আশ্‌রাফ সিদ্দিকী গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। গল্পকার হিসেবে তিনি একদিকে যেমন কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন তেমনি অন্যদিকে কালের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঙ্গা পরবর্তী নতুন দেশ ও সমাজ গঠনের স্বপ্নে দেশের নতুন নাগরিক, মার্জিত সামাজিক কাঠামো এবং তিক্ততাহীন মানবিক সম্পর্ক সৃষ্টির প্রতি নজর দিয়েছিলেন। শাশ্বত মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মনুষ্যত্বের সাধনাকে তিনি সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন আগামী প্রজন্মের মধ্যে। তাই একই সময়ের আরও অন্যান্য গল্পকারদের তুলনায় তিনি বিষয় নির্মাণে ও গল্প বলার আন্তরিকতায়

অনেকাংশে স্বতন্ত্র হয়ে থেকেছেন। গল্প বা নির্ভেজাল বাস্তব, যাই লিখুন না কেন, লেখক আশ্‌রাফ সিদ্দিকী এক জীবনমুখী চেতনা সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন আমাদের মনে। খুব বেশি দিন হয়নি আমরা তাঁকে হারিয়েছি। তিনি আস্থা রেখেছিলেন জীবনের প্রতি।

আবুল মনসুর আহমদ, আবু রুশদ এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ—দেশভাগের পর বাংলাদেশের ছোটগল্প রচনা ধারার প্রথম পর্বের এই তিনজন খ্যাতিমান লেখকের গভীর সমাজমনস্কতা তাঁকে যেমন প্রভাবিত করেছে তেমনি মানবতাবাদ ও হৃদয়বৃত্তির প্রকাশে পরবর্তী ফজলুল হক, সোমেন চন্দ, ইব্রাহীম খাঁ, আবুল ফজল, আবু জাফর শামসুদ্দীন ও শওকত ওসমান প্রমুখদের সমপর্যায়েও তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তবে সমাজকল্যাণ চিন্তা তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পে বড়ো হয়ে ওঠায় তিনি ব্যক্তিমনের অপার রহস্য উন্মোচনে তেমন উদ্যোগী হয়ে ওঠেননি। হয়তো এই কারণেই তাঁর গল্প শিল্প বিচারে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু কাহিনি নির্মাণ থেকে চরিত্রদের উপস্থিতি পাঠক মনের প্রত্যাশাগুলিকে পূরণ করতে পেরেছে।

উদ্ধৃতিপঞ্জি:

১. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, *গল্পসমগ্র,* সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা ৭১
২. তদেব, পৃষ্ঠা ২৭
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ২৮
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৩
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৮
৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৫
৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৬০
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৬২
১০. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৮
১১. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩২

নির্বাচিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় সমাজ ও মানবিক প্রেম সম্পর্ক

কস্তুরী চৌধুরী
স্নাতকোত্তর
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মধ্যযুগের সমাজ ছিল ধর্মাশ্রয়ী। সমাজ চলত সামন্ততন্ত্রের নিয়মানুসারে। যেখানে মানবতার থেকে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের ও প্রাণহীন নিয়মকানুনের স্থান ছিল উপরে। সেই দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন ছিল নিয়ম ভাঙ্গা প্রতিবাদের, এই সহজ সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন প্রথাগত শিক্ষার বাইরে থাকা মৈমনসিংহের পালাকাররা। তাঁরা 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র নানা পালার মাধ্যমে আমাদের সন্ধান দিয়েছিলেন এক বৃহৎজনগোষ্ঠীর। যেখানে আছে মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় আত্মীয়তা আর সেখানকার গ্রামবাসীর বাস্তব জীবনের ছবি। যেখানে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য নেই, যেখানে নায়ক-নায়িকারা কোন বাধাকে মানতেই রাজি নয়, সেখানে শুধু আছে নিখাদ প্রেমের জন্য আত্মত্যাগের কাহিনি। আলোচ্য তিনটি পালায়(দ্বিজকানাই প্রণীত 'মহুয়া' মনেকরা হয় চন্দ্রাবতীর লেখা 'মলুয়া' নয়ান চাঁদের লেখা 'চন্দ্রাবতী') আবলম্বনে সেই চিত্রগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

সূচক শব্দ : সমাজ, সামাজিক বাধা, উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ, প্রেম, নায়ক-নায়িকা, প্রণয় কাহিনি, অকৃত্রিম, মধ্যযুগ, সাহিত্য, সংস্কার, অস্পৃশ্যতা, বর্ণাশ্রম, সতিত্ব, রক্ষনশীল, দেবত্ব, প্রথাগত শিক্ষা, মানবতা, মানব-মানবী, সামন্ততন্ত্র,

মুল আলোচনা:

ক) নির্বাচিত 'মহুয়া' 'মলুয়া' ও 'চন্দ্রাবতী' পালায় সমাজ-ভাবনা

লোকসাহিত্য মানেই সমাজ। কোন প্রেম ও দাম্পত্য জীবন সবই নির্ভর করে সমাজের নিয়মের ওপর। তাই আমাদের নির্বাচিত পালাগুলির মধ্যে প্রেমের জন্য আত্মত্যাগের কাহিনিকে জানতে হলে, সেখানকার সমাজকে জানা প্রয়োজন। পালাগুলি সংগৃহীত হয়েছিল মৈমনসিংহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এই জেলা অরণ্য, খাল-বিল, নদী দিয়ে ঘেরা তাই সেনবংশীয় প্রভাব খুব প্রখরভাবে পড়েনি, কিন্তু প্রাচীন হিন্দু আদর্শ এখানে বজায় ছিল। মধ্যযুগীয় উচ্চ ও নিম্নস্তরের মধ্যে জাতিভেদ এখানে স্পষ্ট। হিন্দু সমাজে ব্রাক্ষণদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি, তারা সবসময়ই নিচু শ্রেণীর মানুষের থেকে নিজের দূরত্ব বজায় রেখে চলত। বাড়িতে আর্যেতর মানুষের প্রবেশ ছিল নিষেধ। সেই দৃশ্য দেখা যায় 'মহুয়া পালা'য়।

' শুন শুন নদ্যার চানরে বলি যে তোমারে।

বাইদ্যার তামশা করাওনিয়া বাইর বাড়ীর মহলে।।'[১]

এমনকি কোনো উচ্চর্বণের মানুষ শূদ্রের বা আর্যেতর হিন্দু সমাজের কোনো বাড়ীতে খেলে তাদের জাতিনাশ হত। এই খাদ্য গ্রহনে জাতিনাশ হয়েছিল 'মহুয়া পালা'র নদ্যারচাঁদের।

'দেল ভরিয়া কন্যা করিল রন্ধন।
জাতি দিয়া নদীয়ার ঠাকুর করিল ভোজন।।'[২]

স্বনামধন্য ইতিহাসকার রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলা দেশের ইতিহাস' বইতে এই ধরনের জাতিনাশের কথা বলেছেন-

'কয়েকটি মাত্র দ্রব্য ভিন্ন শুদ্র কর্তৃক প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিনা জলে শুদ্র পক্কদ্রব্য এবং শুদ্র কর্তৃক প্রস্তুত ক্ষীর ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন। রঘুনন্দনের মতে, শুদ্র কর্তৃক দধি ও শক্ত ব্রাহ্মণের ভোজ্য।'[৩]

মধ্যযুগে হোসেন শাহের আমল থেকে হিন্দু মুসলিমের সম্পর্কে কিছুটা উন্নতি হলেও। তখনও ধর্মান্তর চলছে। অন্যদিকে হিন্দু নারী অপহরনও চলছে। ইতিহাসকার রমেশচন্দ্র মজুমদারও তাঁর বইতে এরকম কথা বলেছেন-

'ধর্মের দিক দিয়া যেমন মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তিপূজা, সমাজের দিকদিয়া তেমনি স্ত্রী লোকের শুচিতা ও সতীত্ব রক্ষা হিন্দুরা জীবন যাত্রায় প্রাধান স্থান দিত। এদিক দিয়াও মুসলমানেরা হিন্দুদের প্রাণে মর্মান্তিক আঘাত দিয়াছে।'৪

'মলুয়া পালা'য় দেখাযায় মলুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে দেওয়ান মলুয়াকে অপহরণ করেছিল।

'হুমুক করল কাজী পেয়েদা পশ্চানে।
বিনোদেরে লইয়া যাও নিরলইক্ষার ময়দানে।।
জেতায় রাখিয়া তারে কব্বরে মাটি দিও।
তারে ঘরের নারীরে কাড়িয়া আনিও।।
জাঙ্গিরপুরে বাস করে দেওয়ান জাহাঙ্গির।
তাহার হাউলীতে নিয়া করিও হাজির।।'[৫]

মুসলিম শাসক হিন্দু সমাজের ওপর এতটাই আঘাত হেনেছিল যে হিন্দু মুসলিমের সাধারণ মেলামেশা সমাজ বিরুদ্ধ ছিল। আর মুসলিম হিন্দুর প্রেম তো ভাবাই যায় না। তাই জয়ানন্দ যখন মুসলিম যুবতীকে বিয়ে করার পর নিজের ভুল বুঝে, চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে আসে, তখন চন্দ্রাবতীর মনে হয় জয়ানন্দের ছোঁয়ায় মন্দির দূষিত হয়ে গেছে।

'জয়ানন্দের ছোঁয়ায় মন্দির প্রাঙ্গন দূষিত হয়ে গেছে।
কোপাটে আছিল লেখা পড়ে চন্দ্রাবতী।
অপবিত্র হইল মন্দির হইল অধোগতি।।
কলসী লইয়া জলের ঘাটে করিল গমন।
করিতে নদীর জলে স্নানাদি তর্পণ।।'[৬]

মৈমনসিংহের নিম্নবর্গের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। সমাজে নারী শুধু সাংসারিক কাজে নয় বরং কর্ম জীবনেও পুরুষের সাঙ্গী। ব্রাহ্মণ্ কন্যা মহুয়াকে অপহরণ করে হুমরা বেদে কন্যা স্নেহে বড়ো করেছে, তার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য। বেদের তামশা দেখার জন্য লোকের জড় হওয়া তো আসলে মহুয়াকে দেখার জন্যই।

'শুন শুন ঠাকুর মশায় বলি যে তোমারে।
নতুন একদল বাইদ্যা তামাশা দেখাইবারে।।
পরম এক সুন্দরী কইন্যা সঙ্গেতে তাহার।
জন্মিয়া-ভন্মিয়া এমুন দেখি নাইকো আর।।'[৭]

পালাগুলির নায়ক-নায়িকারা প্রত্যেকেই যুবক-যুবতী। অর্থাৎ মৈমনসিংহ ও তার আসে পাশের অঞ্চলে বাল্যবিবাহের তেমন প্রকোপ ছিল না। এছাড়া চন্দ্রাবতীকে দেখলেই বোঝাযায়, উচ্চবর্গের বা ব্রাহ্মণ্য সমাজে নারীকে সাংসারিক ও ধর্মীয় কাজ ছাড়াও শিক্ষা দানের ব্যাবস্থা ছিল। এই শিক্ষার জন্যই চন্দ্রাবতীর মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। তাই সে সারা জীবন অবিবাহিত থাকার মতো সিধান্ত নিতে পেরেছে। তার বাবা এই সিধান্ত মেনেও নিয়েছে এর খেকেই বোঝা যায় সেখানকার ব্রাহ্মণ্য সমাজে নারীর কথা কেউ সম মর্যাদা দেওয়া হতো।

'চান্দ্রাবতী বলে পিতা,মম বক্য ধর
জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবড়।।
শিব পূজা করি আমি শিব পদে মতি।
দুঃখিনীর কথা রাখ কর অনুমতি।।
অনুমতি দিয়া পিতা কয় কন্যার স্থানে।
শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে।।'[৮]

পালাগুল পড়লে তৎকালীন সমাজেরব পুরুষ চরিত্রের ত্রুটি গুলিও বোঝা যাবে। এমনি পুরুষ চরিত্র মহুয়া পালার সাধু ও মাঝিমল্লা এবং সন্ন্যাসী। সবাই ছিল নারী লোলুপ। মলুয়া পালায় কাজীও ছিল মলুয়ার রূপে মত্ত। অন্যাদিকে জয়ানন্দও মুসলিম নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার রূপ দেখে। আসলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারীকে পুরুষেরা মনে করতো তাদের ভোগ্য। তারই প্রতিফলন হয়েছে এই পালাগুলিতে।

খ) 'মহুয়া' 'মলুয়া' ও 'চন্দ্রাবতী' পালায় মানব-মানবীর প্রেম

মধ্যাযুগীয় সমাজে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সেরকম গুরুত্ব পেতনা। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে সেই দৃশ্যই উঠে এসেছে। মধ্যযুগের সাহিত্য পড়লেই দেখাতে পাওয়া যায় সেখানে দেবতাই প্রাধান। মঙ্গলকাব্য, পদাবলী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য সবেই যে মানুষের কথা আসেনি তা নয় কিন্তু তা দেবতাকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যই। মঙ্গলকাব্যে দেখানো হয়েছে এমন দাম্পত্যের চিত্র যার সাথে প্রেমের ভাব রাজ্যের কোনো যোগাযোগ নেই। আরাকান রাজসভার সাহিত্যে মানব-মানবীয় প্রেম থাকলেও তা মৌলিক সাহিত্য নয়

ধর্মীয় ও রূপকের মোড়কে মোড়া অনুভবি রচনা। খ্যাতনামা সাহিত্য গবেষক ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন-

'আমাদের পুরানো কাব্য কাহিনীতে প্রেমের স্থান ছিল সংকীর্ণ। মধ্যযুগের সামাজিক বিধিনিষেধ মুক্ত প্রেমের পক্ষ বিস্তারে সাহায্য করেনি আদৌ-বাধাই দিয়েছে।'[৯] সামাজিক বাধার কারণেই আমাদের নির্বাচিত 'মৈমসিংহ-গীতিকা'য় প্রেমের পরিণতি ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছে। বিখ্যাত লেখক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়র মতে-

'শুধু প্রেমের জন্য জাতি পাঁতি বিলিয়ে দেওয়া, উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নবর্ণের কন্যাকে প্রেয়সী রূপে গ্রহণ করে সর্বশান্ত হয়ে যাওয়া এমনকি বেদিয়ার সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ, হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও প্রেমের চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ঘটনা অশিক্ষিত কবিরা বিস্ময়কর নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।'[১০]

আমাদের নির্বাচিত 'মহুয়া' 'মলুয়া' ও 'চন্দ্রাবতী' পালায় এই অকৃত্রিম প্রেমই এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়।

পুরুষতান্ত্রিক মধ্যযুগে পুরুষ কর্তৃক নিজের প্রেমিকা বা জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন সাধারন মনে হলেও মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় নারীরাও নিজের সঙ্গী নির্বাচন করেছে যা মধ্যযুগে অভিনব। আরাকান রাজসভার সাহিত্যে তার কিছু দৃষ্টান্ত আছে ঠিকই, কিন্তু তার চরিত্ররা সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ। সমাজের সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত তারা নন।

'মলুয়া' ও 'চান্দ্রাবতী' পালায় নায়ক-নায়িকার জাতি সম্প্রাদায় এক হওয়ায় প্রেমিক প্রেমিকা নির্বাচনে সেরকম কোনো বাধা আসেনি। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। 'মহুয়া' পালায় ঠাকুর নদের চাঁদ গ্রামের তালুকদার আর মহুয়া বেদের দলে খেলা দেখায়। সমাজে তখন বর্ণাশ্রম প্রাথার প্রাবল্য, তাই এই উচ্চবর্ণের আর নিম্নবর্ণের প্রেম সমাজ মেনে নেবে না তা স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে নায়ক-নায়িকা থেমে থাকেনি। নদের চাঁদ তার ঘরবাড়ি, সমাজ, জাতি, পদমর্যাদা সব ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে মহুয়ার জন্য।

'চান্দ সুরুষ পন্নাম করি সবে।
মায় বাপে পন্নাম করি যাইব বৈদেশে।।
রাত্রে নিশা কালে ঠাকুর কি কাম করিল।
বইদ্যার নারীর লাগ্যা ঠাকুর বৈদেশী হইল।।'[১১]

মহুয়াও নিজের সম্প্রাদায়, ঘর, পরিজন ছেরে বেরিয়ে এসেছে।

'পইড়া থাকুক বাপ মাও পইড়া থাকুক ঘর।
তোমারে লইয়া বন্ধু যাইবাম দেশান্তর।।
দুই আঁখি যেদিগে যায় যাইবাম সেই খানে।
আমার সঙ্গে চল বন্ধু যাইবাম গহীন বনে।।'[১২]

শুধু এই নয় সাধুর লালসা, সন্ন্যাসীর অপ্রীতিকর প্রস্তাব অনেক বাধাই এসেছে তাদের জীবনে, কিন্তু কোনো পরিস্থিতি তাদের আলাদা করতে পারেনি এমনকি মৃত্যুও না।

তারা এক সাথে বাঁচতে না পারলেও এক সাথেই মরেছে। মৃত্যুর পর মহুয়ার পালিত বাবা হুমরা বেদেও বুঝতে পেরেছে –

'দুইয়েই পাগল ছিল দুইয়ের লাগী।'[১৩]

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন-

'একমত্র মহুয়া এই গাঁথা সাহিত্যে অতীব অভিনব সামগ্রী ইহা ঘরের ও নহে, বাহিরের ও নহে। এই গীতিকায় জাতি বিচার, কুলশীল, পদমর্যাদা সমস্তই প্রেমরত্নাকারের অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে।'[১৪]

আসলে 'মহুয়া পালায়' মহুয়া আর নদের চাঁদের কাছে দুজনের প্রতি প্রেমই ছিল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

আমাদের আলচ্য অন্যদুই পালাতে প্রেম শেষ পর্যন্ত হয়েগেছে একপাক্ষিক। পুরুষ চরিত্রগুলি তাদের প্রেমিক আর্দশকে সার্থক করতে পারেনি বরং নারীরা থেকেছে একনিষ্ঠ।

'মহুয়া পালা'য় মলুয়া দেওয়ান জা্হাঙ্গীরের হাউলিতে তিন মাস থেকেও নিজের সতিত্ব বজায় রেখে ঘরে ফিরেছে। চাঁদ বিনোদ সমাজে লোকলজ্জার ভয়ে আত্মীয়দের কথা শুনে মলুয়াকে ত্যাগ করে অন্য বিবাহ করেছে। তবুও মলুয়া স্বামীকে ছেড়ে যায়নি। সে বাইরের ঘরের দাসী হয়ে থেকেছে। এমনকি চাঁদ বিনোদের সামাজিক মর্যাদার কথা ভেবে নিজের প্রান বিসর্জন করেছে।

'আমি নারী থাকতে তোমার কলঙ্ক না যাবে।
জাতি বন্ধু জনে তোমায় সদাই ঘটিবে।।
কলঙ্ক জীবন মোর ভাসাইব সাগরে।
এখান হইতে সোয়ামী মোর চইল্যা যাও ঘরে।।'[১৫]

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-

'প্রেম পুরুষের কৌতুক, নারীর জীবন। যাহার প্রেমের জন্য তাহার প্রাণ বাঁচিল, সমাজের কোথায় সে তাকে বিসর্জন দিল-সমাজের সম্মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া সে একবার নিজের মনের দিকে তাকাইয়া দেখিল না। কিন্তু যে শক্তির দ্বারা মলুয়া অত্যাচারীর হাত হইতে নিজের নারীত্ব রক্ষা করিয়াছে, সেই শক্তির দ্বারাই সে তাহার স্বামীর অপমান জয় করিল। সে তাহার স্বামীর গৃহে সতিনীর দাসী হইয়া থাকিয়াও প্রেমের গৌরবে যেন মহিষীর মতো বিরাজ করিতে লাগিল।'১৬

মলুয়া কোনো অবস্থাতেই স্বামীকে ছেড়ে যায়নি, সেটা অর্থনৈতিক খারাপ অবস্থা হোক বা দেওয়ানের অত্যাচার এমনকি স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া আঘাতেও না। কোনো কিছুই তার প্রেমকে ম্লান করতে পারেনি।

প্রেমে একনিষ্ঠতার আর এক প্রামান মেলে 'চন্দ্রাবতীর পালা'য় চন্দ্রাবতীর মধ্যে। চন্দ্রাবতী তার প্রেমকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার প্রাণে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সে নিজের

আত্মমর্যাদাকে বিলিয়ে দেয়নি। জয়ানন্দ ও মুসলিম যুবতীর প্রেম তাকে ভিতর থেকে ভেঙে দিয়েছে।

'সেই হাসি সেই কথা সদা পড়ে মনে।
ঘুমাইলে দেখিব কন্যা তাহারে স্বপনে।।
নয়নে না আসে নিদ্রা অঘুমে রজনী।
ভোর হইতে উঠে কন্যা যেমন পাগলিনি।।'[১৭]

তাই সারাজীবন অবিবাহিতা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার প্রেম ছিল অকৃত্রিম তাই প্রেমের সিংহাসনে অন্য কাউকে বসাতে সে পারেনি। সে জয়ানন্দকে ফিরিয়ে নেয়নি ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রেমেই পাগল হয়েগিয়েছে।

'আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী।।'[১৮]

নিজে প্রেমের এই আঘাত ভুলতে চাইলেও জয়ানন্দের মৃত্যু তাকে তা করতে দিলনা। সাহিত্য গবেষক ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন-

'অপবিত্র মন্দিরকে আর পবিত্র করা হল না-দোষগুন ছাপিয়ে মানুষ বড় হল,নিবৃত্তির চেষ্টা মিথ্যে হল চন্দ্রাবতীর এই ট্রাজেডি তার প্রেমকেই জয়ী করল।'[১৯]

আমাদের নির্বাচিত পালাগুলিতে আসলে প্রেমেরই জয়গান করা হয়েছে। প্রেম যখন দৈহিক আকর্ষণকে ছারিয়ে মনে জায়গা করে নিয়েছে তখনই তার জয় হয়েছে। মহুয়া, নদের চাঁদ মলুয়া, চন্দ্রাবতীর প্রেম ছিল আত্মিক। তাই পারিবারিক ও সামাজিক আঘাতই তাদের প্রেমকে শেষ করতে পারেনি।

গ)'মহুয়া' 'মলুয়া' ও 'চন্দ্রাবতী' পালায় প্রেম ও সমাজের সমন্বয়

সাহিত্য যদি সমাজের দর্পন হয়। তাহলে সেই সাহিত্যে সমাজের চিত্র উঠে আশা স্বাভাবিক। আমাদের নির্বাচিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র পালাগুলিতে তাই মানুষের স্বাধীন প্রেমকেই সাহিত্যের বিষয় হিসেবে গন্য করা হয়েছে। তবে সেই স্বাধীন প্রেমের পরিণতি সব সময়েই বিয়োগাত্মক হয়েছে যা তখনকার রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই প্রাবন্ধিক কালিদাস রায় বলেছেন –

'স্বাধীন প্রেমের প্রবাহ এইরূপে জাতীয় জীবনে বিয়োগান্ত হওয়ায় করিয়া মিলনান্ত করা যায় না যে তাহা নয়, কিন্তু তাহা সত্য হইয়া উঠে না এই গীতিকাগুলির কাহিনীগুলি তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়োগান্ত। এবিষয়ে কবিগণ কোনো মিথ্যে অনুশাসনকে মানে নাই।'[২০]

আমাদের নির্বাচিত 'মহুয়া', 'মলুয়া', ও 'চন্দ্রাবতী' পালাতেও তেমনি প্রেমের পথে নানা বাধা এসেছে। গল্পের নায়ক-নায়িকারা সেখানে সমজের কাছে হার স্বীকার করেনি বরং পরিস্থিতির সাথে লড়াই করেছ্ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু তবুও প্রেমকে সুখের পরিণতি দিতে পারেনি।

'মহুয়া পালা'তে দেখা গেছে বেদের ঘরে মানুষ মহুয়া ও ব্রাহ্মণ যুবক নদের চাঁদের প্রেম। বর্ণাশ্রম, অস্পৃশ্যতা যে সমাজে সংস্কারের মতো বাসা বেঁধে আছে। সেখানে তাদের প্রেমের সামাজিক পরিনতির কথা তারা ভাবতেই পারেনি তাই প্রেমের সম্পর্ক গড়ার শুরুতেই তারা দেশান্তরী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'মা ছাড়বাম বাপ ছাড়বাম ছাড়বাম ঘর বাড়ী।
তোমার লইয়া কইন্যা অইয়াম দেশান্তরি।।'[২১]

কিন্ত মহুয়া নারী সে ঘর ছাড়বো বললেই ছাড়তে পারে? সমাজ পরিবারের সম্মান রক্ষার দায়ভার যেন শুধু নারীর উপরেই ন্যস্ত করেছে তাই মহুয়ার মনও দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে।

'আমি যে অবলা নারী আছে কুল মান।
বাপের সঙ্গে নাহি গেলে নাহি থাকব মান।।'[২২]

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো পুরুষকে যতটা স্বাধীনতা দিয়েছে নারীকে তার সিকিভাগও দেয়নি। উপরন্তু সংস্কারের বাধা চাপিয়ে দিয়ে তাকে করেছে গৃহবন্দী।

মহুয়া সমস্ত বাধাকে পার করেছে। পারেনি শুধু পারিবারিক বাধাকে আটকাতে। মহুয়াকে অপহরণ করার মূল উদ্দেশ্য ছিল হুমরার জীবিকাতে পাকা গুটি হিসেবে ব্যবহার করা। সে ব্রাহ্মণ যুবকের সাথে প্রেম করলে সেই তিল তিল করে তৈরি করা ভিত ধ্বংস হত। তাই হুমরা বেদে চেয়েছিল মহুয়া তার পালক পুত্রের সাথে বিয়ে করে তার জীবিকাতে প্রধান সহযোগী হিসেবে থাকুক।

'আমার পালক পুত্রু সুজন খেলোয়ার।
বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ।।'[২৩]

শেষে তাই হুমরার হাত থেকে নদের চাঁদকে বাঁচানোর জন্য মহুয়া নিজে প্রাণ দিয়েছে। হুমরার হাতে মরতে হয়েছে নদের চাঁদকে। তবে পালাতে নদের চাঁদের দিক থেকে তেমন কোনো বাঁধা আসতে দেখা যায় না, কারণ সে বাড়ি ছেড়েছে তীর্থ যাবার কথা বলে।

প্রাচীনকাল থেকেই নারীকে সৌন্দর্যের মূর্তি রুপে দেখানো হয়েছে। স্বর্গের অপ্সরা হোক কিংবা সামান্য নারী তার পরিচয় সে সুন্দর। এপ্রসঙ্গে প্রথিতযশা সাহিত্য গবেষক কালিদাস রায় বলেছেন-

'আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে একটা কথা চলিত আছে- "আপনা মাংসে হরিণা বৈরী" যে বিধাতা সুস্বাদু মাংস দিয়া বনের হরিণীকে গরিয়াছেন- তিনি-ই নারীর দেহে রূপযৌবন দিয়েছেন। এই রূপযৌবনই নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ। কখনও কখনও সৌভাগ্যের নিদান, কিন্তু অনেক স্থলে ইহাই পরম শত্রু।'[২৪]

পুরুষের লালসা সেই শত্রু। সমাজের হত্তাকত্তা পুরুষ ভেবেছে নারীর সৌন্দর্য তাদের আস্বাদনের জন্য। এই মানসিকতাই পালাগুলিতে ট্র্যাজিডি সৃষ্টি করেছ। পালাগুলিতে নায়িকার সৌন্দর্য 'কাঞ্চা সোনা' এরফলেই তাদের জীবনে নেমে এসেছে দুঃখ।

'মহুয়া পালা'তে সাধুর লালসার শিকার হয়েছে মহুয়া। মহুয়াকে পাওয়ার আশায় নদের চাঁদকে নদীর জলে ফেলে দিতে দ্বিতীয়বার ভাবেনি তারা। কিন্তু মহুয়া যেমন প্রেমের জন্যে নিজের প্রাণ দিতেও পারে তেমনি প্রেমকে বাঁচাবার জন্যে প্রান নিতেও পারে, তাই সাধুদের বিষপান খাইয়ে তাদের হাত থেকে বেঁচেছে মহুয়া এবং নদের চাঁদকেউ বাঁচিয়েছে। এই শেষ নয় আবার তাকে পুরুষের লালসার শিকার হতে হয়েছে সন্ন্যাসীর কাছে।

'মুনি বলে "কন্যা তুমি আমার কথা শুনি দিয়া মন।
পায়ে ধরি মাগি কন্যা তোমার যইবন।।
তোমার রূপেতে আরে কন্যা যোগীর ভঙ্গে যুগ।
এমন ফুলের মধু করাও মোরে ভোগ।।'[২৫]

শুধু মুহুয়া নয় মলুয়াও দেওয়ানের নজরে পড়েছে ফলে চাঁদ বিনোদের জীবনে নেমে এসেছে অসম্ভব রকমের আর্থিক অনটন।

'শাক সাজনা খাইনা তবে দুই দিন যায়।
দেখিয়া সোয়ামীর মুখ বুক ফ্যাটা যায়।।
আপনি উপবাস থাইক্যা পরে নাহি কয়।
সোয়ামী-শাশুড়ীর দুঃখ আর কত সয়।।'[২৬]

এখানেই শেষ নয় চাঁদকে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়ান মলুয়াকে অপহরণ করে। তিনমাস দেওয়ানের ঘরে থেকেও মলুয়া তার সতিত্ব রক্ষা করেছিল। কিন্তু তার সত্ত্বেও স্বামীর সাথে সুখের ঘর সে করতে পারেনি। সমাজে মর্যাদা রক্ষার তাগিদে স্বামী তাকে ত্যাগ করলো। সেই স্বামীর মান রক্ষার জন্যই সে আত্মহত্যা করলো। দেহ মন সব সমর্পণ করে ভালবাসার পুরস্কার স্বরূপ মলুয়া পেল মৃত্যু। দেওয়ানের সাথে লড়াই করে বাঁচলেও স্বামীর কাছে সে নিরুপায়।। প্রাচীন কাল থেকেই নারী প্রেমের জন্য সংসারের জন্য সর্বংসহা মূর্তি দেখতেই আমরা অঅভ্যস্ত।

'চন্দ্রাবতী পালা'তে নায়ক জয়ানন্দ প্রথমে তার ছোট বেলার সঙ্গি চন্দ্রাবতীর রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে প্রেমে পরে। আবার হঠাৎ মুসলিম যুবতীর সৌন্দর্যে অভিভুত হয়ে তাকে বিয়ে করে।

'অনাচার কৈল জামাই অতি দুরাচার।
যবতী করিয়া বিয়া জাতি কৈল মার।।'[২৭]

এই যুবতীর মোহ যখন কেটে গেছে, তাকে ফেলে জয়ানন্দ আবার চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে এসেছে। এভাবেই জয়ানন্দ তার নিজের চরিত্রের দোষএর জন্য দুই নারীর জীবনকে নষ্ট করেছে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-

'জয়ানন্দের চরিত্রের দৃঢ়তা নাই, সেই প্রেমেও নিষ্ঠা নাই, অতএব সে যেমন তাঁহার প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কামিনীতে আসক্ত হইতে পারে তেমনিই সে আকস্মিক উত্তেজনায় জীবনও বিসর্জন দিতে পারে। কিন্তু এই জীবন বিসর্জনের তাহার আত্মহত্যার পাপই বৃদ্ধি পাইয়াছে কোনো গৌরব প্রকাশ পায় নাই।'[২৮]

তার চরিত্রর জন্যই চন্দ্রাবতীর প্রেম পরিণতি পেলো না। এই পালাতে সামাজিক আঘাতের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে ব্যক্তি কেন্দ্রিক আঘাত। এই আঘাত চন্দ্রাবতীকে ভেতর থেকে শেষ করে দিয়েছে তাই দ্বিতীয়বার সে আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারেনি। সারাজীবন অবিবাহিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জয়ানন্দের বিশ্বাসঘাতকতা তাকে ভিতর থেকে এতটাই কঠোর করে দিয়েছে যে জয়ানন্দের মৃত্যুও তার চোখে জল আনতে পারেনি। চন্দ্রাবতী আসলে এক শিক্ষিতা আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বময়ী নারী। তার এই সিধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাই তাকে অনান্য নারীর থেকে আলাদা করেছে। জয়ানন্দের প্রতি প্রেম তাকে জয়ানন্দের কাছে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেও তার প্রতিবাদী সত্তা তাকে ধরে রেখেছে।

উপসংহার :

মধ্যযুগের দেবদেবী নির্ভর সাহিত্যের ভিড়ে, এমন কিছু নিদর্শন আছে যেখানে মানবসত্তাকে প্রধান করে দেখানো হয়েছে। এই নিবন্ধে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র প্রতিনিধি স্থানীয় পালাগুলি অবলম্বনে সেই ছবিই উঠে এসেছে। তবে এই পালাগুলিকে আধুনিক এই একবিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশকে দাঁড়িয়ে বিচার করলে চলবে না। আজকের সমাজকে অস্বীকার করে কোন প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের সম্পর্ককে গড়ে তুলতে চাইলে তা পূর্ণতা পায়। তাই 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'মহুয়া' 'মলুয়ার' 'চন্দ্রাবতী' মানব-মানবীর স্বাধীন প্রণয়ের এই প্রতিনিধি স্থানীয় পালাগুলিকে বুঝতে গেলে আমাদের তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে সমাজকে দেখতে হবে। সামাজ তখন অন্তর্মুখী সংস্কারাচ্ছন্ন, অস্পৃশ্যতা, বর্ণাশ্রমের মতো কু-প্রথা বাসা বেধে আছে । সেই সমাজে থেকেও পালাকরারা স্রোতের সাথে গা ভাসান নি। তাঁরা কাহিনি অতারা কাহিনী ও চরিত্র গুলি কে অঙ্কন করেছেন স্বতন্ত্রভাবে।

আমাদের আলোচ্য পালাগুলির চরিত্র যেমন- নদের চাঁদ, মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী প্রত্যেককে চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পন্ন মানুষ। তারা নিজেদের প্রেমকে পাওয়ার জন্য বিপরীতে থাকা শক্তিশালী সমাজের সাথে লড়াই করেছে শেষ দিন পর্যন্ত। অর্থাৎ তারা সমাজের ধার্য করা পরিণতিতে নিজেদের বিলিয়ে দেয়নি। ব্যক্তি ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছে। চন্দ্রাবতী শিক্ষিতা নারী তাই তার আত্মমর্যাদাবোধ তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছে।কিন্তু মহুয়া, মলুয়ার ক্ষেত্রে তা নয় তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। তারা তাদের সংগ্রামে পরাজিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই পরাজয়ের মধ্য দিয়েই তাদের প্রেম উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। তাদের এই লড়াই তাদেরকে

সমাজের আর পাঁচটা মানুষের থেকে আলাদা করেছে। পালাকাররা বাস্তব জীবন থেকেই কাহিনী আরোহন করেন।অর্থাৎ তারা এই প্রতিবাদী চরিত্রদের কেউ সমাজের মধ্যে থেকে তুলে এনেছেন। তাঁরা লড়াইয়ের এই কাহিনিগুলির মধ্য দিয়েই সমাজের কুসংস্কারের অচলায়তনকে ভেঙেফেলার প্রয়াস আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. দীনেশচন্দ্র সেন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'(প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), পৃষ্ঠা:৮
২. দীনেশচন্দ্র সেন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'(প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), পৃষ্ঠা:২২
৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস(দ্বিতীয় খন্ড),পৃষ্ঠা: ২৬০
৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩০৯
৫. দীনেশচন্দ্র সেন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'(প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), পৃষ্ঠা: ৮৬
৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ১১৮
৭. তদেব, পৃষ্ঠা: ৮
৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ১১৪
৯. ক্ষেত্র গুপ্ত, (দ্বিতীয়াংশ), 'প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন', পৃষ্ঠা: ১৫৯
১০. অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', পৃষ্ঠা: ২২৮
১১ দীনেশচন্দ্র সেন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'(প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), পৃষ্ঠা: ১৯
১২. তদেব,পৃষ্ঠা: ২৫
১৩. তদেব,পৃষ্ঠা: ৪১
১৪. তদেব,পৃষ্ঠা: ভূমিকা
১৫. তদেব,পৃষ্ঠা: ৯৯
১৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোক সাহিত্য', পৃষ্ঠা: ২৮৫
১৭. দীনেশচন্দ্র সেন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'(প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), পৃষ্ঠা: ১১৩
১৮. তদেব,পৃষ্ঠা: ১১৮
১৯. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন', পৃষ্ঠা: ১৬০
২০. কালিদাস রায়, 'প্রাচীনবঙ্গ-সাহিত্য', পৃষ্ঠা: ৩২২
২১. দীনেশচন্দ্র সেন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'(প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), পৃষ্ঠা: ১৫
২২. তদেব,পৃষ্ঠা : ১৬
২৩. তদেব,পৃষ্ঠা: ৩৯
২৪. কালিদাস রায়, 'প্রাচীনবঙ্গ-সাহিত্য', পৃষ্ঠা: ৩৩০
২৫. দীনেশচন্দ্র সেন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'(প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), পৃষ্ঠা: ৩৪
২৬. তদেব,পৃষ্ঠা: ৮০
২৭. তদেব,পৃষ্ঠা: ১১৩

২৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোক সাহিত্য', পৃষ্ঠা: ২৮৬

গ্রন্থ পঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১. দীনেশচন্দ্র সেন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'(প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮

সহায়ক গ্রন্থ:

১. অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬-২০১৭

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোক সাহিত্য', কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪

৩. আহমেদ শরীফ,'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ',ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০০

৪. কালিদাস রায়, 'প্রাচীনবঙ্গ-সাহিত্য',কলকাতা: দি নিউ প্রেস, ১৩৫৭

৫. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মধ্যযুগে বাঙ্গালা', কলকাতা: দেজ পাবলিশিং,২০১৫

৬. গোপাল হালদার, 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা'(প্রথম খন্ড), কলকাতা:এম এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬০

৭. তমোনাশচন্দ্র দাস গুপ্ত, 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

৮. বরুণকুমার চক্রবর্তী, 'গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য', কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ১৯৯৩

৯. বরুণকুমার চক্রবর্তী, 'বাংলা লোকোসাহিত্য চর্চার ইতহাস', কলকাতা:পুস্তক বিপনি, ২০১৭

১০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস(দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৩

১১. রত্নদুতি গিরি, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', কলকাতা: প্রাঞ্জা প্রাকাশন, ২০১৯

১২. সুকুমার সেন, 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী', কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩২৫

১৩. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সি, ১৯৪০

১৪. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন', কলকাতা: গ্রন্থ নিলয়, ১৩৬৬

চিত্রকল্প, জীবনানন্দ দাশ ও ‘রূপসী বাংলা’

রুদ্রজিৎ দাস ঠাকুর
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে বাংলা কবিতার পালাবদলে কবি জীবনানন্দ দাশের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা গীতিকবিতার সুর অনেকটাই বদলে যায় কবি জীবনানন্দের হাত ধরে। শুরু হয় আধুনিক কবিতার পথ চলা। তাঁর কবিতায় শব্দসৌকুমার্য, বাক্যবিন্যাস, যতিচিহ্নের ব্যবহার স্পষ্ট করে দেয় বাস্তবের নির্মম রূঢ় সত্যকে। তাঁর কবিতা নৈর্ব্যক্তিক নয়। ব্যাক্তির জীবন তাঁর কবিতায় পূর্ণতা পেলেও তা আধ্যাত্মিক জগতের বন্ধন ছিন্ন করে উপস্থাপিত হয়েছে এক ধূসর পৃথিবীতে, নষ্ট শসা আর পচা চালকুমড়োর ছাঁচে। যেখানে প্রশ্ন করা হয়েছে মানুষের অস্তিত্বকে। জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতির মায়াবী রূপ উপস্থিত থাকলেও, তা আচ্ছাদিত পরাবাস্তবতার মোড়কে। তাঁর কাব্যশৈলী কেবল বাংলা প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে হারিয়ে যায়নি, সেই সাথে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার স্মৃতি কিভাবে মানুষকে কুড়ে কুড়ে খায় তার ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত হয়েছে। সেইসূত্রে বলা যায় ‘রূপসী বাংলা’ প্রকৃত অর্থেই নির্জনতম কবির একান্ত নিজস্ব আর্তি। প্রকৃতির সাথে কবির এই একাত্ম হওয়া যেমন নিবিড় তেমনি চিত্ররূপময়। চিত্রকল্পের সংযোজনে ‘রূপসী বাংলা’ পাঠকচিত্তকে গন্ধ-বর্ণ-শব্দে মদিত এমন এক অপার্থিব জগতের কিনারায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় যেখানে পাঠকমন কেবলমাত্র প্রকৃতিবাদকে আশ্রয় করে বিকশিত হয় না, সেখানে ইমেজিস্‌ম পাঠকের নান্দনিক জগতের পরিধিকে সনাতনী চিন্তাচেতনা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে এক ছবির পৃথিবীর কাল্পনিক পরিমন্ডলে। আমার গবেষণার উদ্দেশ্য প্রকৃতির ছোট ছোট উপাদানগুলি তাঁর কবিতাকে কীভাবে চিত্ররূপময় করে তুলেছে তারই অনুসন্ধান।

সূচক শব্দ: ইমেজ, ইমেজিস্ট, চিত্র, চিত্রকল্প, রূপসী বাংলা, জীবনানন্দ দাশ, টি. এস. এলিয়ট, এজরা পাউন্ড

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥[১]

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্যে এজরা পাউন্ডের নেতৃত্বে ইমেজিস্ট আন্দোলন শুরু হলেও, ভারতীয় সাহিত্যে চিত্র ও চিত্রকল্পের ব্যবহার সুপ্রাচীন। কবি বাল্মিকীর আদি শ্লোকই ছিল একটি ছবি। ব্যাধের বাণে মিথুনরত পাখির মৃত্যু। একটি মর্মান্তিক ঘটনা দিয়ে কাব্য আরম্ভ। ঘটনাটি দেখেই আদিকবি বাল্মিকী পাখি দুটির প্রতি সহমর্মী হয়েছেন। ব্যাধকে দিয়েছেন অভিশাপ। প্রকাশ পেয়েছে কবির তাৎক্ষণিক ক্ষোভ। ছন্দোবদ্ধ পংক্তি দুটির মধ্যে কারুণ্য ও ক্রোধ একই সাথে ব্যক্ত। পংক্তিদ্বয়

একটি সাধারণ ছবি ও একটি অসাধারণ অনুভূতির সমন্বয়ে এমন একটি শ্রুতিমাধুর্য ছন্দমন্ডিত বাক্যবন্ধ যার মধ্যে উদ্‌যাপিত বাল্মিকীর কবিত্বশক্তি। এই ছবিনির্ভর ইন্দ্রিয়ানুভূতিই যে পরবর্তীকালে নয়া আঙ্গিকে চিত্র ও চিত্রকল্প রূপে আলোচিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবে একথা অনস্বীকার্য যে এজরা পাউন্ড, এমি লোয়েল, টি. ই. হিউম, টি. এস. এলিয়ট যেভাবে এই ইমেজিস্ট আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার থেকে ভারতীয় চিত্রকল্পবাদের ধারণা অনেকাংশে আলাদা। কারণ পাশ্চাত্যে গড়ে ওঠা চিত্রকল্পবাদে কাব্যব্যঞ্জনা প্রধানত ইন্দ্রিয়বেদী হলেও, তাদের প্রচেষ্টায় যে 'পোয়েট্রি' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে তাঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল আবেগপ্রবণ কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তাই রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় নাটকে বাক্‌প্রতিমা এলেও, যেহেতু তা আনন্দ ও আবেগের অনুসারী, তাই তা বিংশ শতাব্দীর চিত্রকল্পবাদের সমকক্ষ নয়। অন্যদিকে জীবনানন্দের কবিতায় পাশ্চাত্য ইমেজিস্‌ম চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। হয়তো কবি সচেতনভাবেই সেই পথ অবলম্বন করেছেন কিংবা পরবর্তীকালের সমালোচকেরা তাঁর কবিতায় খুঁজে পেয়েছেন ইমেজিস্ট কবিতার বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জীবনানন্দ নিজেকে সুরলিয়ালিস্টিক কবি বলে উল্লেখ করেছিলেন।

The Perfect Critic কে? সময়ের সাথে সাথে সমালোচনা ক্ষেত্রে নানা বদল ঘটলেও ইমেজিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ কবি টি. এস. এলিয়ট মনে করতেন কবিই যথার্থ সমালোচক। অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রকৃত স্রষ্টাই পারেন তার সৃষ্টিকে বুঝতে। "when the critics are themselves poet, it will be suspected that they have formed their critical statements with a view of justifying their poetic practice."[২] বক্তব্যটি জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে অনায়াসে খাটে। জীবনানন্দের 'সমারূঢ়' কবিতাটি পাঠ করলেই বোঝা যায় কবি ও সমালোচকের মধ্যে যে সুক্ষ্ম পার্থক্যে তিনি বিশ্বাস করতেন তার বীজ কত সুগভীর। অন্যদিকে টি. এস. এলিয়টের চিন্তা চেতনার বিকাশে ভারতীয় সাহিত্য দর্শনের যে প্রভাব রয়েছে তা তিনি বহুবার স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ এই ইমেজিস্‌ম আঙ্গিকের দিক থেকে রূপাবয়ব নির্ভর হলেও ইমেজিস্ট কবিরা সমালোচনার ধারায় আত্মসমীক্ষারই পক্ষপাতী ছিলেন। লক্ষ্মণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইমেজিস্ট কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে এতে থাকবে,

'A belief in short poem, structured by the single image or metaphor and a rhythm of cadences, presenting for direct apprehension by the reader an object or scene from the external world, and refusing to implicate the poem's effect in extended abstract meaning.'[৩]

'Imagism' বা চিত্রকল্পবাদ পাউন্ডের সাহিত্যসমালোচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মিল্টনের বাগাড়ম্বর এবং আলংকারিক কাব্যশৈলীর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এজরা পাউন্ড। সেই বিরোধিতা থেকেই তিনি এই ধারণাই পেশ করেন যে, ইমেজ সৃষ্টির মধ্যেই আসল কবিত্ব। তিনি বলেন, "it is better to present one image in a lifetime than to produce voluminous works."[৪] তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Sprit of Romance-এ কবিতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "(poetry) is a short of inspired mathematics, which gives equations, not for abstract figures...but for the human emotions."[৫] পাউন্ডের এই ধারণাটি প্রায় এক দশক পর এলিয়ট 'objective correlative' বলে এক নতুন পরিভাষায় ব্যক্ত করেন। যদিও শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেন ওয়শিংটন অ্যালস্টন। সেকথা জানান এলিয়টই তাঁর Elizabethan Dramatists গ্রন্থের মুখবন্ধে। এই objective correlative-কে এলিয়ট সজ্ঞায়িত করেন এইভাবে— "a set of objects or situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion."[৬] এলিয়েটের সর্বাপেক্ষা পাউন্ড প্রভাবিত কাব্যগ্রন্থ 'The Waste Land'-এ চিত্রকল্পের নানা সমাহার লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,

"Do
You know nothing? Do you see nothing? Do you
Remember
"Nothing?"
I remember
Those are pearls that were his eyes."[৭]

পরবর্তীকালে সিসিল ডে. লিউইস নামক কবি ও তাত্ত্বিক 'The Poetic Image' নামে একটি বই লেখেন। সেখানে তিনি অভিমত দেন 'Imagist Poetry' না হলেও যে কোনো কবির কবিতাতেই চিত্রকল্প পাওয়া যেতে পারে। সেগুলিকে বলে 'Poetic Image'। ইয়েটস ইমেজ সম্পর্কে আবার অভিমত দেন যে, wisdom speaks first in images. এককথায় রোমান্টিকভাবকে অতিক্রম করে এক নতুন আঙ্গিকে অল্পকথায় যথার্থভাবকে প্রকাশ করার ইচ্ছে নিয়েই ইমেজিস্ট কবিরা কবিতা রচনা করেছিলেন। রবিন পাল তাঁর 'ইমেজিসম ও ভর্টিসিজম কাব্য আন্দোলন ও তত্ত্বভাবনা' প্রবন্ধে ইমেজিস্টরা কী চান বলতে গিয়ে ফ্লিন্টের বক্তব্য অনুসরণে লিখেছেন,

"(ক) বস্তু (thing) তা সে আত্মলীন বা বস্তুনিষ্ঠ যাই হোক তার প্রকাশ সরাসরি হওয়া বাঞ্ছনীয়,

(খ) উপস্থাপনে অপ্রয়োজনীয় একটি শব্দও ব্যবহার না করা,

(গ) লয় (rhythm) প্রসঙ্গে বলা যায় এরা গীতল বাক্যাংশে তাল রাখবেন, তবে তালবাদ্য (metro nome) অনুযায়ী নয়।"[৮]

সেই সময় কবি ও চিত্রশিল্পীদের যৌথ উদ্যোগে ভার্টিসিজম বলে এক নতুন ধারার আন্দোলনের সূচনা ঘটে। মূলত ভবিষ্যবাদের প্রতি আগ্রহ থেকেই এর উদ্ভব। লিউয়িস, গদিয়ের, হিউম, পাউন্ড এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। 'Blast' নামে এঁরা একটি পত্রিকাও বের করেন। এদের সম্পাদকীয় নীতি ছিল কারোর প্রশংসা কারোর নিন্দা। বাংলার মতোই সেইসময় পাশ্চাত্যেও 'Blast' পত্রিকার প্রথম দুটো সংখ্যায় যে বিস্ফোরক মন্তব্যগুলি লেখা হয়েছিল তা ছিল বার্গসঁ ও রবীন্দ্রনাথ বিরোধী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সময়ের সাথে চিত্রকল্পবাদের নিরন্তর বিবর্তন চলতে থাকলেও টি. এস. এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, টি. ই. হিউমের কবিতায় বাঙালি কবিরা যে আজও মজে আছেন তা না বললেই নয়।

বর্তমান বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ইমেজিস্‌মকে চিত্রকল্পবাদ বলে পরিগণিত করলেও ১৯৩৫ সালে 'চিত্রকল্প' শব্দটি 'পরিচয়' পত্রিকার 'সুন্দর ও বাস্তব' প্রবন্ধে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। তিনি লিখেছেন,

"সৌন্দর্য, তা সে প্রাকৃতই হোক আর শিল্পপ্রসূতই হোক, মানব-মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে বাধ্য, তাতে জীবনের চিত্রল ছায়া পড়বেই। এ-যুগের শিল্পীদের চিত্রকল্প (imagery) ও মানসপ্রতীক বিশ্লেষণ ক'রে ফ্রয়েড তাতে অবলুপ্ত মিশরী সভ্যতার আভাস পেয়েছেন—সে-কথার উল্লেখ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন।"[৯]

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শব্দটি পছন্দ হয়নি। তিনি মনে করেছিলেন 'কল্পচিত্র' শব্দটি সঠিক। ডঃ আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চিত্রকল্প' প্রবন্ধে চিত্রকল্প শব্দের বদলে 'চিত্রজল্প' শব্দটি ব্যবহার করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে 'চিত্রজল্প' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ভাষার মাধ্যমে চিত্রকে অনুভূতিগোচর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা 'চিত্রজল্প'-এর কাজ। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর 'অলংকার চন্দ্রিকা' গ্রন্থে ইমেজ অর্থে 'বাঙ্‌মূর্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। আবার জগদীশ ভট্টাচার্য ইমেজকে 'রূপকল্প' বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ অমলেন্দু বসু 'বাক্‌প্রতিমা', ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত 'ভাবরূপচিত্র' এবং শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায় 'মানস প্রতিবিম্ব' অভিধায় ইমেজকে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বিষ্ণু দে অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকই এই ইমেজারিকে প্রতিমা বলে গণ্য করেছেন। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে দিয়ে একই সাথে ভাব ও চিত্র প্রকাশ পায় বলে এই ইমেজারিকে ভাব রূপ চিত্রের প্রকাশকও বলা চলে। এই ইমেজারির নানা প্রতিশব্দ থাকলেও চিত্রকল্প শব্দটি যেমন শ্রুতিমধুর তেমনি বক্তব্যব্যঞ্জক। 'চিত্র' শব্দটির মধ্যে রয়েছে রেখা ও রঙের অবয়বের দ্যোতনা। সহজ কথায় কবির ভাবচেতনার বাঙ্ময় প্রকাশই ইমেজ। এই ইমেজ হ'ল একটি সংবেদনময় অনুভবের আইডিয়া। অর্থ, সঙ্গীত ও চিত্রের সমন্বয়ে কবিতার শব্দবিন্যাস স্রষ্টা-হৃদয়ের গভীরতম বোধকে ইঙ্গিত করে। চিত্রকল্প কথাটির মধ্যে ইন্দ্রিয় সংবেদনার ইঙ্গিত বেশ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। চিত্র= চিৎ—ত্রৈ +

অল্— চিত্র অর্থে যা চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করে। আর কল্প শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থে কল্প; to create, সৃষ্টি করা; মূলত মনোলোকের ভাবনার সাহায্যে যা সৃষ্টি করা হয় তাই কল্প। আর 'কল্প' অর্থে 'তৎতুল্য'; অর্থাৎ চিত্র তুল্য যা তাই চিত্রকল্প। অমলেন্দু বসু আবার সর্বজনস্বীকৃত এই 'চিত্রকল্প' শব্দটির প্রতি আপত্তি জানিয়ে কিছু যুক্তি খাড়া করেছেন। যথা, "চিত্রকল্প' শব্দটিতে কেবল একশ্রেণীর ইমেজই সূচিত হয়, যে ইমেজ Visual Imagination (দৃষ্টিনির্ভর কল্পনাশক্তি) দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, যার ফলে কাব্যানুভূতির বাংলায় রূপটি শুধু চিত্রধর্মী বলে মনে করা হয়েছে। অথচ কবিকল্পনার বাহন যে ভাষা, যে বাক্‌মালা তাতে দৃশ্যানুভূতি যেমন সম্ভব, শ্রবণানুভূতি, ঘ্রাণানুভূতি, স্পর্শানুভূতি, স্বাদানুভূতিও তেমনি সম্ভব, অর্থাৎ কুশলী ভাষা-প্রয়োগে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিই উদ্বুদ্ধ হতে পারে। ...এখানে আমার বলার কথা হচ্ছে যে ভাষা মাধ্যমে চিত্রানুভূতি সৃষ্টি করা ভাষার একটি মাত্রই নিপুণতা। তাছাড়া অন্যবিধ নিপুণতাও কবির সাধ্য। অতএব ইমেজ অর্থে চিত্রকল্প শব্দটির প্রয়োগে ইমেজ ভাবনার প্রসারতা ও জটিলতা সংকীর্ণ ও পঙ্গু করে ফেলা হবে।"[১০]

বাংলা সাহিত্যে বহু কবির লেখা কবিতাতেই চিত্রকল্প এসেছে। শুধুমাত্র আধুনিক কবিতার মধ্যে চিত্রকল্প এসেছে এমন নয়। গীতিকবিতার ধারাতেও বর্তমান চিত্রধর্মীতা। কিন্তু ইমেজিস্ট কবিরা যে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তা পূর্ববর্তী গীতিকবিতাতে নেই। কিন্তু বাক্‌প্রতিমা নির্ভর কাব্যপ্রবণতা উনিশ শতকের কবিতাতেও পরিলক্ষিত হয়।

গোলাপের দলে দলে পড়িয়াছে হিমরাশি
আদরে দুলায় শাখা প্রভাত-পবন আসি;

(শোক- অক্ষয়কুমার বড়াল)

বুঝি গো প্রেমের সিন্ধু, হৃদি তোমারেই চাহে,
বুঝিয়া বুঝিতে নারি, ডুবিয়া অজ্ঞান মোহে।
এস নাথ, এস প্রাণে, আত্মার মিলন দানে
পূর্ণ কর এ অভাব এ অনন্ত তৃষা!

(অনন্ত পিপাসা- স্বর্ণকুমারী দেবী)

আমিও এসেছি বালা!
প্রেমের প্রফুল্ল মালা,
সৌরভে আকুল হয়ে পারি নি পরাতে গায়;
সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাঙা পায়।

(সাধের আসন- বিহারীলাল চক্রবর্তী)

উনিশ শতকের গীতিকবিতায় সামান্য কিছু চিত্রের কথা এলেও সেখানে চিত্রধর্মীতা বা চিত্রকল্প প্রায় নেই বললেই চলে। তবে চিত্রকল্প নামক কোন একটা শৈলীর আভাস বর্তমান। টুকরো টুকরো ছবি ফুটে উঠলেও তা যতটা ভাবব্যঞ্জক ততটা ভাবরূপচিত্র

নয়। কবির অন্তরের আবেদন প্রকাশ পেলেও তা সোজাসাপ্টা, এবং একই কথার পুনরাবৃত্তি। ফলে চরণগুলি কাব্যময় হলেও এগুলিতে ইমেজারির বৈশিষ্ট্য নগণ্য। আধুনিক কবিতায় ইমেজারির মাধ্যমে কবির মনের ভাব ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইমেজিস্ট কবিরা রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতায় অংশগ্রহণ করলেও, বাংলা কবিতার সন্ধিক্ষণ পর্বে রবীন্দ্রনাথ যা সৃষ্টি করে গেছেন তাতে ইমেজ ও ইমেজারি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রতিমার কোন অভাব নেই।

নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে।

(নিষ্ফল কামনা- মানসী)

যেতে যেতে পথপাশে
পানাপুকুরের গন্ধ আসে,
সেই গন্ধে পায় মন
বহুদিনরজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।

(ঘরছাড়া- সেঁজুতি)

আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক,
আগুনের ডাক,
পাঁজরের-উপরে-আছাড়-খাওয়া
মরণসাগরের ডাক,
ঘরের-শিকল-নাড়া উদাসি হাওয়ার ডাক।...
কালবৈশাখীর ঘূর্ণি-মার-খাওয়া
অরণ্যের বকুনি।

(বাঁশিওয়ালা- শ্যামলী)

বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা।।

(গীতবিতান)

যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে;
দাঁড়াও বারেক, দাঁড়াও হৃদয়-আসনে।

(গীতবিতান)

রাজা: "আমি এক প্রকান্ত মরুভূমি তোমার মত একটি ছোট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।"

(রক্তকরবী)

পঞ্চক: "এই আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার রক্তের ভিতরে গিয়ে কথা কচ্ছে।"

(অচলায়তন)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন চিত্ররূপময়। তাঁর কাব্য যেন ইম্প্রেসনিস্টদের তুলিতে আঁকা ছবি। অসংলগ্ন ছেঁড়া ছেঁড়া টানের মতো। খন্ডাংশে তাঁর বক্তব্য বুঝে ওঠা কষ্টসাধ্য। কিন্তু সার্বিক পরিধিতে বোঝা যায় তাঁর কবিতার জগত এক অদ্ভুত অ্যাবসার্ড সৌন্দর্যে মুখরিত। সামগ্রিক আবেদন গড়ে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। তিনি মনে করতেন উপমাই কবিত্ব। প্রচলিত উপমানকে উপমেয় হিসেবে এবং উপমেয়কে তিনি উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবির মনের গভীরে এই উপমাগুলির জন্ম, এগুলি যেন কাব্যসাগরের সঞ্চিত স্ফোটধ্বনি। আসলে তিনি ছিলেন এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি। জীবনানন্দের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অসংগতিপূর্ণ শব্দের ব্যবহার, যতিচিহ্নের অরাজকতা এবং গদ্যশব্দের ব্যবহার। প্রচলিত পদ্যশব্দ থেকে তিনি অনেকটাই সরে এসেছিলেন। লাগামছাড়া এই যতিচিহ্নগুলি আপাতপাঠে খাপছাড়া মনে হলেও, রান্নায় যেমন লবনের প্রয়োজনীয়তা ঠিক তেমনি জীবনানন্দের কবিতায় যতিচিহ্নের মাহাত্ম্য। কবিপ্রসিদ্ধির অনুসরণ না করেই অতিচলিত, গ্রাম্য, দেশজ শব্দ নিয়ে তিনি এক নিজস্ব শব্দভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন। সংস্কৃত শব্দের প্রতি বাংলা ভাষার যে ঋণভার তা যেন খানিক কম করতে চেয়েছেন জীবনানন্দ তাঁর কবিতায়। বলা বাহুল্য, এই সময় আধুনিক কবিদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুখের ভাষা ও কাব্যের ভাষার মধ্যে ব্যবধান বিলোপ। আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কাব্যেই সমকালীন যুগের সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পরিচয়টি ফুটে উঠেছে। ইয়েটস একদা বলেছিলেন, 'man can embody truth but he cannot know it'[১১]। জীবনানন্দের কাব্য যেন তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। এলিয়ট 'The Waste Land'-এর চিত্রকল্পে বর্তমান বন্ধ্যা যুগকে দেখেছিলেন, জীবনানন্দ দেখেছেন হেমন্তের চিত্রকল্পে। হেমন্তের নিঃস্ব, রিক্ত, অনুর্বর রূপ এই ক্ষয়িষ্ণু, সৃষ্টিসম্ভাবনাহীন যুগেরই প্রতিবিম্ব।

প্রথম ফসল গেছে ঘরে,—

হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল;
অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে
হিম হ'ইয়ে আসে
বাঁশপাতা— মরা ঘাস— আকাশের তারা!
বরফের মত চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা!
ধানক্ষেতে— মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা! (পেঁচা— মাঠের গল্প, মহাপৃথিবী)

বাংলার প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ কবি এ দেশের সৌন্দর্যের ক্রমাবলুপ্তি লক্ষ্য করে ব্যথিত হতেন, অতীতের রূপ যেন ক্রমেই নষ্ট হতে চলেছে, সেই বেদনাও তিনি ‘রূপসী বাংলা’র সনেটে প্রকাশ করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে গ্রামবাংলার বিজন পথের বর্ণনায় এমন একটি বিষণ্ণ উপমার সংস্থান করেছেন, যার ছবি পাঠকের হৃদয়ে অমলীন।

বুঝি নাকো চিল কেন কাঁদে;
পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি, হায় এমন বিজন
সাদা পথ— সোঁদা পথ— বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে
চলে গেছে— শ্মশানের পারে বুঝি;— (গোলপাতা চাউনির বুক চুমে)

বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে গ্রামবাংলার মেঠো পথ— সাধারণত সে পথ ফাঁকা, নির্জন; মেঠো বলেই সেখানে সোঁদা গন্ধ। কিন্তু কবি বাঁশঝাড়ে স্বল্পালোকিত পথটুকুকে নারীর অবগুণ্ঠিত মুখের মতো কিছু ঢাকা মনে হয়েছে। আর যেহেতু অন্তর্লগ্ন বিষণ্ণতার বোধ-ই বর্ণিতব্য বিষয়, তাই সে নারী বিধবা বলেই কল্পিত। আর পথটি চলে গেছে শ্মশানের দিকে। সাধারণ একটি দৃশ্য। কিন্তু এই সামান্য দৃশ্যে অসাধারণ উপমার প্রয়োগ কবিতাটিকে প্রকৃত অর্থেই করে দেয় চিত্ররূপময়। ‘রূপসী বাংলা’র কবিতাগুলিতে কবি বাংলা প্রকৃতিকে যেভাবে দেখেছেন তা যতটা নয় পল্লীপ্রকৃতির রূপকেন্দ্রিক রোমান্টিক চিন্তাধারার কবিতা তা থেকে অধিক বিষণ্ণ নির্লিপ্ত পৃথিবীর এক চিত্রকল্পময় স্বরূপের নিদর্শন। দেবেশ রায় রূপসী বাংলা সম্পাদনকালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে। যথা,

‘১. পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে যে-খাতাটির ৭৩টির কবিতা থেকে ৬১টি কবিতা নিয়ে ‘রূপসী বাংলা’ তৈরি হয়েছিল তার প্রথম পৃষ্ঠায় জীবনানন্দ লিখে রেখেছেন March 1934। খাতায় মোট ৭৬ পৃষ্ঠা। কবিতার সংখ্যা দেয়া আছে পরপর ৭৩ পর্যন্ত। তার মধ্যে ১ ও ২-সংখ্যক আর ১৩ ও ১৪-সংখ্যক কবিতার পাতা দুটি ছেঁড়া—পাতার বাকি অংশ এখনও খাতায় লেগে আছে। কবিতাগুলোতে ছোটোখাটো সংশোধন কিন্তু দেখেই বোঝা যায় কবি বড় কোনো সংস্কারে হাত দেননি।

[প্রচলিত ‘রূপসী বাংলা’র (১৯৫৭) রচনাকাল লেখা আছে: মার্চ ১৯৩২। কাজেই ‘রূপসী বাংলা’র রচনাকালের ভ্রান্তি অপনোদিত হ’লো।]

২. ‘রূপসী বাংলা’-র ভূমিকা-কবিতা বলে এতদিন যে-কবিতাটি পড়ে আসা গেছে, এখন পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে সেটা কোনো গোটা কবিতাই নয়। পাণ্ডুলিপির ৭৩-সংখ্যক কবিতাটি পাঁচটি টানা চরণের। তাকে ‘রূপসী বাংলা’তে ভেঙে ভেঙে ন’টি চরণে সাজানো হয়েছে। তার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে পাণ্ডুলিপির ৬৮-সংখ্যক চার চরণের কবিতাটি।

[অর্থাৎ ভূমিকা-কবিতাটি আসলে দুটি সম্পূর্ণ কবিতা। তাদের রূপকল্প এরকম:

এক

সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাক' জানি—এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন—সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে
আমি চলে যাব বলে চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে? লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে না কি তার লক্ষ্মীটির তরে
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!

দুই

চারিদিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব
খেয়া নৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে
পৃথিবীর এই গল্প বেঁচে রবে চিরকাল
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।]'[১২]

'ইমেজ'কে যদি কথার ছবি বা বাক্‌প্রতিমা ধরা যায়, তা হ'লে কবিতাকে বলতে হয় রূপ জগতের হুবহু অনুকৃতি। বস্তুর যথাযথ প্রতিফলন। ফটোগ্রাফির মতো কাব্যশরীরে বস্তুর বহিঃরূপের অনিবার্য প্রকাশ। কিন্তু কবিতা তো কেবল সমাজ-প্রকৃতি-জীবনের দর্পন নয়। কবিকল্পনায় চিত্রধর্ম এমনভাবে প্রকাশ পায় যে মানবীয় অনুভূতি নিছক একটি ছবিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। আসলে শব্দের চিত্রধর্মের অতিরিক্ত কিছু কবিতায় রূপায়িত হয়। কবির কল্পনা ও মনীষা বিশেষ ধরনের রূপায়নের ফলে বস্তু বহিরঙ্গের রূপের অনিবার্য দাবি অতিক্রম করে আনুষঙ্গিক ভাবানুভূতির উদ্ভাসন ঘটায়। যার ফলে 'বাক্‌চিত্র' পর্যবসিত হয় চিত্রকল্পে। উপর্যুক্ত কবিতাংশগুলিতে চিলের কান্না, নদীর শ্বাস, লক্ষ্মীপেঁচার গান, 'বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে', 'বরফের মত চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা', 'নরম গন্ধের ঢেউ', 'ভিজে গন্ধ' ইত্যাদি অংশ পাঠকমনে কেবল এক চিত্র উদ্দীপন জাগিয়ে তোলে না, বরং কবির অন্তর্লোক ও পাঠকের হৃদয় এমন এক দ্বন্দ্বে উপনীত নয় যার আবেদন অশরীরি। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্যে এমন অগুনতি ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন—যেগুলো আপাতভাবে অর্থহীন; কারণ নরম ঢেউয়ের গন্ধ বলে বাস্তবে আদৌ কিছু হয় না, কিন্তু মানবিক অনুভূতি যখন পার্থিব চিন্তার জগতকে অতিক্রম করে এক ভাবলেশহীন জগতে গিয়ে পৌঁছায় যেখানে প্রগাঢ় শান্তিবিরাজমান, কোন চঞ্চলজীবনবোধ যেখানে বাতুলতা সেখানে এর ভাবার্থ বস্তুপৃথিবীর পিছুটান এড়িয়ে মনের গভীরতম খাদে এক ভিন্ন আনন্দে উচ্ছ্বাসিত। সাধারণভাবে আমাদের যে পঞ্চেন্দ্রিয় তারাই এই চিত্রকল্পের নির্ণায়ক। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'র বেশিরভাগ কবিতাতে এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি অর্থাৎ দৃশ্যানুভূতি-শ্রবণানুভূতি-ঘ্রাণানুভূতি-স্পর্শানুভূতি-স্বাদানুভূতির ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর: অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে

ভোরের দোয়েলপাখি—　　　　　　　　　　(বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি)

জানিব না কত কাল উঠানে ঝরিবে এই হলুদ বাদামী
পাতাগুলো— মাদারের ডুমুরের— সোঁদা গন্ধ— বাংলার শ্বাস
বুকে নিয়ে তাহাদের;—　　　　　　　　　　(কোথাও চলিয়া যাব একদিন)

এখানে আকাশ নীল— নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম সাদা— রং তার আশ্বিনের আলোর মতন;
(এখানে আকাশ নীল)
মাঠ থেকে গাজন গানের ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাস
ভেসে আসে;— ডানা তুলে সাপমাসী উড়ে যায় আপনার মনে
আকন্দ বনের দিকে;　　　　　　　　　　(কত দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে)

দিকে দিকে চাল-ধোঁয়া গন্ধ মৃদু— ধূসর শাড়ির ক্ষীণ স্বর
শোনা যায়;— মানুষের হৃদয়ের পুরোনো নীরব
বেদনার গন্ধ ভাসে;— খড়ের চালের নিচে তুমি আর আমি
কত দিন মলিন আলোয় ব'সে দেখেছি বুঝেছি এই সব;
(কত দিন তুমি আমি)
দূর পৃথিবীর গন্ধে ভ'রে ওঠে আমার এ বাঙালির মন
আজ রাতে; একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর নক্ষত্রের তলে
অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে
তবুও সে ঘাস এই বাংলার অবিরল ঘাসের মতন
মউরির মৃদু গন্ধে ভ'রে রবে;　　　　　　　　　　(দূর পৃথিবীর গন্ধে)

এইখানে ধুন্দুল লতাতে
জোনাকি আসিবে শুধু; ঝিঁঝি শুধু, সারারাত কথা ক'বে ঘাসে আর ঘাসে;
বাদুর উড়িবে শুধু পাখনা ভিজায়ে নিয়ে শান্ত হয়ে রাতের বাতাসে;
(কোনোদিন দেখিব না তারে)
কেউ নাই কোনোদিকে— তবু যদি জ্যোৎস্নায় পেতে থাক কান
শুনিবে বাতাসে শব্দ: 'ঘোড়া চ'ড়ে কই যাও হে রায়রায়ান—'
(পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোন্‌খানে)
পৃথিবীর কোনো পথে: নরম ধানের গন্ধ— কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের

মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোঁয়া ভিজে হাত— শীত হাতখান
কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাস,— লাল লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা— এরি মাঝে বাংলার প্রাণ:
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।

(আকাশে সাতটি তারা)

১৯১৪ সালে ভার্টিসজম আর ইমেজিস্‌মকে সমার্থক বলে পাউন্ড ঘোষণা করেন। যদিও ভার্টিসিজমের বিরূপ সমালোচনা করেছিল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ইমেজিস্ট আন্দোলনে পরবর্তীকালে অ্যামি লাওয়েলের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেলে পাউন্ড একে 'amygism' আখ্যা দেন। কারণ ১৯১৪ থেকে ১৯১৭-তে ইমেজিস্‌ম আন্দোলন লাওয়েল ও তাঁর অনুগামীদের হাতে চলে যায়। সেই সময় লাওয়েল ১৯১৫ সালে 'Some Imagist Poets' বলে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এখানে পাউন্ডের কবিতা ছিল না। তবে পাউন্ড প্রভাবিত একটি দীর্ঘ ভূমিকা ছিল। তাতে যা বলা হল, তা অনেকাংশে ইমেজিস্ট কবিতার বৈশিষ্ট্য। প্রবন্ধে কথিত সেই বৈশিষ্ট্যগুলির অনুসরণ জীবনানন্দের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।

ক. সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষা ও শব্দ ব্যবহার হবে এইধারার কবিতার বিষয়। এবং ইমেজ কোন অলংকার নয়, ইমেজ কবিতার প্রাণসত্তা।

তাদের উপেক্ষা ক'রে কে যাবে বিদেশে বলো— উটির পর্বতে
যাব নাকো, দেখিব না পামগাছ মাথা নাড়ে সমুদ্রের গানে
কোন্ দেশে,—

(এই ডাঙা ছেড়ে হায়)

খ. মুক্ত ছন্দ বা free verse-এর বদলে নতুন মুডের নতুন ছন্দের জন্ম দিলেই নতুন ভাবপ্রকাশ করা সম্ভব হবে।

আর সেই সোনালি চিলের ডানা— ডানা তার আজো কি মাঠের কুয়াশায়
ভেসে আসে?— সেই ন্যাড়া অশ্বত্থের পাতা আজো চ'লে যায়
সন্ধ্যা সোনার মতো হলে?

(ভেবে ভেবে ব্যথা পাব)

গ. কবিতার বিষয় ইচ্ছেমতো নির্বাচন করা যাবে। অর্থাৎ কবির কাছে স্বাধীনতা থাকবে বিষয় নির্বাচনের। আধুনিক জীবনকে শৈল্পিক রূপ দেবার সুযোগ থাকবে কবিদের কাছে।

মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধূল,
কবেকার কোকিলের জানো কি তা? যখন মুকুন্দরাম, হায়,
লিখিতেছিলেন ব'সে দু'পহরে সাধের সে চণ্ডীকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়— থেমে থেমে যায়;—

(এখানে আকাশ নীল)

ঘ. কবিতায় ইমেজ হবে স্পষ্ট। কোন ঝাপসা অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। যা চিত্রকল্পের মাধুর্যকে নষ্ট করে। ইমেজিস্ট কবিরা অভিজ্ঞতার এক ঘনীভূত রূপ অথবা ভাবের একটি নিটোল চেহারা গড়তে চেয়েছিলেন।

কোথায় যে নিয়ে গেছে সঙ্গে ক'রে সেই নদী, ক্ষেত, মাঠ, ঘাস,
সেই দিন, সেই রাত্রি, সেইসব ম্লান চুল, ভিজে শাদা হাত
সেইসব নোনা গাছ, করমচা, শামুক, গুগলি, কচি তালশাঁস
সেইসব ভিজে ধুলো, বেলকুঁড়ি-ছাওয়া পথ, ধোঁয়া-ওঠা ভাত,
কোথায় গিয়েছে সব? (খুঁজে তারে মরো মিছে)

ঙ. ইমেজিস্ট কবিতা হবে স্পষ্ট, কঠিন, সংহত, পরিচ্ছন্ন। কোন ধোঁয়াটে অনির্দিষ্ট বিষয় কবিতায় আসবে না।

যেন এই গাঙুরের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে— রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।
(তোমার বুকের থেকে একদিন)

চ. মনোসংযোগ হবে কবিতার প্রধান কথা। পাঠকের আগ্রহ কোনমতেই বিচ্ছিন্ন হবে না।

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
(আবার আসিব ফিরে)

পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক রবিনস্কেলটন মনে করতেন images born of image। তাঁর করা প্রতিমার বহুবিধ বিভাজন থেকে বোঝা যায় তাঁর মতে প্রতিমা আসলে সাদৃশ্য, তুলনা, সংকেত ও রূপকের সংমিশ্রণে সৃষ্টি। তিনি তাঁর ইমেজ সংক্রান্ত 'দি পোয়েটিক প্যাটার্ন' বইতে প্রতিমার কতগুলি শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যথা Simple image (শাদা তালশাঁস, ধবল বক), Abstract image (আসন্ন সন্ধ্যা), Immediate image (শিশিরের ঘ্রাণ), Diffuse image (হিজলের ক্লান্ত পাতা), combined image, complex image (শরতের রোদের বিলাস), combined abstract image, complex abstract image (চাঁপাফুল-মাখা ম্লান চুলের বিন্যাস), abstract combined and abstract complex image(তারি বুকে নদী এসে কি কথা মর্মরে) ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে ইমেজিস্ট কবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশ অগ্রগণ্য। রোমান্টিকতার বিরোধিতা কবি করলেও তথাকথিত ইমেজিস্ট আন্দোলনকারী হিসেবে তাঁর নাম গণনা করা যায় না। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে বিশ্বের অতীত-বর্তমানের কাব্যভুবন সম্পর্কে দীক্ষা গ্রহণ করে কবিতা রচনার সচেতন অনুশীলনে। তবে একথা বলা বাহুল্য যে তাঁর ভাবনার সঙ্গে এলিয়টের ভাবনার সাজুয্য রয়েছে। এলিয়টের

কাব্যাদর্শ তাঁকে চিত্রকল্পনির্ভর কবিতা লেখায় অনুপ্রেরণা জোগায়। তাঁর কবিতার পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে চিত্র ও চিত্রকল্প। তুলনামূলকভাবে বলা যায় 'রূপসী বাংলা'য় চিত্রকল্পের আবেদন গৌন। টুকরো টুকরো ইমেজেই কাব্যগ্রন্থ মুখ্যত ছেঁয়ে গেছে। রূপসী বাংলার বাক্‌চিত্রের মূল্যগুলি ছবিতেই সীমাবদ্ধ। চিত্রকল্পের ব্যবহার রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থে হলেও 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের কল্পচিত্রগুলি অধিক হৃদয়াগ্রহী ও আবেদনমুখর। তবে, এখানে বস্তুরূপের নিজস্ব যে গৌরব আছে তা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। চিত্রকল্প সৃষ্টিতে রূপসী বাংলা অনেক কবির কাব্যগ্রন্থকে অনায়াসে মাৎ দিতে পারে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির সাপেক্ষে রূপসী বাংলা ইমেজ গঠনে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারলেও, ইমেজারি নির্মাণে খানিকটা পশ্চাৎপদ। রূপসী বাংলা নিসর্গের বস্তুরূপের বর্ণনা করলেও তা জীবনসত্যের উদ্ভাসনে তেমন পারদর্শীতার পরিচয় রাখতে পারে না। কবি বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চিত্রনির্মাণ করলেও, তা কেবলি ছবি, ছবির বাইরে বস্তুর অন্তর্গত ভাবব্যঞ্জনা পাঠকের কল্পনালোককে তেমনভাবে জারিত করতে পারে না। রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থে টুকরো টুকরো ছবি পাঠকমনে যে ইমেজচেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছিল তাই পূর্ণতা পেয়েছে পরবর্তীকালে বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থে। যেখানে ইমেজ ও ইমেজারির ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে কবির ভাবাবেগ ও কবিত্ব শক্তিকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে। সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যে তেমনভাবে ইমেজিস্ট কবি বলে কেউ না থাকলেও, জীবনানন্দ দাশের কবিতা চিত্রের ব্যবহার চিত্রকল্পের হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার জন্য অমর হয়ে রয়ে গেছে। কারণ, তাঁর কবিতার আবেদন কেবল ইন্দ্রিয়াদির কাছে নয়, সমগ্র মনের সামগ্রিক বৃত্তির কাছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পা., জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র, অবসর, ঢাকা, ২০০৫
২. নবেন্দু সেন সম্পা., পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০২০
৩. প্রণব চৌধুরী সম্পা., জীবনানন্দ নিয়ে প্রবন্ধ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, অখন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২৪
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২২
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৬
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৬
৮. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পা., বাংলা গীতিকবিতা উনিশ শতক, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১

সূত্রনির্দেশ:

১. https://bit.ly/3ye6l0m

২. ইন্দ্রনীল আচার্য, সাহিত্যসমালোচনার ধারায় পাউণ্ড ও এলিয়ট, নবেন্দু সেন সম্পা., পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০২০, পৃষ্ঠা ২৫৪

৩. রবিন পাল, ইমেজিসম ও ভর্টিসিজম কাব্য আন্দোলন ও তত্ত্বভাবনা, নবেন্দু সেন সম্পা., পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০২০, পৃষ্ঠা ২৬৩

৪. https://rb.gy/aj2rd7

৫. ইন্দ্রনীল আচার্য, সাহিত্যসমালোচনার ধারায় পাউণ্ড ও এলিয়ট, নবেন্দু সেন সম্পা., পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০২০, পৃষ্ঠা ২৫০

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫১

৭. T. S. Eliot, The Waste Land, Boni And Liveright, New York, 1922, Pg. 21

৮. রবিন পাল, ইমেজিসম ও ভর্টিসিজম কাব্য আন্দোলন ও তত্ত্বভাবনা, নবেন্দু সেন সম্পা., পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০২০, পৃষ্ঠা ২৬২

৯. আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুন্দর ও বাস্তব, অলোক রায়, পবিত্র সরকার, অভ্র ঘোষ সম্পা., দুই বছরের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ২০০২, পৃষ্ঠা ৪০৯

১০. অমলেন্দু বসু, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চিত্রকল্প, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫

১১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১১৭

১২. আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পা., জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র, অবসর, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৭০৫

‘জমিদার দর্পণ’ নাটকে নারী: লাঞ্ছনা ও প্রতিবাদ

রাহুল মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে দীর্ঘকাল ধরেই অত্যাচারের স্বীকার হতে হয়েছে। নীরবে মৃত্যু বরণ করেছে অসংখ্য নারী। একবিংশ শতাব্দীতেও এই সমাজ ব্যবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ক্ষমতাশালী মানুষজন ক্ষমতা ও অর্থের জোরে কীভাবে নারীর ওপর অত্যাচার করে থাকে তা উনিশ শতকেই দেখিয়েছেন মীর মশার্‌রফ হোসেন তাঁর ‘জমিদার দর্পণ’ নাটকে। এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিবাদ হয়ে আসছে। সামান্য একজন নারী হয়েও যে প্রতিবাদ করা যায় তা এই নাটকে দেখিয়েছেন মীর মশার্‌রফ হোসেন। নাটককার নিজে একজন জমিদার বংশের সন্তান হয়েও যেভাবে জমিদারদের প্রকৃত স্বরূপটি তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে।

সূচক শব্দ: উনিশ শতক, জমিদার, নারী, মৃত্যু, প্রতিবাদ, লালসা।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী দীর্ঘকাল ধরে, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত। নারী যেন শুধুই পুরুষের ভোগের বস্তু। ঘরে ও বাইরে সর্বত্রই তাঁদের সমান অবস্থা। নারীকে তাঁর পরিবারের কাছে তথা সমাজের কাছে অত্যাচারের স্বীকার হতে হয়েছে বার বার। সাহিত্য সমাজেরই দর্পণ। তাই সাহিত্যে আমরা নারীর কথা যেমন পাই তেমনই পাই নারীর যন্ত্রনার কথা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মীর মশার্‌রফ হোসেনের রচিত ‘জমিদার দর্পণ’(১৮৭৩) নাটকটিতেও আমরা দেখতে পাই নারীর চরম দুরবস্থার ছবি। জমিদারের দায়িত্ব প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করা। অথচ সেই জমিদারই হয়ে উঠেছেন প্রজার সবথেকে বড়ো শত্রু। এই নাটকে আমরা দেখতে পাই জমিদার হায়ওয়ান আলী গরিব, দুঃখিনী এক নারীর ওপর কী ভয়ানক অত্যাচার চালিয়েছেন। রক্ষকই কীভাবে ভক্ষক হয়ে উঠেছে তা নাটকের পরতে পরতে চোখে পড়ে।

নাটকে আমরা তিনজন নারীর কথা পাই। গ্রামের প্রজা আবু মোল্লার স্ত্রী নূরুন্নেহার, আবুর বোন আমিরণ এবং বৈষ্ণবী নটী কৃষ্ণমণি। নাটকটির কেন্দ্রে রয়েছে নূরুন্নেহার। জমিদার হায়ওয়ান আলী নূরুন্নেহারের রূপের প্রতি মোহিত হয়ে তাকে ভোগ করার জন্য পাগল হয়ে ওঠেন। নারীর প্রতি আসক্তি, নারীকে ভোগ করার লালসা, নারীর সতিত্ব নাশ করা— জমিদার হায়ওয়ানের বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। নূরুন্নেহারও তাই জমিদারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তার ওপর নেমে এসেছে নির্মম অত্যাচার। তা সত্ত্বেও গরিব, দুঃখিনী এই নূরুন্নেহারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই

এক প্রতিবাদী নারীর চিত্র। তার প্রতিবাদী কণ্ঠধ্বনি সতর্ক করে গেছে আগামি দিনের নারীজাতিকে।

নূরুন্নেহার ছিল অপরূপ সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা একজন পতিব্রতা স্ত্রী। সংসারে আর্থিক অভাব থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসায় কোন কমতি ছিল না। নূরুন্নেহারের এই সৌন্দর্যই তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। নাটকটি শুরুই হয়েছে নূরুন্নেহারের রূপ বর্ণনার কথোপকথন দিয়ে—

হায়। দেখেছো?

প্র,মো। হুজুর দেখেছি।

হায়। কেমন?

প্র,মো। সেকি আর বলতে হয়, অমন আর দুটি নাই!

(জমিদার দর্পন, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

নূরুন্নেহারের এই অপরূপ সৌন্দর্যের জন্যই জমিদার তাকে ভোগ করার লালসায় অস্থির হয়ে ওঠেন। হায়ওয়ান নূরুকে পাবার জন্য অনেক লোভ দেখিয়েছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। তিনি নিজের মুখেই বলেছেন, 'টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গওনার লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না।'[১]

একজন নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তার সম্ভ্রম, সতীত্ব। কেউ অভাবে, কেউ বা স্বভাবে তা বিকিয়ে দেয়। নূরুন্নেহারের ঘরে অভাব থাকলেও সে কখনোই জমিদারের প্রলোভনে পা দেয়নি। জমিদার হায়ওয়ান আলী নিজের মুখেই বলেছেন, '... ক'মাস হলো কত চেষ্টা করিছি, কত হাঁটা-হাঁটি করিছি, কৈ কিছুই তো হয় না!'[২] সেজন্যই জমিদার তাকে ভোগ করার জন্য নানা ফন্দি আঁটেন। নূরুন্নেহারের জন্যই আবুর কাছে কোমর খোলাইয়ের জন্য পাঁচ টাকা দাবি করেন; যা আবুর পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও জমিদারের ভয়ে বহু কষ্টে আবুকে পাঁচ টাকা দিতে হয়। তবুও জমিদারের পেয়াদারা তাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায় এবং তার ওপর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করে। জরিমানার টাকা দিতে না পারার জন্য আবুকে চোদ্দ পোয়া করে মাথায় ইট চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আবু বুঝতেই পারে না তার অপরাধটা কোথায়। সে বারবার বলেছে—'আমি কি ঘা'ট করেছি।'[৩]

বিনা দোষে স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছে, তার ওপর ৫০ টাকা জরিমানা করেছে। কোনো কারণ ছাড়াই জমিদারের এই অত্যাচার নূরুন্নেহারকে স্তম্ভিত করেনি। কারণ সে জানে জমিদার ক্ষমতার জোরে সব কিছুই করতে পারেন। সে নিজে একজন সামান্য গৃহবধূ। কিছু করার মতো ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও জমিদারের এই অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নূরুন্নেহারের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। আবুর ওপর ৫০ টাকা জরিমানা প্রসঙ্গে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নূরু আমিরণকে বলেছে, 'পঞ্চাশ টাকা কোথা পাব?...পঞ্চাশ টাকা একসাথে তো আমরা চক্ষেও দেখি নাই।'[৪] প্রতিবাদী

ভাষা না হলেও তার এই কথাগুলো অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। তাছাড়া আমিরণ যখন বলেছে, '...জমিদারের সঙ্গে কার কথা, সে কি না করতে পারে।'[৫] তখন নূরুন্নেহারের কঠোর উক্তি—'পারেন বলে কি একেবারে মেরে ফেলবেন? এই কি জমিদারের বিচের, জমিদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করবেন ওমা তা গেলো মাটিচাপা! উল্টে দিনে ডাকাতি।'[৬]—এই কথাগুলো হয়তো জমিদারের সম্মুখে বলার ক্ষমতা নূরুন্নেহারের নেই। কিন্তু তার ভেতরে যে একটা প্রতিবাদী সত্তা আছে তা এই সংলাপে অত্যন্ত স্পষ্ট।

জমিদার নূরুন্নেহারকে পাবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। কৃষ্ণমণি নামে একজন বৈষ্ণবীকে নূরুন্নেহারের কাছে পাঠিয়েছেন প্রলোভন দেখিয়ে নূরুকে নিয়ে আসার জন্য। নূরুন্নেহারের কাছে জমিদারের অবিচারের কথা শুনেও কৃষ্ণদাসী বলেছেন, 'জমিদার আস্ত বাঘ।'[৭]। আর তখন নূরুন্নেহারের উক্তি—'দুর্জনকে সকলেই ভয় করে! এই কি তাঁর বিবেচনা?'[৮] জমিদার হায়ওয়ান আলী একজন অসৎ, দুর্জন লোক একথা জমিদারের অনুচরের সামনে বলতে কোন দ্বিধাবোধ করেনি নূরুন্নেহার। হাকিমের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কৃষ্ণদাসীকে বলেছে, 'হাকিমে এমন করে অবিচারে মারলে আর কার কাছে দাঁড়াব? এরপর যদি হাকিমের পর হাকিম থাকতো তবে এর বিচার হোতো!'[৯] কৃষ্ণমণি নূরুন্নেহারকে কুপ্রস্তাব দিয়ে বলেছেন যে, রাতে নাকি জমিদারের বৈঠকখানায় গেলে রাজার সব রাগ কমে যাবে। কিন্তু নূরুন্নেহার তার এই কুপ্রস্তাবে রাজি তো হয়নি উপরন্তু তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছে, '...অধীনে আছি বলেই কি এমন কাজ করবেন? এই কি তাঁর ধর্ম্ম?...আমি বৈঠকখানায় কখনো যেতে পারবো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।'[১০] মরতে প্রস্তুত আছে তবু সে নিজের মান-ইজ্জত কখনোই নষ্ট করবে না। সমালোচক নিবেদিতা চক্রবর্ত্তী তাই বলেছেন, "নূরুন্নেহার দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ। কিন্তু তার দারিদ্র্য, তার আদর্শবোধ, তার নীতিজ্ঞানকে কেড়ে নিতে পারেনি।"[১১] একজন সাধ্বী স্ত্রীর কাছে তাঁর সতীত্বই সবথেকে বড়ো; অর্থ কখনোই বড়ো হতে পারে না। কৃষ্ণমণি তাকে পুনরায় লোভ দেখিয়ে বলেছেন, 'তুমি রাজার রাজরানীর মতো সুখে থাকবে।'[১২] নূরুন্নেহার তখনও জোর গলায় বলেছে, 'সে কাজ আমি পারবো না, জান থাকতে তো নয়! আগে আমায় খুন করুন, তার পর যা ইচ্ছে তাই করবেন।"[১৩] জমিদার অনুচর পাঠিয়েছে, তার স্বামীকে আটকে রেখেছে, সামনে আরও বড়ো বিপদ আসছে জেনেও নূরুন্নেহার কণ্ঠে এই যে প্রতিবাদের সুর শোনা গেছে তা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে।

নূরুন্নেহারের উপর যে অনেক বড়ো লাঞ্ছনা আসতে চলছে তা সে বুঝতে পেরেছে। মুখ ফুটে সে কথা না বললেও দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নেপথ্যে যে গানটি আছে তাতে নূরুন্নেহারের বেদনাই প্রকাশ পায়—

> "আর, কে আছে আমার?
> এ দুঃখ পাথারে কে বা হবে কর্ণধার?

যে তারিবে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,
না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, ঝুরি আনিবার।”[১৪]

কৃষ্ণমণি নূরুন্নেহারের নামে অনেক মিথ্যা কথা বলে জমিদারের কাছে। তাতে জমিদারের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। এমনিতেই নূরুকে ভোগ করার লালসায় ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাই এবার জোরজবরদস্তি লোক পাঠিয়ে নূরুকে তুলে আনেন। দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষার অবসান। জমিদার ক্ষুধার্ত বাঘের মতো নূরুন্নেহারের ওপর চড়াও হন। অত্যধিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা সহ্য করেও নূরুন্নেহার জমিদারকে ‘বাপ’ বলে সম্বোধন করেছে। জমিদার হায়ওয়ানকে সে বলেছে, ‘...আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ!’[১৫] কিন্তু দুশ্চরিত্র জমিদার দীর্ঘ অপেক্ষার পর আজ নূরুকে পেয়েছে। কোন ভাবেই তিনি তাকে ছেড়ে দেবেন না। নূরুন্নেহার বার বার বলেছে— ‘আমায় ছেড়ে দিন! গলায় কাপড় দে বলছি আমায় ছেড়ে দিন! আমি আপনার মেয়ে! আপনি আমার বাপ!’[১৬] কিন্তু তাতে হায়ওয়ান বিন্দুমাত্র বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। নূরুন্নেহার গর্ভবতী থাকা সত্ত্বেও জমিদার জোরপূর্বক তার ওপর চড়াও হন এবং নিজের লালসা মেটান। বাড়ির এক গৃহবধূকে জোরজবরদস্তি ধরে এনে এইভাবে অত্যাচার করার পর তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া, শুধু তাই নয় তার গর্ভের সন্তানকে পর্যন্ত হত্যা করা—একজন মানুষের ওপর এর থেকে বেশি আর কি অত্যাচার হতে পারে?

পূর্বেই বলেছি নূরুন্নেহার সামান্য একজন গৃহবধূ হলেও সে কখনোই ভয় পায়নি। মৃত্যুর আগেও সে জমিদারের এই কঠোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে গেছে। সে বলেছে,

> জমিদার হয়ে এমন কাজ করলে! ধর্মের দিকে চাইলে না! এত কষ্ট কি আর এক প্রাণে সয়! হায় হায় এদের দমনকর্তা কি আর কেউ নেই! এদের উপরে কি হাকিম নেই! হায় হায় জাত গেলো, দেশ জুড়ে কলঙ্ক হোলো, প্রাণও গেলো, শুধু আমার প্রাণই যে গেল তা নয়! পেটে যে একটা ছিল, তারও গেলো! খাঁ সাহেব! আপনার মনে এই ছিল। এই করলেন! খোদা আপনার বিচার করবেন!’[১৭]

একজন নারী হয়ে সতীত্ব রক্ষা করতে না পারার জন্য বার বার নূরুন্নেহার আক্ষেপ করেছে। শুধু তাই নয় মৃত্যুর আগে মহারানীর কাছে নালিশ করেছে। যখন গোটা সাম্রাজ্যটার অধিপতি একজন নারী তখন সেই দেশেরই একজন নারীকে এইভাবে হত্যা করা হল। মহারানীর উদ্দেশে তাই সে বলেছে, ‘...কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা? আমরা গরিব বলে কি তুমি আমাদের মা হবে না?’[১৮] মৃত্যুর আগে গোটা সমাজ ব্যবস্থার প্রতি, সমাজের শাসনকর্তাদের প্রতি নূরুন্নেহার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে

গেছে। ভবিষ্যতে আর কোনো নারীর যেন এমন দুরবস্থা না হয় সেই কামনাও করে গেছে।

শুধু তাই নয় মৃত্যুর পরেও সে আদালতে সঠিক বিচার পেল না। হায়ওয়ান সম্পর্কে মোক্তার জানিয়েছেন, '...ইতিপূর্বে সাহেবজাদা হাকিমের আমলে এক হিন্দু স্ত্রীকে জাবরানে ধরে এনে সতীত্ব হরণ করেন। ওই প্রকার কত কুলবালার সতীত্ব নাশ করেছেন, ধ্বংস করেছেন, নষ্ট করেছেন, মাথা খেয়েছেন, জাতপাত করেছেন সে আমি বলতে চাইনে। ধর্মাবতার ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে। প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে।'[১৯] কিন্তু এসব প্রমাণের বিনিময়ে আদালতে কোন বিচার হয় না। যার অর্থ আছে বিচারের রায় তার পক্ষেই যায়। তাই সমকালীন আইন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "আইন—সে একটা তামাসা মাত্র—বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে।"[২০] বিলাসপুর জেলার সেসন আদালতে বিচারে রায় দেওয়া হয় নূরুন্নেহারের "ব্রেন ডিজিজে" মৃত্যু হয়েছে। যে মানুষটির অধোদেশ থেকে নির্গত হয়েছে রক্ত এবং গলার চামড়ার নীচে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে তার মৃত্যু কীভাবে "ব্রেন ডিজিজে" হয় তা কেউ বুঝতে পারল না। যেমন ডাক্তারের চিকিৎসা তেমনই আদালতের রায়। বিচারের নামে আদালতে শুধু প্রহসনই হল।

জমিদারের অত্যাচারে নূরুন্নেহার ও তার গর্ভের সন্তান মারা গেল। কোন বিচারও পেল না। এ অবস্থা শুধু তার একার নয়, তার মতো অনেক নারীরই এই দুরবস্থা হয়েছে। ভারত-ঈশ্বরীর উদ্দেশে নটীর গান—

'হবে না কি দরিদ্রের এ দঃখ মোচন?
রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন?
আরো বিজ্ঞাপিত শোক কান্দি তাঁর কাছে,
ঈশ্বর-প্রসাদে যিনি ভারত-ঈশ্বরী
যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বার বার,
কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার।'[২১]

'জমিদার দর্পন' নাটকে আর একজন নারীর কথা পাই। তিনি হলেন আবু মোল্লার বোন আমিরণ। নাটকে কয়েকটি মাত্র দৃশ্যে তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই সামান্য উপস্থিতিতেই তার চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। সমালোচক সুতপা মুখোপাধ্যায়ের মতে, "আমিরণ সমাজ সচেতন এক নারী"[২২] সে জমিদারের শাসন ও জুলুম ভালো করেই জানে। তার দাদাকে জমিদার বিনা কারণে ধরে নিয়ে গেছে, কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী কেন তার বৌদির (নূরুন্নেহার) পেছনে পড়ে আছে তা আমিরণের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু সেও তো সামান্য একজন নারী। তার ক্ষমতা আর কতদূর! তা সত্ত্বেও তার সংলাপে প্রতিবাদী ও যুক্তিবাদী সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নূরুন্নেহার যখন স্বামীর জন্য

কাঁদছে তখন আমিরণ বলেছে, 'আর কাঁদলে কি হবে। জমিদারের হাত কখনো এড়াতে পারবে না...'[২৩] তার এই যুক্তিবাদী সংলাপেই বোঝা যায় সে জমিদারের কার্যকলাপ সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। কৃষ্ণমনিকে সে জানিয়েছে, কীভাবে তার দাদাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করেছে। আমিরণ কৃষ্ণমণিকে বলেছে, '...এদের তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পয়সা বেরোয় না! অত টাকা কোথায় পাবে? এই কি হাকিমের বিচের?'[২৪] কৃষ্ণমণি জমিদারেরই লোক জেনেও আমিরণ তাকে এই সত্য কথাটা বলতে ভয় পায়নি। কৃষ্ণমণি সবই জানে। তা সত্ত্বেও আবুর প্রতি জমিদারের অবিচারের কথা যেভাবে আমিরণ কৃষ্ণমণিকে বলেছে তাতে তার প্রতিবাদী সত্তারই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নূরুন্নেহারের সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমিরণের দীর্ঘ সংলাপেই তার প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তার এই সংলাপ শুধু জমিদার হায়ওয়ানের বিরুদ্ধে নয় সমগ্র জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে— '...ওরা ছাগলের জাত পর্যন্ত পার পায় না! তুমি আমি তো ছার কথা! বলতেও নজ্জা করে বোন; শুনতেও নজ্জা! ওদের মেয়ে মানুষ দেখলেই চোক টাটায়, জমিদার হলেই প্রায় একখুরে মাথা মুড়নো!'[২৫] অত্যাচারী, নারীলোলুপ জমিদারদের চরিত্র অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমিরণের সংলাপে:

> '...চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক্ এমনি দাঁত পড়া বাঘের মতন এখনও জিব লক্‌লক্ করে! সেই বাজারে মেয়েগুনো এসে কত নাঞ্ছনা দিয়ে যায়, তবু নজ্জা নাই। ...আবার বেদিনী, যুগিনী, চাঁড়ালনী, কলুনী, চার জাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়েসে রঙ্গ কোরছেন; কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিনী নে উন্মত্ত কেউ ঘরের দিব্বি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল কাটাচ্ছেন! তা বোন এ দেশের জমিদারের অনেকের দশাই তো এই!...[২৬]

নাটকের অপর একজন নারী হল কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী। নাটকে তাঁর ওপর কোন অত্যাচারও হয়নি এবং তাঁর কোন প্রতিবাদী কণ্ঠও নেই। কিন্তু নারী চরিত্রের আলোচনা করতে হলে তার কথা বলতেই হয়। নূরুন্নেহার ও আমিরণের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ কৃষ্ণমণি। নাটকে মাত্র একটি দৃশ্যে তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। একজন নারী হয়েও শুধুমাত্র অর্থের লোভে অপর একজন নারীর সর্বনাশ করেছে। নূরুন্নেহারকে জমিদারের বিছানায় পাঠানোর জন্য সে অনেক চেষ্টা করেছে। কৃষ্ণদাসী একজন বৈষ্ণবী। একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ হয়েও সে নূরুন্নেহারকে বলেছে, '... আজ রাতে যদি তাঁর[জমিদারের] বৈঠকখানায় যেতে পার, তাহলে যত রাগ দেখছো একেবারে জল হয়ে যাবে! তুমি উল্টে আবার তার ডবল টাকা ঘরে আন্তে পারবে!'[২৭] ধর্মের মুখোশ পরে থাকলেও আসলে সে যে একজন ভণ্ড, ঠক, লোভী মানুষ তা এই সংলাপেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমগ্র নাটকে দেখতে পাই যে, জমিদাররা তাঁদের ক্ষমতার জোরে নারীজাতির ওপর নির্মম অত্যাচার করেছে। তা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি, এইসব ক্ষমতাশালী, স্বৈরাচারী শাসকের কাছে কোন নারী মাথা নত করেনি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জমিদারদের কুকীর্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গেছে। নাটককার মীর মশার্‌রফ্‌ হোসেন যেভাবে জমিদার শ্রেণির প্রতিবিম্ব নাটকে তুলে ধরেছেন তা অতুলনীয়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য, "...সেই যুগে সামাজিক নানা সমস্যামূলক বিষয় লইয়া যত রচনাই প্রকাশিত হউক, আনুপূর্বিক জমিদারের অত্যাচারের ভয়ঙ্কর স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া খুব অল্প রচনাই প্রকাশিত হইয়াছে। সেইজন্য 'জমিদার-দর্পণ' নাটকের ভিতর দিয়া লেখকের যে দুঃসাহসিক সত্যভাষণের প্রয়াস দেখা যায়, তাহা সে যুগের পক্ষে পরম বিস্ময়কর এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"[২৮] জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেও আত্মীয় পরিজন সকলেই জমিদার হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে নাটককার জমিদারদের প্রকৃত স্বরূপটি তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

তথ্যসূত্র:

১. মীর মশার্‌রফ হোসেন, জমিদার দর্পণ, সোহারাব হোসেন সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ, ১৪২২, পৃ. ৫০।

২. তদেব, পৃ. ৫২।

৩. তদেব, পৃ. ৫৮।

৪. তদেব, পৃ. ৬২।

৫. তদেব, পৃ. ৬৩।

৬. তদেব।

৭. তদেব।

৮. তদেব, পৃ. ৬৪।

৯. তদেব।

১০. তদেব।

১১. নিবেদিতা চক্রবর্ত্তী, "জমিদার দর্পণ" নাটকের নারী চরিত্র, জমিদার দর্পণ নিকৃষ্টের নামাবলি, দেবব্রত বিশ্বাস ও শ্যামলচন্দ্র দাস সম্পাদিত, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৫, পৃ. ১৩১।

১২. মীর মশার্‌রফ হোসেন, জমিদার দর্পণ, সোহারাব হোসেন সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ, ১৪২২, পৃ. ৬৫।

১৩. তদেব।

১৪. তদেব, পৃ. ৬৭।

১৫. তদেব, পৃ. ৭৩।

১৬. তদেব।

১৭. তদেব, পৃ. ৭৬।

১৮. তদেব।

১৯. তদেব, পৃ. ৮৩।

২০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ: শ্রাবণ ১৩৯০, পৃ.২৯০।

২১. মীর মশার্‌রফ হোসেন, জমিদার দর্পণ, সোহারাব হোসেন সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ, ১৪২২, পৃ. ৫০।

২২. সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার দর্পণের স্ত্রী চরিত্র, জমিদার দর্পণ নিকৃষ্টের নামাবলি, দেবব্রত বিশ্বাস ও শ্যামলচন্দ্র দাস সম্পাদিত, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৫, পৃ. ১২৭।

২৩. মীর মশার্‌রফ হোসেন, জমিদার দর্পণ, সোহারাব হোসেন সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ, ১৪২২, পৃ. ৫০।

২৪. তদেব, পৃ. ৬৩।

২৫. তদেব, পৃ. ৬৬।

২৬. তদেব।

২৭. তদেব, পৃ. ৬৪।

২৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা- ১২, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬১, পৃ. ৪১২।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনে উনিশ শতকীয় নারীজীবন-প্রসঙ্গ

শিল্পী অধিকারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলা অনুষদ
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: উনিশ শতকীয় সমাজে নারীজীবন অবহেলিত, বঞ্চিত এবং লাঞ্ছিত। তবে সাম্প্রতিককালেও এই ধারা কিছু পরিবর্তন হলেও অক্ষুন্ন। উনিশ শতকের নারী অপেক্ষা বর্তমান নারী অনেক বেশি ব্যক্তিত্বময়ী। ১৮২৯ ও ১৮৫৬-তে সতীদাহ রদ ও বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন তৈরি হলেও তাতে নারীজীবন প্রসঙ্গে খুব একটা সুফলদায়ক হয়নি। কারণ নতুনভাবে নারীজীবনকে আবদ্ধ করার জন্য সমাজের মাতব্বরেরা সচেষ্ট হয়ে ওঠে। কুলীন বিবাহের পরিণতিও নানা নাটক, প্রহসনে লক্ষিত হয়। উনিশ শতকীয় সমাজের নানা দিক উঠে এসেছে দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনে। তাঁর তিন প্রহসনেই পুরুষতান্ত্রিকতার ভণ্ডামি, পতি পরায়ণা নারী, সংস্কারাবদ্ধ নারীজীবন, পুরুষের বারবিলাসিতা ও মদ্যপান, সতীদাহ প্রসঙ্গ, বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ, কুলীন সমাজের নানাদিক কাহিনিরূপ পেয়েছে। তবে এ সবের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের সমাজ-অভিজ্ঞতার পরিচয় স্পষ্ট। সমাজ-বাস্তবতার পাশাপাশি নিজস্ব মতামত প্রহসনের চরিত্রগুলির মধ্যে তিনি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। নারীজীবনকে লক্ষ্যবস্তু করে আলোচ্য প্রবন্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: i) সতীদাহ প্রথা ii) বিধবা বিবাহ আইন iii) বেশ্যাসক্তি iv) সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখানো v) ব্রত-নিয়ম vi) বিবাহের ভীমরতি vii) শ্বশুরবাড়িতে গ্রাসাচ্ছাদন viii)) সপত্নী ix) উত্তম মধ্যম প্রহার।

বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে দীনবন্ধু মিত্র এক বিশেষ নাম। কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুবাদে তিনি খুব কাছ থেকে গ্রাম বাংলার চিত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে লেখনীতে রূপদান করেছেন। নাট্যকাহিনির পাশাপাশি প্রহসনের ক্ষেত্রেও সমাজ-বাস্তবতা তাঁর প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। সহজ সাধারণ কৌতুকের মধ্য দিয়ে তিনি পুরুষশাসিত সমাজ-ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রসহনগুলিতে। সমাজ-ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ ভিন্ন নিয়মের বেড়াজালে মেয়েরা হয়েছে নিষ্পেষিত। কীভাবে সমাজের কঠোর নিয়ম মেয়েদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল সেই কাহিনিই উঠে এসেছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

উনিশ শতকীয় সমাজ প্রসঙ্গে কুলীন প্রথা, সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ সমস্যা, মদ্যপান, বেশ্যানুরাগ প্রভৃতি কলুষতার কথা স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে। তবে একুশ শতকীয় সমাজ-ব্যবস্থায় এইসব কলুষতা পুরোপুরিভাবে সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে— একথা জোর গলায় বলা যায় না। কিন্তু উনিশ শতকীয় সমাজে

মেয়েদের আর্তনাদ, সমাজের মাতব্বরদের সংস্কারের নামে মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কঠোর নিয়ম-রীতি এসব খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন এবং উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক-এর সহায়তায় অসহায় মেয়েদের বেঁচে থাকার নূন্যতম অধিকার দেওয়া হল 'সতীদাহ প্রথা' রদ করে। এতে কুসংস্কারে আবদ্ধ সমাজপতিদের চোখে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল। তারা স্থির করে, এ অন্যায় হিন্দু ধর্মের অবক্ষয়। তাই একে রোধ করতে তারা বদ্ধ পরিকর হয়। মেয়েদের দেবীর আসনে জায়গা করে দেওয়ার লক্ষ্যে ধর্মের গোরারা পরিকল্পনা করে— নিয়ম যেহেতু করা হয়েছে তাই বেঁচে থাকুক মেয়েরা। কিন্তু তাদের বেঁচে থাকতে হলে এমন নিয়ম করতে হবে, যা মৃত্যুর সমতুল্য। তা-ই হল! বিধবা মেয়েদের কঠোর নিয়মের বেড়াজালে এমনভাবে জড়িয়ে রাখা হল, তাতে তাদের কাছে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক বেশি শ্রেয় মনে হয়। শুভ কাজে যোগদানে বাধা দিয়ে বিধবারা সমাজের অমঙ্গলের প্রতীক রূপে চিহ্নিত হয়। কঠোর একাদশীর নিয়ম পালন, পিতা বা ভ্রাতার অনুগ্রহে থেকে দাসীবৃত্তি করে অনেক সময় দাসীর থেকেও নিকৃষ্ট মানের জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হত। এ সময়ে কৌলিন্য প্রথার কারণে মেয়েদের জীবনে নেমে আসে আর এক বিপর্যয়। কুলীন পিতা কুলরক্ষার দায়ে পড়ে কন্যাকে বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হত না। এর ফলে সমাজে বিধবার সমস্যা বাড়তে থাকে এবং মেয়েরা বিধবার কঠিন জীবনযাপন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। বিধবাদের দুঃখমোচনে নারী জাগৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'বিধবা বিবাহ আইন' বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু সমাজ কি এই আইনকে আদৌ মেনে নিত পারল?

দীনবন্ধু মিত্র মোট চারটি নাটক এবং তিনটি প্রহসন লিখেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনগুলি— i) বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬) ii) সধবার একাদশী (১৮৬৬) iii) জামাইবারিক (১৮৭২)। প্রথম প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রসঙ্গে সুকুমার সেন মহাশয় জানিয়েছেন— "'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' (১৮৬৬) একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে পরিকল্পিত। এমন ঘটনা এখনকার দিনেও খুব বিরল নয়। বিধবা-কন্যা দৌহিত্র প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও পুনর্বার বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়া গেঁয়ো এক বুড়ো ছেলেদের হাতে কেমনভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিল তাহাই এই প্রহসনটিতে চিত্রিত হইয়াছে।"[১] কাহিনিতে সমাজপতি বৃদ্ধ রাজীবলোচন পত্নী বিয়োগে হঠাৎ বিবাহের প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করে। অতি বৃদ্ধ বয়সে তরুণী বিবাহের ভীমরতিকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে প্রহসনকার সমাজের কঠিন সত্যকে তুলে ধরেছেন। যদিও রাজীবলোচনের ইচ্ছা পূরণ হয়নি। কারণ, শুধুমাত্র কৌতুকরস নয়, রাজীবলোচনের পরিণতির মধ্য দিয়ে সমাজকে শিক্ষা দেওয়াই ছিল প্রহসনকারের প্রধান উদ্দেশ্য। অনুমান করা সহজ— টাকা এবং কুলীনতার জোরে পুরুষের পক্ষে বৃদ্ধ বয়সেও পুনর্বিবাহ সেই সমাজে অস্বাভাবিক ছিল না। সমাজে পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ ছিল অতি সম্মানের কাজ। কিন্তু 'বিধবা বিবাহ

আইন' পাশ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে সমাজ ছিল নিশ্চুপ। বৃদ্ধ রাজীবলোচনের বাড়িতে রয়েছে দুই বিধবা কন্যা, কিন্তু নিজে বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় বিয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করলেও বিধবা মেয়েদের পুনর্বিবাহ প্রসঙ্গে তেলেবেগুণে জ্বলে ওঠেন। দীনবন্ধু মিত্র একদিকে যেমন সমাজের কলুষতাকে দেখিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি তা থেকে উত্তরণের আভাসও দিয়েছেন। যারা বিধবা বিবাহের সমর্থক তাদের কথাও উঠে এসেছে কাহিনিতে। বিধবাদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র দেখিয়েছেন রাজীবলোচনের দুই কন্যার জীবনের মধ্য দিয়ে। উভয়ই বিধবা হয়ে পিতার আশ্রয়ে এসে দিনযাপন করছে। কিন্তু তারা সারাদিন দাসীর মতো খেটেও নূন্যতম সম্মানটুকুও পায় না পিতার কাছে। রাজীবলোচনের দুর্ব্যবহারে আক্ষেপ করে তাই রামমণি বলেছে— "হা পরমেশ্বর! বিধবার কপালেও এত যন্ত্রণা লিখেছিলে, দাসীর মত খেটেও ভাল মুখে দুটো অন্ন পাই নে।"[২] রাজীবলোচনের কনিষ্ঠা কন্যা গৌরমণি। সে বাল্য বিধবা। বিধবা হলেও তার মনে রয়েছে রঙিন স্বপ্ন। যৌবনের অতৃপ্ত কামনায় জর্জরিত গৌরমণির কথায় উঠে আসে তার সুপ্ত ইচ্ছা। যুক্তিবাদী চিন্তাশক্তি নিয়ে বিধবাদের সুপ্ত বাসনাকে সে স্বীকার করেছে অকপটে— "আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্চে, তা গুণে সংখ্যা করা যায় না—কখন ইচ্ছা হয় জীবনাধিক প্রাণপতির সঙ্গে উপবেশন করে প্রণয়গর্ভ কথোপকথনে কাল যাপন করি; কখন ইচ্ছা হয়, পতির প্রীতিজনক বসন ভূষণে বিভূষিত হয়ে স্বামীর কাছে বসে তাঁকে ভাত খাওয়াই; কখন ইচ্ছা হয়, একবয়সী প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে নিজ নিজ প্রাণকান্তের কৌতুককথা বল্‌তে বল্‌তে স্নান করি; কখন ইচ্ছা হয় আনন্দময় কচি খোকা কোলে ক'রে স্তন পান করাই; আর মাতায় হাত বুলাতে বুলাতে ঘুম পাড়াই; ...দিদি! ভালো খেতে, ভাল পত্তে, ভাল ক'রে সংসারধর্ম্ম কত্তে কার না সাধ যায়?"[৩] গৌরমণির মতো বহু বাল্য বিধবার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে চরিত্রটির মধ্য দিয়ে, যারা সমাজের ভয়ে বৈধব্যকে সঙ্গী করে নিজেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। কিন্তু প্রহসনকার সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গৌরমণিকে দিয়ে বিধবার একাদশী ব্রতের নিয়মকে অস্বীকার করার সাহস দেখিয়েছেন। প্রতিবাদ করেছেন সংস্কারের নামে ভণ্ডামিকে। সুস্থভাবে জীবনযাপন করার তীব্র ইচ্ছাই গৌরমণি বিধবার কঠোর নিয়মকেও অস্বীকার করতে চেয়েছে। নিয়মের কঠোরতায় জর্জরিত গৌরমণি বাধ্য হয়েছে সেই যন্ত্রণার কথা বলতে— "একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বল্‌তে থাকে,"[৪] সে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তাই স্বাভাবিকভাবেই বলতে পেরেছে বিধবার জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। একটু একটু করে মরার চেয়ে সহমরণে নিজেকে একেবারে নিঃশেষ করাই ভালো কাজ। এক বিধবা কতটা পরিমাণে যন্ত্রণা পেলে এই কথা বলতে পারে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সমাজপতিদের কঠোর নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ গৌরমণির মতো বহু বিধবার একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গৌরমণি বিধবা বিবাহের সমর্থন জানিয়েছে। তার

ইচ্ছে, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হোক। কিন্তু নিজে সে পুনরায় বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে। উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারের নামে কুসংস্কারগুলি এমনভাবে আঁকড়ে ধরে সেখান থেকে পুরুষ কেন নারীরাও নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। বাল্যাবস্থা থেকেই এই পাঠ তাদের দেওয়া হয়ে থাকে— স্বামী মৃত হোক বা জীবিত, আজীবন সেই স্বামীর উদ্দেশেই নিজেকে উৎসর্গ করাই নারী জীবনের সার্থকতা। সেই আদর্শ নিয়েই গৌরমণির মতো বহু মেয়েরা আজীবন অদৃশ্য স্বামীর উদ্দেশ্যেই বাকি জীবন শত কষ্টের মধ্যেও কাটিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

দীনবন্ধু মিত্রের দ্বিতীয় প্রহসন 'সধবার একাদশী'। প্রথম প্রহসনে অসহায় বিধবা মেয়েদের কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়ে নিজের কামনা-বাসনা, ইচ্ছাকে দমন করার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু 'সধবার একাদশী' নাম থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না এর মূল বিষয় সম্পর্কে। একাদশী ব্রত শুধুমাত্র বিধবাদের জন্য। কিন্তু সধবাদের জীবনও খুব একটা সহজ ছিল না উনিশ শতকীয় সমাজ ধারায়। সধবা হয়েও বিধবার মতো ছিল তাদের জীবন-পরিণতি। এ প্রসঙ্গে নাট্যসমালোচক অজিতকুমার ঘোষ জানিয়েছেন— " 'সধবার একাদশী'তে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট নবীন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব দোষ ও অনাচার দেখা গিয়েছিল এবং তাহার প্রতিকারকল্পে যে সংস্কার-আন্দোলন সমূহের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তখনকার যুবকদিগের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সমাজলব্ধ যে গুরুতর দোষটি দূরারোগ্য ব্যাধিরূপে সমাজদেহকে পঙ্গু করিয়া তুলিতেছিল তাহাই আলোচ্য প্রহসনখানির মূল বক্তব্যবিষয়।"[৫] আলোচ্য প্রহসনে দেখা যায়, কলকাতার এক ধনাঢ্য পরিবারের একমাত্র পুত্র অটলবিহারীকে। একমাত্র পুত্র, তাই পিতা-মাতার আদরের সীমা নেই, সেইসঙ্গে বংশের একমাত্র প্রদীপ। পিতা-মাতার অতিরিক্ত আদর ও প্রশয়ে সে তৈরি হয়েছে মাতাল, বখাটে, চরিত্রহীন। ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বারবণিতার সঙ্গে সে অবাধে মেলামেশা করেছে। এ বিষয়ে পিতার আপত্তি থাকলেও একমাত্র পুত্র সন্তানকে খুশি করতে তার মা নির্দ্বিধায় প্রশ্রয় দিয়েছে। পুত্রবধূকে উপেক্ষা করে ছেলেকে সঁপে দিচ্ছে এক বারবণিতার হাতে। ছেলের অভিমানে এক বারবণিতার কাছে অনুরোধ করে বলেছে— "যাস্ নে যাস্ নে, ও কাঞ্চন যাস্ নে।...ও কাঞ্চন, কাঞ্চন, ও কাঞ্চন আমার মাতা খাস্ মা যাস্ নে, তোমায় না দেখ্‌লে গোপাল আমার আবার গলায় দড়ি দেবে।"[৬] পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের আধিপত্যের সামনে মাতৃস্নেহের এক নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন দীনবন্ধু মিত্র। পুরুষের অন্যায়কে উপেক্ষা করে এক নারী আর এক নারীর প্রতি অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছে। তৎকালীন সমাজে পুরুষের বারবণিতার সখ অস্বাভাবিক ছিল না। স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা করে দিনের পর দিন পতিতার সঙ্গে মেলামেশা করেছে অটল। সধবা হয়েও স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিতা কুমুদিনী বিধবার মতো দিনযাপন করছে। বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে স্বামী একমাত্র সম্পদ, আর কুমুদিনী সেই স্বামীর কাছ থেকেই বঞ্চিতা হয়েছে। তাই স্বামী

অপেক্ষারত কুমুদিনী আক্ষেপ করে বলেছে— "পোড়া কপালের দশা দেখ্ দেখি ভাই, আজ দশ দিন বাপের বাড়ী থেকে এইচি এক দিন তাকে ঘরে দেখতে পেলেম না, এক মরে যায় জান্‌লুম আপদ গেল, চকের উপর এ পোড়ানি সহ্য হয় না—রাত দিন মদ খেয়ে নেচে বেড়াবে।"[৭] নারীর যেখানে পতি একমাত্র গতি, সেই সমাজেই কুমুদিনীর সহজভাবে স্বামীর মৃত্যু কামনা তাকে একটু আলাদা করে দেয় বাকি নারীদের চেয়ে। আসলে প্রহসনকার খুব সচেতনভাবেই কুমুদিনীর মুখ দিয়ে উনিশ শতকীয় নারীর বিপরীত কথা তুলে ধরেছেন। তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি জোড়াল কশাঘাত কুমুদিনীর এই স্বতন্ত্র অভিমত। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র সমাজকে একেবারে উপেক্ষা করেননি, সামঞ্জস্য বজায় রেখেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন পাঠক ও দর্শকের সম্মুখে। অটলের মতো স্বামী উনিশ শতকীয় সমাজে অস্বাভাবিক কিছু নয়— এ সত্য সম্পর্কে সমাজের অন্যান্য স্ত্রীদের মতো কুমুদিনীও অবগত ছিল, তাই তো শেষ পর্যন্ত স্বামীর কাছ থেকে অন্যায় আচরণ পেয়েও স্বামীর প্রতি সহানুভূতি অটুট রেখেছে— "তোমার গাল ফুলে উঠেছে যে। (অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছাইয়া) তুমি কাঁদ কেন, আমার কপালে যা ছিল তা হলো।"[৮] তবে প্রহসনকার পুরুষের দাম্ভিকতাকে চূর্ণ করার লক্ষ্যে আশ্রয় নিয়েছেন আর এক নারীর। এবার আর গৃহবধূ নয়। সেই নারীর আশ্রয় নিলেন, পুরুষজাতির মতে যাকে ক্রয় করা যায় অর্থের লোভে। পুরুষের কাজে নারী অতি সহজলভ্য বস্তু। কিন্তু পুরুষের দম্ভ চূর্ণ করেছে এই বারবণিতা কাঞ্চন। বাক্‌চাতুর্যে সে অটলকে করায়ত্ব করেছে। অটলও কাঞ্চনকে শুধুমাত্র নিজের অধীনে রাখতে চায়। কিন্তু এই অন্যায় আবদার কাঞ্চন সহজেই উপেক্ষা করেছে। কারণ সে কোনো ঘরের বধূ নয়। ইচ্ছে করলেই পুরুষ নারীকে পেতে পারে না। কারও অধীনে থাকার মতো সে নয়। পুরুষের এই অহঙ্কারকে কাঞ্চন চূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। উনিশ শতকের বাবু সমাজের মদ্যপান এবং রক্ষিতা রাখার অহঙ্কার এবং ঘরের স্ত্রীদের অবজ্ঞার ফলে তাদের করুণ পরিস্থিতি আলোচ্য প্রহসনে স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্রের তৃতীয় প্রহসন 'জামাই বারিক'। কৌলিন্যতার সুযোগ নিয়ে অর্থের লোভে কুলীন ব্রাহ্মণের বিয়ের পর বছরের পর বছর দর্শনের অভাব, বিবাহ বাসরে স্বামীমুখ দর্শনের পর আজীবন প্রতীক্ষা ও দুঃখের জীবন, কখনও বা নিজের সতীত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে কুপথে গমন, সমাজের ভ্রূকুটি প্রভৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় কুলীন মেয়েদের। কুলীন প্রথার ফলে মেয়েদের করুণ পরিণতি, সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে বহু নাটক লিখিত হয়েছে। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র কৌলিন্য প্রথার এক অন্য অধ্যায় লিখলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পরাজয়ের এক অধ্যায় বলা যেতে পারে 'জামাই বারিক'। নিষ্কর্মা কুলীন জামাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আশ্রয় এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর কাছেও অবহেলিত, সেই বিষয়কেই প্রহসনকার কৌতুকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেইসঙ্গে প্রহসনে বহুবিবাহের ফলে সপত্নী কলহ, এক

স্বামীকে নিয়ে উভয় স্ত্রীর কলহ এবং স্বামীর করুণ দশা প্রভৃতি কাহিনি তুলে ধরে সমাজকে কুলীনতার ওপিট সম্পর্কে অবগত করাতে চেয়েছেন।

কেশবপুরের জমিদার বিজয়বল্লভের কনিষ্ঠা কন্যা এবং অভয়কুমারের স্ত্রী কামিনী। সে রুচিশীল এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী। কিন্তু অভয় তার বিপরীত। সে কারণেই কামিনী স্বামীকে মেনে নিতে পারেনি কখনও। এরূপ স্বামীর কারণে পিতার প্রতিও আক্ষেপ রয়েছে যথেষ্ট। উনিশ শতকীয় নারীর কাছে স্বামী যখন দেবতা স্বরূপ সেই প্রেক্ষিতে দেখা যায় কামিনীর মতো ব্যতিক্রমী নারীকে। সে রুচিহীন স্বামীকে অকপটে বলতে পেরেছে— "টেবিলের উপর এক বোতল গোলাপজল আছে, ওটা সব তোমার গায়ে ঢেলে দাও, আতর ল্যাভেন্ডার মুখে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মাখ, তার পর আমার কাছে এস।"[৯] কামিনী চেষ্টা করেছে স্বামীকে নিজের মতো করে তৈরি করতে। স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা পরায়ণ মনোভাব প্রকাশ করলেও অন্তরে ছিল তার প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা। তাই অন্যের মুখে স্বামীর অপমান সে শুনতে রাজি নয়— "আমার জিনিস আমি মারি, কাটি, বকি ঝকি, তাতে এসে যায় না, কিন্তু পরে কিছু বল্লে আমার মনে বাজে।"[১০] উনিশ শতকীয় নারীর মতোই সেও একথা বলতে বাধ্য হয়েছে, স্বামী যেমনই হোক না কেন, তার কাছে সারাজীবন থাকতে পারাই স্ত্রী-জীবনের সার্থকতা। মেজদিদির আত্মহত্যার ইতিহাস বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার অন্তরের সহানুভূতি। মাতাল স্বামীকে পিতৃগৃহ থেকে বের করে দেওয়ায় মেজদিদির দুঃখের শেষ ছিল না। পিতার কাছে অনুরোধ করেও স্বামীকে বাড়ি ফেরাতে অক্ষম হয়েছে সে। তাই চেয়েছিল স্বামীকে নিয়ে আলাদা সংসার করতে। কিন্তু পিতা বিজয়বল্লভ তার এই অনুরোধে সাড়া না দিয়ে স্বামীকে ভুলে যাওয়ার কথা জানায়। স্বামীর অপমান স্ত্রীর কাছেও অপমানের, তাই এই অপমান সহ্য করতে না পেরে কামিনীর মেজদিদি আত্মহত্যা করেছে। উনিশ শতকে নারীর জীবনের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। স্বামী চয়ন থেকে শুরু করে স্বামীর চরিত্র, সবটাই মেয়েরা নিজের অদৃষ্ট বলে মেনে নিলেও কামিনীর মেজদিদির মতো অনেক মেয়ের পরিণতি এভাবেই হয়। সেই বাস্তব চিত্রকেও দীনবন্ধু মিত্র আলোচ্য প্রহসনে তুলে ধরেছেন। মেজদিদির ক্ষেত্রে মাতাল স্বামীর ভালোবাসার অভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কামিনীর শত অপমানেও অভয়ের মধ্যে ভালোবাসা অটুট ছিল। কিন্তু একদিন কামিনীর অভব্য আচরণে অভয় তীব্র আঘাত পেয়ে বাড়ি থেকে চলে যায়। "কামিনী—আমি তোমার স্বামী—কামিনী, আমি জন্মের মত যাই, তোমাকে একটি কথা বলে যাই, তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়ে নি, আজ পড়্‌লো।"[১১] পুরুষের প্রতি অবহেলা স্ত্রীর মনে অনুশোচনার জন্ম নেয়। উনিশ শতকীয় নারীর বৈশিষ্ট্যকে কামিনী পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেনি। একদিন যে স্বামীকে অবহেলা করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই স্বামীর নিরুদ্দেশে কামিনী দগ্ধ হয়েছে।

'জামাই বারিক' প্রহসনের আরও এক দিক বহু বিবাহের কুফল। সপত্নী কলহের কঠিন বাস্তব চিত্র দেখা যায় এই প্রহসনে। বহু বিবাহের ফলে যে শুধুমাত্র নারীরাই বঞ্চনার শিকার তা নয়, সপত্নী কলহের চাপে পড়ে অসহায় স্বামীর করুণ দশা তুলে ধরা দীনবন্ধু মিত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর হাতে পুরুষের নির্যাতন নিজ কর্মফলে। পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী— বগলা ও বিন্দুবাসিনী। স্বামীর ভালোবাসার পক্ষপাত নিয়ে উভয় স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই অশান্তির সৃষ্টি হত এবং সেই অশান্তির ফলে পদ্মলোচনের ভাগ্যে জুটত উত্তম মধ্যম প্রহার। কখনওবা খালি পেটেই দিন কাটাতে হত। শুধু তাই নয়, কে বেশি শাস্তি দেবে সে নিয়েও চলত বচসা— "আমি বাটি ফেলে মেরিচি, ছোটরাণী হ'লে ঘটি ফেলে মার্তো—দেখলে তো ভাই, ওঁর বিচার তো দেখ্লে—আমি কথা কইলে ওঁর গায় পোড়া কাট পড়ে, ছোটরাণী কিল মার্লে ওঁর গায় পুষ্পবৃষ্টি হয়।"[১২] স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এমত আচরণ সে সময়ের প্রেক্ষিতে কিছুটা বিস্ময়কর। যে সমাজে নারী পুরুষের অধীনা, স্বামীকে মনে করা হয় ভগবান তুল্য, নারীর স্বাধীনতা নিয়ে ওঠে নানা প্রশ্ন তুলে দীনবন্ধু মিত্র লিখলেন এক অন্য কাহিনি। নাট্যসমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য মতে, "স্ত্রী-কোন্দলের ভাষা দীনবন্ধুর যে রকম আয়ত্ত ছিল, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তেমন আর কাহারও ছিল না, অতএব এই দুই সপত্নীর জীবন-চিত্রের মধ্যে কোন রকম নূতনত্ব না থাকিলেও ইহাদের মুখে যে ভাষা শুনিতে পাই, তাহা আর কোথাও কোনদিন শুনিতে পাই নাই।"[১৩] এই দুই সপত্নীর স্বামীর প্রতি আচরণ উনিশ শতকীয় নারী আদর্শের উর্দ্ধে। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এই ধরণের কলহ পরায়ণ চরিত্রের অভাববোধই আলোচ্য চরিত্র দুটির বাস্তবতা নিয়ে সংশয় জাগায়। দীনবন্ধু মিত্র এইভাবে কাহিনি গঠন করে পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. সেন সুকুমার; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড); প্রকাশ প্রকাশ ১৩৫০; প্রথম আনন্দ সংস্করণ; নবম মুদ্রণ মাঘ ১৪১৮; পৃ ১২৮।

২. দীনবন্ধু রচনাবলী; সাহিত্য সংসদ; প্রথম প্রকাশ মে ১৯৬৭; অষ্টম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৯; পৃ ১০২।

৩. ঐ; পৃ ১০৮।

৪. ঐ; পৃ ১০৯।

৫. ঘোষ অজিতকুমার; বাংলা নাটকের ইতিহাস; দে'জ পাবলিশিং; পঞ্চম সংস্করণ আশ্বিন ১৪২৩; পৃ ৯২।

৬. দীনবন্ধু রচনাবলী; সাহিত্য সংসদ; প্রথম প্রকাশ মে ১৯৬৭; অষ্টম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৯; পৃ ১৫৫।

৭. ঐ; পৃ ১৩০।

৮. ঐ; পৃ ১৫৯।

৯. ঐ; পৃ ২৫৩।

১০. ঐ; পৃ ২৩৬।

১১. ঐ; পৃ ২৫৪।

১২. ঐ; পৃ ২৪০।

১৩. ভট্টাচার্য আশুতোষ; বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড); এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬১; পৃ ৪০১।

নজরুলের মরু-ভাস্কর : মরুর দুলালের জীবন দর্শন

মহম্মদ মুজাহিদ
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

সারসংক্ষেপ : বাংলা কবিতার জগতে কাজী নজরুল ইসলাম সেই মাইল ফলক, যার পর থেকে নতুন শুমার শুরু হয়েছিল। বাংলা কাব্য জগতে রবীন্দ্র উত্তর কবিদের অভিনব পথের বাতিকর যিনি, তিনি নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এমন এক সমাজ পরিবেশে, যখন ইংরেজ সামাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর শোষণ নির্যাতনে ভারতের প্রতিটি সাধারণ মানুষ ভয়ার্ত নজরুল পরাধীনতার কুৎসিত রূপ দেখতে দেখতে বড় হতে থাকেন আর প্রতি শিরায় শিরায় বাড়তে থাকে বিদ্রোহের আগুন। নজরুলের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় মানবতাবাদী চেতনা।

'মরু-ভাস্কর' কাব্যটি ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। কাব্যটির প্রতিপাদ্য বিষয় নবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) জীবন চরিত। 'মরু-ভাস্কর' চারটি সর্গে বিভক্ত। কবিতা সংখ্যা সর্বমোট ১৮। প্রথম সর্গে- মুহাম্মদের (সাঃ) আবির্ভাব কাল। দ্বিতীয় সর্গে- নবীর শৈশবকাল, তৃতীয় সর্গে- কৈশোর এবং শেষ সর্গে সংসার জীবন ও বিশ্বমানবতার জন্য সংগ্রামের প্রারম্ভ কথা স্থান পেয়েছে। মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ ধর্মপ্রচারক। তাঁর আগে প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার ধর্মপ্রচারক এই মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হন। এই সব ধর্ম প্রচারক তথা নবীগণ বিশ্বস্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরবের বিখ্যাত কোরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, পিতা আব্দুল্লাহ তাঁর জন্মের আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন। যখন নবীর বয়স ৬ বছর, তখন মা আমিনা পরলোকে যাত্রা করেন। এরপর ঠাকুরদাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন মুহাম্মদ (সাঃ)। একসময় মুত্তালিবও কালের স্রোতে চলে যান। অনাথ শিশু মুহাম্মদের (সাঃ) দায়িত্ব নেয় তাঁর কাকারা।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন আবির্ভাব হন, তখন আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। ইসলামিক ইতিহাসে নবীর জন্মের পূর্ব সময়কে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়। আরবের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায় আরববাসীর ছন্দহীন জীবনের বিশৃঙ্খল অবস্থা। মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র আরব। আর আরবের কেন্দ্রস্থল মক্কা নগরীর কাবাগৃহ। কাবাকে বলা হয় –'বায়তুল্লা' অর্থাৎ আল্লার ঘর। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই এই গৃহ ছিল। কাবা গৃহকে অনুসরণ করে সারা বিশ্বের মুসলমানরা নামাজ পড়ে। মুহাম্মদের (সাঃ) আগে প্রায় ৬০০-৬৫০ বছর পর্যন্ত কোনো নবী আসেননি পৃথিবীতে।

এই দীর্ঘ সময়ে কোনো নবী না আসায়, মানুষ আবার অন্ধকারে প্রবেশ করে। কাবাগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয় ৩৬০ টি দেব প্রতিমা ।

আরববাসীগণ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সময় সামান্য কারণে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। দুই গোত্র একঘাটে উটকে জলপান করাবে, কে আগে সুযোগ পাবে তা নিয়ে বাঁধত যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধ চলত বংশ পরম্পরায়। বাবা প্রতিশোধ নিতে না পারলে পুত্রকে আদেশ করে যেত প্রতিশোধ নেবার জন্য। মুহাম্মদের (সাঃ) আগমনে আরবের সমস্ত কলহ, বিশৃঙ্খলা, অশ্লীলতা, কুসংস্কার বদলে গিয়ে শান্তির হাওয়া বয়তে থাকে।

নজরুল ইসলাম মুহাম্মদের (সাঃ) সমগ্র জীবনকে নিয়ে কাব্য রচনা করবেন ভেবে ছিলেন। কিন্তু ২৫ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ খাদিজার সঙ্গে বিবাহ ও পরবর্তী কিছু সময় পর্যন্ত বর্ণনার পর কাব্যটি শেষ করেন। সেই অর্থে 'মরু-ভাস্কর' অসম্পূর্ণ। নবী মুহাম্মদের (সাঃ) অর্ধ জীবন বৃত্তান্ত 'মরু-ভাস্করে' স্থান পেয়েছে। নজরুল স্বল্প পরিসরে নবীর ২৫ বছরের জীবনীকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে এবং ইসলামিক ইতিহাসে অদ্বিতীয়।

মূলশব্দ : সত্যগ্রহী মোহাম্মদ, কাবাগৃহ, ৩৬০ দেব-প্রতিমা, সর্বহারা, সাম্যবাদী

মূল বিষয় :

বাংলা কবিতার জগতে কাজী নজরুল ইসলাম সেই মাইল ফলক, যার পর থেকে নতুন শুমার শুরু হয়েছিল। বাংলা কাব্য জগতে রবীন্দ্র উত্তর কবিদের অভিনব পথের বাতিকর যিনি, তিনি নজরুল ইসলাম। নজরুল এমন একজন সাহিত্যিক যাঁর সম্পর্কে বলতে গেলেই প্রথমেই চলে আসে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার কথা। সচেতন পাঠক মাত্রই নজরুলকে কেবলমাত্র একরৈখিক ভাবনার সাহিত্যিক বলাকে বিরোধিতা করবেন। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহের স্লোগান আছে ঠিক কথাই, তবে নজরুল কেবলমাত্র বিদ্রোহী কবি নন। তাঁর কবিতায় প্রেম-ভালোবাসা, বাস্তব-কল্পনা, সমসাময়িক সময়ের অবস্থার চিত্র অন্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। নজরুল কবিতার ভেতর দেশকাল সমাজের পরিচয়কে প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট ভাবনায়। তিনি বাঙালির চেতনার কবি। মানবতাবাদ, দেশপ্রেম ও নিবিড় ধর্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মে। বৃহৎ অর্থে নজরুল বিশ্বমানবতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তা ও সমগ্র কর্ম পরিসরকে নিবেদন করেছেন। সমাজ ও দেশের জন্য মানুষের যে চিন্তা-ভাবনা, অধিকার ও ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করবার যে লড়াই, তাতে তিনি সামিল থেকেছেন নিরন্তর। নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এমন এক সমাজ পরিবেশে, যখন ইংরেজ সামাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর শোষণ নির্যাতনে ভারতের প্রতিটি সাধারণ মানুষ ভয়ার্ত । নজরুল পরাধীনতার কুৎসিত রূপ দেখতে দেখতে বড় হতে থাকেন আর প্রতি শিরায় শিরায় বাড়তে থাকে বিদ্রোহের আগুন।

নজরুলের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় মানবতাবাদী চেতনা। কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রায় শুরুতেই ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নজরুল লিখেন 'খেয়াপারের তরণী'। তখন থেকেই হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) প্রতি তাঁর বিশেষ সম্মান ও নির্ভরতা প্রকাশ পায়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নবীর জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ে লেখেন পূর্ণাঙ্গ কবিতা-'ফতেমা-ই-দোয়াজ দহম' (আবির্ভাব / তিরোভাব)। এই কবিতাগুলি ছাপা হয় 'মোসলেম ভারতে'। 'মরু-ভাস্কর' প্রকাশের ঠিক আগে এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'অবতরণিকা' মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় 'মরু-ভাস্কর' শিরোনামে বেরিয়েছিল (প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ)। 'সওগাতে' যখন কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তখন কবিতাটির পাশে তারকা চিহ্ন দিয়ে সম্পাদক লিখেছিলেন- কবি নবীর জীবনী কাব্য লিখছেন, এই কবিতাটি তার পূর্বাংশ।

'মরু-ভাস্কর' কাব্যটি ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। কাব্যটির প্রতিপাদ্য বিষয় নবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) জীবন চরিত। 'মরু-ভাস্কর' চারটি সর্গে বিভক্ত। কবিতা সংখ্যা সর্বমোট ১৮। প্রথম সর্গে- মুহাম্মদের (সাঃ) আবির্ভাব কাল। দ্বিতীয় সর্গে- নবীর শৈশবকাল, তৃতীয় সর্গে- কৈশোর এবং শেষ সর্গে সংসার জীবন ও বিশ্বমানবতার জন্য সংগ্রামের প্রারম্ভ কথা স্থান পেয়েছে। মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ ধর্মপ্রচারক। তাঁর আগে প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার ধর্মপ্রচারক এই মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হন। এই সব ধর্ম প্রচারক তথা নবীগণ বিশ্বস্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের মধ্যে আরব দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এই দেশটিকে 'জাজিরাতুল আরব' বলা হয়; যার আভিধানিক অর্থ আরব দ্বীপপুঞ্জ। আরবের আয়তন প্রায় ১৯ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। যদিও দেশটি তিন দিকে জল দিয়ে বেষ্টিত, তারপরেও যেদিকে দৃষ্টি পড়ে শুধু বালু আর বালুময় মরুভূমি।

মুহাম্মদ (সাঃ) আরবের বিখ্যাত কোরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, পিতা আব্দুল্লাহ তাঁর জন্মের আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন। জন্মের পর দুধ মা হালিমা নবীকে নিয়ে যায় লালন-পালনের জন্য। আরববাসীদের প্রথা ছিল শিশু জন্ম হলে সেই শিশুকে দেওয়া হত কোনো গরিব মানুষকে এবং সঙ্গে দেওয়া হত অর্থ সামগ্রী। এইভাবে কিছু দিনের শর্তে তারা শিশুকে লালন-পালন করে শিশুকে তার বাবা-মাকে ফিরিয়ে দিয়ে যেত, আর পরিবর্তে নানা উপহার সামগ্রী তাদেরকে দিত সন্তানের বাবা-মা। যখন নবীর বয়স ৬ বছর, তখন মা আমিনা পরলোকে যাত্রা করেন। এরপর ঠাকুরদাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন মুহাম্মদ (সাঃ)। একসময় মুত্তালিবও কালের স্রোতে চলে যান। অনাথ শিশু মুহাম্মদের (সাঃ) দায়িত্ব নেয় তাঁর কাকারা।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন আবির্ভাব হন, তখন আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। ইসলামিক ইতিহাসে নবীর জন্মের পূর্ব সময়কে 'অন্ধকার যুগ' বলা

হয়। আরবের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায় আরববাসীর ছন্দহীন জীবনের বিশৃঙ্খল অবস্থা। তারা প্রকাশ্যে ব্যাভিচার করত। দাস-দাসীদের সঙ্গে অকথ্য আচরণ করত। আরববাসীরা এতটাই নির্মম ছিল যে, রাস্তার পাশ দিয়ে কোনো গর্ভবতী মহিলা হেঁটে গেলে তারা নিজেদের মধ্যে চ্যালেঞ্জ করতো ঐ মেয়ের পেটে কোন লিঙ্গের সন্তান আছে ? প্রমাণ স্বরূপ ওই মেয়ের পেট চিরে দেখা হত কোন সন্তানের সে জননী? নজরুল প্রথম সর্গের 'অভ্যুদয়' কবিতা লিখেন-

"বালক বালিকা যুবা ও বৃদ্ধে ছিল নাকো ভেদাভেদ,
চলিত ভীষণ ব্যভিচার-লীলা নিলাজ নির্বেদ।
নারী ছিল সেথা ভোগ-উৎসবে জ্বালিতে কামনা-বাতি,
ছিল না বিরাম সে বাতি জ্বলিত সমান দিবস রাতি।"১

আরববাসীদের ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তানকে জীবিত কবরস্থ করা হত। কন্যা সন্তানদের সম্পর্কে নজরুল বলেন :

"হায়রে, যাহারা স্বর্গে-মর্ত্যে বাঁধে মিলনের সেতু
বন্যা-ঢল সে কন্যারা ছিল যেন লজ্জারই হেতু !"২

তারা মনে করত কন্যা সন্তান হওয়া মানে তাদের দেবতা অভিশাপ দিয়েছে তাদেরকে, ফলে এই কন্যার জন্ম।

মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র আরব। আর আরবের কেন্দ্রস্থল মক্কা নগরীর কাবাগৃহ। কাবাকে বলা হয় –'বায়তুল্লা' অর্থাৎ আল্লার ঘর। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই এই গৃহ ছিল। কাবা গৃহকে অনুসরণ করে সারা বিশ্বের মুসলমানরা নামাজ পড়ে। মুহাম্মদের (সাঃ) আগে প্রায় ৬০০-৬৫০ বছর পর্যন্ত কোনো নবী আসেননি পৃথিবীতে। এই দীর্ঘ সময়ে কোনো নবী না আসায়, মানুষ আবার অন্ধকারে প্রবেশ করে। কাবাগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয় ৩৬০ টি দেব প্রতিমা :

"আল্লার ঘর কাবায় করিত হল্লা পিশাচ ভূত,
শিরনি খাইত সেথা তিন শত ষাট সে প্রেতের পুত।"৩

মুসলমানদের বিশেষ কর্তব্যের একটি হল হজ। সমস্ত ধর্মপ্রাণ মুসলিম মিলিত হয় মক্কা ও মদিনা নগরে। প্রথানুসারে হজ যাত্রীরা কাবাগৃহকে প্রদক্ষিণ করেন, আরবিতে একে 'তাওয়াফ' বলে। সেই সময়ও এই প্রথা ছিল, তারা মনে করত সৃষ্টিকর্তার সামনে যেতে হবে নতুন পোশাক পরে; আর সামর্থ্য না থাকলে বিবস্ত্র হয়ে কাবাকে প্রদক্ষিণ করবে। যদিও তারা আল্লাকে নয়, প্রদক্ষিণ করত উয্যা, লাত, মানাত, বা'লকে। এঁরা ছিল তাদের উপাস্য দেবতা। নজরুল ইসলাম আরবের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে জানিয়েছেন :

"এশিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা-এই পৃথিবীর যত দেশ

যেন নেমেছিল প্রতিযোগিতায় দেখিতে পাপের শেষ !
এই অনাচার মিথ্যা পাপের নিপীড়ন-উৎসবে
মক্কা ছিল গো রাজধানী যেন 'জজিরাতুল আরবে'।
পাপের বাজারে করিত বেসাতি সমান পুরুষ নারী
পাপের ভাঁটিতে চলিত গো যেন পিপীলিকা সারিসারি।"৪

এইরকম বিশৃঙ্খল, কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, অন্ধকার পরিবেশে নবী মুহাম্মদের (সাঃ) আবির্ভাব।

"ঘন তমসার সূতিকা-আগারে জনমিল নব শশী
নব আলোকের আভাসে ধরণী উঠিল উচ্ছ্বসি।"৫

শিশু মুহম্মদ (সাঃ) হালিমার ঘরে প্রতিপালিত হতে থাকেন। বেশ কিছু সময় তিনি হালিমার ঘরে কাটিয়ে আবার ফেরত আসেন আমিনার ঘরে। কিছুদিন কাটতেই মা আমিনা ইহলোক ত্যাগ করেন। মুহাম্মদ (সাঃ) হয়ে যান- 'সর্বহারা'

"সকলের তরে এসেছে যে জন, তার তরে
পিতার মাতার স্নেহ নাই, ঠাই নাই ঘরে।

বেদানার পর বেদনা হানিয়া তাই তারে
ভিখারি সাজায়ে পাঠল বিশ্ব দরবারে ।"৬

আরববাসীগণ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সময় সামান্য কারণে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। দুই গোত্র একঘাটে উটকে জলপান করাবে, কে আগে সুযোগ পাবে তা নিয়ে বাঁধত যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধ চলত বংশ পরম্পরায়। বাবা প্রতিশোধ নিতে না পারলে পুত্রকে আদেশ করে যেত প্রতিশোধ নেবার জন্য। মুহাম্মদের (সাঃ) আগমনে আরবের সমস্ত কলহ, বিশৃঙ্খলা, অশ্লীলতা, কুসংস্কার বদলে গিয়ে শান্তির হাওয়া বয়তে থাকে। "সত্যগ্রহী মোহাম্মদ" অংশে নজরুল লেখেন :

"সহসা বাজিল রণ-দুন্দুভি আরব দেশে,
'ফেজার' যুদ্ধ আসিল ভীষণ করাল বেশে।

আরবের সব গোত্র সে রণে নামিল গিয়া।
যে গৃহ-যুদ্ধে আরব হইল মরু সাহারা,"৭

এই যুদ্ধে সামিল হন মুহাম্মদ (সাঃ) কিন্তু :

"যুদ্ধভূমিতে গিয়া নবী হায় যুদ্ধ ভুলি
আহত সেনারে সেবিত আদরে বক্ষে তুলি।
দেখিতে দেখিতে তরুণ নবীর সাধনা-সেবায়

শত্রু মিত্র সকলে গলিল অজানা মায়ায়।
সন্ধি হইল যুযুৎসু সব গোত্র দলে,
মোহাম্মদের মানিল সালিশ মিলি সকলে।"৮

নবীর মুহানুভবতা ও সহৃদয়তায় সন্ধি হল পাঁচ বছরের রণ যুদ্ধের। এরকম বহু ঘটনার উল্লেখ আছে আরবের ইতিহাসে যেখানে নবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, জলন্ত আগুনে জল ঢেলে আত্মসম্পরণ করেছে মানুষ তাঁর কাছে।

নজরুল ইসলাম এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে নবীর বিবাহ প্রসঙ্গ, প্রস্তুতি, আচার-অনুষ্ঠানকে তুলে ধরেছেন। বিপুল বিত্তশালিনী খাদিজা ছিল আরবের চিত্তরাণী। রূপে গুণে অতুলনীয়, সতী-সাধ্বী ছিল বলে মানুষ তাঁকে 'তাহেরা' অভিধায় ভূষিত করেন। খাদিজার প্রথম স্বামী আবুহানা। নজরুল খাদিজার ও তাঁর প্রথম স্বামী সম্পর্কে বলেন :

"বীর 'আবুহানা' বিবি খদিজার আছিল প্রথম জীবন-সাথী,
মৃত্যু আসিয়া হরিল তাহারে, খদিজার প্রাণে নামিল রাতি।"৯

খাদিজা বাবার একমাত্র মেয়ে। বাবার মৃত্যুর পর তিনিই ব্যবসার হাল ধরেন। অন্যদিকে দিকে মুহাম্মদের (সাঃ) দক্ষ ব্যবসায়ী ও নিঃস্বার্থ নির্লোভ নামের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। খাদিজা মুহাম্মদকে (সাঃ) নিজ ব্যবসার দায়িত্ব দেন। মুহাম্মদের (সাঃ) আদর্শ ও নিঃকলঙ্ক চরিত্র দেখে খাদিজা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিবাহের প্রস্তাব দেন। মুহাম্মদের (সাঃ) কাকা আবু তালিব এই সংবাদে খুশি হন। মুহাম্মদ (সাঃ) তখন ২৫ বছরের আর বিধবা খাদিজার বয়স ৪০ বছর। বিবাহ হয়ে যায় মুহাম্মদের (সাঃ)। খাদিজা তাঁর সমস্ত ব্যবসার ভার অর্পণ করেন মুহাম্মদকে (সাঃ)। মুহাম্মদ (সাঃ) খাদিজার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আর কোনো বিবাহ করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর ১০ জনকে (মতান্তরে ১২ জনকে) বিবাহ করেন। এদের কারোরই কোনো সন্তান ছিল না। খাদিজার গর্ভে দুই পুত্র এবং চার কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। পুত্ররা শিশুকালেই মৃত্যুবরণ করেন।

নজরুল ইসলাম মুহাম্মদের (সাঃ) সমগ্র জীবনকে নিয়ে কাব্য রচনা করবেন ভেবে ছিলেন। কিন্তু ২৫ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ খাদিজার সঙ্গে বিবাহ ও পরবর্তী কিছু সময় পর্যন্ত বর্ণনার পর কাব্যটি শেষ করেন। সেই অর্থে 'মরু-ভাস্কর' অসম্পূর্ণ। নবী মুহাম্মদের (সাঃ) অর্ধ জীবন বৃত্তান্ত 'মরু-ভাস্করে' স্থান পেয়েছে। নজরুল স্বল্প পরিসরে নবীর ২৫ বছরের জীবনীকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে এবং ইসলামিক ইতিহাসে অদ্বিতীয়। হিন্দুধর্মে মহাপুরুষদের জীবনী নিয়ে কাব্য-কবিতা রচিত হয়েছে অজস্র। কিন্তু ইসলাম ধর্মের কোনো মহাপুরুষকে নিয়ে এরকম রচনা বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আগে বা পরে পাওয়া যায়নি সেইভাবে। তিনিই প্রথম কলমের ছোঁয়ায় হজরত মুহাম্মদের (সাঃ) জীবনীকে সুললিত ছন্দে, সুমধুর ভাষায় লিপিবদ্ধ

করেছেন। হজরত মুহাম্মদের (সাঃ) জীবনী লেখার জন্য নজরুলের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছিল। আর সমকালীন মুসলিম সাহিত্য, সমাজের চিন্তার দিকেও মনোযোগী নজর ছিল তাঁর। বিষয়ের কারণেই গ্রন্থটিতে আরবী-ফারসি শব্দের প্রয়োগ করেছেন বেশি। তবে সেগুলির অধিকাংশই সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির পরিচিত শব্দ। তাই কাব্যটি পাঠের ক্ষেত্রে কোনো রকমের দুর্বোধ্যতা তৈরি হবে না আশা করা যায়। লক্ষণীয় বিষয়- নজরুল তাঁর কবিতার মূল সুর 'সর্বহারা' এবং 'সাম্যবাদী', খুব সুন্দর ভাবে 'মরু-ভাস্করে'ও প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয় সর্গে 'সর্বহারা' আর চতুর্থ সর্গে 'সাম্যবাদী' শিরোনামে দুটি ভিন্ন কবিতা বিশেষ সংযোজনের কারণ। নজরুলের কবিতায় সর্বহারাদের যাতনা দূর করার যে প্রত্যয়, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার যে লড়াই তা নজরুল করে গেছেন আজীবন, তাঁর সঙ্গে মুহাম্মদের (সাঃ) জীবন ও সংগ্রামের এই যে অপূর্ব সাদৃশ্য তা সত্যিই বিস্ময়কর। এমনকি নবীর ব্যক্তিগত মহান দারিদ্র্যের সঙ্গে নজরুলের 'দারিদ্র্য' কবিতার অভিব্যক্তিরও সুন্দর সাদৃশ্য আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। তাহলে কী নজরুল এই মহামানবের জীবনদর্শন ও বাণীকেই ধারণ করেছিলেন চিন্তা ও চর্চার সমস্ত প্রহর জুড়ে ? তাঁর সাহিত্য সাধনা কী সত্যিই সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালিত হয়েছিল নবীর জীবনযুদ্ধ ও অর্জনের অনুপ্রেরণা থেকে ? কবিতা দুটির কিছু অংশ তুলে ধরলাম বোঝার সুবিধার্থে-

সর্বহারা :

"সকলের তরে এসেছে যে জন, তার তরে
পিতার মাতার স্নেহ নাই, ঠাঁই নাই ঘরে।
নিখিল ব্যথিত জনের বেদনা বুঝিবে সে,
তাই তারে লীলা-রসিক পাঠাল দীন বেশে।
আশ্রয়হারা সম্বলহীন জনগণে
-- - - - - - - - - - - - - - - -
ভিখারি সাজায়ে পাঠাল বিশ্ব-দরবারে।"১০

সাম্যবাদী :

"আদি উপাসনালয় –
উঠিল আবার নূতন করিয়া– ভূত প্রেত সমুদয়
তিন শত ষাট বিগ্রহ আর মূর্তি নূতন করি
বসিল সোনার বেদীতে রে হায় আল্লার ঘর ভরি
সহিতে না পারি এ দৃশ্য, এই স্রষ্টার অপমান,
ধেয়ানে মুক্তি-পথ খোঁজে নবী, কাঁদিয়া ওঠে পরান
খদিজারে কন- 'আল্লাতালার কসম, কাবার ঐ
'লোৎ' 'ওজ্জা'র করিব না পূজা, জানি না আল্লবই

নিজ হাতে যারে করিল সৃষ্টি খড় আর মাটি দিয়া
কোন্ নির্বোধ পূজিবে তাহারে হায় স্রষ্টা বলিয়া !

সাধ্বী পতিব্রতা খদিজাও কহেন স্বামীর সনে
দূর করে এ লাত মানাতেরে, পূজে যাহা সব জনে
তব শুভ বরে একেশ্বর সে জ্যোতির্ময়ের দিশা
পাইয়াছি প্রভু, কাটিয়া গিয়াছে আমার আঁধার নিশা।”১১

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদে বিশ্বাস এবং সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি বিষয়ে নিঃসংশয়বাদ কবি চেতনাকে আলোড়িত করেছে সব সময়। কবি নজরুলের সবচেয়ে আবেদন সৃষ্টিকারী কবিতা ‘বিদ্রোহী’তেও আছে সেই অনুভবের স্বীকৃতি। নজরুল সাহিত্যে ধর্ম প্রসঙ্গ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় মানবতাবাদী ধর্ম পরিচয়। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় নজরুলের শ্রদ্ধা যেমন অপরিসীম, তেমনই তাঁর স্রষ্টা ভাবনাও মানবতাবাদের পরিপোষক। তাঁর এই বিশ্বধর্মবোধ ও মানবতাবাদের ছবি শুধুমাত্র ‘মরু-ভাস্করে’ রূপায়ণের ভেতর দিয়েই নয়, বরং কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, গান সমগ্র সাহিত্য পরিসর জুড়েই বিস্তারিত। নিজস্ব ধর্মচিন্তার দর্শনকে আশ্রয় করে তিনি ‘মরু-ভাস্করে’র মাধ্যমে নবী মুহাম্মদের (সাঃ) বার্তাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। ‘মরু-ভাস্করে’র মাধ্যমে পাঠক মুহাম্মদের (সাঃ) জীবন দর্শনের পরিচয় যেমন পাই, তেমনি পাই আরববাসীদের সামাজিক নিয়ম-নীতি, বিবাহ, কন্যা হত্যা, বেশ্যা বৃত্তি , মূর্তি পূজা। এই সব বিষয় গুলিকে নজরুল সহৃদয়তার সঙ্গে আঁকতে পেরেছেন তাঁর কাব্যে। নজরুল মুসলমান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন ইসলামিক বিষয় নিয়ে কাব্য-কবিতা ও গজল রচনার জন্য। তাঁর কবিতা ও গজল মানুষের মুখে মুখে আজও উচ্চারিত। যা অন্য কোনো মুসলমান কবির পক্ষে এই সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব হয়নি।

তথ্যসূত্র :

১. নজরুল রচনাবলী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, পঞ্চমখন্ড, বাংলা একাডেমী ঢাকা, বাংলাদেশ। প্রথম প্রকাশ : ৪ র্থ ও ৫ ম খন্ড যথাক্রম ১৯৭৭ এবং প্রথমার্থ ও দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, পুনর্মুদ্রণ-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯৭৬, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (৫ম খন্ড) ২৭ আগস্ট ২০০৭, প্রথম পুণর্মুদ্রণ মে ২০১১, প্রকাশক – শাহিদা খাতুন, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৩

২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৩

৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৩

৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬২
৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৩
৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৮০
৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯৪
৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯৪
৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯৭
১০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৮০
১১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১১৪

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বিশ্বনবী, হজরত মুহম্মদ (সাঃ) এর জীবনী ও অলৌকিক ঘটনা সমূহ, ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরী

বিশ্বায়ন ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বিপন্নতার অন্তহীন আখ্যান : ভগীরথ মিশ্রের আড়কাঠি

সোমা দাস (চৌধুরী)
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বহুমাত্রিক ও বিস্তৃত প্রেক্ষিতের অর্থব্যঞ্জনা নিয়ে যে শব্দ আমাদের কাছে আজ সুপরিচিত তা হল, বিশ্বায়ন। যে প্রক্রিয়ার মধ্যস্থতায় সমগ্র বিশ্ব একটি 'একক বিশ্ব ব্যবস্থা'-এ (Single global system) রূপান্তরিত হয় তা-ই 'বিশ্বায়ন'। সেক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্ব পায় উন্নত বিজ্ঞান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিশ্বায়ন আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের এক বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ বলা যায়। যা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, এমনকি সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত। সূচনালগ্নে বিশ্বায়নের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল খুবই সুনির্দিষ্ট। যেখানে খণ্ড-খণ্ড জুড়ে অখণ্ড সমগ্রতা গড়ে তোলাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবে সমন্বিত-সমগ্রতার উদ্দেশ্য সফল হলেও খণ্ডাংশগুলির নিজস্বতা ক্ষুণ্ণ হতে বসেছে। এককথায় বলা যেতে পারে, বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবে অংশগুলি হারিয়ে ফেলছে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি সাংস্কৃতিক পরিচিতি। একটি জনগোষ্ঠীর স্বীয় সামাজিক বৈশিষ্ট্যই সেই জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি। যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তাদের স্বতন্ত্র জীবনাদর্শ। দৈনন্দিন, আনুষ্ঠানিক, প্রথাগত, ঐতিহ্যগত যাবতীয় কার্যকলাপ; সেইসঙ্গে বিশ্বাস ও বিশ্বাস-সম্পৃক্ত প্রতীক, ভাষা, শিল্পকলা সম্বন্ধীয় একান্ত সম্পদসমূহ— সামগ্রিকভাবে গড়ে তোলে একটি সাংস্কৃতিক পরিচয় (Cultural Identity)। কিন্তু ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের আগ্রাসন নীতি, যা মানুষের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে মূল্যবোধহীন লোভাতুর প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেছে; তারই প্রাবল্য আজ আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় বিপন্নতাকে অবধারিত ভবিতব্যের পর্যবসিত করে তুলেছে। এমনই বিপন্নতার আখ্যান বয়ান করলেন ভগীরথ মিশ্র তাঁর 'আড়কাঠি' উপন্যাসে।

সূচক শব্দ : বিশ্বায়ন, আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক পরিচয়, লোকসংস্কৃতি, বিপন্নতা।

মূল আলোচনা :

মানব জাতির উত্থান ও অগ্রগতির দীর্ঘ পথ অতিক্রমনের ইতিবৃত্তই মানব জাতির শাশ্বত ইতিহাস। যে ইতিহাস সাক্ষী থেকেছে বহু বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের। সেই অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব বর্তায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর ক্রম-উন্নয়ণের উপর। বলা যায়, অভূতপূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষই আধুনিকায়নের চাবিকাঠি। এরই প্রশ্রয়ে শিল্পবিপ্লবের হাত ধরে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল একসময়। তারপরের ইতিহাস আমাদের

অজানা নয়। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে আধুনিকায়নের সূত্রেই পাশ্চাত্য তথাকথিত উন্নত জাতি সমূহের উত্থান ও বিশ্বময় তাদের অপ্রতিরোধ্য একাধিপত্যের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত প্রত্যক্ষদৃষ্ট। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের ওপর এর প্রভাব সামগ্রিকভাবেই বর্তেছে। ফলত জাতীয় রাজনীতি- অর্থনীতি আর বিশ্বরাজনীতি- অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একক অস্তিত্বে টিকে থাকতে পারেনি। কারণ বিগত শতাব্দী থেকেই শুরু হয়ে গেছে বিশ্বকে 'একক বিশ্ব ব্যবস্থা'-র (Single global system) অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া। তথ্য বলে Global শব্দটি আনুমানিক চারশো বছর পুরানো হলেও ১৯৬০ সালের পূর্বাবধি Global শব্দ সম্পৃক্ত কোন শব্দ প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়নি। তবে একথা ঠিক যে ১৯৬০-৭০-এর দশকেই সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনায় 'বিশ্বায়ন' শব্দটি উঠে এসেছে এবং এর প্রসার যেমন বহুস্তরীয়, তেমনই বহুধা প্রেক্ষিতে বিস্তারলাভ করেছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে আধুনিক উন্নত সর্বস্তরীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত অত্যাধুনিক উন্নয়ণ। এখন প্রশ্ন হল, এত কিছুর পরেও বিশ্বায়ন সম্পর্কিত মূল্যায়নের নেতিবাচকতা আজ কেনো এত বেশি করে প্রকট হয়ে পড়েছে? আসলে যে বিশ্বায়নের মৌলিক উদ্দেশ্যই ছিল খণ্ডিতের ধারণা থেকে সমগ্রের ধারণায় উন্নীত হওয়া, তা একত্রীকরণ ও চূড়ান্ত আগ্রাসনে পর্যবসিত হয়েছে। এই আগ্রাসন এতটাই তীব্র যে, তা আজ আমাদের সামগ্রিক জাতীয় পরিচিতি (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক) বিলুপ্তিকে প্রায় অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। 'বিশ্বায়ন' শিরোনামাঙ্কিত অন্তঃসংযুক্তিকরণ জালিকা ব্যবস্থার আন্তঃনির্ভরশীলতার মাত্রাগত বৈষম্যমূলক তারতম্যই এই বিপন্নতার কারণ বলা যায়। এমনই পরিচয় বিপন্নতার কাহিনি বয়ানে বাঁকুড়া-মেদিনীপুর সীমান্তবর্তী পাহাড়, ডুংরী, জঙ্গলঘেরা গজাশিমুলের বসু-শবর জনজাতির অব্যক্ত যন্ত্রণার অন্তহীন আখ্যান শোনালেন কথাসাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র তাঁর 'আড়কাঠি' উপন্যাসে।

ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ সরলরৈখিক দুটি উদ্দেশ্যধারা স্পষ্টতা পেয়েছে। প্রথমত: চরম অনিশ্চয়তায় জর্জরিত একটি প্রান্তিক জনজাতির নিজস্ব অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে গতানুগতিক প্রচেষ্টা- সম্বলিত জীবন-অতিবাহন প্রাধান্য পেয়েছে। উল্লেখ্য সেই প্রচেষ্টায় কোনো বিশেষত্ব প্রকাশ পায়নি। এক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথাগত অর্থনীতির নির্ধারিত নিয়মকে মেনে অবধারিত ভবিতব্যে নিজেদের উৎসর্গ করা বত্রিশ ঘর বসু-শবর এবং সেই নির্ধারনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে দাস-ব্যবসায়ী রঙলাল— উভয় পক্ষ সমমাত্রিক অবস্থানিক সমান্তরালতায় উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত: রঙলালের অস্তিত্ব মুছে দিয়ে, খণ্ডিত জীবনকে বৈশ্বিক অখণ্ডতার অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্যে দিয়ে কতখানি তাদের যাপিত জীবনের গতিপথকে পরিবর্তিত করা গেল, বা আদৌ করা গেল কিনা তারই বিস্তৃত পর্যালোচনাই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যধারার মূল উপজীব্য হিসেবে স্পষ্ট করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রার ভূমিকায় পাই লোকসংস্কৃতি

প্রেমী অধ্যাপক রাজীব চৌধুরীকে। বাঁকুড়ায় এক স্বপ্নের জগৎ আবিষ্কার করেছেন রাজীব, ছাত্র সুনীলের সহায়তায়। তারপরে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। লোকসংস্কৃতিকে ভালোবেসে তাকে খোঁজার নেশাটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল তাঁর মধ্যে। যত খুঁড়েছে ততই গভীরে প্রবেশ করেছেন। প্রাথমিকভাবে সেই নেশা এতটাই নিয়ন্ত্রিত ছিল যে, সেই নেশা তাঁর স্নায়ুগুলিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনাধীন করে ফেলতে পারেনি। আর পারেনি বলেই রিক্ত-নিঃস্ব মানুষগুলির অপারগতা, যন্ত্রণা, অপ্রাপ্তি, আকাঙ্ক্ষা, অসহায়তা তাঁকে ভিতরে-ভিতরে উদ্বিগ্ন এবং সেই সঙ্গে বদ্ধপরিকরও করে তুলেছিল। তাই রঙলালের দাদন ফাঁদ থেকে গজাশিমুলের বসু-শবরদের মুক্ত করবার চ্যালেঞ্জ নিতে দ্বিতীয়বার ভাবেন নি। কিন্তু ধীরে ধীরে নেশা যখন রাজীবকে আচ্ছন্ন করতে শুরু করে তখনই সমব্যথী অনুভূতিগুলি ভোঁতা হতে হতে একসময় প্রায় সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়ে যায়। আর তার পরিবর্তে লোভাতুর আগ্রাসন চারিয়ে যায় তাঁর শিরায় শিরায়। 'গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ'-এর শিল্পীরা তখন হয়ে ওঠে তাঁর কাছে অর্থ-যশ-প্রতিপত্তি লাভের ঘুঁটি। রাজীবের বদলে যাওয়া মানসিকতার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে তাঁর পূর্বাপর বক্তব্যে, ভাবনায়, কার্যকলাপে। গজাশিমুলের সরল মানুষগুলি যখন প্রথম-প্রথম শহুরে কাঁকড়া হিসেবে রাজীবকে বিশ্বাস করতে মানসিক দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত, তখন রাজীব তাঁদের সকলকে আশ্বস্ত করতে নিজের উদ্দেশ্য খোলাসা করতে গিয়ে বলেছিলেন—

> "গাছে মিষ্টি আমটি পেকেছে, লোকচক্ষুর আড়ালে, আমি চাই, মিষ্টি আমটি দুনিয়ার তবত মানুষ খাক।"[১]

সত্যিই তো, প্রাথমিকভাবে মহৎ উদ্দেশ্য ও তা চরিতার্থতায় কোনো কূটনৈতিক অভিসন্ধিমূলক প্রবণতা ছিল না। অথচ সেই রাজীবই ধীরে ধীরে পালটে যায়। দলের কল-শো নিয়ে রাজীবের ব্যস্ততায়, ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশনের ইস্টার্ন জোনের ডিরেক্টর ক্যাথি বার্ডের অভিজ্ঞ চোখে তা ধরা পড়েছে।

> "আই সি — প্রচুর কল-শো পাচ্ছ তোমরা, তাই না ? ... ...
> ব্যাপারটাকে কি কমার্শিয়াল করতে চাইছ ? "[২]

আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবর্ধমান বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্থানীয় তথা জাতীয়-অর্থনীতির একক-বৈশ্বিক-অর্থনীতিতে উন্নীত কিম্বা একীভূতিকরণের প্রক্রিয়া, যাকে আমরা বিশ্বায়ন বলে থাকি, উপন্যাসে গজাশিমুলের প্রান্তিক মানুষগুলির জন্য ক্যাথি বার্ডের পর্যায়ক্রমিক সুপরিকল্পিত কর্মকৌশল ও প্রয়োগ তাকেই স্পষ্ট করে তোলে। সে খুব ভালো করেই জানে দুঃস্থতার শেষ সীমায় দাঁড়ানো মানুষগুলি, যারা খিদের তাড়না থেকে রেহাই পেতে ঝোরার জল খায় অথবা নিজেদের কাছের মানুষগুলিকে ন্যূনতম মূল্যে দাদন খাতায় চিরতরে বেঁধে দিতে কিম্বা বেচে দিতে দ্বিতীয়বার ভাবে না। তাঁদের আয়ত্বে রাখার একমাত্র পথ তৈরি করতে পারে আর্থিক সহায়তা। আর এই পথই

তাঁদের যাপিত জীবনে ক্যাথি বার্ডদের অন্তর্ভুক্তির অন্যতম রাস্তা। শুধু টাকা ছড়িয়ে ফোক বাঁচানো যায় না। কারণ দ্রুতগতিসম্পন্ন বিশ্বে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অতিরিক্ত আরও কিছু চাই। এই কারণে ক্যাথি বার্ডরা সুপরিকল্পিত পরিকল্পনায় সুখ-স্বপ্নের প্যাকেজ দিতে চায় সুচাঁদ ভক্তাদের —

> "... সেসব কথাও আমরা ভেবেছি। সবকিছুকে মাথায় রেখে একটা দীর্ঘমেয়াদী মাস্টার-প্ল্যান বানাতে চাই আমরা। একটা ইনটেনসিভ সার্ভে প্রোগ্রামও নেব। তারপর শুরু হবে তৃতীয় পর্যায়ের কাজ। ততদিনে ঐ সেন্টারটিও কলেবরে অনেক বাড়বে। তৈরী হয়ে যাবে রিসার্চ-সেল, মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, আরো অনেক কিছু থাকবে। পাশাপাশি সেন্টারেরই নেতৃত্বে চলবে সারা এলাকা জুড়ে আমাদের সোস্যাল এবং রিলিফ প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রামে কিছু রাস্তাঘাট হবে, ইস্কুল হবে, মেডিকেল এইড্ সেন্টার হ্যান্ডিক্রাফট্ ইউনিট —।"[৩]

ক্যাথি বার্ডের এই পরিকল্পনা বিশ্বায়নেরই চূড়ান্ত প্রতীকী উপস্থাপনা তা বলাই বাহুল্য। বিশ্বায়নের নিরিখে মানুষের দারিদ্র্যতাও বিপণনের পণ্য হয়ে ওঠে। তাঁদের অসহায়তা তাঁদের শরীর-মন এমন কি তাঁদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির একান্ত গোপনীয় বিষয়ও খোলা বাজারের সামগ্রী হয়ে যায়। তাই খোলা আকাশের নিচে একই চাটাইয়ে বিছানাপত্র, বাসন-কোসন-ছাগল-মুরগী-মানুষকে background রেখে উলঙ্গশিশু ও পাতিহাঁসের একই এনামেলের থালা থেকে খাবার খুঁটে খাওয়ার ক্যামেরাবন্দি স্থিরচিত্রকে 'দ্য ফোক' পত্রিকার কভার পেজের ছবি হিসেবে নিজের নির্বাচনে ক্যাথি বার্ডরা একই সঙ্গে গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রাজীব সংস্কৃতি সংঘের কল শো নিয়ে। মুখে যতই না বলুক কিম্বা যতই এই হতদরিদ্র মানুষগুলির ভালো করে বাঁচায় তথা মুক্ত জীবনের আস্বাদ দানের প্রয়াসকে জোর গলায় ঘোষণা করুক; সুনীল কিম্বা সুচাঁদদের চোখে কিন্তু ধরা পড়ে যায় তাঁর অর্থগৃধ্নু নিকৃষ্ট চেহারাটা। শুধু তাই নয় সংস্কৃতি প্রেমী থেকে আদ্যন্ত মুনাফালোভী ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে অথবা ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিশ্বায়ন এভাবেই ক্রমান্বয়ে চুইয়ে-চুইয়ে ঢুকে পড়েছে আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থলে। বিষিয়ে দিচ্ছে প্রতিটি পরিসরকে।

মানব জাতির আপন অস্তিত্বের প্রত্যয়ী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নৃতাত্ত্বিক E.B.Tylor-এর মতানুসারে সংস্কৃতি হল—

> "... That complex whole which includes knowledge, belief, art morals, law, custom And any other capabilities and habits acquired by man as a member of society."[৪]

সুতরাং যে কোনো জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনচর্যাসম্পৃক্ত যাবতীয় বিষয় সমূহ যথা- খাদ্য, পোশাক, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রতীক, সংস্কার,

লৌকিক শিল্পকলা প্রভৃতি যা তাঁদের যাপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতোপ্রতভাবে জড়িত, সেই সমস্ত কিছুর সমবায়েই সামাজিকভাবে গড়ে ওঠে সেই নির্দিষ্ট জনজাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় (Cultural Identity)। রাজীবের সদর্থক প্রচেষ্টায় গজাশিমুলের বসু-শবরদের এমনই একটা সাংস্কৃতিক পরিচিতির উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছিল। এতদিন নিজেদের অসহায়তাকে মেনে নিয়েই আধুনিক সভ্য সমাজের থেকে যতটা সম্ভব দূরবর্তী ডুংরী-পাহাড়-জঙ্গলের অন্তর্বর্তী অন্তরালে নিজেদের অবস্থানকে আপাত সুরক্ষিত রেখে চলেছিল এই 'পাহাড়িয়া জাতি'। রাজীবের প্রচেষ্টার সঙ্গে ক্যাথি বার্ডের সহায়তা এই প্রান্তীয় জাতিটিকে নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠায় সচেতন করে তুলেছিল। বিশ্বায়নের দৌলতে বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্তিকরণের পথও প্রশস্ত হতে শুরু করেছিল। সেক্ষেত্রে রাজীব ও ক্যাথিবার্ডের উদ্যোগ, সংকল্প এবং প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়। বিশ্বায়নের নেতিবাচক অন্ধকার দিক হয়ে যখনই পণ্যায়নের মনবৃত্তি রাজীবের সমস্ত শুভবুদ্ধি ও প্রয়াসকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, তখনই লোকসংস্কৃতি প্রদর্শন নিছক ফূর্তি লোটার আধার হয়ে উঠেছে। যা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে, যখন বসু-শবরদের গোপন লোকাচার যা ধর্মীয় সংস্কারের অনুষঙ্গ হিসেবে 'জলকেলি নৃত্য'-এর মাধ্যমে শুধুমাত্র কানাইশরজীউর প্রতি ঐকান্তিক পবিত্র নিবেদনের অঙ্গ। সেই নৃত্যই খোলাবাজারে বিনোদনের সামগ্রীতে পরিণত করা হয়েছে। এতে শুধু এর পবিত্রতাই নষ্ট হয়নি, সেই সঙ্গে সহজ মানুষগুলির সরল বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। যা দশরথ ভক্তার হা-হুতাশে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

> " যা ছিল আমাদের একান্ত গুপ্ত চিজ, জাতির পুরুষরাও যে চিজ দেখে নাই আইজতক্ক, সে চিজ দুনিয়ার মনিষ্যি দেইখ্যে লিল্যাক্। এ ছিল আমাদের সাধন-লাচ, কানাইশরজীউর সাথে যোগাযোগের মাইধ্যম্ সে আইজ হইল্যাক শহরের বাবু-ভায়াদ্যার আমোদের চীজ।"[৫]

একই সঙ্গে বসু-শবর গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ রাজীবের বিশ্বায়নের ঘোর লাগা নেশাতুর মন কোনোভাবেই একে গুরুত্ব দিতে নারাজ। কারণ তাঁর কাছে ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক পরিচয় আঁকড়ে থাকা নিছকই সংস্কার, পিছিয়ে পড়া ধ্যানধারণা।

> " যখন দুনিয়া জুড়ে নাম হবে, বিপুল অর্থ আসবে ঘরে, অর্থ এলেই আসবে ভালো খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিলাস-সামগ্রী, ক্রমে ক্রমে শিক্ষা, আধুনিকতা— জীবনের ধারা এবং ধারণাই যাবে বদলে, তখন ভাবনার প্রক্রিয়াটাই হবে পৃথক। সারা বছর হিল্লি-দিল্লি চক্কর মারতে মারতে মনটাই হয়ে উঠবে কস্‌মোপলিটন, তখন কোনও রুচি-

> সংস্কৃতি- প্রক্রিয়াকে আঁকড়ে থাকবে লুকিয়ে রাখব, এসব ধ্যান-ধারণা ফিকে হয়ে আসবেই।”[৬]

যেমন রাজীব নিজে নিজেরই ধ্যানধারণা, মানসিকতা, দৃষ্টি সবকিছু বদলে নিয়েছিল। যা খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে বাজোরিয়ার সঙ্গে শো'য়ের ডিল করতে গিয়ে রাজীবের বক্তব্যে—

> “ ... তবে সম্প্রতি আমরা রেট রিভাইজ করেছি। আট হাজার। দলের ম্যানেজারকে ঐ টাকাটাই দেবেন। বাকিটা আমাকে। আপনি তার থেকে কমিশন পাবেন। টুয়েন্টি পারসেন্ট। বুঝতেই পারছেন ঐ বাইশ হাজারের কোনও রসিদ পাবেন না।”[৭]

রাজীব শুধু পাকা ব্যবসায়ী নয় পরবর্তিতে রীতিমত ‘দালাল’ হয়ে উঠেছে। প্রকৃত অর্থেই রঙলালকেও ছাপিয়ে গেছে। রঙলাল কৌশলে নারীদের চা বাগানে বা বিভিন্ন শহরের নিষিদ্ধ পল্লীর জীবন অতিবাহনে বাধ্য করেছে। আর রাজীব তাঁদের আন্তর্জাতিক স্তরের দেহোপজীবিনীর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। রাজীবের দৃষ্টি বদলে গেছে, তাই যে রঙীদের মাথায় হাত দিয়ে আশ্বস্ত করেছিল অভিভাবকের মতো, তাঁদের জীবনের সংকট মোচনের প্রচন্ড তাগিদে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। সেই দৃষ্টি কোথায় ? এখন তার চোখে রঙী ‘ডব্‌কা ছুঁড়ি’, লোভনীয় পণ্য —

> “... এ দলে জনা বারো মেয়ে আছে। সবগুলোই এক একটি জুয়েল। তার মধ্যে একটা ডব্‌কা ছুঁড়ি আছে, দেখেছেন তো ? ওকে দেখলে আপনার বড় বাজারের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে মশাই।ওর এক-একখানি বুকই আঠারো হাজারে বিকোবে।”[৮]

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে উৎকর্ষতার প্রশ্নে বিশ্বায়ন যেমন শুধু পণ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বিস্তার ঘটেছে সাংস্কৃতিক বোধেও। বিপরীতে তেমনই মূল্যবোধগত অবনমনের নিরিখে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি পণ্যে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের ইতিবাচক সম্ভাবনায় একসময় সুচাঁদ, কান্‌চা মল্লিক, বদন কোটাল, কৌশল্যা, একাদশী, মউলী, পার্বতী, সোহাগী, সুখী, রঙীদের চোখে জীবনটা অন্যভাবে ধরা দিতে শুরু করেছিল। যে জীবন স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন দেখার সাহস জোগায়। সেই আশা ও সাহসে ভর করেই সুচাঁদরা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে, তাঁরা বিশ্বাস করতে শুরু করে আর মাত্র পাঁচটা বছর এভাবে চললেই তারা অন্য জীবনের আস্বাদ পাবে। সরল মানুষগুলির সোজা-সাপ্টা সহজ হিসেব —

> “ পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছে ওরা আজকের শো'তে। ... ... দলের বত্রিশজন পাবে একশো টাকা করে। যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া, হোটেলভাড়া ইত্যাদিতে লাগবে হাজার টাকার মতো। বাকি রইলো আটশো। সংঘের ফান্ডে জমা পড়বে সেটা। প্রতি শো' থেকে এমনি করে

> কিছু কিছু জমা পড়লে দু,এক বছরের মধ্যে গড়ে তোলা যাবে, গজাশিমুল স্বয়ম্ভর সমিতি। তাতে ঋণ-দাদনের ব্যবস্থা থাকবে। ধর্মগোলা হবে। তারপর সবাইয়ের জন্য পড়াশুনোর ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, আরো, আরো অনেক কিছু হবে। সেসব রয়েছে সুচাঁদের স্বপ্নের মধ্যে। বছর পাঁচেকের মধ্যেই, সুচাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, গজাশিমুলের ভোলই বদলে ফেলা যাবে।”[৯]

তাই সুনীল যে ইঙ্গিত দিয়েছিল মাস্টারদার কার্যকলাপ সম্পর্কে, তা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে চায়নি তাঁরা। তবে হ্যাঁ , বুকের মধ্যে কী যেন একটা কাঁটার মতো খচ্খচ্ করেছে। একটা চোরা আশঙ্কা বারবার দুলে-দুলে উঠেছে — “ সইবে তো, অত সুখ, গজাশিমুলের মানুষগুলির কপালে।” না সয় নি। বিশ্বায়নের নেতিবাচক ফলশ্রুতি সইতে দেয় নি সত্যিকারের সুখকে। তাই যে লোক-সংস্কৃতি ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে এক নির্দিষ্ট জনজাতির একান্ত গোপন ঐতিহ্য হয়ে, অখণ্ড বৈশ্বিকীকরণের অছিলায় তা কলুষিত হয়ে উঠেছে। জাতির আব্রু ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রকৃত অর্থেই ঐতিহ্যের গুপ্তহত্যা সংঘটিত হয়েছে। তাই গভীর রাতে চারদেওয়াল ও বন্ধ দরজার আড়ালে ক্ষুধার্ত পুরুষের কামনা পূরণ নয়, খোলা বাজারে রঙীর ‘উদম শরীরের ফটো’ বিক্রির মধ্যে দিয়ে বিকিয়ে গেছে নারী সম্ভ্রম। বিপন্নতার শেষ সীমায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে।

> “মাথায় একরাশ বোঝা নিয়ে মধ্যরাতে সুচাঁদের দল গুটিগুটি হাঁটতে থাকে হাওড়া স্টেশনের দিকে। এ বুঝি এক অনন্ত পথ, গন্তব্যে পৌঁছুতে এমনিতরো কত হাজার রাত্রি যে নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে যাবে তার বুঝি ইয়ত্তা নেই ......।”[১০]

এভাবেই বিশ্বায়নের আগ্রাসন গজাশিমুলের বসু-শবরদের পরিচিতির উপর ঘন ছায়া ফেলেছে যে ছায়া অন্তহীন অন্ধকারেরই নামান্তর। এঁদের জানা নেই এর থেকে কীভাবে মুক্তি পাবে তারা। আদৌ মুক্তি পাবে কিনা। ভোগবাদী অত্যাধুনিক বিশ্বনীতি তথা বিশ্বায়নের আগ্রাসন আজ তাই চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে সভ্যতার কপালে। ধীরে ধীরে এই প্রক্রিয়া চারিয়ে যাচ্ছে জাতির কাঠামোর গভীরে। আর ধ্বস্ত করে দিচ্ছে আমাদের সত্তাকে। বিপন্ন করে তুলছে আমাদের সামগ্রিক পরিচিতিকে।

তথ্যসূত্র:

১. ভগীরথ মিশ্র, আড়কাঠি, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৯, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ৫৫।

২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৪।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৪।

৪. M. Francis Abraham, Contemporary Sociology: An Introduction to concepts and theories, Oxford University Press, 2006, P- 53.

৫. ভগীরথ মিশ্র, আড়কাঠি, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ১৪৭।

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৮।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৭।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৮।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৮।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৯-১৬০।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ভগীরথ মিশ্র, আড়কাঠি, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯।

২. M. Francis Abraham, Contemporary Sociology: An Introduction to concepts and theories, Oxford University Press, 2006.

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা উপন্যাস : বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিসর

সুকন্যা বেরা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ধারায় বহুল বিখ্যাত সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিনমাসি। আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত মিতিন তার বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে রহস্যের জাল ভেদ করে। মিতিনের প্রখর ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধির ঝলক, সাংসারিক খুনসুটিতে ভরে ওঠে পাঠকের মন। কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনির এই চেনা ছন্দের ফাঁকে ফাঁকে লেখিকা তাঁর কিশোর সিরিজের উপন্যাস গুলিতে হাজারো মণিমুক্তা ছড়িয়ে রেখেছেন পাঠকের জন্য। অত্যন্ত সুকৌশলে কাহিনির পরতে পরতে শিশু-কিশোর তথা আপামর পাঠকের কাছে নিয়ে এসেছেন আমাদেরই পাশে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহুবছর ধরে বসবাসকারী ইহুদি, চিনা, আর্মেনিয়ানদের মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাস, ধর্মীয় সংস্কার, ও লোকাচারের নানা অজানা কথা। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতির টানে, ব্যবসাবাণিজ্যের সূত্রে বহু মানুষের সমাগম ঘটেছে। তাদের মধ্যে বহু মানুষই আর ফিরে যাননি নিজের ফেলে আসা দেশে, এই দেশকেই ভালোবেসে থেকে গেছে এখানে। তাদের পরবর্তী বংশধরেরাও অন্যান্য ভারতবাসীর মত হয়ে উঠেছে এই দেশেরই সন্তান। এই বহু সংস্কৃতির আগমনে সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতবর্ষ। কিন্তু এতবছর ভারতে বসবাস করেও আজ তারা প্রায় অবলুপ্তপ্রায়, তাদের সন্তানদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ফিরে যাওয়ার মানসিকতা। অত্যন্ত যত্নসহকারে সুচিত্রা ভট্টাচার্য রহস্যের সমান্তরালে নব্যপ্রজন্মের পাঠকের কাছে প্রায় অজ্ঞাত এই প্রতিবেশী সংস্কৃতির মানুষগুলির আগমন, বর্তমান ছবি, তাদের বিশ্বাস, রীতি-নীতি, ধর্মীয় সংস্কারের বাস্তব ছবি তুলে ধরেন।

সূচক শব্দ: মিতিনমাসি, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ভিন্নধর্ম, বহুমাত্রিক সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস, সাংস্কৃতিক একতা।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা উপন্যাস : বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিসর

রহস্যরোমাঞ্চের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন। তাই পৃথিবীব্যাপী বহুবিখ্যাত সাহিত্যধারার মাঝে গোয়েন্দাগল্পের জনপ্রিয়তা শীর্ষে। যুগ যুগ ধরে সাহিত্যিকদের হাত ধরে রহস্যগল্প ও তুখোড় গোয়েন্দা চরিত্রের আগমন ঘটেছে বইয়ের পাতায় পাতায়। বাংলা গোয়েন্দাগল্পের কথা বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে ফেলুদা, ব্যোমকেশ, কিরীটী, কাকাবাবুর মত একের পর এক পুরুষগোয়েন্দা চরিত্র। আসলে গোয়েন্দা বলতে সাধারণত পুরুষগোয়েন্দাদেরই আমরা বুঝে থাকি, সে গল্পেরপাতায় হোক কিংবা বাস্তবজীবনে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না।

তবুও বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে গোয়েন্দা হিসেবে কোনো নারীকে পাই না, একথা বলা যায় না। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কৃষ্ণা, অদ্রীশ বর্ধনের নারায়ণী, অজিতকৃষ্ণ বসুর নন্দিনী সোম, তপন বন্দোপাধ্যায়ের গার্গী – এরা সকলেই বাংলাসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নারীগোয়েন্দা। তবু একথা সত্য এরা সকলেই নিজস্ব স্বকীয়তায় বিরাজমান হলেও কোথাও পাঠকমনে পুরুষগোয়েন্দাদের পাশে নারীগোয়েন্দাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না, বিপুলসংখ্যক পাঠক সৃষ্টিতে সক্ষম নারীগোয়েন্দা চরিত্রের খুব একটা দেখা মেলেনি। ব্যতিক্রম কেবল একজনই- সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিনমাসি ওরফে প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জ্জী।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। গভীর অনুভূতিশীল ও প্রখর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী সুচিত্রা ভট্টাচার্য আন্তরিক ভাবে অনুভব করেছিলেন চারপাশের সময়-সমাজের পরিবর্তনশীলতাকে। বিংশ শতকের শেষলগ্ন থেকে শুরু করে,একবিংশ শতকের প্রথম দেড়দশক ধরে আমৃত্যু রচনা করেছেন অজস্র গল্প, উপন্যাস। তন্মধ্যে বহুল চর্চিত ও জনপ্রিয় হল তাঁর মহিলা গোয়েন্দা- মিতিনমাসির রহস্য অভিযানের রচনাগুলি। শিশু-কিশোরদের পাশাপাশি মিতিনমাসির পাঠককুলের মধ্যে সমানভাবে দেখা যায় আগ্রহী প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের। ছোটো ও বড়োদের জন্য রচিত মোট উনিশটি উপন্যাস ও গল্পে আমরা মিতিনমাসিকে পেয়ে থাকি। শিক্ষিতা, বিদুষী আধুনিক নারী মিতিন। ক্ষুরধার বুদ্ধি নিয়ে করে চলে একের পর এক জটিলতার সমাধান। টানটান রহস্যের কথাবয়নে মগ্ন হয়ে থাকে পাঠককুল। কিন্তু শুধুমাত্র এই মনমুগ্ধকর রহস্য রোমাঞ্চের আধারেই শেষ হয়ে যায় না তাঁর গোয়েন্দাগল্পগুলি। অসাধারন লেখনী দক্ষতায় লেখিকা তাঁর গোয়েন্দা কিশোর সাহিত্যসিরিজের উপন্যাসগুলিতে সুকৌশলে রহস্য রোমাঞ্চের পাশাপাশি নব্যপ্রজন্মের পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন কলকাতা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহুবছর ধরে বসবাসকারী ইহুদি, চিনা, আর্মেনিয়ান, পারসি, জৈনর মতো ভিন্নসংস্কৃতির সাথে। যুগ যুগ ধরে ভারতের মাটিতে আগমন ঘটেছে এই বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের। আজও ভারতের বিভিন্নস্থানে বহুভারতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশিই ছড়িয়ে রয়েছেন এই ভিন্নসংস্কৃতির মানুষগুলি। কিন্তু বহুবছর পাশাপাশি বসবাস করেও তারা যেন আজও রয়ে গেছে আমাদের অচেনা। অত্যন্ত সহানুভূতিশীলতার সাথে লেখিকা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সেই না জানা জগৎটিকে এবং গল্পচ্ছলে পাঠককে জানান দিচ্ছেন সেই ভিন্নসংস্কৃতির মানুষদের বিভিন্ন রীতি-নীতি, সংস্কারের কথা; তাদের অতীত ইতিহাস তথা বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তবচিত্র। “সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা উপন্যাস : বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিসর” এই আলোচনা পত্রে সেই ভিন্নসংস্কৃতির আলোকেই গোয়েন্দা কাহিনিগুলি দেখার চেষ্টা করব-

কিশোর সিরিজের জনপ্রিয় মনমুগ্ধকর উপন্যাস “কেরালায় কিস্তিমাত”। এখানে সপরিবারে মিতিনের গন্তব্য কেরালা। মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও টানটান রহস্যের পাশাপাশি আমরা জানতে পারি কেরালার প্রাচীন ইতিহাস তথা কেরালায় কয়েক পুরুষ ধরে অবস্থিত ইহুদিজাতির কথা। যেমন অসাধারন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তেমনি লোমহর্ষ ইতিহাসের সাক্ষী এই কেরালাভূমি; উপন্যাসে অবনীর মুখে শোনা যায়-

> “কেরলের হিস্ট্রিটাই পিকিউলিয়ার। ভারতের এখানেই প্রথম গির্জা, এখানেই প্রথম মসজিদ, এখানেই প্রথম সিনাগগ”[১]

জানতে পারি “ডাচ প্যালেসের” প্রাচীন ইতিহাস। নামে ডাচ প্যালেস হলেও এটি মূলত পর্তুগিজদের দ্বারা নির্মিত, পরে ডাচরা এসে পর্তুগিজদের হঠিয়ে পুনরায় রাজাকে উপহার দেন। তখন থেকেই ডাচ প্যালেস নামে খ্যাত প্রাসাদটি।

এছাড়া জানতে পারি মাট্টানচেরিতে অবস্থিত “ইহুদি সিনাগগ”এর কথা। সিনাগগ অর্থাৎ উপাসনালয়। সিনাগগটি নির্মিত হয় ১৫৬৪তে, কোচির রাজা ভাস্কর প্রথম রবি বর্মা ইহুদিদের এই জমিটি দান করেন, সিনাগগের দেওয়ালে তামার পাতে স্মরণ করা হয়েছে সেই কথা। ৬৬২তে পর্তুগিজদের আক্রমনে গির্জাটি নষ্ট হয়ে যায়, তার ২বছর পরে ডাচেরা নতুন করে নির্মাণ করে। বেলজিয়াম থেকে আনা ঝাড়লণ্ঠন, চীনদেশ থেকে আনা টাইলসে সজ্জিত সিনাগগ শুধুমাত্র ইহুদি নয়, আপামর ভারতবাসীর কাছেই এক পবিত্র স্থান।

পরিচিত হয়ে উঠি ইহুদিজাতির অনেক ধর্মীয় সংস্কারের সাথে। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তালমাদ। তাদের পবিত্র অনুশাসনলিপি অর্থাৎ টেন কমান্ডমেন্টসকে বলা হয় পেন্টা টিউক। আর অনুশাসনগুলি হল টোরা। লিপিটিকে গুটিয়ে রাখা হয় বলে পেন্টা টিউক গ্রেট স্ক্রল নামে পরিচিত। ছাগলের চামড়ার ওপর হিব্রু লিপিতে লেখা এই অনুশাসনটি পবিত্র সিনাগগের দেওয়ালসিন্দুকে রক্ষিত থাকে। এবং একমাত্র স্যাবথের দিন অর্থাৎ বিশ্রামের দিন যেটি ইহুদি মতে শনিবার, ওইদিন তাঁদের রাবি অর্থাৎ পুরহিত গ্রেটস্ক্রলটি পাঠ করেন।

মাট্টানচেরির এই সিনাগগটি কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ইহুদিপল্লী প্রাচীন “জু টাউন”। সম্ভবত ফিফটিন সেঞ্চুরিতে নেবুচাদনেজার জেরুজালেম দখলের পর ইহুদিরা চলে আসে ভারতবর্ষে। ইয়েমেন, ব্যাবিলন, স্পেন এর বিভিন্নঅঞ্চল থেকে এসে বসতি গড়ে তোলে। মাট্টানচেরির অনেকাংশই ইহুদিদের দ্বারা নির্মিত। কিন্তু বহুবছর ভারতবর্ষে বসবাসের পরও নবীনপ্রজন্মের অনেকেই ফিরে যাচ্ছেন নিজদেশে, কেবলমাত্র রয়ে গেছে পূর্বপ্রজন্মের মানুষগুলি। যাদের কাছে ভারতই তাদের দেশ, উপন্যাসের বয়নে ফুটে ওঠে সেই শূন্যতার ছবি-

> “সেই আমরাই এখন মাট্টানচেরি থেকে হারিয়ে জাচ্ছি,........গোটা মাট্টানে আমরা পড়ে আছি মাত্র জনাষাটেক। তাও বেশির ভাগই বুড়োবুড়ি। আমাদের ছেলেমেয়েরা তো আর এ-দেশে থাকতেই চায় না”[২]

এইভাবে অতীত ঐতিহ্য, সংস্কার তথা বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তব ছবি ফুটে ওঠে উপন্যাসের কথাবয়নে।

কিশোর গোয়েন্দা সিরিজের অন্য একটি আকর্ষণীয় উপন্যাস হল “ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য”। উপন্যাসের কথাবয়নে রয়েছে কলকাতায় বসবাসকারী চিনাব্যক্তি ঝাও ঝিয়েন এর হত্যা ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ম্যাপের অন্তর্ধানের কাহিনি। কলকাতা শহরে চাইনিজদের বাস প্রায় দুশোবছর পুরানো, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে। কলকাতায় এদের সংখ্যা প্রায় কুড়িহাজার। অথচ এতো গুলো বছর পাশাপাশি বসবাসের পরও তারা রয়ে গেছে আমাদের অচেনা। উপন্যাসে অবনীর মুখ দিয়ে যেন উচ্চারিত হয় স্বয়ং লেখিকার আক্ষেপধ্বনি-

> “অথচ কী আশ্চর্য,ভাব তুই, এত বছর ধরে এত লোক আমাদের প্রতিবেশী হয়ে থাকা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু সেভাবে তাদের চিনিই না। তাদের রীতিনীতি, আদবকায়দা, উৎসব-পার্বণ, কোনও কিছুরই খবর রাখি না। আর এই না-চেনা তো তৈরি হয় আশঙ্কা, রহস্য, ভয়”[৩]

নতুন প্রজন্মের কাছে এই না চেনা জগতটাকে চেনানোর জন্য কাহিনির সমান্তরালে নিয়ে এসেছেন এই চিনা মানুষগুলির অনেক না জানা রীতি-নীতি,সংস্কারের কথা।

চিনেরা হল পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য জাতি। আধুনিক সভ্যতার উন্নতির পিছনে এদের অবদান অনস্বীকার্য। দৈনন্দিন ব্যবহৃত কাগজ থেকে, বাঙালী জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় চা- সবই যে এই চিনাদেরই অবদান সে কথা নব্যপ্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন লেখিকা। তিনি জানাচ্ছেন বজবজের কাছে অছিপুরে চাইনিজ কলোনির গড়ে ওঠার পেছনের ইতিহাসের কথা- ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে এই বজবজের কাছে আৎসু নামে এক চিনার গড়ে তোলা চিনির কলকারখানাকে কেন্দ্র করে চিনদেশ থেকে বহুমানুষের আগমন ঘটে। চিনিকল ঘিরেই তৈরি হয় চিনামহল্লা আৎসুপুর, যা কালক্রমে অছিপুর। কিন্তু চিনিকল গড়ে ওঠার পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে আৎসুর মৃত্যু ও সেখানাকার চিনাদের ধীরে ধীরে কলকাতায় আগমনের ফলে অছিপুর আজ সম্পূর্ণ চিনাশূন্য। কিন্তু অছিপুরে আজও এক চিনামন্দির ও আৎসুর সমাধি সেই ফেলে আসা সময়ের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

প্রাচীন ইতিহাসের পাশাপাশি উপন্যাসিক পাঠকের সাথে পরিচয় করাচ্ছেন কলকাতার ছাতাতলা গলিতে অবস্থিত চাইনিজদের সাথে। কলকাতার চাইনিজরা মূলত চিনের হাক্কা, হুপে, সাংহাই প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এসে বসতি স্থাপন করেন। চিনের

এক এক জায়গার লোকেরা এক একটি ব্যবসায় পেশাদারিত্ব অর্জন করেন, যেমন ক্যান্টনিরা কাঠের কাজ করেন, ডেন্টিস্টরা মূলত হুপের ছিলেন। বহুবছর ভারতে বসবাস করেও চাইনিজরা আজও তাদের নিজেদের পেশাই বজায় রেখে চলেছে। শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রে নয়, বহুবছর স্বদেশ থেকে দূরে থেকেও চিনারা নিজেদের রীতি-নীতিকে রক্ষা করে চলেছেন। চিনেদের বছরের হিসেব হয় তাদের নিজস্ব চাইনিজ ক্যালেন্ডার অনুসারে। ওদের বছর ঘোরে চাঁদের হিসেবে। আমরা পরিচিত হই চিনাদের এক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান মুন ফেস্টিভ্যাল এর সাথে। অষ্টম চান্দ্রমাসের ফিফটিন ডে তে এই অনুষ্ঠানটি হয়। অনেকটা আমদের নবান্নের মত চিনাদের এই উৎসবটা ফসল কাটার পরে হয়, ওইদিন চিনারা মুনকেক খেয়ে উৎসব পালন করেন। উৎসবের দিক ছাড়াও চিনাদের কাছে এই অনুষ্ঠানের এক ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক রয়েছে। থারটিনথ্ সেঞ্চুরিতে কুবলাই খাঁ চিন দখলে বিদ্রোহের ভাব জেগে ওঠে মানুষের মনে। এই মুন ফেস্টিভ্যলে প্রথম মুনকেক বানিয়ে তার মধ্যে কাগজ পুরে বিপ্লবীরা খবর চালান করেন। এখন চিনাদের কাছে মুনকেক বিপ্লবের প্রতীক। পাঠক পরিচিত হয় না জানা অনেক চিনাদের সংস্কারের সাথে, যেমন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হলে বাড়ির মেয়েরা মাথায় নীলউল ও ছেলেরা হাতে কালো টেপ পরে। মৃত্যুর ঊনপঞ্চাশ দিন পরে এই উল ও টেপ খুলে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এছাড়া মৃতদেহ সমাধি করা হয় একটু দেরি করে, তারা মনে করে মানুষের আত্মা হোয়াংহো নদীর জলে যতক্ষণ না নিজের ছায়া দেখে বুঝতে পারছে সে বেঁচে নেই, ততক্ষন সমাধি দেওয়া উচিত নয়।

এইভাবে চিনাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যর পাশাপাশি আমরা যেমন পরিচিত হই মো-ই-টং, অ্যাডমিরাল জেং এর মত ঐতিহাসিক চরিত্রের সাথে, তেমনি নানকিং হাইস্কুলের বর্তমান ছবির মাধ্যমে লেখিকা স্পষ্ট করেন যে শহর একদিন প্রায় কুড়িহাজার চিনার বসবাস ছিল আজ তার করুণ অবস্থা-

> "ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে কমতে এখন ছেচল্লিশে দাঁড়িয়েছে।শিক্ষক-শিক্ষিকা সাকুল্যে ছয়।......বিদ্যালয় এখন নামেই হাইস্কুল,কিন্তু এখানে তো ক্লাস ফোরের বেশি পড়ানোই হয় না"[৪]

আসলে এর দায়ভার যেন কিছুটা আমদের বাঙালি সমাজের উপর পড়ে, কোথাও আমাদের উদাসীনতা যেন এই পরিনতিকে ডেকে আনে, উপন্যাসের কথাবয়নে অবনীর মুখে শোনা যায় সেই ধিক্কারবানী-

> "সত্যি,আমরা বাঙালিরা বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। আমাদের মনের জানালাটা আরও খোলা দরকার।[৫]

কিশোর সিরিজের অপর একটি জনপ্রিয় উপন্যাস "আরাকিয়েলের হিরে"। একটি নিখোঁজ হিরের সূত্র ধরে আমরা পরিচিত হই কলকাতার আর্মেনিয়ান সমাজের সাথে।

আর্মেনিয়া পূর্ব ইউরোপের একটি রাষ্ট্র। ১৯২২ সালে এটি সোভিয়েত ইউনিয়েনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। উপন্যাসের আলোকে লেখিকা হিন্দু সংস্কৃতির সাথে আর্মেনিয়ানদের প্রাচীন যোগসূত্র তুলে আনেন- আর্মেনিয়ানদের অনেক পূর্বপুরুষ ছিলেন হিন্দু, খ্রিস্ট জন্মের দেড়শ বছর আগে দুজন হিন্দু রাজকুমার পাকাপাকি ভাবে চলে যায় আর্মেনিয়ায়। আর্মেনিয়ান ভাষায় তাদের একজনের নাম জেসান্নি, অপর ডেমেটার, হিন্দু নাম কৃষ্ণ ও জগন্নাথ। আর্মেনিয়ায় এখনও হিন্দু বীরের মূর্তি রয়েছে, যার স্থানীয় নাম আর্টজান, অর্থাৎ অর্জুন। লেখিকা আমাদের পরিচয় করান আর্মেনিয়ান সংস্কৃতির সাথে। বহুবছর অন্যদেশে বসবাস করলেও আজও তারা যত্ন করে নিজ সংস্কৃতি বজায় রেখে চলেছে। আজও আর্মেনিয়ানরা বিয়ের ব্যপারে রক্ষণশীল, নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরে আজও বিয়ে মেনে নিতে পারে না তারা। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী আজও আর্মেনিয়ানদের ক্রিসমাসের উৎসব হয় ছয় জানুয়ারি, আসলে বাইবেলে যিশুর জন্মদিনের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায়, একেবারে প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ৬ জানুয়ারি যিশুর জন্মদিন পালন করে আর্মেনিয়ানরা। উপন্যাসে আর্মেনিয়ান বৃদ্ধা ইসাবেলের মুখে শোনা যায়-

> “আমরা পঁচিশে ডিসেম্বর বড়দিন পালন করি না,মাই চাইল্ড। সেদিন শুধু একটা বাতি জ্বালাই । আর্মেনিয়ানদের ক্রিসমাসের উৎসব হয় ছয় জানুয়ারি”[৬]

এরই সাথে জানতে পারি বাংলার মাটিতে আর্মেনিয়ান আগমনের বিস্মৃত অতীতের কথা- কলকাতায় অবস্থানের অনেকদিন আগেই চুঁচুড়ায় ঘাঁটি গাড়ে আর্মেনিয়ানরা। চুঁচুড়ায় গড়ে তোলে তাদের প্রথম গির্জা। তবে কলকাতার সাথে তাদের যোগ বহুপ্রাচীন। ১৬৩০এ আর্মেনিয়া মহিলা রেজাবিবির সমাধি পাওয়া যায় কলকাতার বুকে। ১৭২৪এ সেখানেই তারা গড়ে ওঠে আর্মেনিয়া চার্জ। বহুবছর ধরে কলকাতা শহরে আশ্রয় করে আছে আর্মেনিয়ানরা। ব্রিটিশেরা ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময় কলকাতায় আর্মেনিয়ানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০হাজার। ১৮২১ সালে কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় আর্মেনিয়ান কলেজ অ্যান্ড ফিলানথ্রপিক আকাদেমি। কলকাতার আর্মেনিয়ানদের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। আজও কলকাতা শহরের ইতিহাসে ছড়িয়ে রয়েছে আর্মেনিয়ানদের অবদান। স্টিফেন কোর্ট, হোটেল কেনিলয়ার্থ, কুইন্স ম্যানসনসহ আরও বহু বাড়ি তৈরি করেছিলেন আর্মেনিয়ানরা। রেসকোর্সের রাজা জোহানস গলস্তউন তৈরি করেছিলেন নিজাম প্যালেস। ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল এর জন্য দান করেছিলেন ২৫হাজার টাকা। কিন্তু একসময় যে শহরটি বহু আর্মেনিয়ানের প্রাণকেন্দ্র ছিল, কালের প্রবাহে তারা আজ অনেকে হারিয়ে গেছে, নব্যপ্রজন্মের মধ্যেও লক্ষ করা যায় ফিরে যাওয়ার মানসিকতা, উপন্যাসে এক আর্মেনিয়ান কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সেই বিসন্নতার সুর-

> "এই শহরে আর্মেনিয়ান আর কোথায় ম্যাডাম।কমতে কমতে সাকুল্যে আমরা এখন একশ'জন হব কিনা সন্দেহ। বেশির ভাগই হয় অস্ট্রেলিয়ায় কেটে পরেছে, নয়তো ব্যাক টু আরমেনিয়া"[৭]

আজও এই দেশের গন্ধ মেখে যারা রয়ে গিয়েছেন, তাদের আশ্রয় এখন পার্ক সার্কাসের 'স্যর ক্যাথিক পল চ্যাটার হোম ফর দ্য এল্ডারলি'।

কিশোর সিরিজের অপর একটি লোমহর্ষ উপন্যাস "হাতে মাত্র তিনটে দিন"। টানটান রহস্যের পাশাপাশি উপন্যাসে লেখিকা পাঠককে যেমন পরিচিত করিয়েছেন কলকাতার পারসিক সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে তেমনি অন্যদিকে শুনিয়েছেন ভারতবর্ষে পারসিকদের প্রথম আগমনের কাহিনি। প্রায় কয়েকশো বছর ধরে ভারতের বিভিন্নস্থানে পারসিকরা বসবাস করছে। দেশের অগ্রগতিতে অন্যান্য ভারতীয়দের পাশে পারসিকদের অবদান অনস্বীকার্য, আসলে ভারতে আসার পর থেকেই দেশটাকে ভালবেসে আপন করে নেয় তারা। শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসা-বানিজ্য সবকিছুতেই তারা সফল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকায় দেখা যায় তাদের; দাদাভাই নওরাজি, মাদাম কামার মত পারসিদেরকথা লেখিকা আমাদের স্মরণ করান।

অতীতের কলকাতার জমজমাট পারসিসমাজের সাথেও পাঠক পরিচিত হয়। ১৮২২ সালে কলকাতার বেলেঘাটায় হয় পারসিদের একমাত্র 'দখমা' অর্থাৎ মৃতদেহ সৎকারের জেয়গা-টাওয়ারর অব সাইলেন্স। ১৯০২ সালে কলকাতার বুকে গড়ে ওঠে পার্সি ক্লাব গোটা পূর্ব ভারতে পারসিদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ আড্ডার স্থান। কলকাতা থেকে বেরত দুটি পারসি হাউস জার্নাল –'গাবসনি' ও 'আওয়ার ভেঞ্চার'। প্রতিষ্ঠিত হয় পারসি উপাসনা গৃহ অগ্নিমন্দির। আমরা পরিচিত হই পারসি সংস্কৃতির সাথে- পারসিদের ধর্মগ্রন্থ 'আভেস্তা',ধর্মগুরু জরথুস্ত্র। অন্যায়কারীকে শাস্তি প্রদান, দারিদ্র্য আর ভিক্ষে করা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিটি ধর্মপ্রাণ পারসি মান্য করে চলে। পাশাপাশি জানতে পারি পারসিরা আগুনকে খুব পবিত্র বলে মানেন, তাদের অগ্নিমন্দিরে সজত্নে রক্ষিত থাকে আগুন। মৃতদেহ সৎকারের ক্ষেত্রেও দেহ দাহ করা বা সমাধি দেওয়ার প্রথা পারসি ধর্মে নেই, তাদের দখমার চূড়ায় দেহ রেখে আসে, চিল-শকুনে মৃতদেহ খায়। আসলে তার মনে করে অন্য কোন পদ্ধতিতে মৃতদেহ সৎকার হলে আগুন, মাটি আর জল অপবিত্র হবে। নিজেদের রীতিনীতির সম্পর্কে আজও রক্ষনশীল পারসিরা, আজও তাদের অগ্নিমন্দিরে পারসি ব্যতীত কারুর প্রবেশাধিকার নেই, নিজস্ব সমাজের বাইরে বিয়ে-থা আজও পারসিরা ভালভাবে মেনে নিতে পারেনা। কলকাতার সংস্কৃতির উন্নতিতেও পারসিদের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা পরিচিত হই জামশেদজি ফ্রাজমি ম্যাডানের সাথে, যিনি ছিলেন এককালের ইন্ডিয়ান ফিল্মের রাজা, যার নামে কলকাতার ম্যাডান স্ট্রিট। কিন্তু গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সাথে বর্তমান ছবিও

ধরা পড়ে উপন্যাসের পাতায়। যে কলকাতায় কয়েক হাজার পারসির বসবাস ছিল, আজ তার সংখ্যা বহুলাংশে কমে গেছে, উপন্যাসে শোনা যায় সেই শূন্যতার ধ্বনি-

> "কলকাতায় এখন আমরা সাকুল্যে সাতশোজন পারসি বাস করছি।মাত্র শ'আড়াই পরিবার" [৮]

এইভাবে অত্যন্ত সযত্নে উপন্যাসের কথাবয়নে লেখিকা ভারতবর্ষে ক্রমবিলুপ্তমান পারসি সংস্কৃতির সাথে নব্যপ্রজন্মের পাঠকের পরিচয় ঘটান।

"দুঃস্বপ্ন বারবার" গল্পে আমরা পরিচিত হই জৈন সংস্কৃতির সাথে, জানতে পারি অতীতে বঙ্গে জৈনধর্মের বিস্তারের ইতিহাস। জৈনধর্ম ভারতের প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে অন্যতম। উপন্যাসে মিতিনের মুখে শোনা যায় ভারতের জৈনধর্মের প্রাচীন ইতিহাসের কথা-

> "ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই অল্পবিস্তর জৈন আছেন.........তামিল, কর্ণাটকিদের মধ্যে একসময় ভাল প্রচার হয়েছিল ধর্মটা। ওঁদের অনেক রাজামহারাজাও তখন জৈন ছিলেন।এমনকী,আমাদের এই বাংলাতেও হাজার দুই বছর আগে বেশ রমরমা হয়েছিল জৈনধর্মের। বিশেষত, পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলে"[৯]

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে জৈনদের দানও কম নয়। জৈনধর্মের অহিংসাবাদ পরবর্তী কালে হিন্দু সমাজের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

> "প্রত্যেক জৈনমঠই একটি শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিউহবলার কাম্বেতে দুইটি জৈন মন্দিরে ত্রিশ হাজার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখেন"[১০]

কলকাতা নিবাসী এমন এক জৈনপরিবারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে ধরা পড়ে প্রাচীন বাংলার এক বহুল চর্চিত জগৎশেঠ পরিবারের কথা। উপন্যাসের বয়ানে পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে হিরানন্দ, মানিকচাঁদ, ফতেচাঁদ ক্রমউত্থান ও মহাতাপচাঁদ, খুশলচাঁদদের ক্রমপতনের ইতিহাসের না ভোলা এক অধ্যায়ের ছবি।

পাঠক পরিচিত হয় কলকাতার জৈন সম্প্রদায়ের সাথে। হাজার-দুই বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক প্রসার লাভ করে জৈনধর্ম। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ও হিন্দু শাষকের চাপে এ রাজ্য থেকে হারিয়ে যায়, এবং মাত্র তিনশ বছর আগে রাজস্থান থেকে আগত ব্যবসায়ীদের সাথে পুনরায় বঙ্গে জৈনধর্মের আগমন ঘটে। জৈনধর্ম মূলত দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত-শ্বেতাম্বর ও দিগাম্বর। কলকাতার জৈনরা মুলত শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়বলম্বী। ১৮১০সালে কলকাতায় গড়ে ওঠে প্রথম শ্বেতাম্বর জৈনমন্দির- বদ্রীদাস টেম্পল। বড়বাজারে গড়ে ওঠে জৈনধর্মশালা। জৈনধর্মে যেকোনো রকম প্রানীহত্যাকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলা, সর্বক্ষেত্রে সত্য কথা বলা ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে নিজেকে অর্পণ করা শ্রেয় বলা হয়। তারা মনে করে জিন অর্থ্যাৎ তীর্থঙ্করেরা

সপ্নের মাধ্যমে সুপথে চালনা করে মানুষকে। বহুবছর অন্যদেশে বসবাস করলেও আজও যেমন যত্নসহকারে ধর্মপ্রাণ জৈনরা সজত্নে লালন করে চলেছে নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য, তেমনি যুগের প্রয়োজনও অনুভব করে এগিয়ে চলেছে সময়ের সাথে- জৈনরা মূলত ব্যবসায়িক জাতি হলেও বর্তমানে অনেকে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে, ব্যাবসা ছাড়াও চাকরি-বাকরি করছে, ডাক্তার, অ্যাডভোকেট ও হচ্ছে নবীন প্রজন্ম। এইভাবে অতীতের পাশাপাশি নবীন মনকে বর্তমানের সাথে পরিচিত করিয়েছেন লেখিকা।

গভীর অনুভূতিশীলতা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী সুচিত্রা ভট্টাচার্য আজীবন খুবই সূক্ষ্মভাবে অনুভব করেছিলেন নিজের চারপাশের সময় ও সমাজের পরিবর্তনশীলতাকে। তার হাত ধরে গল্প উপন্যাসের পাতায় বারবার উঠে এসেছে শহরকেন্দ্রিক জীবন জটিলতা, আধুনিক নারীর যন্ত্রণা, সমাজের অবক্ষয়। যশোধরা রায়চৌধুরি সুচিত্রা ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারন করতে গিয়ে বলেছেন-

> “সুচিত্রা ভট্টাচার্য বাংলা কথাসাহিত্যের ঘরানায় উজ্জ্বল সংযোজন........... মূলধারার সাহিত্যে মানুষের মনের কথা,আশা আকাঙ্খাকে ভাষা দিয়ে, চিরদিনের গল্প শুনতে চাওয়া মানুষের প্রত্যাশা মিটিয়ে, সামাজিক সমস্যা গুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে,একগোছা লেখা রেখে গেলেন,সবার জন্য।শুধু মেয়েদের জন্য নয়”[১১]

বাস্তবেই সুচিত্রা ভট্টাচার্য নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে কলম ধরেননি। আমোদপ্রিয়, হাস্যরসিক এই মানুষটি শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কের মনের সন্ধানে থেমে থাকেননি। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের আসরেও ছিল তার অবাধ গতিবিধি। নিজের বাস্তব দৃষ্টিতে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মনের সন্ধান যেমন করেছেন তেমনি ধরা পড়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসন কীভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের নতুনপ্রজন্মকে। নব্যপ্রজন্মের এই কিশোররাই আমাদের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির ধারক-বাহক, তাদের মধ্যেই বেঁচে থাকবে আমাদের ঐতিহ্য। তাই নিজের দেশকে ভালো ভাবে চেনার জন্য নবীনদের সাথে ভারতের মাটি থেকে ক্রমবিলুপ্তমান সংস্কৃতিগুলির পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা অনুভব করেছিলেন লেখিকা। চেনা জীবনের বাইরে বেরিয়ে সুচিত্রা ভট্টাচার্য সূক্ষ্মপর্যবেক্ষণশীলতা ও গভীর আন্তরিকতা সাথে দেখেছিলেন এই ভিন্ন সংস্কৃতি ও তার মানুষগুলিকে, এবং তার সেই কঠিন পরিশ্রমের ফসল হয়ে ধরা দেয় গল্পগুলি। গোয়েন্দাগল্পের চেনা ছন্দের বাইরে বেরিয়ে অচেনা রং এ, একটু অন্য স্বাদে ধরা দিয়েছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের এই লেখাগুলি। বর্তমান জীবনের জটিলতার ফাঁকে ফেলে আসা অতীত ও বহুযুগ ধরে পাশাপাশি অবস্থিত না জানা এক জগতকে তুলে আনেন নতুনপ্রজন্মের কাছে। কাহিনীর উৎকন্ঠা, রহস্য রোমাঞ্চের গল্পের পাশাপাশি, কিশোর-কিশোরীদের মধ্য নিজেদের অতীত ইতিহাসকে জানবার আকর্ষণ গড়ে

তোলেন। এই ভিন্নসংস্কৃতির সমন্বয়েই যে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অখণ্ডতা, সেই বার্তাও ফুটে ওঠে উপন্যাসগুলিতে-

"তাই তো বলি এ দেশ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান কারও একার নয়, সক্কলের"[১২] এখানেই গোয়েন্দা গল্পের ধারায় মিতিন মাসির গল্পগুলির অনন্যতা।

তথ্যসূত্র:

১. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, "মিতিন মাসি সমগ্র,১ খণ্ড" অন্তর্গত *কেরালায় কিস্তিমাত* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২১),২৭৩।

২. তদেব,২৪৮।

৩. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, "মিতিন মাসি সমগ্র,১ খণ্ড" অন্তর্গত *ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২১),৪২৩।

৪. তদেব, ৪৬৭।

৫. তদেব, ৪৮৯।

৬. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, "মিতিন মাসি সমগ্র,২ খণ্ড" অন্তর্গত *আরাকিয়েলের হিরে* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২১),২৬।

৭. তদেব, ১২।

৮. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, "মিতিন মাসি সমগ্র,২ খণ্ড" অন্তর্গত *হাতে মাত্র তিনটে দিন* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২১),১৬০।

৯. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, "মিতিন মাসি সমগ্র, ২ খণ্ড" অন্তর্গত *দুঃস্বপ্ন বারবার* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশালিশার্স, ২০২১),৫০১।

১০. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, "প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস" অন্তর্গত *ধর্ম* (কলিকাতা : সিগনেট প্রেস),৮৬।

১১. যশোধরা বাগচী, "তবু তাঁকে মেয়েদের লেখক বলব?", আনন্দ বাজার পত্রিকা, বুধবার, ২০ মে ২০১৫, কলকাতা।

১২. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, "মিতিন মাসি সমগ্র,১ খণ্ড" অন্তর্গত *কেরালায় কিস্তিমাত* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২১), ২৭৩।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অলৌকিক জলযান' : সমুদ্র-জীবনকেন্দ্রিক মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণ

ননীগোপাল সরকার
গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : স্বাধীনতা উত্তরপর্বে কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম কথাসাহিত্যিক হলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ববঙ্গের আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত রাইনাদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেশভাগ হতেই পরিবারের সাথে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর জেলার কাশিমবাজার রাজবাড়ির জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করেন। এরপর জীবিকা সূত্রে তিনি এক পেশা থেকে অন্য পেশায় অনায়াসে যাতায়াত করেছেন। পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে জাহাজি ট্রেনিং করে নলি পেয়ে জাহাজে কোল বয়ের চাকরি নিয়ে প্রায় দু-বছরের মতো জলে ভেসে বেড়িয়েছেন প্রায় অর্ধেক পৃথিবী। অর্জন করেছেন সমুদ্র, জাহাজ, বিভিন্ন বন্দর, উপকূল, বিচিত্র মানুষের অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতা থেকেই রচনা করেছেন— 'সমুদ্র মানুষ', 'সাগরে মহাসাগরে', 'বিদেশিনী', 'সমুদ্রযাত্রা', 'সমুদ্রে বুনোফুলের গন্ধ', আমার আলোচ্য 'অলৌকিক জলযান' সেই অভিজ্ঞতারই ফসল। সমুদ্র, জাহাজ, উপকূল, বন্দর, বন্দরে বসবাসকারী বিচিত্র মানুষের সাথে জাহাজিদের জীবন সংগ্রাম ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। এস. এস. সিউলব্যাঙ্ক নামক জাহাজে প্রায় ৫০-৬০ জন জাহাজিদের পরিবার-পরিজনদের দূরে রেখে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে জলে ভেসে বেড়ানো, অদম্য শক্তিতে বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে জয় করে বেঁচে থাকার সংগ্রামই বড়ো উঠেছে এই উপন্যাসে। 'বন্দরে বন্দরে' উপন্যাসে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমুদ্র জীবনের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র উপহার দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যকে, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তা থেকে এক ধাপ এগিয়ে গড়ে তুললেন সমুদ্র-জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্যের নন্দনকানন।

সূচক শব্দ : জলজীবন – জীবিকা – ঔপনিবেশিকবাদ - ধর্ম ও সংস্কৃতি – রুচিবোধ – উত্তরণ

মূল আলোচনা : বাংলা সাহিত্যে স্থলভাগ যেটুকু স্থান দখল করে আছে, ততটা জলভাগ দখল করে না থাকলেও নদী মাতৃক এ-দেশে জলজীবনের চিত্র ধরা পড়েছে নানাভাবে। 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে, মধ্যযুগের 'মঙ্গলকাব্যে', 'চাঁদ সওদাগর', আধুনিক সাহিত্যে জলজীবনের প্রসঙ্গ এসেছে বারে বারে। রবীন্দ্র সাহিত্যেও জলভাগ ধরা পড়েছে বিচিত্র ভাবে। দীর্ঘকাল ধরে নদী-মাতৃক এদেশে নদীকে কেন্দ্র করে বৃত্তি স্থাপন করে বেঁচে আছে অসংখ্য মানুষ। নদীর কথা, নদী তীরবর্তী জেলে সমাজের জীবনচর্চা এবং

আর্থসামাজিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'(১৯৩৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাসুলিবাঁকের উপকথা' (১৯৪৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' (১৯৫০), অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'(১৯৫৬), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'(১৯৫৭), সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' (১৯৮০), দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) প্রভৃতি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস। এর এক ধাপ এগিয়ে নদী-সমুদ্র নিয়ে লেখা– অমিতাভ ঘোষের– 'দি হাংরি টাইড'(২০০৪), ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র দুয়ার' (২০১০), হরিশংকর জলদাসের 'জলপুত্র' (২০১২) প্রভৃতি। উক্ত উপন্যাসগুলিতে সমুদ্র, জাহাজ না থাকলেও প্রান্তিক সমাজের পাশ কাটিয়ে বয়ে যাওয়া এই নদীগুলির মিষ্টি জলের স্রোত বেয়ে জেলেরা নেমে গেছে অসীম সমুদ্রে। তবে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অলৌকিক জলযান' উপন্যাসটি স্থলভাগের ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে সমুদ্র, জাহাজ, জাহাজি, বন্দর, বন্দরে বসবাসকারী বিচিত্র মানুষ, উপকূল, সারা পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখের দলিল হয়ে উঠেছে। এক বাঙালি যুবকের সাথে ৫০-৬০ জন জাহাজিদের প্রাচীন কয়লার জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে যাত্রা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

উপন্যাসটির সূচনা হয়েছে ১৭ই মে ১৯৫৩। উপন্যাসের একেবারে শুরুতে দেখতে পাই কেন্দ্রীয় চরিত্র সোনা, উদ্বাস্তু জীবনের ক্লেশ ও অনটন থেকে মুক্তি পেতে ক্রমশ হেঁটে যাচ্ছে শিপিং অফিসের উদ্যেশ্যে। এভাবে শিপিং অফিসে হেঁটে গিয়ে এক বুড়ো সারেঙের হাত ধরে কোলবয়ের চাকরি নিয়ে 'এস.এস.সিউল ব্যাঙ্ক' জাহাজে উঠে পড়ে। সোনার মতো আরও ৫০-৬০ জন জাহাজি এই জাহাজে যাত্রা করেছে। কয়লার ইঞ্জিন, জাহাজিদের কথায় এটা একটা ইবলিশ। কোন্ আমলের জাহাজ তা কেউ জানে না। জাহাজটা হলো– "কেউ বলে ডেনিসদের ওটা যুদ্ধ জাহাজ ছিল, কেউ বলে ওটা পালের জাহাজ, আবার কেউ বলে, প্রথম মহাযুদ্ধে জাহাজটা খুব ঘায়েল হয়েছিল। মাঝ দরিয়া থেকে মাঝি-মাল্লারা টেনে কার্ডিফে নিয়ে যায়। চক্ পালটে, বয়লার পাল্টে ওটাকে ওরা কার্গোসিপ বানিয়ে ফেলে। কিন্তু ঘাড়ে শয়তান চেপে আছে। পুরোনো জাহাজ কখন দরিয়ায় যে খসে পড়বে কে জানে।"[১] – তবুও সোনার মতো অন্যান্য নাবীকেরা এই জাহাজেই উঠে পড়ে পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য, কিছু অর্থ উপার্জনের আশায়। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে একদিকে উদ্বাস্তু সমস্যা ও অর্থনৈতিক সংকটের কালে তারা জানে কোনো জাহাজ ধরতে না পারলে আর দাঁড়াবার জায়গা পাবে না। এই শহরের অলিগলিতে পচে মরার চেয়ে অসীম সমুদ্রে তাদের যেন অসীম সুখ আছে। কৃষিনির্ভর এই দেশ থেকে তাই জাহাজে চাকরী নিয়ে মাল বহন করার কাজে অচেনা জগতে নেমে পড়ে।

সমস্ত জাহাজিরা যেন একটি পরিবার এবং জাহাজ যেন তাদের সংসার। সমুদ্রে যাত্রাকালে দরিয়া ক্ষেপে গেলে যখন স্টিম ধরে রাখা যায় না তখন জাহাজিদের হুস থাকে না। টিন্ডালের মুখে ভীষণ দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা যায়, ফায়ারম্যানদের প্রচন্ড

উত্তাপের সামনে দাঁড়িয়ে কয়লা হাঁকড়াতে গিয়ে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। স্টোক হোল্ডের সবাই তখন ঐশীশক্তি পাবার লোভে সমবেত ভাবে 'আল্লা হু আকবর' ধ্বনি দিয়ে জ্বলন্ত আগুনের কঠিন চাঙগুলি ভেঙে টুকরো করে দেয়। অনেকে আবার এত গরম সহ্য করতে না পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আত্ম হত্যার পথ বেছে নেয়— "রেড-সীতে একবার একজন নতুন জাহাজি স্টোক-হোলডের গরম সহ্য করতে না পেরে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। অথবা একবার এক জাহাজির সী-সিকনেস এমন হল, সে স্কাই-হোলের ভেতর দিয়ে এনজিনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছিলো। কেউ কেউ তো পাগল হয়ে যায়।"[২] এই সময়ে জাহাজিরাই মা বাবার মতো একে অপরের পাশে থাকে। গভীর সমুদ্রে একনাগাড়ে কঠোর পরিশ্রম করতে করতে অনেক সময় জাহাজিরা কঠিন অসুখে পড়ে যায়। পরবর্তী বন্দর না এলে ডাক্তার দেখানোর উপায় থাকে না। এমন সময় পরিবারের মতো একে অপরের সেবা করে। 'এস.এস.সিউল ব্যাঙ্ক' একটি প্রাচীনকালের কয়লা চালিত জাহাজ। তাই জাহাজিদের প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হয়। খাদ্য তালিকায় প্রয়োজন হয় মটনের, কিন্তু মটন যেহুতু ব্যায় সাপেক্ষ তাই জাহাজের মালিক পক্ষ মটনের বদলে বেশি করে বিফ পাঠিয়ে দেয়। হিন্দু জাহাজিরা ধর্ম রক্ষার জন্যে বিফ খেতে না চাইলেও শরীর টিকিয়ে রাখতে শেষ পর্যন্ত বিফ খেতেই হয়। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ মৈত্রকে তাই বলতে শোনা যায়— "বিফ না খেলে জাহাজ চালানো যায় না। আমি, আমি হিন্দুর পোলা বলচি, বিফ না খেয়ে কয়লার জাহাজে কাজ করা যায় না।"[৩]

আসলে তারা জানে ধর্ম টিকিয়ে রাখলে জাহাজে টিকে থাকা যাবে না। যে ধর্ম রক্ষার জন্যে পরিবারের সাথে উদ্বাস্তু হয়ে সোনার মতো মানুষেরা হিন্দুস্থানে এসেছে, অভাবের তাড়নায় সেই ধর্ম শেষপর্যন্ত তারা রক্ষা করতে পারেনি। এর পরেও সাদাচামড়ার মানুষের কাছে তাদের 'নেটিভ ইণ্ডিয়ান', 'অল ইণ্ডিয়ায়ন আর ডগস' প্রভৃতি গালাগাল সহ্য করতে হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৫৩ সাল। সাদাচামড়ার মানুষের এহেন আচরণ থেকে বোঝা যায় ওই সময়ে এসেও ঔপনিবেশিকবাদ মানুষের মন থেকে পুরোপুরি উঠে যায়নি। পরিবারের সঙ্গ থেকে দূরে থেকে, ধর্ম ত্যাগ করে, অক্লান্ত পরিশ্রম সহ্য করেও তারা স্বপ্ন দেখে বেঁচে থাকার, কোনো মতে টিকে থাকার। সোনাও এভাবে স্বপ্ন দেখে— "আমি এখন যাচ্ছি কলম্বো, তারপর আমেরিকা, আমি যে কত বড় হব বলে নিরুদ্দেশে চলে এসেছি। আমার আকাঙ্ক্ষা অনেক, আমি সুন্দর এক পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে বাঁচতে চাই। আমি হেঁটে যাব মা, চারপাশে মানুষেরা বলবে, ঐ যে মানুষটা হেঁটে যাচ্ছে। আমি স্বপ্ন দেখব মা, হ্যাঁ স্বপ্ন...।"[৪] এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে সোনা দূর্গমগিড়ি কান্তারমরু পাড় করার মতো জাহাজের অসম্ভব কাজকেও সম্ভব করে নিয়েছে। অভাব যেন তার উজ্জীবনি শক্তি। এপ্রসঙ্গে মনে আসে রবীন্দ্রনাথের সেই গান—

"অজানাকে ভয় কি আমার ওরে?
অচেনাকেই চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে।।
জানি জানি আমার চেনা কোনো কালেই ফুরাবে না
চিহ্নহারা পথে আমায় টানবে অচিন ডোরে।।"[৫]

প্রত্যেক জাহাজিরই এক জীবন থাকে ডাঙ্গায়, আর এক জীবন সৃষ্টি হয় অসীম সমুদ্রে। সমাজ থেকে অনেক দূরে জাহাজে ভাসতে থাকা জাহাজিরা সমস্ত উৎসব থেকে বঞ্চিত। তাই অবসর সময়ে বিনোদনের জন্যে কখনও কখনও রসিকতায় ব্যস্ত থাকে। কেউ সঙ্ সেজে নাচ করে, কেউ টব বাজায়, অমিয় টপ্পা গায়। অনিমেষ মজুমদার পায়ে ঘুঙুর বেঁধে মেয়ে সেজে নাচ করে। একনাগারে জলের মধ্যে আটকে থেকে পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই একটাই মাত্র তাঁদের কাছে উৎসবের দিন। সবার কাছে চাঁদার মতো ধার্য করে সারেঙের কাছে জমা করা হয়– "এক সঙ্গে টাকা জমবে তা দিয়ে উৎসবের মতো জাহাজে, একেবারে তাজা মুরগি কিনে আনবে সারেঙ, তারপর পিকনিকের মতো ব্যাপার।"[৬] জাহাজে ফাঁকা সময়ে পরিবারের জন্য চিঠি লেখে, বন্দর এলে সেগুলি নির্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে দেয়। বাড়তি আয়ের জন্যে কখনও কখনও তারা এক বন্দর থেকে কিছু কিনে অন্য বন্দরে বেঁচে দেয়। বন্দরে নেমে পরিবারের কাছে টাকা পাঠায়।

জাহাজে জলের ওপর ভাসমান অবস্থায় থাকতে থাকতে জাহাজিদের এক বিচিত্র জীবন গড়ে ওঠে। প্রথমে কিনারার প্রতি টান, পরিবারের প্রতি মায়া থাকলেও দীর্ঘদিন বাদে তাদের মনে হতে থাকে তারা নিরালম্বর মানুষ। তারা যেন জাহাজেই জন্ম-যৌবন-বার্ধক্য অতিবাহিত করার পর এভাবেই মারা যাবে। তখন তাদের মনে হয় না যে, তাদেরও স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে, কেবল মনে হয় একটা যানে চরে ক্রমান্বয়ে সমুদ্র, দ্বীপ এবং পাহাড় অতিক্রম করে মানুষের ঘরে ঘরে পণ্য পৌঁছে দিচ্ছে। জাহাজ বন্দর পেলে তাই তারা আনন্দে নাচতে থাকে। নারী সঙ্গ পেতে উন্মুখ হয়ে পড়ে, নেশা করে, জুয়া খেলে। এমনই চরিত্র মৈত্র, ডেভিড, আর্চি। মৈত্র জাহাজের বড়ো টিণ্ডাল। বিমলবাবুর ভালোবাসার স্ত্রী সেফালীকে কিডনাপ করে বিয়ে করে। বন্দরে বন্দরে সেফালীকে টাকা পাঠায়। কিন্তু বুয়েন-এয়ার্সে এসে মদ্যপ অবস্থায় এক স্পেনীশ যুবতীর প্রেমে পাগল হয়ে যায়। মৈত্র অকপটে স্বীকার করে– "আমার জাহাজে যেতে ইচ্ছে করছে নারে। মেয়েটার পায়ের নীচে আমার পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে।"[৭] –মৈত্রের এই উক্তি ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বেরই ইঙ্গিতবাহী। সেই স্পেনীশ যুবতীর শরীর থেকে বিষাক্ত অসুকে সংক্রমিত হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত মৈত্র সুখী হতে পারেনি। স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার স্বপ্ন তাকে পাগল করে তুলেছে। অথচ মৈত্রই ছিলো জাহাজের একমাত্র সাহসী নাবিক। সকলের জন্যে খুব সহজেই মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উঠতে পারে। মৈত্র একসময় বুঝতে পারে সমুদ্র এবং নিরুদিষ্ট জীবন নিয়ে তার মনে একটা দুঃখের প্রাসাদ গড়ে উঠছে। শেষে বসন্তনিবাস হয়ে সকলের হাসির

খোরাক জুগিয়েছে। আপিয়া শহরে সমুদ্রে স্রোতে ভেসে গিয়ে তার মৃত্যু হয়ছে। মানুষ যেখানে যায় সেখানে সাথে বয়ে নিয়ে যায় তাদের সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতি বশত জাহাজীরা হরিধ্বনি দিয়ে সমুদ্রে ঘেরা সবুজ পাহাড়ে মৈত্রর সৎকারের ব্যবস্থা করেছে— "বসন্ত নিবাস এখানে সমুদ্রে ডুবে মরেছিল। ঐ যে দেখছ পাহাড়টা, সমুদ্র থেকে খাড়া উঠে গেছে, ঠিক আকাশের নিচে, তার মাথায় সারারাত আগুনটা জ্বলেছিল। একজন মানুষের শরীর প্রায় সারারাত পাহাড়ের মাথায় জ্বলেছিল—বড় দুঃসাহসিক ঘটনা।"[৮]

প্রত্যেকের জীবনেই থাকে অপ্রাপ্তি। এই অপ্রাপ্তি থেকেই যত দুঃখের সূত্রপাত। আর মানুষ যখন একা থাকে তখন এই দুঃখ-যন্ত্রণা মানুষকে আরও আকরে ধরে। জাহাজে একঘেয়ামি কাজ করতে করতে তারা যখন হাপিয়ে ওঠে তখন অতীত স্মৃতি তাদের বেদনাভারাক্রান্ত করে তোলে। দূরে কোনো দ্বীপ, পাখি, বন্দর, উপকূল দেখতে পেলে উৎফুল্লিত হয়ে ওঠে। উপকূলে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের মেয়ে মানুষ দেখার অভ্যাস হয়ে যায়। ডেভিড তার স্ত্রী এবির কথা ভেবে নিজেকে হীন মনে করতে থাকে। কারণ এক ঘেয়ামি জাহাজে কিছুতেই সে এবির প্রতি পতি নিষ্ঠা টিকিয়ে রাখতে পারে না। এবি একজন স্কুল শিক্ষিকা, সংসার এবং কাজ কর্ম নিয়ে সবসময় ব্যস্ত থাকতে চায়। অন্যান্য নারীদের মতো তার মধ্যে কোনো ছল চাতুরি নেই। কিন্তু ডেভিড দূরবীনে বন্দর, উপকূলের উলঙ্গ নারী দেখে। ডেভিডকে ছোটবাবুর কাছে বলতে শোনা যায়— "সুন্দরী মেয়েরা জ্যোৎস্নায় স্নান করে ফিরে আসে, চুলের ডগা বেয়ে টপ্ টপ্ জল ঝরতে থাকে এবং মনে হবে যেন ওরা সমুদ্রে নোনাজলের তলায় এতক্ষণ কি খুঁজে এসেছে, আসলে জানো ওরা পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে মুক্তো খুঁজতে যায়। এবং শরীরে কোন পোশাক থাকে না ছোটবাবু। গাছপালার ভেতর লুকিয়ে দেখতে কি যে ভালো লাগে না!"[৯] তখন তার আর এবির কথা মনে থাকে না।

জাহাজ বন্দর ধরলেই মেজো মিস্ত্রি আর্চিও বেড়িয়ে পড়ে কোনো নারীর সঙ্গ পাওয়ার জন্যে। কাপ্তানের একমাত্র মেয়ে বনি যে জাহাজে ছেলের ছদ্মবেশে এসেছে জ্যাক নামে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বনির শারীরিক পরিবর্তন হতে শুরু করলে আর্চির চোখ এড়াতে পারে না। বনির শরীরে যৌবন যখন 'লেট মি ব্লুম...ব্লুম...' করে ফুটে উঠতে চাইছে ঠিক তখনই আর্চির লোভী দৃষ্টি পড়ে তার উপরে। দীর্ঘ দিনের প্রতিক্ষার পরে দূর্যোগপূর্ণ এক রাতে আর্চি জোড় করে বনির ঘরে ঢুকে পড়ে। আসলে শারীরিক ও মানসিক চাহিদা মিলেই মানব জীবন পরিপূর্ণ। মৈত্র, ডেভিড, আর্চি কিংবা অন্যান্য জাহাজীদের পরনারীর প্রতি আসক্তি আমাদের অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রেশমী' উপন্যাসের কল্যাণশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের উপলব্ধির কথা মনে আসে— "কোন অজ্ঞাত নারী কি বেশি মোহ সৃষ্টি করে। কিংবা জীবনের কিংবা জীবনের ক্ষেত্রে কোনো পুরুষই নারীর সব হতে পারে না, কিংবা কোনো নারীই পুরুষের সব হতে পারে না—অথবা এও হতে পারে নারীর মধ্যে পুরুষ স্বপ্নের বীজ পুঁতে দিতে ভালোবাসে অজ্ঞাত নারীরা

ঘুরে বেড়ায়, সে তখন একজন আততায়ী এবং অধিক ভালোবাসা বলেও কিছু নেই জন্ম থেকে মৃত্যু কিংবা তারও অধিক কোথাও, কোনো অন্য গ্রহে সে আছে এক ক্ষুরধার অস্ত্র হয়ে।"[১০]

অমিয়ও বাড়ি থেকে উৎখাতিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার লক্ষ্যে উঠে এসেছে জাহাজে। জাহাজে কয়লা পুড়ে গিয়ে যে সমস্ত চকচকে ধাতব পিণ্ড থাকে তা গোপনে রেখে দেয় এক বাক্সে। সে ভাবে এই ধাতবপিণ্ড থেকে একবার সাত রাজার ধন মাণিক পেয়ে যাবে। মাণিক বেচে অনেক টাকা পেয়ে যাবে। এভাবে পৃথিবীর সর্ব সুখ পেয়ে যাবে— "টাকা কামিয়ে একটা দ্বীপ কিনে ফেলবো। তারপর চাষাবাদ, চারপাশে সমুদ্র দ্বীপের। দ্বীপের একপাশে উঁচু পাহাড়, পাহাড়ে একটা আমলকি গাছ থাকবে। তার নীচে ছোট্ট কুটির। নীচে বেলা ভূমি, মৎস্য শিকারের অবাধ সুযোগ। পাশে ফুলের রাজত্ব একপাশে আঙুর খেত, পাশেই আঙুর পচিয়ে মদ, পৃথিবীর যাবতীয় সুদৃশ্য গাছপালা এনে সে লাগাবে, তারপরে সুন্দরী রূপবতী মেঘবরণ চুলের কন্যার হাতে ফুল দিয়ে বলবে, আমি পৃথিবী জয় করলাম।"[১১] তেমনি বনিও ৫০-৬০ জন পুরুষ জাহাজিদের মাঝে নিজেকে রক্ষা করে সমবয়সী ছোটবাবুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে— সেই ব্যবলিয়ান সভ্যতার আগে, কিংবা গ্রীক সভ্যতার আর আর যদি ভাবা যায় ফারাওদের আমলে সে আর ছোটবাবু ছিল সেই অভিযানের প্রথম নারী-পুরুষ এবং এখানে তাদের বংশধররেরাই হাজার হাজার বছর পর ছোটবাবুর ফিরে আসার জন্য প্রতীক্ষা করছে।"[১৩]

উপন্যাসের এক অন্যতম চরিত্র কাপ্তান স্যালি হিগিনস। জীবনে কাপ্তান রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে ছুটতে ছুটতে পরিবার থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। জাহাজে উঠেই প্রিয়তমা পত্নী এলিসকে হাড়িয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন চড়াই উৎরাই এর মধ্যেও শুধু সমুদ্র-জাহাজকেই ভালোবেসেছেন। এমনকি প্রচণ্ড বিস্ফোরনে জাহাজ ভেঙে গেলেও তিনি এই জাহাজের উপর বিশ্বাস হারাননি— "শী ইজ ফেথফুল! সমুদ্রে শয়তান যতই চেষ্টা করুক, সিউল ব্যাংক আমাদের ঠিক কোনো ডাঙায় ভিড়িয়ে দেবে।"[১৪] ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে এভাবেই হিগিনস তার বিশ্বস্ত জাহাজ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। উপন্যাসের শেষ অংশে জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। মাঝ সমুদ্রে কোনো সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই যেনে জাহাজিরা প্ল্যাংটন খেয়ে কোনো মতে বেঁচে ডাঙায় ফেরার অদম্য আগ্রহে বোট নিয়ে ভেসে যায় সমুদ্রে। কাপ্তান স্যালি হিগিনস ছোটবাবুর হাতে তার একমাত্র বংশের প্রদীপ বনিকে পাঠিয়ে দিলেও নিজে জাহাজ থেকে বেড়োন নি। বেড়োতে পারেন নি ইঞ্জিন সারেঙও। যিনি পারিবারিক দৈনতা থেকে মুক্তি পেতে লড়ঝড়ে জাহাজে উঠে এসেছেন। ভালোবাসার তৃতীয় বিবি বাড়িতে তার জন্যে অপেক্ষা করছে জেনেও দীর্ঘদিনের সমুদ্র সফরের অলৌকিক মায়া বশত শেষ মুহূর্তে তিনি এই জাহাজ ত্যাগ করতে পারেন নি। মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

বিশেষ ভাবে লক্ষ করবার বিষয় যে, এই ৫০-৬০ জন জাহাজিই সমুদ্রের রুদ্ররূপের সাথে পরিচিত। পারিবারিক স্বচ্ছলতা আনবার জন্যে সমুদ্রে নেমে পড়েছে। কিন্তু তাতে তারা সফল হতে পারছে না। আবার চাইলেও তারা এই জীবন থেকে বেড়োতে পারছে না। তারা যেন, দীর্ঘদিন ধরে জলে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে বিভিন্ন বন্দর, উপকূল, বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শ এবং সমুদ্রের বিশালতার মধ্যে পড়ে একটা অলৌকিক জল জগতে আবিষ্ট হয়ে যায়। বিশালতা, স্নিগ্ধতা, বিভিন্ন উপকূল, বন্দর, সামুদ্রিক পাখি, ছোট বড়ো দ্বীপ, শত শত বছর ধরে শত শত মানুষের, সভ্যতার ইতিহাস বহনকারী সমুদ্রের সাথে তারা একাত্ম হয়ে পড়ছে। এই সমুদ্রের মধ্যেই খুঁজে পায় তাদের বাঁচা মরার মন্ত্র।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন, অলৌকিক জলযান, করুণা প্রকাশনী, দশম অখণ্ড সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১১।
২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৫ ।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫১।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৭।
৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতালি, tagorweb.in, সংগ্রহের তারিখ- ০৯/১২/২০২১, সময়- সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন, অলৌকিক জলযান, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪১।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৬।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮২।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৬।
১০. বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন, রেশমী, সাহিত্যম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১০১।
১২. বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন, অলৌকিক জলযান, ঐ, পৃষ্ঠা- ২০৭।
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৯।
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২১।

সহায়কগ্রন্থ :

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বলাকা, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, দশম সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ ১৩৯৬।
২. ড. সোমনাথ চক্রবর্তী, বাংলা উপন্যাসে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : সামগ্রিক মূল্যায়ন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৯।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন, অলৌকিক জলযান, করুণা প্রকাশনী, দশম অখণ্ড সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৯।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন, রেশমী, সাহিত্যম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডাণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, চতুর্থ পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৬৯।

৬. ভট্টাচার্য তপোধীর, ‘উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, দীপাবলী ২০১০।

৭. ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু, দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ আগস্ট, ২০০৫।

৮. ভট্টাচার্য তাপস, বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ-১৪১১।

অমর মিত্রের ছোটগল্পে : হারানো শিকড়ের খোঁজে বেদনার অভিব্যক্তি

বহ্নিশিখা সরকার
গবেষক,
বিনোদবিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল ইউনির্ভাসিটি, ধানবাদ

'সিমান্তের ওপার থেকে অচেনা বাংলাশদেকে এক অলীক ভূ-খন্ড মনে হত। মনে হত ওই ভূখণ্ডে বাস করেন আমার পূর্বপুরুষ, মৃত স্বজনেরা। ওখানের পথের ধুলোয় খেলছে অকালে চলে যাওয়া আমার ছোট ভাইটি, দিদিটি, যাদের মুখ আমার মনে নেই। আঁচল উড়িয়ে ওই যে পথের পাঁচালির দুর্গার মত মেয়েটি চলেছে মাঠ বেয়ে। সে তো আমারই দিদি। তার নাম ছিল ডিলডিল। শুনেছি মায়ের কাছে'[১]

১৯৫০ সালের পর থেকে অমর মিত্রের পরিবারেরা পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি ত্যাগ করে এপারে চলে আসে। ফলে তাঁর জন্মের পর ৪-৫ বছরের স্মৃতি থেকেই এই বোধের জন্ম নেয়। পূর্ববঙ্গের মাঠ-ঘাট, প্রকৃতি, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে একাত্মতার কোন স্বাদ পাওয়ার আগেই সেখানকার শিকড় উন্মূল করে এপারে চলে আসলেও তাঁর নাড়ির টান থেকেই যায়। ফলে একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তিনি তাঁর হারানো গ্রাম, জেলা, নদী, দেশ নিয়ে একের পর এক ছোটগল্প, উপন্যাস, স্মৃতিমূলক রচনা সৃষ্টি করে চলেছেন। সেগুলি পাঠ করলে সহজেই অনুধাবন করা যাবে দেশভাগের ফলে কি অপরিসীম যন্ত্রণা, নিজ জন্মভিটের প্রতি কি গভীর টান তাঁর রচনার মর্মমূলে গ্রথিত আছে।

দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা সেভাবে ব্যতিক্রমী কয়েকজন লেখক ছাড়া উপলব্ধি করতে পারেননি ফলে 'কেয়া পাতার নৌকা', 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র মতো মহাকাব্যিক উপন্যাস রচিত হয়নি এবং চলচ্চিত্রে নিমাই ঘোষ(ছিন্নমূল), ঋত্বিক কুমার ঘটকদের(কোমল গান্ধার, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা) মতো নির্মাতাদের আগমন ঘটেনি। দেশভাগের এই যন্ত্রণা কেন সাহিত্যিকদের মর্ম্মমূলে আঘাত করতে পারেনি সে সম্পর্কে প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য জানান-

> 'দেশভাগ সমস্ত অঞ্চলের বাঙালির জন্য হয়নি বলেই সবাই এই ঘটনার পরিণামকে জাতীয় বিপর্যয় বলে ভাবেননি। তাই পূর্ববঙ্গের সঙ্গে বিচ্ছেদে জাতিসত্তার বিকলাঙ্গ দশা নিয়ে মর্মবেদনা কিংবা ক্ষোভ ঈপ্সিত কোনও সাহিত্যিক অভিব্যক্তি পায়নি'[২]।

অথচ দেশভাগে ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা, অসহায় অবস্থা, কলকাতা-নোয়াখালির গণহত্যা এবং কিভাবে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আধিপত্যবাদের খাঁড়াতে হিন্দু ও বাঙালি

মুসলমানের চিরায়ত সহাবস্থানের প্রীতিপূর্ণ মধুর সম্পর্ককে বলি দিতে হল সেই গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের উপাদান নিয়ে কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারতো। কিন্তু দেশভাগের মতো আদিপাপকে ভেবেছেন ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধির সোপান অথবা সহজে প্রাপ্তব্য মুক্তি ও ক্ষমতা অর্জনের প্রাকশর্ত। তাই কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

বাংলাসাহিত্যে দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে সাহিত্য রচনার যে অপূর্ণতা রয়েছে সেই অপূর্ণতার কলস অমর মিত্র কিছুটা হলেও পূরণ করতে পেরেছেন। যদিও অমরবাবু প্রত্যক্ষভাবে দেশভাগ দেখেননি কিন্তু দেশভাগে তাঁর পরিবার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে যন্ত্রণা ভোগ ও আক্ষেপ করতেন তাই তিনি প্রত্যক্ষ ও অনুভব করেছিলেন। সেই নির্মম অতীত আজও বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতায় কতটা ছড়িয়ে রয়েছে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাব তাঁর ছোটগল্পে।

‘নদীর ওপার’ গল্পটি একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পনেরো বছরের মধ্যে লেখা। গল্পটি লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে স্বয়ং লেখক জানিয়েছেন-

> ‘আমি অনেক লেখক বন্ধু আর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে টাকি গিয়ে বহু রাত অবধি ইছামতীর কূলে বসে দেখতে পেয়েছিলাম অন্ধকারে আমার পিতৃপুরুষ ভেসে চলেছেন অকুল গাঙে। ওই ওপারে আমাদের ভিটেবাড়িতে হেরিকেন জ্বালিয়ে বসে আছে আমার বড় ঠাকুমা। ফিরে এসে একটা গল্প লিখেছিলাম, নদীর ওপার’[৩]।

গল্পটি নব্বই বছর বয়সি অভয়পদর স্মৃতিভ্রষ্টতায় পার্টিশনের যন্ত্রণার পাশাপাশি গণেশের অচেতন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে চলা ঘটনায় লেখক অমর মিত্র শিকড়ের সন্ধান করতে চেয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে তাঁর অবরুদ্ধ যন্ত্রণার বিষ বাষ্পের উদগিরণ ঘটেছে। লেখক দেখাতে চেয়েছেন পার্টিশনের যন্ত্রণা দশকের পর দশক চলে আসা এক দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষত, যেখানে কোন প্রলেপই স্থায়ি হয় না। তাই অভয়বাবু নব্বই বছরে পা দিয়েও দেশ, জেলা, গ্রাম, নদী, আত্মীয়-স্বজন, ভিটেমাটি হারানোর বেদনায় এতটাই মুহ্যমান যে শরীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকলেও তিনি যেন পূর্বজনদের সঙ্গে বাস করছেন, তাদের স্মৃতিতে বুঁদ হয়ে আছেন। ফলে তার মৃত সন্তান সাহেবকে খুঁজে পাচ্ছেন গণেশের মধ্যে।

‘আজকাল সবই ভুলে যান অভয়। আশ্চর্য! এত বয়সে ডিম খেয়ে, চপ কাটলেট খেয়েও দিব্যি হজম করে যান যে মানুষ, তিনিই কিনা একদিন আচমকা গণেশকে জিজ্ঞেস করলেন। আপনি কে? কাকে চাই’[৪]?

গণেশ পিতার প্রশ্নের জবাবে নিজের পরিচয় দিলে তিনি জানান-

‘কে গণেশ? সায়েবের বন্ধু? ও সায়েব সায়েব’[৫]।

আবার অভয়বাবু ঘোরের মধ্যে তার মৃত দুই ভাই কালিপদ ও নিরাপদর অস্তিত্ব টের পান। তাই তাদের সাথে কথা বলতে থাকেন। একদিন পুত্রবধূ রিনাকে জিঞ্জেস করলেন,

> ‘ধুরোল থেকে নিরা এল?...ও কালী কালী, সাড়া দে, মন খারাপ করে কি করবি’[৬]?

অভয়বাবু এই বয়সে এসে যেন পার্টিশনে দেশ, আত্মীয়-স্বজন হারানো যন্ত্রণায় কাবু হয়ে গেছেন, তাই তিনি অলীক অবাস্তব জগতে বিচরন করছেন।

গল্পের পরবর্তী অংশ সমস্তই গণেশ ও তার পূর্বজনদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গণেশ একজন সফল ব্যবসায়ি। সে গেছে ইছামতীর কূলে জমির জন্য, যে জমিতে সে কাঁকড়ার ব্যবসা করবে এবং এক্সপোর্ট করবে বিদেশে। ব্যবসার সূত্রে ইছামতীর কূলে অতিথিশালায় বসে তার মেজকাকা অসফল ব্যবসায়ি কালিপদ এবং ছোটকাকা নিরাপদর অস্তিত্ব টের পায়। তারা যেন তার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। দেশ মাটি উন্মূলের যন্ত্রণায় কেবল পিতা অভয়বাবু নয় তার উত্তর প্রজন্ম গণেশও এক পথযাত্রী। তাই গণেশ হঠাৎ পূর্বজনদের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ইহজগতের জ্ঞান হারায়। তার স্বপ্নে একে একে ভীড় করতে থাকে মেজকাকা, কাকি, ছোটকাক্ কাকি, ঠাকুরদা, ঠাকুমা নিস্তারিনীদেবী। তাদের সাথে সে কথোপকথন করতে থাকে। মেজোকাকার সাথে তার ব্যবসা, ছোটকাকার সাথে তার গান এবং অনিবার্য পার্টিশন, ছোটকাকি শোভারানির কাছে তার অগ্রজ মৃত দাদা সাহেব সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ, মেজোকাকির পৈতৃক ভিটেবাড়ি খোয়া যাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে আলোচনায় রত থাকে। নদীতে এক নৌকা দেখে তার স্মৃতিপথে উদয় হয়-

> ‘নৌকায় তার ঠাকুমা নিস্তারিণী আছেন। নাতি নাতনি নিয়ে বাপের বাড়ি হরিঢালি চলেছেন তিনি’[৭]।

গল্পে লেখক গণেশের মাধ্যমে এই দৃশ্যের অবতারনা করলেও বাস্তবেও তিনি এই ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন। সেই যন্ত্রণারই অভিব্যক্তি ঘটেছে এই গল্পে।

এই গল্পে লেখক পার্টিশনের মতো আদিপাপের সরাসরি অবতারনা করেছেন অনন্ত ভদ্র চরিত্রটির মাধ্যমে। তাই ঠাকুরদা নীলাম্বরের শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে স্বজন অনন্ত ভদ্রকে বলতে শোনা যায়-

> ‘পার্টিশন হচ্ছে, হিন্দুর দেশ ওপার, মুসলমানের দেশ এপার’[৮]।

এই অনন্ত ভদ্রর জীবনের অনেকটা অংশ গণেশের স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া যায়। দেশভাগে অনন্তের পরিচিত আত্মীয়স্বজনেরা এপারে আসলেও সে যায়নি। কিন্তু খেলার সঙ্গী নীলাম্বর তাঁকে ছেড়ে দেশ ছেড়ে চলে আসায় তার ফাঁকা বুকের হাহাকার প্রকাশিত হয়েছে গল্পে-

> ‘নীলাম্বর চলে গিয়ে আমারে অনাথ করে গেল ঘুঁটিগুলো আমার কাছে ছিল; ভেবেছিনু নীলাম্বর ওইটানেই ফিরে আসবে, এল না, না খেলতে পারলে বাঁচা কেন’[৯]?

অনন্ত ভদ্রর কয়েকটা মেয়ে সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে দুজন থাকতো মামার বাড়ি, একজনের বিয়ে হয় এবং বাকি তিনটি মেয়ে নিয়ে তিনি ওপারেই থেকে যান। এই তিনজনকে তাকে বিয়ে দিতে হয়নি, নিজেরাই সেই কর্মটি সম্পন্ন করেছে। সেই তিনজনের মধ্যে একজনের খবর পাওয়া যায়, যে শ্বশুরবাড়িতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

এরপর গণেশের সম্বিত ফিরে আসলেও পূর্বপুরুষদের স্মৃতির ঘোর কাটাতে পারেনি। সে টলতে টলতে অতিথিশালার ব্যালকনি থেকে সোজা নদীঘাটে তাদের খোঁজ করতে থাকে কিন্তু কোথাও তাদের খুঁজে না পেয়ে আবার সে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা গ্রাম জীবনের মধ্যে নেমে আসে। এখানে লেখক পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো ছবিকে তুলে ধরেছেন। যেখানে গণেশের নববিবাহিত ছোটকাকা নিরাপদ ও তার স্ত্রীকে শঙ্খ ও উলুধ্বনির দ্বারা বরণ করা, মাঠে পাঁকা ধান, খেজুর রসের গন্ধ, খেজুর রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরি, মেজোকাকির উনানে দুধ ফোটান ইত্যাদি। উন্মূলিত জীবনের মধুময় জীবনে গণেশ পাড়ি দিয়েছে।

এ গল্পের কাহিনি আসলে লেখকের ব্যক্তিজীবন থেকেই উঠে এসেছে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র গণেশ আসলে লেখক স্বয়ং। এই গল্পের প্রতিটি লাইনেই লেখককে, তাঁর ব্যক্তি জীবনকেই খুঁজে পাই এবং অনুভব করি তাঁর অপরিসীম যন্ত্রণার মাত্রাকে। দেশভাগ তাঁর দেশ, জেলা, গ্রাম, নদী, শৈশব, কৈশোর, যৌবনকে কেড়ে নিতে পারে কিন্তু তার মধ্যকার স্মৃতির যন্ত্রণাকে কেড়ে নিতে পারেনা, বরং তার মাত্রাকে উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বগামী করে তোলে। তাই পার্টিশনোত্তর বাংলার দুই প্রজন্মের অপরূপ সংযোগের সমীকরণ তৈরি করাটাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।

‘হারানো নদীর স্রোত’ গল্পটি গড়ে উঠেছে দেশভাগের পরে ভিটে মাটি ছেড়ে কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়িতে আসা এক পরিবারের উত্তরপ্রজন্মের বেদনার উত্তরাধিকারীর বয়ানে। লেখক দেখিয়েছেন দু’কামরার ফ্ল্যাটবাড়িতে আসা পরিবারটি কিভাবে কপোতাক্ষ তীরের পূর্বজনদের জীবনের সঙ্গে সংলগ্নতা খুঁজে পায় সেই আখ্যান। লেখক গল্পটির বয়ান রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানান-

> ‘আমার বাবার মৃত্যুর ঠিক একমাস আগে একটি গল্প লিখেছিলাম-হারানো নদীর স্রোত-সেই নদী কপোতাক্ষ।...সেই ফেলে আসা পূর্ববঙ্গ থেকে সেই গ্রামের এক বছর চল্লিশের মুসলমান যুবক এসেছিল তার মায়ের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে।...তারপর বৃদ্ধের সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়। এই গল্প এল নিজের ভিতর থেকে বাবা যখন কাউকে চিনতে পারছেন না, সেই মুহূর্ত থেকে।...গল্পটি এল তারপর’[১০]।

দেশভাগে কথকের পিতা নব্বই বছর বয়সি মুকুন্দ পাল স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, পিতা, মাতাদের নিয়ে অনাথ বিশ্বাস বাই লেনের দু'কামরার ফ্ল্যাটবাড়িতে ওঠেন। সেটাই ছিল দুই বঙ্গের মানুষের মিলনের ক্ষেত্র, দেশ হারানো আত্মীয়স্বজনের একমাত্র আশ্রয় স্থল। ওপার থেকে সর্বসান্ত হয়ে তারা এপারে এসে ওই ফ্ল্যাটবাড়িতে ঠাসাঠাসি করে থেকে নতুন জায়গা খুঁজে চলে যেত। কথকের মাকে সেইসব মানুষের রান্না একা হাতে দশভুজার মতো করতে হত, যারা বর্তমানে তাদের কোন খোঁজ রাখে না।

> 'মা চুপ করে থাকল কিছু সময়, তারপর বলল, "কত লোক ছিল এই বাসায়। কত লোক? এক একদিন তিরিশ জনের ভাত রেঁধেছি পর্যন্ত। ...না রেঁধে উপায় ছিল না, এই একটাই বাসাবাড়ি, তারা ওপার থেকে এসেছে, থাকার জায়গা ছিল না'[১১]।

কথকের মাতার বাপের বাড়ি ছিল ওপারে কপোতাক্ষ তীরে কাটিপাড়া গ্রামে। শেষ রাত্রে সেখানে প্রথম লঞ্চের ভোঁ শোনা যেত। এপারেও তিনি কথককে ছেলেবেলায় অনেক শুনিয়েছেন। মাতার অনেক আশা ছিল বাংলাদেশ হওয়ার পর তার ফেলে আসা বাপের বাড়ি, নদী দেখে আসবে কিন্তু সে আশা অপূর্ণই থেকে যায়। তিনি সেখানকার নদী গ্রামের কথা অনর্গল বলতে থাকলেও একসময় তা ফুরিয়ে আসে বা শ্রোতার সন্ধান পাননা। তাই তিনি তার অবরুদ্ধ বেদনা নিয়েই বেঁচে থাকেন।

ওপার থেকে আসা মানুষেরা গড়িয়া, বাঘাযতীন, নাকতলা, বাঁশদ্রোণী, দমদম, বিরাটি, সোদপুর, আগরপাড়াতে নতুন বসতি গড়ে তুললেও কথকরা সেই ভাড়া বাড়িতেই থেকে গেছেন। যদিও পিতা মুকুন্দ পাল সেই বাড়ি ছেড়ে গঙ্গার ধারে জমির সন্ধান করলেও তা না পেয়ে সেই বাড়িতেই থেকে যান। তিনি পুত্রকে ছাড়তে রাজি আছেন কিন্তু গঙ্গার ধার ছাড়তে রাজি নন। তার মধ্যে নদী নিয়ে অদ্ভুত এক বিশ্বাসের মূল প্রোথিত হয়েছে যা কথকের মাতার উক্তিতে প্রকাশ পায়।

> 'নদী না থাকলে মানুষের জীবন শুকিয়ে যায় মা,...নদীর ধারের মানুষ ভালো হয়, তাদের মন নরম হয়'[১২]।

সেজন্য মুকুন্দবাবু ফ্ল্যাটের জরাজীর্ণ অবস্থা জেনেও বাড়ি ছেড়ে যেতে চান না। নিজে না গেলেও পুত্রকে বলেন-

> 'তুই দ্যাখ ফ্ল্যাট, আমি এখানেই থেকে যাই।...তুই যাবি, আমি তোর মাকে নিয়ে থেকে যাব এখানে, এই শেষ বয়সে আমি গঙ্গা ছেড়ে যাব না। ...আমি মরি তো গঙ্গাতীরেই মরি, নিমতলা, কাশীমিত্তির ঘাট কত কাছে, নদীর ধারে থাকলে মনে বৈরাগ্য আসে'[১৩]।

গল্পের পরবর্তি অংশে দেখা যায় কথকদের ফ্ল্যাটে পূর্ববঙ্গের বড়োদল গ্রাম থেকে সিকান্দার আলি আসে গোবরডাঙ্গায় এক পূর্ববঙ্গীয় আত্মীয়ের বিয়ে বাড়ির আমন্ত্রণ সূত্রে। সে একে একে শোনাতে থাকে তার পিতা ও চাচার মৃত্যু, ধর্ম-মা রোশেনারার

মৃত্যু(যে একদা তার রূপে মুকুন্দ পালের মন জয় করেছিল), আঞ্জুমানের বিকারগ্রস্থ অবস্থা(যে ছিল কথকের মাতার সই), নদীর শুকিয়ে যাওয়ার বেহাল দশা এবং সেই সঙ্গে মুসলিমদের অত্যাচারে হিন্দুদের একে একে দেশ ছাড়ায় পক্ষাঘাতগ্রস্থ পূর্ববঙ্গের অবস্থা। এই সমস্ত শোনার পর কথকের পিতা ও মাতা তাদের পূর্ব স্মৃতিতে ডুব দেয়। একে একে বলতে থাকে সিকান্দারের মাতা পিতার সাথে তাদের বন্ধুত্বের কথা, তাদের সাথে কাটানো বিভিন্ন ঘটনার কথা। এসব বলতে বলতে ও শুনতে শুনতে মুকুন্দ পালের এক অদ্ভুত দশা লক্ষ্য করা যায় যা কথকের উক্তিতে প্রকাশ পায়-

> 'বাবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে বুকের উপর এসে শুকিয়ে যাচ্ছিল। বাবা কীরকম অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন সিকান্দারের দিকে। একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছেন'[১৪]।

এরপর তিনি আচমকা চঞ্চল হয়ে ওঠেন এবং বলতে থাকেন-

> 'খবর দিতে হবে, ঠাকুরদাস মিত্তির, শৈলেন রায়, গোবিন্দ কুন্ডু, বলরাম মল্লিক, সবাইরে জানানো দরকার, ওরা সব থাকে কোথায়? ডেকে নিতে এসেছিল মজাহার-এজাহারের বেটা, আমরা চলে এয়েছি বলে নদীতে জল নাই, সব্বাইরে খবর দে খোকা,...'[১৫]।

শিকড়ের টান যাওয়ার নয় তাই পূর্ববঙ্গ থেকে সর্বস্ব ত্যাগ করে আসলেও পূর্বপুরুষদের ঠিকানা ত্যাগ করতে পারেনি।

'এইসব মানুষ সবাই-এর আদি নিবাস বড়োদল, জেলা খুলনা। এখনও বিয়ের চিঠিতে লেখা হয় পিতৃপুরুষের ঠিকানা, আদি নিবাস বড়োদল, বর্তমান...'[১৬]।

এরপর মুকুন্দ পাল অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। পিতার অসুস্থতায় কথক একা বোধ করলে দেখা যায়, কিভাবে তার পিতার অসুস্থতার সংবাদ এপারে থাকা সমস্ত পরিচিত মানুষের কাছে সূর্য থেকে তার রশ্মি পৃথিবীতে আসার মতো অতি দ্রুততায় ছড়িয়ে পড়ে। একে একে পরিচিত সমস্ত আত্মীয়-স্বজন মুকুন্দবাবুকে দেখতে আসে কিন্তু তিনি তাদের চিনতে না পারলেও চেনার ভান করেন। মুকুন্দবাবু গোবরডাঙ্গার ঠাকুরদাস মিত্তিরকে দেখে বলেন-

> 'আপনি তাহলে বড়োদলের লোক, খুব ভালো কথা, বড়োদলে দুই নদী কপোতাক্ষ, বেতনা, এতদিনে মরে গেছে না বেঁচে আছে কে জানে, আপনি বড়োদলের খোঁজটা এনে দিন'[১৭]।

পাঠক মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন, মুকুন্দবাবু পূর্ববঙ্গের পরিচিত স্মৃতিজড়িত নদীর শুকিয়ে যাওয়ার সংবাদ মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি শিকড়ের সন্ধান করতে করতে সেই পূর্ববঙ্গেই চলে যেতে চান এবং এপারের সমস্ত দেশত্যাগী মানুষদের তিনি তার পথের সঙ্গী করতে চান। নিজের শিকড়ের টানে এতটাই বিভোর হয়ে আছেন যে ইহজগতের পরিচিত মানুষ এমনকি নিজ পুত্রকে পর্যন্ত চিনতে পাচ্ছেন না। তাই পুত্রকে দেখে তাকে বলতে শোনা যায়-

> 'আসুন, আসুন, আপনি বড়োদলের মানুষ, আপনারা সবাই এসেছেন, আমার কি আনন্দ হচ্ছে, আপনাদের সঙ্গে দেখা হল, এ আমার পরম সৌভাগ্য, এখনও সবাই আসেনি, এজাহার, মজাহার...'[১৮]।

এবং অন্যান্য পরিচিতজন ও আত্মীয়-স্বজনদের বলছেন-

> 'আপনারা আসবেন তাই বাসাবাড়িটা নেওয়া, সবাই থাকুন, সবাই আবার ফিরে যেতে পারি কিনা ভাবতে হবে, ওটা তো আমাদের জন্মভূমি, কী বলেন আপনারা'[১৯]?

মুকুন্দ পাল এমনই এক স্মৃতিভ্রষ্টতায়, ফেলে আসা দেশে যাওয়ার প্রবল বাসনায় নিমজ্জিত থাকতে থাকতে একসময় নিস্তেজ হয়ে পড়েন। নিস্তব্ধ অন্ধকারে কেবল তার চোখের জলের ধারা ও হৃদস্পন্দন ক্রিয়া করতে থাকে। দেশে ফেরার এই অলীক স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে আছেন একটা প্রজন্ম; মুকুন্দ পালের একাকীত্বময় প্রস্থান। সেই প্রস্থানে কি খুঁজে পাচ্ছে না জীবনের শিকড়?

গল্পকার অমর মিত্র ২০০০ সালে তাঁর লেখকবন্ধু সাধন চট্টোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ভগীরথ মিশ্রদের নিয়ে বাংলাদেশের ফেলে আসা ভিটে মাটিতে শিকড়ের সন্ধানে যান। সেই অভিযাত্রার কাহিনি গড়ে উঠেছে 'অন্ন-পরমান্ন' গল্পে বিমল দত্তের নাতি, সুবোধ দত্তের ছেলে ও ডাক্তার সুশীল দত্তের ভাইপো আবীর দত্তকে কেন্দ্র করে। গল্পে সেই অভিযাত্রাটি শুরু হয়েছে তেলেভাজার দোকানে বসে থাকা শুকুর আলির কাছে ধূলিহর গাঁয়ের সন্ধানে। আবীর দত্ত একে একে তার পরিচয় দিতে থাকলে শেষ পর্যন্ত পেয়ে যায় তার শিকড়ের মূল ধূলিহর গ্রামকে। হারিয়ে যাওয়া গ্রামকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় এমনভাবে-

> 'আবীর দত্ত বসে পড়ল শুকুর আলির পাশে, তার দুটি হাত ধরে ফেলে চোখ বুজে বিড়বিড় করতে লাগলো, কোনও দিন যে আসতে পারব ভাবিনি, বিশ্বাস হচ্ছে না এই হল ধূলিহর, কী আশ্চর্য! আমার তো মনে হত গ্রামটা উবে গেছে, এ পৃথিবীতে নেই ধূলিহর'[২০]।

আবীর দত্ত শুকুর আলিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের ভিটেবাড়িতে গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু পাঁচ বছর বয়সের স্মৃতির সঙ্গে বর্তমানের পিতৃপুরুষের ভিটের অবস্থা মেলাতে পারে না। সে কখন চিনতে পারে কখন পারেনা। কারণ-

> 'সেই বড় পুকুর, সে তো এইটুকুন ডোবা। জল নেই প্রায়। উঠোনই বা কই? কিন্তু পুকুরের ওপারের বাড়িটা রয়েছে। রামকৃষ্ণ ধরের বাড়ি। তারা নেই কেউ। আবীর দৌড়ে গেল সুপুরি বাগানে, বাগান থেকে ডোবার পাড়ে, পাড় থেকে মেটে বাড়িটার পাশ দিয়ে ভিতরে।...আবীর থম থমে গলায় বলছিল। পুকুরগুল, রাস্তা সব ছোট হয়ে গেছে, মিলছে আবার মিলছে না, এমন হল কেন শহীদুল ভাই'[২১]?

আবীর দত্ত তার পিতৃপুরুষের হারিয়ে যাওয়া ভিটেকে দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। অনর্গল চোখের জল ফেলতে থাকে। মধ্যবয়সি এক লোকের এমন অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ভিটের এক চিলতে মাটি রুমালে বাঁধতে দেখে তাদের ভিটের বর্তমান বাসিন্দা দিলোয়ারের ছেলে সিদ্দিকের স্ত্রী নাজমা বেরিয়ে এসে তার ব্যাথায় সমব্যাথি হয় এবং তাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ জানায়। আবীর নাজমাকে অবিকল তার ছোট কাকিমার মতো দেখতে বলে মনে করে। সে যেন শুনতে পায় ভিটেবাড়ির হাতনে থেকে মা, কাকি, কাকা, ঠাকুমা, ঠাকুর্দার গলার আওয়াজ। এমনকি সে অনুভব করে পুকুর পাড়, উঠোনের তরুণ সুপুরি, আম, জাম, জামরুল গাছগুলি তাকে চিনতে পেরেছে। তারা যেন তাদের ভিটে ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় সমব্যাথা বোধ করছে। ভিটে ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় আবীর আরও অনুভব করছে যে তাকে বিদায় দিতে গাছেরাও তার সঙ্গী হয়েছে, এবং কে যেন তার মাথায় ছাতা ধরছে। সিদ্দিকের বউ নাজমা ছুটে এসে আবীরকে তাদের ভিটের ভাতগন্ধী পাতা দিয়ে তাদের ভিটের গুণাগুণ জানায়-

> ‘ভাতগন্ধী পাতা, ভিটেতে খুব হয়, মোর শউর মশায় বলত এ ভিটেতে অন্নের অভাব হবেনে কোনওদিন, আপনা আপনি হয়, তোমার ঠাউদ্দা, তার ঠাউদ্দার আমলের গাছ সব, পুকুর পাড়ে ভিটের পিছনে হয়ে আছে, লাও লিয়ে যাও। ...অন্নের অভাব হয়নি এ ভিটেতে পা দেওয়ার পর, মোর শউরের আশীর্বাদ, আপনার বাপ-ঠাউদ্দার আশীর্বাদ’[২২]।

ফেরার সময় তেলেভাজা দোকানী হেলালও পশ্চিমবঙ্গের মসলন্দপুর গ্রামে ফেলে আসা পিতৃপুরুষের ভিটের সন্ধান করে আবীরের কাছে। হেলাল কখনও পশ্চিমবঙ্গে আসেনি। বাপ ঠাকুরদার কাছে তাদের হারিয়ে যাওয়া গ্রামের কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

‘খুলনে কি কলকাতার মতোন’[২৩]?

হেলালও আবীরের মতো শিকড়ের টান অনুভব করেছে। তাই তার চোখের জল বাঁধ মানেনি এবং সেই জল এসে পড়েছে গরম তেলের কড়াইতে। দুজনেই যেন ভাতগন্ধী পাতার সুবাস টের পাচ্ছে আর সেই সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে মানুষ থেকে মানুষে, দেশ থেকে দেশান্তরে।

অমর মিত্র পার্টিশনকে চাক্ষুস না করলেও হারানো মানুষ ও হারানো দেশকে এমনভাবে তার রচনার কেন্দ্রে রেখেছেন যে তাঁর লেখনীর অভিনবত্বে উত্তর প্রজন্মকে ফিরে যেতে হয় পার্টিশনের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভে। উত্তর প্রজন্মও খুঁজে চলে শিকড়ের মূলকে। ‘নদীর ওপার’, ‘হারানো নদীর স্রোত’, ‘অন্ন-পরমান্ন’ গল্প তিনটিতে সাতক্ষীরা-খুলনা সন্নিহিত ধূলিহর গ্রামকে খোঁজা মানে তো নিজেকেই খুঁজে চলেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মনোজ মিত্র, অমর মিত্র, 'শিকড়ের খোঁজে', 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে' প্রথম প্রকাশ-২০০১, দে'জ পাবলিকেশন, পৃঃ ৯১
২. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'দেশভাগঃ নির্বাসিতের আখ্যান', প্রথম প্রকাশ-২০১৬, সোপান পাবলিকেশন, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-০৬, পৃঃ ৫৭
৩. মনোজ মিত্র, অমর মিত্র, 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে', পৃঃ ১৭৩
৪. অমর মিত্র, 'নদীর ওপার', 'হারানো দেশ হারানো মানুষ দেশভাগ', প্রথম প্রকাশ-২০১৬, সোপান পাবলিকেশন, পৃঃ ২৩৯
৫. তদেব।
৬. তদেব।
৭. তদেব। পৃঃ ২৪১
৮. তদেব। পৃঃ ২৪৪
৯. তদেব
১০. মনোজ মিত্র, অমর মিত্র, 'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে', পৃঃ ১৭৯
১১. অমর মিত্র, 'হারানো নদীর স্রোত', 'হারানো দেশ হারানো মানুষ দেশভাগ', পৃঃ ২৪৯
১২. তদেব। পৃঃ ২৪৯-২৫০
১৩. তদেব। পৃঃ ২৪৯-২৫১
১৪. তদেব। পৃঃ ২৫৪
১৫. তদেব। পৃঃ ২৫৫
১৬. তদেব। পৃঃ ২৫৬
১৭. তদেব। পৃঃ ২৫৮
১৮. তদেব। পৃঃ ২৬১
১৯. তদেব।
২০. অমর মিত্র, 'অন্ন-পরমান্ন', 'হারানো দেশ হারানো মানুষ দেশভাগ', পৃঃ ২৬৩
২১. তদেব। পৃঃ ২৬৫
২২. তদেব। পৃঃ ২৬৭
২৩. তদেব। পৃঃ ২৬৮

উপন্যাস – সংরূপ – প্রয়োজনীয়তা

সুষমা সেন
সহকারী অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বঙ্গবাসী কলেজ

সাহিত্যকে আঙ্গিকগতভাবে বিভাজন করাটা যতখানি বৈজ্ঞানিক বিষয়গতভাবে বিভাজন করাটা সম্ভবত ততখানি নয়। নাটক রূপক না সাংকেতিক নাকি একাঙ্ক এটি বিচার করা যেতেই পারে কিন্তু সেটি সামাজিক না পৌরাণিক এই আলোচনা সবসময় যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। উপন্যাসটি চেতনাপ্রবাহমূলক কিনা তা তার লেখার ধরণ থেকে নিশ্চয়ই বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু প্রথম থেকেই সেটি আঞ্চলিক না রাজনৈতিক ভাবতে বসলে আসল বিষয়টিই বুঝি হারিয়ে যায়। মনে হয় একটি উপন্যাস বা কথাসাহিত্যকে সামাজিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক বা এই ধরণের কোনো বিশেষণে বিশেষিত করা খুব প্রয়োজনীয় নয়। একটি উপন্যাসের ভিতর এই বিষয়গুলি একইসঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে।

যদি বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি উপন্যাসের নাম পরপর বলা হয়, যেমন পদ্মানদীর মাঝি, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, আরণ্যক -তাহলে অনেকেরই মনে হবে এগুলি সবই তো আঞ্চলিক উপন্যাস। কারণ আঞ্চলিক উপনাস হিসেবেই এগুলি গণ্য। কিন্তু পদ্মানদীর মাঝি'র ভিতর কি রাজনীতি একেবারেই অনুপস্থিত? হোসেন মিঞা- ময়নাদ্বীপ প্রসঙ্গ কি কোনো রাজনৈতিক বার্তা পাঠকের সামনে উপস্থিত করেনা? পঙ্গু মালার জীবনচর্যা কি সমাজ বহির্ভূত, কপিলা-কুবেরের পরকীয়া সম্পর্ক কি সমাজের চোখরাঙানিতে থমকায় না? তাহলে "পদ্মানদীর মাঝি" রাজনৈতিক বা সামাজিক তকমাটি পেল না কেন? আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বুঝি আর সমস্ত কিছুকে ম্লান করে দিল! এইখানেই আমাদের আলোচনার শুরু। কোনো একটি কাহিনীকে কি শুধু একটিমাত্র শব্দবন্ধের ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া আদৌ যায় বা সেটা কি উচিত? যে পাঠক প্রথম পাঠ করছেন পদ্মানদীর মাঝি, তাকে যদি প্রথমেই বলে দেওয়া হয় এটি একটি আঞ্চলিক উপন্যাস, তাহলে তার পাঠের দৃষ্টিকে কিছুটা খর্ব করা হয় নাকি!

মালো সমাজ নিয়ে লেখা সুবিখ্যাত উপন্যাস "তিতাস একটি নদীর নাম" অঞ্চল ভিত্তিক লেখা হলেও, সেই অঞ্চলের যে নিপুণ সমাজচিত্র বহন করে তা প্রশংসনীয়। বাসন্তীর ভিতর দিয়ে লেখক যে বার্তা পৌঁছে দেন তা বঙ্গনারীকে চিনতে সাহায্য করে, বঙ্গসমাজকে বুঝতেও, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলকে নয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম নিয়ে একখানি উপন্যাস রচনা করেন তখন সেটি আঞ্চলিকহয় না। কেন হয় না?কারণ বাংলার মানচিত্রে নিশ্চিন্দিপুর নামে কোনো গ্রামকে খুঁজে

পাওয়া যায় না। তাই সেই গ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকলেও সেটির ভিতর আঞ্চলিক ধর্ম অনুপস্থিত। কোন অঞ্চলের সম্পদ হবে সেটি, সমালোচকরা তা ঠিক করতে পারেন না, তাই গ্রামবাংলার নিখুঁত চিত্রটি কোনো অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয় না, আঞ্চলিক তকমা পায় না। কুশী নদীর অপর পারে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ অরণ্যে প্রান্তরকে কেন্দ্র করে লেখা বিভূতিভূষণের উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করে। তার যে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা টানা আছে। উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষণপুর, পূর্বে ফুলকিয়া-বইহার-লবটুলিয়া থেকে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলা-ভাগলপুর অঞ্চলকে ঘিরেই গড়ে ওঠে আরণ্যক উপনাসের পটভূমি। যে সব অঞ্চলের কথা লেখক এই উপন্যাসে বলেছেন যেমন- লবটুলিয়া, ফুলকিয়া, বইহার, নানাবইহার, ভীমদাসটোলা, লছমনিয়াটোলা, চকমকিটোলা, কুলপাল, বুরুন্ডি, পর্বতা,শূয়োর-মারী-বস্তি – এই সমস্তরই দেখা মেলে ভাগলপুর মানচিত্রে।পাহাড়ী নদী মিশি,কারো, কুশী প্রভৃতিও এই অঞ্চল দিয়েই প্রবাহিত। পাশাপাশি সুংঠিয়াদিয়ারা অঞ্চলের নাম লেখক করেছেন বলে মনে হয়, দিয়ারা উপত্যকাও এই উপন্যাসের একটি বিশেষ স্থান।

যখন কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলকে(অবশ্যই যা বাস্তবে পাওয়া যায়- দিকশূন্যপুরের মতো কিছুতেই নয়) ঘিরে একটি উপন্যাস গড়ে ওঠে এবং সেই অঞ্চলের জনজাতির কথা সেখানে আলোচিত হয়, সাধারণভাবে তখনই সৃষ্টি হয় একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। "আরণ্যক"এ সেই নির্দিষ্ট ভূ-রেখাটি মিলেছে। কিন্তু রেখা কি কল্পনার খাতিরে এতটুকুও কাঁপেনি? অরণ্য উপভোগের সমস্ত স্বাদ-গন্ধ পাঠকের প্রাণে ছড়িয়ে দেওয়ার তাগিদে লেখক সিংভূম ভ্রমণের সময় যে মহালিখারূপের নাম শুনেছিলেন কিংবা যে ধনঝারি দেখেছিলেন সেগুলিকেও তিনি ভাগলপুরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন, তাই আরণ্যকে আজমাবাদ-ইসমাইলপুরের বনঝাউ আর কাশজঙ্গল যেমন আছে, তেমন কুন্ডীর পাশের বনের সৌন্দর্য ছবি এবং সিংভূমের জঙ্গলের চিহর ফলের বীজ কুড়িয়ে খাওয়ার অভিজ্ঞতা, ওড়াও গঢ় বা রানী ঝরণা দেখার দৃশ্য। মানচিত্রের রেখা একটু নড়ল বটে, কিন্তু আঞ্চলিকতা থেকে 'আরণ্যক' মুক্ত হল না।

আমাদের কথা হল, অঞ্চলভিত্তিক হলেই তা আঞ্চলিক, দুখানি রাজনীতির বার্তা থাকলেই সেটি রাজনৈতিক -এই তকমার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি? 'আরণ্যক' একটি উপন্যাস- একটি কালজয়ী উপন্যাস। তার বিশেষ ঠিকানার কীই বা প্রয়োজন! লেখক যখন আমাদের জানান- ভাগলপুর অঞ্চলের গরমের জলকষ্টের কথা তখন সেটি শুধু ওই অঞ্চলের মানুষের ভিতর আর আবদ্ধ থাকে না। ঘন্টাখানেক ধরে বালি ছেনে ছেনে যে আধবালতি তরল কর্দম পাওয়া যায় তাই দিয়েই জলের অভাব মেটাতে হয় ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যের মানুষকেই। তখন সেই সমস্ত মানুষের বেঁচে থাকবার লড়াইয়ের কাহিনী হয়ে যায় আরণ্যক; এ শুধুমাত্র অঞ্চলভিত্তিক হয়ে থাকে না, থাকতে পারে না। একজন লেখক যখন লেখনী গ্রহণ করেন তখন তার মনের ভিতর

স্বাভাবিকভাবেই নানান রঙের আলপনা আঁকা হতে থাকে। সেই সমস্ত রঙ দিয়ে যখন সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় তখন কোনো একটি রঙ আগে পাঠকের চোখে ধাক্কা দিলেও অনেক সময় হালকা রঙটি হয়ত মন ছুঁয়ে যায় বেশি। মাঝারিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই পাঠক হিসেবে আমাদের সবকটি রঙকেই চিনবার চেষ্টা করা উচিত।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে বাংলা তথা ভারতের রূপ দেখা যায়সেইখানে অনেক সমস্যা, দ্বিধা, রাজনৈতিক জটিলতা। পরাধীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের মানুষ আর স্বাধীন ভারতবাসীর আত্মশনাক্তিকরণ সম্পূর্ণ আলাদা।তারই প্রকাশ তথাকথিত আঞ্চলিকউপন্যাসগুলিতে। আঞ্চলিকতা পুরনো বাংলাসাহিত্যেও ছিল। চর্যাপদে ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা মেলে। ধর্মমঙ্গল কাব্য আঞ্চলিক কাব্য হিসেবেই পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই জাতীয় উপন্যাস পাওয়া যায়না। বিংশ শতাব্দীতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সুব্রত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত বেশ কিছু সাহিত্যিককে অঞ্চলপ্রধান উপন্যাস লিখতে দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে যে উপন্যাসগুলিকে আঞ্চলিক তকমাটি উপহার দেওয়া হয় লক্ষ করলে দেখা যায় তার বেশিরভাগই নদীকেন্দ্রিক। তারাশঙ্কর-মানিক-অদ্বৈত-সমরেশ বসু-দেবেশ রায় সকলেই নদীর ধারের জনজাতির জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন আগ্রহভরে।

'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কোপাই নদীর ধারের কাহার জীবনের কথা বলা হয়েছে। কাহারদের জীবনযাত্রার সঙ্গে রয়েছে প্রাচীন-নবীনের দ্বন্দ্ব, যার ফলে আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে বাস্তবতা এসেছে। সঙ্গে রয়েছে পৌরাণিক বিশ্বাস। এই রাঢ় বঙ্গের ঝুমুর শিল্পীর প্রেম-অপ্রেম-বেদনার কথা শুনতে পাওয়া যায়সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের "নাচনী" উপন্যাসের কাহিনীতে। বিশেষ অঞ্চলকে ঘিরে কাহিনীবিন্যাস ঘটছে বটে কিন্তু লক্ষ্য সেই অঞ্চলে স্থির নয়। তাই কেন যে তার পরিচয় আঞ্চলিক উপন্যাস হবে সেটিই মনে প্রশ্ন তোলে।

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখায় সমাজের তথাকথিত ব্রাত্য জনজাতির কথা সেভাবে পাওয়া যায় না। প্রবন্ধে তাদের স্থান দিলেও গল্পে-উপন্যাসে তারা নিতান্তই অনুপস্থিত। শরৎচন্দ্রের লেখায় একটু দেখা পাওয়া যায় কিন্তু অবশ্যই পার্শ্বচরিত্র হিসেবে। এরই মাঝে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কোলেদের দিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন "পালামৌ"। ভারতীয় সমাজ কাঠামোয় বর্ণাশ্রমের যে রেশ ছিল তারই সূত্র ধরে সমাজে ব্রাত্য মানুষ সাহিত্যেও ব্রাত্য থেকে গিয়েছিল। রাশিয়া বিপ্লব, গান্ধিজীর হরিজন আন্দোলন সম্ভবত মানুষকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। বর্ণহিন্দু নায়ক, সদগোপ নায়ক এইরকম উপন্যাস বাংলাসাহিত্য পেতে শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিতমশাই", তারাশঙ্করের "চৈতালি ঘূর্ণি"। তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় শ্রেণি নিয়ে লেখা শুরু হয়। আর সেই ধরণের বেশির ভাগ লেখাই আঞ্চলিক আখ্যা পেয়ে যায়। কিন্তু অঞ্চল কেন? কেন মানুষ নয়? কেন সামাজিক নয়? ১৯২৯ সালে বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালি" আর জগদীশ গুপ্তের "দুলালের দোলা" প্রকাশিত হয়।

প্রথমটিতে গ্রামের নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব নিরিবিলি ছায়ামাখা রূপখানি আর দ্বিতীয়টিতে গ্রামের কুৎসিত রূপ। কিন্তুকোনোটিতেই গ্রামটিকে নির্দিষ্ট করে চেনা যায় না। ভাগ্যিস চেনা যায় না। তাই এই দুটিকে আর ধরে বেঁধে ডানা ছেঁটে "আঞ্চলিক" নামক খোপটির ভিতর রাখা গেল না। নির্দিষ্ট অঞ্চল নিয়েই যখন গজেন্দ্রকুমার মিত্র লিখলেন "উপকণ্ঠে" কেতকী-কুশারী ডাইসন লিখলেন "নোটন নোটন পায়রাগুলি", তখন সেগুলি নগরকেন্দ্রিক বলে "আঞ্চলিক" নামকরণ হল না। তাহলে শুধুমাত্র গ্রামকেন্দ্রিক জনজাতির জীবননির্ভর কথাসাহিত্যই আঞ্চলিক হয়ে উঠল। হারিয়ে গেল ওই মানুষগুলির কথা, অঞ্চল হয়ে উঠল প্রধান। অন্তত সেই পরিচয়ই বহন করে চলল উপন্যাসগুলি। দ্বিতীয় ভাঁজে মানুষের জীবনকথা!

বিংশ শতাব্দীর যে উপন্যাসগুলিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের পরিচয় দেওয়া হয় তার অনেকগুলিরই নাম আমরা করলাম। কিন্তু একটি উপন্যাসের নাম এতক্ষণের আলোচনায় একবারও করিনি। আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা যখন নিয়ম মেনে পড়তেই হয়, তখন যদি মনের বিরুদ্ধে গিয়ে একবার স্বীকার করেই ফেলি যে, আঞ্চলিক উপন্যাস বলে সত্যিই কিছু হয়, তাহলে আমার সেই তালিকায় একদম প্রথমে থাকবে এই নাম না করা উপন্যাসটি। আবার এই উপন্যাসটিই আমায় শেখায় বারবার যে আঞ্চলিক- রাজনৈতিক-সামাজিক বলে আসলে কিছুই হয় না। কারণ এই ধরণের অনেকগুলি ভাগের তালিকা করলেই আমার তালিকার প্রথম নামটি হবে ওই উপন্যাসটি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" সমালোচনা গ্রন্থের সূচিপত্রে এই উপন্যাসের লেখকের নাম পাওয়া যায় না। বইটির অষ্টম সংস্করণ ৮২৭ পৃষ্ঠার। "নির্দেশিকা"র সাহায্য নিলে ৮১৪ পৃষ্ঠায় এই উপন্যাসটির উল্লেখমাত্র মেলে। শ্রীকুমারবাবুর মতে "কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিবিভাগের মধ্যে এই উপন্যাসটিকে ফেলা যাবে না"।[১]উপন্যাসটি সতীনাথ ভাদুরির "ঢোঁড়াই চরিত মানস"। কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিবিভাগে ফেলা যাবে কিনা বলতে পারব না, তবে আমার ব্যক্তিগত তালিকায় অনেক বিভাগেরইপ্রথমতম নাম ঢোঁড়াই চরিত মানস।

"তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াই নামের একজন লোক সত্যিই ছিল। এখানকার গ্রামাঞ্চলে ও নামটা খুব চলে। তবে তার হিন্দিতে বানান হল ঢোঢ়াই; উচ্চারণ ঢোড়হাই। বাঙালিরা নিজেদের ধরণে করে নিয়েছে ঢোঁড়াই। আমি বাংলাভাষীদের ভুল বানানটা নিয়েছিলাম, এই নামের অনুষঙ্গে নির্বিষ সাপের ইঙ্গিতটুকু আনবার জন্য"।[২]আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, রাজনৈতিক প্রগতির দলিল "ঢোঁড়াই চরিত মানস"।[৩]

উত্তর বিহার (বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি) নানাদিক থেকে পিছিয়ে থাকা এক অঞ্চল। কোনো শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠেনি। কৃষিভিত্তিক দরিদ্রজীবনের ছবি এখানে। সতীনাথ ভাদুরীর বাস ছিল পূর্ণিয়া অঞ্চলে। সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিনিয়ে লেখা এই উপন্যাস। লেখকের পর্যবেক্ষণ সরাসরি গিয়ে পড়েছে

এই সাধারণ মানুষগুলির ওপর। এই সমাজের মধ্যে প্রবলভাবে যে জাতিভেদ আছে তারও কথা এইখানে সুস্পষ্ট। দুটি জনজাতি গোষ্ঠীর কথা এইখানে মূলত এসেছে- তাৎমা(হিন্দু), ধাঙড়(খ্রিস্টান)। এই দুই জনজাতির কথা শোনা যায় এই উপন্যাসটিতে। জনজাতি আর বিশেষ অঞ্চলের কথা বলা হল বলেই একে বলা হল আঞ্চলিক উপন্যাস। আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে দেখতে পারি উপন্যাসটি সত্যিই কথাখানি তথাকথিত আঞ্চলিক হয়ে ওঠার উপযুক্ত।

যে সমস্ত অঞ্চল নাগরিক হস্তক্ষেপের বাইরে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে সেই সব অঞ্চল নিয়েই লেখা হতে পারে আঞ্চলিক উপন্যাস। ভৌগলিক, প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত দিকই হবে আঞ্চলিক। সতীনাথ বিহারের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল তাৎমাটুলিকে প্রথমেই নির্বাচন করেছেন। জিরানিয়া-পূর্ণিয়াকে চিনে নিতেও পাঠকের কষ্ট হয় না। তাই প্রথম শর্ত এইখানে রক্ষিত হয়েছে। স্থানটি মানচিত্রে নির্দিষ্ট এবং সেটি নাগরিক আওতার বাইরে। উপন্যাসে অঞ্চল এবং জনজাতির সম্পৃক্তি প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য লেখক জনজাতির কথা বলতে শুরু করে শেষপর্যন্ত মনোনিবেশ করেছেন একটি চরিত্রের ওপর। সমগ্র জনজাতির উত্তরণের পরিবর্তে ঢোঁড়াইয়ের উত্তরণ কাহিনী অধিক বর্ণিত। কিন্তু তার ফলে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য খর্ব হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন জনজাতির সমস্যা ও আবর্তন দেখানো শুরু করে একটা সময়ের পর ঢোঁড়াই মুখ্য হয়ে ওঠে। সে তার জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ছেড়ে নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। বিচ্ছিন্ন হয় কিন্তু তার ফলে উপন্যাসটির গা থেকে আঞ্চলিকতার গন্ধ কিছুমাত্র দূর হয় না। লেখক যখন আমাদের জানান, তাৎমা পুরুষরা কিছুতেই মসুর ডাল খেতে চায় না কারণ গরম ডাল খেলেই কুষ্ঠ অবধারিত বলেই তাদের বিশ্বাস, যখন বলেন, "লোহা মেনেছে" কথাটির অর্থ পরাজয় স্বীকার করেছে, যখন ভাদ্রপূর্ণিমার দিনে ধাঙড়দের উৎসব আর পূজা কর্মাধর্মায় আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান, যখন বাকধারার ব্যবহার শেখান মুরোদে কুলোল না অর্থে "দাল গলল না", যখন আদা দেওয়া বড়ি অদৌড়ি প্রস্তুতির উপায় শেখান, যখন কুমড়োয় "গানহি বাওয়ার" মুখ আঁকার কথা বলেন তখন কিন্তু আমরা সেই অঞ্চলের ভেতরই উপস্থিত হই। অঞ্চলের রূপ রস গন্ধ বর্ণ সমস্ত কিছু আমরা আমাদের অস্থি মজ্জায় মিশিয়ে ফেলি অনায়াসে। অঞ্চলের ভাষাটিকে এত অসাধারণভাবে ব্যবহার করেছেন যা তুলনাহীন। প্রয়োজনে আমরা পাদটীকার সাহায্য নিচ্ছি বারংবার, কিন্তু সেই কারণে পড়বার গতি কিছুমাত্র ব্যাহত হচ্ছে না, বরং রস আরও গাঢ় হচ্ছে। তাৎমারা যে স্বরাজকে বলে সুরাজ আর বোটানি বিষয়টিকে বলে ভূটানি, তাও তো এই উপন্যাস পাঠই আমাদের বলে দেয়। অসংখ্য বাকধারা, ছড়া, সংস্কার বা কুসংস্কার যা ওই জনজাতির একান্ত নিজস্ব তার সবটুকুই বর্ণনা করেন লেখক নিখুঁতভাবে। তাৎমারা কথা বলবার সময় ধ্বনিপ্রধান শব্দের পুনরাবৃত্তি করে - এটা তাদের কথা বলবার বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য। সেটিরও উল্লেখ করতে লেখক কিন্তু ভুলে যাননি। উপন্যাসের

কাহিনীর ভিতর এই সমস্ত ভাষা বৈশিষ্ট্যকে সংলাপের মধ্যেই সাজিয়ে দিয়েছেন অথচ কোথাও কখনও আরোপিত বা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়নি। কাহিনীর ভিতর কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা বা অতিরিক্ততা ভিড় করেননি। কিন্তু সমস্ত বৈশিষ্ট্য জানানো হয়ে গিয়েছে।

ঢোঁড়াইয়ের প্রাধান্য আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যবিরোধী হয়ে ওঠেনি। আঞ্চলিক উপন্যাসকেও কিন্তু জনজাতির কেন্দ্রীয় সংকট ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে হবে। শেষপর্যন্ত মানবিক সার্বজনীন স্তরে পৌঁছতে হবে। সেই দিক থেকে সতীনাথের এই উপন্যাস শিল্প হিসেবেও উৎকৃষ্টমানের। তাৎমা-ধাঙড়দের জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় আঞ্চলিক উপন্যাসের তালিকায় "ঢোঁড়াইচরিত মানস"কে আমার কাছে প্রথম করে তোলে। কিন্তু আবার সেই পুরনো কথায় ফিরে আসতে হয়। আঞ্চলিক উপন্যাস বলে কোনো রচনাকে নির্দিষ্ট করা যায় কি? উচিত কি? আঞ্চলিক উপন্যাস – এই পূর্বনির্দিষ্ট সংরূপের কথা ভেবে কি কোনো সৃষ্টি শুরু বা শেষ হতে পারে! সেই সৃষ্টির ভিতর কি কোনো স্বতঃস্ফূর্ততা থাকা আদৌ সম্ভব! তবে কেন এই বৃথা নামকরণ! আঞ্চলিক উপন্যাসের যা বৈশিষ্ট্য বলে সমালোচকরা নির্দিষ্ট করেছেন [বিশেষ অঞ্চলের কথা বলা হবে, ভৌগোলিক সীমারেখা বাস্তবসম্মতভাবে নির্দিষ্ট থাকবে, জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ, লোকধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কারের ছবি থাকবে, ভাষা হবে লোকভাষা, জনগোষ্ঠীই নায়ক হবে] তার প্রায় সবকটিই ঢোঁড়াই চরিত মানসে পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু সেটুকুই পাওয়া যায় না; আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়। তাহলে একটি নবীন পাঠককে কেন বলে দেব এটি একটি "আঞ্চলিক উপন্যাস"। কেন বুঝে নিতে দেব না তাকে তার মতো করে? উপন্যাসের রস প্রতিটি পাঠক তার নিজস্বতা দিয়ে অনুভব করবে। এটাই তো হওয়া উচিত। বিশেষ নামের মোড়কের আড়ালে কেন ঠাঁই পাবে একটি উপন্যাস, এটাই আমাদের জিজ্ঞাসা, এখানেই আমাদের আক্ষেপ।

"ঢোঁড়াই চরিত মানস" একটি অনবদ্য "রাজনৈতিক উপন্যাস" হবার যোগ্যতা রাখে, আমি অবশ্য ঠিক বুঝতে পারি না, মানুষের জীবন নিয়ে লেখা কোন উপন্যাসটি রাজনৈতিক নয়! সে তর্ক থাক। কথাসাহিত্যের বিভাজন স্বীকার করে নিয়ে "রাজনৈতিক উপন্যাস" হিসেবে "ঢোঁড়াই চরিত মানস" কেমন দেখা যাক।

ঢোঁড়াইয়ের জন্মকাল থেকেই লেখক সচেতনভাবে প্রশাসনিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন। ১৯১৩ সালে ঢোঁড়াইয়ের বয়স ছিল দেড় বছর; কালেক্টর কিলবি সাহেবের নাম করে সময়কে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে ঢোঁড়াইয়ের জীবন শুরু হয়। ১৯১৫ সালে আফ্রিকা থেকে গান্ধিজী ভারতে আসেন। এসে দেশের স্বরাজের প্রশ্ন তোলেন; রাজনীতিকে আপামর জনসাধারণের ভিতর ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন গান্ধিজী। হতদরিদ্র খেটে খাওয়া ঘর্মাক্ত মানুষগুলির ভিতরে ইংরেজবিরোধিতার বীজ রোপণ করেছিলেন তিনি। এই "গানহি বাওয়া"(গান্ধি

বাবা)র ছবি উপন্যাসে এসেছে। সমগ্র ভারতবাসীর সঙ্গে তাৎমারাও ইংরেজের কাছে স্বাধীনতা দাবি করেছে। উপন্যাসের প্রথম চরনে গান্ধিজীর অলৌকিক ক্ষমতা তাৎমাদের বিশ্বাসের টুকরো টুকরো ছবির ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে। পরবর্তী অংশে গান্ধির ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত। ২য় চরনে ভারতীয় অবহেলিত সমাজে কংগ্রেসি আন্দোলনের কথা এসেছে। দেশের দরিদ্রশ্রেণির প্রতিনিধি সেখানে ঢোঁড়াই। ঢোঁড়াইয়ের কথায় চাষের কথা, জমির কথা, জমির মালিকানার কথা আসে। অবহেলিত শ্রেণির ভিতর জমির মালিকানার বিচারে কীভাবে প্রশাসনিক চিন্তা জায়গা করে নেয় তাও দেখান ঔপন্যাসিক। অবশেষে কৃষকদের কাগজে-কলমে লিখিত অধিকার দেয় জমিদার। ভলন্টিয়ার প্রসঙ্গ আসে সচেতন ভাবে; জমিদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেতনা জাগে তাৎমাদের মনে। ভোটের সঙ্গে পরিচিত হয় তারা। নিরক্ষরতা যে ক্ষতিকর সেই চেতনা জাগ্রত হয় তাদের। “সদিয়াগিরাৎ” উৎসবের ছবি আঁকেন সতীনাথ যা আসলে সত্যাগ্রহ উৎসব। গান্ধিজীর আন্দোলনের সঙ্গে অবহেলিত শ্রেণির চেতনার জাগরণ-বিবর্তন এইখানে আলোচিত। আসে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সমস্যার চিত্রও। ইংরাজ সরকার কীভাবে বিভাজন নীতিকে ব্যবহার করছে সে প্রসঙ্গও উঠে আসে। ঢোঁড়াইয়ের চেতনায় রাজনৈতিক জটিলতা দেখা যায়। ১৯৪২ এ অন্তর্কলহের জেরে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ঐক্য নড়ে ওঠে। তারই ফল উপন্যাসের “আজাদদস্তা” দলটির জন্ম। সেখানে অস্ত্র আছে। অস্ত্রের সাহায্যে দেশ স্বাধীন করবার উত্তেজনা দেখা যায়। গান্ধিজীর আদর্শ থেকে সরে আসে বহু মানুষ, ঢোঁড়াইয়ের রাজনৈতিক বিশ্বাসে আঘাত আসে। তার আনুগত্য তৈরি হয় অ্যান্টনিকে অবলম্বন করে রাজনীতি থেকে সরে এসে কিছুটা হতাশার মধ্য দিয়েই হয়ত উপন্যাস শেষ হয়। কিন্তু হতাশার মধ্যেও ভুললে চলবে না, উপন্যাসের শুরু আর শেষের তাৎমারা সম্পূর্ণ আলাদা। বিপ্লব, জমির মালিকানা, ভোটবাক্স আর সর্বোপরি গান্ধিজীর শক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে তারা। ১৯১৩ থেকে ১৯৪২ এর রাজনীতির চিত্র বহন করে ঢোঁড়াই চরিত মানস। সেই চিত্র দলিল হয়ে ওঠার যোগ্য। কী করে বলব “ঢোঁড়াই চরিত মানস” সার্থক “রাজনৈতিক উপন্যাস” নয়।

সমালোচকদের মতে উপন্যাসের আরেকটি বিভাজন হল “সামাজিক উপন্যাস”। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটি সেই বিভাগেও প্রথম হতে পারে। তাৎমা সমাজই তো উপন্যাসের অন্যতম বিষয়। ঢোঁড়াইকে বাদ দিয়েও তাৎমা সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। সমাজের চলমানতা অর্থাৎ সমাজ যে পরিবর্তনশীল একটা সময়ের ভেতর দিয়ে চলেছে আর তার অভিঘাতে সে নিজেও প্রতিনিয়ত বিবর্তিত হচ্ছে তাই বলেন সতীনাথ। সময়কালকে সুনির্দিষ্টও করে তোলেন ইতিহাস সাক্ষী রেখে – ১৯১৩, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গান্ধিজী, লবণ আন্দোলন, ১৯২৪ এ মুঙ্গেরে ভূমিকম্প, কংগ্রেস আন্দোলন, ১৯৪২ এর আগস্ট বিপ্লব – সময়টা বড়ো অস্থির। গতি খুব বেশি। সেই গতির প্রভাব তো সমাজের ওপর আসবেই। উপন্যাসে প্রতীকের মতো ব্যবহৃত হয়েছে একটি পথ – “পাক্কী” – পথ চলেছে সামনের দিকে – পাঠকও যেন সর্বদা তাৎমাদের সঙ্গে ওই

পথেই চলেছে। ঘটে যাচ্ছে কত নতুন কিছু; কিন্তু থামার কোনো উপায় নেই, কারণও নেই।

সমাজের কথা বলতে হলে অর্থনীতির কথা আসতে বাধ্য। দারিদ্রের কারণে (অতিরিক্ত বস্ত্রের অভাব) তাৎমা মেয়েরা বছরে একটি দিন স্নানের সুযোগ পায়। আবার বছরে দুটি মাস তারাই পরিবার শাসন করে, কারণ ধান কাটার কাজের টাকা ওই দুটি মাস তাদের হাতে থাকে। অর্থ হাতে থাকে বলে নারী শক্তি ওই দুইমাস সমাজের শাসনকর্তা। তাৎমাদের জীবনযাপন পদ্ধতি, চাষের কাজে তাদের বাধ্য হয়ে যুক্ত হওয়া, তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ছবি সবকিছুই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে একে একে। ঢোঁড়াইয়ের পাশাপাশি পুরো তাৎমাসমাজ প্রাধান্য পায়। সামাজিক বদল ধরা পড়ে। উপন্যাসের শেষে নিঃসঙ্গ ঢোঁড়াই শিক্ষিত হয়ে একাকিত্বের জালে বাধা পড়ে। কিন্তু সমগ্র তাৎমাসমাজ সেই একাকিত্বের স্বীকার কখনও হয় না। তারা ঢোঁড়াইয়ের মতো কারাগারবাসী হয় না। তারা কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের আড়ালে হারিয়ে যায় না, তাই উপন্যাসটি "সামাজিক উপন্যাস" নামক তকমাটিও পেয়ে যায়।

কয়েকটি দিক থেকে আলো ফেলে ঢোঁড়াই চরিত মানসকে একটু দেখার চেষ্টা হল। চেষ্টার কারণ ছিল, সেই গোড়ার কথা – সাহিত্যের বিভাজন প্রয়োজনীয় কিনা। চেষ্টার ফলে মানসিক অস্থিরতা বাড়ল পাঠক হিসেবে। আঞ্চলিক-সামাজিক-রাজনৈতিক বা ওইরকম আরও কোনো নামের আড়াল থেকে উপন্যাসটিকে বিচার করা বোধহয় সঙ্গত নয়।কোথাও যেন সম্পূর্ণ করে পাওয়া হচ্ছে না – এই অস্থিরতাই তাড়া করে ফেরে। 'রামচরিতমানস'এর নামের আদল সতীনাথের উপন্যাসে। ব্যাপ্তি বিশাল। সেই বিশালতাকে উপলব্ধি করতে হলে আগে ওই নামগুলিকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে, তবেই তো সেই উপলব্ধি ঘটবে।

রামায়ণ কাহিনীর আধারটি গ্রহণ করা হল বৈপরীত্য প্রকাশের জন্য। বাল্মীকির রামায়ণে ইক্ষাকু বংশের রাজা রামচন্দ্রের নিষ্ঠুরতার বিভিন্ন পরিচয় মেলে। বংশমর্যাদার অহংকার শ্রীরামচন্দ্রেরমধ্যে স্পষ্ট। সেই সংস্কার থেকে আধুনিক নায়ককে সরিয়ে আনবার কারণেই রামকে ঢোঁড়াইয়ের প্রতিকল্প চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়। রামচন্দ্র বারংবার সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বাধ্য করেছিলেন, সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। সন্তান জন্মানোর পর তার পবিত্রতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন; আর এর ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে 'কলঙ্কী' রামিয়ার সন্তান এন্টনিকে নিজের করে কাছে টেনে নেয় ঢোঁড়াই। আধুনিক নায়ক কখনই বংশমর্যাদার দ্বারা চালিত হয় না। রামিয়ার জীবনে স্যামুয়েরকে মেনে নেয় ঢোঁড়াই মানবিকতার কারণে। স্যামুয়েরের সন্তান এন্টনিকে তার নিজের সন্তান বলেই সে অকপটে মনে করে। এইখানেই রামায়ণের কাহিনীর ফ্রেম পরিবর্তিত হয়। ঢোঁড়াই সবার ওপর মানুষ সত্যকে বিশ্বাস করে আধুনিক হয়ে ওঠে।

তাৎমাদের প্রধান জীবিকা ছিল তাঁতের কাজ। পড়ে তারা জিরানিয়াতে ঘরামি এবং কুয়োর জল ছাঁকার কাজও করত। তাদেরই একজন ঢোঁড়াই। তাকে ঘিরে তাৎমা সমাজ, অঞ্চল, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত হতে হতে পাঠক একসময় চিনতে পারে ঢোঁড়াইকে। বুঝতে পারে সতীনাথের নায়কের চিন্তাচেতনা, মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি; সেই কারণেই বারবার মনে হয় ওই কৃত্রিম বিভাজন নয়, সামগ্রিক রস আস্বাদনই লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রথমেই কোনো বিশেষ একটি নামাঙ্কিত খোপে বন্দি করা ঠিক নয়, সম্পূর্ণ উপন্যাসটির বক্তব্য-বিষয় তার ফলে হারিয়েও যেতে পারে।

আমাদের এই সমস্ত কথা শুধুমাত্র যে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সম্পর্কে প্রযোজ্য নয় তা বলাই বাহুল্য। সতীনাথের উপন্যাস একটি উদাহরণ মাত্র। সাহিত্যের আলোচনার সকল স্তরেই আমাদের এই বিনম্র অনুরোধ, বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কি আরও একবার নতুন করে ভাবা যায়! আঙ্গিক বিভাজন অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু বিষয়ভিত্তিক বিভাজন কতখানি বাঞ্ছনীয় যদি আমরা আর একবার সেটি ভেবে দেখি, ক্ষতি কী!

তথ্যসূচী:

১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮১৪
২. সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা, সতীনাথ ভাদুড়ী, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ জুলাই ১৯৯৪, পৃষ্ঠা গ
৩. সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঘ

সহায়ক গ্রন্থ:

১. সাহিত্যের রূপরীতিকোষ, ড. অশোক কুমার মিত্র, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স,
২. সতীনাথ ভাদুড়ী স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান, জলার্ক, প্রথম পুস্তক সংস্করণ ১৩৯৪

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. অধ্যাপিকা ড. সত্যবতী গিরি – যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
২. অধ্যাপিকা ড. সুমিতা চক্রবর্তী – বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত সাহিত্য-গোলকের দুই মেরু; কালিদাস ও ভবভূতি

নিবেদিতা চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
গভঃ কলেজ অব্ এডুকেশন (সি.টি.ই),
বাণীপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

সারসংক্ষেপ : সংস্কৃত সাহিত্যাকাশের দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক কালিদাস ও ভবভূতি। বিষয়োস্থাপনে, প্রকৃতিবর্ণনে, চরিত্রচিত্রণে, রসপরিবেশনে, প্রকৃতি ও মানবের সম্পর্কনিরূপণে, কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের প্রতিভা 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নামক দৃশ্যকাব্যে সর্বতোভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অপরদিকে রসের প্রয়োগবাহুল্যে, অভিনয়ের ভাবগাম্ভীর্য্য প্রকাশনে, কাহিনীবৈচিত্র্যে এবং উপস্থাপনার বৈদগ্ধ্যে নাট্যকার ভবভূতি তার 'উত্তররামচরিতম্' দৃশ্যকাব্যে অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কালিদাস মহত্তম কাব্যপ্রতিভার অধিকারী হয়েও অতীব বিনয়ের অধিকারী। কিন্তু ভবভূতি নিজের রচনা সম্পর্কে নিঃশঙ্কচিত্ত। মহাভারতের গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যে নাট্যপ্রয়োজনে কালিদাস কোনোও কোনোও স্থানে স্বকপোলকল্পিত কাহিনী সংযোজন করে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকটিকে সর্বাতিশায়ী করে তুলেছেন। অপরদিকে নাট্যবস্তুর স্থূল রূপরেখা রামায়ণ থেকে গ্রহণ করলেও তাতে প্রয়োজনীয় প্ররিবর্তন সাধন করে ভবভূতি তাঁর অমর সৃষ্টি 'উত্তররামচরিত'কে স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব দান করেছেন। কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির কোমল ও মধুর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে আর ভবভূতির রচনায় কমনীয় রূপের সাথে প্রকৃতির রুদ্ররূপও চিত্রিত হয়েছে। শৃঙ্গাররসের বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয় অপরদিকে কারুণ্যের অভিব্যক্তিতে ভবভূতির স্থান সর্বোত্তম। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' –এ দুষ্যন্ত নারীলোলুপ কিন্তু উত্তররামচরিতে রামচন্দ্র একনিষ্ঠ প্রেমিক। আবার দুষ্যন্ত বাৎসল্যরসের প্রকাশে যতটা সংযত, রামচন্দ্র কিন্তু অপত্যস্নেহের অভিব্যক্তিতে ততটাই আবেগমুখর। সমস্ত গুণের সমাহার বৈদর্ভী কালিদাসকে পতিত্বে বরণ করেন আর অপরদিকে পরিণতপ্রজ্ঞ ভবভূতি তাঁর রচনারীতিকে সমৃদ্ধ করেছেন গৌড়ীয় রীতিতে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'–এ বিদূষকের ভূমিকা যেমন নাটকীয় গতিকে ত্বরান্বিত করেছে তেমনি অপরদিকে 'উত্তর, রামচরিতম্' –এ বিদূষকের অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

পদসঙ্কেত : সংস্কৃতসাহিত্য, কালিদাস, ভবভূতি, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, দৃশ্যকাব্য, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, উত্তররামচরিতম্, মহাভারত, রামায়ণ, মধুর, উৎকট, নারীলোলুপ, প্রেমিক, শৃঙ্গাররস, কারুণ্য, সংযত বাৎসল্য, উৎসুক অপত্যস্নেহ, বৈদর্ভীরীতি গৌড়ীয়রীতি, বিদূষক, নূতন চরিত্র, সন্তানসম্ভবা, রাম, লব, দুষ্যন্ত, সর্বদমন, প্রত্যভিজ্ঞা, উপমালঙ্কার।

মূল বক্তব্য:
সংস্কৃত সাহিত্যাকাশের দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক কালিদাস ও ভবভূতি। কালিদাসের কাব্যপ্রতিভা মহাকাব্য, গীতিকাব্য ও দৃশ্যকাব্য—এই তিন ধারায় প্রবাহিত। ভবভূতির সাহিত্যপ্রতিভা মূলতঃ দৃশ্যকাব্যকে অবলম্বন করেই চরম বিকাশলাভ করেছে। প্রাচীন ভারতের এই দুই মহাকবি প্রত্যেকে তিনখানি করে দৃশ্যকাব্য রচনা করে গেছেন। এঁদের প্রত্যেকের রচিত তিনখানি নাটকের মধ্যে দুটি রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসিদ্ধ বৃত্তান্তের উপর ভিত্তি করে রচিত। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ম্ ও অভিজ্ঞান—শকুন্তলম্ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে বিরচিত। কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রম্ কল্পনাবহুল দৃশ্যকাব্য। একইভাবে ভবভূতিরও উত্তররামচরিতম্ ও মহাবীরচরিতম্—দৃশ্যকাব্যদুখানি রামায়ণের কাহিনা অবলম্বনে রচিত। কিন্তু মালতীমাধবম্ কল্পনার ডানায় ভর করে বিরচিত।

কালিদাসের প্রতিভা মালবিকাগ্নিমিত্রে অঙ্কুরিতা, বিক্রমোর্বশীয়ে পল্লবিতা এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলে ফলবতী হয়েছে। সুতরাং সেইদিক থেকে বিচার করলে দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে প্রথমে মালবিকাগ্নিমিত্রম্, তারপর বিক্রমোর্বশীয়ম্, এবং সবশেষে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—এই ক্রম প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। বিষয়োপস্থাপনে, প্রকৃতিবর্ণনে, চরিত্রচিত্রণে, রসপরিবেশনে, প্রকৃতি ও মানবের সম্পর্কনিরূপণে কবিকূলচূড়ামণি কালিদাসের প্রতিভা অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—এ সর্বতোভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তাই আলঙ্কারিকদের মতে, ‘‘কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।’’ একইভাবে ভবভূতির মহাবীরচরিতে প্রথম বয়সের সারল্য, মালতীমাধবে তরুণ বয়সের চাপল্য এবং উত্তররামচরিতে পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। তাই, মহাবীরচরিতম্, মালতীমাধবম্ এবং উত্তররামচরিতম্—এই ক্রমে ভবভূতির প্রতিভা যে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে সেই বিষয়ে সমালোচকেরা একমত। রসের প্রয়োগবাহুল্যে, অভিনয়ের ভাবগাম্ভীর্য্য প্রকাশনে, কাহিনীবৈচিত্র্যে এবং উপস্থাপনার বৈদগ্ধ্যে নাট্যকার ভবভূতি তাঁর উত্তররামচরিতম্—এ অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই সমালোচকদের উক্তি— ‘‘উত্তরে রামচরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে’’।

সুতরাং মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান—শকুন্তলম্ দৃশ্যকাব্য এবং প্রসিদ্ধ নাট্যকার ভবভূতির উত্তররামচরিতম্ দৃশ্যকাব্য—এর পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক সমীক্ষা সংস্কৃতসাহিত্যরসিকগণের কাছে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উভয় কবির কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে প্রথমেই ধরা পড়ে তাঁদের ব্যক্তিত্বের দিকটি। কালিদাস মহত্তম কাব্যপ্রতিভার অধিকারী হয়েও অতীব বিনয়ী। তাই তিনি অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ দৃশ্যকাব্যের প্রস্তাবনাংশে বলেছেন—‘‘আপরিতোষাদ্ বিদূষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।’’ অর্থাৎ-- ‘‘আমার এই প্রয়োগবিজ্ঞান (নাট্যাভিনয়) যতক্ষণ না সহৃয়দের সন্তোষ উৎপাদন করছে ততক্ষণ তা সফল হয়েছে বলে মনে করি না।’’ কিন্তু ভবভূতির ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ। উত্তরামচরিতম্ কাব্যের প্রস্তাবনাংশে তাঁর সদর্প উক্তি—‘‘যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্বশ্যৈবানুবর্ততে।’’ অর্থাৎ ‘‘সেই ব্রাহ্মণকে (ভবভূতিকে)

বাগ্‌দেবী অনুগতা পত্নীর ন্যায় অনুসরণ করে থাকেন।" কালিদাস নিজের রচনা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। ভবভূতি নিঃশঙ্কচিত্ত।

মহাভারতের গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যে নাট্যপ্রয়োজনে কালিদাস কোনোও কোনোও স্থানে স্বকপোলকল্পিত কাহিনী সংযোজন করে অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকটিকে সর্বাতিশায়ী করে তুলেছেন। যেমন, মূল মহাভারতের দুষ্যন্ত লোকাপবাদের ভয়ে শকুন্তলাকে অস্বীকার করেন। পরে দৈববাণীর মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা প্রকাশিত হওয়ায় তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হন। কিন্তু এই নাটকে দুর্বাসার অভিশাপে স্মৃতিভ্রষ্ট দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে না পেরে পরে অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্তির পর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে শকুন্তলাকে ফিরে পেতে আকুল হন। এই দুর্বাসার অভিশাপ নাট্যকারের নিজস্ব সংযোজন। এর ফলে রাজার চরিত্রমাধুর্য্য রক্ষিত হয়েছে। অপরদিকে নাট্যবস্তুর স্থূল রূপরেখা রামায়ণ থেকে গ্রহণ করলেও তাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে ভবভূতি তাঁর অমর সৃষ্টি উত্তররামচরিতম্-কে স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব দান করেছেন। যেমন, মূল রামায়ণ অনুসারে লবণাসুরের উপদ্রব এবং তার নিধনের জন্য শত্রুঘ্নকে প্রেরণের ঘটনা সীতানির্বাসনের পরবর্তীকালের। কিন্তু নাট্যকার এই বৃত্তান্তকে সীতা নির্বাসনের দিনে বর্ণনা করে সীতা পরিত্যাগের কারুণ্যকে তীব্রতরতা দান করেছেন এবং বিরহকাতরা রামচন্দ্রকে উত্তেজিত করে তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছেন। এই পরিবর্তন নাট্যকারের মৌলিকতার পরিচয় বহন করে।

সংস্কৃতকবিদের মধ্যে কালিদাস ও ভবভূতির রচনাতে প্রকৃতি ও মানবের মধুর সম্পর্ক সব থেকে বেশী সার্থকতার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে এ বিষয়ে সকল সমালোচকেরা একমত। তবে প্রকৃতির রূপের বর্ণনায় কালিদাস ও ভবভূতির মধ্যে একটি মৌলিক দৃষ্টিভেদ পরিলক্ষিত হয়। কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির, মধুর ও কোমল চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, আর ভবভূতির রচনায় কমনীয় রূপের সাথে প্রকৃতির রূদ্ররূপও চিত্রিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে লিখেছেন—"কালিদাস একটি একটি করিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন;.... ভবভূতি... দুই চারিটা স্থূল কথায় একটি চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই-চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখনও মধুর, কখনও ভয়ঙ্কর, কখনও বীভৎস হয়ে পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।"

অভিজ্ঞান-শকুন্তলমে তপোবনের এক করুণ অথচ কোমল চিত্র কালিদাসের লেখনীতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রথমাঙ্কে শকুন্তলার আদর পাবার বাসনায় সেখানে কেসরবৃক্ষ যেন ইশারা করে তাঁকে ডাকে—"এসো বাদেরিদপল্লবাঙ্গুলীহিং তুবরেদি বিঅ মং কেসররুক্‌খও।" দ্বিতীয়াঙ্কে বরাহশ্রেণীর জলাশয়ের তীরে নির্ভয়ে মুস্তাঘাসের উৎপাটনের বর্ণনাতেও অরণ্যের জীবকূলের নিরাপত্তার জীবন্ত চিত্র ধরা পড়ে—"বিশ্রদ্ধং

ক্রিয়তাং বরাহততিভিমুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে।" তৃতীয়াঙ্কে অসুস্থ শকুন্তলার সেবার জন্য সখীরা তাকে তপোবনজাত নলিনীপত্র দিয়ে বাতাস করতে থাকে। চতুর্থাঙ্কে ক্ষুদ্র অবোধ হরিণশাবক শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে তার আকুতি জানায়—"সোহ্য়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে।" ষষ্ঠাঙ্কে দুষ্যন্তের বিরহব্যথায় সমব্যথী হয়ে কুরুবকফুল কুঁড়ি হয়েই থাকছে, প্রস্ফুটিত হচ্ছে না—"সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকাবস্থায়া।" আবার সপ্তমাঙ্কে মারীচাশ্রমের বিশুদ্ধ প্রকৃতিই দুষ্যন্ত-শকুন্তলার নিকষিত হেমকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুষ্যন্তের কথায়—স্বর্গাদধিকতরং নির্বৃতস্থানম্।" বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই যথার্থই বলেছেন—"শকুন্তলায় এই প্রকৃতি নাটকের মেরুদণ্ড।"

অপরদিকে উত্তররামচরিতমে একাধারে আমরা পাই পঞ্চবটীর পেলবতা এবং দণ্ডকারণ্যের ভয়ঙ্করতা। পঞ্চবটীর মাধূর্য্য রামচন্দ্রের বিরহবেদনাকে জাগিয়ে তুলেছে—

"যত্র দ্রুমা অপি বন্ধবো
মে যানি প্রিয়াসহচশ্চিরমধ্যবাৎসম্।
এতানি বানি বহুকন্দরনির্ঝরাণি
গোদবরীপরিসরস্য গিরেস্তটানি।"

(যে স্থানের তরুরাজি এবং পশুরাও আমার বন্ধু ছিল, যেখানে প্রিয়তমার সঙ্গে আমি দীর্ঘকাল বাস করেছিলাম, যেখানে বহুসংখ্যক নির্ঝরিণী ও গুহা ছিল, এই সেই সকল গোদাবরীসন্নিহিত পর্বতের সানুদেশ।)

আবার শম্বুকের কণ্ঠে উত্থিত হয়েছে দন্ডকারণ্যের ভয়াল পরিবেশ—

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎক্বচিদপি প্রোচণ্ড সত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরভোগভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিরলস্বল্পাম্ভসো যাস্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে।

(অরণ্যে প্রান্তভাগ কোথাও কূজনবর্জিত ও স্তিমিত, কোথাও আবার প্রাণীর গর্জনে প্রতিধ্বনিত, কোথাও স্বেচ্ছাসুপ্ত ফণাবিশিষ্ট সাপের নিঃশ্বাসে দীপ্তাগ্নিশিখা, যেখানে গুহাগহ্বরে স্বল্প, স্বচ্ছ জল যেখানে তৃষ্ণার্ত কৃকলাসেরা অজগরের ঘর্মরস পান করে থাকে।)

প্রেমভাবনা প্রকাশনে উভয় নাট্যকারের মধ্যে কিছুটা হলেও পার্থক্য চোখে পড়ে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ দৃশ্যকাব্যে শকুন্তলাকে দেখে কামনাতপ্ত দুষ্যন্তের লোলুপ উক্তি—

"ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।।"

অর্থাৎ, "এই তন্বী শকুন্তলা বল্কল পরে থাকলেও বেশী সুন্দর লাগছে। আকৃতি যাদের সুন্দর- সবই তাদের অলঙ্কার।" কিন্তু উত্তররামচরিতম্ দৃশ্যকাব্যে সীতার স্পর্শে মুগ্ধ রামচন্দ্রের কাতর উক্তি—

"এতানি তে সুবচনানি সরোরুহাক্ষি।
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি।।"

অর্থাৎ, প্রিয়তমার বাক্যসমূহ তাঁর কর্ণের অমৃততুল্য এবং মনের রসায়নস্বরূপ। এইদিক থেকে বিচার করলে দুষ্যন্ত নারীলোলুপ কিন্তু রামচন্দ্র একনিষ্ঠ প্রেমিক।

"শকুন্তলা শৃঙ্গারলজ্জাং রূপয়তি"—এই ঘটনা বারেবারেই আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সংস্কৃতসাহিত্যে শৃঙ্গাররসের বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়। তাই শকুন্তলার দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহু।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনভঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।।"

--(অধর নতুন পাতার মতন রক্তাভ, দুই বাহু যেন কোমল শাখা, আর সারা অঙ্গে ফুলের মত লোভনীয় যৌবন ছড়িয়ে আছে।) অপরদিকে কারুণ্যের অভিব্যক্তিতে ভবভূতির স্থান যে সর্বোত্তম একথা সমালোচকেরা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন— কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনু তে।" কারুণ্যের প্রধান আশ্রয় উত্তররামচরিত। সেখানে সীতার রূপের বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে—

কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনং
হৃদয়কমলশোষী দারুণো দীর্ঘশোকঃ।
গ্লপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং
শরদিজ ইব ধর্মঃ কেতকীগর্ভপত্রম্।।

অর্থাৎ, "শরৎকালজাত গ্রীষ্ম যেমন কেতকী ফুলের কোমলপত্রকে মলিন করে, সেইরূপ হৃদয় কুসুমের শোষণকারী, দারুণ ও সুদীর্ঘ শোক, শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন ও মনোহর পল্লবের মত শ্বেতবর্ণ ও ক্ষীণ এঁর দেহকে মলিন করেছে।" M. R. Kale-এর মতে, "Kalidasa's rasa is conveyed or abhivyakta by the Laksya or Vyannga sense of words, while Bhavabhuti's is conveyed by the vacya sense."

নায়িকার প্রতি সাভিলাষ উক্তিতে দুষ্যন্ত যতটা চপল, বাৎসল্যরসের প্রকাশে ততটাই সংযত। সর্বদমনকে কোলে করে তাঁর উক্তি—

"অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ স্পৃষ্টস্যগাত্রেষু সুখংমমৈবাম্।
কাং নির্বৃতং চেতসি তস্য কুর্যাদ্ যস্যায়মঙ্গাদ্কৃতিনঃ প্রসূতঃ।।"

অর্থাৎ, "কোন্ অপরিচিত ব্যক্তির কুলের অঙ্কুরস্বরূপ এই শিশু কর্তৃক অঙ্গস্পৃষ্ট হওয়াতে আমার ঈদৃশ সুখোদ্গম হইয়াছে? জানি না যে, ভাগ্যবানের অঙ্গ হইতে এই শিশু সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহার চিত্তে কিরূপ আনন্দ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।" অপরদিকে ভবভূতির নায়ক রামচন্দ্র নায়িকার প্রতি মনোভাব প্রকাশে অনেক আন্তরিক হলেও

অপত্যস্নেহের অভিব্যক্তিতে অনেক বেশী আবেগমুখর। লবকে দেখামাত্র তার মনে ঔৎসুক্য—

অঙ্গাদঙ্গাদসৃত ইব নিজস্নেহজো দেহসারঃ
প্রাদুর্ভূয় স্থিত ইব বহিশ্চেতনা ধাতুরেকঃ।
সান্দ্রানন্দক্ষুভিতহৃদয় প্রস্রবেণাবসিক্তো
গাঢ়াশ্লেষঃ স হি মম হিমজ্যোতমাশংসতীব।।

অর্থাৎ, “প্রত্যেক অঙ্গ থেকে বিগলিত নিজদেহের স্নেহসার, যেন চৈতন্য পদার্থই প্রাদুর্ভূত হয়ে বাইরে অবস্থান করছে, প্রগাঢ় আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয় রসেই যেন নির্মিত হয়েছে এবং আলিঙ্গনকালে অমৃতরসের শ্রোতেই যেন আমার দেহকে সিক্ত করেছে।” সর্বদমনের স্পর্শে দুষ্যন্ত পেয়েছেন পরম প্রশান্তি। রামচন্দ্র লবের আলিঙ্গনে পেয়েছেন অনির্বচনীয় আনন্দ।

সমস্ত গুণের সমাহার বৈদর্ভীর জন্ম দেন, ব্যাস একে লীলাময়ী করে তোলেন আর তারপরে বৈদর্ভী স্বয়ং কালিদাসকে পতিত্বে বরণ করেন।” এই রীতির ছোঁয়ায় মূর্ত হয়েছে হরিণের ভঙ্গিমা—“গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ।” এই রীতির মাধ্যমেই শকুন্তলার দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা আলাদা তাৎপর্য পেয়েছে—“ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।” সর্বদমনের দুরন্তপনা সজীবতা লাভ করেছে এই রীতির আলোকেই—“প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলাৎকারেণ কর্ষতি।” অপরদিকে “পরিণতপ্রজ্ঞ” ভবভূতির রচনারীতি তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। রস, ভাব, বর্ণনীয় পদার্থ বা বিষয় এবং প্রতিপাদ্যমান অর্থের গুরুত্ব বা লঘুত্ব—এসব অনুসরণ করে বিচিত্রমার্গের রীতিতে তিনি সজ্জিত করেছেন তাঁর বিশিষ্ট রচনা উত্তররামচরিতম্ কে। যেমন প্রকৃতির ভয়ঙ্কর দৃশ্যাবলীর বর্ণনক্ষেত্রে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় ওজোগুণের প্রাচুর্য্য ও দীর্ঘসমাসসমন্বিত গৌড়ীয়রীতি সমৃদ্ধ শব্দাড়ম্বরের গুরুগম্ভীর জলদ নিনাদ। পঞ্চমাঙ্কে জৃম্ভকাস্ত্রের বর্ণনায় কবি বলেছেন—

“পাতালোদরকুঞ্জপূঞ্জিততমশ্যামৈর্নভো জৃম্ভকৈ—
-রুত্তপ্তস্ফূরদারকূটকপিলজ্যোতির্জ্বলদ্দীপ্তিভিঃ।”

(পাতাল গহ্বরের আবৃত স্থানে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং অগ্নিতপ্ত উজ্জ্বল পিতলের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ এর দীপ্তি প্রকাশমান।) আবার বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের প্রকাশে হৃদয়ে ঝঙ্কার তোলে প্রসাদ ও মাধুর্য্যগুণসমন্বিত সমাসবাহুল্যবর্জিত বৈদর্ভীরীতিসমৃদ্ধ মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর বীণাধ্বনী। দ্বিতীয়াঙ্কে রামের চরিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন—“বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।”

বর্ণনরীতির দিক দিয়ে কালিদাস অনেক বেশী ছিমছম। বিরহিণী শকুন্তলার বাঙ্ময়চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

“বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়তক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি।।”

অপরদিকে ভারবির বর্ণনায় শৈল্পিক কারুকার্য অনেক বেশী। বিরহক্লিষ্টা সীতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

"পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলসুন্দরং দধতী বীলোলককবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরথবা শরীরিণী বিরহব্যথেব মূর্তিমতী জানকী।।"

আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য উভয় নাটকে ধরা পড়ে। অভিজ্ঞান—শকুন্তলম্-দৃশ্যকাব্যে বিদূষক চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু উত্তররামচরিতম্ দৃশ্যকাব্যে বিদূষক চরিত্রটি সৃষ্টই হননি। অন্যান্য পাত্রপাত্রীর মাধ্যমে নাটক এগিয়ে গেছে তার নিজস্ব গতিতে। এই প্রসঙ্গে R. M. Bose বলেছেন—"...We have no character in either of his three dramas approaching the Vidusaka."

উভয় কবির মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও কিছু কিছু বিস্ময়কর সাদৃশ্যও একেবারে চোখ এড়িয়ে যায় না। প্রথমতঃ প্রাচীন বৃত্তান্তের নাটকীয় উপস্থাপনার অভিনবত্বে উভয় নাট্যকারেরই প্রতিভার সাফল্য অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়তঃ ভবভূতি যেমন আত্রেয়ী, তমসা, মুরলা, সৌধাতকি, দাণ্ডায়ণ প্রভৃতি নূতন চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, একইভাবে কালিদাসও অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, শাঙ্গরব, শারদ্বত, সানুমতী প্রভৃতি নূতন চরিত্রগুলির মাধ্যমে তাঁর দৃশ্যকাব্যটিকে দর্শকদের সামনে স্পষ্টীকৃত করতে পেরেছেন। তৃতীয়তঃ উভয় দৃশ্যকাব্যেই সন্তানসম্ভবা অবস্থাতেই নায়িকারা নায়ক কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েছেন এবং পরে আকস্মিকভাবে সন্তানযুক্ত অবস্থাতেই তাঁদের মিলন ঘটেছে নিজ নিজ নায়কের সাথে। চতুর্থতঃ ভবভূতির নাটকে যেমন ঋষি বাল্মীকির আশ্রম আসন্নপ্রসবা সীতার আশ্রয়স্থল হয়েছে, তেমনি কালিদাসের নাটকেও মারীচের আশ্রম গর্ভবতী শকুন্তলার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। উত্তররামচরিতম্—এ লবকে রামচন্দ্র এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ দুষ্যন্ত সর্বদমনকে; উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যভিজ্ঞার ক্রমিক পরিণতির মাধ্যমে চিনতে পেরেছেন। উভয় নাটকেই অনুষ্টুভ্, ইন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি স্বল্প পরিসরের, আবার শার্দূলবিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি বৃহৎ পরিসরের—উভয় প্রকার সংস্কৃতছন্দের সমীচীন প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সবশেষে বলা যায়, "উপমা কালিদাসস্য" এ গর্বোক্তি কালিদাসের সম্পর্কে উচ্চারিত হলেও উপমালঙ্কার প্রয়োগে ভবভূতিও অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। কালিদাসের উপমা পরিলক্ষিত হয় দুষ্যন্তের আকুলতায়—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।।"

(যেমন বায়ূর প্রতিকূলে একটি ধ্বজদণ্ডকে সঞ্চালিত করলে তার চৈনিক পতাকাটি যেমন পশ্চাৎদিকে যাইতে চায়, তেমনি আমার শরীরও সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আমার চঞ্চল হৃদয় পিছনের দিকে ধাবিত হইতেছে।)

একইভাবে ভবভূতির উপমার পরিচয় আমরা পাই রামচন্দ্রের উদ্বেগবর্ণনায়—

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ।।

(গাম্ভীর্যবশতঃ রামের শোক পুটপাকের ন্যায় বাইরে প্রকাশিত হচ্ছে না ঠিকই, তবে তাঁর প্রগাঢ় বেদনা অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে।)

কেউ কেউ মনে করেন, ভবভূতির নাট্যরচনার কৃতিত্বে 'কালিদাসের যশকে অতিক্রম করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে R. D. Karmakar-এর উক্ত—"Bhavabhuti no doubt has a desire to show that he has bettered the ideas of Kalidasa in the process of borrowing."

যাই হোক, দুজনেই নিজস্ব রচনার ক্ষেত্রে যে মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা সাহিত্যসমালোচকদের কাছে যে এক নতুন দিগন্ত তুলে ধরেছে একথা অনস্বীকার্য। প্রাচীন এই দুই কবিশ্রেষ্ঠের চরণে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

পরিশীলিত গ্রন্থপঞ্জি (বাংলা):

১. আচার্য, ডঃ সীতানাথ; দাস, ডঃ দেবকুমার; (সম্পা); ১৯৯৮; উত্তররামচরিত; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার; কলিকাতা।
২. চক্রবর্ত্তী, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা); ১৯৯৭; অভিজ্ঞানশকুন্তলম্; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার; কলিকাতা।
৩. ঠাকুর, জ্যোতিভূষণ (সম্পা); ১৯৮২; কালিদাস সমগ্র; কলিকাতা।
৪. বন্দোপাধ্যায়, ডঃ জয়চন্দ্র; ডঃ অনিতা; ২০০৪; প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য; কলিকাতা।
৫. ভট্টাচার্য্য, ডঃ বিমানচন্দ্র; ১৯৫৮; সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা; কলিকাতা।
৬. ভট্টাচার্য্য, শ্রী পরেশচন্দ্র; ১৯৯৫; সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস; কলিকাতা।
৭. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বিমলাকান্ত; ১৯৬৯; সাহিত্যদর্পণ; কলিকাতা।
৮. শাস্ত্রী, ডঃ গৌরীনাথ; ১৩৭৬; সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস; কলিকাতা।
৯. সেন, ড. মুরারিমোহন; চাকী, জ্যোতিভূষণ; ভট্টাচার্য্য, তারাপদ; মুখোপাধ্যায়, ড. রবিশঙ্কর; শ্রীমতী গৌরী; (সম্পা); ১৯৭৮; সংস্কৃতসাহিত্যসম্ভার; কলিকাতা।

পরিশীলিত গ্রন্থপঞ্জি (ইংরেজী):

Bose, Ramendra Mohan; 1963; (ed.) Abhijnanasakuntalam; Calcutta

বিদ্যারসাগর ঈশ্বরচন্দ্র তথা শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

রুবেল পাল
সহকারী অধ্যাপক, শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ,
কামারপুকুর, হুগলি

সারসংক্ষেপ : যিনি প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তি তিনি সবাইকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবেন, অশ্রদ্ধার সঙ্গে কাউকে কোন কিছু দান করবেন না। ইশ্বরচন্দ্র ছিলেন এই রকমই একজন জন্মসিদ্ধ বিদ্বান তথা দয়ালু ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে মাস্টারমশাই শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত উল্লেখ করেছেন যে - শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছোটবেলা থেকেই বিদ্যাসাগরের অগাধ পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা অনেক শুনেছেন।শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তার সমসাময়িক কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের সংকলন করেন তার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'গ্রন্থে। এই গ্রন্থের 'কলিকাতায় ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর সঙ্গে রাম কৃষ্ণের মিলন'এই শীর্ষক পরিচ্ছেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে ইংরেজি 1882 খ্রীস্টাব্দের পাঁচই আগস্ট বাংলায় **২১** শে শ্রাবণ এর কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার হয়েছিল।[৪] এই অংশ থেকে আমরা উভয়ের নাম, ধাম ও কামের বিষয়ে অনেক তথ্যই জানতে পারি। যেমন ঠাকুরের জন্ম কামারপুকুর গ্রামে এবং বিদ্যাসাগরের জন্ম বীরসিংহ গ্রামে। বস্তুতপক্ষে এই দুটি গ্রামই আগে অখন্ড হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল। কিন্তু বর্তমানে কামারপুকুর হুগলি জেলার অন্তর্গত থাকলেও বীরসিংহ গ্রাম বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুরে অবস্থিত। মাস্টারমশাই লিখছেন- "ঠাকুরের জন্মভুমি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম। এই গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ নামক গ্রামের নিকটবর্তী।" এই রকমভাবে আমি বিদ্যারসাগর ঈশ্বরচন্দ্র তথা শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বহু আলোচনা এখানে তুলে ধরেছি।

সূচক শব্দ : শ্রীরামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, দয়ার সাগর, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সংস্কৃত কলেজ, মেট্রোপলিটন স্কুল, ব্যাকরণ, ন্যায়।

যেদিন থেকে আমরা বর্ণপরিচয় শিখেছি,সেই বাল্যকাল থেকেই আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শুনে আসছি। ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নানান গল্প শুনেছি, যেখানে মুখ্য রূপে স্থান পেয়েছে তার পাণ্ডিত্য অর্থাৎ বিদ্যাবত্তা ও দয়ার কথা। বস্তুতপক্ষে পাণ্ডিত্য এবং দয়া এই গুণদুটি পরস্পরের পরিপূরক । শাস্ত্রে বলা হয়েছে -

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ ধর্মস্ততঃ সুখম্ ।।"[১]

অর্থাৎ বিদ্যা বিনয় দান করে, বিনয় থেকে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হয় অর্থাৎ সমাজে বসবাস করার উপযুক্ত যোগ্য পাত্র হয়ে ওঠে । আর এই যোগ্যতাথেকেই ব্যক্তি

সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধনলাভ করে, যে ধন-সমৃদ্ধি পরিণামে তাকে ধর্ম প্রদান করে। আর এখানে ধর্ম বলতে দান দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদগুণের বিকাশকেই বোঝানো হয়েছে, যা ব্যক্তিকে প্রকৃত জীবন ধারণে সহায়তা করে। আর এই ধর্ম থেকেই ব্যক্তি প্রকৃত সুখ-শান্তি পেতে সমর্থ হয় । আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদে শুনতে পাই, গুরুগৃহে বিদ্যার্থীরা বিদ্যা অর্জনের পর সমাজে গিয়ে গার্হস্থ্য ধর্মের পালন উপযোগী কোন কোন গুণের বিকাশ ঘটাবেন নিজেদের জীবনে, সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গুরুদেব দান করার করার কৌশল সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন - "শ্রদ্ধয়া দেয়মশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্ ---".[২] অর্থাৎ যিনি প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তি তিনি কাউকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবেন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কোন কিছু দান করবেন না । ইশ্বরচন্দ্র ছিলেন এই রকমই একজন জন্মসিদ্ধ বিদ্বান তথা দয়ালু ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে মাস্টারমশাই শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত উল্লেখ করেছেন যে - শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছোটবেলা থেকেই বিদ্যাসাগরের অগাধ পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা অনেক শুনেছেন। কথামৃতকার মাস্টারমশাই লিখছেন - "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা প্রায় শুনিয়া থাকেন।"[৩] আমরা সম্প্রতি এই প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের মধ্য দিয়ে বহুগুণের অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে মুখ্য ভাবে বিকশিত দুটি গুণ পাণ্ডিত্য ও দয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করব । আর এই আলোচনা থেকেই খুব স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব যে ইশ্বরচন্দ্র পরবর্তীকালে কিভাবে সর্বজনের মধ্যে 'বিদ্যাসাগর'নামে পরিচিত হলেন।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের পরিচয় জেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক। শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তার সমসাময়িক কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের সংকলন করেন তার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'গ্রন্থে। এই গ্রন্থের 'কলিকাতায় ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর সঙ্গে রাম কৃষ্ণের মিলন'এই শীর্ষক পরিচ্ছেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে ইংরেজি 1882 খ্রীস্টাব্দের পাঁচই আগস্ট বাংলা ২১ শে শ্রাবণ এর কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার হয়েছিল।৪ এই অংশ থেকে আমরা উভয়ের নাম, ধাম ও কামের বিষয়ে অনেক তথ্যই জানতে পারি । যেমন ঠাকুরের জন্ম কামারপুকুর গ্রামে এবং বিদ্যাসাগরের জন্ম বীরসিংহ গ্রামে । বস্তুতপক্ষে এই দুটি গ্রামই আগে অখন্ড হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল। কিন্তু বর্তমানে কামারপুকুর হুগলি জেলার অন্তর্গত থাকলেও বীরসিংহ গ্রাম বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুরে অবস্থিত । মাস্টারমশাই লিখছেন- "ঠাকুরের জন্মভুমি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম। এই গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ নামক গ্রামের নিকটবর্তী।"[৫] ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছিলেন একজন পরমহংস । বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন তার বিদ্যালয়ের কর্মচারী কথামৃতকার মাস্টার মশায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাচেয়েছিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ গেরুয়া কাপড়

পড়েন কিনা, তখন মাস্টার উত্তর দিয়েছিলেন - "আজ্ঞা না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, লালপেড়ে কাপড় পড়েন, জামা পড়েন, বার্নিশ করা চটি জুতো পড়েন, রানী রাসমনির কালীবাড়িতে একটি ঘরের ভিতরে বাস করেন ----".[৬] এই অংশ থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে বিদ্যাসাগর এর বয়স তখন ৬২/৬৩ বছর। তিনি ঠাকুরের থেকে ১৭/১৮ বছরের বড়। বিদ্যাসাগর পরনে সাদা থান কাপড়, পায়ে চটি জুতা পরিধান করিতেন । মাথার চারদিকে উড়িষ্যাবাসীদের মতো কামানো, তার দাঁতগুলি ছিল বাঁধানো। ব্রাহ্মণ হওয়ায় শরীরে উপবীত ধারণ করিতেন ইত্যাদি ইত্যাদি।[৭]

কথামৃতের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারি যে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন প্রকৃত পন্ডিত। গ্রন্থে মাস্টারমশাই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার এই অংশের প্রথমেই যেভাবে বিদ্যাসাগরের বাসগৃহের বর্ণনা দিয়েছেন আমরা সেই অংশ লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবো যে তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান ও পান্ডিত্যের অধিকারী। মাস্টারমশাই লিখছেন -"তাহার পূর্বদিকে হলঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ণ করেন । ঠিক দক্ষিনে আরেকটি কামরা আছে - এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তক পরিপূর্ণ । দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাঁধানো বইগুলি সাজানো আছে....".[৮] এখানে কথামৃতকার মাস্টারমশাই যেভাবে বিদ্যাসাগরের বাসগৃহের চিত্র তার লেখনীর মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা দেখে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি বিদ্যাসাগর রীতিমতো পড়াশোনা করতেন। শুধু তাই নয় বহুমূল্য পুস্তক বলতে অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বইও যে তার সংগ্রহে ছিল এবিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই । শুধু তাই নয় এই বইগুলোর মধ্যে কিছু বই বিদ্যাসাগরের রচিত বলে ভেবে নিলেও কোন দোষ হবে না। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছিলেন বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা । বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন অনেক মৌলিক গ্রন্থ, শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তেমনি অনেক সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্যও সৃষ্টি করেছেন । শুধু তাই নয় বিদ্যাসাগর অনেক অনেক সম্পাদিত গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছেন ।

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যেই সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার মধ্যেশিক্ষামূলক গ্রন্থগুলি হল - বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ ১৮৫৫); ঋজুপাঠ (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ(১৮৫১-৫২); সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১); ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩) । তিনি অনেক হিন্দি সাহিত্য থেকে বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন - বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭, লল্লুলাল কৃত বেতাল পচ্চীসী অবলম্বনে) ইত্যাদি। তাঁর সংস্কৃত থেকে বাংলা গ্রন্থগুলি হল - শকুন্তলা (ডিসেম্বর, ১৮৫৪); কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ দৃশ্যকাব্য অবলম্বনে), সীতার বনবাস (১৮৬০) - ভবভূতির উত্তররামচরিতম্ নাটকের আখ্যানবস্তু।মহাভারতের উপক্রমণিকা (১৮৬০); ব্যাসদেব মূল

মহাভারত-এর উপক্রমণিকা অংশ অবলম্বনে), বামনাখ্যানম্ (১৮৭৩); মধুসূদন তর্কপঞ্চানন রচিত ১১৭টি শ্লোকের অনুবাদ) ।

বিদ্যাসাগরের ইংরেজি থেকে বাংলা গ্রন্থ গুলির মধ্যে অন্যতম হল - বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮ ; মার্শম্যান কৃত হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল অবলম্বনে রচিত), জীবনচরিত (১৮৪৯ ; চেম্বার্সের বায়োগ্রাফিজ অবলম্বনে রচিত), নীতিবোধ (প্রথম সাতটি প্রস্তাব – ১৮৫১ ; রবার্ট ও উইলিয়াম চেম্বার্সের মরাল ক্লাস বুক অবলম্বনে রচিত), বোধোদয় (১৮৫১ ; চেম্বার্সের রুডিমেন্টস অফ নলেজ অবলম্বনে রচিত), কথামালা (১৮৫৬ ; ঈশপস ফেবলস অবলম্বনে রচিত), চরিতাবলী (১৮৫৭ ; বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা অবলম্বনে রচিত) , ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯ ; শেক্সপিয়রের কমেডি অফ এররস অবলম্বনে রচিত) ।

বিদ্যাসাগরের যে সকল মৌলিক গ্রন্থ সম্পাদনা করে তার পাণ্ডিত্যের তথা বিদ্যাবত্তার স্বাক্ষর রেখেছেন, সেগুলো হলো -সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (প্রথম খন্ড ১৮৭১, ২য় খন্ড ১৮৭৩), অতি অল্প হইল এবং ”আবার অতি অল্প হইল দুখানা পুস্তক (১৮৭৩, বিধবা বিবাহ বিরোধী পণ্ডিতদের প্রতিবাদের উত্তরে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য'ছদ্মনামে)।
ব্রজবিলাস, যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মহাকাব্য (নভেম্বর, ১৮৮৪) - "কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" ছদ্মনামে রচিত। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের রচনার প্রত্যুত্তরে লিখিত হয়। রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬), প্রভাবতী সম্ভাষণ (সম্ভবত ১৮৬৩), জীবন-চরিত (১৮৯১ ; মরণোত্তর প্রকাশিত), শব্দমঞ্জরী (১৮৬৪), নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস (১৮৮৮), ভূগোল খগোল বর্ণনম্ (১৮৯১মরণোত্তর প্রকাশিত)। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেসকল সম্পাদিত গ্রন্থ সম্পাদনা করেন সেগুলি হল - অন্নদামঙ্গল (১৮৪৭), কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ (১৮৫৩), সর্বদর্শনসংগ্রহ (১৮৫৩-৫৮), শিশুপালবধ (১৮৫৩), কুমারসম্ভবম্ (১৮৬২), কাদম্বরী (১৮৬২), বাল্মীকি রামায়ণ (১৮৬২), রঘুবংশম্ (১৮৫৩), মেঘদূতম্ (১৮৬৯), উত্তরচরিতম্ (১৮৭২), অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৮৭১), হর্ষচরিতম্ (১৮৮৩), পদ্যসংগ্রহ প্রথম ভাগ (১৮৮৮), কৃত্তিবাসি রামায়ণ থেকে সংকলিত), পদ্যসংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯০); রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল থেকে সংকলিত)।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান অস্বীকার করার মত সাধ্য কারও নেই। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা তথা মার্গ-প্রদর্শক। বিদ্যাসাগর যে সময় বাংলা সাহিত্য রচনার নতুন দিক উন্মোচন করেন, তাঁর পূর্বেও কিন্তু বাংলা ভাষায় অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছেন । তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় কিভাবে সাবলীল গদ্য সাহিত্য রচনা করা যায় তা নিজের রচনার মধ্য দিয়ে বারংবার

আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আমরা পূর্বেই তার সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের ইতিবৃত্ত আকারে উল্লেখ করেছি। এই প্রবন্ধে এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত কিছু আলোচনা করব না। আমরা এই প্রবন্ধে তিনি যে কি ধরনের শাস্ত্রীয় সুপন্ডিত ছিলেন, সেইদিকেই বিশেষভাবে নজর রাখব। বিদ্যাসাগর তার বিদ্যাকে শুধুমাত্র তার লেখনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে সেই বিদ্যার প্রয়োগ করা যায় তাও তিনি আমাদেরকে সুন্দরভাবে শিখিয়েছেন তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরল ও সাবলীল অথচ গুরুগম্ভীর আচরণের মধ্য দিয়ে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে - "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ... "। অর্থাৎ কপট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কপট আচরণই শ্রেয় । আরো বলা হয়েছে শাস্ত্রে - " যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। " অর্থাৎ স্থান অনুযায়ী আচরণ করা সর্বদা বাঞ্ছনীয়। আর তাই বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময়ে পার্শ্ববর্তী একটি ইংরেজ কলেজের অধ্যক্ষের কাছে বিশেষ কাজে বিদ্যাসাগর যখন গিয়েছিলেন তখন সেই ইংরেজ সাহেব বিদ্যাসাগরকে ঠিক যেইভাবে অপমান করেছিলেন, বিদ্যাসাগরও অন্য একদিন সেই ইংরেজ অধ্যক্ষকে সুযোগ ও সময়মতো সেই অপমানের প্রতিদান অত্যন্ত বিদ্যাবত্তা ও পান্ডিত্যের সাথে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপঃ- বিদ্যাসাগর যখন সেই ইংরেজ অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকে ছিলেন, তখন সেই অধ্যক্ষ মুখের চুরুট ও টেবিলের উপর বুট জুতো পরা পা তুলে শুধুমাত্র ইশারা করে বিদ্যাসাগরকে সামনের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তখন কিছু না বলে নিজের কাজ সমাপন করে ফিরে গিয়েছিলেন । অন্য একদিন সেই ইংরেজ অধ্যক্ষকে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে আসতে হয়েছিল বিশেষ কাজে । ঠিক সেই সময় বিদ্যাসাগর তাকে মুখে হুঁকো টানতে টানতে ও টেবিলের উপর চটি জুতো পরা পা তুলে ইশারা করে বসার ইঙ্গিত করেছিলেন। এই ঘটনায় শিক্ষক সংগঠনের সম্পাদক যখন বিদ্যাসাগরের কাছে লিখিত কারণ জানতে চেয়েছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, - আমি আসলে অসভ্য বাঙ্গালীদের মত আচরণ করিনি । বরং সভ্য ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি সেই অধ্যক্ষ আমার সাথে ঠিক যেপ্রকার সভ্য আচরণ করেছেন আমি ঠিক সেই প্রকার সভ্য আচরণ করাই উপযুক্ত মনে করেছি। তখন সেই সম্পাদক বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক শ্লেষময় উত্তর এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন।[১০] ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী শ্রী শ্রী সারদাদেবীর কথায় - "যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন থাকে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন।"[১১] বস্তুতপক্ষে বিদ্যাসাগর জানতেন প্রায়োগিক জীবনে কোথায় কিপ্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা উচিত । আর তাই তিনি যাকে যেমন তাকে তেমন আচরণই করেছেন।

মাস্টারমশাই কথামৃতে লিখছেন - "বিদ্যাসাগর মহাপন্ডিত। যখন সংস্কৃত কলেজে পড়তেন, তখন নিজের শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম

হইতেন ও স্বর্নপদকাদি (mrdal)বা ছাত্রবৃত্তি পাইতেন ।"[১২] আমরা কথামৃতের এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই অনুমান করতে পারি যে, বিদ্যাসাগর বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র আট (১৮২০ -১৮২৮) বছর বয়সেই বিদ্যাসাগর তার গুরু কালীকান্তের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন । তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন। লেখক বিনয় ঘোষ তাঁর 'যুগপুরুষ' বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ লিখছেন - "গুরুমশাই কালীকান্ত তাই একদিন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাসকে বললেন, 'আমার পাঠশালায় ঈশ্বরের যা শিক্ষা করা আবশ্যক তা শেষ হয়েছে। আমার মনে হয় এখন তাঁকে কলকাতা শহরে নিয়ে গিয়ে ইংরেজীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ভাল। টোল চতুষ্পাঠীর যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে ,অর্থাৎ সংস্কৃত-বিদ্যার কোন ভবিষ্যৎ নেই। বিদ্যার বাস্তব ফলাফল সম্বন্ধে গ্রাম্য গুরুমশায় কালীকান্তের জ্ঞান বেশ প্রখর ছিল ।"[১৩]

যদিও বিদ্যাসাগর অর্থকরী ইংরেজি শিক্ষা করতে কলকাতায় এসেছিল, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সংস্কৃত কলেজেই তিনি তার পড়াশোনা আরম্ভ করেন। ১৮২৯ সালে বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন তখন তার সহপাঠী ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতে অত্যন্ত পন্ডিত হয়ে ওঠেন । বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত শিক্ষা খুব সহজে সম্ভব হয়নি । পারিবারিক অনেক টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর পরিশেষে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন । এই প্রসঙ্গটি বর্ণনা করতে গিয়ে বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন , -"ইংরেজী ভাল, না সংস্কৃত ভাল তাই নিয়ে তখন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বিতর্ক চলছিল। কাজেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ইশ্বরচন্দ্রের শিক্ষার ব্যাপারেও দুটি দল হয়ে গেল। একদল সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে, আরেকদল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে। ইংরেজী অর্থকরী শিক্ষা। দেশের নতুন শাসকরাও ইংরেজ.. । সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের পন্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের সঙ্গে এই সুযোগে ঠাকুরদাসের পরিচয় হয় । গঙ্গাধর সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রকে ভর্তি করে দিতে বলেন।.... ১৮২৯ সালে ১লা জুন ইশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন।"[১৪]

আমরা পূর্বেই মাস্টারমশাইয়ের বর্ণনা থেকে জেনেছি যে বিদ্যাসাগর বাল্যকাল থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন। এ বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ না করলে বিদ্যাসাগরের প্রখর মেধাশক্তির প্রমাণ পাওয়া যাবে না। প্রথমবার উচ্চশিক্ষার জন্য বীরসিংহ গ্রাম থেকে বালক ইশ্বরচন্দ্র তার পিতা ঠাকুরদাসের সাথে কলিকাতায় যাচ্ছিল। তখন কলকাতায় হাঁটা পথেই যেতে হতো । পথে যেতে যেতে রাস্তার ধারে যে সকল মাইলস্টোন পোঁতা ছিল, তাতে খোদাই করা ইংরেজি সংখ্যা (1,2,3... ইত্যাদি) একবার দেখেই শিখে নিয়েছিল । বিদ্যাসাগরের এমনই মেধাশক্তি ছিল যে, তার বাবা যখন বললেন আজ আমরা এক নম্বর মাইলস্টোনের কাছ দিয়ে যাব না, আমরা দুই পর্যন্ত যাব ,তারপর অন্য পথ ধরে নেব, যদি এক সংখ্যার মাইলস্টোন দেখতে চাও অন্য

একদিন দেখাব, তখন বিদ্যাসাগর বললেন, - "'এক'তো দেখেছি, ওটা আর দেখার দরকার কি ? 'নয়'থেকে 'দুই'পর্যন্ত দেখলেই ইংরেজি অংকের অক্ষর সব চেনা হয়ে যাবে।"[১৫] বস্তুতপক্ষে বালক ইশ্বরচন্দ্র তার প্রখর মেধাশক্তির দ্বারা ইংরেজি কুড়ি, 19..15,16,17.. ইত্যাদি দুই অঙ্কের সংখ্যা দেখেই পূর্বেই 1 থেকে 9 পর্যন্ত সমস্ত ইংরেজী অক্ষর শিখে নিয়েছিল । আর তাই নয় তার বাবা একবার পরীক্ষা করার জন্য যাওয়ার পথে ইচ্ছা করে 6 সংখ্যাটিকে বাদ দিয়ে 5 সংখ্যাটিকে জিজ্ঞেস করেছিল, তখন ঈশ্বরচন্দ্র খুব স্পষ্টভাবেই বলেছিল, এই মাইলস্টোন দিতে ভুল করে 6 এর পরিবর্তে 5 লেখা হয়ে গেছে । বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন - ". . .ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা এইভাবে আরম্ভ হয়েছিল। এইবার পরীক্ষার পালা । 'দশ'মাইলের পর যখন 'নয়', 'আট,''সাত'অক্ষরগুলি আরম্ভ হলো তখন ছয় মাইলের অক্ষরটি ইচ্ছা করে বাদ দিয়ে, পাঁচ মাইলের অক্ষরটি ঠাকুরদাস জিজ্ঞাসা করলেন , 'এটা কি অক্ষর বল তো ?''ছয়'নম্বর পাথরটি তাঁর চোখের আড়াল দিয়ে কখন চলে গেছে তা তিনি জানতেন না। তাই 'পাঁচ'অক্ষরটি দেখে ইশ্বরচন্দ্র বললেন, 'এটা তো 'ছয়'হবার কথা, ভুল করে 'পাঁচ'লিখেছে কেন?'ঠাকুরদাসের পরীক্ষায় ইশ্বরচন্দ্র পাশ করলেন।"[১৬]

বিদ্যাসাগরের এহেন মেধাশক্তির পরীক্ষা তার পিতা ঠাকুরদাস কিভাবে নিয়েছিলেন, তাঁর সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন লেখক বিনয় ঘোষ তার 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ'এই গ্রন্থে। সেই বর্ণনাটি এইরূপঃ - " ঠাকুরদাস বললেন - 'পরীক্ষা করব কেমন শিখেছ? 'গুরুমশায়ও প্রস্তুত হলেন পরীক্ষা করার জন্য। ভৃত্য আনন্দময় উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। যতক্ষণ একের পিঠের উপর অন্য অংকগুলি ততক্ষণ আঠারোর পর সতেরো হবে, সতেরোর পর ষোল হবে, এইভাবে হিসাব করে যে ঈশ্বরচন্দ্র অংকগুলি না চিনেও আন্দাজ করতে পারেন, একথা ঠাকুরদাসের ও গুরুমশায়ের মনে হল। তাই যখন একের পিঠটি সরে গেল,কেবল অক্ষরগুলি পৃষ্ঠাশ্রয়হীন হয়ে সামনে দাঁড়ালো একে-একে, তখন মাঝের ছয় মাইলের অক্ষরটি ইচ্ছা করে বাদ দিয়ে , পঞ্চম মাইলের অক্ষরটি দেখিয়ে ঠাকুরদাস জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'এটা কি অক্ষর বল?'মধ্যের ছয় অক্ষরটি ইশ্বরচন্দ্র দেখতে পাননি। পিতা তাকে ফাঁকি দিয়েছেন । একে তো একের পিঠটি নেই, তার উপর কৌশলে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে মধ্যের পাথরটিকে । তখন পরীক্ষা। ইশ্বরচন্দ্র বললেনঃ - 'এটা ছয় হবে, কিন্তু ভুল করে পাঁচ লিখেছে কেন?'পরীক্ষায় পাশ করলেন ইশ্বরচন্দ্র। চলার পথে চলতে চলতে পরীক্ষা, , গ্রাম্য বালকের পক্ষে কঠিন পরীক্ষা। প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ইশ্বরচন্দ্র ।"১৭ ঈশ্বরচন্দ্রের এরূপ প্রখর মেধাশক্তি দেখে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং খুশিও হলেন। জীবনের এই ঘটনা প্রসঙ্গে ইশ্বরচন্দ্র তার নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন, - "এই কথা শুনিয়া পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা

অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম । বীরসিংহের গুরুমশায় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন। তিনি আমার চিবুক ধরিয়া 'বেশ বাবা বেশ'এই কথা বলিয়া অনেক আশীর্বাদ করলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, দাদামশাই, আপনি লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে মানুষ হইতে পারিবেক।"[১৮]

ইশ্বরচন্দ্র তাঁর এই অসামান্য মেধাশক্তির দাঁড়াই বাঙালি সমাজে মহাপন্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। সংস্কৃত বাংলা ইংরেজি হিন্দি ইত্যাদি শাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতগ্রন্থে বিদ্যাসাগরের অনেকগুলো গুণের উল্লেখ করেছেন । সেখানে তিনি প্রথম গুণের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন মহাপন্ডিত এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বিদ্যাসাগরের এহেন পাণ্ডিত্যের কথা বলতে বলতে মাস্টারমশাইয়ের সামনে কেঁদে কেঁদে বিলাপ করতেন । মাষ্টারমশাই তাঁর গ্রন্থে চমৎকার লিখছেন - "বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ । প্রথম - বিদ্যানুরাগ। একদিন মাস্টারের কাছে এই বলতে বলতে সত্য সত্য কেঁদেছিলেন, আমার তো খুব ইচ্ছে ছিল যে, পড়াশোনা করি, কিন্তু কই তা হল। সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না ।"[১৯] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একজন জন্মসিদ্ধ পুরুষ । যদিও তিনি প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হননি, কিন্তু বেদ-বেদান্ত তার মুখেই লেগে থাকত। এইরকম সিদ্ধ পুরুষের মুখে বিদ্যাসাগরের এইরূপ প্রশংসা সত্যিই আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে, ইশ্বরচন্দ্র কত বড় মাপের পন্ডিত ছিলেন ।

আমরা জানি অনেক পারিবারিক টালবাহানার পর ১৮২৯ সালের ১লা জুন ইশ্বরচন্দ্র প্রথাগত সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। প্রথমে ইশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং তিন বছর 6 মাস এই শ্রেণীতে পড়াশুনা করেন। সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম গুরু ছিলেন গঙ্গাধর তর্কবাগীশ এবং তিনিই ছিলেন তাঁর ব্যাকরণের অধ্যাপক।গঙ্গাধর তর্কবাগীশ খুবই ছাত্র দরদী শিক্ষক ছিলেন। তার পাঠদান পদ্ধতি এতই ও সুন্দর ছিল যে ছাত্ররা খুবই সহজে তার পড়ানো বুঝতে পারত। শুধু তাই নয় মুগ্ধবোধের মত কঠিন ব্যাকরণও ছাত্রদের কাছে সরল হয়ে যেত। বিদ্যাসাগর মাত্র তিন বছরের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে, অমরকোষ ও ভট্টীকাব্যের খানিকটা অংশ শেষ দুই মাসে শেষ করেন । তৎকালীন সময়ে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শিক্ষার পর ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হতো। বিদ্যাসাগর দুই বছর ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে ইংরেজীতে প্রবল উৎপত্তি লাভ করেন। এরপর ১৮৩৫ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এইসময় তাঁর সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন পন্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। বিদ্যাসাগরের জীবনে পন্ডিত গদাধর তর্কবাগীশ ও পন্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য।

পন্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে দুই বছর ধরে বিদ্যাসাগর রঘুবংশম্, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মেঘদূতম্, কুমারসম্ভবম্, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষসম্, কাদম্বরী ইত্যাদি

অনেক সংস্কৃত সাহিত্য অত্যন্ত যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেন। পন্ডিত জয়গোপাল ছিলেন একজন সুলেখক ও সুপন্ডিত । এইরকম একজন গুরুর কাছে অধ্যায়ন করা সত্যি বিদ্যাসাগরের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের ছিল । রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন - "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের আদি শিল্পী । এই আদি শিল্পীর সুযোগ্য গুরু ছিলেন পন্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।"[২০] জয়গোপাল নিজে সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করতে পারতেন। জয়গোপালের প্রেরণায় বিদ্যাসাগর একবার এক ঘন্টায় পাঁচটি শ্লোক রচনা করেছিলেন । এই প্রতিযোগীতায় শ্লোক রচনার বিষয় ছিল -'গোপালায় নমোস্তু মে।'বিদ্যাসাগর এতই সুরসিক ছিলেন যে, তিনি গুরুদেব কে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোন গোপালকে নিয়ে শ্লোক রচনা করবকরব । আমার সামনের গোপালকে অর্থাৎ আপনাকে নিয়ে, নাকি বৃন্দাবনের গোপালকে নিয়ে। ছাত্রের এই সরল রসিকতাকে খুব সহজভাবে নিয়ে গুরুদেব উত্তর দিলেন- 'সামনের গোপালকে ছেড়ে বৃন্দাবনের গোপালকে নিয়েই শ্লোক লেখ।'বিনয় ঘোষ লিখছেন - "এক ঘন্টায় ৫টি শ্লোক ইশ্বরচন্দ্র রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি শ্লোক হলঃ -

নবনীনৈকচৌরায় চতুর্বর্গৈকদায়িনে।
জগড্ভান্ডকুলালায় গোপালায় নমোস্তু মে ।।

ছাত্রের রচিত এরকম সু-ললিত ছন্দের সংস্কৃত শ্লোক শুনে, জয়গোপালের মত সাহিত্যরসিক যে অত্যন্ত প্রীত হলেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"[২১]

ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন- "শ্লোকটি দেখিয়া পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয় আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছিলেন, এবং অনেককে ডাকাইয়া আনিয়া, স্বয়ং পাঠ করিয়া শ্লোকটি শুনাইয়াছিলেন।"[২২] ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সাহিত্যগুরু জয়গোপালের কাছে যে কেবল সংস্কৃত সাহিত্য শিখেছিলেন তা নয় , বরং বাংলা ভাষার শিক্ষাও তিনি তার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। সাহিত্য অধ্যয়নের পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে অলংকার শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন । বিদ্যাসাগরের অলংকার শাস্ত্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন পন্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ । প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশও জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ছাত্র ছিলেন। ১৮৩৬ সালের প্রথম দিকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যায়ন শেষ করেন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর ১৮৩৬ - ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত বিদ্যাসাগর পন্ডিত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি কাছে বিদ্যাসাগর বেদান্ত অধ্যায়ন করেন। সংস্কৃত কলেজে উচ্চশ্রেণীর ক্লাসে যখন ন্যায়, বেদান্ত ও স্মৃতিশাস্ত্র পড়ানো হতো, সেই সময় নিয়ম ছিল ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষায় গদ্য এবং পদ্য রচনা করতে হতো । পরীক্ষার দিন বেলা 10 টা থেকে 1 টা পর্যন্ত ছিল গদ্য রচনা এবং একটা থেকে চারটে পর্যন্ত ছিল পদ্য রচনা । কিন্তু পরীক্ষার দিন দশটা বেজে গেলেও ইশ্বরচন্দ্র পাশের অন্য একটি ঘরে চুপ করে বসে ছিলেন। তখন তার শিক্ষক প্রেমচন্দ্র তাকে খুঁজে বের করলেন এবং পরীক্ষায় বসতে বাধ্য করলেন। গদ্য রচনার বিষয় ছিল

'সত্য কথার মহিমা'। প্রায় তিন ঘন্টার মধ্যে অর্ধেক সময় পরে শুরু করলেও ঈশ্বরচন্দ্র গদ্য রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন । কিভাবে কিছুতেই আবার পরের বছর পদ্য রচনায় ঈশ্বরচন্দ্রই পুরস্কার পেয়েছিল। পদ্য রচনার বিষয় ছিল 'বিদ্যার প্রশংসা'। বিদ্যা বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র আটটি সংস্কৃত শ্লোক লিখেছিলেন। বস্তুতপক্ষে প্রেমচন্দ্রের প্রেরণাতেই সংস্কৃত শ্লোক রচনাতে ঈশ্বরচন্দ্রের সমস্ত ভয় সশংসয় কেটে গিয়েছিল। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি কাছে বেদান্ত অধ্যায়নের পর এক বছর ধরে পন্ডিত হরণাথ তর্কভূষণের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন। ১৮৩৯ সালের প্রথম দিকে তিনি সংস্কৃত কলেজে ন্যায় শ্রেণীর ছাত্র হন। সেই সময় প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নিমাইচন্দ্র শিরোমণি তাঁর ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৪০ সালে নিমাই চন্দ্র এর মৃত্যুর পর বিখ্যাত নৈয়ায়িক জয়নারায়ন তর্কপঞ্চানন তাঁর ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যায়নের পর ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে কিছুদিন পণ্ডিত যোগাধ্যান মিত্রের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন।

এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে 12 বছর 5 মাস সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরন, সাহিত্য, অলংকার, ন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ইংরেজি ও বাংলার অধ্যায়ন করে সংস্কৃত বিষয়ে বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাই কথামৃতকার মাস্টারমশাই তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে লিখছেন - "ক্রমে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন । অধ্যবসায় গুনে নিজে চেষ্টা করিয়া ইংরেজী শিখিয়েছিলেন।"[২৩] ঈশ্বরচন্দ্রের এইরূপ প্রগাঢ় পান্ডিত্যের জন্য ১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরা মিলে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর'উপাধিতে ভূষিত করেছিল এবং বিশেষ প্রশংসাপত্র দিয়েছিল। সেই প্রশংসাপত্রটি এইরূপঃ - "আস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে, অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুত-কোম্পানি-সংস্থাপিত-বিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাঞ্চোপস্থায়াধোলিখিত-শাস্ত্রাণি অধীতবান্"[২৪] এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার ছাত্রজীবন সংস্কৃত কলেজে অতিবাহিত করে একজন বিখ্যাত পন্ডিত হয়ে ওঠেন। আর যেহেতু এই কলেজে অত্যন্ত সাধারণ স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ছাত্রদের সাথে তিনি পড়াশোনা করেন, তাই তাঁর চরিত্রে কখনোই অর্থ বা অন্যান্য চারিত্রিক গরিমার অহংকার বিশেষ ছিল না। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই বিদ্যারসাগর। আর সেই কারণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে 'বিদ্যাসাগর'বলে পুনরায় 1882 সালে সম্বোধন করেন। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঈশ্বরচন্দ্রের চমৎকার কথোপকথনটি নিম্নরূপঃ -" শ্রীরামকৃষ্ণ - আজ সাগরে এসে মিশলাম। এতদিন খাল বিল নদী দেখেছি, আজ সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর - (সহাস্যে) তবে নোনাজল খানিকটা নিয়ে যান। (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ - না গো ! নোনাজল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য), তুমি ক্ষীরসমুদ্র ! (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর - তা বলতে পারেন বটে।
বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন, ঠাকুর কথা কহিতেছেন ।"[২৫]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতকার মাস্টারমশাই তাই তাঁর গ্রন্থে ঠাকুরের মুখ দিয়ে উল্লেখ করছন - "শ্রীরামকৃষ্ণ - তুমি তা নও গো , শুধু পন্ডিতগুলো দরকচা পড়া, না এদিক - না ওদিক। শকুনি খুব উপরে ওঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পন্ডিত, শুনতেই পন্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি - শকুনির মত পচা মরা খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।"২৬শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে যে কথাগুলো বলেছেন, আমরা যদি সেগুলো ভালো করে বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝতে পারব বিদ্যাসাগরের মধ্যে প্রকৃত বিদ্যার যে ঐশ্বর্য, দয়া, ভক্তি ও বৈরাগ্য - তার প্রকাশ কিন্তু সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁর আচার-ব্যবহার ও কর্মে খুবই স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে যা কিছু আলোচনা করেছি, সেখানে স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছি, বিদ্যাসাগর শুধু পন্ডিতই ছিলেন না, তিনি ছিলেন শাশ্বত বিদ্যার সনাতন আধার।আর সেই ভাবই খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে উপরিউক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অকপট স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে। আর পাণ্ডিত্যের এই পূর্ণতার প্রকাশের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হয়ে উঠেছেন আপামর সকলের বিদ্যারসাগর ।

তথ্যসূত্র:

১. চাণক্য শ্লোক
২. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ - শিক্ষা বল্লী, একাদশ অনুবাক্।
৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা- ৪৪
৪. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা- ৪৪
৫. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা- ৪৪
৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা- ৪৪
৭. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা- ৪৬
৮. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৫
৯. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৫
১০. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর
১১. শতরূপে সারদা
১২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
১৩. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ২০
১৪. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ২৯-৩১
১৫. যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ২৪
১৬. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ২৪

১৭. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা - ১০৮
১৮. বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৮ - ১০৯
১৯. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম, পৃষ্ঠা -৪৬
২০. যুগপুরুষ' বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা -৩৩
২১. যুগপুরুষ' বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ৩৪
২২. যুগপুরুষ' বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা -২২
২৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা-৪৮
২৪. যুগপুরুষ' বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা- ৪০
২৫. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৭
২৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৬ – ৪৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. শ্রীম-কথিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-০৩, প্রথম সংস্করণ-১৯৮৬-৮৭, মুদ্রিত।
২. পান্ডে, গোপালদত্ত, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত- কৌমুদী (প্রথমো ভাগ), চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারানসী, পুনর্মুদ্রণ-২০১২।
৩. পান্ডে, গোপালদত্ত, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত- কৌমুদী (তৃতীয়ো ভাগ), চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারানসী, পুনর্মুদ্রণ-২০১২।
৪. মুখোপাধ্যায়, সচ্চিদানন্দ, সিদ্ধান্তকৌমুদী (সমাস প্রকরণ),সাহিত্য নিকেতন, কলকাতা- ৭,পুনর্মুদ্রণ- ২০০৯-১০ ।
৫. M.M.JHA, অষ্টাধ্যায়ী সূত্রানুক্রমণিকা, Google plystore Applicatuon.
৬. দে, পূর্ণচন্দ্র, ব্যাকরণ-কৌমুদী (প্রথম ভাগ), The sansket press Dipository, calcutta-30.
৭. হালদার, গুরুপদ, ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা -০৬।
৮. সামন্ত ,অমিও কুমার, বিদ্যাসাগর, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৪ ।
৯. ইসলাম, নুরুল, ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের রূপরেখা, শ্রীধর প্রকাশনী, ২০১৮ ।
১০. বন্দোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ, রায়, বণিক, বিদ্যাসাগর, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিকেশন, ১৯৯০ ।
১১. চট্টোপাধ্যায়, শরৎ, বিদ্যাসাগর: সংগঠন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ২০০৭।
১২. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্যের সূচনা ও নারী প্রগতি, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন লিমিটেড, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
১৩. শ্রীমদ্ভগবদগীতা (শ্লোকসর্থসহ) গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, পুনর্মুদ্রণ - 2016 ।
১৪. ব্যাকরণ মহাভাষ্য (পস্পসাহ্নিক) দন্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, সম্পাদিত, কলকাতা ।
১৫. উপনিষদ্, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, 2003 ।
১৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (অখন্ড), মাইতি বুক হাউস, কলকাতা।

১৭. ঘোষ, বিনয় : যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পাঠভবন, ১২/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা -১২, প্রথম সংস্করণ - জানুয়ারী, ১৯৬০।

১৮. ঘোষ, বিনয় : বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ (প্রথম ও তৃতীয় খন্ড) , বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ১২।

১৯. চাণক্য শ্লোক সংগ্রহ।

২০. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী: শতরূপে সারদা, রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্ক, কলকাতা – ২৯।

সচ্চাষি সম্প্রদায়ের জাতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গঠনের ইতিহাস (স্বাধীনতা পূর্ব সময় পর্যন্ত)

উজ্জ্বল বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

সারসংক্ষেপ : উনিশ শতকের শেষদিক থেকে ভারতীয় সমাজের গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য হল জাতিগুলির সংগঠিত হওয়ার প্রয়াস। যদিও জাতি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গুলি জাতির সামগ্রিক চাহিদার প্রতিফলন নয়, কারণ প্রতিষ্ঠান গুলি অনেক ক্ষেত্রেই হত এলিট ভিত্তিক। তা সত্ত্বেও জাতপাতের আন্দোলনকে বুঝতে গেলে প্রতিষ্ঠান গুলির উপর নজর দেওয়া জরুরী। সচ্চাষি সম্প্রদায়ের এই প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি ছিল না। তাদের প্রথম প্রতিষ্ঠান 'হিতৈষিনী সভা' ১৯০৬-০৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে। জমিদারভিত্তিক এই সংগঠন চার বছর টিকে ছিল। এরপর আরও তিনবার সচ্চাষি সম্প্রদায় তাদের সংগঠন তৈরী করে। তৃতীয়বারের প্রচেষ্টা ছিল এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকদের। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'সচ্চাষি তরুণ সংঘ'। তাদের মুখপত্রের নাম 'সচ্চাষি সেবক'। এই সংগঠনও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সচ্চাষিদের সর্বশেষ সংগঠন 'সচ্চাষি ছাত্রমঙ্গল সমিতি' ১৯৪১ সালে আত্মপ্রকাশ করে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ন ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করা এই সংগঠনের লক্ষ্য,যেটি আজও টিকে আছে।

সূচক শব্দ : রিজলে, চাষাধোবা, ধান্যকুড়িয়ার জমিদার, সেন্সাস, সদগোপ

বিশ শতকের শেষদিক থেকে সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু হল জাতিপ্রথা। কিন্তু এই ধরনের আলোচনায় সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে সেইসব জাতিগুলি যাদের সদস্য সংখ্যা বেশি, প্রতিষ্ঠান ও লোকবল বেশি, যাদের আন্দোলন ব্রিটিশ সরকার ও জাতীয় কংগ্রেসের নজর কেড়েছিল। যেমন - রাজবংশী, নমঃশূদ্র বা মাহিষ্য সম্প্রদায়ের আন্দোলন। রিজলের 'Tribes and caste of Bengal' দেখলেই বোঝা যায় বাংলায় জাতির সংখ্যা নিছক কম নয়। এইসব জাতিগুলি তা সে জনসংখ্যায় যতই ছোট হোক না কেন, বিশ শতকের প্রথম দু-এক দশকের মধ্যেই তারা নিজস্ব জাতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। আমরা আলোচ্য নিবন্ধে এইরূপ একটি জনসংখ্যায় ছোট জাতি সচ্চাষি সম্প্রদায়, তাদের জাতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়াস নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমে জানা দরকার সচ্চাষি কারা? সহজ উত্তর চাষাধোবা/চাষাধোপা সম্প্রদায় তাদের নাম পরিবর্তন করে এই নাম গ্রহণ করে। কিন্তু এই চাষাধোবাদের উৎপত্তি ও অবস্থান নির্ণয় করা একটু জটিল ও বিতর্কিত। রিজলে দেখেছিলেন, চাষাধোবা হল বাংলার একটি কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী জাতি, যাদের অনেক সদস্য কারিগর ও নির্মান কাজে যুক্ত।[১] ১৯০১ সালের সেন্সাসে চাষাধোবা, সচ্চাষি, চাষাতি, হলধর প্রভৃতি জাতি

গুলিকে সমজাতীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের বাসস্থান ছিল ২৪ পরগনা, হুগলী, পাবনা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, যশোর।[২] আসলে হিন্দু ঐতিহ্যবাদী সমাজে কোন মানুষের সম্মান ও অবস্থান নির্ভর করত সে কোন জাতির অন্তর্গত তার মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে যে জাতিগুলি আন্দোলন শুরু করেছিল তার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল- ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে বা সেন্সাস কমিশনারের কাছে তারা নিজেদের উচ্চবর্ণজাত বলে দাবী জানাতো।[৩] এর প্রমাণ জোগাতে তারা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের নাম জুড়ে দিত। দেখাতো যে তাদের সঙ্গে পুরাণের কোন অংশের অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে । একইভাবে চাষাধোবা সম্প্রদায়ও তাদের দাবি জানায়। তাদের নিজেদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা মনুসংহিতার দশম সূত্রে বর্ণিত বিদেহদের আধুনিক রূপ। তারা বৈশ্য পিতা ও বিদেহ মাতার সন্তান-সন্ততি। এখানে ধোবা আসলে 'ধব' শব্দের অপভ্রংশ। 'ধব' মানে স্বামী বা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ চাষাধোবা মানে চাষাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা চাষাস্বামী।[৪]

শুধু চাষাধোবা কেন, এ ধরনের দাবি বহু জাতি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আসত। যেমন গোয়ালারা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলে দাবি জানায়। রাজবংশীরা নিজেদের 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' বলে মনে করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মাধ্যম হিসাবে সকলের কাছেই প্রধান আশা ভরসার আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠে সেন্সাস কমিশনার। মনে করা হয় ঔপনিবেশিক সরকারই তাদের যোগ্য সম্মান দিতে পারবে। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক সরকারও লক্ষ্য করেছিল, এইসব জাতপাতের আন্দোলন গুলি সরাসরি বর্ন হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করার অন্যতম হাতিয়ার হবে এইসব আন্দোলন গুলি কে প্রশ্রয় দান।[৫] লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বড় বড় জাতপাতের আন্দোলন গুলি সরকারি স্তরে মান্যতা পেয়েছিল। কিন্তু ছোট সংখ্যক জাতিগুলির দাবি সরকারি স্তরে মান্যতা পায়নি। সরকারী ধারণায় চাষাধোপারা হলো প্রকৃতপক্ষে ধোপা, যারা পরবর্তীকালে চাষবাস গ্রহণ করেছিল।[৬]

শুধু সরকারী স্তরে মান্যতা পেলেই হবে না, একটি জাতির দাবি তখনই স্বীকার্য হয়, যখন সমাজের অন্য জাতির সদস্যরা তাকে মান্যতা দেয়। অনেক সময় জাতি গুলির সদস্যরা এইসব ব্যাখ্যার জন্য নবদ্বীপ পণ্ডিতদের কাছে যেত, যাদের সিদ্ধান্ত সকলে মেনে নিত। যাই হোক চাষাধোবারা তাদের নামকরণ ও মর্যাদা নিয়ে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনি। তাদের চন্ডাল, মেছো কৈবর্তদের সঙ্গেই তুলনা করা হতো। রিজলে ভেবেছিলেন, যদি এই জাতি পুরানো হত, এবং বহুদিন আগে তারা ধোপা বৃত্তি ত্যাগ করে চাষবাস গ্রহণ করত তাহলে তারা বর্তমানের তুলনায় অনেক উচ্চ শ্রেণীর আসনে থাকতো।[৭] অর্থাৎ না সরকারী স্তরে, না সামাজিক ক্ষেত্রে কোথাও কৃষক বৃত্তির দাবী ধোপে টেকেনি। তাদেরকে ধোবা জ্ঞানেই দেখা হত। শেষ পর্যন্ত চাষাধোপারা সিদ্ধান্ত নেয় নামকরণ পরিবর্তনের। কারণ এই নাম ঠাট্টা তামাশার পর্যায় পৌঁছে

গিয়েছিল। তাই বিতর্কিত 'ধব' বা 'ধোবা' শব্দ বাদ দিয়ে তারা 'সচ্চাষি' নাম গ্রহণ পরে। এই নতুন নামকরণে পুরানো বৃত্তির সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ছিন্ন করা হয়।

এবার প্রশ্ন কবে চাষাধোবারা সচ্চাষি হল? এর সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। রিজলে ১৮৯২ সালে 'Tribes and caste of Bengal' প্রকাশ করার সময় চাষাধোপা নামটি ব্যবহার করেছিলেন, সেখানে সচ্চাষি নামের কোন উল্লেখ নেই। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' (রচনা সমাপ্তিকাল ১৭৫২) এবং লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধ নির্ণয়'তে (প্রকাশকাল ১৮৭৫)সচ্চাষি নামটি নেই, আছে চাষাধোবা।[৮] ১৮৯৯ সালে সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত 'বঙ্গীয় সমাজ' গ্রন্থে ধান্যকুড়িয়ার জমিদারদের বোঝাতে তিনি চাষাধোবা নামের কথাই বলেছেন।[৯] আবার এন্টনি ফিরিঙ্গীর সমসাময়িক গায়ক ভোলা ময়রার একটি কবিগানে চাষাধোবারা যে নিজেদের সচ্চাষি বলে তার উল্লেখ আছে।[১০] ভোলা ময়রার সময়কাল আনুমানিক ১৭৭৫-১৮৫১। আবার ১৩১৩ সনে প্রতিষ্টিত হচ্ছে প্রথম সচ্চাষি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান 'হিতৈষিনী সভা'। সেখানে সচ্চাষি নামের উল্লেখ আছে, চাষাধোবা অনুপস্থিত। সুতরাং মনে হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে সম্ভবত এই নাম পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু তা সরকারি স্তরে মান্যতা পাইনি, বা সর্বব্যাপক হয়ে ওঠেনি। তাই ১৯০১ সালের সেনসাস রিপোর্টে চাষাধোবা নামই আছে। তবে চাষাধোবারা যে সচ্চাষি নামে পরিচিত তাও বলা আছে।[১১] এমনকি ১৩৫৮ সালের মাসিক বসুমতিতে চাষাধোবা নাম পাওয়া যায়।

জাতিভিত্তিক আন্দোলন গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, কিছু ছিল সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর আন্দোলন, এটা সমগ্র জাতিকে নিয়ে। যেমন- বৈদ্য, কায়স্থ, পোদ বা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের আন্দোলন। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় কোন জাতির একটি অংশ মূল জাতি থেকে বের হয়ে এসে সামাজিক উচ্চ মর্যাদা দাবি করে।[১২] এটা হয় অনেক সময় পেশা পরিবর্তনের কারণে। যে পেশায় শুদ্ধ-অশুদ্ধ ব্যাপার থাকে। কখনও বা কোন বৃত্তি ভিত্তিক জাতির শিল্প কৌশলে পরিবর্তন এলে বা আহার বিহার বা সামাজিক রীতিতে কোনো পরিবর্তন এলে সেখান থেকে নতুন জাতির উৎপত্তি হতে পারে।[১৩] নতুন জাতি বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে(endogamous) নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে। এ ঘটনা ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বহুবার ঘটেছে। ব্রিটিশ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনা আরো বাড়তে থাকে। যেমন গোপ থেকে সদগোপ, তেলি থেকে তিলি, চাষী কৈবর্ত থেকে মাহিষ্য, শুড়ী থেকে সাহা, ধোপা থেকে চাষাধোপা ইত্যাদি।

ব্রিটিশ শাসনের ধাক্কায় ভারতীয় জাতি-বর্ণ ভিত্তিক সমাজে পরিবর্তন আসে। পাশ্চাত্য শিক্ষা, ব্রিটিশ আইন-কানুন প্রবর্তন, বাজার অর্থনীতির উদ্ভব ইত্যাদির ফলে দীর্ঘদিনের বৃত্তিভিত্তিক জাতপ্রথা প্রশ্নের মুখে পড়ে। প্রাক ঔপনিবেশিক আমলে উচ্চ জাতির অধিকারে উর্বর জমি থাকতো। তার জোরে উচ্চবর্ণ ছিল সমাজ ও অর্থনীতিতে অগ্রসর।[১৪] ব্রিটিশ আগমনের পর থেকে এই ছক বদলে গেল। জমিদারি, বানিজ্য,

সুদের কারবার করে বহু নিম্ন বর্ণের মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে লাগলো। স্বভাবতই তারা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা দাবি করে। শিক্ষা হলো এই সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির আর একটি দরজা। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেছিল উচ্চ বর্ণের মানুষ এবং সরকারী চাকরিতে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯১ সালের পর থেকে নিম্ন বর্ণের মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মাধ্যম হিসাবে শিক্ষাকে প্রধান বলে বিবেচনা করে। দেখা যাবে উচ্চ জাতির দাবি করা নতুন জাতি গুলি তাদের মূল জাতির থেকে শিক্ষার বিষয়ে বেশি এগিয়ে এসেছে।[১৫]

ব্রিটিশ শাসনের দৌলতে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন চাষাধোবা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়ার জমিদারগণ। বানিজ্য ও অন্যান্য কারবারে উনিশ শতকের শেষদিকে তাদের ব্যবসা বেশ ফুলে ওঠে। ততদিনে চাষাধোবা সম্প্রদায় চাষবাস, ছোটখাটো বানিজ্য, সুদের কারবার ইত্যাদির মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্যনীয় যে, নিম্নজাতির যেসব মানুষ অর্থ ও শিক্ষায় সাফল্য অর্জন করে, তারাই এগিয়ে এসেছিল জাতি ভিত্তিক সংগঠন তৈরির কাজে। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ- এক. নিজেদের জাতিগত অবস্থার পরিবর্তন ও চিরাচরিত সমাজে প্রতিপত্তি অর্জন দুই. শিক্ষা চাকুরী ও রাজনীতিতে আরও বেশি সুযোগ সুবিধা অর্জন। তবে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল এলিট ভিত্তিক। সাধারণত কোন জমিদার বা ধনশালী বা শিক্ষিত মানুষ ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। বড় অংশের নিরক্ষর দরিদ্র জনগণ এইসব প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে যেত। সুতরাং জাতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সেই জাতির সামগ্রিক চাহিদার প্রতিফলন নয়।[১৬] যদিও তারা সমগ্র জাতির মুখপাত্র হিসাবেই আন্দোলনে নামে। তাসত্ত্বেও বলা যায়, জাতপাতের আন্দোলনকে বুঝতে গেলে এইসব প্রতিষ্ঠান গুলির উপর, তাদের দাবী দাওয়ার উপর নজর দেওয়া জরুরি।

একইভাবে সচ্চাষি সম্প্রদায়ও তাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে উদ্যোগী হয়, সেই ইতিহাস আলোচনাই আমাদের নিবন্ধের উদ্দেশ্য। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত সচ্চাষি সংগঠন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিল এই সম্প্রদায়ের ধনশালী মানুষজন। এ ব্যাপারে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হলেন ধান্যকুড়িয়ার জমিদারগণ। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, দানাশস্য ও কাঁচা পাটের ব্যবসায় এখানকার সাউ, বল্লভ ও গাইন পরিবার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান অর্জন করেছিল। তাদের কারবার কলকাতা কেন্দ্রিক হলেও নিজগ্রাম ধান্যকুড়িয়া সঙ্গে তাদের যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৈরি হয় 'হিতৈষিনী সভা', যেটি সচ্চাষি সম্প্রদায়ের জন্য নির্মিত প্রথম প্রতিষ্ঠান। কিভাবে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার পরিচয় আমরা পাই 'সচ্চাষি সেবক' পত্রিকায়। '১৩১৩ সালের পৌষ মাসে মহেন্দ্রনাথ গাইনের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে সমবেত স্বজাতি মন্ডলের অভিপ্রায় অনুসারে কেদারনাথ রায়ের সভাপতিত্বে রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ মহাশয় বাড়িতে

স্বজাতি বর্গের উন্নতি কল্পে 'হিতৈষিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা ও প্রথম অধিবেশন হয়'। প্রতিষ্ঠা লগ্নেই ঘোষিত হয় জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তারই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। চল্লিশ জনের যে কার্যকারী কমিটি তৈরি হয় সেখানে ছিলেন রায়বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউ (সভাপতি), রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ (কোষাধ্যক্ষ), রাসবিহারী মন্ডল (সম্পাদক) সুরেন্দ্রনাথ রায়, খুশিলাল কাবাসী, বৈষ্ণবচরণ মন্ডল সহ অন্যরা।[১৭]

জমিদার ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'হিতৈষিণী সভা' মাত্র চার বছর টিকে ছিল। এদের কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। ১৩১৫ সনের কার্তিক মাসে শরচ্চন্দ্র দেব এর সম্পাদনায় 'সচ্চাষি সুহৃদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকার ব্যয় ভার বহন করতেন উপেন্দ্রনাথ সাউ। এটি ছিল সংগঠনের মুখপত্র। সম্ভবত সম্পাদক সচ্চাষি স্বজাতি ছিলেন না। হয়তো এ বিষয়টি সংগঠনের অনেকের পছন্দ ছিল না। 'সচ্চাষি সুহৃদ' ভিন্ন জাতীয়ের পরিচালিত মনে করিয়া কাহারও ক্ষোভের কারণ ছিল।[১৮] পত্রিকাটির বিষয়বস্তু, লেখক, পত্রিকার মূল্য ইত্যাদি আমাদের কাছে অজানা। বেশ কয়েকজন ধনশালী ব্যক্তির উপস্থিতি সত্ত্বেও কেন যে 'হিতৈষিনী সভা' বেশিদিন টিকলো না, তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। আসলে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি হত পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। জনগণকে এর সাথে যুক্ত করা হয়নি। যদিও পরে 'সচ্চাষি সেবক' গর্ব করে বলেছিল আজ আমরা যেসকল শিক্ষিত যুবককে পাইয়া গর্ব অনুভব করিতে পারিতেছি, তাহাদের অনেকেই সেই সভার সাফল্যের নিদর্শন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সভা লোপ না পাইলে এতদিন আমরা আমাদের জাতিকে উন্নত দেখিতে পাইতাম।[১৯] আনুষ্ঠানিকভাবে চাষাধোবার পরিবর্তে সচ্চাষি নাম গ্রহণ ও তার প্রচলন এই সভার কৃতিত্ব। প্রথম দিকে সচ্চাষিরা নিজেদের সদগোপ দাবি করত। কিন্তু ১৯১১ সালে সেন্সাসের আগেই হিতৈষিনী সভা নিজেদের বৈশ্য দাবি করে।[২০] উদ্দেশ্য পরিষ্কার, সেন্সাসে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন। প্রসঙ্গত সচ্চাষি ও সদগোপ এই দুটি জাতিই তাদের পূর্ববর্তী কৌলিক বৃত্তি ত্যাগ করে চাষবাসকে নতুন পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সচ্চাষিরা নিজেদের সদগোপ দাবী করলেও, সদগোপরা তাদের সেই মর্যাদা দিত না।[২১] এ কারণে হিতৈষিনী সভা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে। পাশাপাশি এটাও ঠিক, এটি ছিল ধনকুবেরদের জাতে ওঠার দাবি। জনগণের বড় অংশ এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল। তাই চাষাধোবা নামটি বহুদিন পর্যন্ত চালু ছিল।

এরপর ননীলাল মন্ডল, কানাইলাল বল্লভ ও অনেকে মিলে সচ্চাষি সম্প্রদায়ের অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। সম্ভবত প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনি।[২২] তাদের সম্পর্কিত তথ্য আমাদের কাছে নেই। কেবল জানা যায় টাউন স্কুলের বিরাট জনসভায় ধান্যকুড়িয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কুশীলাল কাবাসী বলেন, "জাতীয় উদ্বোধনের এই সুন্দর আয়োজন ও সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর এইরূপ সহানুভূতি দেখিয়া আমি আজ বড়ই প্রীত হইলাম। কিন্তু ভয় হইতেছে সকলের এই উদ্যোগ, উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া অকৃতকার্যে পরিণত হয় এরূপ হওয়া অসম্ভব নয় কারণ ইহা

জগতের নিয়ম। কিন্তু এরূপ হওয়াটাকে বাধা দিতে হবে, ব্যর্থ ব্রজের বিরুদ্ধে বুক পেতে দিতে হবে, অসীম উদ্যম দ্বিগুণ বল ও সাহস সহকারে কর্ম পথে অগ্রসর হতে হবে ও স্বজাতির সকলের নিকট সাফল্য ভিক্ষা মাগিতে হবে। হিংসা, দ্বেষ, অভিমান ও কৌলিন্য মর্যাদা ভুলে যেতে হবে। আর নবীন কর্মীদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে যে, তাঁহারা সংঘরূপ যে নবীন শিশুর জন্ম দিয়াছেন তাহাকে জীবিত রাখিতে হইবে।"[২৩] কুশীলাল কাবাসী হিতৈষিণী সভার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি এর জন্ম-মৃত্যু দুটোই দেখেছেন। তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় এই উক্তিতে। তিনি নতুন প্রতিষ্ঠানটির স্থায়িত্ব সম্পর্কে সংশয়ে আছেন। তাই হিংসা, দ্বেষ, কৌলিন্য মর্যাদা ভুলে জাতির সকলকে এগিয়ে আসতে বলছেন। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায়, উল্লেখিত কারণগুলিই হিতৈষিনী সভার বিলুপ্তির জন্য দায়ী।

এরপর সচ্চাষি সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত সমিতির নাম 'সচ্চাষি তরুণ সংঘ'। নামকরণেই পরিষ্কার এটি যুবক ছেলেদের সংগঠন। প্রতিষ্ঠা কাল ১৩৩৪ সনের ৪ঠা আষাঢ়। মাখনলাল সাউ, কৃপাশরণ হালদার প্রমুখ ১২/১৩ জন বন্ধু মিলে তৈরী করে 'সচ্চাষি তরুণ সংঘ'। ঠিক হয় যেকোন স্বজাতীয় যুবক এর সভ্য হতে পারেন। চাঁদার হার মাসিক নূন্যতম ২ আনা। তারা প্রতি রবিবার আলোচনায় বসতেন। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়- "আজকাল ভারতের বিশেষত বাংলার যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই দেখা যায় যে, সকল জাতিই কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক সকল প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সংঘবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের জাতির কোন সমিতি নাই – এই দেখিয়া আমার কয়েকজন বন্ধু – যাঁহারা স্বজাতির জন্য সকল সময় ভাবেন, স্বজাতি যাঁহাদের প্রাণ, তাঁহারা এইরূপ একটি সংঘ স্থাপনের জন্য মনস্থ করিয়াছিলেন।"[২৪] কথাটি লিখেছেন মাখনলাল সাউ। কিন্তু তাদের অর্থবল ও সদস্য সংখ্যা কম হওয়ায় তারা একটি পত্রিকা প্রকাশ ছাড়া অপর কিছু করতে পারেনি। তারা জাতির মুখপত্র সরূপ 'সচ্চাষি সেবক' নামে পত্রিকা বার করতেন।

প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল। প্রথম বার্ষিকী অধিবেশনের যে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে চাঁদা আদায় হয়েছে বরাহনগর, শ্যামবাজার, গড়পার ও সিমুলিয়া অঞ্চল থেকে। প্রথম বার্ষিকী অধিবেশনে ১৫০জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। কার্যবিবরণী থেকে পরিষ্কার হয়, সকল বক্তাই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, নিজ জাতির ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয় ভার বহন, নতুন স্কুল কিভাবে খোলা যায়, বাল্যবিবাহ দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয় ছিল। পাটের আড়তদার বৈষ্ণবচরণ মন্ডল প্রতি ১০০০ বস্তায় ১ টাকা করিয়া বৃত্তি এই সঙ্ঘকে দান করার কথা বলেন। অন্য পাটের আড়তদারদের অনুরূপ পথ চলার নির্দেশ দেন। প্রথম বার্ষিকী অধিবেশনের পর সমিতির হাতে গচ্ছিত ছিল মাত্র ৭৭ টাকা ৫ আনা ৩পয়সা।[২৫]

'সচ্চাষি তরুণ সংঘ' প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'সচ্চাষি সেবক'। প্রথম প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩৩৪। সম্পাদক মাখনলাল সাউ, সহঃ সম্পাদক মাধব মন্ডল ও নরেশচন্দ্র মণ্ডল। দাম ১টাকা ১২ আনা। পত্রিকা ছাপা হত সত্যনারায়ণ প্রেসে, দূর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে। প্রচ্ছদে নবান্ন উৎসবের ছবি। এক নবীনকে দেখা যাচ্ছে গৃহাঙ্গনে হাতে ধানের গুচ্ছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর শঙ্খ বাজিয়ে তাকে বরণ করছেন গৃহবধূগণ। ছবিতেই পরিষ্কার সচ্চাষি সম্প্রদায়ের জীবিকা কি। পত্রিকাটি অন্ততঃ এক বছর প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হত। এখানে থাকত কবিতা, গান, প্রবন্ধ সহ সচ্চাষি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কিছু আহ্বান – যেমন পান দোষ নিবারণের চেষ্টা, বাল্যবিবাহের কুফল, সমাজের ক্রমোন্নতি, প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। থাকত সম্পাদকীয়, এবং সংবাদ বিভাগে সচ্চাষি সম্প্রদায় সংক্রান্ত কিছু সংবাদ প্রকাশিত হত। যেমন মাখনলাল সাউ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রৌপ্যপদক সহ এম.এ পাশ করলে, তা ছাপা হয়। বেনীয়াপুকুরের শশীভূষণ হালদার ও আড়বেলিয়ার ডাক্তার জলধর মন্ডলের মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়।[২৬] পাশাপাশি রাজনৈতিক ঘটনা ও দেশ বিদেশের নানা খবর প্রকাশিত হত। পত্রিকায় লিখতেন শ্রী নিশিকান্ত মন্ডল, শ্রী সতীশচন্দ্র রায়, শ্রী কৃপাশরণ হালদার, শ্রী নারায়ণচন্দ্র দাস, শ্রী বিজয়মাধব মণ্ডল, শ্রী কালিপদ মণ্ডল, শ্রী বিভূতিভূষণ মণ্ডল, শ্রী যোগেশচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখেরা।

যখন 'হিতৈষিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এগিয়ে এসেছিলেন ধান্যকুড়িয়ার জমিদারগণ। তারাই ছিলেন মূল উদ্যোক্তা। সম্ভবত 'সচ্চাষি তরুণ সংঘ' এর সঙ্গে জমিদারদের সরাসরি কোন সম্পর্ক ছিল না। কারণ আয়-ব্যয়ের তালিকায় জমিদার পরিবারের পক্ষ থেকে কোন দানের উল্লেখ নেই।[২৭] যদিও প্রথম বার্ষিকী অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ মহাশয়ের নাম স্থির হয়েছিল। কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি। তার পরিবর্তে সভাপতি হন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার সুরেন্দ্রনাথ দাস।[২৮] লক্ষ্যনীয় যে অধিকাংশ জাতি কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনে সাধারণত এগিয়ে আসেন, সেই জাতির সম্পদশালীরা, প্রধান লক্ষ্য জাতে ওঠা, যেটা জমিদারভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিতৈষিনী সভা করেছিল। কিন্তু সচ্চাষি তরুণ সংঘের সদস্যরা বা তাদের মুখপত্র 'সচ্চাষি সেবক' পত্রিকা কখনওই উচ্চজাতিতে উত্তীর্ণ হওয়ার দাবী জানায়নি। কোন প্রবন্ধেই দেখা যাচ্ছে না তাদের পুরানো ইতিহাসের অনুসন্ধান করতে। বরং তাদের দাবী স্বজাতির মানুষজনকে শিক্ষিত করা। এবং তারা এই দাবী জানাচ্ছেন ইংরেজ সরকারের কাছে নয়; স্বজাতির মানুষ যারা অর্থে-বিত্তে অগ্রগামী তাদের কাছে। কাউন্সিল রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার কথাও সেখানে নেই। তাই অন্য জাতি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের দাবীর সঙ্গে সচ্চাষি তরুণ সংঘের লক্ষ্যনীয় পার্থক্য ছিল। আর অর্থ সংকটের কারণে তারা শুধু প্রস্তাবই নিয়েছেন, কিছুই কার্যে পরিণত করতে পারেন নি। কেবল এম.এ ক্লাসের ছাত্র বলরাম মণ্ডল ও যদুরহাটি পাঠশালাকে অর্থ সাহায্য দিতে শুরু করেছিল।[২৯] কি 'হিতৈষিণী সভা', কি 'সচ্চাষি তরুণ সংঘ' কোনটিই সচ্চাষি

জনতার প্রতিষ্ঠান নয়। প্রথমটি বৃত্তবান জমিদারদের প্রতিষ্ঠান, পরেরটি শিক্ষিত ছাত্রদের সংগঠন। তাই দুটি সংগঠনই বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কারণ সংগঠন গুলি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হিসাবেই থেকে গিয়েছিল। সচ্চাষি সম্প্রদায়ের মানুষ যারা নিম্নবৃত্ত তাদের সমস্যা এইসব প্রচারপত্রে ধরা পড়ে না।

সচ্চাষি সম্প্রদায়ের সমস্যা যে ছিল না তা নয়। তারা যতই নাম পরিবর্তন করুন না কেন তাদের ধোবা জ্ঞানেই দেখা হত। ১৯৫১ সালের জনগণনা রিপোর্টে সচ্চাষির পাশাপাশি চাষাধোবা নামের উল্লেখ মেলে। তাছাড়া চাষী সম্প্রদায়ের উপর ছিল কিছুটা অবজ্ঞা সূচক দৃষ্টিভঙ্গী। যেমন- 'চাষাড়ে বুদ্ধি', 'চাষার হাতে কাস্তের ঠোকর', 'চাষা কি জানে মদের স্বাদ' – প্রভৃতি হীন প্রবাদ প্রবচন কৃষকদের হীন দশার পরিচায়ক।[৩০] আর একটি বড় সমস্যা ছিল হোস্টেলের। গ্রাম গঞ্জ থেকে কলকাতায় শিক্ষা লাভার্থে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল পেতে সমস্য হত। সাধারণ হোস্টেল গুলিতে নিম্ন বর্ণের ছাত্রদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ করা হত। তখনও পর্যন্ত কলকাতায় সচ্চাষি ছাত্রদের জন্য নির্মিত কোন হোস্টেল ছিল না। ধান্যকুড়িয়ার জমিদারদের কলকাতার বাড়িতে বা পাটের আড়তদারদের গুদামে থেকে ছাত্রদের পড়াশুনা করতে হত। সেটা নির্ভর করত পরিচয় ও যোগাযোগের উপর। এই সমস্যার কথা ধরা পড়ে বসিরহাটের কবি বিজয়মাধব মন্ডলের আত্মজীবনীতে। ১৯২২ সালে যখন তিনি কলকাতায় পড়াশুনা করতে আসেন, তখন তাকে এই সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছে। প্রথমে একাকী গ্যালিফ স্ট্রিটে জমিদারবাবুদের গদিতে থাকার জন্য গেলে রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ তাকে নাকচ করে দেন। পরে ধান্যকুড়িয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক কুশীলাল কাবাসীর রেফারেন্সে গেলে সেই একই দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দেন।[৩১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সচ্চাষি সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরীর চেষ্টা হয়েছে বারংবার। উদ্যোক্তাদের সদিচ্ছার অভাব ছিল না। কিন্তু অভাব থেকে গিয়েছিল জনগণকে যুক্ত করার চেষ্টায়। তাই বোধহয় কোন প্রতিষ্ঠানই বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এরপর আবার সচ্চাষি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছিল ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে। নাম 'সচ্চাষি ছাত্রমঙ্গল সমিতি'। নামেই প্রকাশ প্রতিষ্ঠানটি কাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমিতির জন্মবৃত্তান্তে বলা হয়েছে ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে কয়েকজন উৎসাহী যুবকের উদ্যোগে কলকাতার 'গাইন বাড়িতে' 'বাণী ক্লাব' এর ছাত্র সাহায্য ভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়।[৩২] এই সমিতিই পরে 'সচ্চাষি ছাত্রমঙ্গল সমিতি' নামে পরিচিত হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা লাভে সাহায্য করার ভার সমিতির উপর ন্যাস্ত হয়। সমিতিটি আজও তার অঙ্গীকার পালন করে চলেছে। বর্তমানে এই সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৪০/২ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৪ এবং গ্রামীন কার্যালয় কলসুরে অবস্থিত। সমিতির প্রতীক চিহ্ন 'ধানের শীষের মাঝে প্রদীপ'।

অর্থাৎ একাধারে কৌলিক বৃত্তি অন্যদিকে জ্ঞানের উন্মোচন দ্বিবিধ বিষয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪০এর দশকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা অতপ্রত ভাবে জড়িত ছিল তারা হলেন হেমচন্দ্র সাউ, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ গাইন, নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রমুখরা।[৩৩] সমিতি ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বার্ষিকী অধিবেশন হয় ১৯৪৩ সালে। সভাপতি পদ অলংকৃত করেন রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ। দ্বিতীয় বার্ষিকী (১৯৪৫) ও তৃতীয় বার্ষিকী (১৯৪৭) অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে শরৎচন্দ্র সাউ ও কুঞ্জবিহারী বল্লভ। প্রতিষ্ঠতা সদস্য ও বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিদের নামের তালিকা দেখলেই পরিষ্কার হয় এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে প্রথম থেকেই অতপ্রত ভাবে জড়িত ছিলেন ধান্যকুড়িয়ার জমিদার পরিবারের সদস্যরা।

স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যায় এইসব প্রতিষ্ঠান গঠন সচ্চাষি সম্প্রদায়ের জাগতিক উন্নতি বিধান করতে কি সক্ষম হয়েছিল? প্রথমত সচ্চাষি নাম নিয়ে তারা এত গুলি প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছিল অথচ ১৮৯১ থেকে শুরু করে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত সেন্সাসে তাদের নামের পরিষ্কার উল্লেখ নেই। কখনও তারা চাষাধোবা হিসাবে, কখনও সদগোপ হিসাবে তাদের কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব নিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠান গুলি বিশেষ কিছু করেনি। সম্ভবত কম জনসংখ্যা,দুর্বল সংগঠন, সচেতনতার অভাব ইত্যাদির কারণে তারা সেন্সাসে সঠিক গণনার আওতায় আসেনি। আর সংগঠনগুলির দ্বিতীয় প্রচেষ্ঠা ছিল জাতির সদস্যদের শিক্ষায়, চাকুরীতে উন্নতি লাভ। এর সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া মুশকিল, কারণ সেন্সাসে পৃথক কোন উল্লেখ নেই। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত এখানে যে একটি শিক্ষিত মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায় তৈরী হয়েছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র:

১. Risley, H.H., Tribes and caste of Bengal, Vol-I, Bengal Secretariate Press, Calcutta, 1892, p.193

২. Census of India, 1901, Vol-VI, Bengal, p.xxxiii

৩. Bandyopadhyay Sekhar, Social mobility in Bengal in the late nineteenth and the early twentieth centuries, PhD thesis, University of Calcutta, 1985, pp.168-169

৪. Risley, H.H., Op. Cit; p.193

৫. Bandyopadhyay Sekhar, Op. cit; pp.5-6

৬. Risley, H.H., Op. Cit; p.194

৭. Risley, H.H., Op. Cit; p.195

৮. মণ্ডল শ্যামপদ, সচ্চাষি সমাজগোষ্ঠীর এদিক-ওদিক, স্মরণিকা, সচ্চাষি ছাত্রমঙ্গল সমিতি, ২০১৬, পৃ- ৭৮-৭৯

৯. রায়চৌধুরী সতীশচন্দ্র, বঙ্গীয় সমাজ, প্রথম সোপান সংস্করণ, কলকাতা, ২০১২, পৃ ৯১

১০. বামুন বলে 'আমি বড়', কায়েত বলে 'দাস'
বদ্যি বলে 'দ্বিজ আমি', ঢাকা জেলায় বাস
চাষাধোপা 'সচ্চাষি' বলে, কৈর্বত 'মাহিষ্য',
সবাই বড় হতে চায়, কেউ কারো নয় বশ্য।।

১১. Census of India, 1901, Vol-VI, Bengal, p.xxxiii

১২. Bandyopadhyay Sekhar, Op. cit; pp.173-174

১৩. বসু নির্মল কুমার, হিন্দু সমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬, পৃ ৬০-৬১

১৪. Srinivas M.N., Social Change in Modern India, Orient Blackswan, 1995, p.10

১৫. Bandyopadhyay Sekhar, Op. cit; pp. 183-185

১৬. Bandyopadhyay Sekhar, Op. cit; p.24

১৭. 'সচ্চাষি সেবক', ১ম বর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৫, (পঞ্চম সংখ্যা), পৃ ৭৯-৮৩

১৮. 'সচ্চাষি সেবক', ১ম বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩৩৫, (নবম সংখ্যা), পৃ ১৫৩

১৯. 'সচ্চাষি সেবক', ১ম বর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৫, (পঞ্চম সংখ্যা), পৃ ৭৯-৮৩

২০. Bandyopadhyay Sekhar, Op. cit; p.193

২১. Mitra A., Census 1951 West Bengal, p.35

২২. 'সচ্চাষি সেবক', ১ম বর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৫, পঞ্চম সংখ্যা), পৃ ৭৯-৮৩

২৩. 'সচ্চাষি সেবক', ১ম বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩৩৫, নবম সংখ্যা), পৃ ১৪৫

২৪. 'সচ্চাষি সেবক', ১ম বর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৫, (পঞ্চম সংখ্যা), পৃ ৭৯-৮৩

২৫. 'সচ্চাষি সেবক', ১ম বর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৫, (ষষ্ঠ সংখ্যা), পৃ. ১০৬

২৬. 'সচ্চাষি সেবক', ১ম বর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৫, (ষষ্ঠ সংখ্যা), পৃ. ১০৪-১০৫

২৭. ঐ

২৮. ঐ

২৯. 'সচ্চাষি সেবক', ১ম বর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৫, (পঞ্চম সংখ্যা), পৃ. ৮৪

৩০. বসু অমৃতলাল, বসিরহাট-ধান্যকুড়িয়া, পঞ্চপুষ্প, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৩৬সন, পৃ. ৭৮৯-৭৯৩

৩১. মুখোপাধ্যায় বিশ্বনাথ, কবি বিজয় মাধব মণ্ডল জীবন ও সাহিত্যসাধনা, শতপর্ণী, রঘুনাথপুর সংস্কৃতি সংস্থা, বসিরহাট, ২০০৪, পৃ. ঝ-ঞ

৩২. স্মরণিকা, সচ্চাষি ছাত্রমঙ্গল সমিতি, ২০১৯, পৃ. ১৯৯৫

৩৩. ঐ, পৃ. ৭-৮

উপজাতি সমাজে স্বাস্থ্য, রোগ ও নিরাময়: প্রসঙ্গ জঙ্গল মহলের উপজাতি

দীপক মণ্ডল
বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, বজবজ কলেজ

সারসংক্ষেপ: তপশিলি উপজাতি নামে যারা পরিচিত তারা ভারতবর্ষের সংবিধান অনুসারে আদি অধিবাসী। এইসব আদি মানুষদের জ্ঞান চেতনাকে ভদ্র সমাজ নেতিবাচক চোখেই দেখে এসেছে। সমাজ সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনস্বাস্থ্য। আদিবাসী জনসমাজে অন্যান্য সমাজের মতো রোগ ও স্বাস্থ্য নিয়ে যেমন বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, তেমনি রয়েছে নিরাময়ের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি। যার উপর নির্ভর করে এরা জীবন নির্বাহ করে। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল মহল অঞ্চলে অরণ্যবাসীদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ফলে এই অঞ্চলে মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা কেমন এবং রোগনির্মূলের পদ্ধতি কি সেটাই আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ: জঙ্গলমহল, আদি অধিবাসী, রোগ, নিরাময় পদ্ধতি, জনস্বাস্থ্য, উপজাতি।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপ বাংলা ভাগ হয়েছিল পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গকে উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ নামে ভাগ করা হয়ে থাকে। এই দক্ষিণবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হলো জঙ্গলমহল।

পঞ্চিমবঙ্গের তিন জেলায় যার মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড় এবং পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোট, বাঘমুণ্ডি পাহাড়।[১] এই অঞ্চল গুলি গভীর শাল বন, রুক্ষভূমি, নদী, লালমাটি এবং প্রাকৃতিক সম্পদে যেমন পরিপূর্ণ, তেমনি মানবগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যতাও এই অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে লোধা, ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি ভূমিপুত্ররা ছাড়াও বাগদী, চণ্ডাল, নমঃশূদ্র, বাউরি প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে রয়েছে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা।[২]

জঙ্গলমহলে আদিবাসী (Schedule Tribe) –দের সংখ্যা বেশী। ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে 'বাংলাদেশে কোল, ডোম, চণ্ডাল, শবর, হাড়ি, পুলিন্দ প্রভৃতি যে সমুদর অন্ত্যজ জাতি দেখা যায়, ইহারাই বাংলার আদিম অধিবাসীগণের বংশধর।'[৩] বর্তমানে এখানকার আদিম জনগোষ্ঠী হলো সাঁওতাল,[৪] লোধা, মুণ্ডা, খোরিয়া, শবর, কারমালি, ওঁরাও, মালপাহাড়ি, কোড়া, মাহালি।

জঙ্গলমহলকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করলেও এর মূল বৈশিষ্ট্য গুলি একই রকমের। আদিবাসীদের কঠোর পরিশ্রমী জীবন যাত্রা, পিছিয়ে পড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য ও রোগজনিত সমস্যা, বন্ধুর প্রকৃতি, শাল-পিয়ালের অরণ্য, এইসব নিয়েই জঙ্গলমহল একসূত্রে গ্রথিত।[৫] এখানে বসবাসকারী আদিবাসীরা

অধিকাংশ চাষী নয় ভূমিহীন কৃষক অথবা জনমজুর। প্রাত্যহিক জীবনে খাদ্যের জন্য লড়াই, শিক্ষা যেখানে অন্ধকারে, সেখানে স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিক অবহেলিত এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

এই অঞ্চলের আদিবাসীরা অরণ্যচারী ছিল। কিন্তু কৃষিকাজের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু উপজাতি গোষ্ঠী অরণ্য থেকে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ফলেই এদের আদিমতা কিছুটা কমে। লোধা, ঘোরিয়া এরা বাঁচার রসদ সংগ্রহ করে অরণ্যেই থেকে গেল।

অতিরিক্ত পরিশ্রম, নেশা, খাদ্যের অভাব, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবের ফলে জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিলনা। ফলে গড় আয় ছিল কম। প্রাচীন অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও নিজস্ব রীতিনীতির জন্য এরা পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে অনীহা দেখাত। ওঝা, গুণিনরা ছিল এদের চিকিৎসক। আদিবাসী সমাজে রোগের কারণ সম্পর্কে বিচিত্র সব ধারণা ছিল। শারীরিক অসুস্থতাকে যদিও তারা কখনও কখনও জীবাণু ঘটিত মনে করলেও, মানসিক অসুস্থতার কারণ হিসাবে তারা বিভিন্ন অপ্রাকৃতিক ও অলৌকিক শক্তিকেই দায়ী করে। এই ধারণা গুলি অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন হলেও সমাজ ব্যবস্থার গোড়ায় এই বিশ্বাসগুলি সমূলে প্রথিত হয়ে আছে।[৬] সমস্ত ধরনের রোগ অসুখ গুলি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এরা যে চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করতো তাকে প্রধাণত: দু-ভাগে ভাগ করা যায়— (১) ভেষজ দ্রব্য, জড়িবুটি প্রয়োগ (২) ঝাড়ফুক, তুকতাক জাদুমন্ত্র প্রভৃতি অতিপ্রাকৃতিক পদ্ধতি (Magics-Religious System)। প্রথম পদ্ধতির চিকিৎসকদের কবিরাজ ফকির ইত্যাদি নামে ডাকা হত। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যারা চিকিৎসা করতো তাদের বলা হত ওঝা, জানগুরু, গুণিন। আবার একই ব্যক্তি উভয় পদ্ধতির অনুশীলনও করতো।[৭] এই পদ্ধতিগুলি আদিবাসী সমাজে বহু প্রাচীনকাল থেকে অনুসৃত হয়ে আসছে। ঋকবেদে ও অথর্ববেদে এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায়। আদিবাসীরা মানসিক অসুস্থতার ব্যাপারে একেবারেই সচেতন ছিল না। এই রোগগুলি মনস্তাত্ত্বিক ও জিন ঘটিত তা তারা মানতে পারতো না। মৃগী, মেনিয়া, ফোরিয়া প্রভৃতি মানসিক রোগের কারণ হিসাবে তারা ভূত, ডাইনি, তুকতাক, কালাজাদু ও বশীকরণ-কে দায়ী করতো।[৮] এবং এই রোগগুলি চিকিৎসার জন্য তারা জানগুরু ও ওঝার উপর নির্ভর করতো। এই জানগুরু, ওঝা অসুস্থতার কারণ হিসাবে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে দায়ী করেন। রোগীকে সুস্থ করার জন্য আচার অনুষ্ঠানের বিধান দেন। মন্ত্র প্রয়োগ করে তিনি বিভিন্ন শক্তিকে বিতাড়ন করেন। রোগীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার ওপর সরিষা, ধোয়া ইত্যাদি নানা সামগ্রীর পাশাপাশি মন্ত্র প্রয়োগ করেন। তাকে শারীরিক কষ্টও দেওয়া হয়। ওঝা গুণিন তাদের মন্ত্রগুলি হলো—

“বুধঘপুরের বুদ্ধেশ্বর

আনাড়ার বানেশ্বর
চিরকারর গৌরীনাথ
বলরামপুরের বুড়োবাবা
পেহেল পেহেল পেহেল"

এই ধরনের পদ্ধতি ও মন্ত্র প্রয়োগ করা হয় সাপে কাটা রোগীর ক্ষেত্রেও। এই পদ্ধতি গুলির কোন বিজ্ঞানসম্মত ও সমর্থনযোগ্য ভিত্তি নেই। তুকতাক, ঝাড়ফুক ছাড়াও এদের আর এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি হলো ভেষজ চিকিৎসা। আদিবাসীদের মধ্যে লোধাদের ভেষজ সম্পর্কে জ্ঞান বেশী। লোধারা আঘাতজনিত ব্যথায় কুলকাঠের আগুনের সেঁক নেয়, এছাড়াও ব্যথায় মনসা পাতা বা আকন্দ পাতা, কাঁচা রেড়ী পাতার সেঁক দেয়। অনেক সময় শূকরের চর্বিও মেশান হয়। হাড় ও পেশির আঘাত, নখকুনির ব্যাথায় গুলঞ্জপাতার রস ব্যবহার করা হয়। ঈশ্বরীমূল, লজ্জাবতী গাছের শেকড় সাপে কামড়ানো রুগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কোমরের ব্যথায় সাপের হাড়, বুকের ও পাঁজরের ব্যথায় হরিণের সিং পাথরে ঘষে গরম জলে মিশিয়ে ব্যথা স্থানে প্রলেপ দেওয়া হয়। কানের ব্যথায় মনসাপাতার প্রয়োগ করে এই উপজাতীয় মানুষরা।[৯] আমশা ও পেট গরমে আমড়া ও আতা গাছের গোড়ার ছালের রস, বদহজমে অর্জুন গাছের ছালের রস, জণ্ডিস রোগে মেহেন্দি গাছের মূল বা শিয়াল কাঁটার মূল কে ব্যবহার করা হয়।[১০] কাঁটা ফুটলে আকন্দ ফুলের আঠা, হাজা হলে কানশিরা পাতা বেটে গরম করে লাগানো হয়। হাত পা ফোলা রোগে অজগরের মাংস খাওয়ার বিধান, ফোঁড়া হলে বুনো ওল, কাটাছেড়ায় পলাশ গাছের ছালের রস, ঘা তে শালগাছের বাকল ও কুঁচিলার বীজ, কনজাংটিভাইটিস হলে শ্যাওড়া গাছের কচি ডগার রস, পা ফাটাতে মহুয়া লাগানো, খোসপাঁচড়ায় করঞ্জা তেল ব্যবহার করা হয়।

জঙ্গলমহলের জনজাতি সমাজের প্রাচীণতম ও নিজস্ব পদ্ধতি হল এই চিকিৎসা পদ্ধতি। গাছ-গাছড়া ও ভেষজ ঔষধ প্রয়োগে কিছুটা আয়ুর্বেদিক জ্ঞান কাজ করে ঠিকই। কিন্তু যখন এই পদ্ধতি প্রয়োগে কঠিন রোগ সারে না, তখন তারা সরকারি চিকিৎসার শরণাপন্ন হয়। জাদুমন্ত্র, তুকতাক ইত্যাদি বাতিল করার জন্য প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি, জনজাতি সমাজের মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন। এছাড়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে স্থানীয় ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি মিশিয়ে একটি কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে জঙ্গলমহলে জনজাতি সমাজের মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হবে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

সূত্রনির্দেশ:

১. পশুপতি প্রসাদ মাহাত, 'ভারতে আদিবাসী ও দলিত সমাজ' পূর্বালোক, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৪৩।

২. H. H. Rrishy, 'The Tribes and castes in Bengal', Bengal Secretariat Press, 1891, Page 101, 138, 288 (Vol-2).
৩. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, পৃষ্ঠা-১০।
৪. Dr. P. K. Bhowmik, 'The Lodhas of West Bengal', Calcutta Punthi Pustak, 1963, Page-10.
৫. সুভাষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, 'জঙ্গলমহলের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃষ্ঠা-৫৩।
৬. Edited by S. C. Agarwal, R. N. Pati- 'Folk medicine Folk Healers and Medicinal Plants of Chhattrisgarh', Scrub book publishers Pvt. Ltd, 2010 Page-10, 30.
৭. P. K. Bandyopadhyay- "Tribal situation in Eastern India: Customary Laws among bonder Bengal Tribes"- Subarnoreka, 1999, Page- 47, 52.
৮. Edited by A. K. Kalla and P. C. Joshi- 'Tribal Health and Medicines'- Concept, 2004, Page- 12, 15.
৯. সাধন মাহাতো (সম্পা), মারাং বুরু, জয়শ্রী, কলকাতা, ১৪১৪ ব. পৃষ্ঠা-৭৯।
১০. লোকশ্রুতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৩৯।

রবীন্দ্র-নাটকে দ্বন্দ্বের বিবর্তন

সাগর দাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ

সারসংক্ষেপ: বিংশ শতকের অন্যতম প্রধান নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর নাটক রচনার ধারাবাহিক কালপর্ব অন্বেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে তিনি নাট্যরচনার মধ্যে দিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। প্রচলিত পঞ্চাঙ্ক নাটক, রূপক-সাংকেতিক নাটক, গীতিনাট্য এবং কৌতুকধর্মী ছোট-বড় নাটক রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি পাঠককে যেমন বিষয়বস্তুর ভিন্নধর্মীতার স্বাদ এনে দিতে পেরেছেন, তেমনি কালগত এবং গঠনগত দিক থেকেও নতুন শৈলীর নাটক উপহার দিয়েছেন। এই নাটকগুলি পরবর্তীকালের নাট্যকারদের কাছে নাটক রচনার নতুন দিশা হয়ে উঠেছে। সময় ও কালের নিরিখে রবীন্দ্র-নাটক বিচার করলে আমরা দেখতে পাব তাঁর লেখা প্রতিটি নাটকের মধ্যে যে নাট্যদ্বন্দ্ব দেখা গেছে, তারও একটি বিবর্তন রয়েছে। এই আলোচনা নিবন্ধে দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক চয়ন করা হয়েছে এবং সেই সকল নাটকের মধ্যে দিয়ে বিবর্তনের রূপরেখাটি বিশ্লেষিত হয়েছে। নেওয়া হয়েছে 'রাজা ও রানী' নাটক (১৮৮৯), ‘মুক্তধারা’ (১৯২২), 'রক্তকরবী' নাটক (১৯২৪), 'রথের রশি'র (১৯৩১) মতো নাটক।

সূচক শব্দ : নাট্য-বিবর্তন, সামাজিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব, সমাজ-সাম্য।

মূল আলোচনা :

দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ- একথা সর্বজনবিদিত। যে নাটকে যত বেশি দ্বন্দ্ব থাকে, সেই নাটক ততো বেশি পাঠকের কাছে আকর্ষনীয় হয়ে উঠে। কিন্তু এই নাট্যদ্বন্দ্বের রূপ বিবর্তিত হয়ে চলেছে কখনো কালভেদে, কখনো আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ফলে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে এই বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর নাটকেও দু’রকমের দ্বন্দ্ব আছে- এক. কাহিনীগত এবং দুই. চরিত্রগত। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ সময় বা কালপর্বের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে চলেছে। কখনো দেখা দিয়েছে সামাজিক দ্বন্দ্ব, কখনো রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, কখনোবা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্র-নাটকের কাহিনী ও চরিত্রের বিচার এবং বিশ্লেষণে আমরা এই দ্বন্দ্বের প্রকৃত স্বরূপ খুঁজে পাব। তবে প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে এই দ্বন্দ্বের রূপান্তর বা বিবর্তনের অন্তরালে রয়েছে রবীন্দ্র-মননের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ‘রাজা ও রানী’ নাটকটি কবি প্রকাশ করেন ১৮৮৯ খ্রী:। নাট্য রচনার এই সূচনা পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত পঞ্চাঙ্ক নাটকের আঙ্গিক যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনি কাহিনীর বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছেন সমাজ-প্রচলিত

ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিকটি মনে রেখে সঙ্গতভাবেই সমালোচক কুমার রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন-

> "এই স্নায়ু সমাজের আচার আচরণ, কুপমন্ডুকতার চেহারা-রাজা ও রানী, বিসর্জন এবং প্রকৃতির প্রতিশোধে আছে।"[১]

সুতরাং 'রাজা ও রানী' নাটকের কাহিনীর দ্বন্দ্ব সুপরিচিত সমাজ জীবন ও মানুষকে নিয়ে, যা পাঠক বা দর্শক মহলকে আজও আকর্ষন করে। কিন্তু 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকের পটভূমি অন্যরকম। ভারতবর্ষে তখন চলেছে স্বাধীনতা লাভের তীব্র লড়াই। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য অন্দোলন (১৯২০), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১); শুধু তাই নয়, বিশ্বের ইতিহাসে তখন চলেছে তুরস্কের মতো দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার (১৯২২) জন্য অন্দোলন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এই সকল ঘটনাগুলি রবীন্দ্রনাথের মতো একজন সচেতন নাট্যকারের মনকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই 'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটকের অভিজিৎ এবং 'রক্তকরবী' (১৯২৪) নাটকের নন্দিনীকে আর্থ-সমাজ ও রাজনীতির প্রতীক করে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন সমাজের অন্যায় এবং প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চেয়েছেন। তাঁর মূল লক্ষ্য এমন একটি সমাজ-জীবন গড়ে উঠুক, যেখানে সকলে সমান অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে। তাঁর লেখা 'রথের রশি' নাটকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দের পরাজয় এবং শূদ্রদের উত্থান মূলত সমাজ সাম্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

সামাজিক দ্বন্দ্ব ও 'রাজা ও রানী' নাটক;

পঞ্চাঙ্ক নাটকের ধারায় রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সামাজিক নাটক 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯)। এই নাটকের মূল বিষয় রাজ-কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব। জলন্ধরের রাজা বিক্রমদেব রানী সুমিত্রার প্রতি অন্ধ মোহময় ভালবাসায় রাজ-ধর্ম এবং রাজ-কর্তব্যকে অবহেলা করে। সুযোগ পেয়ে রাজকর্মচারীগণ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে এবং প্রজা সাধারণের উপর তারা অত্যাচার শুরু করে। ফলে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাজা বিক্রমদেবের এই অন্ধ ভালবাসা ও কর্তব্যহীনতার জন্য আজ দেশের এই করুণ পরিণতি- একথা রানী সুমিত্রা জানার পর, সে নিজেকেই মনে মনে দায়ি করে এবং রাজাকে তার আপন রাজ-কর্তব্যে ফিরে যেতে অনুরোধ করে। সুমিত্রা রাজাকে বলে -

> "আমারে দিয়ো না লাজ,
> আমারে বেস না ভালো রাজ্যশ্রীর চেয়ে।"[২]

প্রকৃত স্বামী-প্রেমিকা নারীর চোখে ধরা পড়ে রাজ-কর্তব্যচ্যুত রাজার অন্যায় আচরণ। রানী সুমিত্রা স্বামী বিক্রমদেবকে রাজ-কর্তব্য এবং ব্যক্তিত্বময় ভালোবাসার মধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিমায় দেখতে চেয়েছে। কিন্তু রানীর একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও রাজা নিজের স্বরূপে ফিরে যেতে চায়নি। তাই সুমিত্রা অবুঝ প্রেমের মায়া থেকে রাজাকে মুক্ত

করবার জন্য জলন্ধর ত্যাগ করে এবং ছদ্মবেশে কাশ্মীরের পথে পাড়ি দেয়। কিন্তু বিক্রমদেব পত্নী সুমিত্রাকে ভুল বোঝে। সে ভাবে—

"ঐশ্বর্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত- শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা।
তাই কি ঘৃনার দর্পে চলে যাও দূরে
মহারানী,"[৩]

রানী সুমিত্রার বিরহের আঘাত বিক্রমদের মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়। সে রাজকর্তব্যে হিংস্র হয়ে ওঠে। হৃদয়বেদনা রাজা বিক্রমদেব মেটাতে চায় দেশদ্রোহীদের শাস্তিদানে। 'রাজা ও রানী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে সংঘাত দেখিয়েছেন, তা মূলত সমাজ মানুষের সংঘাত অর্থাৎ সামাজিক সংঘাত। মানুষ যখন কোন মোহে আচ্ছন্ন হয়, তখন সে নিজের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকে। রাজা বিক্রমদেবেরও তাই হয়েছিল। কিন্তু রানী সুমিত্রার মতো কোন সচেতন ব্যক্তিত্ব যতদিন সেই মোহকে আঘাত না করে, ততোদিন মোহভঙ্গ ঘটে না। এ দ্বন্দ্ব মানুষের ব্যক্তি-প্রেমের সঙ্গে কর্তব্যের দ্বন্দ্ব। বিখ্যাত সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে সঠিক ভাবেই বলেছে-

> "রাজা হইতেছে অন্ধ আবেশ, আর রানী হইতেছেন নি:স্বার্থ ত্যাগ। অন্ধ আবেশ প্রথমে প্রেমরূপ ও পরে প্রতিহিংসা রূপে রাজাকে পাইয়া বসিয়াছিল। রানী রাজাকে প্রেমের অন্ধতা হইতে বাঁচাইলেন নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া।"[৪]

পরবর্তী সময় রাজা যখন প্রকৃত সচেতন হয়, তখন দু:খ করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না তার। রাজা নিজের প্রকৃত ভুল বুঝতে পারল। রানী নিজের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বিক্রমদেবের এই ভালোবাসার মোহভঙ্গ ঘটায়। এই ভাবেই চিরকাল আপন মানুষেরা অতি প্রিয়জনকে সচেতন করে এসেছে নিজের জীবনের মূল্য দিয়ে। এইভাবে বিচার করলে বলা চলে 'রাজা ও রানী' নাটকে যে দ্বন্দ্ব আমরা দেখলাম তা মূলত সামাজিক দ্বন্দ্ব।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও 'মুক্তধারা' নাটক;

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক পর্যায়ের একটি আকর্ষনীয় নাটক 'মুক্তধারা' (১৯২২)। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। এখানে মূলত নাটকের নায়ক অভিজিতের সঙ্গে রাজ-শক্তির প্রতীক রাজা রণজিতের দ্বন্দ্ব ঘটেছে। রাজা রণজিৎ নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করতে চেয়েছে শিবতরাই বাসীদের ওপর। সেই উদ্দেশ্যে রাজা রণজিৎ যন্ত্ররাজ বিভূতিকে দিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মুক্তধারার ঝর্ণার বুকে লৌহযন্ত্রের বিরাট বাঁধ নির্মাণ করেছ। অভিজিৎ উত্তরকূটের রাজ পরিবারে মানুষ হলেও সেই পরিবারের রক্তের সম্পর্কিত কেউ নয়; তাকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে ঝর্ণাতলা থেকে। তাই যেদিন রাজা রণজিৎ মুক্তধারার উপর বাঁধ নির্মাণে সফল হয়েছে,

সেদিন অভিজিৎ কোন কথা না ভেবে মাতৃ-শৃঙ্খল মোচনের কাজে এগিয়ে গেছে এবং নিজের প্রাণের বিনিময়ে মাতৃরূপ মুক্তধারার শৃঙ্খল মোচন করেছে। অভিজিৎ যে শুধু মুক্তধারার ঝর্ণাকে মুক্তি দিয়েছে তা নয়; সে একই সঙ্গে শিবতরাইবাসীদের চাষের জল, প্রাণের জল ফিরিয়ে দিয়েছে। চিরকাল আমাদের সমাজে বা রাষ্ট্রে অভিজিতের মতো এক এক জন মানুষ কালে কালে আসে, যারা নিজের কথা না ভেবে রাজশক্তির অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ জানায়। ফলে দেখা দেয় রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্ব।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার চিরকাল সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য সেই বিজ্ঞানকে খারাপ কাজে বা নিজেদের কুকাজে ব্যবহার করে। 'মুক্তধারা' নাটকেও রাজা রণজিৎ লৌহযন্ত্রের বাঁধ নির্মাণ করে কোন সৎ উদ্দেশ্যে নয়; নিজের স্বার্থের দম্ভকে প্রকাশ করবার জন্য। এই প্রসঙ্গে সমালোচক ড: সুকুমার সেনের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন-

> "সংকীর্ণ জাতিগত স্বার্থচেতনা ও বনিকবৃত্তি মিলিয়া পৃথিবীর বক্ষে যে পাত্র চালাইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি ও কল্যাণপ্রেরণা একদিন জাগ্রত ও জয়ী হইবে। মানুষ যন্ত্রের দাস না হইয়া যন্ত্র মানুষের দাস হইবে।"[৫]

'মুক্তধারা' নাটকে অভিজিৎ সেই একই কাজই করেছে। সে সংকীর্ণ জাতীয়তার উর্দ্ধে উঠে বিশ্ব মানবের সকল প্রকার বন্ধনমুক্তির কল্যাণব্রত গ্রহণ করেছে। এ অভিজিৎ শুধু 'মুক্তধারা'র অভিজিৎ নয়, সে চিরকালের অত্যাচারিত শ্রেণীর মানুষের প্রতিবাদী নায়ক। তার প্রতিবাদ রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্যবাদী যে কোন কালের, যে কোন অত্যাচারী শাসক-শোষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে। তাই 'মুক্তধারা' নাটকে যে দ্বন্দ্ব আমরা দেখতে পাই, তা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ।

অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ও 'রক্তকরবী' নাটক;

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ নাটক 'রক্তকরবী'। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতার ধনতন্ত্রের বৈষম্যকে প্রকাশ করেছেন কয়েকটি চরিত্র ও কাহিনী অবলম্বন করে। সেই ধনতন্ত্রের রূপ প্রকাশ করার জন্য তিনি যক্ষপুরীর মতো এক অজানা জগৎ, নামহীন রাজা এবং সর্দারদের অঙ্কন করেছেন। মকররাজ যক্ষপুরীতে বিভিন্ন শ্রেণীর সর্দারদের দ্বারা যে শাসন-শোষণ প্রতিষ্ঠা করেছে, তা আর্থিক শক্তি ও অর্থনৈতিক দম্ভ প্রকাশের জন্য। সাধারণ মানুষ এখানে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত, তাদের একমাত্র কাজ অন্ধকার খনি থেকে তাল তাল সোনা তুলে আনা। শুধু 'রক্তকরবী'তে নয়, সারা পৃথিবীতে এটিই একমাত্র ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট। এখানে একদল মানুষ শোষণ করে, অপর দল শোষিত হয়। এইরকম সভ্যতার মধ্যে আর্থিক বৈষম্য মূলকথা হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে যক্ষপুরীর

জটিল ব্যবস্থার মধ্যে এনেছেন নন্দিনীর মতো এক মুক্ত প্রাণের নারীকে; এনেছেন রঞ্জনের মতো যৌবনের প্রতীক পুরুষকে। ফলে দেখা দিয়েছে অর্থলোভী মানুষের সঙ্গে মুক্ত প্রাণের মানুষের সংঘাত। নন্দিনী এই নাটকে মুক্ত প্রাণের প্রতীক। তার প্রতিবাদ অস্ত্র নিয়ে নয়। সে জানে প্রকৃত জীবনের স্বাদ এবং মুক্ত প্রাণের হাওয়া সকলেই চায়। কিন্তু অনেক সময় আমরা অর্থের মোহে ভুলে যাই জীবনের মানে। শুধু ছুটে বেড়াই অর্থনৈতিক গোলোকধাঁধার জগতে। কিন্তু যে সময় মোহভঙ্গ ঘটে, তখন অতীতের জীবনকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। 'মুক্তধারা'র নন্দিনী যক্ষপুরীর কোন মানুষের বিরুদ্ধে কখনই প্রতিবাদ করেনি। সে যে কাজটি করেছে তা হল যক্ষপুরীর কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতীক যক্ষরাজকে জাগিয়ে তুলেছে। সে জানে রাজাকে যদি মুক্ত জীবনের পথে একবার আনা যায়, তাহলে সে আর অন্ধকার জগতে থাকতে চাইবে না। এই লক্ষ্যে নন্দিনী বারংবার জালের জানলায় ঘা দিয়ে রাজাকে বাইরে আসার জন্য ডাক দিয়েছে। এমনকি বাইরের জগতের ফসল কাটার গান শুনিয়েছে-

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আ য় আ য় আয়।"[৬]

একসময় দেখা যায় যক্ষরাজ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। সেই ভুল বোঝার আগেই তিনি নিজের হাতে যৌবনের প্রতীক রঞ্জনকে হত্যা করেছে। এই সব কিছুর প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য রাজা নিজের তৈরী যক্ষপুরীর ধনের জগৎকে নিজেই বিনষ্ট করেছে। এই কাজে সাহায্য করেছে নন্দিনী। রাজা নন্দিনীর হাতে হাত রেখে মুক্ত জীবনে পথে পাড়ি দিয়েছে। তাই রাজা দ্বিধাহীন ভাবে বলতে পেরেছে-

"মরতে তো পারব। এত দিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি- বেঁচেছি।"[৭]

'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের যে রূপ দিলেন, তার দু'টি দিক। এক, নন্দিনী প্রথম পর্যায়ে যক্ষপুরীতে মুক্ত জীবনের বার্তা এনেছে। সকলের মধ্যে ফেলে আসা জীবনের কথা বলেছে। আর সেই প্রভাব পরেছে যক্ষপুরীর সাধারণ মানুষের ওপর। চন্দ্রা তার স্বামী ফাগুলালকে এক সময় অনুনয়ের সঙ্গে বলেছে—'কাজ ছেড়ে দাও না, চলনা ঘরে ফিরে।' এটি এক ধরনের ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরোক্ষ প্রতিবাদ। দুই, যক্ষরাজ নিজেও একসময় প্রতিবাদ জানিয়েছে। তার মূল কারণ ব্যক্তিগত মানসিকতার পরিবর্তন। এখানে রাজার প্রতিবাদ নিজের ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে। তবে এই দ্বন্দ্ব মূলত মানুষের অর্থের নেশার দ্বন্দ্ব। সুতরাং বলা যায় 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ অর্থের বৈষম্য দেখিয়েছেন। তার ফলেই অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের জন্ম ঘটেছে।

পরিশেষে আমাদের উপস্থিত হতে হবে রবীন্দ্রনাথের অন্তিম পর্যায়ের নাটক 'কালের যাত্রা'র (১৯৩১) অন্তর্গত 'রথের রশি' নাটকে। এখানে রবীন্দ্রনাথ সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। গড়ে তুলতে চেয়েছেন শ্রেণীসাম্য। শুধু তাই নয়, প্রকাশ করেছেন সাম্যবাদের কথা। নাটকের কাহিনীধারায় অগ্রসর হলে আমরা দেখতে পাই শ্রেণী-সংঘাত। রথের চাকা আজ আর চলছে না; যে রথ একসময় চলেছিল রাজ শক্তির

টানে, ক্ষত্রিয় শক্তির টানে, ব্রাহ্মণ শক্তির মন্ত্রের জোরে। সেই মহাকালের রথ আজ কোনভাবেই তাদের দ্বারা চালিত হল না। তখন এগিয়ে এলো এতকাল যারা সমাজে অবহেলিত ছিল, সেই শূদ্রের দল। তাদের সংখ্যা প্রচুর, শক্তিও প্রচুর। বর্তমান সমাজে তারাই অগ্রগতির নায়ক। শেষ পর্যন্ত তাদের দ্বারাই মহাকালের রথ চালিত হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ কবিকে দিয়ে বলিয়েছেন আগামী সমাজ-সাম্যের কথা-

“আজকের মতো বলো সবাই মিলে-
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।”[৮]

রবীন্দ্রনাথ এই নাটক রচনার মধ্য দিয়ে অতি সুকৌশলে দ্বন্দ্বের সমাপ্তি করেছেন। কিভাবে সমাজে আসতে পারে সাম্যের সমাজ তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তথ্য সূত্র :

১. কুমার রায়, কবির অভিঘাত ও কবির নাটক। পৃ: ৩৭।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, রাজা ও রানী, পৃ: ৯৮।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, রাজা ও রানী, পৃ: ৩।
৪. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি-রশ্মিঃ পূর্বাভাস, প্রথমখণ্ড, পৃ-২২৬।
৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃ:- ২৩০।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্তকরবী, পৃ-১১৩।
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্তকরবী, পৃ-১০৯।
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালের যাত্রা, রথের রশি অংশ, পৃ-৪৭।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. অজিতকুমার ঘোষ, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, ১৯৮৬।
২. অশোক সেন, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬।
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৫।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫মখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৪।
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৩৩।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালের যাত্রা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৩৯।
৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ড. অজিতকুমার ঘোষ, শতবর্ষের নাট্যশালা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৯।
৮. চিত্তরঞ্জন লাহা, বাংলা নাটকের টেকনিক, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭।

৯. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৪র্থ সংস্করণ), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯২১।
১০. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব বিচার, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪।
১১. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যবিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৯।
১২. শম্ভু মিত্র, কাকে বলে নাট্যকলা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩।
১৩. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৩।
১৪. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম ও চতুর্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪০।
১৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদিত), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮।
১৬. সুরেশ মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, রত্নাবলী, ১৯৭৩।
১৭. শেখর সমাদ্দার, নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, প্যাপিরাস, ১৯৯৮।
১৮. নিমাইচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথের কালের যাত্রা, রত্নাবলী, ১৯৮৯।

জীর্ণত্রয়ের অতীত ও বর্তমান

দীপঙ্কর পাত্র
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ

সারসংক্ষেপ: প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানকে নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন স্থানে কর্ম ও জ্ঞান-কান্ডে প্রাচীনত্বের নথি অন্বেষণে যে ইতিহাস ও তার উপাদান লব্ধ হয় বর্তমানে তার গুরুত্ব কম নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লব্ধ বস্তুর শিল্পশৈলীর বিবর্তনের ভিত্তিতে তদ্‌বস্তুর পর্যালোচনায় ভিন্ন ভিন্ন দিক নিরূপণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। বিশেষত: মন্দির, মূর্তির প্রত্নতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস তথা সংস্কৃতির ইতিহাস বিশ্বদরবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বলা যেতে পারে অতীতের আলোকচ্ছটায় উদ্‌ভাসিত ও স্বতন্ত্র মাত্রায় বর্তমান উপস্থাপিত।

শব্দসূচক: মন্দির—বৃদ্ধেশ্বর—জগন্নাথ—পর্যায়

মূল আলোচনা:

ইতিহাস যে অনেকটাই তথ্য-নির্ভর সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই তথ্যগুলির যাকে ইংরেজীতে বলে 'ফ্যাক্টস'—নিজস্ব কোনও তাৎপর্য নেই। ইতিহাসের যে একটা বিশ্লেষণের দিক রয়েছে সেটা অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আর একটি কথা জরুরি যে কখনোই সব তথ্য জানা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিকগণ সব সময়ে তথ্য নির্বাচন করেন। আর এই নির্বাচনটা করা হয় তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্লেষণ মাথায় রেখে। তাই ইতিহাসে এত বিতর্ক তৈরি হয়। আবার ইতিহাস বিষয়টি এক স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েও থাকে না। ইতিহাসে ধ্রুব সত্য বলে কিছু নেই। ইতিহাস যদিও অতীত ঘটনাকে নিয়ে লেখাপড়াকে বোঝায়। আসলে ইতিহাসকে জানা দরকার—অতীতকে জানার জন্য নয়, বরং বর্তমানটাকে বিশেষভাবে বোঝার জন্য। তা হলে, অতীতের জন্য অতীত নয়, বর্তমানের জন্যই অতীতের সন্ধান। ফলে সেই বাস্তব-সন্ধানের পথ দিয়ে আমরা পৌঁছাই অতীতের তথা ইতিহাসের দুয়ারে।

সমীক্ষায় লব্ধ: ক্ষেত্র সমীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত তথ্যাবলী 'গ্রাম্য জীর্ণ মন্দির'। দ্বাদশ—ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সিংহভাগ অঞ্চল কলিঙ্গ নৃপতিগণের অধীনে ছিল। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে সাগর রায় নামক জনৈক ব্যক্তি কলিঙ্গ নৃপতির অধীনে এক করদ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে ঊড়িষ্যা রাজ্য লাগোয়া বীরকুল পরগণায়। অর্ধ-শতাব্দী না যেতেই ঊড়িষ্যায় পাঠানগণের শাসনে চলে যায়। আর ভারত সম্রাট আকবরের সেনাপতি তোডরমল্ল পাঠান শাসক দায়ুদ খাঁনকে নিধন করেন। ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি মানসিংহ পাঠানগনকে দমন করে

উড়িষ্যায় মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ইংরেজ শাসন প্রবর্তন (১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে) পর্যন্ত সাগর রায়ের বংশধরগণ জমিদারী চালিয়ে গিয়েছেন।

বৃদ্ধেশ্বরঃ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা প্রচলনের প্রাক্কালে (১৭৮৭) সমস্ত জেলা শাসকগণের নিকট যে জেলার তৎকালীন জমিদারগণের বিবরণ চাওয়া হয়েছিল তা থেকেই সাগর রায় ও বীরকুল জমিদারীর বিবরণ পাওয়া যায়। ইতিহাসকে আশ্রয় করে আমরা জানতে পারি যে সাগর রায় জমিদারী স্থাপন করেই রাউতারাপুর (রাউত্রাপুর) গ্রামে শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে 'বৃদ্ধেশ্বর শিবমন্দির' নামে পরিচিত। আর মন্দিরের স্থাপত্যে উড়িষ্যার শৈলীর গভীর প্রভাব লক্ষণীয়। মন্দিরের মূল চারটি ভাগ হল—

(১) পাদপীঠ—মন্দিরের পিষ্ঠভাগ আকারে উঁচু।

(২) বাড় (মন্দিরে নিম্নাঙ্গ) —পা—ভাগ, তল—জঙ্ঘা, বন্ধন, উপর-জঙ্ঘা ও বরণ্ড— এগুলিকে পঞ্চাঙ্গ বাড় বলা হয়।

(৩) গন্ডি (মন্দিরের ঊর্ধ্বাঙ্গ)—ভূমির সমান্তরালে মাথা—কাটা পিরামিডের ন্যায়।

(৪) শীর্ষক (মস্তকাংশ)—আদিতে বেঁকি, তারপর খাপুরী, আমলক, ঘন্টা, কলস ও ত্রিশূলদন্ডসহ কেতন।

উড়িষ্যা—বাংলা সীমান্তবর্তী অধুনা পূর্বমেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার দেউলীহাটের নিকটস্থ রাউত্রাপুরের পার্শ্বস্থ গ্রাম 'সাগরেশ্বর' নামে অভিহিত। তা বর্তমানে সাগরেশ্বর পোষ্ট অফিসের নামকরণে গ্রামটি স্থান পেয়েছে। আর এই গ্রামের পশ্চিমাংশে প্রাচীন 'বৃদ্ধেশ্বর শিবমন্দির', পূর্বাংশে মহামায়া দেবী সর্বমঙ্গলা অবস্থান করে আছেন।

জগন্নাথঃ ভারতবর্ষের মাটিতে তখনও বৃটিশ বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডরূপে প্রকাশিত হয়নি। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দের নাগাদ মীরগোদা পরগণার জমিদার পরিবারের তৃতীয় পুরুষ সাগরেশ্বরের মহামহিম তারাপ্রসাদ পাত্র ও তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী পাট-দেবী পুণ্য বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে এক স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন যে অধুনা উড়িষ্যার পদ্মপুর নামক স্থানে সুবর্ণরেখা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রী জগন্নাথের, বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীর চক্রশোভিত দারুব্রহ্ম দর্শিত হবেন। স্বপ্নাদেশে আরও সূচিত হয় যে, বৃদ্ধেশ্বর শিবমন্দির ও মহামায়া দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে জমিদারের কাচারীবাড়ীর নিকটস্থ উত্তর-পূর্বকোণে মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশস্ত। তদনুসারে উড়িষ্যার পদ্মপুর মোহনা থেকে হস্তিসহযোগে দারুব্রহ্মত্রয় সাগরেশ্বর জমিদার ভবনে আনা হয়। শুকষন্ডা গ্রাম নিবাসী মধু মহারানা দারুব্রহ্মত্রয়ের মূর্তি নির্মান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে তারাপ্রসাদ পাত্র মন্দির নির্মান সম্পন্ন করেন। আষাঢ় মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে মূর্তিত্রয়ের নেত্রদান করে মন্দিরে আনুষ্ঠানিক বিগ্রহ স্থাপন করা হয় ও শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে মহাসমারোহে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের 'রথযাত্রা' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বিধ্বংসী ঝড়-ঝঞ্ঝায় মন্দিরের শীর্ষস্থ মঙ্গল কলসসহ চূড়া ভেঙে যায়। জমিদার বাবুরাম পাত্রের চতুর্থ উত্তরপুরুষের অন্যতম সূর্যকুমার পাত্র ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। এইভাবে অদ্যাবধি বংশানুক্রমিক নিত্যসেবায় জগন্নাথদেব পূজিত হয়ে আসছেন।

পরম্পরা অনুসারে ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬-ই জুন নবকলেবরে ব্রহ্মশিলা স্থাপনের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও নেত্রোৎসব পালিত হয়, যা পঞ্চমপুরুষ দ্বিজেন্দ্রনাথ পাত্রের জেষ্ঠ্য পুত্র শ্রী দীপক কুমার পাত্র পূণ্য শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্পন্ন করেন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সময়কাল থেকেই রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবোধনের দায়িত্বে রয়েছে পাত্রপরিবারের সদস্যগণ।

সাগরেশ্বর পাত্রপরিবারের শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব মন্দিরের স্থাপত্য শৈলীও বিস্ময়কর। মন্দিরের গাত্রে সিংহ, পুষ্প, কৃষ্ণের সূক্ষ্ম কারুকার্য করা রয়েছে। মন্দিরটি আটচালা স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত।

পাত্র পরিবার

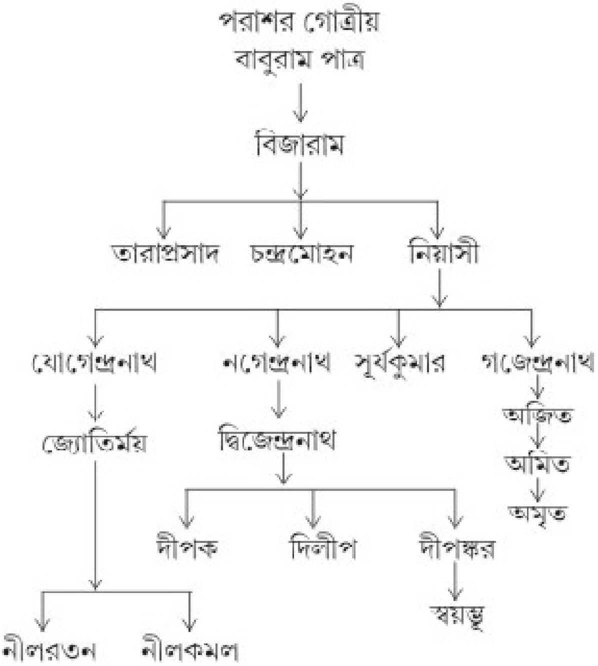

আবার জগন্নাথ মন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যথা—স্নানযাত্রা, আরতি, রথযাত্রা প্রভৃতি কার্যে পদ-কীর্তনের চল রয়েছে। তবে এখানেও একটি জনশ্রুতি রয়েছে—জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশে 'মহিষামাঠ' নামক কৃষিজমিতে লাঙ্গলের ফলায় উত্থিত তালপাতার পুথি, যা প্রাপ্ত হন বৈদ্যনাথ পাঁজা নামক ব্যক্তিত্ব। সেই থেকেই আজ পর্যন্ত ডিহিবিরকুলের পাঁজা পরিবারের সদস্যগণই বংশানুক্রমে জগন্নাথদেবের মন্দিরে পদ-কীর্ত্তণ করে আসছেন-

বৈদ্যনাথ
↓
দীনবন্ধু
↓
রমনী
↓
বিমল কমল

উপসংহার:

বৃদ্ধেশ্বরমহাদেব, মহামায়া সর্বমঙ্গলা ও জগন্নাথদেবের বাসভূমিতে রাউত্রাপুর, ডিহিবিরকুল ও সাগরেশ্বর এক পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে আধ্যাত্মিকতার পবিত্র স্থানগুলিতে সাংস্কৃতিক প্রসার ঘটেছে। শৈব, বৈষ্ণবীর ভাবধারায় মন্দির ও দেবী মহিমায় প্রভাবিত সভ্যতা সুস্পষ্ট। লোকায়ত বিশ্বাসে প্রধানত: দুটি দিকের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়—প্রজনন বা উৎপাদিকা শক্তির আবাহন, ভূমি শস্যবতী হয় ও কন্যা সন্তানবতী হয়। অপরদিকে জীবনের নিরাপত্তা, যাতে বাধা-বিঘ্ন অপসারিত হয় ও মারাত্মক রোগের ফলে অকাল প্রয়ান না ঘটে। লোকায়ত ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুটি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জাগতিক ও বস্তুগত। তারই উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সৌধ। প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের মূলেও ছিল তিনটি দিক—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। বর্তমানে ত্রয়ের আধারে আশ্রিত ভূমিটি 'দেবভূমি' হিসাবে অতীত থেকেই চিরভাস্বর।

তথ্যসূচী:

১. তথ্যপ্রদানকারী ব্যক্তিত্বগণ—অনন্তকুমার পান্ডা, ভবানিশঙ্কর পানি, অজিতকুমার পাত্র, দীপক কুমার পাত্র, দেবব্রত জানা, চিন্ময় দাস প্রমুখ।
২. আদিত্য চৌধুরীকৃত Youtube Link- https://youtube/G7z2_rQj_2M
৩. শ্রীজগন্নাথদেব—রথযাত্রা Youtube Link- https://youtube/pk-EnOM7mA

পরিবেশবান্ধব পাটচাষ ও ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি

বিশ্বরূপ প্রামাণিক
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কথামুখ

পাট একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। গোটা বিশ্বব্যাপী তুলোর পরেই রেশমি সোনালি রঙের এই প্রাকৃতিক সেলুলোজ তন্তুটির ব্যবহার এবং উৎপাদন। মূলত পাট গাছ দুই প্রকারের হয়। সাদা পাট, যা নিচু জমিতে জন্মায় এবং তোষা পাট, উঁচু জমিতে জন্মায়। এই সাদা পাট গাছ থেকে সব থেকে বেশি পরিমাণের তন্তু পাওয়া যায়। তোষা পাট থেকে তুলনা মূলক ভাবে একটু কম পরিমাণের তন্তু পাওয়া যায়। এছাড়াও আরও দুই রকমের পাট হয়, মেস্তা পাট এবং বিমলি পাট। পাটজাত জিনিস তৈরিতে পৃথিবীতে ভারত শীর্ষে। বাংলাদেশ কাঁচা পাট উৎপাদন ও রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম দিকে রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্ব যথেষ্ট। মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোগপতি থেকে শুরু করে বড় চটকলগুলি অর্থকরী এই ফসলটি দিয়ে খাদ্যবস্তুর মোড়ক ছাড়াও নানান পরিবেশবান্ধব জিনিস তৈরি করে। পাট-চাষি, পাটবীজ ব্যবসায়ী, কাঁচা পাটের ব্যাপারি, ফড়ে এবং অবশ্যই পাট-মাজুতদারদের আর্থিক সংস্থান করে পাট ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখে। প্রাকৃতিক দূষণ কমিয়ে পাট চাষ পরিবেশকে সবুজ ও মজবুত রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

অতীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৫৯০ সালে লেখা আবুল ফজল এর 'আইন-ই-আকবরি' বইতে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পাটের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। এই বই থেকে জানা যায় যে ভারতের গ্রামের গরীব মানুষ সাদা পাটের তন্তু থেকে তৈরি জামা কাপড় পরত। হাতে ঘুরানো চরকা-কাটা পাটের সুতো দিয়ে সাধারণত তাঁত বোনা যন্ত্রেই জামাকাপড় তৈরি হত।[১] ভারতীয়রা, বিশেষ করে বাঙালিরা প্রাচীনকাল থেকে পাটের তৈরি দড়ি ও পাতলা পাক দেওয়া সুতো ঘরের ও অন্যান্য নানা কাজে ব্যবহার করত। আফ্রিকা এশিয়ায় বুনন ও দড়ি তৈরির কাজে পাট তন্তু ব্যবহার হত। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে তোষা পাট গাছের পাতা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হত। মিশর, জর্ডন ও সিরিয়া-য় পাট গাছের পাতা দিয়ে খাবার স্যুপ তৈরি করা হয়। পাট গাছের পাতা শাক হিসেবে খাওয়া যায়। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিন-পুর্ব এশিয়া, বাংলাদেশ এবং ভারতের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে পাট চাষ করা হয় প্রধানত এর তন্তু ব্যবহারের জন্য। 'হারবিন একাদেমি অফ সায়েন্স' এর চৈনিক গবেষক 'Qui Shiyu' জানাচ্ছেন, প্রাচীনকাল থেকেই চিন দেশে পাট থেকে কাগজ তৈরি হত।[২] এ কাজে ইহুদিরা অংশ নিত। এ ধরণের কাজকে বলা হত 'jiaoji'। মোটা ধরণের পাট তন্তু দিয়ে এই কাগজ

বানানো হত। উত্তর-পশ্চিম চিন এর গানশু প্রদেশের ডানহুয়াং অঞ্চলে এরকম এক খণ্ড পাটের তৈরি কাগজের খোঁজ মিলেছে যার ওপর চিনা হরফ লেখা আছে। মনে করা হচ্ছে পশ্চিম হান রাজত্বে (খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দ থেকে ২২০ খ্রিস্টাব্দ) এই কাগজ তৈরি হয়েছিল। প্রধানত কাঁচা পাটের ব্যবসা প্রথম শুরু করে উনিশ শতকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।[৩] বিশ শতকের প্রথমেই কোম্পানি ডান্ডি-র পাটকলের সাথে কাঁচা পাটের ব্যবসা শুরু করে। এই সময় কোম্পানির এটি একচেটিয়া কারবার ছিল। ১৮০০ শতাব্দে ডান্ডি-র পাটকলগুলির মালিক ছিলেন মারগারেট ডনেলি-১।[৪] তিনি ভারতে পাটকলগুলি প্রথম স্থাপন করেন। ১৮৫৪-৫৫ সালে হুগলি নদীর ধারে কলকাতার কাছে রিষড়া-য় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। মিস্টার জর্জ অকল্যান্ড ডান্ডি থেকে সুতাকাটা কল এখানে নিয়ে আসেন। এর চারবছর বাদে বিজলি চালিত বুনন কল চালু হয়।

নানাবিধ পাটের ব্যবহারিক ধরনঃ

পাটের তন্তু নানা কাজে লাগে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকেই চটের কাপড় তৈরির কাজে শন এর সুতোর বদলে পাটের সুতোর ব্যবহার শুরু হল। আজও চটের কাপড় দিয়েই পাটজাত নানান জিনিস তৈরি হয়। পাটের তন্তুর সব চেয়ে বড় সুবিধা হল যে কেবল এটি দিয়েই যেমন নানা জিনিস তৈরি করা যায়, তেমনই এটির সঙ্গে অন্যান্য তন্তু ও উপাদান মিশিয়েও তাকে ব্যবহার করা যায়।[৫] পাট ভাল অন্তরক (Insulating) হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এটি মাঝারি ধরনের আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে। পাটের তাপীয় পরিবাহিতা অল্প।[৬] বাণিজ্যিক ভাবে মোড়ক তৈরির উপাদান হিসেবে পাটের তন্তু সবথেকে সস্তা।[৭] এর প্রধান কারণ হেক্টর প্রতি এর উৎপাদন বেশি এবং আধুনিক পাটজাত জিনিস তৈরির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এটিকে সহজেই ব্যবহার করা যায়। তাই পাটের তৈরি থলে, তেরপল, দড়ি, হেসিয়ান-কে মালপত্রের মোড়ক হিসেবে যেমন ব্যবহার করা হয়, তেমনই পাট দিয়ে কার্পেট, কম্বল, পাকানো সুতো, লিনোলিয়ামও তৈরি করা হয়।[৮] এমনকী বোর্ড, কাগজের তৈরিতে কাঠ বা বাঁশের বিকল্প হিসেবেও এটি যথেষ্ট ভাল। জাল তৈরি, বয়ন শিল্পে, কারখানায় সুতো তৈরি করতে, নির্মাণ শিল্পে এবং কৃষি ক্ষেত্রে পাটের ব্যবহার হয়। পাটের ব্যবহার তাই বহুমুখী। ব্যবহারের দিক থেকে পাটকলে তৈরি পাটজাত জিনিসকে সাধারণত ৮টি ভাগে ভাগ করা হয়।[৯]

১। মোটা পাট-কাপড়ে তৈরি ব্যাগ বা মোড়ক (Hessian)

২। ভারী জিনিস বইবার বস্তা বা থলে (Sack)

৩। ক্যানভাস

৪। পাটের সুতো এবং পাকানো সরু সুতো বা দড়ি (Jute yarn and twine)

৫। ঢাকা দেবার কাজে ব্যবহৃত তেরপল (Tarpaulin)

৬। ঝোলা বা ব্যাগ,

৭। কফি, কোকো, চিনাবাদাম ইত্যাদির মোড়কের জন্য হাইড্রোকার্বন-মুক্ত পাটের কাপড় এবং

৮। জিওটেক্সটাইলস– মাটির ক্ষয় ও ধস রোখার কাজে এটিকে নদীবাঁধে ও পাহাড়ের ঢালে ব্যবহার করা হয়।

এছাড়াও অন্য কিছু ধরনও আছে। যেমন বয়ন শিল্প ও ল্যামিনেশনের কাজে ব্যবহৃত সেরিম (serim) কাপড়, তামাক পাতা এক জায়গা থেকে অন্যত্র পাঠাতে মোড়কের জন্য ব্যবহৃত tobacco sheet, পাটের তৈরি ফিতে এবং নানান ধরণের সাজানোর সরঞ্জাম – খেলনা, well hanging, সুদৃশ্য কগজ, শৌখিন ব্যাগ, টেবিল ল্যাম্প, আসবাব ইত্যাদি।[১০]

পরিবেশ বান্ধব পাট চাষ এবং কার্বন বাণিজ্য

পাট ১০০% পচনশীল, পুনর্নবীকরণযোগ্য, পরিবেশ বান্ধব এক প্রাকৃতিক তন্তু। সাধারণত কোনরকম কীটনাশক ও সার ছাড়াই পাট গাছ বেড়ে ওঠে। নানা ধরণের সুতো এবং বাণিজ্যিক ভাবে মোড়কের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি সিনথেটিক বা কৃত্রিম তন্তু থেকে বেশি উপযুক্ত। পাট গাছ সাধারণত চার থেকে ছয় মাসে পরিণত হয়ে যায়। পাট গাছের সরু কাণ্ড গুলি বেশ শক্ত। পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান কাঠের চাহিদার বিকল্প হিসেবে একে ব্যবহার করা যেতে পারে।[১১] পাট গাছের কার্বনডাইঅক্সাইড আত্তীকরণ ক্ষমতা খুব বেশি। পাট চাষ করতে সাধারণত ১২০ দিন সময় লাগে।[১২] ভারত সরকারের বস্ত্রবয়ন মন্ত্রকের দেওয়া এপ্রিল, ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী ১ একর জমিতে পাট চাষ করা হলে পাট বায়ুমণ্ডল থেকে ১২০ দিনে ৬ মেট্রিকটন কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং ৪.৪ মেট্রিকটন অক্সিজেন বাতাসে যোগ করে।[১৩] এখানে উল্লেখ্য যে অন্যান্য অনেক নিরক্ষীয় গাছের তুলনায় পাট গাছের বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করার ক্ষমতা বেশি। এছাড়াও পাট চাষ করলে প্রতি বছর ১ মেট্রিকটন শুকনো পাতা একর প্রতি মাটিতে মেশে। একর প্রতি তিন মেট্রিকটন শিকড় মাটিতে রয়ে যায়। এগুলি পচে মাটিতে জৈব সার হয়। মাটিতে নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম ও ফসফরাস যোগ হয়। ফলে মাটিতে সরাসরি সার দেওয়ার খরচ চাষির বেঁচে যায়। যত টাকার এই সার বাঁচে তাকেও পাটের 'কার্বন ক্রেডিট' এর মূল্য বলে ধরা হয়।[১৪] পাট গাছ থেকে আঁশ ছাড়াবার পর পাটকাঠি বা প্যাকাটি পান চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়, এবং জ্বালানি ও সস্তার ঘর তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[১৫]

বিশ্বউষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন ঠেকাতে নানান কলকারখানা থেকে যাতে কম কার্বনডাইঅক্সাইড বেরিয়ে বাতাসে মেশে তার জন্য পৃথিবী জুড়ে কার্বন ক্রেডিট ব্যবস্থা চালু আছে। এই ব্যবস্থায় প্রতি টন কার্বনডাইঅক্সাইড (বা গ্রিন হাউস গ্যাস) এর দাম ঠিক করা হয়। এবং যে সব শিল্পপ্রধান দেশ থেকে এই গ্যাস বেরিয়ে বাতাসে মেশে, তাদের গ্যাস বেরোনোর পরিমাণ অনুযায়ী বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ তহবিলে অর্থ জমা দিতে হয়।[১৬] সাধারণত দুই ধরণের কার্যকারী কার্বন ক্রেডিট ব্যবস্থা চালু আছে। যেমন , ১) 'কার্বন অফসেট ক্রেডিট'- এই ব্যবস্থায় প্রধানত নির্মল শক্তি উৎপাদনের

কথা বলা আছে। এক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কার্বন বিহীন বা কম কার্বনযুক্ত নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার (যেমন সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ শক্তি, বায়ুশক্তি ও জৈব শক্তি) ব্যবহার করতে হবে। ২) 'কার্বন রিডাকশন ক্রেডিট'- এই ব্যবস্থায় বারে বারে গাছ লাগানোর মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করে তাকে মাটিতে ও সমুদ্রে সঞ্চয়ের কথা বলা আছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের মাত্রা কমাতে এই দুটি ব্যবস্থাই অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে তিসরি দুনিয়ার উন্নতিশীল ও কৃষিপ্রধান দেশগুলির জন্য 'কার্বন রিডাকশন ক্রেডিট' ব্যবস্থা বেশি উপযুক্ত।[১৭] বায়ুমণ্ডলে এক টন পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইড কমানো হলে কার্বন বাণিজ্যর পরিভাষায় তাকে বলে ১ সি ই আর (CER= Certified Emission Reduction)। ১ সি ই আর- এর আন্তর্জাতিক বাজার দর এখন ১৫-২৫ ইউরো (Fair Climate Fund.2019)। ভারতীয় টাকার অঙ্কে ১ ইউরো বর্তমানে প্রায় ৮৫ টাকার সমান।[১৮]

ভারতবর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে পাট ও মেস্তার চাষ হয় (Office of the jute Commissioner,2018)। এই পরিমাণ জমি থেকে ১২০ দিনে মোট কার্বনডাইঅক্সাইড শোষিত হয় ২০ লক্ষ x ৬ মেট্রিকটন= ১২০ লক্ষ টন বা ১.২ কোটি সি ই আর (CER)। প্রতি ই সি আর- এর আন্তর্জাতিক বাজার দরে এই ১.২ কোটি সি ই আর- এর মূল্য ভারতীয় টাকার অঙ্কে কী দাঁড়ায় তা সহজেই হিসেব করা যায়। এই টাকা পাট উৎপাদনকারীদের মধ্যে উৎসাহ ভাতা হিসেবে করা যায়; বা পাটশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মধ্যেও সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যায়। পাট চাষে কার্বন বাণিজ্যের দিকটি আমাদের দেশে এখনো খুব একটা সামনে আসেনি। এ ব্যাপারে সরকারকেই সকলকে উৎসাহিত করতে হবে।[১৯]

এক নজরে পাট শিল্পঃ ভারত ও অন্যান্য দেশ

স্বাধীনতার সময়ে ভারতে পাটকলের সংখ্যা ছিল ১০৬টি। কেন্দ্রীয় বস্ত্রবয়ন মন্ত্রকের ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশে কম্পোজিট পাটকলের সংখ্যা ছিল ৯৭টি।[২০] এগুলির মধ্যে ১৯টি বন্ধ। এই পাটকলগুলির মধ্যে ৬টি 'ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স কর্পোরেশন' নামক রাষ্ট্রায়ত্ত অধীনে পরিচালিত। পশ্চিমবঙ্গে কম্পোজিট পাটকলের সংখ্যা ৭১টি।[২২] বাকি ২৬টি রয়েছে অন্যান্য রাজ্যে; যেমন- অন্ধ্রপ্রদেশে ১২টি, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও ওড়িশায় ৩টি করে, ছত্তিসগড় ও অসমে ২টি করে এবং ত্রিপুরায় ১টি। পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি মূলত হুগলি নদীর দু'ধারে প্রায় ৬০ মাইল জুড়ে টিটাগড়, জগদ্দল, হাওড়া, বজবজ, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, বাঁশবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া, নৈহাটি, হালিশহর, কাকিনাড়া, শ্যামনগর, বরানগর, বিড়লাপুর, কামারহাটি, বৈদ্যবাটি ইত্যাদি জায়গায় অবস্থিত। এই পাটকলগুলিকে শিল্প – এলাকাগত দিক দিয়ে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যেমন, ভাটপাড়া-জগদ্দল,

টিটাগড়-খড়দহ, বজবজ-বিড়লাপুর, চাঁপদানি-ভদ্রেশ্বর এবং হাওড়া। আমাদের রাজ্যে গড়ে প্রতিটি পাটকল প্রায় ২.৫ কোটি বস্তা বা থলে তৈরি করতে পারে।[২৩]

কর্মসংস্থান পাট বয়ন শিল্পের একটি প্রধান ক্ষেত্র। ভারত সরকারের বস্ত্রবয়ন মন্ত্রকের ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে কম্পোজিট পাটকলগুলি সংগঠিত ক্ষেত্রে সরাসরি ৩.৭ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করে। এছাড়াও পরোক্ষভাবে, পরিষেবা ক্ষেত্র সহ অন্যান্য সহযোগী কাজকর্মে প্রায় আরও ৪০ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়।[২৪] 'অফিস অফ দ্য জুট কমিশনার' এর ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে বছরে পাট ও মেস্তার গড় উৎপাদন ১০৯৯০ বেল (১ বেল=১৮০ কেজি) বা প্রায় ৫০,৪৭৭ টন।[২৫] পাট ভারতের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারক পণ্য। পাটজাত জিনিস তৈরি এবং রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। আমাদের দেশে গড়ে (বিগত চার বছরের হিসেবে) ১১২৮০০০ টন পাটজাত জিনিস তৈরি হয়। ভারত প্রতি বছর ১৩৩০০০ মেট্রিকটন পাট জাত জিনিস বিদেশে রপ্তানি করে। অংকের হিসেবে এর মূল্য বছরে প্রায় ২১১৫ কোটি টাকা।[২৬] বিদেশে ভারতের পাটজাত জিনিসের প্রধান ক্রেতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়াও, আর্জেন্টিনা, মিশর, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, কিউবা এবং পূর্ব ইউরোপ ও আফ্রিকার নানান দেশে প্রচুর পাটজাত জিনিস রপ্তানি করে। আমাদের দেশে পাটজাত জিনিসের চাহিদা বছরে ১০৫৬০০০ টন।[২৭]

পৃথিবীতে প্রথম দশটি পাট উৎপাদনকারী দেশ হল ভারত, বাংলাদেশ, চিন, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ব্রাজিল, উজবেকিস্তান, আফ্রিকা, নেপাল ও ভিয়েতনাম।[২৮] পাটের ব্যবসা প্রধানত ভারতীয় উপমহাদেশ ঘিরেই চলে। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় বাজারে পাটজাত জিনিসের স্থানীয় মূল্যকেই আন্তর্জাতিক মূল্য হিসেবে ধরা হয়। পাটজাত জিনিসের ৭৫% মোড়কের কাজে, থলে এবং মোটা পাট-কাপড় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ভারতে উৎপাদিত মোট কাঁচা পাটের ৫০% উৎপন্ন হয়।[২৯]

পাটচাষের সংকট

দেশভাগের ফলে পাট চাষের বেশির ভাগ অঞ্চল বাংলাদেশ চলে যাওয়ায় পাট শিল্পের কাঁচামালের সংকট দেখা দিল। এর মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে পাটের লাভজনক দাম নিশ্চিত করতে এগিয়ে এল। এতে উৎসাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের পাট চাষিরা দ্রুত পাটচাষের বিস্তার ঘটিয়েছিল। কিন্তু আজ সে উৎসাহ তাদের মধ্যে দেখা যায় না। সরকার এখনও পাটের নূন্যতম সহায়ক মূল্য ঠিক করে দেয় এটা ঠিক। কিন্তু পাটের বাজারে এখনও একচেটিয়া আধিপত্য সেই ফড়ে-ফাটকাবাজদেরই। গরিব পাটচাষিদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে পাট ওঠার পরেই এই ফড়ে-আড়তদাররা যোগসাজশ করে সব চেয়ে কম দামে পাট কিনে আড়তে মজুত করে রাখে।[৩০] সরকারি সংস্থা 'জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া' হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের কারিগর এবং শিল্পীদের

ওপরেও। তাই এই কথা বলা খুব একটা অযৌক্তিক হবে না যে অন্যান্য সমস্যা কাটিয়ে উঠলেও পাট শিল্প ততক্ষন কিছুতেই ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না যতক্ষণ পাটচাষের সংকটমোচন না হয়।[৩১]

বিপন্ন পাটশিল্প

স্বাধীনতা লাভের সময় পশ্চিমবঙ্গে পাটকলের সংখ্যা ছিল ১০৬টি।[৩২] একের পর এক সেগুলি বন্ধ হতে হতে সংখ্যাটি বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ৭১-এ। এরই সাথে তাল মিলিয়ে কমেছে শ্রমিক সংখ্যা। কিন্তু পাটশিল্পের উৎপাদনের অনেকটাই দেশিয় বাজারের চাহিদা মেটাতে কাজে লেগে যায়। প্রধান ক্রেতা হল দেশের সরকার। তাহলে সংকটটা কোথায়? বড়োসড়ো চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পাট শিল্প এগোচ্ছে না কেন? একের পর এক পাটকলে কেনইবা পড়ছে তালা! পাটকলগুলি কখন যে চালু, আর কখন যে বন্ধ, তার যেমন কোন স্থির থাকে না, ঠিক তেমনই চালু থাকা পাটকলেও কখন যে কার কাজ আছে, আর কখন যে 'গেটবাহার' – তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।[৩৩] এর উত্তর পেতে যেতে হবে পাটশিল্পের মালিকানার বিষয়ে। ব্রিটিশ আমলে পাটশিল্পের বেশির ভাগ মালিকানা ছিল ব্রিটিশদের হাতে। অবশ্য তখনও যে পাটকলগুলি খুব শিল্পসম্মত ভাবে চলত, তাও নয়। স্বাধীনতার উত্তর কালে পাটশিল্পের মালিকানা প্রায় পুরোটাই চলে এল দেশিয় মালিকদের হাতে।[৩৪] এর ফল কী হল? ব্রিটিশদের হাত থেকে পাটকলগুলির মালিকানা যাদের হাতে এল, তারা ছিল মূলত পাটের ফড়ে ব্যবসায়ী। এরা পাটশিল্পে ফাটকা কারবার ফেঁদে চটজলদি অনেক বেশি মুনাফা কামানো এবং তা অন্য জায়গায় খাটিয়ে আরও বেশি 'মুনাফা' করার নেশায় মেতে উঠল। ফলে এই শিল্পে আরও বেশি টাকা ঢেলে গবেষণা আর উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আর হল না।[৩৫] উপরন্তু ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থার থেকে নেওয়া ধারের টাকা শোধ না করে, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা না মিটিয়ে, এরা শিল্পটাকে আপাদমস্তক ঋণে ডুবিয়ে দিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ব্রিটিশ জামানার শেষে প্রথমবার পাটকলগুলির মালিকানা বদল এর পর থেকে যতবার মালিকানার হাত বদল হয়েছে, ততই বেশিকরে পাট শিল্প জুড়ে ফড়ে – ফাটকাবাজ- মজুতদারেরা জাঁকিয়ে বসেছে। এমনকি, দেশিয় মালিকানাধীন পাটকলের মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও এমনটি হচ্ছে। বর্তমানে বহু পাটকলেরই বৈধ মালিকানার বিষয়টি প্রশ্নের মুখে।[৩৬]

পাট শ্রমিকের অবস্থা

বর্তমানে এই অতিমারি পরিস্থিতিতে কাঁচা পাটের অভাবে বহু পাটকল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাজ হারিয়েছে ২১,৫০০ শ্রমিক।[৩৭] পাটশিল্পের সার্বিক সমস্যা নিয়ে বৈঠকে বসে ২১টি ইউনিয়ন। রাজ্যে কাঁচা পাটের অভাব মেটানোর জন্যে প্রধানমন্ত্রী , কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, জুট কমিশনার এবং শ্রম কমিশন কে চিঠি দেওয়া হয়। এই করোনা আবহে বন্ধ চটকল ও কর্মহীন হয় বহু মানুষ।[৩৮]

সমীক্ষা রিপোর্ট (আনন্দবাজার পত্রিকা ২০২১)

মিলের নাম	কর্মহীন শ্রমিক সংখ্যা
ডেলটা জুট মিল (হাওড়া)	৪০০০
হনুমান জুট মিল (হাওড়া)	৪০০০
ওয়েলিংটন জুট মিল (হুগলি)	৪০০০
বজবজ জুট মিল (দঃ ২৪ পরগণা)	৪৫০০
রিলায়েন্স জুট মিল (উঃ ২৪ পরগণা)	৫০০০

২০২০-২০২১ অর্থবর্ষে পাটের উৎপাদন তার আগের বারের তুলনায় ৪0% কম হয়েছে।[৩৯] পাটকলগুলিতে কাজের পরিবেশ খুবিই শোচনীয়। বহু ক্ষেত্রেই পাটকলগুলি জরাজীর্ণ রুগ্ন প্রায়। মাঝে মধ্যেই ভেঙ্গে পড়ে দুর্ঘটনার নজিরও রোজগেরে। বৃষ্টি বাদলের দিনে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মরত শ্রমিকেরাই ভিজতে থাকে। মেঝেতে জমা জলে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের কাজ করতে হয়। বহু পাটকলে মেশিনের অবস্থা লজঝরে। স্পেয়ার পার্টস এর জোগান নেই। কাঁচা মালের জোগানও অনিয়মিত। পাটকল মালিকদের মধ্যে মধ্যে পাটকলের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী কাজে লাগানোর উদ্যোগ দেখা যায় না। শ্রমিকদের ওপরে বাড়তি কাজের বোঝা চাপানোর জন্য শ্রমিকদের জুলুমবাজি সইতে হয়। অনেক পাটকলেই শ্রমিকদের বস্তিগুলি ভাঙ্গাচোরা।[৪০] লকডাউন ও করোনার প্রকোপে এই শ্রমিকবস্তির শ্রমিকদের কাজ বন্ধ থাকার ফলে ভিক্ষার ঝুলি হাতে দেখা গেছে রাস্তায়![৪১]

বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ কাটা টাকা মালিকরা জমা করে না। অনেক পাটকলে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ টাকা পান নামমাত্র! কারণ প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার কোন হিসেব পাওয়া যায় না।[৪২] অল্প কিছু টাকা দিয়ে চূড়ান্ত হিসেব হয়েগেছে বলে মালিকপক্ষ শ্রমিদের দিয়ে লিখিয়ে নেয়। এই ভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নয়ছয় করে চলেছে মালিকপক্ষ বছরের পর বছর। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পাটকলে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ শ্রমিকদের প্রাপ্য প্রায় ৬০০ কোটি টাকা অনাদায়ী।[৪৩] কিছু ক্ষেত্রে মালিকরা পেনশন খাতেও টাকা জমা না করায় অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকেরা বছরের পর বছর পেনশন না পাওয়ায় হাহাকার উঠেছে। এছাড়াও গ্র্যাচুইটির টাকা শ্রমিকদের মোটেই দেওয়া হয় না, আর হলে ঠেকানো হয় নামমাত্র। শ্রমিকদের প্রাপ্য থেকে আত্মসাৎ করা এই বিপুল টাকারই সামান্য কিছু সম্ভবত মিল চালানোয় মালিকদের ‘বিনিয়োগ’।[৪৪]

পাট শিল্পের এই দুরাবস্থা দূর করতে সময় মতো রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে সামগ্রিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। অল্প কয়েকটি পাটকলের জাতীয়করণ হল বটে, তবে এগুলিকে ‘মডেল পাটকল’ হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা তো হলই না, বরং চরম অব্যবস্থা আর সীমাহীন লুটপাটের ফলে এই পাটকলগুলিও রুগণ

শিল্পের খাতায় নাম তুলে ডুবে গেল।[৪৫] অন্যদিকে বেসরকারি পাটকল মালিকদের বেপরোয়া ফড়ে-ফাটকাবাজির তোষণই প্রকারান্তরে করে গেছে সরকার। সরকারের তৈরি ‘রুগণ শিল্প আইন’ (সিকা) এর মধ্য দিয়ে এই সব লুটেরারা তাদের সাতখুন মাপ এর ছাড় পত্র পেল। এসবের নিট ফল আজ পাট শিল্পের করুন দশা। নামমাত্র যান্ত্রিকীকরণ ছাড়া প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় কায়দায় জুলুমবাজি করে, শ্রমিকদের ঘাড়ে বাড়তি কাজের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে, উৎপাদন বাড়ানোর পথটিও তার শেষ সীমা অতিক্রম করেছে। নানা ধরণের অস্থায়ী শ্রমিককে পাটকলগুলিকে এখন ভর্তি করে ফেলায় উৎপাদনের পরিমাণ ও গুনমানে তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ফলে পাটজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা বর্তমান অবস্থায় বাংলার পাটশিল্পের আর নেই। সে কারণেই প্লাস্টিক ব্যাগ ও পণ্যে বাজার ছেয়ে গেছে। যে পথে পাটকলগুলি এতদিন চলেছে, সেই পথে আর এগুনো সম্ভব নয়। নতুন গবেষণা আর উন্নয়নের মাধ্যমে এই শিল্পটাকে এগিয়ে না নিয়ে যেতে পারলে তার পরিনাম ভয়ঙ্কর।[৪৬]

বিকল্প দ্রব্য

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১৯৭০ এর দশকে পৃথিবী জুড়ে পাটের পাটের ব্যবহার কমে আসার অন্যতম প্রধান কারণটি হল বিকল্প হিসেবে সিন্থেটিক বা কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার।[৪৭] ১৯৬০ সালের শেষ ভাগ থেকেই পাটের বদলে সিন্থেটিক জিনিসের বহুল ব্যবহার দেখা গেল বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে মোড়কের কাজে, শিল্প ক্ষেত্রে, এমনকি কার্পেট তৈরিতেও। সিন্থেটিক ও পাটের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ আছে। সিন্থেটিকের উপাদান পলিপ্রপিলিন কাপড় তৈরি এবং বস্ত্র বয়ন এই দু’রকম কাজেই ব্যবহার করা যায়। পাটের থেকে পলিপ্রপিলিন এর সংশক্তি অনেক বেশি।[৪৮] এটি অপচনশীল। সহজে নষ্ট হয় না। এমনকি অ্যাসিড লাগলেও চট করে গলে বা ক্ষয়ে যায় না। পলিপ্রপিলিন রাসায়নিকভাবেও নিষ্ক্রিয়। পাটের বিকল্প হিসেবে এটির বহুল ব্যবহারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটি অনেক হালকা। একটি বড় পাটের বস্তার মাত্র এক চতুর্থাংশ ওজনেই এটি অনেক বেশি শক্ত ও টেকসই। এই সব কারণে ১৯৮০ এর দশক থেকেই পাটের বিকল্প জিনিস হিসেবে পেট্রোলিয়ামজাত এই তন্তুর ব্যবহার ক্রমাগত যত বাড়তে থাকল, ততই পাটজাত জিনিসের চাহিদা কমল।[৪৯] বর্তমানে পেট্রোলিয়ামজাত এই তন্তু ছাড়াও তিসির ছাল, কেনাফ, রোজেলা, ম্যানিলা হেম্প বা শন, কাগজের ব্যাগ ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারও পাট শিল্পকে সমস্যায় ফেলেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত সিমেন্ট উৎপাদন কারখানাগুলি সিমেন্ট মোড়কের ক্ষেত্রে চটের বস্তা ব্যবহার করত। কিন্তু তারা এখন সিন্থেটিক ব্যবহার করে। একই কথা বলা যায় বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও আলুর মোড়কের বেলায়।[৫০]

পাটের বিকল্প জিনিসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার পাট শিল্পের সংকট গভীর করে তুলেছে। রুগণ পাট শিল্পকে বাঁচাতে মোড়কের ক্ষেত্রে পাটকে আবশ্যিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে 'জুট প্যাকেজিং মেটেরিয়াল (কম্পালসারি ইউজ ইন প্যাকেজিং কমোডিটিজ) অ্যাক্ট' চালু হয়েছিল।[৫১] এই আইনের ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার পাটকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে নানা প্রযুক্তির মাধ্যমে পাটজাত বিভিন্ন জিনিস ব্যবহারের পথ খোঁজার জন্য 'স্টিয়ারিং কমিটি ফর গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ টেকনিক্যাল টেক্সটাইল' গঠন করে।[৫২] এই কমিটি পাট থেকে সাতরকম কাপড় বা বস্ত্র উৎপাদনের উপর জোর দেয়, যেমনঃ ১) অ্যাগ্রোটেক – ছোট গাছ লাগাবার জন্য নার্সারি ব্যাগ হিসাবে , ২) বিল্ডটেক – নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য, ৩) জিওটেক – মাটির ক্ষয় ও ধস রোখার জন্য, ৪) ওয়িকোটেক – খাবারের প্যাকেট ও ময়লা ফেলার ব্যাগ তৈরি ও জঞ্জাল ঢাকা দেওয়ার জন্য, ৫) প্যাকটেক – উন্নত ধরণের মোড়কের জন্য, ৬) প্রোটেক – সম্পদ, সম্পত্তি ও দামই জিনিস সুরক্ষার জন্য, এবং ৭) ইন্ডাটেক – গ্লাভস, অ্যাপ্রন ও জুতোর বাইরের আবরণ তৈরির জন্য।[৫৩]

'জুট প্যাকেজিং মেটিরিয়াল (কম্পালসারি ইউজ ইন প্যাকেজিং কমোডিটিজ) অ্যাক্ট – এ পাটকল মালিকরা কিছুটা সুবিধা অবশ্যই পেল। কিন্তু লক্ষণীয় যে এই আইনে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে পাটের মোড়কের ব্যবহার স্থায়ী ভাবে বাধ্যতামূলক করা হল না।[৫৪] আবার, প্রতি বছর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পাটের তৈরি ব্যগ এর ব্যবহার নির্দিষ্ট করে দিলেও তা কার্যকর হচ্ছে কিনা তা দেখার কোন ব্যবস্থা এই আইনে ছিল না। এখানে বলা দরকার যে এই আইন সত্ত্বেও পেট্রোলিয়ামজাত সিন্থেটিকের মোড়ক পাটজাত মোড়কের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বাজার ছেয়ে ফেলল। দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থান্বেষী ভুবনীকরণ নীতি, উদার অর্থনীতি ও 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'র হুকুমের কাছে আমাদের দেশের সরকার ক্রমাগত মাথা নোয়াল। এইসব নীতির লক্ষ্যই হল দেশিয় শিল্প, কৃষি এবং তার বাজারকে ধ্বংস করা। যেমন, ২৫ কিলোগ্রাম ছোট প্লাস্টিক ব্যাগে খাদ্যশস্য, আলু, চিনি ইত্যাদি মোড়কজাত করে অপেক্ষাকৃত বেশি দামের ৫০ কিলোগ্রামের পাটের বস্তা বা থলেকে কোণঠাসা করে ফেলা হচ্ছে।[৫৫] উপরন্তু, 'জুট প্যাকেজিং মেটেরিয়াল (কম্পালসারি ইউজ ইন প্যাকেজিং কমোডিটিজ) অ্যাক্ট' এর যেটুকু সুবিধা আছে, পাটের ফড়ে-ফাটকাবাজরা সব সময় সেই সবের পুরো সদ্ব্যবহার না করে ক্ষেত্রবিশেষে এদের অনেকেই প্লাস্টিকের কারবারে ভিড়ে গেল। তাই ক্রমবর্ধমান পাটের বস্তার মোড়কের চাহিদা পূরণের জন্য পাট শিল্পের সম্প্রসারণে এদের তরফে কোন উদ্যোগ দেখা যায় না।[৫৬] প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের মত ৫, ১০, ২০ বা ২৫ কিলোগ্রাম এর পাটের তৈরি থলে বা বস্তা তৈরি করে প্লাস্টিকের মোকাবিলা করার মত কোন উদ্যোগ এদেশে পাটশিল্পের ফড়ে- ফাটকাবাজরা নেয়নি। উল্টে

নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে তারা প্লাস্টিকের বাজার দখলকে একটা স্থায়ী বাহানা হিসেবে খাড়া করেছে।[৫৭]

এখানে একটি কথা বলা বিশেষ ভাবে দরকার যে পাটের তৈরি ব্যাগ বা থলের থেকে প্লাস্টিকের মোড়ক বেশ সস্তা এরকম এক প্রচার আছে। সামগ্রিকভাবে সামাজিক ব্যয়ের (Social Costing) দৃষ্টিভঙ্গিতে হিসেব করলে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়ায়।[৫৮] পাটগাছের বিপুল পরিমাণ কার্বন শোষণের বিপরীতে পলিপ্রপিলিন তৈরির সময় উৎপন্ন কার্বন এর তুলনা করলে, বা প্লাস্টিক বর্জ্যের জন্য দেশের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের সার্বিক ক্ষতির সঙ্গে পাটের বর্জ্যের প্রকৃতিতে মিশে যাওয়ার স্বাভাবিক গুনকে তুলনা করলে বিষয়টা অনেকটাই স্পষ্ট হয়। পাট ও পাটজাত জিনিসের ক্ষেত্রে গবেষণা, প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতির যুক্তিসম্মত অগ্রগতি, সর্বোপরি ফড়ে-ফাটকাবাজ মালিক এবং তাদের ঘিরে গড়ে ওঠা শিল্পবিরোধী ও জনবিরোধী কার্যকলাপে যে বিশাল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি পাটশিল্পকে প্রতিনিয়ত বইতে হচ্ছে, তা বন্ধ করতে পারলে পাটজাত জিনিসের দাম এমনিতেই অনেকটা কমবে।[৫৯] চাহিদার ক্রমবৃদ্ধি অনুযায়ী ব্যবহারের বৃদ্ধি ঘটলেও দাম কমার কথা। এসব দিক থেকে বিবেচনা করলে পাটের থেকে প্লাস্টিকের মোড়ক সস্তা, এই যুক্তি স্বভাবতই ধোপে টেঁকে না।

এখানে অবশ্যই বলা দরকার যে এ দেশে প্লাস্টিক ব্যাপক ভাবে ঢুকে পড়ার ফলে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে তার ক্ষতিকারক ভূমিকা ভয়ানক বিপদ ডেকে আনছে।[৬০] প্রথমটি হল খাদ্যদ্রব্যে প্লাস্টিকের বিষক্রিয়া, যার থেকে ক্যানসারের মতো প্রাণঘাতী রোগ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য যেখানে সেখানে থেকে যাবার ফলে তা খেয়ে প্রতি বছর বেশ কিছু গবাদি পশুর মৃত্যু হচ্ছে। তৃতীয়ত, জল নিকাশি ব্যবস্থার বাধা সৃষ্টি করে প্লাস্টিক অনেক জায়গাতেই ফি-বছর বন্যা ডেকে আনছে। এমন ধরণের সমস্যা চলতে থাকার পাশাপাশি পরিবেশের সংকটও ক্রমশ বাড়ছে।[৬১] পরিবেশ সুরক্ষার দিক দিয়ে বর্তমানে পাটের থলে বা বস্তার বিকল্প হিসেবে বহুল ব্যবহৃত প্লাস্টিক বা কাগজের ব্যাগের এক তুলনামূলক বিচার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বনের গাছ কেটে মন্ড তৈরি করে কাগজ তৈরি হয়। ১ টন কাগজ তৈরি করতে ১৭টি গাছ কাটতে হয়।[৬২] পৃথিবী জুড়ে প্রতি মিনিটে ১০ লক্ষেরও বেশি প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহৃত হয়। প্লাস্টিক ব্যাগের মূল উপাদান সিন্থেটিক পলিমার তৈরি হয় অপুনর্ভব শক্তি পেট্রোলিয়াম থেকে। এই বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরির কাঁচামালের প্রয়োজনে প্রতি বছরে পৃথিবী জুড়ে মোট খনিজ তেলের ৪% ব্যবহৃত হয়।[৬৩] প্লাস্টিক ব্যাগ পচনশীল নয়। ১ টন পাট থেকে তৈরি থলে বা বস্তা পোড়ালে বাতাসে ২ গিগা জুল তাপ এবং ১৫০ কিলোগ্রাম কার্বনডাইঅক্সাইড ছড়িয়ে পড়ে।[৬৪] অন্যদিকে ১ টন প্লাস্টিক ব্যাগ পোড়ালে বাতাসে ৬৩ গিগা জুল তাপ ও ১৩৪০ টন কার্বনডাইঅক্সাইড মেশে। এই সব ক্ষতিকারক দিক বিবেচনা করে ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা’

খাদ্যশস্য ও চিনি মোড়কজাত করার জন্য পরিবেশ-বান্ধব পাটের বস্তা বা থলে ব্যবহারের সুপারিশ করেছে।[৬৫]

এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে মানতেই হয় যে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার মানবিক দাবি মেনে পরিবেশ-বিনাশী প্লাস্টিকে খাদ্যদ্রব্য মোড়কজাত করা পুরো নিষিদ্ধ করা দরকার। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এর বদলে পাটের তৈরি ব্যাগ ফিরিয়ে আনা ও তার ব্যবহারে মানুষকে উৎসাহিত করা জরুরি হয়ে উঠেছে। কাজটি করা গেলে পাট চাষ ও পাটশিল্পের ব্যাপক বিস্তার ঘটবে। পাটজাত জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা যে অত্যন্ত অনুকূল অবস্থা তৈরি করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্লাস্টিকের আগ্রাসনকে যতই কমানো যাবে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ-বান্ধব পাটের সম্ভাবনা ততই উজ্জ্বল ও বাস্তব হয়ে উঠবে।[৬৬]

সংকটের মোকাবিলা- ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে

২০০৫ সালে ‘জাতীয় পাট নীতি’ ঘোষিত হয়।[৬৭] এখানে ভারতের অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে পূর্ব ও উত্তর পুর্ব ভারতের আঞ্চলিক অর্থনীতিতে, বিশেষ করে পেশাগত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পাট চাষ ও পাটশিল্পের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ব্যবহারের জন্য পাটজাত দ্রব্যের উপযোগিতা আরও বাড়ানো হবে। ফলে রপ্তানি বাড়বে। রপ্তানি বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ‘ভারত পাট শিল্প উন্নয়ন বোর্ড’ গঠন করেছে।[৬৮] আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের পাটকে ক্রেতাদের কাছে আরও ভাল করে তুলে ধরতে এবং পাট শিল্প ও তার গবেষণার কাজে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের উপর নির্ভর করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন কাঁচা পাটের মানের উন্নতি ঘটানো যাবে, অপরদিকে তেমনই পাটজাত জিনিসও উন্নত হবে।[৬৯]

আইন ‘স্টিয়ারিং কমিটি’ র সুপারিশ এবং ‘জাতীয় পাট নীতি’ থাকা সত্ত্বেও আফশোষের কথা এগুলি মূলত কাগজে-কলমেই থেকে গেছে।[৭০] ১৯৮৭ সালের পরবর্তী প্রায় দুই দশক ধরে কেন্দ্রীয় সরকার ৪০% চাল, গম, চিনির মতো খাদ্যবস্তু চটের বস্তার মোড়কজাত করা আবশ্যিক করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার ২০১৩ সালে পরিমাণটিকে ২০% এ নামিয়ে এনেছে।[৭১] ফলে প্লাস্টিক বা সিন্থেটিক পলিমারের তৈরি ব্যাগ খাদ্যশস্যে মোড়ক হিসেবে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে পাটশিল্প ধুঁকছে। চটের বস্তার চাহিদা কমে যাওয়ায় পাটকলগুলির চটের বস্তার উৎপাদনও যথেষ্ট মার খেয়েছে। অনেক পাটকলে এর ফলে শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে বা বা পাটকলগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বহু শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। চটের বস্তা তৈরির বরাত কমে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে সেই সুযোগে পাটকল মালিকেরা কোন নিয়ম নীতি না মেনে শ্রমিকদের অবসরকালীন গ্র্যাচুইটি বা অন্যান্য ন্যায্য আর্থিক সুবিধা দিতে অস্বীকার করেছে। বেশ কিছু মালিক আবার পাটকলে তালা ঝুলিয়ে

দিচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শ্রমিকদের সুবিধার জন্য ১৯৭২ সালে ভারত সরকার 'পেমেন্ট অফ গ্র্যাচুইটি' আইন চালু করে।[৭২] এটি শ্রমিকদের পক্ষে একটি সামাজিক সুরক্ষা বিধি। কিন্তু পাটকল মালিকদের অনীহা এবং সরকারি শ্রম দপ্তরের অতি গা-ছাড়া মনোভাবের ফলে গরিব শ্রমিকেরা অবসর পরবর্তী টাকা না পেয়ে ভয়ঙ্কর মানসিক অবসাদে ভুগছেন। অর্থাভাবে এমন ভাবে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন যেখানে কোন মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারে না।

পাটকল মালিকরা ভারত সরকারের কাছ থেকে চটের বস্তা বানানোর বরাত পায়। এই চটের বস্তা তৈরির অর্থমূল্য কী হবে সেটিও ভারত সরকার ঠিক করে দেয়। যার মধ্যে শ্রমিকদের বেতন এবং অন্যান্য আইনি আর্থিক সুবিধার হিসেবও ধরা থাকে। এর পরেও শ্রমিকদের অবসরের পর তাদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয় না। পাটকল মালিকরা ইচ্ছাকৃতভাবেই তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বেআইনি ভাবে বঞ্চিত করে। এমনকি , শ্রমিকদের অবসর সংক্রান্ত সামাজিক সুরক্ষা বিধি এড়াতে মালিকরা ঠিকা কর্মী ও চুক্তি ভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করে। কারণ, এই ধরণের অস্থায়ী শ্রমিকদের বেলায় অবসরকালীন দেনা-পাওনা মেটানোর কোন ঝক্কি নেই।[৭৩]

বর্তমানে বিশ্ব-পুঁজির প্রবল দাপটে যখন উন্নয়নের নামে দেশের জমি, জল, জঙ্গল সবকিছুর উপর বহুজাতিক লোভাতুর দৃষ্টি, তখন পশ্চিমবঙ্গের এই একান্ত নিজস্ব সম্পদ সম্বল করে কৃষি এবং শিল্প দুটিরই ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব। সম্ভব এমন একটি বিকল্প শিল্প ভাবনাকে নির্মান করা, যার মূল লক্ষ্য হবে মুনাফার পেছনে দৌড়ানো নয়, সামাজিক প্রয়োজন মেটানো।[৭৪] জনমুখী এমন একটি উদ্যোগ ক্রমশ গতি পেলেই দেখা যাবে শ্রমনিবিড় এই কৃষিজ শিল্পের কেন্দ্রে চলে আসছেন শ্রমিক ও চাষি। এই উদ্যোগ গবেষণার মাধম্যে উৎপাদনের পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতি ঘটিয়ে, পাটচাষ ও পাটশিল্পকে যেমন নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করবে, তেমনই এই ক্ষেত্রে শ্রমিক, কারিগর এবং চাষি-খেতমজুরদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়াবে বহুগুণ। শিল্প ও কৃষির বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকারদের এবং কর্মচ্যুত শ্রমিকদের রুটিরুজির সুযোগ অনেকখানি বেড়ে যাবে। শিল্প ও কৃষির বিকাশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনার দরজা খুলবে, তাতে নানাভাবে মধ্যবিত্ত মানুষেরও লাভ হবে। পাটের বিপণন থেকে পরিচালন, পাট সংক্রান্ত গবেষণা-অনুশীলনে নিজেদের জীবিকা সংস্থান এর পাশাপাশি মেধার বিকাশ ঘটাতে পারবেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সহ বিভিন্ন শ্রেণির উচ্চশিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রী'রা।[৭৫] এই ধরণের আর্থিক বিকাশ ঘটলে দেশিয় ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের বাজার বাড়বে। ছোট ও মাঝারি পুঁজিপতিদের এই শিল্পক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। গণআন্দোলনের মাধ্যমে পাট ব্যবসায়ে রাঘববোয়াল ফড়ে-ফটকাবাজ মজুতদারদের হটিয়ে চাষি, বেকার আর ছোট ব্যবসায়ীদের সমবায় বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে, পাট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে আরও নতুন কর্মসংস্থান ও আর্থিক সুযোগ বাড়বে।

এরই পাশে, উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পাটজাত থলে বা বস্তার দাম আরও কমিয়ে ফেলার ব্যবস্তা করে শুধু এদেশেই নয়, পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই, আগের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে পাটজাত মোড়কের সমস্ত ধরণের জিনিস রপ্তানির সম্ভাবনা অনেকখানি বাড়ানো যেতে পারে।[৭৬]

একথা পরিষ্কার বলা চলে যে পাট চাষ ও পাট শিল্পের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে একদিকে ফড়ে- ফাটকাবাজ- মজুতদারদের দুষ্টচক্রকে ভাঙার, আর অন্যদিকে দেশি- বিদেশি বৃহৎ পুঁজির পেট্রোলিয়াম লবির আগ্রাসন ঠেকানোর মত অপরিহার্য দুটি কাজ করতেই হবে। স্পষ্টতই এই জন্য দরকার এক বিরাট গণআন্দোলন, যার মূল শক্তি হয়ে উঠবে পাটশ্রমিক এবং পাটচাষি। কারণ পাটের সংকট তাদের জিবন-ব জীবিকাকে বিপন্ন করেছে সব থেকে বেশি। পাট শ্রমিকদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পাশাপাশি পাটচাষিদেরও ক্রমশ যোগ দিতে হবে সংগঠিত আন্দোলনে। পাটের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে, পাটশ্রমিক এবং পাটচাষির জোটবদ্ধ এই আন্দোলনের পাশে অতি অবশ্যই অন্যান্য সমস্ত চাষি, শ্রমজীবী, আধা-শ্রমজীবী, ছোট-মাঝারি শিল্পোদ্যোগী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী সহ মধ্য শ্রেণির প্রায় সমস্ত অংশের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ।[৭৭] এককথায় পাট শিল্পকে বাঁচাতে চাই এক বিরাট সামাজিক আন্দোলন।

ফড়ে- ফাটকাবাজ- মজুতদারদের দখলে থেকে গোটা পাটশিল্প এবং পাটচাষ আজ শেষের পথে। দেশের বড় পুঁজিপতিরা পাটশিল্পের সম্ভাবনা ও পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে এযাবৎ মোটেই শিল্পসম্মত ভূমিকা পালন করেনি। অনেকে তো পাটশিল্প থেকে স্রেফ সরে গেছে। তাই পাটশিল্পের সঙ্কট মেটাতে বড় পুঁজিপতিরা আদৌ এগিয়ে আসবে কিনা তার ঠিক নেই। এই সঙ্কট মোকাবিলার প্রশ্নে সরকারের ভূমিকার কোথাও এসে পড়ে।[৭৮] পাটশিল্প এবং পাটচাষের সংকট মোকাবিলা করে নতুন সম্ভাবনা বাস্তবায়নের বেলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা খুব একটা আশা জাগাতে পারেনি। পাটশিল্পে ফড়ে- ফাটকাবাজ- মজুতদারদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে কোনও সরকারের সেরকম সক্রিয় ভূমিকা চোখে পড়েনি। বিকল্প প্লাস্টিকের অনুপ্রবেশকে রোখার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তা চোখে লাগে। পাটশিল্পকে রক্ষা করার জন্য যে ‘জুট প্যাকেজিং মেটেরিয়াল (কম্পালসারি ইউজ ইন প্যাকেজিং কমোডিটিজ) অ্যাক্ট’ আছে সেটা এমনই দুর্বল, আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্তা নেওয়ার কোনও বিধানই নেই সেই আইনে। ফলে আইন না মানাটাই নিয়মে দাঁড়িয়েছে।[৭৯]

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে পাট কেনা-বেচা করে পাট চাষকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গঠিত ‘জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া’র হালও একই রকম। প্রতি বছর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে ‘জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া’র তরফ থেকে পাট কেনার আগেই

অনেক কম দামে চাষিরা ফড়েদের হাতে পাট তুলে দিয়ে সর্বস্বান্ত হতে বাধ্য হয়।[৮০] তাই কাগজে- কলমে পাটশিল্পের রক্ষা ও উন্নতির জন্য সরকারি বহু ব্যবস্থা থাকলেও আসলে সে সব কাজে বড় একটা আসে না। এই ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয় গত ২০১৫ সালে প্যারিসে 'বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন' এর সময়। পরিবেশবাদীদের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন সত্ত্বেও ভারত সরকারের তরফে পরিবেশ- বান্ধব পাটের গুরুত্ব বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। উল্লেখযোগ্য যে, ওই সম্মেলনে বাংলাদেশ কিন্তু পাটের স্বপক্ষে ইতিবাচক বক্তব্য পেশ করেছিল। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের উদাসীনতাও চোখে পড়ে। এখানে এ কথাও বলার যে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পাটচাষ ও পাটশিল্প নিয়ে কোন ইতিবাচক ধারাবাহিক আন্দোলনের পথে কোনও রাজনৈতিক দলই পা বাড়ায়নি।[৮১]

পাটচাষ ও পাটশিল্পের সংকটমোচন ও সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবায়নের বেলায় আর একটি বিষয় নিয়েও আলোচনা জরুরি। পাটশিল্প এখন পুরোপুরি ফড়ে- ফাটকাবাজদের দখলে চলে গেলেও, একটা সময় বিশেষত ব্রিটিশরা চলে যাবার পরে , পাটশিল্প গোয়েঙ্কা, সিংহানিয়া-র মতো দেশিয় বড় পুঁজির মালিকানাধীন ছিল। কিন্তু বড় পুঁজির মালিকানা মানেই যে শিল্পসম্মত পরিচালনা, এমনটা এদেশে প্রায়ই নিশ্চিত নয়। যেমন শ্রমিকদের ইঞ্জিয়ারিং শিল্পভিত্তিক মজুরি দেওয়ার ভয়ে বিড়লা–র মতো দেশের অন্যতম বৃহৎ পূঁজি যেভাবে এক সময় 'হিন্দুস্তান মোটরস' কারখানাকে 'গ্যারেজ' বলে দেখিয়েছিল, তাতে পাটের মতো শিল্প যে তারা শিল্পসম্মত ভাবে চালাবে, এ কথা ভাবার তেমন যুক্তি নেই। যাই হোক, পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় সমস্ত বড় পূঁজি পাটশিল্প থেকে বিদায় নেয়।[৮২] তারপর এই পর্যান্ত দেশি- বিদেশি কোন বড় পূঁজি পাটশিল্পের বিষয়ে আর আগ্রহ দেখায়নি।

এই অবস্থায় একটা প্রশ্ন খুব সহজেই উঠে আসে যে পাটশিল্পের এত সম্ভাবনার কথা যেখানে বলা হচ্ছে, তাহলে পাটশিল্পে বড় পূঁজি নেই কেন? বা আসছে নাই বা কেন? উত্তরে এটাই বলার, পাটচাষ ও পাটশিল্পের সংকটমোচন তথা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রশ্নকে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে, বড় পূঁজি বিনিয়োগ হওয়া- না- হওয়ার বিষয়টি গভীর ভাবে ক্ষতিয়ে দেখতে হবে। তবে এটাও অদেখা নয় যে পূঁজি, বেশি থেকে আরও বেশি মুনাফার কড়ি গোনা ছেড়ে কখনোই নিছক জনস্বার্থে বা সামাজি স্বার্থে বিনিয়োগ হয় না। তাই বিকল্প বিনিয়োগ ছাড়া উপায় কি? তাই পাটের মত এমন এক সামাজিক তথা জনমুখী কৃষি ও শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ তো সমাজ থেকেই আসতে হবে। এক্ষেত্রে তাই সরকারের প্রসঙ্গ আপনি ওঠে। কারণ সর্ববৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানুষের অর্জিত সম্পদ সরকারের হাতেই থাকে। তাই এই সামাজিক বিনিয়োগের জোগানদার সরকারকেই হতে হবে।[৮৩]

কেবল বিনিয়োগ কেন, পাটের সংকট মুক্তিবা সম্ভাবনা বাস্তবায়নের বেলায় সরকারের আরও অনেক কিছুই করার আছে। আইন এবং প্রশাসনিক সাহায্যে পাটকল

ও পাট ব্যবসায় ফড়ে-ফাটকাবাজির দাপট বন্ধ করা, শ্রমিকদের কাজের শর্ত, স্থায়িত্ব, ও পরিবেশ থেকে শুরু করে উন্নত জীবন মানের উপযুক্ত মজুরি সহ যাবতীয় প্রাপ্যের নিশ্চয়তা দান, পাট চাষিদের অভাবী বিক্রি বন্ধ করে উপযুক্ত দামে পাট বিপণনের ব্যবস্থা, প্রয়োজনে কৃষক সমবায় গঠন, পাটশিল্প ও পাটচাষে শ্রমনিবিড়, দেশজ, স্বনির্ভর কৃষিতে উৎসাহ দান, পাটচাষ ও শিল্পে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রকরনের ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর কৃষিতে উৎসাহিত করা, পাটশিল্পের সম্ভাবনাময় সমস্ত দিক নিয়ে গবেষণা ও প্রয়োগ, খাদ্যদ্রব্যে প্লাস্টিকের মোড়ক নিষিদ্ধ করা। এমন অনেক কিছুই করার আছে সরকারের। প্রসঙ্গত, অবস্তার বিচারে এ কথা বললেও বেশি বলা হয় না যে শেষ পর্যন্ত হয়তো সমগ্র পাটশিল্পটাকেই জাতীয়করণ করার দরকার হয়ে পড়বে। আর সেজন্যই চাই পাটের স্বপক্ষে এক সার্বিক জনমুখী সরকারি নীতি ও কার্যক্রম।

গ্রন্থঋণ :

১. Majumdar, R.C. The Mughul Empire, Bharatiya vidya Bhavan, p-5, 2007 Mumbai.
২. তদেব পৃষ্ঠা – ৬
৩. তদেব পৃষ্ঠা – ১৭
৪. তদেব পৃষ্ঠা - ২৯
৫. Chakrabarti S. K. Carbon credit of jute; Indian Industries Research Assocition, May 6, 2010, Kolkata.
৬. তদেব পৃষ্ঠা – ১১৮
৭. তদেব পৃষ্ঠা – ১৬৭
৮. তদেব পৃষ্ঠা –১৭২
৯. সেন, সুকোমল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-২০০০), এন. বি. এ., কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৭. বাগচী, অমিয়কুমার। ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন (১৯০০-১৯৩৯), কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৭.
১০. তদেব পৃষ্ঠা – ৫৬
১১. তদেব পৃষ্ঠা –৫৭
১২. তদেব পৃষ্ঠা –৬৭
১৩. তদেব পৃষ্ঠা –৭৮
১৪. দাস, অমল। ভারতের ইতিহাসের নিম্নবর্গের নারী শ্রমিকঃ এদের সংকট ও সংগ্রাম উনিশ থেকে বিশ শতক, গ্রন্থমিত্র, এপ্রিল ২০১৩, কলকাতা.

১৫. দাস, অমল। 'সাম্প্রতিককালে ভারতে শ্রমিক ইতিহাস চর্চা'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫. কলকাতা, ২০০১।
১৬. বসু, নির্বাণ। 'বাংলার চটকল শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট (১৯৩৭)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৩। কলকাতা, ১৯৮৮।
১৭. তদেব পৃষ্ঠা – ৩৪
১৮. তদেব পৃষ্ঠা – ১৫৬
১৯. তদেব পৃষ্ঠা –১৫৭
২০. তদেব পৃষ্ঠা – ১৮৭
২২. বসু, চন্দন। 'পশ্চিমবঙ্গের শিল্প আর্থনীতি (১৯৪৭-১৯৭০)- একটি পর্যালোচনা'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫। কলকাতা, ২০০১
২৩. Chakraborty, Dipesh. Rethingking Working Class History : Bengal 1890-1940. Kolkata, 1989.
২৪. Dasgupta, Ranajit. Labour and Working Class in Eastern India Studies in Colonial History. Kolkata, 1994.
২৫. তদেব পৃষ্ঠা – ১২৩
২৬. তদেব পৃষ্ঠা – ১২৪
২৭. তদেব পৃষ্ঠা – ১২৭
২৮. তদেব পৃষ্ঠা – ১২৮
২৯. তদেব পৃষ্ঠা – ১২৯
৩০. তদেব পৃষ্ঠা – ১৬৮
৩১. তদেব পৃষ্ঠা – ১৭১
৩২. তদেব পৃষ্ঠা – ১৭২
৩৩. তদেব পৃষ্ঠা – ১৭৩
৩৪. Ghosh, Parimal. Communalism and Colonial : Experience of Calcutta Jute Mill Workers 1880-1930, Kolkata, 1990.

সংবাদপত্র ও সাময়িকী

৩৫. আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭ জুন ২০১৪, পৃষ্ঠা – ৬
৩৬. Hindusthan Standard
৩৭. The Statesman
৩৮. Census of India 1951, District Handbook, 24 Parganas, A. Mitra, Writer's Building, Kolkata.
৩৯. Labour in West Bengal 1967, Department of Labour, Gov. of West Bengal Writer's Building, Kolkata, Chapter-XIII, p.143

৪০. রায়, স্বপনকুমার। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সরকারি উদ্যোগ, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই, ১৯৯৬।
৪১. চক্রবর্তী, প্রণবেশ। শ্রমিকের নয়, নিজের স্বার্থে শ্রমিক নেতারা 'বিপ্লবী'; দৈনিক বসুমতি, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৫, ন্যাশনাল লাইবেরি, কলকাতা।
৪২. কর, সুমিত। বিশ্বায়ন, আধুনিকতা ও পশ্চিমবঙ্গ। কলকাতা, ২০১২।
৪৩. ঘোষ, অলক। ভারতীয় অর্থনীতি। কলকাতা, ১৯৭৩।
৪৫. ঘোষ, শিবদাস। শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে। কলকাতা, ২০১২।
৪৬. চক্রবর্তী, মধুসূদন। অর্থনীতির প্রথম পাঠ। কলকাতা, ২০১২।
৪৭. ভট্টাচার্য, হরশঙ্কর। ভারতের অর্থনীতি। কলকাতা।
৪৮. তদেব পৃষ্ঠা – ৪৬
৪৯. তদেব পৃষ্ঠা – ৪৭
৫০. শিকদার, শুভেন্দু। 'চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে শ্রমিক'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৯। কলকাতা -২০০৫।
৫১. International Jute Study Group: Carbon Credit of jute and Sustainable Environment; 1, issue 7, June, 2013.
৫২. Singh L K P: Raw Material Base of Jute Industry in India.
৫৩. Worldjute.Com
৫৪. texmin.nic.in
৫৫. website of jute Corporation of India.
৫৬. website of Office of the Jute Commissioner.
৫৭. পাট চাষ, জুট শিল্প ও পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন প্রস্তুতি কমিটি'–র প্রতিবেদন, ২০০৯।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও আঞ্চলিক ইতিহাসের তাত্ত্বিক নির্মাণ

পীযুষ নন্দী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

সারসংক্ষেপ: প্রাচীন যুগের সাহিত্য বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা আসলে ছিল সংগীত। গীতের আবেদন নিয়েই তার আত্মপ্রকাশ। তার পূর্বে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের ধরন অবশ্য আলাদা ছিল। চর্যাপদের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ধরন যেমন পালটে যাচ্ছে, অপরদিকে বিষয়বস্তু বা ভাবনার দিক থেকেও চর্যাপদের পূর্বে বাংলার ভৌগোলিক পরিসরে রচিত সংস্কৃত সাহিত্য বা অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তার পার্থক্য তৈরি হচ্ছে। এই পার্থক্য ভিন্ন ঘরানার সাহিত্য বলে নয়, আসলে সংস্কৃত সাহিত্যে সার্বভৌমত্ব ছিল, একটি ভারতীয় প্রেক্ষাপট ছিল। চর্যাপদের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলা জনজাতির জীবন প্রথম উঠে এল অর্থাৎ ভারতীয় প্রেক্ষাপট ছেড়ে সাহিত্য একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসরের মানুষদের কথা বলতে শুরু করল। এই মানুষজন আসলে সাধারণ মানুষ, উক্ত সময়ের প্রান্তিক মানুষ। এই পথ ধরেই মধ্যযুগের সাহিত্যে এই ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। আধুনিক কালে বা উনিশ শতক জুড়ে বাঙালির জাতিগত আবেগ বা জাতি হিসেবে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার সময়। তাই আজকে আমরা বাঙালির পরিচয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে উনিশ শতকে গিয়ে থেমে যায়। কিন্তু এর বাস্তবিক ইতিহাস তো চর্যাপদ অবধি বিস্তীর্ণ। চর্যাপদে যে জনজাতির কথা উঠে এসেছে তুর্কি আক্রমণের পরে সেই জাতিকে ভিত্তি করেই সমাজ নির্মাণের প্রচেষ্টা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে তারই ইতিহাস রয়েছে। আমরা ভাবতে চেয়েছি বাঙালির ইতিহাস দীর্ঘ, যদিও তখন 'বাঙালি' কনসেপ্ট দানা বাঁধেনি (সেই সময়কার বাংলা ভাষায় কথা বলা বা বাংলা ভাষার ভৌগোলিক পরিসরে বসবাসকারী জঞ্জাতিকে আমরা বাঙালি বলেই উল্লেখ করবো)। চর্যাপদ থেকেই বাঙালির ইতিহাসের সূচনা- আর এটিকে একপ্রকার আঞ্চলিক ইতিহাস বলতে পারি। কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্যে জাতি হিসেবে বাঙালির কী পরিচয় তৈরি হয়েছিল, তার ইতিহাসই বা কোথায়? – এই প্রশ্নগুলি আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা ধারাবাহিকভাবে এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে সচেষ্ট থাকবো।

সূচক শব্দ: গান, সাহিত্য, চর্যাপদ, প্রাচীন-যুগ-সাহিত্য, আর্য, অনার্য, ব্রাহ্মণ্যবাদী, নিম্নবর্গ, বাঙালি, আঞ্চলিক, ভৌগোলিক, ইতিহাস।

'বাঙালি'- এই ভাবনাটি তথাকথিত আধুনিক, মানে আমি বলতে চাইছি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের কথা। উনিশ শতকেই বাঙালির জাতিগত আত্মপরিচয়ের সূচনা। তৎপূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে একটি ভাষা গোষ্ঠীর বা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত জনজাতির পরিচয়ই মুখ্যত উঠে এসেছে। প্রাচীন(এখানে প্রাচীন মানে প্রাগাধুনিক অর্থে) বাংলা সাহিত্যে 'বাঙালি' হিসেবে কোনো ভাবনা যে দানা বাঁধেনি তা বলাইবাহুল্য। তার পূর্বকালে আধুনিক ভাবনায় যে বাংলা বা তার ভৌগোলিক পরিসরে রচিত সাহিত্যে, নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন-জাতির সার্বিক পরিচয়ই বা কোথায়? প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের পাঠ বা সেই সাহিত্যের আবেদন, যে প্রেক্ষিতে আজ আমাদের কাছে চর্চিত হচ্ছে, স্বরূপগতভাবে উক্ত সাহিত্যের ধরন কি তাই ছিল? মধ্যযুগের সাহিত্যকে আমরা মধ্যযুগের গান বলে চিহ্নিত করলে বোধহয় খুব ভুল কিছু হবে না। প্রাচীন সাহিত্যের প্রকরণ সম্পর্কিত সুকুমার সেনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন-

"পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্য ত্রিধারায় প্রবাহিত। প্রথম গীতিকবিতা, দ্বিতীয় পৌরাণিক গেয় অথবা পাঠ্য আখ্যায়িকা, তৃতীয় অ-পৌরাণিক গেয় কবিতা-আখ্যায়িকা।"[১]

পৌরাণিক গেয় বা পাঠ্য আখ্যায়িকা হলেও, পাঠ্য হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা মুষ্টিমেয় মানুষদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং অবশ্যই তার বিষয় পৌরাণিক। এই বিভিন্ন রকমের সাহিত্য (আসলে এগুলি গান হলেও, আমরা অভ্যস্ত ধারণায় সাহিত্য হিসেবেই উল্লেখ করবো) একাধিক ধর্মীয় গোষ্ঠীর দ্বারা রচিত ও প্রচারিত হত।[২] তাহলে যে ধর্ম, যে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল, নির্দিষ্ট সাহিত্যে সেই ধারার পরিচয় ফুটে উঠত। চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতি থেকে এই বিষয়টি বোঝাই যায়। কিন্তু এসবেরও পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যকে কি এই ধারার পূর্বসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়? সংস্কৃত সাহিত্যে একটি সার্বভৌমত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গদ্য ও পদ্যে রচিত সেই সাহিত্য শুধু গীতিনির্ভর ছিল না, পাঠ নির্ভরও ছিল, যদিও সাধারণ মানুষ কি পঠন চর্চায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? এই প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যে একটি 'আঞ্চলিক' ইতিহাস যে ভাষা পাচ্ছে, এমনটা ভাবাই যায়। এই সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা ও আবেদনও পালটে যাচ্ছে। 'চর্যাপদ' দিয়েই তার সার্থক সূচনা।

চর্যাপদের আগে বা সমকালে রচিত সাহিত্যে বাংলা বা বাঙালি প্রায় কেউই ছিল না বললেই চলে। বাঙালির কথা মানে তাঁর জীবন-ভাবনা-সংস্কৃতির বিচিত্র প্রসঙ্গ প্রথম পাওয়া গেল 'চর্যাপদ' শীর্ষক পাঠ্যটিতে। এ দিক থেকে বাংলায় রচিত প্রথম আঞ্চলিক সাহিত্য হিসেবে 'চর্যাপদ'এর প্রসঙ্গ নিছক অমূলক নয় অবশ্যই। 'আঞ্চলিকতা'কে এভাবে বোঝানো যায়, বৃহৎ ক্ষেত্র থেকে সীমিত পরিসরে অবতরণ- এমনটা ভাবা খুব

অপ্রাসঙ্গিক নয়। সেই বিশেষ স্থানের উল্লেখে তার জনজাতি, জীবন-ভাবনা, কর্ম প্রচেষ্টা সব কিছুই ধরা পড়ে খুব স্বাভাবিক নিয়মে। আধুনিক ভাবনায় সেই অঞ্চলের প্রেক্ষাপট বিশেষ পাঠ্যের কাহিনি ও চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠল কিনা মূলত সেটাই বিচার্য। আমরা আধুনিক ভাবনায় আঞ্চলিক উপন্যাসকে যেভাবে বুঝেছি, সবক্ষেত্রে আমরা সেই ভাবনায় আঁটকে থাকবো না। এই হিসেবে 'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিক ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে– একথা বলাইবাহুল্য। জয়দেবের আগে রচিত কোনো সাহিত্যই ঠিক বাঙালি ঘরানার নয়, সেই সময়পর্বের রাজসভার কবিরা পৃষ্টপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে নব রসের সাধনা করেছেন। বাঙালির জীবন-যাপন, ভাবনা-সংস্কার, দুর্গতি-আনন্দানুভূতি—এসবের বাইরে ভারতীয় সনাতন হিন্দু-পুরাণ কথাই সাহিত্যের আঙিনায় মুষ্টিমেয় ব্যষ্টির কথা হয়ে থেকেছে।

সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য ছিল মূলত ভারতের সম্পদ, ভাবনায় ও চরিত্রে বাংলার বাইরের বিষয়ও সেখানে অবাধে স্থান পেয়েছে। তাই নির্দিষ্ট করে বাঙালির পরিচয় সেখানে নেই, থাকলেও সেগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে। 'চর্যাপদ' এর পূর্বে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় রচিত সাহিত্য বা সেই সময় পর্বে বাংলায় রচিত সাহিত্যের মূল বিষয় ছিল প্রেম, ধর্মীয় আখ্যান ও ঘরোয়া কিছু কাহিনি। বাঙালির সেন্টিমেন্ট সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে 'সুভাষিতরত্নকোষ' সংকলন গ্রন্থের একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হল।

"কোহয়ং দ্বারি হরিঃ প্রজাহুপবনং শাখামৃগেণাত্র কিং
কৃষ্ণোহহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ।
মুগ্ধেহহং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবাং
ইথং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ।।"

অর্থাৎ দ্বারে ও কে? হরি। উপবনে যাও, বানরের এখানে প্রয়োজন কি? প্রিয়ে আমি কৃষ্ণ। বড় ভয় করিতেছে। বানর কি কালো হয়? বোকা মেয়ে, আমি মধুসূদন। যাও তবে ফুল ফুটিয়াছে যে লতায়।[৩]

রাজসভায় রচিত সাহিত্যের কথা তো বলাইবাহুল্য, রসপ্রবণতাই সেই সাহিত্যের মূল আধেয়। সাধারণ জনজীবনের কোনো পরিচয় সেখানে নেই। এসবের বাইরে এসে 'চর্যাপদ' ই প্রথম বাংলায় আঞ্চলিক ভাষার ও ভাবনার সাহিত্য হয়ে উঠল।

বাংলা ছিল মূলত অনার্যদের বাসভূমি। আর্যদের আগমনে তাঁদের জীবন বৃহৎ জগৎ সংসারের সান্নিধ্যে এলো ঠিকই, কিন্তু উপেক্ষার ভারে তারা নিজেদের অবস্থানও হারিয়েছিল। তুর্কি আক্রমণোত্তর মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এই চিত্রই প্রেক্ষাপট ও ফলকথা হিসেবে উঠে এসেছে।[৪] গুপ্তোত্তর যুগে উত্তর ভারত থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমনের ফলেই বাংলার জন-জীবনে ধর্মীয় ও সামাজিক ভেদরেখা স্পষ্ট হয়েছে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে রয়েছে মিশ্র বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয়, দুই ঘরানার দ্বন্দ, সংস্কৃতি, ভাব-ভাবনা সেখানে খুবই স্পষ্ট আকারে ধরা দিয়েছে।[৫] অখন্ড বাঙালি হয়ে

উঠতে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে, তাই স্বভূমি ছেড়ে মধ্যযুগীয় সাহিত্য সর্বকালীক ও সর্বভূমিক হয়ে উঠতে পারেনি, আঞ্চলিকতাতেই তার অবস্থান। দুই ভিন্ন জনজীবনকে বাংলার আঞ্চলিক ভাবনায় সম্পৃক্ত করে তুলতেই মধ্যযুগীয় লেখকদের কাল অপসৃয়মাণ হয়ে গেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'মঙ্গলকাব্য' প্রভৃতি এই ভাবনাতেই রসদ জুগিয়েছে। তাই বলতে পারি এসকল সাহিত্য এক অর্থে আঞ্চলিক, আবার ভিন্ন জনজীবনের চাপে পড়ে সীমানা অতিক্রম করার সাহস দেখিয়েছে। এ দিক থেকে 'চর্যাপদ' এসব সমালোচনার উর্দ্ধে, তৎকালীন বাংলার প্রকৃত জনজীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে 'চর্যাপদ' অকৃপণ।

একালের ভাবনায় বাঙালির বিভিন্ন জীবন ভাবনার প্রেক্ষাপটে বিশেষ স্থানের জীবনচর্চা সাহিত্যে উঠে এলে তা আঞ্চলিক নামে ভূষিত হয়। 'চর্যাপদ' এর সময়কালে বাঙালির সীমানা ও ভাবনা বহুধা বিস্তৃত ছিল না বা বলা ভালো 'চর্যাপদ'এ আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের আওতার বাইরে। 'চর্যাপদ' এ উঠে আসা জীবনভাবনাকেই আমরা বাঙালির অখণ্ডিত জীবন চিত্র হিসেবে ধরে নিতে পারি। সেই সময়কালে বাঙালির সংস্কৃতি ও জীবন যে খুব উন্নত ছিল না তার বাস্তবতা, চর্যার পদগুলির মধ্যে রয়েছে। এর বাইরে অবশ্যি রাজসভাকেন্দ্রিক অর্থাৎ উচ্চ ঘরানার একটা সমাজ অস্তিত্বশীল ছিল যাকে আমরা রাজসভার সাহিত্য বলে জানি— এটিই মূল ধারা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও বলা যায়, 'চর্যাপদ' রাজসভার বাইরের সাহিত্য, রাজসভা থেকে শত যোজন দূরে অবস্থানকারী নিম্নবর্গীয় মানুষদের(এঁদের আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি, প্রাচীন-মধ্যযুগে এরাই ছিলেন প্রান্তিক) জীবন প্রাধান্য পাওয়ায় উক্ত পদগুলি আঞ্চলিক রূপ পেয়েছে। তথাকথিত নিম্ন ও অখণ্ডিত বাঙালির চিত্রকে দেখানোর যে ভাবনাগত পরিবর্তন আলোচ্য পাঠ্যটিতে ফুটে ওঠে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতেই পারি 'চর্যাপদ', 'পরিবর্তিত ভাবনার আঞ্চলিক রূপ' অথবা বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'আঞ্চলিক সাহিত্য'। আর এই 'গান' বা 'সাহিত্য' যাই বলি না কেন, তার মধ্য দিয়েই আঞ্চলিক ইতিহাস নির্মাণের অবকাশ তৈরি হয়েছিল।

চর্যাপদে মূল জীবনধারার অর্থাৎ উচ্চ জনজাতি ও ব্রাহ্মণ্যবাদের কোনো প্রসঙ্গ নেই, ধনীদের বিলাস বহুল জীবনের কোনো পরিচয়ও নেই, আছে দরিদ্র ও নিম্নবর্গীয় সমাজের পরিচয়—যারা তথাকথিত মূল জীবনধারার বাইরে অস্পৃশ্য ও অচ্যুত ছিল। তাঁদের জাতি পরিচয় ছিল ডোম, চণ্ডাল, শবর ইত্যাদি। চর্যাপদ এই পিছিয়ে পড়া জনজীবনের চিত্রে পূর্ণ। এঁদের বাসস্থানও তথাকথিত মূল সমাজের বাইরে ছিল। গ্রাম্য সীমান্ত, পাহাড়ের উঁচু টিলা প্রভৃতি ছিল মূলত এঁদের বসবাসের স্থান। চর্যাপদে এর বিস্তৃত বর্ণনা খুঁজে পেতে প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না।

"নগর বাহিরেঁ ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।"[৬]
অর্থাৎ নগরের বাইরে ছিল ডোমেদের কুঁড়ে।
"উঁঞ্চা উঁঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।"[৭]
অর্থাৎ উঁচু পাহাড়ের উপরে শবরেরা বাস করত।
"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।"[৮]
অর্থাৎ টিলার উপরে মোর ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই।

সমাজের বাইরে বিশেষ স্থানে বসবাস করে নির্দিষ্ট জাতি হিসেবে এঁদের জীবনে আঞ্চলিকতার প্রভাব খুবই স্পষ্ট। সমাজের বিভিন্ন নিম্ন পেশাদারি কর্মের মধ্য দিয়ে এই মানুষেরা জীবিকা নির্বাহ করে। যার মধ্যে রয়েছে মাঝি (৮, ১৩, ১৫ নং পদ), শবর বা ব্যাধ (২৩, ২৮ ৫০ নং পদ), ডোম (১০ নং পদ), শুঁড়ি অর্থাৎ যে মদ তৈরি করে (৩ নং পদ) এছাড়াও একাধিক পেশার উল্লেখ পাওয়া যায়, এগুলি সবই সমাজের একটি বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের জীবিকা হিসেবে পরিচিত। একালের আঞ্চলিক সাহিত্যেও জনজীবনের এমন অনুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। স্থান ও কাল বিশেষে সেই নির্দিষ্ট জনজাতির উপর সেই স্থান ও কালের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। চর্যাপদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থানের প্রভাব হয়ত বিশেষভাবে লক্ষগোচর হয় না, তারও একটি নির্দিষ্ট কারণ হয়ত তৎসময়ে সারা বাংলাজুড়ে মূলত দুটি জীবনধারা বর্তমান ছিল। তারই একটির ভাব ও ভাবনাই আলোকিত হয়েছে পুরো পাঠ্য জুড়ে। আলোচ্য পাঠ্যটিতে উঠে আসা জনজাতির বিশেষ বেশভূষারও উল্লেখ রয়েছে একাধিক চর্যাগীতির মধ্যে। শবর কন্যাদের বিশেষ সাজ ছিল মাথায় ময়ূর পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জের মালা ও কানে কুণ্ডল। এছাড়াও ব্যবহার্য দ্রব্যে পাওয়া যায় লোকভাবনার পরিচয়। চর্যাপদে উঠে আসা জনজাতির সামাজিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আজকের বিচারে লোক বিশ্বাস-সংস্কার-উৎসব হিসেবেই পরিগণিত হচ্ছে। সাধারণভাবে স্থানবিশেষে যদি কোনো জাতির ভাবনা ও পরিচয় সাহিত্যে উঠে আসে সে ক্ষেত্রে তা লোকসংস্কৃতির বিষয়ের আওতাধীন হয়। সেক্ষেত্রে চর্যাপদ কোনো স্থানবিশেষের রচনা না হলেও বিষয়ের সামাজিকতার মধ্যে গণের আন্তরিকতা ও মাটির টান অনুভব করা যায়। স্থানভেদে তা অবশ্যই ভাবনার আঞ্চলিক রূপ হয়ে উঠতে পেরেছে এবং তা লোকসংস্কৃতির উপাদানে সমৃদ্ধ। সেকালের নিম্নবর্গীয় সমাজে তাঁদের উৎসব ও আমোদ-প্রমোদে নাচ ও গান ছিল একমাত্র আনন্দের উপকরণ। তাঁদের সমাজে স্ত্রী মানুষেরা মদ তৈরিতে ছিল সিদ্ধহস্ত এবং প্রত্যেক উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁরা একত্রে মদ্যপান করত— এটাই ছিল তাঁদের বিশেষ রীতি। এছাড়াও এই সমাজের নারীদের যে কোনো পুরুষের সঙ্গেই রাত কাটানোর একটা বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল। বিবাহেরও কিছু নির্দিষ্ট সংস্কার শুধুমাত্র এঁদের মধ্যেই লক্ষ করা গেছে। সমসাময়িক অন্য কোনো সাহিত্যে এই বিশেষ সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিয়েতে যৌতুক প্রথা ছিল, বরযাত্রীরা নাচগান বাদ্য

সহযোগে বিয়ে করতে যেত। তাঁদের সমাজে যৌনতার এক আদিম প্রথা অবাধে ক্রিয়াশীল ছিল। পাঠ্যভুক্ত একাধিক পদে তার প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে তার একটি ছোটো তালিকা উদ্ধৃত হল।

"তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া"[৯]

অর্থাৎ আমি তোমার জন্যই এই নটশয্যা ত্যাগ করেছি।

"সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।"[১০]

অর্থাৎ শবর ভুজঙ্গ নৈরামণি নারীকে নিয়ে প্রেম বিভোরে রাত কাটালেন। জীবনাচরণের এই রীতি কিছু বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই লক্ষগোচর হয়, যেগুলি সাধারণত মূল সমাজের বাইরে আঞ্চলিক জাতিগত সংস্কার অথবা নির্দিষ্ট এলাকাবিশেষে কিছু জনজাতির মানুষেরাই এই ধরনের প্রথায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ' গ্রন্থে চর্যাপদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বোঝাতে গিয়ে বলেছেন—

"...... এই ইতিহাসের একদিকে রয়েছে বাংলার আর্যপূর্ব সংস্কৃতি ও সমাজবোধের সহিত আর্য সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তার বিরোধ ও সংঘাত।"[১১]

'আর্য' ভাবনাটির জটিলতায় প্রবেশ না করে এখানে আমরা দুটি গোষ্ঠীর বা সংস্কৃতির বা জাতির বিরোধের প্রসঙ্গের দিকে নজর দেব। তৎকালীন সময়ে বা তার পূর্ববর্তী সময়ে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসরে দুটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ভাবা যেতে পারে- একটি প্রধান (অরবিন্দ বাবুর কথায় আর্য, আমরা সেটিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ বলে চিহ্নিত করবো) আর একটি অ-প্রধান (এটিকেই আমরা আঞ্চলিক বলছি এবং অরবিন্দ পোদ্দারের ভাবনার যা অনার্য, আমাদের কল্পনায় তা নিম্ন বর্ণের জাতি মানে চর্যাপদে উল্লিখিত জাতি)। এই ছিল সমকালীন ইতিহাসের তত্ত্ব, কিন্তু তুর্কি আক্রমণোত্তর কালে এই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে এক অখণ্ড সম্প্রদায় গড়ে তোলার তাগিদ অনুভূব করেছিলেন বলে জানা যায়। আর তার রূপায়ন বা সামাজিক স্থিতাবস্থা গড়ে তোলার ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা শুরু হল তুর্কি আক্রমণোত্তরকালীন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। তাই পরবর্তী সাহিত্যে সিন্থেসিস রূপে এক মিশ্রিত 'বাঙালি'(জনগোষ্ঠী) আত্মপ্রকাশ করলো। এক অন্য সংস্কার, রুচি, সংস্কৃতি ও ভাবধারা নিয়ে শুরু হল দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাসের পূর্বে বাংলার স্থিতাবস্থা রূপে আর্য ও অনার্যের (আবারও আমরা এই শব্দদুটিই প্রয়োগ করলাম, এক জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত আমরা এই শব্দ দুটি ব্যবহার করবো) ভিন্ন মেরুর সহাবস্থানই ছিল একমাত্র সামাজিক কাঠামো। এই আর্যপূর্ব সংস্কৃতি ও সমাজই হল চর্যাপদের জনজীবন। বাংলার এই প্রকৃত জনসমাজের জীবনচিত্র নিয়ে লেখা বাংলা দেশের প্রথম সাহিত্য 'চর্যাপদ'। বাংলাদেশে এর পূর্বে রচিত সাহিত্যের ভাষাও ছিল সংস্কৃত ও

প্রাকৃত। কোনো ভাষায় জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে তা নির্দিষ্ট স্থানে বাঁধা পড়তে থাকে। পরিবর্তনের ধারায় তাই প্রত্যেকটি আধুনিক ভাষা প্রথম পর্বে আঞ্চলিক। আঞ্চলিক বাংলা ভাষার সাহিত্য 'চর্যাপদ'। সময়ের অনতিক্রমে অবশ্যই তা আর আঞ্চলিক থাকে না। তাই যে কোনো আধুনিক ভাষার পরবর্তীকালীন সাহিত্য আর আঞ্চলিক থাকে না। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও একথা যথার্থ ভাবেই ফলপ্রসূ। ভাষার প্রথম পর্বের সাহিত্যে, উক্ত ভাষার জনজাতির প্রসঙ্গ কতকটা আঞ্চলিক ভাবনা থেকেই উঠে আসে। প্রথম স্তরে প্রাদেশিক ভাষাগুলি পারস্পরিক দূরত্বের সঙ্গে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে হাজির হয়। মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে সুকুমার সেন অলঙ্ঘনীয়। তাঁর ভাবনা থেকেও এই সূত্রের অনুসন্ধান করা যায় এবং এই আঞ্চলিকতা নির্মাণের কারণ হিসেবে তাঁর বক্তব্যটিকে প্রমাণ হিসেবে ধরলে খুব ভুল হবে না।

"...প্রাদেশিক পরিবেশ ঠিক একই রকম ছিল না, লোকায়তিক ঐতিহ্যেও কমবেশি বিভিন্নতা ছিল,....এই সব কারণে এবং স্থানীয় ভাষার শক্তি ও প্রবণতা অনুসারে প্রাদেশিক সাহিত্য-রীতি ক্রমশ পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল।"[১২]

প্রাচীন যুগের প্রাদেশিক জাতির প্রবণতা(আঞ্চলিক) অনুসারেই চর্যাপদের(প্রাদেশিক সাহিত্য) নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। চর্যাপদের পূর্বে রচিত সাহিত্যে দেখা যায় রসের আধিক্য আর সদ্য উদ্ভূত আধুনিক ভাষার প্রথম পর্বে রচিত সাহিত্যে দেখা যায় জীবনের আধিক্য। চর্যাপদকে আঞ্চলিক সাহিত্য হিসেবে দেখার ভাবনাকে নস্যাৎ করার একাধিক যুক্তি উঠে আসবে, কিন্তু সাধারণ ভাবনায় প্রাথমিক ভাবে চর্যাপদ কে আঞ্চলিক সাহিত্য হিসেবে ভাবা একেবারে অযৌক্তিক নয়। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আঞ্চলিক সাহিত্যে উঠে আসে বিভিন্ন জনজীবনের ইতিহাস, তার কারণ আজকের পৃথিবীতে জনজীবনও বহু-বিচিত্রময়। যেমন নাগরিক জীবন, গ্রাম্য-জীবন, প্রান্তিক জীবন, নিম্ন বর্গীয় জীবন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিই চর্যাপদকালীন সময়ে জনজীবনের এহেন বিচিত্র বর্গীকরণ ছিল না। সমাজের মূল ধারার বাইরে অবহেলিত, বঞ্চিত একটাই জাতি ছিল যা আমাদের আলোচিত পাঠ্যে প্রসঙ্গে-অপ্রসঙ্গে ধরা পড়েছে। 'চর্যাপদ' আঞ্চলিক সাহিত্য হয়ে উঠতেই পারে, কিন্তু আমরা বুঝতে চেয়েছি অন্য প্রেক্ষিতটিকে। চর্যার পদগুলির মাধ্যমে একটি আঞ্চলিক ইতিহাস তৈরি হচ্ছে, যেটি বাংলা ভাষাকে ঘিরে একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস। এই ইতিহাস মূর্ত হচ্ছে মধ্যযুগের সাহিত্যের (মঙ্গলকাব্য, জীবনী সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য) মাধ্যমে। 'চর্যাপদ'এ বা তৎকালীন সময়ে এই আঞ্চলিকতার গড়ন সম্পর্কে বা আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক ও যথার্থ।

"অষ্টম-নবম শতক থেকেই দেশের সর্বত্র আঞ্চলিক সত্তাই প্রাধান্য পাচ্ছিল, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই। আকবর বাদশাহ থেকে শুরু করে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত যে সুবিস্তীর্ণ মুঘল সাম্রাজ্য তা-ও এই সর্বভারতীয় স্বপ্ন কল্পনাকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

দেশের মানুষের চিত্ত ও চেতনায় দেশের ছোট-বড় বিভিন্ন অঞ্চলগুলিই ছিল দেশ; ভারতবর্ষ বলে একটা দেশও যে না-ছিল এমন নয়, কিন্তু সে তো একটা দূরাগত ধ্বনিমাত্র।”[১৩]

এই উক্তির সাপেক্ষে মূলধারা বলতে আমরা সমগ্র দেশকেই বুঝতাম, প্রাদেশিক ভাষায় নিজেদের কথা বলার সূচনাটা আসলে আঞ্চলিক ভাবনা থেকেই উঠে আসে এবং চর্যাপদের পূর্ব সাহিত্য সেই সমগ্র দেশ বলতে যা বোঝায় সেই ভাবনাকেই লালিত করে এসেছে। আমরা আসলে ভাবতে চেয়েছি ‘চর্যাপদ’ থেকেই আধুনিক ভাবনা জাত ‘বাঙালি’র স্বরূপগত ইতিহাস নির্মাণের সূচনা হয়েছিল। বাঙালির (বাংলা ভাষাভাষী বা ভাষার ভৌগোলিক পরিসরে বসবাসকারী) জাতিগত পরিচয় ও সমাজের অভ্যন্তরীণ গঠনকে বুঝতে হলে আমাদের উক্ত সময় থেকেই অনুসন্ধিৎসু হতে হবে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর একাধিক প্রবন্ধ জুড়ে এই ইতিহাসের গুরুত্বকে স্বীকার করে গেছেন।

“এ দেশে ইংরেজদের শুভাগমনের পূর্বে বাংলাদেশ বলে একটা দেশ ছিল, আর সে দেশে যে মানুষ ছিল, আর সে মানুষের মুখে যে ভাষা ছিল, আর সে ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হত, এই সত্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়াইএই নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।”[১৪]

মধ্যযুগের সাহিত্যে উক্ত ইতিহাসের তত্ত্বগত নির্মাণ হয়েছে— বাঙালির আত্মভাবনা-সংস্কৃতির অনুসন্ধান করতে হলে এই ইতিহাসকে উপেক্ষা করা যায় না। মধ্যযুগের সাহিত্য জুড়ে বাঙালির জাতিগত পরিচয়ের কোন ইতিহাস তৈরি হল? আজকের ইতিহাস জুড়ে তার পরিচয়ই বা কোথায়? এসব অনুসন্ধানের পথ অবশ্য খোলা রইল। এবিষয়ে আমাদের বোঝাপড়ার প্রস্তুতি কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ।

টীকা উৎসনির্দেশ:

১. দ্রষ্টব্য. সুকুমার সেন,‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ প্রথম খন্ড, আনন্দ, দ্বাদশ মুদ্রণ ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১০৩।

২. এই অংশের জন্য দ্রষ্টব্য. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৮।

৩. শ্লোক ও ব্যাখ্যা উভয়ই সুকুমার সেন থেকে গৃহীত। দ্রষ্টব্য. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮।

৪. এই আর্য-অনার্যের ধারনাটি খুবই জটিল ও অস্পষ্ট। আসলে অনার্য অর্থে নিম্নশ্রেণি ও আর্য বলতে ব্রাহ্মণ্যবাদী বোঝানোটাই সঠিক বলে আমরা মনে করি। কারণ বাস্তবে আর্য-অনার্যের মিশ্রণ কবে হয়েছে, তার ইতিহাস অনুসন্ধান করা মুশকিল। বাংলায় কারা বাস করতেন বা এখানে অবিমিশ্র আর্যরা কোনদিন এসেছেন নাকি মিশ্রিত আর্যদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, সে ব্যাপারেও সঠিক করে

কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। সুকুমার সেনও আর্য-অনার্যের ব্যাপারটিকে নস্যাৎ করে গেছেন। দ্রষ্টব্য. প্রাগুক্ত, তথ্যসূত্র-২, পৃষ্ঠা- ৯০।

৫. এই অংশের জন্য বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯।

৬. দ্রষ্টব্য. নির্মল দাশ, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', ডোম্বী রচিত, ১০ নং পদ। দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৪ পৃষ্ঠা- ১৪৩।

৭. দ্রষ্টব্য. প্রাগুক্ত, শবরপাদ রচিত, ২৮ নং পদ। পৃষ্ঠা- ১৯০।

৮. দ্রষ্টব্য. প্রাগুক্ত, টেণ্টণপাদ রচিত, ৩৩নং পদ পৃষ্ঠা- ২০০।

৯. দ্রষ্টব্য. প্রাগুক্ত, কাহ্নপাদ রচিত , ১০ নং পদ, পৃষ্ঠা- ১৪৩।

১০. দ্রষ্টব্য. প্রাগুক্ত, শবরপাদ রচিত, ২৮ নং পদ, পৃষ্ঠা- ১৯০।

১১. দ্র. অরবিন্দ পোদ্দার, 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ', পুস্তক বিপণি, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১।

১২. দ্র. সুকুমার সেন,'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খন্ড, আনন্দ, দ্বাদশ মুদ্রণ ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৮৫।

১৩. দ্র. নীহাররঞ্জন রায়, 'ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১৪৯।

১৪. দ্র. প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'ভারতচন্দ্র', সুমিতা চক্রবর্তী সম্পা., প্রজ্ঞাবিকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২৫৪।

গ্রন্থঋণ:

১. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, গদ্যসমগ্র ১, প্রতিভাস কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রবাসী পত্রিকা : ১৯৩১-১৯৪২ খ্রিঃ

নিতাই গায়েন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ : আলোচ্য নিবন্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবাসী পত্রিকার ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। সমকালীন রাজনীতিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রবাসী পত্রিকার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' বিভিন্ন সংখ্যায় নিয়মিত ভাবে আলোচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। কাল-পরিবর্তনের সাক্ষী ইতিহাস। বিংশ শতকের প্রথমে যে সুবিশাল ঘটনা তরঙ্গাবলীতে উত্তাল হয়েছিল বাংলা তথা ভারতবর্ষ তার বিবরণ আছে ইতিহাসের যে কোনও প্রামাণ্য পুস্তকে। কিন্তু 'প্রবাসী' পত্রিকার 'বিবিধ প্রসঙ্গ' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এক অর্থে ইতিহাস। বলা যায় চলমান ঘটনা প্রবাহের দিনলিপি। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৯৩১-১৯৪২ খ্রিঃ পর্যন্ত এক দীর্ঘ সময়কালের রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ 'প্রবাসীতে' পাওয়া যায়। স্বাধীনচেতা ও দেশ ভক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ থেকে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা লাভের বিভিন্ন প্রচেষ্টা বিভিন্ন সংখ্যায় পরিবেশন করেছেন। মূলতঃ এই কালপর্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে 'প্রবাসী' পত্রিকা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা এই পত্রিকায় বিশদভাবে দেখানো হয়েছে।
সূচকশব্দ: বিবিধ প্রসঙ্গ, গোলটেবিল, শীর্ষক, য়ুনিটি, ঘূর্ণায়মান, বাঁটোয়ারা, সাম্প্রদায়িক, সোসাইটি, ন্যাশনালিস্ট, জমিদার সভা, বৈকল্পিক, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস, ভেদ বুদ্ধি, রাজবন্দী, কব্জাগত, ওয়ার্কিং, বিপ্লবী কিংবদন্তী।
ইংরেজ শাসন থেকে দেশকে মুক্তির বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও জাতীয়তাবাদে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা 'প্রবাসী'র পাতায় পাতায় পরিবেশিত হয়েছিল। এখানে ব্রিটিশের বিভিন্ন অত্যাচার অনাচার, শোষণের যে কঠোর সমালোচনা হয়েছিল তার বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকাকে জনগণের রাজনীতি সচেতন করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' আলোচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এই রকম কিছু ঘটনার মধ্যে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে 'গান্ধী আরউইন চুক্তি'। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ 'প্রবাসী'র শ্রাবণ সংখ্যায় 'বঙ্গে গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ' শীর্ষকে পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে কোন তদন্ত হবে না। গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে যা স্থির হয়েছিল তা 'প্রবাসী' তে প্রকাশিত হলে দেশের সর্বত্র বিরূপ ফল ও

প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। 'প্রবাসী' পত্রিকার মন্তব্য যে 'বঙ্গদেশে যে সব রাজনৈতিক বন্দী আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বল প্রয়োগের অপরাধে অপরাধী কিনা তা নির্ধারিত হয় না। এর কারণ কি এবং কংগ্রেসও এদের সম্পর্কে উদাসীন'।[১]

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে বিবৃত করা হয় যে 'কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের প্রথম চুক্তি অনুসারে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্ব বন্ধ হয়ে আছে।'[২] 'প্রবাসী' পত্রিকার মতে 'ঐ চুক্তির শর্তগুলি দেশের মানুষের পক্ষে সন্তোষজনক হয়নি। কংগ্রেস ও সরকারের দ্বিতীয় চুক্তিতে গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে বিলাত যেতে পেরেছেন, কিন্তু 'প্রবাসী' পত্রিকার বিবেচনায় এক্ষেত্রেও রাজনৈতিক চালে, ডিপ্লোম্যাটিক দ্বন্দ্বে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে।'[৩] 'প্রবাসী' ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ আশ্বিন সংখ্যায় মন্তব্য করেছে যে, 'গান্ধীজী রয়টারের সংবাদদাতাকে বলেন যে, তিনি ভারতের সমুদয় দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন এবং প্রয়োজনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংস্রব ত্যাগ করবেন। গোলটেবিল বৈঠকে এ সম্পর্কে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হবেন।'[৪] কিন্তু 'প্রবাসী' পত্রিকা আশঙ্কা করেছে যে 'গান্ধীজী যেসব ভারতীয় লোকের দ্বারা বেষ্টিত থাকেন, তাঁদের প্রভাব থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবেন।'[৫] ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে 'গান্ধীজীর গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়াকে ভালো বলা হয়েছে। কিন্তু একথা বলা হচ্ছে না যে ভারতের স্বাধীনতার দায়িত্ব ইংরেজদের তিনটি দল মেনে নেবে, এরূপ আশাবাদী নন। তবে গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে ব্রিটিশকে অবজ্ঞা ও আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। আলোচনার ফলাফল যাই হোক না কেন, তার প্রভাব পৃথিবীকে প্রভাবিত করবে'।[৬] 'প্রবাসী' ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় 'মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যাবর্তন' শীর্ষকে 'মহাত্মা গান্ধী ভারতের পক্ষ থেকে বিলাতে পূর্ণ স্বাধীনতার যে দাবী করেছেন 'প্রবাসী' তা সমর্থন করেছে।'[৭] ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় 'প্রবাসী' মহাত্মা গান্ধীর বিলাত থেকে ফিরে আসা সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, 'গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠক থেকে খালি হাতে ফিরে এসেছেন একথা বললে ভুল হবে। গান্ধীজীও বিজেতা মনে করেন না। বিলাতে থাকাকালীন তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় দাবি পৃথিবীর দরবারে উপস্থিত করেছেন। শুধু তাই নয়, ইংরেজ রাজকীয় দরবারে নগ্নপদকটি পরিহিত মানুষের প্রবেশ ও সমাদর লাভ অভূতপূর্ব। এক্ষেত্রে তাঁর চরিত্র জয়যুক্ত হয়েছে।'[৮] 'প্রবাসী'তে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ সংখ্যায় 'হিজলীর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করা হয়।'[৯]

'প্রবাসী' ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ ১৯৩৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের স্বরাজ প্রাপ্তির কোনোই সম্ভাবনা নেই বলে মন্তব্য করেছে।'[১০] ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী'র পৌষ সংখ্যায় গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে দুটি মন্তব্য যথা 'গোলটেবিলের অর্থ' এবং 'গোলটেবিল বৈঠক ও স্বরাজ' শীর্ষকে প্রকাশিত হয়েছে।'[১১]

প্রথমটিতে আমেরিকার শিকাগো শহর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'য়ুনিটি' পত্রিকার সম্পাদক হোমস গান্ধীজীকে বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ বলেছেন। গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে ব্যঙ্গচ্ছলে বর্ণিত হয়েছে 'এটি কেবলই চক্রাকারে ঘুর্ণায়মান, কোনো একটি লক্ষস্থলে উপনীত হইতেছে না।'[১২] 'প্রবাসী' পত্রিকার মন্তব্য 'ব্রিটিশ সভ্যদের সম্বন্ধে আমেরিকার এরূপ বিদ্রুপটি খাটে না। এটি পরিষ্কার হয়েছে গোলটেবিল বৈঠক দ্বারা ভারতের উপর ইংরেজ জাতির প্রভুত্ব দীর্ঘস্থায়ী করার বন্দোবস্ত হচ্ছে।'[১৩] দ্বিতীয়তঃ বিবৃত হয়েছে ভারতবর্ষের কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ভেবেছেন যে গোলটেবিল বৈঠকে ভারত পূর্ণ স্বরাজ না হোক, আংশিক স্বরাজ পাবে। 'প্রবাসী' পত্রিকার মতে 'এরূপ ধারনা ভ্রান্ত, এ আশা পূরণ হবে না। কারণ পূর্ণ স্বরাজের অর্থ হল ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্বন্ধে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। আংশিক স্বরাজ হলে সীমাবদ্ধ আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।'[১৪] 'প্রবাসী'তে মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'কিন্তু কোনো মানুষ কোনো মানব সমষ্টি, কোনো জাতি বা সাম্রাজ্য অন্য কোনো জাতির ও দেশের ভাগ্য বিধাতা নহে। যে জাতির লোকেরা সত্যই মানুষের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্তা হইতে চায় তাহাদের চেষ্টা কেহ ব্যর্থ করিতে পারে না।'[১৫] গোলটেবিল বৈঠকগুলি 'প্রবাসী'র ভাষায় 'গণ্ডগোলটেবিল বৈঠক' ছিল।[১৬]

গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ভারতে ফিরে আসেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯৩২-৩৪ খ্রিস্টাব্দ) শুরু করেন। সরকার গান্ধীজী সহ বহু নেতাদের আগেই কারারুদ্ধ করে কঠোর হাতে দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়। মুদ্রা যন্ত্রকে আইনের বেড়াজালে ফেলা হয়। নির্ভীক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিস্তর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে 'প্রবাসী'তে সরকারী কাজের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নীতির বিরুদ্ধে 'প্রবাসী' পত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মুসলমানদের অত্যধিক দাবি দাওয়া ও তাদের সুযোগ সুবিধাদানের মূলে যে কোনো যুক্তি নেই তা 'প্রবাসী' তে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে তার প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন।[১৭] এ বিষয়ের উপর পরিসংখ্যান ভিত্তিক বিস্তর আলোচনা-প্রবন্ধ লিখলেন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত। রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে সরকারী শিক্ষানীতিতে সাম্প্রদায়িতার প্রভাব দেখিয়ে কিছু প্রবন্ধ লেখেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সর্বদা নিজেকে এবং 'প্রবাসী' পত্রিকাকে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধে রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' এবং কংগ্রেস কর্তৃক এর পরোক্ষ সমর্থন জাতীয়তাবাদ, জাতীয় ঐক্য তথা ভারতের সার্বভৌমত্বের মূলে প্রবল আঘাত করার আশঙ্কায় তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি। এবার তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক আসরে অবতীর্ণ হন। 'প্রবাসী'র মাধ্যমে তিনি ভারতবাসীকে এর কুফল সম্পর্কে বারে বারে সচেতন করে দিতে থাকেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে ১৯৩২-১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ, যেমন এর বিরুদ্ধে সভা, সম্মেলন, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে

চাপান উতোর, হিন্দুদের পক্ষের বক্তব্য প্রকাশ করেই 'প্রবাসী' নিজেকে নিরস্ত রাখেনি। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে মুখর ও প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই ভূমিকারও কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন-'কংগ্রেস দলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে দ্যোদুল্যমানতার প্রতি তীব্র কসাঘাতে সমালোচনা করে যুক্তিসহ বিরোধিতার বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। হিন্দুদের বঞ্চনার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। একে ন্যায় বিরুদ্ধ কাজ, হিন্দুদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা হচ্ছে বলে 'প্রবাসী'তে মন্তব্য করা হয়েছে'।[১৮] 'প্রবাসী'তে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে সভা, মিছিল ও ব্রিটিশের উপর চাপ দিতে আহ্বান করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছে। যে সব মুসলমান সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্যও প্রকাশ করা হয়েছে। মুসলীম লীগের ভূমিকাকে নিন্দা করা হয়েছে। 'প্রবাসী' পত্রিকা সর্বদা দেশে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর কথা বলেছে। সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিনিময়ে পূর্ণ স্বরাজ লাভে 'প্রবাসী' রাজী নয় - একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করেছে। বাঙালীর প্রতি সংবেদনশীল হলেও উগ্র প্রাদেশিকতার তীব্র নিন্দা 'প্রবাসী'তে দেখা যায়। যে কোন শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা যেমন আছে, তেমনি ধর্ম নিরপেক্ষতাকেও আদর্শ বলে গ্রহণ করে তার সমর্থনে প্রচারে ব্রতী হয়েছে 'প্রবাসী'। একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়েছে, ''প্রবাসী ধর্ম্মমতের আলোচনার কাগজ নয়। কিন্তু ধর্ম্মমতের আলোচনা না করিয়াও এ প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা যেতে পারে।''[১৯]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারত ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ। মূলত ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র, তাদের শোষণের পদ্ধতি এবং কয়েকটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের সমন্বয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। ভারতীয় ও ব্রিটিশ স্বার্থের সংঘাতই ছিল জাতীয়তাবাদ উন্মেষের মূল কারণ। এই জাতীয়তাবাদের আঞ্চলিক চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। তবে সেই জাতীয়তাবাদ নিঃসন্দেহে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে বাদ দিয়ে নয়। তবে কোন একটি অঞ্চলের কাছে জাতির ধারণা অন্যান্যদের থেকে আলাদা ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের এই ধারণা সম্প্রদায়, এলাকা, ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।[২০] বাংলার ক্ষেত্রে তা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এই জাতীয় জাগরণের শুরুতেই ভারতবাসী উপলব্ধি করে যে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রথমে বাংলায় বেশকিছু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে 'জমিদার সভা', ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি', ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বহু পূর্ব থেকেই জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গঠনে বাংলার বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলের মত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে 'বাংলা আজ যা ভাবছে, ভারত আগামীকাল তা ভাববে'। ফলে সকলের জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য এক হলেও পদ্ধতি এক ছিল না। তাই এই সময়ে

ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলার ও অন্যান্য আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের মতের মিল হয়নি। পদ্ধতিগত কারণে তাঁদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। কংগ্রেসের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট হয়ে জাতীয়তাবাদে ও জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাসী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ 'কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টি' গঠন করেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, নরসিংহ চিন্তামন কল্‌কার এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় আইনসভার নতুন নির্বাচনে বঙ্গদেশের যে পাঁচজন হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হন তাঁরা সকলেই কংগ্রেস জাতীয় দলভুক্ত ছিলেন। এই দলে নিখিল ভারতীয় প্রথম সম্মেলন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ২৫শে-২৬শে অক্টোবর বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় যার সভাপতিত্ব করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই সম্মেলনের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল : ''জাতি, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ ও ধর্ম বিশ্বাস নির্বিচারে অসাম্প্রদায়িক সম্মিলিত নির্বাচক মণ্ডলী এবং সমান নির্বাচনাধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে কোনোরূপ প্রতিনিধি নির্বাচন প্রণালী গ্রহণ যোগ্য হবে না এবং এই সর্ত্তও পালিত হওয়া আবশ্যক যে, কোনো সম্প্রদায়কে ন্যায্য স্বার্থত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে না।''[২১] জাতীয় কংগ্রেসের মুসলিম তোষণ নীতি যে কতখানি ক্ষতিকর হয়েছিল তা কারও অজানা নয়। মুসলিমদের তুষ্ট করার জন্য যখন জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম্' এর ছাঁটাই প্রস্তাব করে তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। এর অযৌক্তিকতা বোঝাতে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে এক প্রতিনিধিদল মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যার নেতৃত্ব দেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ 'প্রবাসী' সংখ্যায় ভারত শাসন বিধি প্রণয়নের নতুন পন্থায় গভর্নমেন্টের কর্তৃত্ব বাড়ানোর প্রচেষ্টার প্রস্তাবে ভারতীয় লিবার‍্যালরা অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছে যে, গভর্নমেন্ট ঐ প্রণালীমত কাজ করলে অসহযোগিতা করা হবে। মুসলিমদের একাংশ সহযোগিতায় রাজী নয়। 'প্রবাসী' পত্রিকার মন্তব্য যে, 'গুজব রটানো হয়েছে কংগ্রেসীরা ও ভারতীয় লিবার‍্যালদের একযোগে কাজ সম্ভবপর করার জন্য একটি সম্মিলিত কার্যপ্রণালী স্থির করতে প্রচেষ্টা করা হবে'।[২২] ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন বিল, হাউস অব কমন্সে অনুমোদনের পর হাউস অব লর্ডসে আলোচনা চলাকালীন, এই বিল সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকার আষাঢ় ১৩৪২ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'এতে বৈকল্পিক কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক তামাসা মাত্র।'[২৩] 'প্রবাসী' ১৩৪২ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যায় ''ভারত শাসন বিলের বৈকল্পিক কিছুর দাবী'' শীর্ষকে 'ভারত সচিব ও ভারত শাসন সংস্কার নাটকের নেপথ্যে স্যার সামুয়েল হোর সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।'[২৪] ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ বৈশাখ সংখ্যায় আলোচনা করে মন্তব্য করেছে যে 'উক্ত আইনটি ভারতবর্ষের পক্ষে ক্রমশঃ অধিকতর অনিষ্টকর ও শৃঙ্খলবৎ হচ্ছে।'[২৫] 'প্রবাসী' ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা রূপ ভ্রান্তিকর উক্তি করেছে তার

সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছিল'।[২৬] এই উক্তির বিষয়ের আঁধারে রয়েছে ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ এবং ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রসঙ্গ।

নতুন ভারত শাসন আইন (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ) সম্বন্ধে ১৩৪২ বঙ্গাব্দ 'প্রবাসী' পত্রিকায় সমালোচনা করা হয়েছে 'অখণ্ড ভারতের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য যে যে উপায় অবলম্বন আবশ্যক এই আইনের মধ্যে তার বড়ই অভাব। নিখিল ভারতীয় এবং প্রাদেশিক উভয়বিধ সংস্কার ব্যবস্থা একই সময় প্রবর্তিত হল না। নিখিল ভারতীয় অংশ ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রেখে প্রাদেশিক অংশই শুধু কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফল এই যে, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রধান সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম, অন্যদিকে প্রাদেশিক আত্ম কর্তৃত্বের বিধানের জন্য প্রদেশ অংশে সম্প্রদায় বিশেষের প্রাধান্য স্থাপিত হল। ফলে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ রেষারেষিতে জাতীয় জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যেও ঐক্যবোধের পরিবর্তে সংকীর্ণ প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির অবকাশ ঘটল।'[২৭] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন বলে নতুন শাসনতন্ত্রের কুফল গুলি দিব্যদৃষ্টিতে দেখে 'প্রবাসী' পত্রিকার মাধ্যমে স্বদেশবাসীকে এ সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে চেষ্টা করেন।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মন্ত্রিসভায় অনুমোদন এবং পরে নতুন ভারত শাসন আইনের অংশ রূপে পরিণত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস পরিবর্তন করার চেষ্টা হবে-এ প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ বৈশাখ, সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছে যে 'যদি সংখ্যা লঘিষ্টদের লোকসংখ্যার অনুপাতে অধিক আসনই দিতে হয়, তাহলে বঙ্গের ও পাঞ্জাবের হিন্দুরা কেন প্রাপ্য আসনের চেয়ে বেশি পাবে না? ফলে নতুন ভারত শাসন আইনে ভারতীয়দের ক্ষমতাহীন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'[২৮] ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ নতুন ভারত শাসন আইন ও বিধিবদ্ধ নতুন শাসনতন্ত্রকে কংগ্রেস গ্রহণের অযোগ্য ও বর্জনীয় এবং বিনাশেরই যোগ্য মনে করেন। এ সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় 'ভাঙিবার নিমিত্ত গড়া' শীর্ষকে প্রশ্ন তোলা হয় যে, 'এই শাসনতন্ত্রকে ভাঙার উপায় রূপে ব্যবহারের অভিপ্রায়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল যদি কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের হাতে থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না, এটা কি আশা করা যেতে পারে'।[২৯] 'প্রবাসী' ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ বৈশাখ সংখ্যায় 'ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মত রাজ্যে কংগ্রেস ও রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত মন্ত্রি মণ্ডল গঠনের কথা বলা হয়েছে।'[৩০] নতুন ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রদেশ অংশে কার্য আরম্ভ হল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল থেকে। মাস কয়েক আলাপ আলোচনার পর কংগ্রেস এই আইন অনুযায়ী মন্ত্রী সভা গঠনে সম্মত হয়। মুসলিম প্রধান প্রদেশ গুলিতে স্বভাবতই মুসলিমদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ, 'প্রবাসী' ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের, ভাদ্র সংখ্যায় 'দেশের সামগ্রিক মান ও উন্নয়নের জন্য ভারতের স্বাধীনতা লাভ প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর তাকে রক্ষার জন্য আর্থিক স্বাধীনতা লাভ প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছে।'[৩১]

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ ইংরেজ লেখক মেজর ইয়েট্‌স ব্রাউন জার্মানীর বার্লিন ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বক্তব্যটি 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ কখনও স্বাধীন ছিল না' শীর্ষকে প্রকাশিত হয়েছে। বক্তার মতে, 'ভারতবর্ষ বরাবরই বিজেতাদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে, কোনো কালেই স্বাধীন ছিল না'।[৩২] 'প্রবাসী' ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ মাঘ সংখ্যায় ''স্বাধীনতা হীনতার অসুবিধা'' শীর্ষকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কবি রঙ্গলালের লেখা ''স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?''[৩৩] উদ্ধৃতি দিয়ে পরাধীন থাকার সমস্যার কথা বলে স্বাধীনতার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর অবদানের কথা বলে মন্তব্য করেছে যে 'স্বদেশের জন্য তাঁরা যা আবশ্যক ভাবেন, তাঁরাই তার প্রয়োগ বিশ্বব্যাপী দেখতে চান। স্বাধীনতা বিশাল হিতৈষণা ও মনীষার উদ্ভবের অনুকূল, পরাধীনতা তার অনুকূল নয়।'[৩৪]

'প্রবাসী' ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৫, মাঘ সংখ্যায় 'স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রবল ও অক্লান্ত ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন করা এবং দেশের প্রত্যেক কাজেই প্রত্যেকেই নিজের বোঝাটা নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে এরপর অন্যের কর্তব্য নির্দেশ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছে।'[৩৫] 'প্রবাসী' ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে 'স্বাধীনতা দিবস', 'স্বাধীনতা কেন চাই?', 'স্বাধীনতা দিবসে পঠিত প্রতিজ্ঞা', 'স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কারণ', নামে চারটি শীর্ষক আলোচিত হয়েছে। স্বাধীনতা উপলক্ষে যে প্রতিজ্ঞা পত্রটি ইংরেজিতে ও বাংলায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ঃ ''We pledge ourselves a new to the independence of India and solemnily resolve to carry on non-violently the struggle till purna swaraj is attained.''[৩৬] এবং বাংলায় - ''আমরা নূতন করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ব্রত গ্রহণ করিতেছি এবং পূর্ণ স্বরাজ লাভের প্রচেষ্টা চালাইতে গম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।'' স্বাধীনতা কেন চাই? শীর্ষক আলোচনায় মানুষের অধিকার সমূহের কথা বলে, ব্রিটিশ শাসনের কুফলের কথাও বিবৃত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীও স্বাধীনতা চান একথাও বলা হয়েছে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে - এ বিশ্বাস 'প্রবাসী' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে।[৩৭] ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, 'প্রবাসী' সংখ্যায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা বিবৃত করে মন্তব্য করেছে যে, ''গান্ধীজী যতবার অনশন করেছেন সেগুলি কি সুশৃঙ্খল শাসন কার্যের সহায়ক হয়েছিল? লোকমত সব অনশনকে সমর্থন করে না, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। অনশন দ্বারা বন্দীমুক্তি বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। এর জন্য চাই জনমত সমর্থন।'[৩৮] 'প্রবাসী' ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ আশ্বিন সংখ্যায় 'রাজবন্দীদের উপর সরকারি মনোভাব, ভীতি প্রদর্শন ও হুমকিকে নিন্দা করা হয়েছে এবং রাজবন্দীদের উপবাসে মৃত্যু হলে কে দায়ী হবেন - এ প্রশ্নও তোলা হয়েছে।'[৩৯] 'প্রবাসী' ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন

সংখ্যায় 'কংগ্রেস ঝগড়া' শীর্ষকে বক্তব্য প্রকাশিত হয় যে, 'বাংলা দেশে কংগ্রেসীদের মধ্যে একাধিক দল পূর্বে থেকে ছিল ও শুধু নিজের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া ব্যতীত নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়াও ছিল।'[৪০] তা নিয়ে 'প্রবাসী' দুঃখ প্রকাশ করেছে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে 'কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যে সব অভদ্র ব্যবহার ও গুন্ডামি হয়েছে তা 'প্রবাসী'র জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ সংখ্যায় অতিশয় লজ্জাকর ও গর্হিত বলে মন্তব্য করেছে।'[৪১] 'প্রবাসী' ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'পূর্বতন ও নতুন কংগ্রেস সভাপতি' শীর্ষকে বিবৃত হয়েছে যে 'শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়ায় যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে তা ভুলে যাওয়ার কথা নয়'।[৪২] 'প্রবাসী' ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ ভাদ্র সংখ্যায় যুদ্ধ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত প্রস্তাবটির উদ্ধৃতি দিয়ে ছাপা হয়েছে 'এই প্রস্তাবের সারাংশ হল বিট্রিশ সরকার কোনো যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে, ভারত তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। কারণ ব্রিটিশ ভারতকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।'[৪৩] 'প্রবাসী' পত্রিকা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে।

'প্রবাসী' ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ, সংখ্যায় 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় ইংরেজ কখন রাজী হইবে' শীর্ষকে বিবৃত হয়েছে যে, 'বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজপুরুষ ও রাজনৈতিকরা ভারতবর্ষকে যতটা রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়ার কথা বলেছে, কিন্তু কার্যতঃ তা করেননি।'[৪৪] এ প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' পত্রিকার মন্তব্য হল 'ভারতের রাজদণ্ড ইংরেজ জাতির হাত থেকে এখনও খসে পড়েনি। কিন্তু ভারতীয়রা রাষ্ট্রীয় আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। কিন্তু ইংরেজ জাতি এই সময়কে তাদের ইতিহাসের 'সর্বাপেক্ষা গৌরবময় দিন' বলে মনে করছেন না।'[৪৫] 'প্রবাসী' ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় ভারতীয় কোন স্বাধীনতা চায় ও স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছার কারণ কি? এবং ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে 'প্রবাসী'র ৪টি শীর্ষক শিরোনামে যথাক্রমে - 'ভারতীয়রা কোন স্বাধীনতা চায়', 'স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছার কারণ কি?' 'ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতের আর্থিক অবস্থা' এবং 'ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা'। 'প্রবাসী'তে এগুলিকে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে।[৪৬]

'প্রবাসী' ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র সংখ্যায় 'ইংল্যাণ্ডে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে জানা যায় যে, '১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ ১০ই আগস্ট লণ্ডনে ইন্ডিয়া লীগের উদ্যোগে জাতির প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। এই সভায় বক্তারা ভারতের স্বাধীনতা দাবী করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারতের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হোক, স্বাধীন ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি গণপরিষদ আহ্বান করা হোক, সব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে একটি সাময়িক গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হোক, পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতার জন্য একটি সন্ধি করা হোক। সালিসীর দ্বারা বিষয়ের মীমাংসা করার চেষ্টা হোক।'[৪৭] ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ মাঘ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ

'প্রবাসী' সংখ্যায় ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের নানা অজুহাত-যুদ্ধ, নাৎসী প্রীতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছে যে, 'স্বাধীনতার দাবী কি দর কষাকষি'?[৪৮] ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে হাউস অফ লর্ডসের বিতর্কে সরকারী ভারত সচিব ডিভনশায়ারের ডিউক বক্তৃতায় কোনো ভারতীয় ভারতের শাসনভার গ্রহণ করবে এ প্রশ্ন তোলায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয় যে 'ভারতীয়রাই ভারতের স্বাধীনতা দিতে পারে'।[৪৯] 'গণপরিষদে যদি কংগ্রেসী প্রতিনিধিরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ হয় তা কি কংগ্রেসের অপরাধ? ভারতীয়দের নির্বাচিত গণপরিষদই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করবে, সেখানেই সংখ্যালঘুদের রক্ষা কবচ নির্ধারিত হবে।[৫০] ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত সচিব এমারি বক্তৃতায় ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে আত্মরক্ষায় সমর্থ কিনা প্রশ্ন তোলেন। এ বিষয়ে 'প্রবাসী' ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ চৈত্র সংখ্যায় এমারি বক্তৃতা মুদ্রিত করে মন্তব্য করে যে, 'স্বাধীন ভারত আত্মরক্ষায় সমর্থ্য। স্বাধীন দেশগুলির আত্মরক্ষার উপায় প্রধানত দুটি - নিজশক্তি এবং অন্য স্বাধীন দেশ সকলের সঙ্গে মৈত্রী ও সন্ধিবদ্ধ হওয়া।'[৫১]

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনমত উপেক্ষা করে ভারতবর্ষকে মহাযুদ্ধের মধ্যে টেনে নামায়। স্বদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী প্রধানতম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেস তা মেনে নিতে পারেনি। কংগ্রেসী মন্ত্রী সভাগুলি একযোগে পদত্যাগ করে এর প্রতিবাদে। 'প্রবাসী' ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত উদারনৈতিক নেতারা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে অনুরোধ করেন যে 'ভারতকে অধীনদেশের মত মনে না করে স্বশাসন, ডোমিনিয়ন গুলির প্রতি সমব্যবহার করার সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, উদারনৈতিক নেতারা যা চান তা ঠিক স্বরাজ না হলেও ভারতের বর্তমান অবস্থার চেয়ে কিছু ভালো নিশ্চয়ই হত। কিছু বেশি সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব করতে পারত। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ততটুকু ক্ষমতাও ছেড়ে দিতে চান না।'[৫২]

'প্রবাসী' ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমনসভায় ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশীয় শাসনবিধি সংশোধনের জন্য উত্থাপিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হল বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে আরো এক বছর বৃদ্ধি করা এবং বর্তমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে কোন সদস্য সরকারী কর্মী হলে তাকে সদস্যপদে ইস্তফা দিতে হবে, কিন্তু সদস্যপদ গ্রহণের পরে সরকারী চাকুরী গ্রহণে বাধা নেই? এই প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' পত্রিকার বক্তব্য হল 'গভর্নমেন্ট জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যকে সরকারী চাকুরীর লোভ দেখিয়ে টোপ গেলাতে চাইলেন। আইন সভাকে কুক্ষিগত ও কব্জাগত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।'[৫৩] এছাড়া 'প্রবাসী' মন্তব্য করেছে যে 'ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা বা ভারতীয়গণের স্বশাসক অধিকার বৃদ্ধির কথা উঠলেই কর্তৃপক্ষ গুজব করে বলেন, তা করতে হলে পার্লামেন্টে নতুন আইনের বিল বা বর্তমান আইনের সংশোধন বিল পাস করা দরকার। কিন্তু যুদ্ধকালীন সংকট অবস্থায় তা করা যেতে পারে না। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের

নিজের গরজের বেলায় তা বেশ করে চলে।'[৫৪]

এই রূপ পরিস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধী নতুন করে 'সীমিত সত্যাগ্রহ' আরম্ভ করেন ১৯৪০-৪১খ্রিস্টাব্দ। পক্ষান্তরে জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম সমাজ সরকারের সঙ্গে কার্যত সহযোগিতা করে চলে এবং তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের দাবী ক্রমশঃ বৃদ্ধি করতে থাকেন। নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে তাঁদের জন্য পাকিস্তান বা স্বতন্ত্র ভূখণ্ড দাবী করে বসে। এরপর অতি দ্রুত ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হতে শুরু করে। ব্রিটিশ মন্ত্রী সভার পক্ষে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে আসেন মার্চ, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের আপোসের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করে এই ক্রিপস্ মিশন। কিন্তু ক্রিপস্ এর আসল উদ্দেশ্য ছিল মহাযুদ্ধের সংকটকালে আপামোর ভারতবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ। কংগ্রেসের জাতীয়তার আদর্শ এবং মুসলিম লীগের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দাবী এই দুইয়ে মিলাতে ক্রিপস্ দৌত্য ব্যর্থ হয়।[৫৫]

'প্রবাসী'তে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যায় স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্ কর্তৃক আনা শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সূত্র সন্ধানে ক্রিপস্ মিশন মূলতঃ দুটি প্রস্তাব দেন - ডোমিনীয়ান সংবিধান প্রণয়ন করা এবং অন্তবর্তী সরকার গঠন করা।[৫৬] কিন্তু 'প্রবাসী'র মন্তব্য হল 'প্রস্তাবগুলি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গৃহীত প্রস্তাব নয়।'[৫৭] 'প্রবাসী'র এ সম্পর্কে বক্তব্যে প্রতিভাত হয়েছে যে 'প্রস্তাবগুলির অন্য সব বিষয়ের দশা যাই হোক, ভারত রক্ষার ব্যবস্থা যথা সম্ভব পূর্ণমাত্রায় হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং তা হলে সুখের বিষয় হবে।'[৫৮] ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতা সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছে যে 'এর জন্য ব্রিটিশ পলিসি দায়ী নয়, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দায়ী নয়, ভারতীয় দল সমূহ ও নেতারা একমত না হওয়াতেই সমস্যার সমাধান হল না।'[৫৯] ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা দাবী সম্বন্ধে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ যে বিবৃতি দিয়েছে, তার মূল কথা হল এখন স্বাধীনতার দাবী করা অনাবশ্যক। কিন্তু এ সম্পর্কে পূর্বের ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিশ্রুতি ছিল, তা অবশ্য পালন করা হয়নি। 'প্রবাসী' ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ ভাদ্র সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'পার্লামেন্ট রক্ষা করবে তার স্থিরতা কি?'[৬০] 'প্রবাসী' ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ আশ্বিন সংখ্যায় 'ক্রিপস্ মিশনের প্রস্তাবাবলী এবং তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রকাশিত করেই ক্ষান্ত হয়নি। মন্তব্যের ঝড় তুলে ক্রিপস্ মিশনকে ধিক্কার জানিয়েছে। স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস এর ৬ই আগস্ট ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মন্তব্য ও আমেরিকার কাছে ভারত সম্পর্কে যে তির্যক মন্তব্য করেছে 'প্রবাসী' পত্রিকা তার প্রতিবাদ করেছে। 'প্রবাসী' পত্রিকা ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে কলমী সওয়াল করেছে।'[৬১]

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে কংগ্রেস ভারতব্যাপী সর্বাত্মক আন্দোলন আরম্ভ করে ভারতবর্ষে একটি অখণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত প্রস্তাবটি 'প্রবাসী' পত্রিকা ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ

ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এটি এসোসিয়েট প্রেস থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। 'এই প্রস্তাবে বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে বলা হয়েছে এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসান আবশ্যক বলে উল্লেখিত হয়েছে। চীন ও রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। কংগ্রেসের এই দাবী ভারত সরকার মানবে না বলে সভা পরিষদ বড়লাট এই মর্মে রিজল্যুশন প্রকাশ করেছেন।'[৬২]

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট বিপ্লব বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও তার সম্প্রসারণের সংবাদ 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্থান পায়নি। তবে ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে 'প্রবাসী' ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত মন্তব্য থেকে প্রতিভাত হয় যে, ' 'প্রবাসী' পত্রিকা কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি পত্রিকাটি কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে'।[৬৩] ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ ভাদ্র সংখ্যায় দুটি মন্তব্য করা হয়েছে। আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজী প্রভৃতি নেতার গ্রেপ্তার ও অশান্ত জনতার উপর পুলিশের গুলি বর্ষণে মানুষ হতাহত হওয়ায় এখন গণ আন্দোলন নিশ্চয়ই অবাঞ্ছনীয়। কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে শান্তি স্থাপিত হলে ভারতবর্ষের ডোমিনিয়ন মর্যাদা দেওয়া হবে। তবে এখনই স্বাধীনতার দাবী কি আবশ্যক? একই সংখ্যায় কংগ্রেসের দাবী সম্পর্কে 'কংগ্রেসের কি হঠকারী' শীর্ষকে মন্তব্য করেছে যে, 'কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাবাদী। তাঁরা আগে পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু চেয়ে জাত খুইয়েছে। অথচ তাতে তাদের পেট ভরেনি'।[৬৪] ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট দু-দুবার বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য সংখ্যা বাড়ালেন, কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষমতা ভারত সচিব ও বড়লাটের হাতে থাকলো। এ সম্পর্কে 'প্রবাসী' ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ ভাদ্র সংখ্যায় 'কংগ্রেসের চাপ ও গভর্নমেন্টের চাল' শীর্ষকে মন্তব্য করেছে যে, 'এ সব সত্ত্বেও যাঁরা কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হয়ে কংগ্রেসের উপর মুরুব্বিয়ানা চালে অনেক সলা-পরামর্শ দিচ্ছেন, কেউ কেউ বা কংগ্রেসকে গালমন্দও দিচ্ছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, গভর্নমেন্ট যা কিছু করছেন তা কংগ্রেসের চাপটা বিদ্যমান আছে বলে করছেন।'[৬৫]

আলোচ্য সময়কালের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা 'প্রবাসী'তে প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায় সম্পর্কে ৪টি শিরোনাম সহ মন্তব্যে এই বিচারের রায়ের যৌক্তিকতা নিয়ে পত্রিকাটি সংশয় প্রকাশ করেছে। হিজলীর হত্যাকান্ড ঘটনার প্রতিবাদ, চট্টগ্রাম পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাবে বোমাবর্ষনের ঘটনায় হিন্দুদের পাইকারী হারে জরিমানা করার সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় ৬টি শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নর স্যার স্ট্যানলী

জ্যাকসনের বক্তৃতাকালে তাঁকে লক্ষ্য করে বীনা দাস গুলি করে হত্যা করার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন সংখ্যায় 'বঙ্গের গভর্নরকে হত্যা করিবার চেষ্টা' শীর্ষকে মন্তব্য করা হয়েছে যে - 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এরূপ চেষ্টার দ্বারা দেশকে স্বাধীন করা যাবে না। এরূপ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করা অনুচিত। ফলে গভর্নমেন্ট কর্তৃক দমন কঠোর হবে। কিন্তু তাতেও ঐ প্রচেষ্টা বন্ধ হবে না।'[৬৬] 'প্রবাসী' ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন সংখ্যায় 'রাজনৈতিক হত্যার চেষ্টা নিবারণের উপায়' শীর্ষকে মন্তব্য করা হয়েছে যে 'ভবিষ্যতে কি হবে বলা হবে, তার জন্য আমরা বসে থাকব না। দেশ প্রকৃত শান্ত অবস্থা আনতে আমাদের স্বার্থ ও আগ্রহ বিদেশীদের চেয়ে কম নয়। অশান্ত অবস্থায় ইংরেজদের জীবন অপেক্ষা ভারতীয়দের জীবনের অপচয় বেশী হচ্ছে। এ অপচয় নিবারণের উপায় দেশের লোকদেরকে বার করতে হবে।'[৬৭] ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলা হয়েছে যে, 'বোম্বাই, কলকাতা, এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা হল না কেন? হলে অভিযুক্তদের কতিপয় অন্ততঃ চার বছর পূর্বেই খালাস পেত'।[৬৮] 'প্রবাসী' ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ বৈশাখ সংখ্যায় 'হোয়াইট পেপার' সম্পর্কে সমালোচনা করে প্রশ্ন তুলেছে দ্বৈত শাসনের ফেডারেশন কখন হবে?[৬৯] এছাড়া 'প্রবাসী'তে১৩৪০ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় 'হোয়াইট পেপার কী গণতান্ত্রিক'?, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ কার্ত্তিক সংখ্যায় 'হোয়াইট পেপারের নাম হোয়াইট কেন?', ১৩৪০ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'হোয়াইট পেপারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত মত প্রকাশের আবশ্যকতা' প্রভৃতি শীর্ষকও প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ সংখ্যায় কমিউনিস্ট দলের 'প্রগতি' শীর্ষকে ভারতের কমিউনিস্ট দল জাতীয় গভর্নমেন্টের দাবী করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে সহস্রাধিক লোকের সাক্ষর যুক্ত আবেদনপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে - এ প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' পত্রিকার মন্তব্য হল যে 'কমিউনিস্টরা আপনাদের বৈপ্লবিক দল বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, আবেদন নিবেদনের কার্যে বিশ্বাসী বলে মডারেট দলকে অত্যন্ত কৃপার চোখে দেখেন, মহাত্মা গান্ধীর আপোষ মীমাংসাকে যথেষ্ট উপহাস করেছে। আজ কমিউনিস্টরাই কংগ্রেসের পথে চলছে এ দৃশ্য দেশের লোক আশ্চর্য্য হবে সন্দেহ নেই'।[৭০] 'প্রবাসী' ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ ভাদ্র সংখ্যায়, 'ভারতীয় কমিউনিস্টরা কি চান' শীর্ষকে বিবৃত হয়েছে যে, 'অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন - কম্যুনিস্টরা ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতে জাতীয় গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা চান। ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের সাধারণ সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত পি.সি. জোশী ও এরূপ কথা বলেছেন।' 'প্রবাসী' এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, 'কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যখন এক, তখন কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ও সংঘর্ষ কেন অবশ্যম্ভাবী হবে?'[৭১]

সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদে 'প্রবাসী' ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন সংখ্যায় সোচ্চার হয়েছে। এতে 'সরকারী দমননীতি' শীর্ষকে 'সরকার কর্তৃক যখন তখন গ্রেপ্তারের ঘটনার সমালোচনা করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের উদ্ভবের কারণ রাজনৈতিক বলে উল্লেখ করা

হয়েছে।'[৭২] সন্ত্রাসবাদ উচ্ছেদ ও বিনষ্ঠ করণে ব্রিটিশ সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এ সম্পর্কে 'প্রবাসী'র মন্তব্য হল 'দেশের যুবশক্তি ব্যর্থ হবে না।'[৭৩] এছাড়া এ ব্যাপারে পত্রিকাটি কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়নি। পত্রিকাটি সন্ত্রাসবাদের পক্ষে না হলেও যে পথে সরকার সন্ত্রাসবাদ দমন প্রক্রিয়া শুরু করেছে যে বিষয়ে পত্রিকাটি বিরোধিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সরকারী ভাষ্য ও রিপোর্ট প্রকাশে 'প্রবাসী' বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে। কোনো ভাবেই তথ্যের বিকৃতি প্রকাশ পায়নি। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আইন সভা ও কতিপয় ব্যক্তি বিশেষতঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী অর্ডিন্যান্স আইন, সরকারি ভাষ্য ও রিপোর্ট বিষয়গুলি প্রকাশ করে, মন্তব্যের আধারে তা আলোকিত করেছে। কংগ্রেস নামে রাজনৈতিক দল 'সন্ত্রাসক' প্রতিষ্ঠান নয় এবং শ্রমিক, ছাত্র, যুবক প্রভৃতির বিভিন্ন সমিতি যেমন স্বদেশী শিল্প আশ্রম, হিন্দু-মুসলমানের মিলন সমিতি, ব্যায়াম সমিতি, ক্লাবগুলি যে সন্ত্রাসক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নয় - একথা 'প্রবাসী' স্বীকার করেছে। কিন্তু এগুলিকে সরকারি ভাষ্যে 'সন্ত্রাসক' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৭৪] এছাড়া সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে 'প্রবাসী'তে ১৩৪০ বঙ্গাব্দ আশ্বিন, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ মাঘ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ চৈত্র প্রভৃতি বিভিন্ন সংখ্যায় নানা শিরোনামে আলোচিত হয়েছে।

'প্রবাসী' পত্রিকা দেশের স্বরাজ ও স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন সময়ে মন্তব্য করেছে। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা অর্জনে শান্তিপূর্ণ প্রণালীর কথাও বলেছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে সব ব্যক্তি ব্রিটিশ কারাগারে বন্দী অবস্থায় ছিলেন, তাদের মুক্তির আন্দোলনে পরোক্ষ ভাবে 'প্রবাসী' পত্রিকা স্বপক্ষে কাজ করেছে তার লেখনীর মাধ্যমে। এই লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে কারাগারের অন্তরালে বন্দীদের অবস্থা ও তাঁদের প্রতি নির্যাতনের কথা। বন্দীদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম ও সভা সমিতির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে 'প্রবাসী'তে। এই করেই 'প্রবাসী' তার কাজ শেষ করেনি, বিনা বিচারে রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য লেখনীতে শব্দ ঝংকার করেছে যে, 'তাদের মুক্তি চাই'। তাঁদের প্রতি ন্যূনতম আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করায় 'প্রবাসী' সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে। বন্দীদের আত্মহত্যার কথাও 'প্রবাসী'তে স্থান পেয়েছে। আন্দামানের বন্দীশালায় বন্দীদের দুর্দশার কথাও 'প্রবাসী'তে 'আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের উপবাস ও মৃত্যু' শীর্ষক প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪০ বঙ্গাব্দ আষাঢ় সংখ্যায়।[৭৫] বন্দী মুক্তির ব্যাপারে কংগ্রেস দলের সক্রিয় ভূমিকার অভাবের কথা ব্যক্ত করে 'প্রবাসী' দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। 'প্রবাসী' আইনসভার মধ্যে ও বাইরে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে।[৭৬] সেই সঙ্গে দাবী করেছে বন্দী মুক্তিকে রাজনৈতিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। 'প্রবাসী'তে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কর্তৃক রাজবন্দীদের কৃষি ও শিল্প শিক্ষাদান এবং জীবিকাকে সমর্থন করেছে। কিন্তু মূল সমস্যা হল রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকা বিরোধী মত প্রকাশ করেছে।

'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় মূলত ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকের ভূমিকার কথা অতি অল্প শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।[৭৭] এ ক্ষেত্রে 'প্রবাসী'র বক্তব্য হল 'ছাত্রদের ধর্মঘট করা, সকল-কলেজ বয়কট করা অনুচিত। কারণ ধর্মঘট হল রাজনৈতিক কেন্দ্রিক। ছাত্রদের প্রধান কাজ লেখাপড়া করা।'[৭৮] এক্ষেত্রে গান্ধীজী ছাত্রদের যে উপদেশ বাণী দিয়েছেন তা গ্রহণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছে। গান্ধীজীর বক্তব্য হল যে, 'ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান না করা, অর্থাৎ তারা রাজনীতিক নয়। কেননা একজন ছাত্র নিজের পড়াশুনা করতে এবং সেই সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতিক হইতে পারে না।'[৭৯]

'প্রবাসী' পত্রিকায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে প্রকাশিত ও পরিবেশিত বিষয়গুলি ছিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ-১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৯৩৩, ১৯৩৪, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় কিছু প্রকাশিত হয়নি। সুভাষচন্দ্র বসুকে সুভাষবাবু বা কখনো শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবু বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে বিভিন্ন লেখায় কখনো সমর্থন, কখনো সমালোচনা করতে 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদকের কলম কুণ্ঠাবোধ করেনি। নেতাজীর লেখা 'রিকন্সিলিয়েশ্যন' প্রবন্ধটির বাংলা সারমর্ম কার্ত্তিক, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়া ব্যতীত সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের পরম্পরাময় ঘটনাগুলি বিবৃত করে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[৮০] সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি সরকারের ও পুলিশের আচরণকে নিন্দা করা, সুভাষচন্দ্রের চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকার গ্রহণ করুক-এ দাবীও করা হয়েছে।[৮১] সুভাষচন্দ্র বসুর 'ঐক্য স্থাপন ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে জাতীয়তাবাদকে বাদ দিয়ে মানা মূল্যহীন'-এ বক্তব্যের সঙ্গে 'প্রবাসী' পত্রিকা একমত। জেলবন্দী পীড়িত সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবীতে 'প্রবাসী' সোচ্চার হয়েছে।[৮২] ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য অধ্যাপক মনু সুবেদারের সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ভিত্তিহীন অভিযোগকে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ এবং পীড়িত অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানকে কর্তব্য বোধের প্রশংসা করেছে 'প্রবাসী' পত্রিকা।[৮৩] ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তাঁর বক্তব্য দেশ ও বিশ্বের সমস্যাগুলি আলোকপাত করায় 'প্রবাসী' ঐ ভাষণটিকে ভূয়সী প্রশংসা করে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়।[৮৪] ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ সুভাষচন্দ্রের অন্য দল গঠন করায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাকে শাস্তি দান করেছে, কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাস যখন কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করেন তখন তার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রযোজ্য হয়নি। 'প্রবাসী' সুভাষচন্দ্রের কেবলমাত্র প্রশংসা করেনি, সমালোচনার ক্ষেত্রে কঠোর মনোভাব দেখিয়েছে।

জওহরলাল নেহেরু সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকাশিত হয়নি। ১৯৩৩-১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১২টি বিষয় 'প্রবাসী' র 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রকাশিত হয়েছে। জওহরলাল নেহেরুকে 'প্রবাসী' পত্রিকা একজন সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী অভিধায় ভূষিত করলেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিষয়ে তাঁর মনোভাব ও ভূমিকায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ আষাঢ় সংখ্যায় 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও জওহরলাল নেহেরু' শীর্ষকে

সমালোচনা করা হয়েছে।[৮৫] জওহারলাল নেহেরু সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকার কলম তেমন সোচ্চার ছিল না। এছাড়া 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় রাজনীতি প্রসঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলি জিন্না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, খান আব্দুল গফফর খান, মীরাবেন,মাতঙ্গিনী হাজরা, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী প্রমুখের আলোচনা প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক রাজনৈতিক ছোট ছোট বিষয় আছে যা 'প্রবাসী' তে স্থান পেয়েছিল, কিন্তু গবেষণার নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে তা আলোচনা করা সম্ভবপর হল না।

'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় জাতীয়তাবাদের অনুকূলে এবং ক্রমবর্ধমান ভেদ-বুদ্ধির বিরুদ্ধে সতেজ লেখনী পরিচালনা করতে কসুর করেননি। 'প্রবাসী'র মাধ্যমে তিনি ভারতবাসীকে দেখাতে থাকেন যে, কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদের আদর্শকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের অযৌক্তিক দাবী দাওয়া অত্যধিক বাড়িতে উৎসাহ দেওয়া, এই উভয় কাজের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দায়ী। তিনি বার বার 'প্রবাসী' তে এই মর্মে লিখেছেন যে, আমরা ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপও কূটকৌশলের নিন্দা, প্রতিবাদ বা সমালোচনা এই আশায় করি না, যে তাঁহারা আমাদের কথা শুনিবেন বা তাঁদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে নেবেন। আমরা এটি করি এজন্য যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরা আমাদের বুদ্ধিহীনতার, দুরদৃষ্টিহীনতার নিমিত্ত আমাদের না দোষারোপ করে। জাতীয়তাবাদী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' পত্রিকা বাস্তবিক পক্ষে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে ভারতবর্ষের জাতীয় তথা স্বরাজ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের দিগ্‌দর্শন রূপে কাজ করেছে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের শেষে জরা ব্যাধি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে আশ্রয় করলে বড় সাধের 'প্রবাসী' র 'বিবিধ প্রসঙ্গ' লেখার ভার অন্যের হাতে অর্পন করতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৩৫০ বঙ্গাব্দ ১৩ই আশ্বিন তাঁর মৃত্যু হলেও 'প্রবাসী' কার্ত্তিক সংখ্যা তিনি প্রকাশ করে যান।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা 'প্রবাসী' পত্রিকার 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এ আলোচনা করা হত। এই সম্পাদকীয় কলমটি ছিল ন্যায় অন্যায়ের বিচারের সুক্ষ্ম তুলাদণ্ডের মতো। 'বিবিধ প্রসঙ্গ'টি সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্পাদকীয় মতামত, মন্তব্য ও বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যাপৃত হয়েছে। এখানে ভীরুতা বা তোষণের কোন প্রভাব নেই। ঘটনা প্রবাহে রয়েছে বিশ্লেষণের আঙ্গিক। যেটি ইতিহাসে গবেষণার ধারায় তথ্য ও তত্ত্বের নব আঙ্গিকে উদ্ভাসিত ও উন্মোচিত। ইতিহাস গবেষণা ও রচনার ক্ষেত্রে পত্রিকাটি প্রাথমিক সূত্র হিসাবে যথার্থ তথ্য ও বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় বহন করে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উজ্জীবিত করতে পত্রিকাটি যথার্থ ভাবে যে লেখনী শক্তির উজ্জ্বল্য প্রকাশ পেয়েছিল তা অনবদ্য ও এর ফল সুদূর প্রসারী হয়েছিল।

এজন্য সম্পাদক ব্রিটিশ অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাননি। 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় তিনি কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করেননি। তিনি সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বরং তাঁর যুক্তি নিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম, জাতীয় জাগরণ, দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমকে পরোক্ষভাবে 'প্রবাসী' পত্রিকা অনুপ্রাণিত

করেছিল। সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও জাতীয় প্রেক্ষাপটকে সম্পাদক যথার্থভাবেই ‘প্রবাসী’ পত্রিকার পৃষ্ঠায় মেলে ধরেছেন। যেটি তৎকালীন অন্যান্য পত্রিকাগুলি সেভাবে করেনি, এ ব্যাপারে ‘প্রবাসী’ পত্রিকা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অসাধারন ভূমিকা পালন করেছিল।

কিন্তু ‘প্রবাসী’ পত্রিকা সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। সমকালীন যে সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনা ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠায় স্থান পায়নি তার তালিকাও বৃহৎ। পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জওহরলাল নেহেরু, মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে নামেমাত্র এবং দায়সারা কলমের আঁচড় কেটেছে। তুলনামূলক ভাবে মহাত্মাগান্ধীকে নিয়ে আলোচনা বেশি এবং তাঁর প্রতি যথাযথ প্রশংসা উল্লেখ্য। তবে সর্বদা গান্ধীজীর নীতির পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন তা নয়। অন্যান্য রাজনৈতিক, দেশপ্রেমী নেতাদের আলোচনা খুবই কম। সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কেপ্রশংসা মিশ্রিত সমালোচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু জওহরলাল নেহরু সম্পর্কে কোনো সমালোচনা মুখর হয়নি। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ঠেলাগাড়ি চালকদের ধর্মঘট ‘প্রবাসী’ পত্রিকার পাতায় স্থান পায়নি। এছাড়া ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত কর্তৃক মহাকরণ অভিযান, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে অ্যালফ্রেড পার্কে বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে পুলিশের সংগ্রামে শহীদ হওয়া এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটি গঠনের কথা, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রাম পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত ইউরোপীয় ক্লাবে আত্মঘাতী আক্রমণ, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ঘটনা খুব সামান্যই পরিবেশিত হয়েছে। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সূর্য্য সেনের ফাঁসি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষণা, কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের কথা, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তেলেঙ্গানা আন্দোলন ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠায় খুব কমই স্থান পেয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবী ধারায় যে সব বিপ্লবী দল - অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, বেঙ্গল ভলেনটিয়ার্স, মিত্রমেলা, গদরপার্টি প্রভৃতির কাজকর্ম সম্পর্কে ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠা শূন্য ছিল। এই তালিকা থেকে প্রমাণিত হয় যে ‘প্রবাসী’ পত্রিকার এক নীতি ছিল, তা হল তৎকালীন বিতর্কিত তত্ত্ব ও তথ্য যথা সন্ত্রাসবাদ, কমিউনিস্ট দল, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি বিষয়কে এড়িয়ে চলা। এর কারণ হয়ত যাতে পত্রিকাটি কোন বিতর্কের শিকার না হয় এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির কুনজরে না পড়ে। কিন্তু নীতিগত ভাবে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা পত্রিকাটির পৃষ্ঠায় প্রকাশ পয়েছে। কারণ ‘প্রবাসী’র মতে সন্ত্রাসবাদের কারণ রাজনৈতিক এবং ব্রিটিশ দমন পীড়ন এর জন্য দায়ী। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে পত্রিকাটি চরম অবস্থান গ্রহণ করেনি।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, ‘প্রবাসী’ পত্রিকা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রের যে ভূমিকা পালন করা উচিত তা ভালভাবে ও সীমিত অবস্থার মধ্যে পালন করেছিল যা সাংবাদিকতার জগতে প্রনিধানযোগ্য। নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে কিছু কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা হয়ত উপেক্ষিত বা যথাযথভাবে বর্ণিত হয়নি। কিন্তু

সবদিক বিবেচনা করে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কিংবদন্তী সাংবাদিক ও সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর অসাধারণ মেধা, নিষ্ঠা ও সম্পাদকীয় বৈশিষ্ট্যে 'প্রবাসী' পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে যে ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, তা ভারতীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৯০-৯১

২. প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৯৯-৯০০

৩. তদেব

৪. প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৯৮-৯৯

৫. প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৯৮

৬. প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৯৭-৯৯

৭. প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৫

৮. প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৬০

৯. প্রবাসী, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৬, ২৯৩, ৪৫২

১০. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০৯

১১. প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪৪-৪৫

১২. তদেব

১৩. তদেব

১৪. তদেব

১৫. প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪৫

১৬. প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৪

১৭. প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৬০-৬৪

১৮. প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪৬-১৪৭, ১৫৪

১৯. প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ - 'নোংরা জড়োপাসক' আষাঢ় ১৩৩৩, পৃ. ৫৩৯

২০. Ghosh Semanti - Different Nationalism Bengal 1905-1947, Oxford University Press, 2017, p. 1-19

২১. দেবী, শান্তা - ভারত মুক্তি সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা, প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৩৭

২২. প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৯১-৯৩

২৩. প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪৪

২৪. তদেব

২৫. প্রবাসী,বৈশাখ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪২

২৬. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯৪
২৭. প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৩৯
২৮. প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৪
২৯. প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৯৭
৩০. প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৫
৩১. প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৩২
৩২. প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯৬
৩৩. প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬০৩
৩৪. তদেব
৩৫. প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬০৬
৩৬. প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৪৭
৩৭. তদেব
৩৮. প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭২৭
৩৯. প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৫৬
৪০. প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৭৮
৪১. প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭৬
৪২. তদেব
৪৩. প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭২৩
৪৪. প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১০
৪৫. প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১০-১১
৪৬. প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৩২-৩৫
৪৭. প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৭৬
৪৮. প্রবাসী,মাঘ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৬৫
৪৯. প্রবাসী, ফাগ্লুন, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৭৯
৫০. প্রবাসী, ফাগ্লুন, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮০
৫১. প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৯৬
৫২. প্রবাসী,মাঘ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৬৪
৫৩. প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪
৫৪. তদেব
৫৫. সরকার, সুমিত - আধুনিক ভারত (১৮৮৫ - ১৯৪৭), কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৯২
৫৬. প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৭-১১০
৫৭. তদেব

৫৮. তদেব
৫৯. প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩১
৬০. প্রবাসী, ভাদ্র , ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৩২
৬১. প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬০৯
৬২. প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪২৯-৩২
৬৩. তদেব
৬৪. তদেব
৬৫. তদেব
৬৬. প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৩১
৬৭. তদেব
৬৮. প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭২৬
৬৯. প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৮-৫১
৭০. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯, বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৯-৩০
৭১. প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৯, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪০
৭২. প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৮, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৩১
৭৩. প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪০, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭২৬
৭৪. প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪৪, বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫২
৭৫. প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪০, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪৩-৪৪
৭৬. প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৭, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪০২-০৩
৭৭. প্রবাসী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৪৪, বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪৮, ২৯৫, ৬০৫
৭৮. প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৫, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬২১
৭৯. প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪৫, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮৭
৮০. প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪১, বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৩-৫৫
৮১. প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৯, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৫৮
৮২. প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৭, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬৪-৬৫
৮৩. প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪৫, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৯৯
৮৪. প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪৫, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৮৫
৮৫. প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৩, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৬৩

SWAMI VIVEKANANDA: A TORCH BEARER OF WOMEN EDUCATION & EMPOWERMENT

Debashis Biswas
Assistant Professor, Raidighi College

ABSTRACT : Swami Vivekananda, the ideal speaker and thinker is recognized globally for his spiritual wisdom of Hindu religion. Among the modern Indian reformers and philosophers, Vivekananda argued for equality of men and women. Swami Vivekananda is the first monk to uphold for freedom and equality of women and realized the importance of women for the society as well as the nation. He identified that the ignorance of women was the main hindrance for the progress in India. He insisted that women should be placed in the arena of power to solve their own problem and this possibility is hidden in education. He engaged throughout his life for development of women education. His objective of education is man making and character building which he also applied in field of women education. His educational perspective is based on applied Vedanta and Western ideology. Thinking the different social status, Swamiji prepared different curriculum for the women. According to him, mother tongue is the best medium for the social and mass education. Today we are living in the globalized world and education is the key factor for development and advancement. In the post independent India, women are still suffering many problems such as physical, social, political, cultural and economical. This situation should be removed through proper education and empowering them. Today various women universities, colleges are opening. This will also help for women empowerment and make them strong and independent. The present paper will illustrate Swami Vivekananda's philosophy and ideas of women education and its impact in present scenario.

Keywords: Philosophy, Equality, Women Education and Women Empowerment.

Introduction:

Swamiji defines education as **"the manifestation of the perfection already in man".** This implies that something already exists and is waiting to be expressed. According to him, knowledge is inherent in man, not acquired from external sources. Swami Vivekananda also defines

education as **"life-building, man-making, character-making assimilation of ideas"**, and not a certain **"amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested all your life".**

Swami Vivekananda's Views on Women Education:

Vivekananda stresses the importance of women education. He explains the point about how female illiteracy retards the progress of a society.

- **"There is no chance for the welfare of the world unless the condition of woman is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing."**
- **"Educate your women first and leave them to themselves; then they will tell you what reforms are necessary for them."**
- **"Our right of interference is limited entirely to giving education. Women must be put in a position to solve their own problems in their own way. No one can or ought to do this for them. And our Indian women are capable of doing it as any in the world."**

These golden quotes of Swami Vivekananda explain how significant female literacy is. Vivekananda realized that right type of education is very important for females in our country because once they get right type of education they will be in a position to solve their own problems. He had suggested introducing subjects like sewing, nursing, culinary art etc because he believed that women should be imparted training emphasizing skill enhancement. Then, his intention and focus was on vocational skills and training to empower women in the way of living.

Vivekananda strongly believes that there is a huge difference in the attitude of Indian men and their western counterparts. Indian men believe that the women are born to please them. The real Shakti-worshipper is he who knows that God is the omnipresent force in the universe and sees in women the manifestation of that force. In America men look upon their women in this light and treat their women as well as can be desired, and hence they are so prosperous, so learned, so free and so energetic. The men and the women are the two wheels of the society. If one of the two falls defective, the society cannot make progress. Hence we need education for the females.

Recent Scenario of Women education in India:

In Independent India, education acquired special significance and has been supported by the government from time to time through its policies and programs. Therefore, in recent years the Education system has expanded rapidly. But still a large number of women are in dark and the gender gap in literacy rate remains startling by its presence. The following facts and figures throw light on the criticality of the problem which is a harsh reality and demonstrate that we have a herculean task ahead.

Table: Literacy rates in India (1951-2011)

Year	Persons	Males	Females	Male Female Gap in Literacy rate
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.84	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

(Source: Census of India)

Issues for Low Literacy Rates among Women:

In spite of various plans and policies formulated and implemented by Indian govt. to eradicate illiteracy from our country, especially among women, the gap between male and female literacy still persist. In this context, the Factors responsible for low female literacy rate in India are identified and listed below:

- Gender bias in the curriculum (female characters being depicted as weak & helpless)
- Social discrimination and economic exploitation.
- Occupation of girl child in domestic chores.
- Low enrollment of girls in schools.

- Low retention rate and high dropout rate.
- Deprived of access to information and alienated from decision-making processes.
- Shortage of female teachers in schools.
- Inadequate school facilities (such as sanitary facilities etc).
- Rapid growth of population which leads to the neglect of girl child and put more emphasis on the boy education. Women is considered as liability who will one time get married and will not contribute to the economic and social development.

Policies:

Before and after Independence, India has been taking active steps towards women's status and education. The 86th Constitutional Amendment Act, 2002, has been a path breaking step towards the growth of education, especially for females. According to this act, elementary education is a fundamental right for children between the ages of 6 and 14. The government has undertaken to provide this education free of cost and make it compulsory for those in that age group. This undertaking is more widely known as Sarva Shiksha Abhiyan (SSA). Since then, the SSA has come up with many schemes for inclusive as well as exclusive growth of Indian education as a whole, including schemes to help foster the growth of female education.

The major schemes are the following:

1. Mahila Samakhya Programme: This programme was launched in 1988 as a result of the New Education Policy (1968). It was created for the empowerment of women from rural areas especially socially and economically marginalized groups. When the SSA was formed, it initially set up a committee to look into this programme, how it was working and recommends new changes that could be made.

2. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme (KGBV): This scheme was launched in July, 2004, to provide education to girls at primary level. It is primarily for the underprivileged and rural areas where literacy level for females is very low. The schools that were set up have 100% reservation: 75% for backward class and 25% for BPL (below Poverty line) females.

3. National Programme for Education of Girls at Elementary Level (NPEGEL): This programme was launched in July, 2003. It was an

incentive to reach out to the girls who the SSA was not able to reach through other schemes. The SSA called out to the "hardest to reach girls". This scheme has covered 24 states in India. Under the NPEGEL, "model schools" have been set up to provide better opportunities to girls.The very first step towards women education and empowerment is to achieve the desired literacy rate. At the same time a notable reconsideration needs to be made regarding imparting an enhancement of certain vocational skills as visualized by Swami Vivekananda.

4. Kanyashree: Kanyashree Prakalpa is a West Bengal government initiative that seeks to improve the status and wellbeing of girls, specifically those from socio-economically disadvantaged families through Conditional Cash Transfers. It is being implemented by the Department of Women Development and Social Welfare, Government of West Bengal. Kanyashree Prakalpa aims to improve the status and well being of the girl child in West Bengal by

- Incentivizing them to continue in education for a longer period of time, and complete secondary or higher secondary education, or equivalent in technical or vocational steams, thereby giving them a better footing in both the economic and social spheres.
- Disincentivising marriage till at least the age of 18, the legal age of marriage, thereby reducing the risks of early pregnancies, associated risks of maternal and child mortality, and other debilitating health conditions, including those of malnutrition.
- Scheme to confer more than just monetary support; it should be a means of financial inclusion and a tool of empowerment for adolescent girls. The schemes benefits are therefore paid directly to bank accounts in the girls names, leaving the decision of utilization of the money in their hands.
- To reinforce the positive impact of increased education and delayed marriages, the scheme also works to enhance the social power and self-esteem of girls through a targeted behaviour change communication strategy. The communication strategy not only builds awareness of the scheme, but includes adolescent-friendly approaches like events, competitions and Kanyashree clubs, and the

endorsement of strong women figures as role models to promote social and psychological empowerment.

5. "Beti Bacchao, Beti Porao" ("Save the Daughter, Educate the Daughter") is a campaign of the Government of India that aims to generate awareness and improve the efficiency of welfare services intended for girls in India. The objectives of the Scheme are as under:

- To prevent gender biased sex selective elimination
- To ensure survival and protection of the girl child
- To ensure education and participation of the girl child

Conclusion:

Swami Vivekananda rightly pointed out that unless Indian women secure a respectable place in this country, nation can never march forward. Swami said that the progress of a nation depends on its treatment of women. And it is impossible to get back India's lost pride and honor unless they try to better the condition of women. So, according to him, there is no chance for welfare of the world unless the condition of women is improved. It is one of the foremost concerns of the Government of India as well as of the society at large. It is due to the fact that at the present time, the educated women play a very significant role in overall development and progress of the country. India is now optimistic in the field of women education. After Independence, Women education acquired special significance and has been supported by the government from time to time through its policies and programs. Swami Vivekananda's vision on women education and today's mission of eradicating gender gap in literacy rate both indicate one goal---progress of women and thereby the progress of entire nation. I must end with the significant quote by Swamiji **"Arise, Awake & Stop not still the goal is reached".**

References:

1. Nithiya, P (2012), *Swami Vivekananda's 'Views on Philosophy of Education'*, Asian Journal of Multidimensional Research.
2. Roy, Dr. Sudipa Dutta (2001), *'Education In The Vision of Swami Vivekananda'*.
3. Kumar, Dr. Jitendra & Ms. Sangeeta (2013), *'Status of Women Education in India'*, Educationia Confab.
4.

5. Rao, R.K. (2004), *'Women and Education'*, Kalpaz Publication, Delhi.
6. Rani, G.Sandhya (2010),*'Women's Education in India – An Analysis'*, Asia-Pacific Journal of Social Science.
7. Mazumdar, Vina (2002), *'Evolution of Women's Studies in India. Dialogue with Researchers: Linking Policy and Research—A Consultation on Women's Studies'*. Centre for Women's Development Studies, New Delhi.
8. Vivekananda, Swami (1986), *'Āmar Bhārat amar Bhārat'*, Golpark Ramkrishna Mission Institute of Culture, Kolkata.

E-Reference:

1. www.swamivivekanandaquotesgarden.blogspot.in
2. www.writespirit.net

'The Quarantine And Its Evolution Of Practice : From Historical Perspective'

Hoque Sabiruddin
Former guest faculty, Post Graduate Section
Department of History, Malda College
University of Gour Banga

Abstract : Quarantine is one of the oldest and highly important health measures elaborated by mankind. This paper mainly focuses on the evolution of the quarantine related practice, besides that the concept and effectiveness of quarantine, the social, economic and political obstacles to its proper implementation through time with place, and the health impact of local and large – scale quarantine. The eminent doctor and medicine specialist Ana Bakija – Konsuo of Dubrovnik mentioned in his book 'The Story Lazarettos quarantine' that the first quarantine was established at Ragusa city (modern – day Dubrovnik) in 1377 in Europe, as protection from leprosy, a bacterial illness that affects the nerves, skin and the respiratory organs. This study aims to better define quarantine within the parameters of human technology and, therefore, to gain a deeper understanding of its uses in relation to advancements made in science and medicine.

Keywords : Quarantine, Black Death, Isolation, Germ Theory, Plague, Pathological Paradigm.

Basic Concept on Quarantine :

Quarantine is the activities for separation of peoples who are not ill but who are hesitated to have been exposed to infection, for the purpose of preventing transmission of diseases. Persons are basically quarantined in their homes, besides that, they may also be quarantined in community - based facilities.[1] The word quarantine comes from quarantena, meaning "forty days",[2] used in the 14th - 15th centuries Venetian language and designating the period that all ships were required to be isolated before passengers and crew could go ashore during the Black Death plague epidemic ; it followed the trentino, or thirty – day isolation period, first imposed

in the Republic of Ragusa, Dalmatia (modern Dubrovnik in Croatia).[3]

Quarantine is ideal, because not only is the recovery better, but it is surely aloof and safer for the family, caregivers, and the community in general. At home, extending the quarantine period is possible.[4] The concept of quarantine are profoundly rooted in culture and health procedures, and have periodically recalled peak interest in the course of epidemics. In the very early concept of quarantine was mainly used to consider for the phase of isolation of people alone, whereas in more recent times, it has come to be applied to animals and things as well.[5]

Quarantine through Technology :

Quarantine is a very sensitive idea and differs greatly from isolation, in which those confirmed to be infected with a communicable disease are isolated from the healthy population. In general, Quarantine considerations are often one aspect of border control. Quarantine requires a theoretical study about the causes and methods of disease transmission. Throughout much of early epidemiological history, isolation, not quarantine, was the primary method of halting the spread of pandemics, because people did not understand the concept of an incubation period.[6]

Without proper knowledge of medical sciences, the historical important and impact of quarantine cannot be gathered. The main concept of utilized in true quarantine is germ theory, which holds that microscopic organisms called bacteria are the cause of disease. In 1861, Louis Pasteur was firstly introduced 'germ theory' through his outstanding work.[7] In 1876, German physician Robert Koch " traced the life history of the organism responsible for anthrax, a disease of cattle and sheep."[8] After six years, in 1882, Koch successfully traced tuberculosis, "first human disease microorganism."[9] Though Koch's discovery was significant in retrospect, germ theory did not become part of scientific and medical ground until the early twentieth century.[10] Koch's contemporaries were trained to believe that, " most diseases were caused by miasmas, undisciplined lifestyles, and anything other than tiny living organisms."[11]

The invention of germ theory and the concept pivotal to the technology of quarantine is the notion of the incubation period of disease. Anyone who carries a pathogen responsible for a disease is considered infected, though not all carries may be symptomatic. Symptoms of a disease are not always caused by the pathogen itself.[12] Sometimes, the symptoms occur due to the response of the immune system in its attempt to fight off the infection. An excellent example of an immune response symptom is a fever, which is the body's attempt to control the spread of harmful microbes through internal temperature regulation.[13]

Rudi Volti describes the technology as " a system based on the application of knowledge, manifested in physical objects and organisational forms, for the attainment of specific goals."[14] Generally, it is very important that by such definitions, technologies are employed even when the users have theories regarding how to attain their specific goals based on false information.

Without any confusion, technology is a major key factor in the medical sciences, but it does have restrictions. Supernatural means of attaining specific goals, such as prayer or belief in the divine intervention, do not incorporate technologies. Maurice Richter comments that " technology requires that natural means be employed : we shall not allow......for a technology of prayer."[15]

Emperor Justinian I (482 – 565 CE) contracted the plague, but he survived and became immune to its effects. He quickly set up procedures for disposing of the many corpses in his capital after realizing the magnitude of the outbreak. Public money was set aside for the payment of gravediggers, and boats contracted to dump bodies at sea.[16] In addition, a series of laws were enacted against those individuals. He believed to be most responsible for the epidemic, including Jews, Samaritans, pagans, heretics, Arians, Montanists, and homosexuals.[17] These laws created an artificial quarantine around Constantinople.

Discriminatory laws of Justinian created a sort of quarantine, though he had no knowledge of what caused the disease to spread. The quarantine enacted by Justinian proved virtually useless and did nothing to stop the spread of the plague. However, it still qualifies

as a quarantine technology, a failed technology, but a technology nonetheless.

Practice and Evolution of Quarantine :

The quarantine related practice has been changed through the time and space. Quarantine has been implemented in many different ways in the course of Western history, undergoing periods in which it was highly considered and periods in which it was relatively neglected. In Europe and North America, during the last decades of the twentieth century, quarantine was substantially underrated, given that the spectacular achievements of modern medicine, from effective vaccines to powerful antibiotics, generated, in the general public but sometimes in health systems and operators cooperation of U.S. citizens would be low, if not very low. Reviewing quarantine from a historical – didactic perspective therefore constitutes a notable formative opportunity to illustrate an ever – pertinent health measure, whose general potentialities and limits of application must be precisely understood not only by health administrators, medical historians and technical operators, but also by the general public.

Theoretical and practical considerations need to be considered when applying quarantine to people. Practice differ from region to region. In some countries, quarantine is just one of many measures governed by legislation relating to the broader concept of biosecurity. In this respect, here trying to discuss about the changing flow of quarantine's practice through the different phases.

The Ancient Period :

Quarantines have been employed for thousands of years as safeguards against the spread of disease. Early in the history of human civilizations, isolation and confinement of ill persons were the predecessors of quarantine. The word 'quarantine' turn from the Latin 'quadraginta', which focuses on the common denominator of the word is the temporal indication of a period of 40 days. This period had already been identified with precision by the Hippocratic School, which, around the fifth century B.C., described a number of diseases with specific reference to their duration. Plague was considered a 'pathological paradigm' for acute illnesses, those that manifested themselves within 40 days ; diseases clinically evident

after 40 days could not be acute, and consequently could not be the dangerous plague. Forty days was therefore considered in ancient Greek medicine a medical turning point useful in differentiating different diseases, and 40 days accordingly became the established length of quarantine for transmissible diseases.[18]

Not only the textbooks, even different religious books also notice the various types of disease and findings the way of prevention from these disease. The Holy Bible describes health control measures. The Old Testament suggests isolating infected people, also indicating the need to burn their garments. Specifically, the text refers to the plague and leprosy, thus evidencing how people affected both by rapidly beginning and developing diseases, such as the plague, and by slowly evolving ones, such as leprosy, were to be segregated from healthy people for variable periods. In the New Testament, too, leprosy is considered a determinant of social discrimination, capable of being cured only by means of a divine miracle, and isolation of sick people continues to be implemented as the most effective strategy to control the spread of transmissible diseases.[19]

The Middle Ages :

The practice of quarantine, as we know it, began during the 14th century in an effort to protect coastal cities from plague epidemics. Ships arriving in Venice from infected ports were required to sit at anchor for 40 days before landing. This practice, called quarantine, was derived from the Italian words quaranta giorni which mean 40 days.

The middle ages are considered the ten centuries from the end of the fifth century AD to the end of the fifteenth century AD (1492, the discovery of America). Historical sources from the sixth to the fifteenth centuries AD clearly indicate that, from a clinical and epidemiological standpoint, what today is called the plague, the infectious disease caused by Yersinia pestis (the Latin 'pestis'), gave rise to recurrent epidemics throughout Europe. In the course of the fourteenth century, for example, the plague caused the death of more than 30 % of the European population. In the absence of vaccines and drugs, quarantine was the only effective health measure against the spread of transmissible diseases.[20]

It is in this context, and specifically during the fourteenth century, that, at least in the western world, the concept of structured preventive quarantine emerges. As has been said, in Medieval times the plague continued to represent a major public health and economic danger, and therefore, to protect their people and their trade, the great mercantile potencies issued, in the course of the fourteenth century, rules and regulations regarding quarantine.

In 1348, during a notorious epidemic of the plague (the 'Black Death' described by the Italian Writer Giovanni Boccaccio), the Republic of Venice (Italy) established a system of quarantine assigning to a council of three the responsibility and power of detaining individuals and entire ships in the Venetian lagoon for 40 days.

At the end of the Middle Ages, the primacy of drawing up edicts, rules, and regulations regarding Quarantine. Quarantining policies were of course determined by health necessities, but also to a notable extent by economic reasons, as is evident from the naval trading roles of Venice and Ragusa in Medieval Europe. Not by the chance did the attention of the Venetian and Ragusan ruluers to the medical features of the plague and also to its important economical and social effects led to the elaboration of the first official quarantine systems. These rules and regulations became a template for many other European countries during the next times.

Modern Times :

The European Renaissance is considered to be the period covering part of the fifteenth and sixteenth century. At the beginning of the sixteenth century a maritime quarantine center was opened in the French port of Marseilles. After that, the new and relevant medical hypothesis allowed official medicine to elaborate more precise quarantine inventions.[21] The various rulers of the European countries were established quarantine center in their States during the entire seventeenth and eighteenth centuries. It is important that the opened of the quarantine related study as large scale during the concerned time frame. Furthermore, quarantine regulations were sometimes implemented as pretexts for repressive measures ; the disinfection of correspondence, for example, was used as an excuse for political espionage.[22] During the nineteenth century, different countries of

Europe had shared rules and regulations to prevention from diseases. As per result, the different conferences were organized in the nineteenth century, such as Washington DC conference in 1881, Rome conference in 1885. In 1893, both in the United States and in Europe, an agreement was reached regarding the fundamental issue of the notification of disease. This agreement is generally considered a turning point for the effective standardization of quarantine measures.[23]

A great boost in scientific progress dates back to the first 40 years of the twentieth century, a period in which a profound, and appropriate, medicalization of quarantine measures emerged. In 1903, the expression 'lazaretto' was replaced by 'health station' for providing the proper medical service. In 1907, an International Office of Public Health was set up, to which, by 1909, at least 20 nations had joined. From a nosographical standpoint, in 1926 quarantine practices were extended to typhus and variola, and in 1928 the International Office issued additional precise rules of quarantining for all the different types of travellers.

In effect, by that time, contrary to the past, sea and land were no longer the only areas of travel, since travelling by air was becoming more widespread. By the end of the twentieth century, air movements became the main transmission modalities for large – scale diseases requiring quarantine, such as SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) and avain influenza. Since the time of foundation (7th April 1948), the World Health Organization (WHO) has been actively engaged for the protection of the international public health. Quarantine was transferred to the agency now known as the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in 1967. CDC remained part of the Department of Health, Education, and Welfare (HEW) until 1980 when the department was reorganized into the Department of Health and Human Service. When CDC assumed responsibility for quarantine, it was a large organization with 55 quarantine stations and more than 500 staff members. Quarantine stations were located at every port, international airport, and major border crossing.

The present world is passing through the COVID – 19 pandemic. Most of the governments highly restricted or advised

against all non – essential travel to and from countries and areas affected by the outbreak.[24] The virus has already spread within communities in large parts of the world, with many not knowing where or how they were infected.[25] So, relevance of the quarantine is highly significant in this present COVID - 19 pandemic situation.

Conclusion :

Since three thousand years ago, quarantine and isolation were employed as technologies against the proliferation of disease. As human understanding of disease transmission grew, quarantine sophistication and efficacy improved, until it became standard practice in combating epidemics. Though not always successful, quarantines delayed or contained outbreaks by removing all potential pathogen carriers from the populace. At first, lightly used against leprosy and plagues of antiquity, quarantine, as a technology, expanded rapidly in the Western world during the Black Death epidemic. Its initial success against the plague established quarantine as a standard procedure to stopping the spread of epidemics and pandemics.

From the above all discussion, we can say that the basic conceptual and operational background of quarantine still has an epistemological and applicative value. The evidence – based current epidemiology and the evidence – based history of medicine show that the implementation of correct quarantine procedures is feasible and effective if tailored to geographical, social, and health conditions and when collaboration occurs among those concerned.

The historical persistence of the term 'quarantine,' etymologically indicating a 40 – day period but now operatively defining variable time interventions for different communicable diseases, is the best documentation of the continuing value of this health measure through the centuries. So, if we don't obey the properly rules and regulations of quarantine, we will not to live from the contagious diseases. Even, we will never built the disease - free better world for the next generation.

Notes and References:

1. Guidelines for Quarantine facilities COVID - 19, National Centre for Disease Control, Delhi, Government of India, p.3.

2. Conti, A. A , Quarantine Through History, International Encyclopedia of Public Health, University off Firenze, Italy, 2008, p. 455.
3. Henry, Ronnie, 'Etymologia : Quarantine', Emerging Infectious Diseases, Centers for Diseases Control and Prevention, Atlanta, USA, Volume 19, Number 2, February 2013, p.263.
4. Article written by Anuradha Mascarenhas in The Indian Express on June 21, 2020.
5. Gensini G. F., Conti, A.A, The evolution of the concept of 'fever' in the history of Medicine : From pathological picture to clinical epiphenomenon , Journal of Infection, 2004, pp. 85 – 87.
6. "Quarantine and Isolation," Centers for Disease control and Prevention, last modified October 24, 2011, accessed December 5, 2011.
7. Paolo, Charles De, Epidemic Disease and Human Understanding, Jefferson, NC : McFarland & Company, Inc., 2006, p.154.
8. Hays, Jo. N, The Burdens of Disease : Epidemics and Human Response in Western History, Piscataway, NJ : Rutgers University Press, 1998, p. 150.
9. Ibid.
10. Paolo, Op. Cit., p. 155.
11. Watts, Sheldon, Epidemics and History : Disease, Power and Imperialism, Wiltshire, United Kingdom : Redwood Books, 1997, xii.
12. Article written by Kelly Drews in the Virginia Tech Undergraduate Historical Review, 1 May 2013.
13. Volti, Rudi, Society and Technological Change, New York : St. Martin's Press, 1995, p.6
14. Ibid.
15. Richter, Maurice, Technology and Social Complexity, Albany : State University of New York Press, 1982, p.10.
16. Hays, Epidemics and Pandemics : Their Impacts on Human History, Santa Barbara : ABC – CLIO, Inc., 2005, p.26.

17. Little, Lester , Plague and the End of Antiquity : The Pandemic of 541 – 750, New York : Cambridge University Press, 2007, p.113.
18. Conti, A.A., Lippi D., Gensini G.F. Tuberculosis : A long fight against it and its current resurgence, Monaldi Archives of Chest Disease, 2004, pp. 71 – 74.
19. Conti A.A., Gensini G.F., The historical evolution of some intrinsic dimensions of quarantine, Medicina nei Secoli, 2007, pp. 173 – 188.
20. Knowelden, J, The New Encyclopedia Britannica, 15th edn., Helen Hemingway Benton ; Chicago, 1979, Quarantine and Isolation, pp. 326 – 327.
21. Gensini G.F., Yacoub M.H., Conti A.A., The concept of quarantine in history : From plague to SARS, Journal of Infection, 2004, pp. 326 – 327.
22. Mafart B., Perret J.L, History of the concept of quarantine, Medicine Tropicale, 2003, pp. 14 – 20.
23. Conti, A. A., Op.Cit., p. 459.
24. ‘COVID – 19 Information for Travel’, U.S., Centers for Disease Control and Prevention (CDC) , 11 February 2020 .
25. “Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) – Transmission”, U.S., Centers for Disease Control and Prevention (CDC)., 17 March 2020.

Job satisfaction of college teachers in West Bengal: An empirical study in the field of organizational psychology

Lusika Datta
Research Scholar, M.Phil. Programme, Department of Education,
Diamond Harbour Women's University, West Bengal
Usashi Kundu (De)
Assistant Professor, Department of Education,
Diamond Harbour Women's University, West Bengal

Abstract : Satisfaction in job provides mental support and brings happiness in daily life which is viewed as similar to pleasure. The purpose of the research is to identify the level of college teachers' job satisfaction and to find out if there is any difference in terms of gender and age. The sample is consisted of a total 199 college teachers who teach at graduation level (B.A, B.Sc., B.Com) in government aided general degree colleges in West Bengal. To collect data for the present study Teachers' Job Satisfaction Questionnaire constructed and standardised by Dr. (Mrs.) Nasrin and Dr. (Mrs.) Afshan Anees (2014) has been used. Data have been collected by both online and offline mode through Purposive sampling technique. To analyse the data descriptive statistics (percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test) have been applied. Majority of college teachers belong to the level of average/moderate satisfied in their profession. There exists no significant gender wise and age wise difference among the college teachers in their job satisfaction. The results of this study would help to understand the factors responsible for job stress and adjustment among college teachers. The result will be important to the government, policy makers, counsellors, education providers and other stake holders to provide better strategies in order to reduce job stress and to grow job satisfaction among college teachers.

Keywords: Job satisfaction, college teacher, organizational psychology, attitude towards teaching

Introduction

Job satisfaction can be defined as the extent of positive feelings and attitudes that individuals have towards their jobs, related factors and also in life. An employee feels satisfaction in job as a complex of

interrelationship of likes, roles, responsibilities, interaction, incentives and rewards which are intimately related to each other. Satisfaction in job provides mental support and brings happiness in daily life which is viewed as similar to pleasure. Lock(1976) and Demirtas (2010) observed job satisfaction as a pleasurable positive emotional state resulting from the appraisal of one's job or job experiences. Job satisfaction is one of the most popular and widely researched topic in the field of organizational psychology (Spector, 1997). Hoppock (1935) defined job satisfaction as the combination of psychological, physiological, and environmental circumstances that cause a person significantly to say that he/she has been satisfied with the job. Satisfaction is the result of positive attitude of teachers towards teaching and dissatisfaction comes from teachers' negative attitudes (Vroom, 1964). Over the years, researchers have identified factors that affect the level of teachers' satisfaction or dissatisfaction in job. Thomas Willard Harrel (1958), in his book 'Industrial Psychology' discussed on many interrelated factors of job satisfaction. He claimed that job satisfaction depends upon three major categories of factors, personal factors like gender, age, intelligence, education, personality, time of job; factors controlled by management like security, pay, working condition; factors inherent in the job like type of work, occupational status, and so on. The teachers' satisfaction in job is very important for guiding the students in right direction, enhance teaching learning situation, and improve the condition of an educational institution.

Trabue (1993) suggested that profound satisfaction in job is the actual achievement of a teacher and if a teacher is positively motivated in teaching being satisfied in all dimensions he/she can turn up to the public expectations. Katoch (2012) found that salaries, physical environment, job security, desired profession, job matching with academic qualification, vacations and fringe benefits, etc. affect the job satisfaction among the college teachers. Aich and Nanda (2017) mentioned that there is gender wise significant difference but age wise no significant difference among the teachers in their job satisfaction. Bashir (2017) revealed that there is a significant difference between male and female school teachers in secondary level in their job satisfaction and no significant difference exists in case of professional commitment. Barman and Bhattacharya (2017) and Gupta and Gehlawat (2013) found that

gender and age have no significant influence on teacher's job satisfaction. There exists significant and positive relationship between job satisfaction and job involvement (Gopinath et al., 2020).

Objectives:

The objectives of the present study are as follows:

- To study the nature of college teachers' job satisfaction.
- To find out gender wise difference among the college teachers in their job satisfaction.
- To find out age wise difference among the college teachers in their job satisfaction.

Hypotheses:

$H_0$1: There is no significant difference in job satisfaction between male and female college teachers.

$H_0$2: There is no significant difference in job satisfaction between the college teachers who are below the age forty-five years and equal and above the age forty-five years.

Methodology

Population, Sample and sampling procedure: The population of the present study is the teachers of government-aided general degree colleges in West Bengal. The sample consisted of 199 college teachers who teach at graduation level (B.A, B.Sc., B.Com). To collect data for the present study purposive sampling technique has been applied. Total sample have been categorised into two groups; gender and age and these are normally distributed being tested through skewness, kurtosis and Shapiro-Wilk value by SPSS statistics-17.0 version.

Table 1: The distribution of Sample according to Categorical Variables (Gender and Age)

Total Sample i.e. 199		By Gender	
		Male	Female
By Age	< 45	53	50
	≥ 45	52	44

Variables under study: The present study is conducted based on an independent variable: Teachers' Job Satisfaction. There are two categorical variables: gender and age.

Tool: The tool used in this study is Teachers' Job Satisfaction Questionnaire, constructed and standardised by Dr. (Mrs.) Nasrin and Dr. (Mrs.) Afshan Anees (2014). It follows the Likert's five point rating scale technique. There are total 42 items, among them 39 positive and 3 negative statements. The areas of this scale are Quality of teaching, Innovative teaching, Responsibility for teaching, Cooperative teaching behaviour, Teaching attitude, Group relationship, Job acceptance, Classroom behaviour, and Social behaviour.

Procedure: Data has been collected in form of questionnaire which was formed in both Google form and word file format. These were distributed through both online and offline mode to the respondents. To know the college teachers' nature of job satisfaction descriptive statistics (percentage, mean, standard deviation) and for hypothesis testing inferential statistics (*t*-test) have been used.

Result and discussion

To study the nature of college teachers' job satisfaction analysis is done with interpretation of the levels of teachers' job satisfaction in total. This is also presented as per the category- gender (male, female) and age (below 45 years and equal and above 45 years).

Descriptive statistics

Table 2: The percentage of college teachers' job satisfaction (total)

Sl. No.	Level of Job Satisfaction	Range of z-scores	*n*	Percentage
1.	Extremely Satisfied	+2.01 and above	7	3.52
2.	Highly Satisfied	+1.26 to +2.00	35	17.59
3.	Above Average Satisfied	+0.51 to +1.25	56	28.14
4.	Average/Moderate Satisfied	-0.50 to +0.50	83	41.71
5.	Below Average Satisfied	-0.51 to -1.25	14	7.04
6.	Dissatisfaction	-1.26 to -2.00	2	1.01
7.	Extremely Dissatisfaction	-2.01 and below	2	1.01

Table 2 shows the level of job satisfaction of the college teachers. There is a very small number of teachers (3.52%) found who are extremely

satisfied in their job.17.59% college teachers are highly satisfied and 28.14% college teachers are above average satisfied in their teaching profession. Most of the college teachers shown in the above table belong to the level of average/moderate satisfied, as the percentage is given as 41.71%. A very low percentage of teachers, that is, 1.01% are dissatisfied and the same percentage of college teachers (1.01%) shown in the above table are extremely dissatisfied in their job.

Table 3: Gender wise and age wise percentage of job satisfaction among college teachers

Sl. No.	Teachers' Job Satisfaction	Gender-wise				Age-wise			
		Male		Female		<45		= > 45	
		n	%	*n*	%	*n*	%	*n*	%
1.	Extremely Satisfied	04	3.81	03	3.19	03	2.91	04	4.17
2.	Highly Satisfied	22	20.95	13	13.83	16	15.53	19	19.79
3.	Above Average Satisfied	30	28.57	26	27.66	26	25.24	30	31.25
4.	Average/ moderate Satisfied	44	41.90	39	41.49	46	44.66	37	38.54
5.	Below Average Satisfied	04	3.81	10	10.64	09	8.74	05	5.21
6.	Dissatisfaction	01	0.95	01	1.06	02	1.94	0	0.00
7.	Extremely Dissatisfaction	0	0.00	02	2.13	01	0.97	01	1.04
Total		105	100%	94	100%	103	100%	96	100%

Table 3 presents that most of the male and female college teachers possess average job satisfaction. In case of male it is 41.90% and in case of female the percentage is slightly lower than the male, that is, 41.49%. A very small percentage of college teachers (both male and female) are extremely satisfied in their job (male 3.81% and female 3.19%). 20.95% male college teachers and 13.83% female college teachers are in highly satisfied level. Only 0.95% male and 1.06% female belong to the level of dissatisfaction. No male college teacher is extremely dissatisfied. Only 2.13% female college teachers are extremely dissatisfied in their job. Age wise, most of the college teachers possess average job satisfaction. In case of below forty-five years the percentage is 44.66 and in case of equal

and above forty-five years age group the percentage is 38.54. 15.53%of college teachers of below forty-five years age have high job satisfaction and 19.79% of college teachers of equal and above forty-five years age have high job satisfaction. The number of college teachers having extremely high job satisfaction is very low, that is only 2.91% from the category below forty-five years and 4.17% from the category equal and above forty-five years. 1.94% of college teachers, age below forty-five years are dissatisfied in their job. 0.97% of college teachers, age below forty-five years and 1.04% of college teachers, age equal and above forty-five years are extremely dissatisfied in their job.

Table 4: Descriptive statistics on job satisfaction among college teachers gender wise, age wise and total

Categorical Variable		*n*	Min.	Max.	Range	Mean		Variance	*SD*
						Stat.	Std. Error		
Gender	Male	105	129	201	72	169.23	1.606	270.75	16.45
	Female	94	113	202	89	164.88	1.913	343.84	18.54
Age	<45	103	113	201	88	165.18	1.736	310.289	17.615
	=>45	96	113	202	89	169.31	1.770	300.807	17.344
Total	199		113	202	89	167.18	1.24	308.44	17.56

From table 4 the mean scores of male and female college teachers are found to be 169.23 and 164.88 respectively. As per mean score male college teachers are in the level of above average satisfaction and female college teachers are averagely satisfied in their job. It also shows that the mean scores of the college teachers belonging to the age below forty-five years and equal and above forty-five years are 165.18 and 169.31 respectively. It indicates that the college teachers belonging to below forty-five years age group are average/moderate satisfied in job and the college teachers equal and above forty-five age are above average satisfied in job. The calculated mean and standard deviation values of the total sample are found to be 167.18 and 17.56 respectively. The mean belongs to the range of z-score +0.51 to +1.25, that is, above average

satisfied which indicates that college teachers have above average satisfaction in their job.

Inferential Statistics

For testing the hypotheses and then analysing the result related to teachers' job satisfaction inferential statistics have been done as per the category gender (male, female) and age (below 45 years and equal and above 45 years).

Hypothesis 1: There is no significant difference in job satisfaction between male and female college teachers.

Table 5: Statistical comparison in job satisfaction between male and female college teachers

Sample size		Mean		*p*-value of Levene's Test for Equality of Variances	*t*-*t*est used	*t*	*df*	*p*-value of appropriate *t*-test
Male	Female	Score of male	Score of female					
105	94	169.23	164.88	.481	Equal variances	1.752	197	.081

From Table 5 it is found that the difference between the pair of mean scores of job satisfaction of male and female college teachers is not significant at 1% and also at 5% levels (i.e., the hypothesis $H_0$3 is not rejected at 1% as well as 5% levels). Therefore, the result of statistical comparison after testing hypothesis establishes the fact that there exists no significant difference in job satisfaction between male and female college teachers.

Hypothesis 2: There is no significant difference in job satisfaction between the college teachers who are below the age forty-five years and equal and above the age forty-five years.

Table 6: Statistical comparison in job satisfaction between below the age forty-five years and equal and above the age forty-five years college teachers

Sample size		Mean		*p*-value of Levene's Test for Equality of Variances	*t*-test used	*t*	*df*	*p*-value of appropriate *t*-test
<45	=>45	Score of <45	Score of =>45					
103	96	165.18	169.13	.973	Equal Variances	-1.664	197	.098

Table 6 shows that the difference between the pair of means of job satisfaction of the college teachers below the age forty-five years and equal and above the age forty-five years is not significant at 1% and even at 5% levels of significance (i.e., the hypothesis $H_0 6$ is not rejected at 1% as well as 5% levels). Therefore, the result establishes the fact that there exists no significant difference in job satisfaction between the college teachers who are below the age forty-five years and equal and above the age forty-five years.

In the present study the result depicts that majority of college teachers have average job satisfaction, few have high job satisfaction and a very small number of college teachers are dissatisfied in their job. Almost same result has been found in the study carried by Devi (2013) on elementary school teachers. In the present study there is no significant difference in job satisfaction between male and female college teachers. The result is entirely consistent with the findings of the study done by Raj and Mary (2005) and Seema (2012) who found no significant difference between male and female lecturers on job satisfaction of social, individual, vocational, moral and economic events. The result however contradicts the findings of Khatoon (2000), Ali et al. (2009), Lee (2009), Mahmood et al. (2011) and Bashir (2017) who concluded that female teachers were more satisfied with their jobs than male teachers. There exists no significant age wise difference which is supported by the findings of Devi (2013) who opined that in terms of different levels of age, teachers' job satisfaction does not differ at all; they have almost

similar level of satisfaction in their jobs. This result is also supported by Naik (1990), Agarwal (1991) and Raj and Mary (2005) who reported that teachers do not differ in their job satisfaction in terms of different age groups.

Implication

Job satisfaction is the most important aspect for teachers because teaching is considered as one of the most inspirational profession in the world. The results of this study would help to understand the factors responsible for job stress and adjustment among college teachers. The level of job satisfaction among college teachers would help the administrators and government to create a friendly atmosphere in the institutions. The result will be important to the government, policy makers, counsellors, education providers and other stake holders to provide better strategies in order to reduce job stress and to grow job satisfaction among college teachers.

Acknowledgements

The authors appreciate all those who participated in the study and helped to facilitate the research.

References:

1. Aggarwal, M. (1991). *Job satisfaction of teachers in relation to some demographic variables and values*. [Doctoral dissertation, Agra University]. Shodhganga.
2. Aich, D. K. & Nanda, B. (2017). Teacher's job satisfaction in inclusive schools in West Bengal. *Quest, 3*(2).
3. Ali, N., & Akhtar, Z. (2009). Job status, gender and level of education as determinants of job satisfaction of senior secondary school teachers. *Indian Journal of Social Science Researches*, 6 (1), 56-59.
4. Barman, P., & Bhattacharyya, D. (2017). Job satisfaction of teacher educators in different types of B.Ed. colleges in West Bengal. *IOSR Journal of Humanities and Social Science, 22*(2), 80-99. https://doi.org/10.9790/0837-2202028099
5. Bashir, L. (2017). Job satisfaction of teachers in relation to professional commitment. *The International Journal of Indian Psychology*, *4*(4). https://doi.org/10.25215/0404.007

6. Demirtus, Z. (2010). Teachers' job satisfaction levels. *Procedia Social and Behavioral Sciences, 9*(2010), 1069–1073. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.287
7. Devi, K. R. (2013). *Attitude of elementary school teachers towards teaching profession and its relation to their job satisfaction: A study of east and west Imphal, Manipur.* [Doctoral dissertation, Assam University] Shodhganga. http://hdl.handle.net/10603/37662
8. Gopinath, R., Yadav, A., Saurabh, S., & Swami, A. (2020). Influence of job satisfaction and job involvement of academicians with special reference to Tamil Nadu universities. *Sri Lankan Journal of Psychology*, 43-53. https://www.researchgate.net/publication/344584299
9. Gupta, M., & Gehlawat, M. (2013).Job satisfaction and work motivation of secondary school teachers in relation to some demographic variables: comparative study. *Educationia confab*, *2*(1), 10-19.
10. Harrell, T. W. (1958). *Industrial Psychology*. New York: Rinehart & Company.
11. Hoppock, R. (1935). Comparisons of satisfied and dissatisfied teachers. *Psychology Bulletin,* 32-68. http://connection.ebscohost.com/c/articles/59737611/
12. Katoch, O. R. (2012). Job satisfaction among college teachers: A study on government colleges in Jammu (J&K). *Asian Journal of Research in Social Science & Humanities, 2*(4), 164-180.
13. Khatoon, T., &Hasan, Z. (2000). Job satisfaction of secondary school teachers in relation to their personal variables: Sex, experience, professional training, salary and religion. *Indian Educational Review*, *36*(1), 64-73.
14. Lee, I. S. (2009). The effect of the working conditions on job satisfaction: Differences between genders in Korea. Busan Presbyterian University. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.336.7367
15. Lock, W. A. (1976). *The Nature and causes of job satisfaction: Hand book of Industrial and Organizational Psychology.* Chicago: Ran mcnally.

16. Mahmood, A., Nudrat, S., Asdaque, M., Nawaz, A., & Haider, N. (2011). Job satisfaction of secondary school teachers: A comparative analysis of gender, urban and rural schools. *Asian Social Science*. *7*(8), 203-208.
17. Naik, G. C. (1990). Job satisfaction of teaching assistants of the M.S. University of Baroda. [*M.Phil. dissertation,* The Maharaja Sayajirao University of Baroda].
18. Raj, P., & Mary. R. S. (2005). Job satisfaction of government school teachers in Pondicherry region. *Journal of All India Association for Educational Research, 17* (1&2), 80-81.
19. Seema, S. (2012). *A study of occupational self efficacy job satisfaction and attitude towards teaching profession among teachers working in teacher training institutions.* [Doctoral dissertation, MaharshiDayanand University]. Shodhganga. http://hd1.hand1e.net/10603/112621
20. Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes and consequences. *Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc*.
21. Trabue, M. R. (1993). *Educational psychology.*Prentice New York. Hall of India (Pvt) Ltd.
22. Vroom, V. (1964). *Work and motivation.*New York: John Wiley and Sons.

TEACHER: A FACILITATOR

Subhajit Saha
Assistant Professor, Department of Education,
Jibantala Rokeya Mahavidyalaya
Bisu Bhuinya
M.Ed,
Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math

Abstract: The teacher is an important part of the entire teaching-learning process. Despite the introduction of new mechanical and electronic teaching aids, as well as a greater emphasis on student-centred education, the teacher is still the most valuable human endeavour when everything is said and done. Teachers have a significant societal impact because they shape future adults' knowledge, abilities, and attitudes.It is the fact that the instructor's position is evolving as a result of smart and active learning methodologies. Teachers currently act as facilitators of learning. As a result of educational advancements, teaching and learning are changing. In the twenty-first century, their role as educators has changed, and they are now the educators who urge students to take responsibility for their own learning rather than being the source of all knowledge in the classroom.

Keywords: Teacher, Student-Centred Education, Facilitators

Introduction

At its most basic level, a facilitator is someone who can help people come together and work toward the best possible outcomes. Facilitators can achieve this by creating a structured setting that encourages both creativity and freedom of thought and expression. When it comes to brainstorming new ways to market a traditional business or actively involving higher education students in interesting student-led conversations, an experienced and certified facilitator is essential. Education facilitators serve a variety of purposes. Instead, they use a number of academic disciplines like learning theory, psychology and communication to ensure that the class or workshop runs well and that all participants are capable of meeting the session's goals. They'll need someone who can be a muse, a referee, a master of ceremonies, a

cheerleader, and a disciplinarian all at the same time to achieve these aims, which could include conflict resolution and consensus building.

"Teacher as a facilitator" refers to a shift in the traditional role of the teacher from simply explaining and dictating notes to creating a conducive learning environment and organising a variety of engaging activities that promote, encourage, and involve learners in gaining knowledge and skills as specified in the curriculum. The educational system has evolved dramatically during the last few decades. The educational system extends beyond the classroom. It has an impact on the individual, the community, and the world at large. More systematic curriculum planning, problem-based learning, community-based learning, integrated teaching, and problem-based learning have all been implemented. Information isn't just limited to test books; it's available on the internet as well. Students are not enslaved by information's facts and figures; they are active makers of knowledge. Teaching is now regarded as one of the most difficult and diverse professions, with a considerable impact on the nation's social, economic, and cultural well-being. Because of the huge transformation in knowledge and information technology, the emphasis on student autonomy has shifted from the teacher to the student. As a result of the change in the circumstances, thousands of teachers are rethinking and reinventing themselves and their profession in order to better serve students. Teacher is a role model who helps students to grow and develop, however as time passes in a dynamic society like ours, the function of a teacher has changed significantly, just as our kids' requirements have changed and shifted. Previously, a teacher was thought of as a source of knowledge and a transmitter of information. The youthful generation now lives in a world where the information and communication revolution has brought in changes in all sectors of life, including social, cultural, political, and technological.

Teacher's role as facilitator

Teachers can confidently train our new generation's students for the future. In addition to the existing ones, the teacher should include current knowledge and modern techniques of obtaining new knowledge. The time has come for a teacher to comprehend that "knowledge is like an endless and deep ocean," and that a teacher's role is to work as a facilitator in a democratic atmosphere with a practical and multidisciplinary approach to accomplish overall development. When the

student-centred or child-centred view of learning emerges, the total fundamental transformation in the role of a teacher occurs. Teachers have been preoccupied with the details of curriculum planning, with the content of the teaching programme, and with the range of education strategies adopted, but when the student-centred or child-centred view of learning emerges, the total fundamental transformation in the role of a teacher occurs.

The role of the teacher has changed from that of a knowledge machine or a nonstop tape recorder to that of a facilitator. The teacher's role is to encourage and support students' learning by using the problem as a central focus. The student has been given additional responsibility and freedom as a result of the teacher's role as a facilitator. Rather than simply providing information, the teacher's responsibility is to assist in the solution of the problem. The teacher must foster an environment in which pupils can freely discuss ideas. In small group sessions, the teacher must have the ability to communicate with the pupils in an informal manner. The teacher's role as a learning facilitator is becoming increasingly important as the use of learning resource materials grows. The teacher's job is to make it easier for students to use the resources by overcoming flaws in the materials and incorporating them into the curriculum. The role of the teacher is changing in the educational process as a result of globalisation. We can live a comfortable and dignified life thanks to education. It is an activity that assists students in gaining the necessary knowledge, skills, attitudes, and perceptions. A nation's quality is determined by its residents' quality. The quality of citizens is determined by the quality of the education system, which is influenced by the joint efforts of planners, educators, and administrators, but the most important aspect is the quality of the teachers.The value of teachers in a country's development cannot be emphasised. Teachers should focus on producing competent, knowledgeable, and skilled students since kids are a valuable resource in our country. The current epoch is considered to be a global epoch. There will be several new changes and trends in the field of education. In the global era, the role of the teacher is changing. The four pillars of education that teachers should grasp and focus on are learning to live, learning to know, learning to do, and learning to be. The instructor's position is changing in smart and active learning systems. The teacher is now a facilitator of learning. Teaching and learning are

evolving as a result of educational developments. In this paper, I'll discuss the instructor's role in shaping the learning environment.Teachers are referred to as teachers on occasion. Teachers know what the term means and how to use it in the classroom. They often don't recognise the difference between teaching and facilitating learning, which creates a barrier between students and teachers. We must understand the difference between teaching and enabling learning because the two terms are sometimes used interchangeably. Teaching is a method of assisting pupils in their academic pursuits. Teachers enter the classroom, instruct the students, provide assignments, and do other daily routine tasks in a variety of classes.

Rather than assisting or facilitating students in their learning, this is a fascinating and gentle concept. If a teacher believes that it is his responsibility to ensure that every student is proficient in his or her subject, the teaching-learning process becomes more innovative, active, and engaging.Teachers should take on the role of mentors, encouraging students to learn. The term "teaching" refers to the act of a teacher imparting knowledge to students.There are some issues with the students. The teacher is aware of the issues that the students are facing. Problems with study habits, a lack of performance, frustration, a financial problem, and a family problem as a counsellor, the instructor assists pupils with these issues.

Instead of giving lectures, facilitators lead the class in a discussion of the material and the sharing of personal experiences from real-life events. This strategy allows students to apply what they've learned in class to their own lives, making the information more meaningful to them. While both approaches are effective, online learning is better suited to a facilitator approach to teaching due to the delivery mechanism, student learning styles, and student engagement.Reading assignments, posting discussion questions, and various electronic presentations are often employed in online courses because they cannot impart material in person (audio,video,PPT). While these techniques can be utilised to present lectures, the impact will be different. Furthermore, research has revealed that students have a variety of learning styles, so depending on a single method of delivery limits the lesson's efficiency. A concern is the amount of student contact with the lecturer and other students in the class.Because online classes are frequently asynchronous, student

involvement is limited only by how much time and effort the student devotes to the course.

Conclusion

In the classroom, teachers act as more than just a student helper; they also function as a friend who may motivate their pupils. Teachers play a critical part in this as they try to instil strong character in their students. As a result, students thought the instructor should serve as an example to others. According to Student Centred Learning, teachers should serve as a facilitator, motivator, and inspiration for students, allowing them to express themselves creatively and comprehend concepts. We can conclude that the teaching profession has evolved from a one-dimensional process in which the teacher must act as a facilitator, guide, resource planner, and curriculum builder to a multifaceted process in which the teacher must act as a facilitator, guider, resource planner, and curriculum builder. The shifting role of the teacher has made teaching a challenging and responsible profession.

References

1. Hollingsworth, S. (1989). Prior belief and cognitive change in learning to teach. American Educational Research Journal.
2. Sharma, S. (2017). Prospective Teachers. International Education & Research Journal.
3. Barrows HS and Tamblyn EM (1980). Problem-based learning. An approach to medical education. New York, Springer Publications.
4. Biggs, J. (1999). What the student does: teaching for enhanced learning. Higher Education Research & Development.
5. Education. Org., - Redefining the role of the Teacher: It’s a multifaceted Profession by Judith Track Lanier.
6. Madan, N. (2017). Changing role of teachers. International Education & Research Journal.

Environmental Thoughts in Ancient India in the Light of Dharmashastras

Gopal Chandra Das
Former M.Phil Research Scholar (Department of History)
Kazi Nazrul University, Asansol,
Paschim Burdwan, West Bengal (India)

Abstract: *The current* article deals with the environment and biodiversity of ancient India in the light of Dharmashastras. Dharmashastras or Smritishastras were not only confined to religious and domestic life observances but also equally concerned about indiscriminate cutting of trees, water conservation, construction of reservoirs and protecting other elements of the environment etc., from which noteworthy hints are found of nature awareness. The present article first tries to show that why social thinkers in ancient India were awareness about the environment and biodiversity? What kind of principles and laws did sages and Dharmashastrakaras (social legislators) adopt to protect the environment and biodiversity?
Keywords: environment, biodiversity, Dharmashastras, Smritishastras, sages, social legislators.

[I]

The study of environmental history is gaining considerable importance in the construction of recent social history. Recently, ecologists, sociologists have been talking about eco-friendly, environmental awareness, etc., although this concept was echoed by Vedic sages and theologians or social lawmakers many centuries ago. From the early beginning of civilization, an interdependent relationship between the environment and human beings has developed, which is conducive to the evolution of human civilizing. The Dharmashastra texts of ancient India not only deal with politics, economic, religious and different social customs etc., as well as ancient scriptures were equally concerned also about the environment and ecology. Sages and social legislators realized that everything from rivers, plants, shrubs, insects, animals to human beings emanated from the soul and vibrated in soul. Social lawgivers wanted to establish the idea that the existence of 'God' is universal, in which there is a hint of love for the universal nature. In ancient India the sky, water,

soil, air, heat– these five elements are recognized in the Dharma Shastra as elements of the environment. This idea came from Sankhya philosophy. Smritishastras or Dharmashastras, Vedas, Upanishads even Puranas also have instructed to maintain the natural rhythm of biodiversity.

Long before today, the ancient sages and social legislators feared that the existence of life on earth would be endangered if the mutual balance of the *Panchabhutas* (the five elements of the earth) was disturbed. In ancient India, forest conservation as well as activities like tree planting was highly encouraged. *S*ocial thinkers in ancient India realized that trees not only provides food, fruit, leaf, flower, medicine, fodder, shelter, fuel, wood for *Yajnas* (sacrifice) etc., but also helps in maintaining the ecological balance. The Aryan sages developed deep connection with the forest. 'Aranyaka' was written in forests for the needs of forest dwellers. After end of domestic life of the Vedic Brahmins, forests became a secluded place to live.

In the society of Rig Vedic age, the importance of animals was much more than the land. Needless to say, there is no doubt that in a society where animals were very important, the treatment, care of animals would be done well. Since cattle provide all the necessities of daily life, veterinary medicine has a remarkable place in Vedic society. Sages like Gautama, Atri and Pardsara laid down specific rules for the conservation and care of cattle. The contribution of various cattle was immense. In the Vedic India, veterinary science or *Pashu Ayurveda* gained considerable importance because animals were quite useful and helpful for human agriculture, manure, foods and various dairy products, transportation, warfare and sacrificial rituals etc. In one place, the *Manu Smriti* forbade the eating of meat. Although, it could not be prevented; meat eating was prevalent in the society. Since water is the lifeblood of life, the ancient sages were determined to keep it pure and to refrain from its abuse. Therefore, the construction of reservoirs, embankments, and wells for agriculture, animal husbandry, groundwater conservation etc. has been given importance in the Dharmashastras (scriptures). Works like construction of reservoirs and wells were considered as virtue-deed. Besides trees, rivers, seas etc., theologians also ascribed divinity other elements of nature such wind, fire, sun, sky, mountains, animals etc. So,

the Rig Veda mentions *Nadisukta, Vayusukta, Agnisukta, Suryasukta, Bhumisukta* etc.

[II]

Ancient Indian sociologists were keen to conserve biodiversity in order to properly preserve the multidimensional elements of environment. It is in the Dharmasutras that personal, domestic, and social laws are first formulated. First of all it is necessary to say that, in the Rig Veda, a special term '*dharma'* was used to mean law, which is why later essays on laws have been termed as 'Dharmasutra' or 'Dharmashastra'. The Sanskrit word *'dharma'* means to sustain or to maintain. Social lawgivers (Manu, Vishnu, Yajnavalkya, Bodhayana, Arti, Narada) enacted strong laws to exemplary penalize those who harm the environment and biodiversity i.e. flora and fauna, rivers, ponds, embankments and various elements of nature. As punishment for the offender, they fixed fines, compensation, atonement provisions, mutilation, banish and even the death penalty. People who were involved in killing animals, trading in animal-skins, fishing, collect forest resources, and any other forest related activities were looked down upon in the society. In this context, Irfan Habib has stated that as the forest continued to shrink, there outcastes (*Chandalas, Shvapachas,* etc.) lost their livelihood and became landless slaves. There is no hesitation in admitting that the importance of animal husbandry and water bodies started increasing due to the establishment of agrarian society. The sages were well aware of the need and importance of irrigation system for the advancement of agriculture. The *Manu Samhita* provides for the death penalty for bridge destroyers. But if the guilty person had reformed the irrigation project, he would have been spared the death penalty. Theologian Vishnu also agreed with Manu on the issue of execution of destroyer of bridges. Smritishastrakara or Dharmashastrakara (social legislators) of ancient India also have spoken out against water conservation as well as impurity and pollution of water. Manu has given some instructions as a precautionary measure to remedy water pollution. Therefore, Manu has spoken about maintaining the purity and sanctity of water. Manu instructed to ensure that no one should throw excrement and impure objects, blood, or any toxic substances in water bodies. Similar instructions are also found in the *Yajnavalkya Smriti* (1/151). Various unwanted substances in the water can be detrimental to

the human body so Manu recommended sifting with cloth thoroughly before drinking the water (*"vastraputam jalam pibate"*).

Needless to say, sages and social legislators were concerned about forest conservation and extensive deforestation. Since the forest was an imperative resource and secluded shelter for sages. That is why scholars of Smritishastra have mentioned the appropriate punishment in the case of destruction of wild animals and deforestation in the Dharmashastras. The *Manu Smriti* or *Manava Dharmashastra* (a text generally assigned to between *c.* 200BCE and 200CE) has directed many stipulations against cutting or damage trees especially fruitful trees. In case of any smash up of the tree, the offender will be punished according to the practicality of different parts of the tree that was Manu's provision. According to Manus's provision:

"faldanam tu vrishanam chhaidane yapyam rik shatama
gulpa-balli-latanama bha puspitanam cha birudham"

This means that, for the crime of destroying fruitful trees, shrubs, flowers, foliages etc., the perpetrator has to recite a special Vedic hymn hundreds of times. Following Manu, later *Vishnu Smriti* and *Yajnavalkya Smriti* also specify different levels of punishments for destruction of plants and woodlands. The scriptures stated that those who will uproot gigantic trees indiscriminately by machinery for construction of mines, industrial factories, dams etc. should be kept in one house (*uppatakam*). Similar such punishments are also mentioned in Vishnu Smriti (5/50-54) *Yajnavalkya Smriti* (3/240-241) and *Atri Smriti* (222-223). There was provision for severe punishment for inhuman treatment of animals and creatures. Manu has given a provision to punish the owner of the chariot if any animals and creatures are killed due to pushing of chariot. If someone damages a crop and tiny sapling that grows usually in the forest without any reason, he has to serve the cows for one whole day by drinking only milk from fasting. The *Manu Smriti* (X, 83-84) indirectly complained about agriculture work as the immense use of iron plough which injures the soil and terrestrial creatures, so the people of the upper castes have been advised to refrain from agricultural work. Later such prejudices were also seen in Buddhism and Jainism. The *Manu Smriti* (V, 43-49) upheld the principle of abstaining from killing animals, although slay of cattle animal for sacrifices (V, 39-40) were still allowed.

Conclusion:

At the current time the constant change in the valance of the environment has become a cause of headache for whole world. Long before today, ancient Indian sages, theologians, social lawgivers realized that disturbing the balance of any one element of environment could have a detrimental effect on the entire biodiversity. The scriptures not only punished criminals with fines, compensation, mutilation, atonement provisions, banish, the death penalty etc., but also sought to protect the environment and ecology by awakening the notion of fear of sin and hell torment, vision of God in universe etc. So finally it can be said that, the environmental consciousness and philosophy of ancient Indian thinkers and social legislators is very relevant in the present situation.

References:

1. Habib. Irfan. (2010). *Man and Environment: The Ecological History of India.* New Delhi: Tulika Books.
2. Singh, Upinder. (2009). *A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century.* New Delhi: Pearson.
3. Chakraborty, Ranabir. (2011). *Bhart-Itihaser Adiparba (Bengali), Early Period of Indian History,* Vol-I. Kolkata: Oriental Black Swan.
4. Jha, D.N. (2004). *Early India: A Concise History.* New Delhi: Manohar Publishers & Distributors.
5. Sharma, Ram Saran. (2005). *India's Ancient Past.* New Delhi: Oxford University Press.
6. Bhattacharya, Narendranath. (2001). *Prachin Bharatiya Samaj (Bengali), Ancient Indian Society.* Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parsad.
7. Chakraborty, Ranabir. (1991). *Prachin Bharater Arthanoitik Itihaser Sandhane*. Kolkata: Ananda Publishers.
8. Gupta, S. (2012). *Pracheen Bharate Paribesh Chinta (Environmental thoughts in Ancient India).* Kolkata: Sahitya Samsad.
9. Benerjee, S.C. (1999). *Manusamhita.* Kolkata: Ananda Publishers.
10. Das, Gopal Chandra. "Cattle Management and Veterinary Science in the Vedic Age: A Brief Historical Evaluation", in *Multi-Disciplinary Research Explorer,* Eds. Yadav, Wakil Kumar and others. (2021). Notion Press.

Relations between Environmental Changes and Human Trafficking in the Indian Sundarbans- A study

Arabindu Sardar
Assistant Professor in History
Sarat Centenary College, Dhaniakhali, Hooghly

Abstract: The Sundarbans, world's largest active delta, are unique in its nature. Its own estuarine system, intricate coastlines, clusters of smaller deltas, innumerable islands, criss-crossed by numerous distributaries, provides great diversity to the eco-system. The environment of earth is incessantly changing over time. The effects of environmental change have been felt more or less in every nook and corner of the globe. Some parts of the world, especially in the Indian Sundarbans are the most adversely affected zone. The Inter governmental Panel on Climate Change (IPCC) has attributed this phenomenon of global warming induced climate change largely to the anthropogenic activities. In the Sundarbans, the factors of human trafficking, especially women can be divided into push and pull factors. Here I will discuss how climate afflicted the Sundarbans gradually became a "hotspot" zone for human/women trafficking. Every cyclones and flood is destroying the homestead of the people who were living in the coastal fringe areas of the Sundarbans islands. They move to the city in search of work to rebuild their homes. As a result, they easily fall in the clutches of human trafficking agents or brokers. That's why, with less work, less time, more money; they easily fall into the trap of trafficking.

Key Words: Sundarbans, Environment, Trafficking, Climate change

Women comprise over half of the world's population. They deliver a major contribution to the well-being of their family members and sustainable development of their communities and nations, and also to the maintenance of the Earth's eco-systems, bio-diversity, natural resources and folk-resources. United Nations Environment Programmers hope that women and their average psychological affinity towards the environment will inspire the future of environmental and sustainable development of community towards the better understanding of the importance of gender and integration of gender perspectives across the world.

The problem of human trafficking, particularly trafficking of women and children has emerged as an important social issue in recent times in many parts of the World. In South-East Asia cross-border trafficking, sourcing, transit to destination are the big problems. Even more prevalent is the movement of persons within the countries for livelihood leading to exploitation and extortion in various forms[1]. Climate changes intensify the existing socio-economic issues inviting regional mobility and human trafficking. Vulnerability increases directly as populations are displaced, and indirectly by undermining human security at the source areas of the migrants. Vulnerability further increases as sub-state networks attempts to respond to both direct and indirect impacts of climate change[2].

Exploitation and multi faceted discriminations against women in our society have a long history. History demonstrates that women are permanent victims of different kinds of abuse and ill treatments. The women of the Sundarbans reside amidst precarious and pains due to geographical barriers like regular flood, cyclone, forest phobia, unhygienic condition due to saline water and unknown diseases. Boys are given more importance in every sphere of daily livelihood. The existing and widely accepted norm of gender perception in this region extends towards patriarchy. Male preferences, in general devalue women's lives and livelihood through dowry and other mechanisms. As a result, domestic violence has ensuing a culture of patriarchal terrorism[3]. Boys and girls get differential access and exposure to everyday conditions from nutritious food to health, education, healthcare and treatment as well as opportunities for disclosure to the outside world and age appropriate recreations.

The livelihood insecurity, which is a product of a complex link between repeated climatic shocks and chronic poverty, is the prime reason why the Sundarbans women are disproportionately affected by mental health problems. On the other side, the mind of women, where their husbands for a long time remain out of sight for alternative livelihood, mental stress is crossed by traumatic stress after facing fearful incidents. This out-migration of the male partners has resulted growing security concerns among women exposing them physically and psychologically and make them vulnerable.

After every cyclonic storms and flood, embankments break and collapse inviting miserable destruction and challenges. Some parts of Ghoramara Island, Sagar Island and Baliara village in Mousuni Island are flooded twice in a day during high tide. Life of inhabitants of this area is continuously being disrupted and devastated their homesteads. Ingress of salinity contaminates the homesteads sweet water ponds and drinking water source. The situation more worsens during monsoon when they have to tread in ankle-deep flood water to reach a tube well. This is a vulnerable source especially in the flood-prone areas, once submerged by saline water, it transforms into unusable.

Human Trafficking is one kind of trade which is both bottom ("dark") and top ("light") driven socioeconomic "pushes" in marginalised locality having the "pulls" of economic opportunity and demands for cheap labour with sexual services in developed countries and areas[4]. The underdeveloped regions in the Sundarbans are the common spots of vulnerability for human trafficking having link with climate change, environmental degradation and livelihood stressors. Vulnerability is a basic component of the dynamics of human trafficking.

Here is a presentation how climate afflicted the Sundarbans gradually became a "hotspot" zone for human/women trafficking. Every cyclones and flood is destroying the homestead of the people who living in the coastal areas of the Sundarbans islands. They move to the city in search of work to rebuild their homes. As a result, they easily fall in the clutches of human trafficking agents or brokers. That's why, with less work, less time, more money; they easily fall into the trap of trafficking.
The Sundarbans comprise a good portion of land under the two districts (south 24 pgs and north 24 pgs) of West Bengal. It serves as a source, transit and destination for national and international trafficking of women and children. The state of West Bengal shares a boundary with north-eastern states like Assam apart from the state of Orissa, Bihar, Jharkhand and Sikkim. More importantly it shares international boundaries with the neighboring countries of Bhutan, Nepal and Bangladesh. The Geographical location of west Bengal as well as its demographic and social constraints makes it vulnerable for the trafficking.

In the Sundarbans, the factors of human trafficking, especially women can be divided into two categories: push and pull factors. The push factors include: poor socio-economic conditions of a large number

of families in the coastal islands accentuated with numerous odds. Almost annual natural disasters like- flood, cyclone, land degradation invites virtual pauperization and force people to retract from their divested holdings and pattern. Absence of education and skill development programmes and poor income opportunities make them susceptible to the activities of trafficking, and expose women in crime activities.

The pull factors are: lucrative employment opportunities in big cities, and multiple open and hidden options of earning. Prime traffickers target people who are landless households, agricultural labourers, and low paid informal sector workers, marginal and seasonal workers. The affected social classes are: illegal migrants, illiterate or dropout adolescents, deserted or widowed women, and women who remain unmarried due to huge dowry demands, and parents less children[5].

The processes of trafficking have different stages and stakeholders. At the initial stage the process starts with the place of "Origin", popularly known as 'source area'. Source region or origin is such a place from where persons are trafficked by traffickers by the help of multiple agents having rackets with the powerful agencies. The origin of trafficking may be different at different stages to the extent and networking of the traffickers. Original sources may be small villages, towns for domestic traffickers or of internationally trafficking. The second stage is 'Transition Stage' where the victims stay for few days, weeks or few months. The transit may be an origin for next transportation. The final stage is the 'Destination Stage' where the trafficked victims are finally delivered to owners[6].

Describing the purpose and nature of women trafficking in the Sundarbans, it can be seen that women are usually employed in different types of job. The jobs are mostly domestic and also sexual business in nature. Other forms are forced marriage, cheap labour, begging and also organ harvesting. The methods used for trafficking such as coercion, duping, luring, fake marriage, abduction, kidnapping etc. are in vogue. It is the social and economic constraints of the victims that make them most vulnerable. Most of the victims in the Sundarbans are from the disadvantaged social strata like scheduled castes and scheduled tribes and lowest caste dalits, members of the tribal communities and of religious minorities.

In the immediate aftermath of a disaster, displacement is likely to occur, giving space to traffickers to operate and exploit the afflicted people. Thus, sudden on-set disasters create the Sundarbans a 'hotspot' zone for human/women trafficking. Many displaced persons who see irregular migration as the only viable option to pursue better opportunities may seek assistance from human smugglers, placing themselves at risk of many of the forms of exploitation that are commonly associated with trafficking, such as sexual exploitation, forced labour, forced marriage, as well as organ removal[7].

The islands of Sundarban located at the forest fringe are less sheltered from the ravages of nature is the 'origin' or 'sources' area. Natural disasters leave people homeless devoid of their prime assets and drain away their livelihood. This makes them prey to relatively lucrative offers and trafficking. Displacement and migration without proper protection measures proliferates incidence of trafficking. A report (Thomson Reuters Foundation) published by Aditya Ghosh states: 'When the handsome young man came courting her, Sunetra (Name changed) could not believe her luck, because she 18 years old lanky girl. A flood the previous year had destroyed her home and left her family struggling financially. Her out-of-town suitor's offer of marriage seemed ideal. He was content to wed without her family providing a dowry. But soon after their marriage, on a visit to Hyderabad, her husband locked her in an apartment in preparation for handing her to sex traffickers from Dubai and she escapes from there'[8].

Bankim Hazra, Chairman of the Sundarbans Development Board and Members of the State Legislative Assembly, says the lure of city life plays a key role among young people's falling into the hands of traffickers[9]. They are very easily misled by traffickers and agents lurking around, who promise a dreamy life in the cities. Many parents, particularly those of young women trafficked by traffickers, just don't report it to the police. Many of them frequently change their names. They are too stigmatized or consider it a fait accompli.

Subhankar Golder, of Haldarchawk Chetna Welfare Society, a Kakdwip based NGOs, says traffickers are also getting skilled in finding ways to exploit the increasing vulnerability of normally quite cautious people. Previously those who were just traffickers gradually transform them as masters in employing young good looking men/women from the

regions. They are locally known as 'agents' or 'contractors', popularly known as *'Dalals'*. The trafficker's targets are the mostly vulnerable families. They pay money for handing over the girls to placement agencies. Broadcasting media (Television & Print media) and internet also deceive vulnerable people by making fake promises of lucrative jobs, residency status in prosperous places and promising new relationship like marriges[10].

These 'agents', 'contractors', or 'newly husbands' are called middlemen. Particularly in trafficking middlemen play crucial role from 'source area' to 'destination area'. In between the two stages various number of middlemen in different nature work. They are very skilled and clever in nature. They are well known to the villages. So no one can easily doubt them. Sometimes girls are often sold by their friends or relatives, sometimes even by their own parents out of desperation.

In the Sundarbans, child marriage acts in the way of operandi trafficking of girls. Abduction also forms another method of trafficking. About missing, trafficked and unsafe migration, West Bengal's percentage is highest. Girls trafficked most falls in the age group of 15-18. In the case of West Bengal, north 24 paraganas ranks highest in trafficking followed closely by south 24 paraganas. The destination areas for trafficking in south 24 paraganas are Kolkata, Delhi, Goa, Mumbai and Pune[11].

With shrinking of the opportunities of livelihood many more traffickers, both men and women are coming in this nefarious game. Golder says that 'the nature of trafficking itself has changed. The agents target the poor parents; cajole them and even their daughters. They travel and run sex industry in Delhi to Mumbai. Then when one of the sex workers come back to her village, narrates tales of good future and shows off her money, others are automatically lured into it. This woman then takes a fresh batch along with her and earns her commission[12]. Once trafficked, the victim becomes liable to be trafficked again and is often alienated from the society[13].

Rescue of women and girls from brothels entails raiding of brothels and removing them to safe locations and also free from exploitation. Rescue operation consists of number of steps. The police or NGOs are informed about trafficked minor girls in brothels and through independent confidential investigations the agencies verify the authenticity. Once

authenticated, police personnel together with NGO representatives conduct the rescue operation[14]. Various NGOs of the Sundarbans are rescuing trafficked women from different cities of India; the most important one is the Halderchawk Chetna Welfare Society. The head of this society Subhankar Golder said that they rescued more than 100 trafficked women and children since 2007 with the help of police[15].

Empowering of the survivors is the most important aspects of post rescue activities. Here counselling is very appropriate method. Rehabilitation is another important stage after rescuation of the trafficked women and children. The persons rescued send to government or NGOs homes for an interim period until their cases are solved by courts or until they are returned to their homes. But reintegration of their normal life in their society is very important task.

Reintegration refers to assimilation of rescued victims by their "sources" or home community to enable them to lead a normal life and acceptable to social life. The evidence currently available suggests that stigma, limited skills and lack of livelihood opportunities make it difficult for women and minor girls to reintegrate with their original families and communities. Those who returned were often subjected to vulnerable conditions, including poverty and lack of safety, which triggers re-trafficking[16]. A vast majority of survivors (80.3 percent) who were re-trafficked in the NHRC study indicated that they were not able to find any alternative sources of income or livelihood options when they returned to their communities[17]. Moreover, local communities display strong biases against women and minor girls who were trafficked. Although trafficked women and girls have the right to get assistance of government and various NGOs but they actually face social isolation and neglect.

Government of West Bengal has launched *Swayangsiddha* scheme to all districts of the state. *Swayangsiddha* scheme was implemented by the police in district of south 24 paraganas. *Swayangsiddha* means self-reliance and this scheme aims to combat human trafficking and prevent child marriage[18]. In this initiative of the West Bengal police, young boys and girls are provided knowledge and skills to make them aware, alert and less vulnerable violations and abuse of rights. The police play a key role in rescuing the trafficked women and girls from the agents and traffickers in this region. A local branch of the "Save the Children India"

recently opened in Dholkhali near Bangladesh border. More than 30 kids (mostly girls) are trained how to prepare, prevent and protest trafficking from this region. They always active in their works, if any unknown person enters the village; they confront them to find out why they are here and they report their teachers, who contract higher level authorities[19]. Thus they prevent human trafficking, although it is difficult in terrains like the Sundarbans.

References:

1. Human Development Report, South 24 Parganas, 2009, p.267.
2. Christopher Jasparro and Janathan Taylor, 'Climate change and regional vulnerability to Transnational security threats in South Asia', *Geopolitics*, June, 2008, pp.241-242.
3. Haraprasad Bairagya, 'Sustainable Managements of Sundarbans-A Critical Analysis', N.B Publications, Ghaziabad, 2019, pp.80-81.
4. Christopher Jasparro and Janathan Taylor, op.cit., p.240.
5. Biswajit Ghosh, 'Trafficking in women and children in India: nature, dimensions and strategies for prevention', *The International Journal of Human Rights*, Vol.13, No.5, December 2009, p.731.
6. Jaffer Latief Najar, 'Human Trafficking in India', *Research Gate*, Nov-2014, p.3 www.researchgate.net/publication/3032765113. dated-20-10-21.
7. Sabira Coelho, 'The climate change-Human trafficking nexus', International Organization for Migration, The UN Migration Agency, Thailand, p.3 www.environmentalmigration.iom.int.
8. Aditya Ghosh, 'Lured by marriage promises, climate victims fall into trafficking trap', *Reuters,* March-8, 2015 www.in.reuters.com dated-20-10-21.
9. Ibid., www.in.reuters.com dated-20-10-21.
10. Karabi Das, 'Perils of Women Trafficking: A case study of Joynagar, Kultali Administrative Blocks, Sundarban, India', *International Journal of Education, Culture and Society*, 2017; 2(2), p.62.
11. Ibid., p.64.
12. Jyotirmor Chaudhuri (Editor), 'Living with changing climate, Centre for Science and Environment', New Delhi, 2012, p.78.
13. Karabi Das, op.cit., p.62.

14. Final Report, 'Trafficking in women and girl children for commercial sexual exploitation: An Inter-State explorative study in Jharkhand, Odisha and West Bengal', Social Awareness Institution, Ministry of Women and Child Development, Govt. of India, New Delhi, 2016, p.42.
15. Interview with Subhankar Golder, Date-12-01.2020.
16. Final Report, op.cit., Govt. of India, New Delhi, 2016, p.44.
17. Sankar Sen and P.M. Nair, 'A Report on Trafficking in women and children in India', *NHRC-UNIFEM-SS Project*, 2002, vol.1, p.97.
18. www.swajangsiddha.org dated-15-01-2020.
19. Sam Eaton, 'After the floods come the human traffickers, but these girls are fighting back', *The World,* September-15, 2015. www.pri.org dated-15-01-2020.

Patriarchy in Cinderella- Portrayal of the Society

Arkojjwal Dasmahapatra
Research Scholar,
Jadavpur University

Abstract : The paper seeks to analyse the ways in which the fairy tale 'Cinderella', in particular, talks about the sense of masculinity present in our everyday life. In addition to this, the paths the society follows, demonstrate that patriarchy has an upper hand in its construction. After having a look at this text, the false assumption that our culture has gender equality as one of its ingredients will get completely erased. Moreover, it should be analysed whether fairy tales try to improve the moral of gender equality or increase the stereotypical concepts of gender.

Keywords: Cinderella, fairy tales, gender equality, stereotypical concepts.

Introduction

There are many versions of the story of 'Cinderella', but all those versions have a common plot. It tells about the miseries faced by the protagonist who is a girl. It is said that the sorrows in her life were imposed by her step-mother and step-sisters. The ultimate relaxation she gets is when the prince chooses her for marriage. This apparently seems to be a mere story but when viewed under critical lens, an influential role played by the man's society can be discovered in it. For this purpose, we shall have a glance at the various texts written around the plot of this story.

Initially we have to travel to the days of the past to locate the original story of Cinderella. In this quest we come to find that in Egypt there was a tale present in the oral tradition which delineated the same story as this. In that the girl was known as Rhodopis. Strabo was the first person to record this story in Greek. Then came many poets who wrote down a revisionist version of this tale. But in this article, all the different versions of the story will not be analysed, instead what will be emphasised are the features that make the patriarchy to obtain its eminence. Moreover, the characters playing a major role in this story, even the female characters, are looked at from a man's eyes. In the place

of a man if a lady was placed, the inferior position of the women would appear without any veil.

A single character getting all the superiority

Even after reading every version of this tale, only a single major character, belonging to the masculine gender can be found. Then the question that arises in the initial level in our minds are that- whether this character is responsible for ascribing the importance to patriarchy in the story. The answer to this question is 'No'! This is because a character that has only a small role to play cannot establish an influencing dogma. Then is it the society which can be held responsible for this? To answer this question, looking at the story from a distance will not be adequate. So, we need to look at the tale more closely.

Marriage the ultimate aim

After reading this tale it can be assumed that the only ambition of upper-class ladies was to make themselves more beautiful in order to be easily sold in the marriage market. Again, we see the arrangement for the ball dance party where spinster ladies were invited so that the prince can select his life partner from among them. It is understood that there is minimum or no choice for the women in these societies. There is also a stark gap in the behaviour shown to the ladies of differing classes and since Cinderella was treated like a servant by making her do all the household chores, she was not invited to the ball as it was only meant for the upper-class ladies. The upper-class ladies had no other work but to make themselves beautiful and sociable so as to find a rich and attractive groom for themselves. The misogyny is extremely pertinent because we can see how it is evident that work was not meant for women belonging to the upper-class of the society.

Giving no Choice to Women

For the marriage of the prince, each and every spinster lady belonging to the elite class were invited. It can be assumed, hence, that all of them wanted to be tied to him in the holy bond of matrimony. However, this desire was not voiced by any of the minor female characters which shows that their voice was suppressed by the society because their choice was curtailed. The only way for women to be respectable in society was to get married in a respectable family.

Women were hardly allowed to work and if they were, they were given work which was inferior in nature because they were not

considered capable of more. They were always employed below men and never allowed to assume positions of power so that men do not have to work under women. Therefore, women have been suppressed to fulfil the selfish desires of men.

Torture Meted out to Women

It can now be asserted that there were a lot of things done to women against their will. These things are either done because they are considered to be beneficial to women but that is only because they are viewed under the patriarchal lens- or only to entertain the masculine society. From tight fitted corsets, to dancing in tight shoes- all these propagate an image of 'pretty' women as desired by men.

Patriarchy Never Held Responsible

After seeing all these it can be deduced that everything, even feminism was also judged by placing it under the scrutiny of the patriarchal lens. One of the main features of patriarchy is to reign over the feminine gender. Not only in this story but even in texts like Ramayana, Mahabharata, many things can be found in common in terms of the life the women were coerced to live. It can be said that the social environment in which Sita, the female protagonist of Ramayana or Draupadi from Mahabharata lived was no better than that of Cinderella. Sita had to give an exam to prove her chastity to her husband and society by passing through the fire, while on the other hand, Draupadi was stripped of her cloth and dignity in a court full of lords as a matter of asserting ownership. All of these incidents represent the humiliation meted out to women in those societies. Now if we again put our vision in 'Cinderella' it can be found that her beauty was reduced to the fitting of her footwear. Is this not an insult to femininity?

Conclusion

To sum it up, it can be stated with utmost confirmation that the main plot of the fairy tale 'Cinderella' sketches a painting of a misogynist, patriarchal society which is relevant at all times.

Bibliography

1. Nagra, Daljit, and Vālmīki . *Ramayana*. Faber and Faber, 2014.
2. Strabo. *Rhodopis*. Wiley.
3. Vyāsa , and P. Lal. *Mahabharata*. Writers Workshop, 1969.

RE-DEFINING THE SOUTHERN BELLE

Madhumita Basu
Assistant Professor in English
Victoria Institution (College)

ABSTRACT : The figures of the Southern belle were created in Southern memory to deflect the attention from the grotesque institution of slavery. The cult of white womanhood was created in the South to consolidate the primacy and power of white masculinity. The Southern white lady was idealized due to her presumed purity, both sexual and racial. The Southern belle was considered as the repository of Southern culture. She was seen as an epitome of piety, purity, submissiveness and domesticity. The cult of true womanhood helped in the perpetuation of patriarchal ideology. Contemporary Southern white women writers challenge the cult of true womanhood and redefine the domestic space. This paper is a study of Josephine Humphreys' *Rich in Love* and Gail Godwin's *Father Melancholy's Daughter* Both novels problematize the position of the Southern woman and show how contemporary Southern white women break through the barriers imposed upon them by patriarchal society and redefine womanhood.

Keywords: Southern belle, white masculinity, domesticity, patriarchy, true womanhood

The Southern belle stereotype rested on a set of very strict class, race and gender traits. The belle was considered as the custodian of culture and was based on the Victorian model of a woman as an angel in house. The construction of Southern bellehood had its racial background which was tied to the institution of slavery and Jim Crow legislation. The belle was visualized as a white upper class woman who legitimately preserved white superiority since her racial 'purity' guaranteed her inaccessibility to inferior races and classes of men. The Southern belle was expected to transcend their inner desires, suppress their real emotions, and be obedient to the ruling will of patriarchal discipline and power. Contemporary Southern women writers like Josephine Humphreys and Gail Godwin destabilize the patriarchal constructs of the belle and redefine womanhood. The heroines in these novels subvert the white masculinity and assert their selfhood.

Lucille Odom, the 17-year-old heroine of Josephine Humphreys' novel begins and ends her story on her bicycle. The teenage protagonist of Humphrey's novel returned from school in a suburb of Charleston "on an afternoon two years ago," when her "life veered from its day-in-day-out course and became for a short while the kind of life that can be told as a story—that is, one in which events appear to have meaning" (1). Her mother Helen recklessly leaves home. According to Lucille her mother has left the family —"betrayed the rest and set of a series of events worth telling." Lucille's mother left home because of an urgent wish for a new direction and a new future. Her desire for selfhood has a tremendous impact on her daughter Lucille's life. For Lucille it is a kind of fall from innocence. The departure of her mother has a catastrophic impact on her father and his paralysis further intensifies the coming-of-age challenges of the young protagonist.

Lucille is so upset that she misses her exams and her high school graduation, feeling that her mother has failed them all. Since Lucille is both a girl and an adolescent, it is tempting to explain her innocent desire for order and her inability to move forward with her life as consequences of her mother's disappearance. Apparently Lucille presents herself as a self-composed girl but it merely covers the disorganization of a vulnerable personality. Disturbed by parental insufficiencies Lucille discontinues her studies. After her mother disappears, she doesn't grow. Her mother's absence intellectually cripples Lucille and she is unable to move in a new phase. Her mother's disappearance has come without warning, and has confronted her with emotions she cannot control. She is overwhelmed with the change and an uncertain future.

Lucille is vulnerable, hungry for emotional attachment, hurt by her mother's abandonment and her father's lack of insight. Like many young women, too, much of Lucille's longing and her frustrations center on her stomach. Young people feel a "hunger" for life; powerlessness causes a "stomachache." She later falls in love with her brother-in-law Billy, Lucille tries to stave of this sense of powerlessness by eating compulsively, wishing for comfort while realizing that what she really needs is "fortification" against the blows of life (p.27). What Lucille is trying to find is fortification against chaos—her parents' separation, her unrequited and inappropriate love for her sister's husband, her sister's depression, and her own movement from childhood to adulthood. Lucille

is also looking for ways to shore up her crumbling identity, damaged by her discovery that she was the other half of a set of twins, one of whom her mother aborted, and undermined further by her mother's desertion, which seems to her at seventeen as a second rejection. This detachment from her mother leaves her with a "strange sensation of incompleteness" and" bereavement." It also explains to her why her mother seems "aloof" (51).

Being the only remaining twin leaves Lucille feeling bereft, having lost her other half *and* her confidence in her mother's love. Still, Lucille is not quite sure how this information might explain her past or determine her future. In the long run," Lucille concludes, " I was alive and well, and I knew some true things about my past. That was all I could say" (p.50).Obviously, Lucille is raising profound philosophical questions about identity, about whether individuals are shaped by or shape events, about the conflict between nature and nurture, but a causal relationship between past events and present realities probably doesn't exist.

In fact, Lucille is profoundly skeptical of the power of abstractions, in particular philosophy, to explain anything. For example, she worries about her father's foray into the history of ideas at the bookstore. Philosophy is fine, she thinks, if one is trained in it, but it has the potential to drive people crazy. "Metaphysical truth is beyond the scope of the human brain," she says. "It exists but it can't be known. I respected the limits of cerebral capability. I didn't want Pop to blow his fuses" (9¡). It is not quite clear if Lucille thinks of herself as an "amateur," even though she does respect "the limits of cerebral capability." She does know that her father may "blow his fuses" with too much abstraction. Lucille is "the one saddled with the household worries, of which there were more than I had ever dreamed" (32). At seventeen, she is" unprepared to be the lady of a house" (32).

Although Lucille expresses some misgivings about "how events are linked in the world," she says that "a family without a mother is vulnerable. She left us sitting ducks" (24). This is a correct assessment, although Lucille doesn't realize it at the time; the events that follow do show the dangers of such carelessness. Although her leaving is consistent with her general "nonchalance," Lucille still tries to discover some other origin for her behavior. When she first phones the family, Lucille asks her Mother "is this something feminist? … or is it something real?" (26).

It isn't quite clear what the distinction between feminist and real is to Lucille, but perhaps it is between making a political and a personal decision, something which feminists have long declared amount to the same thing. Even with her parents' marriage officially over, the foundation of love they created remains with her: "It had been accumulating silently over the years like equity in a house. I was rich in love, even though no one could see it" (146). She realizes this finally at the end of the novel, when she is able to leave her family home with "almost frightening" ease (260).

Lucille first becomes aware of her desire when her brother in law tells her (innocently at this point in the novel) that she has "a lot of love" in her. Her response is to feel that her real self has been recognized, that she is like an old safe, full of money, just waiting to be opened, either accidentally or on purpose. This is typical of Lucille to question cause and effect, to wonder whether Billy has really identified something in her, whether she has broadcast it, or whether it is entirely an accident. The metaphor is telling, however; Lucille is a safe that has been cracked by her brother-in-law. Still, this right combination remains a "lucky discovery" that she must hide from the outside world. At first she thinks, naively, that she can keep this secret but comes to realize something different. She starts to see "how a life can divide in two, and the daily, visible portion move further and further away from the secret, invisible part." The problem with such is a secret is that "[l]ike a little fox in the dark, with sharp teeth and claws, the secret life will a little fox in the dark, with sharp teeth and claws, the secret life will gnaw and gnaw" (75). Her love for Billy brings her to a point in her development typical for most adolescents. The "unified existence" of childhood is over (although recollected nostalgically), and the adult reality of a divided consciousness—an interior and an exterior life—emerges. The worry, of course, is that her "interior life will get out of hand" and reveals itself to the world. Lucille says she understands how the repression and claustrophobia of those long New England nights in small houses could lead to unpredictable behavior.

Lucille expresses herself "I knew what love was without the aid of empirical evidence, and furthermore, I believed that I did have it. It was in me. It had been accumulating silently over the years like equity in a house. I was rich in love, even though no one could see it."(213) Billy

McQueen can see it; he's more attuned to Lucille than any of her family. She is so thrilled to be seen and understood that she immediately falls for Billy, obsessively shadows and serves him, uncertain the attraction is mutual, perplexed by the potential danger of her desire. Lucille and Billy's single sexual encounter occurs on Halloween night, and it ends in near tragedy. Rae gives birth in the bathroom and, deeply delusional, fails to acknowledge the birth.

Like her family house, which has been remodeled by its new owners, Lucille has altered herself to the new reality. No longer drifting and ironically detached, she is focused and sincerely determined to impart her hard-won wisdom to the next generation. Her family, too, is changed but not destroyed: they are "all gravitating back into family lives of one sort or another" following a pattern that "people cannot seem to help, in spite of lessons learned the hard way" (260). People remain drawn to families, Lucille says, to construct and reconstruct them, in spite of previous disasters. At the end of the novel, though, Lucille is surprised by how little the events of the summer and fall have affected her. She thought that love would "deepen and complicate" her, but it "had in a way not even touched" her. She says she is "unscathed" but asserts that she will not forget what has happened (258). It is clear here that part of Lucille remains an adolescent at the end of the novel, although one quite chastened and cautious. She is "unscathed" it is true, in the way adolescents have of surviving all sorts of stupid choices, but she does have a memory of the near disaster to direct her. She is on the road to adulthood, looking to the future, while reclaiming and learning from the past. Memory is the key, both for Lucille and for the newest female member of the Odom/McQueen family, Rae and Billy's daughter Phoebe. As Phoebe rides on the back of Lucille's bicycle, Lucille wants to tell this representative of the next generation about "the strength and fragility of things, the love and the luck hidden together in the world." She admits that this will be hard. Lucille says. "But [Phoebe] is like me, and she will know" (26¡). What Lucille has learned in her trying half year are the contradictions in life—strength and fragility, love and luck, honesty and the difficulty of expressing it, remembering and forgetting.

In Godwin's *Father Melancholy's Daughter*, the protagonist Margaret Gower is the daughter of an Episcopal rector, who has devoted most of her twenty year life in looking after her father. When Margaret

was six her mother Ruth Gower left their insistently nice Virginia town one day with an old schoolmate to find herself in the Art world of New York.Ruth was enamoured by her friend Madelyn Farley's independence, energy and sense of self. In a letter Ruth had mentioned that she does not want to be "trivial." Ruth Gower's impulsive decision reflects her self-absorbed narcissism and her inescapable sense of selfishness has a great impact on her family. Ruth Gower's impulsive abdication of her responsibility marks the end of her little daughter's "life of unpremeditated childhood." Margaret describes her mother's departure: "She left the rectory…just after lunch on September 13, 1972, while I was still at school, and though she remained in this world until the following June, neither my father nor I ever saw her alive again." Some months later Mrs Gower died in an accident and left her husband in a "black curtain of depression." Margaret's father becomes useless around the house; he is unable to give her any emotional support. Margaret suffers from a sense of namelessness at her mother's abandonment. She is never really given the chance to be a child, and on her falls the precocious task of tending the gloomy man.

The renunciation of Ruth is further complicated by the fact that she dies in a fatal car crash on a distant highway in England, leaving unanswered forever the question of whether she would have returned. Margaret grows up into a thoughtful and dutiful young woman with a significant role in the life of the parish. However beneath her buttoned-up exterior, Margaret continues to burn with unanswered questions regarding her mother's behaviour. Throughout the narrative the readers witnesses the suffering that the abandonment causes the child. Margaret spends her formative years putting all aspects of her mother's life that might have explained this abandonment. She grows up collecting stories about runaway mothers, trying to understand why a woman would desert her husband and daughter, she always said she loved. She protests to her parents that her parents never fought. In reply the girl suggests that "It could have been a more subtle thing like walking pneumonia." Taking care of her father becomes an obsession for Ruth. She does so with such a fixation that her best friend Harriet Mac Gruder, warns her, "you talk about his problems, what he is reading. You never start off with how you are… it's not healthy…watch out that it doesn't become a form of escape."(p.130) Harriet challenges Margaret, to attend her own life,

saying, “But why not just get on with your own overall destiny?” (p.129) Instead Margaret remains content to devote herself to her father’s life and escapes the problem of her own character development.

Struck by his daughter’s resemblance to his dead wife and her greater maturity, Walter Gower says “Margaret, I think you’re your mother redeemed somehow.”(p.36) Unable to comprehend her true sense of self Margaret feels angry and frustrated at her father’s comments and contemplates “If my personality had been built upon her learning, who might I have been if she hadn’t left.” Hence Margaret labours through her childhood and youth under the burden of this stunning sense of loss. In absence of a nurturing mother Margaret fails to understand the true essence of self-actualization. She trusts her fate to others, “If I take care of my day-to day responsibilities in good faith, then my future will take care of itself. I’ll get a good ending life the heroines in the books I like. Not necessarily a happy ending but one that I can accept as belonging to me.”(p.152) But future does not take care of itself. Margaret Gower is held responsible for her own destiny. When her father suddenly dies of heat attack Margaret realizes that she has been living a passive existence denying the challenges of life. She comes to understand that , in awaiting passively the heroine’s “good ending” by putting her father’s life before her own, she has forfeited the role of heroine on her own story.

Margaret Gower finds too, that she must resurrect and redeem herself. She has “sinned” as her father defines it, by avoiding the hard task of self-development, “falling short from [her] totality” (p.198). She denied her own sense of selfhood by allowing herself to be circumscribed by her father’s needs and concerns. In his final act before his death Reverend Gower performs a healing ceremony, recons crating a Venetian statue of Christ. The statue has now been partially destroyed by miscreants. Reverend Gower admitted that the statue can never be made perfect again but what he suggested that one can accumulate its “broken pieces” and “respectfully lay it to rest”(p.308)

In the final section of the novel Margaret lays her broken family’s past to rest. With deep inner wound she decides to take responsibility of herself. No longer “want[ing] to be anyone’s daughter anymore…”(p.348) The novel ends with her desperate attempt to free herself from the rubble of her past. Hence her parents’ failed relationship,

her mother's desertion of her father trapped Margaret in a drama that made her deny her own significance.

Both novels reveal the contemporary complexities and similarities of the female characters search for self. female protagonists‟ attempts to realize their feminine selves are thwarted by their conventional Southern society. Lucille and Margaret destabilize the idealized image of the belle. They are emerge as autonomous individuals who confront the oppressive systems of patriarchy.

WORKS CITED

1. Godwin, Gail. *Father Melancholy's Daughter*. New York, Perennial, 2002.
2. Humphreys, Josephine. Rich in Love. New York, N.Y., U.S.A., Penguin Books,1988

Partition of India and Bengali Women as Depicted in Bengali Novels

Utkalika Sahoo
Research Scholar, University of Calcutta

The refugee problem is one of the saddest events in the world today. India became independent in 1947 after a long bloody struggle. After Independence India's refugee problem was exacerbated. Though India had got her Independence but India's map was broken into pieces. Pakistan was created on the basis of religion and India was created as a democrated country. Many didn't want a partition but Nehru and Gandhi accepted the demands of a separate country to maintain peace in India. But after the partition India's biggest crisis was the refugee problem. The refugee crisis was hit hard in two parts of India, especially in West and East India. This problem became even more apparent in West India mainly Punjab and Eastern India. Refugees were arriving in the squad. But after a certain period of refugees in Punjab the problems of refugees stopped but the arrival of refugees in Bengal took a long time. Now the question is how were the lives of the refugee women who came to India for these refugee problem!! As a result of the partition, the most troubled women were refugees. Many displaced women were rehabilitated in camps, homes also religious places like Beneras like Brindabon. Many widows lived in Ashramas living the life of nuns. They wanted forget their previous life in their own homeland in East Bengal and East Pakistan. Some of them liked talking about the golden parts they had left behind in their original homeland.

During the partition women were more oppressed. Women were treated as a symbol of country. Therefore women were badly treated. Sometimes the torture was brutal. There were physical and emotional tortures on women. The brutal persecution of religion has been around for a long time. Literature is the mirror of the society. Therefore in the writings of literary writers, women are depicted in the context of deprived women.

Partition of a country is a great tragedy in the history of any nation. The common people of the country are the worst sufferers and these people are thrown into the darkness of uncertainty. India was ruled down

the ages by different peoples (nations) and at last came the British who ruled over the country for nearly 200 years. Exploiting the people and looting the mineral resources and also depriving the people of their rights. The people of India revolted against the British. The Indian National Congress was formed in 1885 and the congress fought for the rights of Indian people. Lord Carzon divided Bengal in 1905. At this time the aspirations of the educated and middle class people made the rulers think to check the growing nationalism and the demand for freedom. The British Intelligently played the Muslim car setting them against nationalist Indians. The seeds of separation between Muslims and Hindus were sown from this time. Arrangements are made to reserve seeds for Muslims in the provincial and central councils on the basis of Religion. Hindus and Muslims were shown to follow different paths. The motive of the Montague – Chemsford reformation in 1919 was to divide both this communities. The British were not only responsible for this divisive policy. The Muslims under the leadership of Md Ali Jinah gradually strengthened their demand for a separate state or country in the Lahore Congress. India ultimately won her freedom but at the cost of partition. On the basis of Religion the partition of India gave rise to a new problem - the problem of Refugees. Thousands of Hindus and Sikhs crossed over to India from East and West Pakistan.

Partition of India and its refugee problems are co-related. The Hindu Refugees came from East Pakistan (New Bangladesh) and West Pakistan into Punjab and West Bengal. The influx of Refugees from West Pakistan into Indian Punjab remained restricted between 1947 and 1960. But the influx of Bengali Refugees from East Pakistan into India remained an unending process. The Nehru – Liyakat Treaty (1950) for exchange of Refugees of both Pakistan and India could not stop the flow of Refugee entry into India. As the present article is on displaced Bengali woman and literature. So I would restrict my discussion and Analysis of Bengal.

The Noakhali killing in 1946 and the Great Calcutta killing caused a great fear in the minds of Bengali Hindu people particularly women. Thousands of Hindu Minorities in East Pakistan were mercilessly butchered by the Muslims. As a result many Hindu people left there dear homelands in East Pakistan. Another major cause of people living their homelands was the fear factor and insecurity among women. The Hindu

girls and women were subject to great mental as well as physical tortures. They were most mercilessly raped and kidnapped. The Hindus felt the safety and honour particularly of their girls and women were in dangour in the Muslim dominated East Pakistan. Maulana Abul Kalam Azad said it was possible to avoid partition.[1]

This was a major cause why Hindus in their Hundreds left their homeland and crossed over to India. The helpless Hindu girls and women were even taunted in vulgar language and abusive words were used to be thrown at them when they took bath in Ponds. They were forced to tolerate all there insult without any protest.[2] The Hindus loved their homeland but they placed self respect and the Honour of women above everything else. It was not possible for them to live there when the self respect and honour of their women atstack. So they had no alternative and option but to leave their beloved homelands, though these people were unwanted to the Indian Government. In the words of Sashibhusan Dutta of Noakhali "We had to live in fear all the time. The Muslims would often come to our houses giving us threat that our girls had to be given in marriage to Muslim young men." Thus it is needless to say that the life of Hindu girls and women have often been referred to or mentioned (depicted) in the Bengali Stories and Novels. Some of the leading or prominent Bengali writers incidentally belong to East Pakistan and East Bengal who have highlighted the distresses and sufferings of Hindu women folk in their writings. They had been eye-witnesses to the Refugee problems. History and Literature needless to say go hand in hand. These two subjects are interlinked. Literature is rightly called the mirror of 'Society'. There have been many writings on the partition of India but in my article I would like to highlight the woes and sufferings of Hindu girls and women as depicted and portrayed by Bengali folk writers.

Many Bengali writers have written about the problem of Refugees in their novels. Prominent among these writers are Atin Bandhopadhy, Sunil Gangapadhyay, Profullo Roy, Narayan Sanyal and Manik Bandhopadhyay, who have discussed in detail the intolerable miseries and untold sufferings of Hindu Bengali girls and women at the hands of inhuman Muslim torturers in East Pakistan and East Bengal and later East Pakistan. There are two categories of Refugee women. 1. Who only suffered without protest? 2. Those who protested against the tortures

inflicted upon them. Narayan Sanyal has beautifully depicted the woes and miseries of helpless and hopeless Hindu girls and women in his famous novel named ‘Bakultala P.L. Camp’ (1955) and ‘Balmik’ (1958). In this novel the central figure in the Refugee camp he joined as the SDO. There are many characters in this novel. When leaving the camp the distressed women namely Kusum writes to the SDO that she wants to live with her husband Biswanath along with the children but she regrets that she can not live with her husband with honour and dignity, thanks to the stigma attached to her character for no fault of her. Kusum was not responsible for the fate she has been subjected to. It is the unwanted partition of the country which only can be held responsible for the plight of the helpless woman Kusum. Kamala is another major female character in the same novel. The novelist has shown the social standing and position (or status) of Refugee women in the contemporary society. Ritabrata the main character loved Kamala but he could not give the honour to his lady love Kamala as was due to her. A dignified person like Ritabrata can hardly marry a refugee woman like Kamala who has little dignity and honour as she is a refugee. This shows the position of the refugees girls and women in the then (contemporary) Bengali society. The so called gentry in our society presume that the refugee girls and women have lost their purity and virginity. Namita in another novel of Narayan Sanyal called ‘Balmik’, has become a member of a Refugee committee but she was killed following a feud among its members. Namita tries and struggles to survive in the grim struggle of life. Suroma is an important character of Manik Bandhopadhyayas famous novel namely ‘Sarbojonin’ (1952). Suroma was not engaged in any household chores while leaving in her previous household in East Pakistan but when she comes over to West Bengal after partition as a refugee she gets habituated to all household chores and activities. Previously all her household activities used to be done by her maid servants. But now as a refugee woman she performs all these household works and activities all by herself. The writer depicts her as a woman who loves her household activities, work is worship to her now. Suroma supports her husband whole heartedly when he takes up the responsibility to serve the displaced and distressed refugees. On the other hand her sister Pratima is lazy, jealous by nature but Pratima went as per as to arranging Durga Puja in to please her father when he comes over to this part of Bengal as a Refugee.

So these novels show womanhood and women folk in their diverse attitudes and mind sets. These novels show various shades of Bengali refugee women. Sometimes they have been shown as women only subjected to suffering and as also as women who fight back in protest.

Jhinuk is another main important women character of the novel 'Keyapatar Nouka' in 1970. Jhinuk has been brought by Binu to Kolkata after she had been tortured by the rioters. The writer has discussed in detail the atrocities of Muslims on the helpless Hindu girls and women. The novels also shows how many Muslims rescued helpless Hindu men and women during riots. This novel shows how Muslims lke Afzal Hossain and Shayed Miya helped Hindus at the cost of their own life. During partition tortures on Hindu women assumed great proportions. The refugee problem gave rise to human trafficking. The torture on women reached an all time high. Binu has witnessed how women were harassed during searching on the border. The writer himself was a refugee. In his novel Profulla Roy gave a poignant expression and beautiful picture of the happenings and incidents that the author himself chanced to witness and experience.3 Later on Atin Bandhopadhyay portrayed a wonderful picture of the untold miseries and sufferings of displaced refugees in his masterpiece called 'Nil kanta pakhir khonje' (1971). Sona the central character of the novel has been portrayed in the light of the authors own personality. The writer himself is a displaced person. Jalali, Malati and Joton are the main female characters. These female characters have been presented as the symbols of both the countries.4 Malati lost her beloved husband following the communal disturbances in the aftermath of the partition of the countries. The author has shown in novel how Malati has to suffer and humiliated after the death of her husband. Then we find Malati involved in rice trafficking. Thus we find the women being harassed and humiliated and at the same time they fight for their self respect and dignity. They could not distinguished what was good and what was bad to them. Their bare necessity was a square meal everyday. There is another Trilogy of Nil Kanta Pakhir Khonje. In addition different writers wrote many stories and novels depicting the sufferings of homeless people in the 1950's and 60's. Sunil Gangopadhyay was another writer who himself crossed over to our part of Bengal and later established himself as a distinguished writer. He in his number of novels discussed in detail the problems faced

by homeless refugees. He wrote the novels like ‘Arjun’ and ‘Purbo-Paschim’. ‘Arjun’ discusses the struggle of a refugee young man named Arjun. In this novel a major female character Labanya wants to live like Arjun with dignity in their refugee colony. But she cannot due to problems she faced in the colony. Another female character Purnima who leads a dishonest life. She goes to office and is involved in anti social activities.

After partition many refugees came over to Tripura, Assam and West Bengal after they had faced in human tortures upon themselves. The fear of being persecuted, the fear of being disposed. According to Ashru Kumar Sikdar the refugees lost their properties, faced the threat of religious conversion and Hindu Bengalis lost their social and economic status following the empowerment of Muslim Bengalis.5 Along with all these problems the greatest problem was the torture of Hindu women in their own homeland. They are forced to leave their homeland leaving behind their health and home, properties and they forgot all about their culture and heritage. These people flocked at railway stations, in camps and other available locations. Sealdah Station became the biggest home to this homeless people. Camps were built in stations like Dhubulia, Bansberia, Ranaghat etc. People were given ‘Doles’, ‘Clothes’, ‘food’ and ‘shelter’. Women were given jobs. Many organization raised to employ these helpless women. The women were trained in making clothes, soaps and so on. The famous social workers looked after the shelterless people.The social organization like Ananda Ashram, Nari Seva Sangha, Udai Villa Industrial Home and all Bengal Women’s home played prominent roles. In Hiranmoy Bandhapadhyay’s novel ‘Udvastu’ the writer has shown how the refugee women were given jobs on completion of their training. The Uday Villa training centre under the charge of Bina Das was a unique centre. Partition in sense was a blessing in disguise.6 It has made many refugee women self dependent and self reliant. It has taught them a great lesson in their own life to be active and energetic to fulfill and realize their own dreams. These women have become more successful than most other women living idleness. Many unfortunate women were lost their lives to save themselves from tortures. Their own family members killed them so that they might not be subject to physical torture by the Muslim rioters. Ritu Menon and Kamala Vasin have described in their novels named ‘Borders and Boundaries’, “The

consensus is most successful when women 'Voluntarily' participate in the violence that is done them and ensuring their silence is a necessary part of the consensus. How often were we told of the courage and strength of women who came forward to be killed or who set an example of self – negation by taking their own lives and again and again, we heard men say with pride, They preferred to die."7 Many women were separated from their families, lost their husbands and children and they were forced to pursue professions which they did not like. The raped victims who became pregnant lived like married ladies so that they could be acceptable to the society. The persecuted women started living afresh coming over to our part of Bengal marring others.

On the Western front of our country in Punjab also refugee women faced physical and mental tortures. There also we find the similar picture of women being suffering like their Bengali counter parts. We are being treated as weak down the ages. As per a proverb women are like open safes that can be stolen anytime. That is why the safes in the house need to be kept save. It is natural that women should be considered weak in a male dominated society. Urbashi Butulia in her book "The other side of silence" has interviewed a refugee man called Mangal Singh. In the interview the gentleman has termed these women as martyres "After living home we had to cross the surrounding boundary of water. And we were many family members, several women and children would not have been able to cross the water, to survive the flight. So we killed – the became martyrs." 8 The writer has questioned if these helpless women and child have any right to living. It is a strange world where only a few gender oriented lucky fellows can only live with dignity. In addition to this another problem that merits mention is the process of recovery of these abducted women. In many cases the abducted women married the culprits and lived happily with their families. When attempts are made to rescue the women they were not ready to come out of their families.9 Then they were forcefully rescued and rehabilitated?

But the novels are mostly based on memory as told by the eye witnesses. These writers found more pleasure in recalling their by-gone days than anything else.

Many displaced women were rehabilitated in camps, homes also religious places like Beneras like Brindabon. Many widows lived in Ashramas living the life of nuns. They wanted forget their previous life in

their own homeland in East Bengal and East Pakistan. Some of them liked talking about the golden parts they had left behind in their original homeland, In the book named “The Trauma and the Triumph” by Jyotsna Bagchi and Subharanjan Dasgupta interviewed a some of the refugee women and highlighted the distresses of these displaced people. Many refugee widows have been leading their lives worshiping God in holy places like Brindaban. Ila Bandyopadhyay aged 88 coming with her husband leaving behind their children in East Pakistan decided to spend the remaining part of their life in Brandaban. “She weeps softly at night.”10 She worshiped God from 1947 to 2000. In Sunanda Sikdar writing named “Dayamoyir Katha” the country is seen in the background of old memory. In Snakha Ghosh’s novel named “Supuriboner sari” the story is written based on memory of his own homeland he has left behind. In the book edited by Krishna Mallick “Deshtyag” the memories of a few displaced women who have left their health and home due to partition.

In this book the women like Surama Mondal, Sushama Das, Parboti Das have described the sufferings their underwent after partition and their struggles for existence coming over to India as homeless and helpless people. In the words of a women who was interviewed has regretted: How can a country called mother can be cut into two pieces.[11]

The partition has a great social impact and significance. The East Bengal and West Bengal people started living together. Initially both the communities had social issues and problems to mix together they had difference in culture and attitude that gladly slowly almost disappeared. The so called “Ghoti – Bangal’ conflict that was a huge problem initially has slowly been resolved to a large extent. The “Ghoti” Bengali women were less interested in education and employment compared to the “Bangal” women who were more serious in education which later ensure their jobs and employment and help them to stand and shine in their life. These women are more sincere, serious and dedicated to the cause of education and self employment. In the novel “Mahanagar” we find how women are trying to earn along with their husband to run their families. Many institutions like “Sammilita Udvastu Valika Vidyalaya” in Jadavpur were set up for the education of refugee girls.

In conclusion it can be said that the writers of novels dealing with refugee problems have highlighted the sorrows and suffering of homeless people along with girls and women who underwent inhuman tortures.

These novels have depicted and portraying many things about their miseries. There may be some deviations and distortions of facts and figures, events and incidents relating to the problems faced by homeless mortals. But none can deny that the descriptions and discussion in these novels are fast hand and direct based on facts.

Footnotes :

1. Ahmed Rafik, “Deshbibhag”, Anindya Prakashan, Dhaka 2014, P - 14
2. Hiranmoy Bandyapadhyay, “Udvastu”, Deep Prakashan, Kolkata - 14, P-32,-33
3. Hena Singha, “”Bangla Upanyasa Deshbhag”, Bangiya Sahitya Sanshad, Kolkata, 2010, P - 189
4. Salma Banu, “Desh o Nari : Bivajaner Avingyan”, Monon Kumar Mondal (ed.), “Partition Sahitya”, Gangchil, Kolkata, 2010, P - 94
5. Ashru Kumar Sikdar, “Deshbhag o Muktipathe Meyera”, Sucharita Bandyopadhyay (ed.) “Deshbhag Smritibismritir Anusongo”, CU, 2013, P - 9
6. Hiranmoy Bandyapadhyay ibid, p- 135
7. Ritu Menon, Kamala Vasin, “Borders and Boundaries”, Kali for Women, New Delhi, 2017, P - 60
8. Urbashi Butulia, “The other side of silence”, Penguine Books, New Delhi, 1998, P - 194
9. Jharna Dhar, “Lanchita Manabi o Deshbhag”, Soumen Chakraborty (ed.), “Bahusware Udvastu Satyay Bangali, Muktaman, 2013, P - 158
10. Jasodhara Bagchi and Subharanjan Dasgupta, “The Trauma and The Triumph”, Stree, Kolkata, 2007, P – 188
11. Krishna Malik (ed.), “Deshtyag”, Gangchil, Kolkata, 2019, P - 116

Bibliography:

1. Ahmed Rafik, “Deshbibhag”, Anindya Prakashan, Dhaka 2014
2. Hiranmoy Bandyapadhyay, “Udvastu”, Deep Prakashan, Kolkata - 14
3. Hena Singha, “”Bangla Upanyasa Deshbhag”, Bangiya Sahitya Sanshad, Kolkata, 2010
4. Salma Banu, “Desh o Nari : Bivajaner Avingyan”, Monon Kumar Mondal (ed.), “Partition Sahitya”, Gangchil, Kolkata, 2010

5. Ashru Kumar Sikdar, “Deshbhag o Muktipathe Meyera”, Sucharita Bandyopadhyay (ed.) “Deshbhag Smritibismritir Anusongo”, CU, 2013
6. Hiranmoy Bandyapadhyay ibid
7. Ritu Menon, Kamala Vasin, “Borders and Boundaries”, Kali for Women, New Delhi, 2017
8. Urbashi Butulia, “The other side of silence”, Penguine Books, New Delhi, 1998
9. Jharna Dhar, “Lanchita Manabi o Deshbhag”, Soumen Chakraborty (ed.), “Bahusware Udvastu Satyay Bangali, Muktaman, 2013
10. Jasodhara Bagchi and Subharanjan Dasgupta, “The Trauma and The Triumph”, Stree, Kolkata, 2007
11. Krishna Malik (ed.), “Deshtyag”, Gangchil, Kolkata, 2019

CULTIVATION OF JUTE AND ITS CONTRIBUTION TO THE ECONOMY OF NINETEENTH CENTURY BENGAL

Chanchal Chowdhury
Senior Joint Commissioner of Revenue
West Bengal

Abstract: Jute was produced in Bengal from time immemorial. It was mainly grown for the production of jute yarn, jute linen, cordage, hessian cloth and gunny bags for catering the domestic demand.The exportation of raw jute to Britain was introduced in the year 1828-29. By mid-nineteenth century, Bengal became the leading supplier of jute fibre, gunny cloth and gunny bags to overseas countries of Asia, Africa, Australia and North America. The prices of raw jute and jute goods in the European market was high due to their increasing demand. The peasants of Eastern Bengal grabbed the opportunity and began extensive cultivation of jute. They earned some extra money and materially improved their social position by producing the golden fibre. Others who were benefitted in the production, transportation and trading of jute, were the agricultural labourers, women strippers, drivers of bullock cart, boatmen, *pharias*, *beparis, dalals, mahajans,* warehouse-keepers, shippers and exporters.

Keywords: Cultivator, Fermentation, Production,*Mahajan*, Consignment, Exportation.

Introduction: In pre-Plassey epoch, Bengal was the most important producer and exporter of cotton and silk piece-goods, raw silk, sugar, salt, saltpetre, opium and jute goods. The fine cotton clothes, especially the Dacca muslin were exported in large quantities from Bengal by European Companies all over the world. The flourishing cottage industry and trade of Bengal, which generated employment of millions of artisans and craftsmen, were decayed in the former half of the nineteenth century within hundred years' of mis-rule of the English East India Company. Bengal lost its previous status in the matter of cottage industries and trade and became a British colony for supply of basic raw materials for the power-driven manufacturing industries of Britain and a dumping-ground for the cost-effective finished goods from western countries. The notable

causes for the ruin of the industries and trade of Bengal were the policy of the British Parliament, uneven competition with the machine-made cheaper goods and the destructive administration of the East India Company government in Bengal. As a consequence of the ruin of cottage industries and trade, a large number of artisans and craftsmen could not continue their here ditary occupations and were compelled to adopt agricultural activityfor their livelihood. The high demand of raw jute and jute goods in European market in the late twenties of the nineteenth century opened up a new opportunity for the cultivators of Bengal. They grabbed this scope and began to cultivate jute in larger areas of agricultural land side by side with other crops. The peasants of Bengal earned some extra money by growing jute plant in agricultural land and producing the golden fibre in the latter half of the nineteenth century.

Cultivation of jute was known in Bengal since long past: The cultivation of jute in India can be traced even before the time of the Mahabharata.In Bengal, jute was an agricultural produce from time immemorial. Jute was produced in different parts of Bengal in the seventeenth and the eighteenth centuries for domestic consumption as well as for gunnies used as packing materials for exportation of articles. Jute was also used for the manufacture of cordage. From the statement of Baul Sheik of Borokandi, Pubna, recorded by the Jute Commission on 22nd May, 1873, it was learnt that the Kapalis, one of the lower Hindu castes, manufactured gunny bags around their neighbourhood and sold at the *hats* for local consumption.[i]In Dinajpur District, large quantities of gunny clothes and jute linen were made. Jute was also produced here for the production of cordage and hand-made paper.[ii]But, jute fibre was not exported from Bengal. From the year 1828-29, the export of raw jute from Calcutta to Great Britain became a regular trade and within the first five years the exports rose to 25,333 cwt.[iii]

Large-scale cultivation of jute in Bengal: Jute possessed a significant position in the economy of Bengal upto the former half of the eighteenth century as a material for consumption mainly within India. The raw fibre and hand-woven jute goods became a regular export commodity of Bengal from the mid-nineteenth century.[iv]

The British merchants required huge quantity of gunny bags for packaging ofraw materials for import in European factories and for export of finished goods to their colonies in Asia, Africa, and

America.The high price of gunny bags due to higher demand prompted the Bengal manufacturers to make increased production of gunny bags and the jute cultivators to produce more fibre.Very soon, the manually-produced indigenous gunny bags could not compete with the machine made commodity of Europe. As a result, exportation of gunny bags from Bengal to Europe was discontinued and Bengal became the supplier raw jute to the mechanically-operated Scotch mills powered by steam engine in Britain. The cultivators of Bengal found that the production of raw jute would be more profitable to them because of its high price in the European market.So, they exerted their surplus labour and extra effort in the production of this cash crop. Since the year 1828, when exportation of raw jute to Europe commenced, the cultivation of jute had expanded rapidly across Bengal, mainly in Eastern Bengal and Assam.[v]

The increased production of jute fibre in Bengal began from the early thirties of the nineteenth century. The steady increase in the production of raw jute was achieved solely by the effort of the cultivators without any state support. They found the cultivation profitable which always ensured them a fair return. The demand of this commodity in the market was brisk and its price was high. The jute cultivators of Bengal tookthe opportunity on their own accord.[vi]

The cultivation of jute was carried out almost in all Districts of Eastern Bengal. But, the cultivation was largely concentrated involving large areas in the Districts of Dacca, Faridpur, Maimansinh, Tippera, Rangpur, Dinajpur, Rajshahi, Bogra, and Pabna.[vii]The area of jute cultivation was gradually extending along the banks of the Meghna river.[viii]The cultivation and manufacture of date sugar and the production of rice in the Sundarbans tract and in the Sudder and Jhenida sub-divisions of the District, were the chief agricultural produce of Jessore. Jute was not produced in the District so extensively. But, in the sub-division of Naral, however, jute cultivation was introduced on a larger scale.[ix]From the following table, it can be observed that cultivation of jute in Bengal was carried out in large areas between the years from 1872 to 1895.

Estimated area under cultivation of jute from 1872 to 1895[x]

District	1872	1880	1886	1890	1895
	Acres.	Acres.	Acres.	Acres.	Acres.
24 Parganas	47,100	59,900	44,000	41,700	35,300
Nadia	1,000	18,600	30,000	60,000	44,000
Rangpur	100,000	131,200	162,000	600,000	278,000
Dinajpur	117,600	14,600	40,000	96,000	107,500
Rajshahi	14,300	25,700	45,000	118,400	103,300
Pabna	122,900	102,300	150,000	150,000	175,500
Bogra	46,600	23,600	34,000	35,000	100,000
Maimansinh	84,000	160,900	250,000	301,000	558,000
Dacca	40,000	111,500	170,000	180,000	178,300
Faridpur	16,600	79,600	85,000	80,000	86,000
Tippera	78,400	-	17,000	190,806	231,200

People involved in the production of jute in Bengal: As per the census data of 1872, the largest peasant classes of Bengal were the Muslims, Mahishyas (Chasi Kaibarttas), Namasudras (Chandals), Rajbansis, Bagdis, Poundras (Pods), Sadgops, Chasadhopas and Aguris. But in jute producing Eastern Bengal, the largest cultivating classes were the Muslims, Namasudras, Mahishyas, Rajbansis and Poundras.The cultivation of jute was not confined to any of the particular classes or castes. In fact, agriculturists of all classes were engaged in the production of raw jute irrespective of their caste, creed, and religion.[xi]

Census Data 1872[xii]

District	Total Muslim	Total Hindu	Chandal	Kaibarttta	Rajbansi	Pod
24-Pergunnahs	887853	1307087	46056	182486	170	249075
Dinagepore	793215	702235	7371	38301	86351	24
Rajshaye	1017979	286870	28762	60440	8121	12
Rungpore	1291465	857298	36148	35396	399407	1
Bogra	556620	130644	7647	14833	2153	4
Pubna	847227	361314	50126	19255	2874	-
Dacca	1050131	793789	191162	32317	4363	101
Furreedpore	588299	420988	156223	13649	3862	73
Mymensing	1519635	817963	123262	77798	14007	63
Tipperah	993564	540156	81155	53866	1295	315
Total	9545988	6218344	727912	528341	522603	249668

From the above table, it is found that the numerical strength of the Namasudras, Mahishyas, Rajbansis, and the Pods were 7,27,912, 5,28,341, 5,22,603, and 2,49,668 respectively among the Hindus in the jute-producing eastern Districts. But, what is more significant is that the largest cultivating class of this tract were the Muhammadans and their number was 95,45,988. So, it would not be wrong to conclude that the Muslims, Namasudras, Mahishyas, Rajbansis, and Poundras were the largest jute producing classes of Bengal in the nineteenth century.[xiii]

Production of dry fibre from the jute plant: Jute plant was cut any time before it was dead ripe. Fibre of jute is contained in the bark of the plant. The fibre is attached to a kind of glue which must be softened by fermentation process and then removed by washing. The fermentation of the bark takes place when the plants are cut and kept under water. This process is called steeping or retting.When jute crop was grown on high lands, the plants were tied in small bundles and stacked on the field for two days before they were removed to a ditch full of water for steeping. The bundles of jute were then removed to the nearest pool and immersed.In Western part of Bengal where deep water was not ordinarily available for steeping, bundles of jute were bound together with rejected plants and placed under water.In Eastern Bengal, the low-lying part of the country, jute was cut in water and the steeping of jute began at once with the leaves on. Bundles of several layers of jute plants were placed one over another. The whole heaps of the plants were completely covered with weeds. There was no requirement for artificial weight and the bundles of jute were immersed by their own weight. The cultivators erected bamboo posts on both sides of the heap for preventing it from floating away.Jute fibre was separated from the stem within a couple of days after retting process was complete.Both the males and the females of the villages undertook the stripping of jute. Ordinarily, a woman did the stripping job in her own home. But, the male strippers conducted the stripping activity standing in the steeping water.A woman ordinarily stripped about half a *maund* of fibre if it weighed in dried condition by working 8 hours a day. But the skilled women of Eastern Bengal could strip more than that quantity.Jute fibre, separated from the stem, was required to be washed in clean water. Running water was much better for washing of dirt from the fibre.The washing process was generally conducted by taking a handful of fibre which was pulled right and left in

water and sometimes dashed against it. After washing the fibre in clean water, it is dried in the sun over a bamboo frame for two or three days and then tied into bundles for market.[xiv] The women of Bengal took an active participation by applying their labour and skill in the process of stripping, drying, and keeping the marketable jute in their residential storehouses in nineteenth century Bengal. Jute fibres of different varieties and quality were produced in different parts of Bengal, the particulars of which can be understood from the following table.

Variety of jute fibre produced in Bengal[xv]

Sl No	Variety of Jute	Place of origin
1	*Uttariya*	Rangpur, Goalpara, Bograh, parts of Maimansinh, Kuch Behar, and Jalpaiguri.
2	*Deswal*	Native jute of Sirajganj and its neighbourhood. The varieties are grown mainly in *bils* and *chars.*
3	*Desi*	Hughli, Bardwan, Jessore, and 24 Parganas.
4	*Deora*	Faridpur and Bakarganj.
5	*Naraianganj i*	Mostly produced in Dacca.
6	*Bakrabadi*	Produced in Dacca District on the *chars* of the river Meghna.
7	*Bhatial*	Grown in river chars of Dacca District since it grows in the *bhati* or tidal country.
8	*Karimganji*	Grown in Maimansinh District.
9	*Mirganji*	Produce of Rangpur District.
10	*Jangipuri*	Produce of a portion of Pabna District named after village Jangipuri.

Transportation of jute to marts and shipment to Calcutta for export: Jute fibre is a light material. It occupies much space when it is kept in loose condition. The bales of jute fibre, therefore, were made by tying them hard with ropes. The cultivators of jute carried the dried jute fibres tied in bundles to the local *hat* or to nearby large marts by boat or on

men's heads depending upon regional circumstances and sold their produce to petty traders known by the names of *pharias*, *bhasania beparis,beparis or paikars* at different places. These petty traders collected raw jute from the cultivators in village *hats* or direct from the peasants' homestead and supplied the material to the *mahajans* in large marts like Sirajganj, Raiganj, Pangasi, Chandrakona, Ulapara and Shahzadpur and Narainganj. They transported the jute hanks to the marts by boats having a carrying capacity of fifty to one hundred and fifty *maunds* per boat. Sometimes the cultivators, who owned country-boats or could hire boats belonging to others, sold their produce direct to the *mahajans* in order to get higher price from them. The *pharias* or *beparis* were the middlemen between the jute-growers and the big merchants. They were ordinarily allowed half share of the profits earned by the venture undertaken by Sirajganj mahajans.In Sirajganj, the *beparis* dealt with the *mahajans* through the agency of brokers who were locally known as *dalals*.More than half of the *mahajans* were *Marwaris*. In jute-growing areas of Eastern Bengal, the *pharias* or *paikars* were found everywhere. The *mahajans*, stationed in the central marts, would sell the jute to the native or European merchants for shipment to Calcutta.The transportation of great bulk of raw jute from Eastern Bengal to Calcutta was conducted by waterways. Jute produced in Maimansinh was often despatched to the large marts of Sirajganj or Narainganj instead of sending direct to Calcutta. Shipments of jute were occasionally forwarded direct to Calcutta in charge of a*manjhi* or chief of the boat, who were known to dispose of the commodity on his own account. Jute was also sent to Calcutta by rail. The raw jute, finally, was exported to overseas countries by European exporting firms.[xvi]

Sale of jute outside Bengal including export to foreign countries: In mid-nineteenth century, jute fibre, gunny cloth, and gunny bags were exported from Bengal to foreign countries of Asia, Africa, Australia, and North America.The countries, where large quantity of these commodities were exported, comprised the United Kingdom, France, Germany, Arabia, Gulf countries, Java, Pegu, Mauritius, Ceylon, Penang and Singapore. In India, the consignment of jute fibres were despatched to the coast of Coromandel and Malabar.[xvii]In the year 1849-50, gunnies and gunny cloth of rupees 26,83,551.00 and in the year 1850-51 of Rs.21,59,782.00 were despatched from Calcutta.[xviii]We can observe

that the exportation of jute to Great Britain had been fluctuating between the years 1835-36 to 1839-40. In the year 1835-36, the export value of jute to Britain was rupees 31,479.00. In the succeeding years of 1836-37, 1837-38, 1838-39, and 1839-40 the export values were rupees 3,87,081.00, 1,70,519.00, 1,89,282.00, and 1,47,530.00 respectively.[xix]Between the years 1847-48 to 1860-61, bulk quantities of jute, involving huge money, were exported to Great Britain that can be observed from the table below.

Export of jute to Great Britain from Calcutta between the years 1847-48 to 1860-61[xx]

Export of Jute to Great Britain		
Year	Quantity	Value
	Cwt.	Rs.
1847-48	246144	504886
1848-49	328948	671838
1849-50	364906	823835
1850-51	564907	1910686
1851-52	499506	1689741
1852-53	312764	1013795
1853-54	369944	1178132
1854-55	565740	1845884
1855-56	765639	2854990
1856-57	492543	2011323
1857-58	670217	2512719
1858-59	594904	4515880
1859-60	682304	2605437
1860-61	923638	3463644

Installation of modern jute mills in Bengal: Before the installation of mechanised looms, the hessian cloths were manually woven in Bengal. The beginning of manufacture of jute goods with the help of machinery was commenced when one Mr. Ackland established a jute mill at Serampore in the year 1854. From the years between 1854 to 1863-64 only one more jute mill was erected in Bengal. But, from the year 1863-64 onwards, the growth of installation of jute mills along the river Hooghly around Calcutta and Howrah was fairly rapid. Very soon the Bengal became a leading producer of factory-made jute goods.[xxi]

Generation of income in the production and trading of jute: The extended cultivation of jute in Bengal was introduced when high demand of raw jute, sack cloth and gunny bags were felt in the European market in the mid-nineteenth century.Cultivators of Bengal, during this period, earned some extra money by employing their labour and capital in the production of jute. A segment of the cultivating classes had materially improved their economic status in those days. The larger part of the peasant population of Eastern Bengal were the Muhammadans.[xxii] So, the Muslim peasants got the major share of this opportunity.Wealth was also accumulated by some of the Namasudra peasants, the largest Hindu community of Eastern Bengal, through the cultivation and trading of jute in northern Bakarganj and Southern Faridpur, as well as Narail and Magura sub-divisions of Jessore and the northern low lands of Khulna.[xxiii] Other cultivating classes, who grabbed the opportunity and earned profit, were the Mahishyas, Rajbansis and Poundras.

Conclusion: In the latter half of the eighteenth century, the English East Company adopted a disastrous economic policy in Bengal. The prosperous cottage industries and the flourishing trade of Bengal were destroyed within hundred years' of mis-rule of the East India Company Government. The cottage industries in the province generated employment of millions of artisans and craftsmen. When these industries were ruined, Bengal lost its previous position in respect of its industry and trade. When the East India Company captured political power of Bengal after their victory in the battle of Plassey, they turned Bengal into an uninterrupted supplier of basic raw materials for the mechanised industrial units of Britain and a dumping ground for their machine-made cheaper finished goods. Due to the destruction of cottage industries and trade of Bengal, a large segment of the artisans and craftsmen could not continue their caste-centric occupations and were compelled to take up alternative callings to earn their livelihood. Majority of them adopted agricultural operation as their occupation. Pressure on agriculture got mounted and it was hardly possible to accommodate the large number of agricultural workers without expanding the size of agricultural sector. In the late twenties of the nineteenth century, a high demand of jute fibre, hessian cloth and gunny bags was generated in the European market. The lofty demand of raw jute and jute goods in Europe had been a boon to the millions of peasants of eastern Bengal from the economic point of view.

The European markets, having high prices in jute goods, opened up a new opportunity for the cultivating classes of Bengal. They seized the scope without delay and began to cultivate this cash crop in larger areas of agricultural land together with other crops. A section of the Bengali peasants earned some spare money by employing their extra labour and capital in the production of the golden fibre in the latter half of the nineteenth century. Not only the peasants, but also the agricultural labourers, women strippers, *paikars*, *pharias* or *beparis, dalals, mahajans,* transport workersand others who were associated with the production, transportation and trading of raw jute earned some profit during the nineteenth century and elevated their economic position in the society.

References and Notes:

[i]. Hem Chunder Kerr, *Report on the Cultivation of, and Trade in, Jute in Bengal, and on Indian Fibres available for the Manufacture of Paper*, Bengal Secretariat Press, Calcutta (1874), Reference No.38, Appendix-B, p.xxviii.

[ii].Francis Buchanan (Hamilton), *A Geographical, Statistical, and Historical Description of the District, or Zila, of Dinajpur, in the Province, or Surah, of Bengal*, Baptist Mission Press, Calcutta (1833), p.198.

[iii]. Commissioners' Report cited by W.W. Hunter in *A Statistical Account of Bengal*, Volume V., Trubner & Co., London (1875), p.431.

[iv]. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee*, Volume I, Bengal Government Press, Alipore (1941), p.5.

[v].Nibaran Chandra Chaudhury, *Jute in Bengal*, Majumdar Library, Calcutta (1908), pp.1, 8.

[vi].W.W. Hunter, *op.cit.,* Volume V., pp.431-432.

[vii].W.W. Hunter, *op.cit.,*Volume V, pp. 86-87, 204, 421-441; Volume VI. (1876), p.391; Volume VII. (1876), pp.242-243, 391; Volume VIII. (1876), pp.60, 213-214; Volume IX. (1876), pp.303-305.

[viii].Colonel J.E. Gastrell, *Geographical and Statistical Report of the Districts of Jessore, Fureedpore and Backergunge*, Office of Superintendent of Government Printing, Calcutta (1868),para.77, p.15.

[ix].J. Westland, *A Report on the District of Jessore: Its Antiquities, Its History, and Its Commerce*, Bengal Secretariat Office,Calcutta (1871), pp.207-226; W.W. Hunter, *op.cit.,*Volume V., p.254.

[x]. Nibaran Chandra Chaudhury, *op.cit.,* pp.63-65.

[xi].Hem Chunder Kerr, *op.cit.,* p.35.

[xii].H. Beverley, *Report on the Census of Bengal 1872*, Bengal Secretariat Press, Calcutta (1872), General Statement V.B., pp. cxvi – cxxiii.

[xiii].James Taylor, *A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca*, G.H. Huttmann, Military Orphan Press, Calcutta (1840), p.235; W.W. Hunter, *op.cit.,* Volume V., pp.259, 288, 438; Volume I., pp.63-64, 69.

[xiv].Nibaran Chandra Chaudhury, *op.cit.,* pp.30-32, 34, 36.

[xv].W.W. Hunter,*op.cit.,* Volume V, pp.438-439.

[xvi].*Ibid,* pp.434-437.

[xvii].J.Forbes Royle, *The Fibrous Plants of India fitted for Cordage, Clothing, and Paper: with an Account of the Cultivation and Preparation of Flax, Hemp, and their Substitutes*, Smith, Elder, and Co., London (1855), p.251.

[xviii].*Ibid.*

[xix].Hem Chunder Kerr, *op.cit.,* Statement showing the Quantity of Jute exported from Calcutta Appendix H., p. lxv.

[xx].*Ibid,* pp. lxvi-lxvii.Note: In Board's published volume, the quantity is far too small as compared with the value. In the "Commercial Annual"—a private publication for the period May to April-the quantity given is Indian *maunds* 1593883 in 1858-59 which has been converted to quintals.

[xxi].D.R. Gadgil, *The Industrial Evolution of India in Recent Times*, Oxford University Press, Calcutta (Fourth Edition, Seventh Impression 1959), p.54.

[xxii].W.W. Hunter, *The Indian Musalmans*, Trubner & Co., London (1876, Third Edition), p.153.

[xxiii].Sekhar Badyopadhyay, "Social Protest or Politics of Backwardness? The Namasudra Movement in Bengal, 1872-1911" in *Dissent and Consensus: Protest in pre-Industrial Societies*, edited by Basudeb Chattopadhyay, Hari S. Vasudevan, Rajat Kanta Ray, K.P. Baghchi & Company, Calcutta (1989), pp.179-180.

Relevance of Teacher Motivation to Student Motivation in the Context of Dooars

Sanghamitra Roy
Associate Professor
Eastern Dooars B.Ed. Training College

ABSTRACT : The Dooars are the alluvial flood plains in Eastern – North Eastern India that lie South of the outer foothills of the Himalayas and North of the Bramhaputra River Basin. Stretching about 350 KM, this region forms the gateway to Bhutan. Dooars is part of the Terai-Duar Savanna and grass lands eco-region. There exist 18 passages or gateways between the plains in India and the hills in Bhutan. Being divided by the Sankosh River, this region is often classified as Eastern and Western Dooars where the Western Dooars are called the Bengal Dooars and the Eastern Dooars are known as the Assam Dooars. Famous for its tea gardens, forests and the river Teesta, Dooars is an ideal place for nature enthusiasts and adventure seekers. The region is widely known for its wild life sanctuaries abound in herds of deer, one horned rhinos, elephants, reptiles, etc. The tribal culture with its folk dance, drama, songs and folk lore is an integral part of the culture of the region. The tribal communities of Rajbongshi, Mech, Rava, Toto, Limboo, Lepcha and the Bengali and Nepali community populate the region and provide a rich flavor to the rich cultural diversity of dooars. Dooars, thus, can inevitably be considered as a region embracing the rich cultural and natural diversity present in the foothills of the Eastern Himalayas in North East India around Bhutan. The past few decades have witnessed an increase in research on teacher motivation which has been proved a crucial factor closely related to number of variables in education such as student motivation, educational reform, teaching practice and teachers' psychological fulfilment and well-being.

Key Words: Dooars, Alluvial, Basin, Savanna, Rajbongshi, Mech, Rava, Toto, Limboo, Lepcha, Motivation

INTRODUCTION :

The Dooars are the areas covering the alluvial flood plains in eastern – northeastern India. This part of North Bengal lies south of the outer foothills of the Himalayas and north of Brahmaputra river basin. In the

foothills of the Himalayas, it is a region of West Bengal covered with dense forests and tea gardens. It's also mesmerizingly beautiful, stretching from the Teesta River in the West to the Sankosh River in East, 150 km in length and 40 km in breadth. The region, fully or partially, covers the districts of Alipurduar, Jalpaiguri and Cooch Behar. Dooars means 'Doors' in Assamese, Bengali, Maithili, Bhojpuri and Magahi languages.

There are 18 passages or gateways between the hills in Bhutan and the plains in India. Western Dooars or the Bengal Dooars, and the Eastern Dooars or the Assam Dooars are very popular.

Dooars is famous for its historical background as well. In the pre independent India Dooars were under the control of several dynasties like Kamata Kingdom under Koch dynasty and also the kingdom of Bhutan. And then after the end of the British rule in India, the Dooars acceded into the dominion of India in the year 1947, and got merged with the union of India shortly afterwards, in the year 1949. The region, when considered and looked in terms of political geography, it is a part of the plains of Kalimpong district, the whole of Jalpaiguri districts and Alipurduar districts and the upper region of Cooch Behar district in West Bengal and the districts of Kokrajhar and Bongaigaon in the State of Assam. The largest cities in the region stretching from the Darjeeling foothills to the Arunachal Pradesh foothills are Siliguri and Jalpaiguri, which partly lie in the Terai region rather the Dooars, geographically. These North Bengal cities are connected well with the other parts of the country by road, air and railway. This region is the business hub of North Bengal. The other major cities under Dooars are Kokrajhar, Bongaigaon, Goalpara, Barpeta and Dhubri in Assam; Cooch Behar, Alipurduar, Dhupguri, Malbazar, Maynaguri, Falakata, Birpara and Jalpaiguri form a part of North Bengal in the state of West Bengal; Kishanganj in Bihar and Phuentsholling near Jaigaon in Bhutan.

One can enjoy the unique combination of varied landscape, geographical diversity as well as the cultural variety of different ethnic groups prevailing in this area. This is the reason that Dooars in North Bengal has been placed as one of the most treasured tourist destinations in North Bengal which comprises mostly of the three Districts – Jalpaiguri, Alipurduar and Cooch Behar. There are fabulous wildlife sanctuaries with scenic beauty, log huts and Toto Para, the habitat of the

rare and smallest surviving tribe known as the Toto. Summer is mild and winters are cold with foggy mornings and nights. Dooars is home to 5 major national parks and sanctuary each has their own unique settings. Chilapata forest is near Alipurduar. Jaldhaka is close to Bindu and is a perfect destination for leisure holidays. Neora Valley, Parren Busty, DhupJhora, Kalimati, Kalikapur are some of the offbeat sites and are worth visiting. Dooars is famous for its historical background as well. In the pre independent India Dooars were under the control of several dynasties like Kamata Kingdom under Koch dynasty and also the kingdom of Bhutan. And then after the end of the British rule in India, the Dooars acceded into the dominion of India in the year 1947, and got merged with the union of India shortly afterwards, in the year 1949. The region, when considered and looked in terms of political geography, it is a part of the plains of Kalimpong district, the whole of Jalpaiguri districts and Alipurduar districts and the upper region of Cooch Behar district in West Bengal and the districts of Kokrajhar and Bongaigaon in the State of Assam. The largest cities in the region stretching from the Darjeeling foothills to the Arunachal Pradesh foothills are Siliguri and Jalpaiguri, which partly laid in the Terai region rather the Dooars, geographically. These North Bengal cities are connected well with the other parts of the country by road, air and railway. This region is the business hub of North Bengal. The other major cities under Dooars are Kokrajhar, Bongaigaon, Goalpara, Barpeta and Dhubri in Assam; Cooch Behar, Alipurduar, Dhupguri, Malbazar, Maynaguri, Falakata, Birpara and Jalpaiguri form a part of North Bengal in the state of West Bengal; Kishanganj in Bihar and Phuentsholling near Jaigaon in Bhutan.

The people of this place are also a varied lot. The tea gardens brought in tribal from other parts of Bengal and Bihar; the hill stations attracted people from neighboring Nepal and Bhutan and the partition of 1947 brought in Hordes of Bengalis from Bangladesh. Along with the local inhabitants known as the Rajbongshis, this made a heavy mix of culture and traditions.

Dooars is predominantly inhabited by Oraons, Mundas, Santhals, Kharias, Mech, Ravas, Rajbongshis and Nepalis, all of whom primarily depend on tea-gardens, forests and agriculture for their livelihood. The beautiful landscape camouflages years of neglect and exploitation resulting in poor education and health facilities, migration, trafficking and

poverty. Residence of this area is the weaker section of the society. They are settled in the remotely located areas which are away from the main stream of society. Though they have been kept aloof, due to irony of fate, they represent a unique class of people who are really the most graceful in the environment like a child in its mothers lap.

The indigenous people of the Dooars were the Koch-Rajbanshis, the Mech, the Rabhas and the Lepchas. They were well dependent on their traditional village economy of agriculture, hunting, fishing, and forest based economy. After the introduction of tea plantation in Dooars, the planters encouraged the immigration of the Nepalese, and then the tea planters decided to bring labourers from the Santal Parganas and Chhotonagpur plateau. In the second part of nineteenth century, a large number of tribal people mainly of Oraons, Santals, Mundas and Malpaharis in-migrated to the Dooars. Again after the partition of the country in 1947, and emergence of Bangladesh in 1971, streams of immigration or infiltration from East Pakistan and Bangladesh occurred in the areas. The immigrated Bangladeshi people occupied a vast areas in almost everywhere. Thus the Dooars grew into a new hub of Oraon 40% Malpaharia 2% Mech 1% Santal 8% Mahali 6% Lohar 7% Kharia 5% Munda 10% Tamang 4% Limbu 3% Others 14% .This mixing up of multi-racial and multi-lingual people has led to the demographic and cultural environment to be too complex for the future.

Before coming of the British, the tribals enjoyed unhindered rights of ownership and management over natural resources like land, forests, wildlife water, soil, fishes etc. Indigenous peoples have an intuitive relationship with nature, a wealth of traditional knowledge, and have used natural resources for their livelihood. But, after the introduction of plantation farming in the Dooars, livelihood has been changed. Jungles were cut, forests disappeared in large amount, and control over natural resources has shifted from tribal people to the Government. With the concept of protected forests and national forests, the tribals felt themselves uprooted from their property of forests. Even the concept of earlier forest village is abolished recently by the notification of the government. Hence the right of forest is abolished today.

The British Government declared the eleven Bengal Dooars as a non-regulated area for the purpose of using the land in accordance with

the design of colonial economy. Under the lease rules for tea gardens, lands were granted to any capable entrepreneur for a term of five years, after expiry of that if the conditions of lease fulfilled all terms and conditions be renewed for a period of thirty years and so on for similar periods in continuity. In the present time, tribal lands are gradually transforming to tea gardens due to the ignorance of the tribal people. It is found that for the tea gardens different private entrepreneurs have borrowed land from the farmers in a condition that one or two members of each family would be permanently employed in the tea garden. But after agreement, they were cheated, no one is employed in the garden, or the garden is abandoned after few years. Hence there is no production as well as no employment. Land of tribal people is forfeited in such a way.

Tea gardens are the main employment source of tribal workers in Dooars region. One most critical period happens during the closing of tea gardens. Incident of closing of tea gardens are nothing new in this region and it happens suddenly. The tribal laborers lose their job during the closing of the gardens. The laborers shifted to another profession after a long waiting. From the closed tea gardens a few male laborer force to migrate to the different western states of the country, the women and young age workers are employed in different hard construction works such as lifting and breaking stones from the river beds etc.

Due to unemployment in tea gardens every year, hundreds of tribal girls mostly teenagers have gone missing over the past few years from the poverty-stricken dying tea estate areas of the Dooars. Driven out of home by poverty and because of the dream of a better life, these girls have fallen prey to human trafficking. They have been trapped by local agents promising lucrative jobs in big cities of the country. After leaving home, however, these girls have become untraceable.

The tribes of Dooars are facing some common problems as it is in state and national level and some unique problems which require strategic solutions. It is very hard to return them to their primitive stage of self-regulating society and economy. Poor lliteracy rate and high School dropout rates are big problems of tribal society in Dooars. In the government sponsored schools most of the teachers are from Bengali background while the students are not able to understand Bengali properly. As a result, the students lose their interests on studying. Hindi

medium schools may be opened, as most of them understand Hindi better than Bengali. Sandri being main communicating language, teachers may be appointed from the sections who understand Sandri properly. The missionary schools focus English language as medium of study. Moreover, children can study if they remain free from hard work in their early life for earning. Such a situation can be developed if there is sufficient income in the family. The development practices should be based on the cultural characteristics, environmental peculiarities and traditional skills of the tribal people. Tribal welfare programme should be based on the felt needs of the people. Planners should be well acquainted with these needs. In implementing the development schemes, the local political leaders and administration should have good will to serve the poor tribal, otherwise the benefits will not reach up to the root level.

Several steps have been taken to give priority for the development and the welfare of the natives of Dooars, but the educational level among them is yet to reach a satisfactory one that can improve their standard of living. As such, education is most important element in the development of its community. Literacy level and educational attainment are vital indicators of development in a society. Since the level of awareness and literacy status is very poor among the plantation works, they are ignoring about what they should do for their children. Thus, in order to improve their living and economic conditions, a change in their social outlook is urgently needed.

Literacy is one of the major indicators of the development of a population. The rate of literacy is directly related to the quality of life in a place. The higher the literacy percentage of a place, the more the status consciousness in the society. It cannot be denied that maintaining standard of education is of much importance and so must be taken due care of. Education plays a significant and remedial role in balancing the socio economic fabric of any area. Since the citizens of a place are its most valuable resource, every state needs the nurture and care in the form of basic education to achieve a better quality life. Education is one of the most powerful and proven vehicles for sustainable development, enabling upward socio economic mobility and poverty escape. But, despite years of progress in access to education and enrollments, particularly for girls, it has been too slow: about 260 million children were still out of school in

2018 – nearly one fifth of the global population in that age group. One in 5 are estimated to drop out and two in five never set foot in a classroom (UN Sustainable Development 2016) – and that was before Covid's impacts. For this reason, 'Quality Education' is Sustainable Development Goal # 4 of the 17 Global Goals of the 2030. The goal aims for all girls and boys to complete free primary and secondary schooling by 2030, to provide equal access to affordable technical and vocational education and training (TVET), to eliminate gender and wealth disparities, and achieve universal access to a quality higher education and life-long learning opportunities.

It has been found that the causes of the failure in reaching out the needful educational standard of a place are deeply rooted in the environment of that place. The progress remains arrested chiefly due to the physical, social, political, economic and administrative factors prevalent in that area. But, despite several such factors influencing the standard of education of that place, the motivation of a teacher plays the most important role. Students, if not properly motivated, will not learn effectively. They won't retain information, won't participate and may even become disruptive. And, to motivate the students, it is highly needed that the teachers too remain motivated.

The past few decades have witnessed an increase in research on teacher motivation which has been proved a crucial factor closely related to number of variables in education such as student motivation, educational reform, teaching practice and teachers' psychological fulfilment and well-being. As one of the most often researched topics in the field of psychology and education, motivation has been generally viewed as energy or drive that moves people to do something by nature. As for teacher motivation, Sinclair(2008) defined it in terms of attraction, retention and concentration as something that determines ' what attracts individuals to teaching, how long they remain in their initial teacher education courses and subsequently the teaching profession, and the extent to which they engage with their courses and the teaching profession' (2008, p-37).

The relevance of teacher motivation to student motivation has long been acknowledged. To address the constant calls for Teacher Motivation Research, a comprehensive review of teacher motivation studies conducted from diversified theoretical perspectives must be undertaken in

the Dooars belt in North Bengal consisting of the three major districts of Jalpaiguri, Alipurduar and Cooch Behar.

REFERENCES:

1. Debnath, S. (2010). The Dooars in Historical Transition. Shiva Mandir: N. L. Publishers.
2. Dinerstein, E., Loucks, C. (2001). Terai – Duar Savanna and Grass Lands. Terrestrial Eco-Regions. World Wild Life Fund.
3. Sengupta, Somen (2012). Call of the Wild. The Statesman. P. 5
4. Encyclopedia Britannica – Duars
5. Sen, A. (2000), Development as Freedom, Oxford University Press, New Delhi
6. Majumdar, B. (2001) Jalpaiguri Zilar Janajati, in T. Ghosh and A. Mandal (eds.), Paschimbanga, Vol. 34, (In Bengali).
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH CULTURE SOCIETY ISSN: 2456-6683 Volume - 1, Issue - 08, Oct – 2017 UGC Approved Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Publication Date:30/10/2017 Available online on - WWW.IJRCS.ORG Page 163, 164

The Mentality of Education and the Use of Education in Different Fields during the Mughal Period (Babar to Aurongojib)

Bimal Mandal
Assistant Professor, Department of Education,
Serampore Girl's College, West Bengal, India

ABSTRACT: During the reign of Babur shuhrat-i-am, the Public Works Department used to set up buildings for schools and colleges. Mughal Emperor Humayun introduced the study of Mathematics, Astronomy and Geography in Madrasa in Delhi. Akbar added subjects like Accountancy, Public administration, Geometry. Jahangir paid homage for women's education which Saha Jahan also accomplished too. As the empire was very large in its periphery there were so many options for various types of jobs other than agriculture which was the backbone of the economy. Education was treated as a matter of individual concern, did not admit of the method of mass production applicable in industry. The making of men was regarded as an artistic and not a mechanical process. Indeed the aim of education was the developing of the pupil's personality in his innate and latent capacities. According to the ancient Indian theory of education, the training of the mind and the process of thinking are essential for acquisition of knowledge. The paper intends to explore the mentality of education and the use of education in different fields during the Mughal Period from Babar to Aurongojib.

Keywords: Education, Mughal Period, Pathshalas, Vidyapeeths, Madrashas.

Introduction

The Mughal Empire was established by Babur. As the empire expanded it included Iranians Indians Afghans Rajputs Marathas and other groups in its system and the Mughal Emperors managed the diversity of people and cultures with their political Legacy and decisive power and maintained the peace and prosperity. They were patrons of education. They had great love for learning and contributed more in the field of spreading education through Pathshalas Vidyapeeths Maktabs and Madrashas. During the reign of Babur shuhrat-i-am, the Public Works Department used to setup buildings for schools and colleges. Mughal Emperor Humayun

introduced the study of mathematics astronomy and geography in Madrasa in Delhi. Akbar added subjects like accountancy public administration geometry. Jahangir paid homage for women's education which Saha Jahan also accomplished too. As the empire was very large in its periphery there were so many options for various types of jobs other than agriculture which was the backbone of the economy. Mughal rulers were the patrons of art and culture. Many historical relics are the example of the rich endearment towards architecture sculpture Handicrafts painting etc. This helped developing various book a sense apart from traditional functions such as Government employees traders etc. Even in this Era is significant practice of song dance and music can be found. To discuss about the vacations related to industrial sector Mughal period may be divided into two categories agricultural based and non agricultural based. As technological advancement had not reached up to the mark in this period so Industrial product were mainly handmade Different types of craftsmen at home from the cottage industry based on agriculture. From non agricultural sector the vocations are mainly from cotton textile and woolen products sugar products tobacco and wine and even from Silk products. The enormous wealth and resources helped to create various kinds of job opportunities. India has a long history of organised education. India has glorious past of quality education and cultural activities. The Gurukul system of education is one of the oldest on earth and it was dedicated for highest upliftment of all round ideals and human development that is physical mental and spiritual. The traditional Hindu Residential schools of learning what were called gurukuls which ran at the houses of the teachers or at monastery. According to Ain-i-Akbari boys wear kept in school for IAS where they learnt the consonants and vowels. A great portion of the life of the students wasn't wasted by making them read many books. His majesty ordered that every school boy should first learn to write the letters of the alphabet and also learn to trace their several forms. He ought to learn the shapes and name of each letter which may be done in 2 days then the boys should proceed to write the joined letters. They may be practiced for a week after who is the boy should learn some prose and poetry by heart and then commit to memory some verses in praise of God or moral sentences each written separately. The teacher ought especially to look after 5 things- 1) knowledge of the letters 2) meanings of words 3)

hemistich 4) the verse 5) the former lesson. Every boy ought to read books on morals arithmetic the notation peculiar to arithmetic agriculture mensuration geometry astronomy physiognomy household matters the rule of Government medicine logic the Tabiyi and Riazi and Ilahi Sciences and history all of which may be gradually acquired.

Significance of the Study

The Mughal Era was the most important transitional phase of education policy, especially in case of vocational education. A empire was vast due to economic growth, mingling different cultures and advancement of society along with their political Legacy there were ample scope of several vocations apart from agriculture sector in Mughal period. Some were inherited vocations while others were refurbished with sincere effort and systematic technical implication of education policy patronised by Mughal rulers. Vocational education is skill based education related to specific trade, occupation, industry. So the students need to identify those with present situation.

Objectives of the Study

1) to explore the mentality of education and the use of education in different fields during the Mughal Period from Babar to Aurongojib
2) To know the several trading occupations and their nature in Mughal period
3) To know about various service sectors and industrial sectors of this period and its impact on later ages
4) To know the gravity of aegis of Mughal Emperors for vocational education.

Definitions of Important Terms

1) **Technology:** Technology is the collection of techniques skills methods and processes used in the production of goods or services or in the accomplishment of objectives such a scientific investigation.
2) **Education:** (learning outcome): education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge skills values beliefs and habits. Educational methods include storytelling discussion teaching training and directed research.
3) **Institution:** (educational setup) As structures or mechanisms of social order, they govern the behaviour of a set of individuals

within a given community. Institutions are identified with social purpose transcending individuals and Intentions by mediating the rules that govern living behaviour

4) **Mughal Era:** (time period ruled by Mughal rulers) The emperor was founded by the Mongol leader Babar in 1526 when he defeated Ibrahim Lodi at the first battle of Panipat. The emperor continued up to 1857 till the reign of Bahadur Shah II.

5) **Madrasa:** Madrasa is the Arabic word for any type of educational institution secular or religious and whether a school college or university. The students in Mughal Era went in Madrasa for higher studies and the students of different religions studied there.

Sources of the Data

The sources of data with reference to historical research are as follows -

1) **Primary Sources:** These are the records of information created by people directly influenced by the historical event of interest. This can include eyewitness accounts, reports, journal, articles, maps, test scores, diaries, music, plays etc. Primary sources can be roughly divided into four areas, i.e. written records or documents, quantitative records (numeric), oral records and relics. Written records of documents is the biggest category and can further be divided into groups based on the intention of the writer. International documents are written to serve as a record of the past which can include things like a yearbook. Unpremeditated documents refer to documents that are written to solve an immediate purpose without the writer expecting it to be used as a record of the past. The availability of primary sources is dependent on the era and subject that is studied and in some instances not available at all and the researcher would have to turn to secondary sources.

2) **Secondary Sources:** Secondary sources of sources for the events or articlesare described by a third person not directly involved in the event. It can also be the case that the event is described a long time after the event took place. Secondary sources can be created from primary sources secondary sources or a combination of the two. In this research work researchers has mainly used the secondary sources of data. The used sources of this is today includes various Research reports, different articles and published books which are enlisted in the Bibliography.

Review of the Related Literature

The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. From their mother's side they were descendants of Genghis Khan, ruler of the Mongol tribes, China and Central Asia. From their father's side they were the successor of Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. Such a great rulers could not refrain their endeavour from uplifting educational system. They started a developed educational system with modern outlook and enough scope for creating new job opportunities. During Mughal period all round development had took place including military, painting, architecture, industry, art and culture, singing etc. Related literature is a store home of knowledge. It is absolutely necessary to review literature before making up one's mind to proceed with the problem. The related literature is helpful to deal with a topic for dissertation. In this regard the review of the related literature avoid the risk of duplication, provides theories, ideas and expansions in formulating the problem and contributes to the general scholarship of the investigator. It is the foundation upon which all other elements of research depend. Review of the related literature on any problem area helps the researcher to discover what is already known, what others have attempted to find out so far, what methods have been used, which methods are useful to solve the problem. In the present prepared the researcher has tried to explain the relevance and attitude towards vocational education in Mughal period. The researcher has attempted to give a comprehensive picture of the studies which are directly or indirectly related to the present study.

- **2012: "Education during mediaeval period in India" by V K Maheswari -** This review covers the system of education in India from about 10th century a.d. to the middle of the 18th century. It is an enhanced work of educational system during that period.
- **2016: "Islamic education at Mughal kingdom in India (1526 to 1857)" by Sri Suyanta, SilfiaIkhlas** - This work has highlighted how Mughal dynasty had encouraged the new revival of the old and almost drowned civilization. In this work we can find that education system gained considerable attention during this period with simultaneous development of Mosques and Science subjects.
- **2017: "A brief survey of Muslim education in pre-colonial India (1206 to 1857)" by Anwar Farooq, Masher Hussain -** This review relates the rulers' contribution for education. Muslim rulers

especially in Mughal period liberally are test on education for all. Though there was a strong conformity with Muslim tradition. Contemporary education was considered necessary for daily spiritual freedom here in this world and hereafter.

Methodology of the Study

Descriptive studies are concerned with studying what exists. It interprets and explains the educational phenomena. There are various forms of descriptive studies such as case studies, surveys of the different forms, developmental studies, content analysis etc. Historical research attempts to examine past events in order to draw their relevance for the present and future life. There are various types of historical research namely bibliographical research, legal research, studying the history of scientific and philosophical ideas, studying the history of educational institution and Organisation etc. Philosophical research is made on analysing meaning and nature of educational concepts and proposition and their relevance to educational practice.

Historical research is the process of systematically examining past events to give an account of what has happened in the past. It is not a mere accumulation of facts and dates or even a description of past events. It is a flowing, dynamic account of past events which involves and interpretation of these events in an attempt to recapture the nuances, personalities and ideas that influence these events. One of the goals of historical research is to communicate and understanding of past events. Historical research can show what occurred in the past and overtime which can help us to see you where we came from and what kinds of solution we have used in the past. Understanding this can add perspective on how we examine current events and educational practices. The researcher has investigated of the matter and sought answers from the available sources and evidences. This includes external and internal historical information literary articles of different authors, autobiographies and books by the Mughal rulers and existing various historical relics and others.

Analysis and Interpretation of the Objectives of the Study

The several trending occupations and their nature in Mughal period:
As the Mughal Empire was vast there were several opportunities of choosing from several occupations. There was no formal institution for vocational education or professional training. Such education was

transferred from generation to generation in due course with the active participation of eager people. It has been argued further that extreme specialisation was promoted by the caste system, with the father training his son in the same profession since si he had no option to move to another station. However this argument has limited validity. In all pre modern societies including Europe additional skills were passed on from Father to Son. Whenever a new profession such as paper making, making of Fireworks, dying, painting, painting on cloth arose caste was no barrier for enlisting new entrants. As the empire expanded, it encompassed different professions and recruited diverse bodies of people. A detailed discussion is made in the following-

❖ **Mansabdar:** Vitamin Sadda refers to an individual who holds a Mansab meaning a position or rank. It was a grading system used by the Mughals to fix 1) rank 2) salary 3) military responsibilities. Rank and salary were determined by a numerical value called Zat. The higher the Zat the most prestigious was the noble's position in court and the larger his salary. The mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of sawar or cavalrymen. The mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered, their horses branded and then received money to pay them as salary.

❖ **Military:** Muslim rulers established their Empire in India because of their superior skill in warfare and higher military organisation. Devar was conscious of the fact that they could win because of their superior skill and Organisation of the armed forces. Therefore the parents’ special attention was to military education of their children. The princes were given special military training besides education in practical affairs of life and state affairs. The young princess was also taken to battlefields for practical experiences. The Mughal Emperors paid special attention to military education because they knew that they could hold of the empires only through superior forces. So they engaged a large number of people in military services.

❖ **Craftsmen:** Crafts developed during the Mughal period as it received the royal patronage. Embroidery I bodywork exquisite ornaments were regarded as symbolic of the excellence attained by Handicrafts during the Mughal period. Because at that time there

was no institution for technical education training in crafts, so it was practiced in the traditional manner in families. Preparation of War goods also encouraged handicrafts. Boats ships and chariots were manufactured on a large scale. This help that he seems to be busy in their work and earn their livelihood. The Taj Mahal of Agra, Red Fort of Delhi and Buland Darwaza of Fatehpur Sikri are excellent examples of the development of architecture during in the Muslim period.

- **Fine artist:** development of Fine Arts has reached its peak during the Mughal period. The Mughal Emperors believed that along with strengthening of military powers it was also necessary to maintain pomp and show in the court. They encouraged education in fine arts so that great artists might develop their art for contributing to the glory of the court. One of the great courtiers of Akbar, Tansen the great musician, developed many musical tunes Rag and Raginis. Dancing was also developed during this period. Anarkali, the great dancer belongs to Akbar's time. Painting was also encouraged. Jahangir himself was a great painter. Sir Thomas Roe the British Ambassador who visited the royal Court had praised Jahangir love of painting.
- **Teachers:** Oral education and memorization of the assigned lessons were the chief methods of teaching during the Muslim period. The teacher used to decide as to when a student was competent to receive education of a higher standard and the people believe that no knowledge was possible without a teacher. After completion of primary education in maktabs the student could go for higher education in Madrasas. The Mughal rulers engaged many teachers for this purpose. They used to import lessons in maktabs and madrasas.
- **Astronomers**: the Mughal Emperors took a keen interest in the development of astronomy. The works thus produced were mainly Zijes(astronomical tables) and calendars. Fariduddin Munazzam was a court astronomer of Shah Jahan. He compiled Zije Shah Jehani. Malajeet was another astronomer at Saha Jahan's Court. He wrote ParciPrakasha which gave Arabic Persian astronomical terms and their Sanskrit equivalents. Maharaja Sawai Jai Singh was an astronomer of the first order. He had some Greek works on

mathematics translated into Sanskrit as well as more recent European works on trigonometry logarithms and Arabic text on astronomy. Except that Hindu Scholars namely Nityanand and Manish Vohra were amongst the noted astronomers of this period.

- ❖ **Hakeemi**: During Mughal period physicians used to care health and hygiene of the royal people as well as the common men. They were called Hakeems. Those Hakeems or the court physicians supervised preparation of Royal medicine and ensured safety of this. Hakim Ali geelani was the chief physician of Emperor Akbar. He invented a kind of sweet wine for getting rid of travelling fatigue. Hakim Ain ulMulkSiraji composed for his Royal Patron Emperor Shah Jahan Alfaz-al-Adwiya. Mohammad Raja of Siraj wrote treatise RiaziAlamgiri on medicine food and clothing and was dedicated to Aurangazeb. Hakim Akbar Arzani was also another court physician of Emperor Aurangzeb.
- ❖ **Other jobs:** There were so many other job opportunities in this era. Amin, Weaver, Dancer, Dramatist, Calligrapher, Surveyor, Accountant were among the prime vocations. Even many people were engaged in wine industry. In the comparatively large industry like ship-building, cannon industry many people were engaged as general workmen as well as mechanical engineers and other technicians and designers.
- ❖ **Weaver:** In the field of Weaving and Dyeing many people had the opportunities of their livelihood. Indian Technology was hardly backward as compared to the technology available at that time so even the Europeans sent their own craftsman to Murshidabad for certain colours and dyes.

Various service sectors and industrial sectors of this period and its impact on later age: During Mughal period efforts were made to seek a kind of synthesis between the Indian traditional scientific culture and the prevalent medial approach to science in other countries. Let us discuss what development took place in various fields of service sectors and industrial sectors during this period. Astronomy: the 16th and 17 centuries Roy synthesis between Islamic astronomy and Indian astronomy way Islamic observational techniques and instruments are combined with Indian computational techniques. While there appears to have been little concern for theoretical astronomy Mughal astronomers

continued to make advances in observational Astronomy and produced nearly a hundred Zij treaties. The Mughal Emperors took a keen interest in the development of astronomy. Women built a personal observatory near Delhi. The instruments and observational techniques used at the Mughal observatories were mainly derived from the Islamic tradition. In particular had one of the most remarkable astronomical instruments invented in Mughal India is the seamless celestial globe.The JantarMantar is a collection of architectural astronomical instruments built by Sawai Jai Singh. It is still exist in Delhi and Jaipur. There are three instruments within the observatory of JantarMantar in New Delhi namely Samratyantra Jai Prakash Yantra and MisraYantra. The observatory in Jaipur consists of 14 major geometric devices like Samratyantra Jai Prakash Yantra Ram YantraMisraYantraetc for measuring time predicting eclipses tracking stars' location as the Earth orbits around the sun ascertaining the declination of planets and determining the celestial attitudes and related ephemerides.

❖ **Water works:** the first Mughal emperor Babur is known to have patronise the construction of water channels used in Gardens and orchards ablution pools for his servicemen. This tradition was continued by his grandson Akbar who built monumental water works in his capital at FatehpurSikri where he ordered the construction of a dam with 13 Gates. This damn created this fellow artificial lake during the monsoon season every year. Water was developed into FatehpurSikri through large mechanical device is known as the Persian water Wheels and Sakias. Digging of wells and river embankments for irrigation were the pillars of success in the field of irrigation system during the reign of Mughal emperor Shah Jahan. Nahar-i-Faiz and Saha-Nahar were the notable canals for irrigation. Alchemy or Chemistry: Sheikh Din Muhammad had learned much of Mughal Alchemy and understood the techniques used to produce various alkali and soaps to produce shampoo. He was also a notable writer who described the Mughal emperor Shah Alam II and the cities of Allahabad and Delhi in rich details and also made note of the glories of the Mughal Empire. Sheikh Din Mohammad was appointed as sampling surgeon to both Kings George IV and William IV.Pharmacy: Sultan AlauddinKhilji had 7 eminent hakeems in his Royal court. This Royal patronage was a

major factor in the development of Unani practice during Mughal period in India but also a Greco- Islamic medical literature with the aid of Indian Ayurvedic physicians. During the reign of Mughal kings of India several Qurabadains were compiled like QurabadainShifae'ee, Qurabadain Sakai, QurabadainQadri and Elaj-ul-Amraz. In these Pharma pharmacopoeias quantities of drugs in a given prescription were specified and methods of preparation. The court physician supervised the preparation of Royal medicine which were sealed to ensure safety.

- **Mathematics:** Faizi was a poet Laureate of Emperor Akbar. At the suggestion of Akbar Faizi translated Bhaskaracharya's Sanskrit work on mathematics 'Lilavati' into Persian containing theorems of arithmetic and algebra. It appears that mathematics was not only associated with accountancy and revenue collection but with astronomy and architecture as well. Ustad Ahmad Lahori the architect of Taj Mahal and Red Fort made significant contribution to mathematics. Maharaja Sawai Singh made major contributions in trigonometry which was to find the sign of one Degree and its parts namely minutes and seconds.
- **Metallurgy:** Various types of weapons were made in India. The use of zinc was not known in Europe but extracted in India. Many alloys were made iron steel brass bronze used in making weapons. This kind support princeware produced in a plant called Karkhana. Screw Cannon-in order to carry heavy cannons on Hill tops the Cannon was made in pieces and assembled subsequently. Another dimension of metallurgy was production of gold silver and copper coins. Gold and Silver leaf was produced for use in goods and medicines. Trains are made from various metals like gold silver which are used in textile. In 1659 Muhammed SalihThattvi headed the task of creating a massive seamless celestial globe using a secret wax casting method in the Mughal Empire. It was inscribed with Arabic and Persian inscription. 20 other side clothes wear pad used in Lahore and Kashmir during the Mughal Empire. It is considered a major feet in Metallurgy.
- **Rocket:** Akbar was the first to initiate and utilise metal cylinder Rockets known as Bans particularly against war elephants during the battles. In the year 1657 the Mughal unutilized Rockets during

the Siege of Bidar. Prince Aurangazeb's forces discharged rockets and Grenades while scaling the walls. Rockets were made with gunpowder in them. Some Rockets went in the year and some point along the surface. The rocket man were trained to launch the rockets at an angle calculated from the diameter of the cylinder and the distance to the target.

❖ **Damascus steel:** the Mughal Emperor Akbar is known to have built large foundries producing the best quality showed blades. Akbar himself is known to have preferred Damascus Steel Talwar which were considered the shortest blades ever used in battle in South Asia.

❖ **Canon foundry**: during the reign of the Mughal emperor Shah Jahan Raigarh Fort became one of the world's most efficient Canon foundries mainly due to the abundance of iron ore mines in the vicinity of the Fort. There was a massive internal that sucked yeah from the high mountains into its furnace creating temperature as high as 2400 degrees Fahrenheit. Dhee today I would mail the metal and then the liquid molten metal would feel it is aware chamber and into a Cannon mould in the casting pit. Most of those Mughal canonsburg Messi mostly 16 feet long and have to be prepared within a single day. The Mughals also build a large ingenious mechanical device that had a Precision gear system driven by 4 pairs of oxen. The device was used for hollowing out the Canon barrels. Mughal Cannon production reached its Zenith during the reign of the Mughal emperor Aurangzeb.

Except that many other scientific inventions were made in this period such as device for cleaning many gun barrels at the same time, a moving carriage for grinding corn etc. Search high quality development had its impact on the later ages. The impact was first filled with the coming of the Portuguese. Portuguese ships and guns were seen as the basis of Portuguese superiority at sea. The master carpenters of the Krishna Godavari Delta on the Coromandel coast could not start and launch ships as any shipwright. Many of them had learnt the techniques of European construction from European craftsmen. Bus Surat became one of the centres for such ship construction. By the end of the 17th century European country to Das made a little technical distinction between ships built in the west and those built in the countries of the Indian Ocean.

They seemed to have preferred the local ships as the standard of finish and general workmanship remained high. Even the Omani fleet it built in India was able to deal with English piracy and threat in Surat. Though there were some weak points in the field of manufacturing cannons muskets and water pump. But it is the power of entrepreneurship of Mughal period that paved the way for better development in those fields. According to Jai Singh- Religions disperses like Mist kingdoms are destroyed but the work of the scientist remains forever. Really the development during the Mughal period established the future of India in a golden way of opportunities.

After the Mughals the British started their rule in India. They constituted several committees and common sense for educational development and stressed on recommendations made by several committees' incorporation with reflection of the previous era. Lord Macaulay's minute; Wood's despatch on education ,1854; Hunter Commission 1882-83; The Indian University act 1904; The resolution 21st February 1913; The Sadler university Commission 1917-19; The Hartog committee 1929; Wardha scheme of basic education; Sargent report 1944 are some of the educational developmental schemes made under British Raj. Such committees recommended introduction of new vernaculars, new techniques and vocational courses as well as female education and education for physically and mentally handicapped children. All such endeavour had been made with a view for a better type of person and rising the social status of the profession. In independent India under five year planning scheme several efforts have been made till date for development of educational education system especially stressed on vocational training and scope of job opportunities. Even in very recent time Pradhan Mantri Kaushal VikashYojona,Skill India are among the enthusiastic initiatives for promoting vocational education in India.

The gravity of Aegis of Mughal Emperors for vocational education: The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic commercial and educational prosperity. International travel as described it as the fabled land of wealth. The Mughal Emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce. The enormous wealth and resources commanded by the Mughal Elite made them an

extremely powerful group of people in the late 17 century. The Mughals tried to spread education to the general people. Boys and girls both received primary education. Mosques and maktabs were the centre of education. The greatness of the rulers is as follows -

- **Zahiruddin Muhammad Babur: (1526 - 1530):** He was an accomplished scholar in Arabic Persian and Turkey. He was celebrated author Turkish poems.His 'Memoirs' throws light on this issue. Babar was also famous for his Persian composition. He invented in new style of verse called 'Mubaivan'.He was a great literary genius. Babar was also a fastidious critic. He composed a book entitled 'Mufazzal'. He had also skill in music. Babur initiated a form of handwriting- "the Babaruihandwriting" and wrote a copy of the Quran in that script. Honda boobs as he was Babu took possession of Ghazi Khan's library. He was also a lover of paintings. Babar made the diffusion of education a duty of the state. Babar had a Society of literary men. Babur's Surat-i-am that is Public Works Department was entrusted with the duty of publishing a gazette and establishment of buildings and colleges. The fact that the establishment of educational institution constituted an important item of Babur's administrative program speaks much for his interest in the extension of education in his Indian Empire.
- **Naseeruddin Mohammad Humayoun: (1530-1556):** He was an accomplished scholar. He gave great encouragement to land man and used to discuss literary subjects with them. Emperor human health plant man was in very high Esteem. His learned associates included Mir Abdul Latif. He designated the different grades of persons by 12 arrows the lowest being made a base material and the highest (the XII Arrow) being made of pure gold. Homayoun was very fond of astronomy and geography. This branch of science made considerable progress during his reign. He wrote a dissertation on the nature of elements and constructed his own Terrestrial and celestial Globes. He was very fond of poetry and he himself composed verses. Farishta tells us that he fitted up 7 halls for the reception of his officers and dedicated them to 7 planets. The land manual received in the Saturn and Jupiter halls. He classified the learned men into three major categories-1) the holy

men the law officers and the scientist formed one category known as Ahlisaadt. The relations of the monarch the nobles the ministers and military men formed the second category known as Ahli-Daulat, and the third category was formed of musicians and artistes known as Ahli-Murad. Humayun was a great bibliophile and Studios scholar. He was very fond of books and collected a vast number book in the Imperial library. Even during military expedition he carried a selective library with him. He founded a Madrasa at Delhi.

❖ **Sher Shah :(1552-1556):** Sher Shah who dethroned Humayun and ruled for 4 years did much for the promotion of education in his dominion in spite of the short duration of his reign. His educational contributions were not contrary to the spirit of the Mughal rulers. He rather paved the way for Akbar. He was fond of philosophy history and biography. He was also fond of learned men and built the most gigantic Madrasa called the Sher-shahi Madrasa at Naruaul.

❖ **Akbar the Great: (1556 -1605):** The reign of Akbar, son and successor of Humayun was characterized by peace and prosperity. This afforded ample opportunity for literary activities in India. His court was crowded with men of letters like AbulFazal and his brother AbulFaizi E Abdul KadirBadaoniAbdur Rahim and others. As a result we have Masterpiece of literary works like the Ain-i-Akbari. During the age of Akbar there were some celebrated places which were known for educational activities and cultural activities.

1) **Agra:** Agra in the reign of Akbar was a famous seat of learning and celebrated centre of education. It had several schools and colleges for students flocked from farand wide for listening to the lectures of learned and distinguished teachers. A big Madras existed there.

2) **Lahore:** Lahore too was at this time an eminent abode of literary geniuses. It was here that celebrated Tariq-i-Alfie was written and the Mahabharata and the Rajtarangani were translated into Persian.

3) **FatehpurSikri:** FatehpurSikri was also famous for cultural activities. It has several schools and colleges. The well-known Ibadatkhana was situated here. It was the meeting place of the intellectual of various nationalities and the centre of a set of

brilliant Scholars of the reign. The representatives of different schools of thought used to discuss minute points of their religions here.

Akbar's reign was marked by the growth of an extensive and sound system of education through schools and colleges. Under his instruction numerous maktabs and Madras us for both resident and day Scholars were founded. Education was encouraged in every possible way. Akbar championed education of Hindus and Muslims alike. Akbar had a broad National Outlook to have education imparted to all classes of his subjects irrespective of their caste and creed. The Hindus where educated on the same line as the Muslims. During Akbar's time education was liberalized and even Hindus were admitted to Muslim Maktabs and Madrasas. As a result in course of concert in Hindi Scholars and historians learnt person and made valuable contribution to the cause of education. Some of the prominent Scholars of the time where Madho Bhat, Shri Bhat, BishanNath, Ramakrishan, Bhan Bhat, Vasudeva Misr, VidyaNivas, Gaurinath, Gopinath, KisanPandit, Narayan Shivji. Akbar offered state patronage to the development of the Hindu culture. Akbar the great Mughal was patron of and contributor to education. The glory of Islamic education in India reached its Zenith in the days of Akbar The Great.

❖ **Jahangir: (1605- 1627):** Jahangir was a scholar and poet. He was is interested in history and wrote his autobiography. NaimatullahHaibat Khan Nakib Khan Mirjaghiyas Beg adorned Jahangir's Court. Jahangir was greatly interested in promoting the cause of education. He repaired and reconstructed the moribund and dilapidated maktabs and Madrasahs. Jahangir was a great lover of books and paintings. He paid 3000 gold coins for the purchase of a rare Persian manuscript. He appointed Muktab Khan as the librarian of the Imperial library and keeper of the picture gallery. The Mughal painting reached its Zenith during Jahangir.

❖ **Shah Jahan: (1627-1659):** He was a cultured king and refined scholar. He is better known for his magnificence. Shah Jahan founded the Imperial college at Delhi near Jama Masjid. Shah Jahan was also a lover of books on travels biographies and histories. He was a great Patron of music. Painting received his encouragement. Architecture was a special contribution of Shah Jahan.

- **Aurangzeb: (1659-1707):** Communal reaction had began in the reign of Shah Jahan. Aurangzeb completely turned the table. Religious bigotry reflected in the administration and Educational policy. Aurangzeb had very little for the promotion of Hindu learning. He patronised Islamic education only. Under his orders many Hindu educational institutions were demolished. He appointed teachers in Muslim educational institution throughout his Empire. Aurangazeb founded number of schools and colleges in his Kingdom and took special interest in the education of his subjects in the outline provinces. Aurangzeb also took steps for the education of The Princesses in the harem. They were first taught to read and write in their mother tongue. Aurangzeb himself was well educated and well versed in Arabic Persian and his own mother tongue that is Turkish. During fixed hours of the day he read and copied the Quran and used to sell the copies. Dhol Baje was deeply religious minded yet he was not satisfied with the traditional Islamic curricular at ideas on Theological and grammatical skill. He wanted philosophy to add of the mind to reason and to elevate the soul. He wanted listens in reciprocal duties of king and subjects Arts of war history geography and language. In conclusion it can be well said that never in the whole history of India did art and literature Science and Commerce flourish as a whole quite as much as during the 200 years of great Mughal rulers. Education specially vocational education made mighty strides during the Mughal period. It was because this Emperors were great educationists and patrons of learning.

Conclusion

Organised education system is the integrated part of India's glorious history. Physical, mental as well as spiritual development were organised from Gurukul system. Education was treated as a matter of individual concern, did not admit of the method of mass production applicable in industry. The making of men was regarded as an artistic and not a mechanical process. Indeed the aim of education was the developing of the pupil's personality in his innate and latent capacities. According to the ancient Indian theory of education, the training of the mind and the process of thinking are essential for acquisition of knowledge.

Bibliography

1. Altekar, A.S. (1957). Education in ancient India, Nandkishore, Varanashi, UP.
2. Basham, A. L. (1992). The wonder that was India (Reprint Ed.). Kolkata (Calcutta):
3. Bose, Sugata Bose, Ayesha Jalal (2004), Modern south Asia: History, Culture, Political Economy, Roulledge.
4. Empire of the Moghul: Raiders from the North by Alex Rutherford.
5. Eraly, Abraham: The Mughal Throne, The Saga of India's Great emperors London, Phoenix 2004.
6. Har Anand.Islam, R. (1999). Sufism and its impact on Muslim society in South Asia. Karachi, Pakistan: Oxford University Press.
7. Koul Lokesh (1998), Methodology of Educational Research New Delhi, Vikash Publishing House.
8. Kulke, H., & Rothermund, D. (1994). History of India. Kolkata (Calcutta):
9. Law, N.N. (1916) Promotion of learning in India during Muhammadan Rule, Longman Gnen& Co, London.
10. Maiti Provatansu and Saha Probhat (2009), Medieval India, Kolkata, Shree Dhar Publisher.

Silent Followers of Mahatma: Recognizing Some Women Followers of Gandhi in Bengal

Sayantani Maitra
Ph.D Research Scholar
History Department, Jadavpur University

Abstract: One of the primary focus areas of late nineteenth century social reform was the question of women emancipation women's position was considered then a marker of progress and modernity in the eyes of India's colonial masters. The women centric reforms of late nineteenth century had their own limitations some of which were subdued gradually with the turn of century. It is unarguably well known that watershed like development in matter of women emancipation in India was put forward in early twentieth century by Mahatma Gandhi. Also though he made these changes possible with ample contradictions which later on has fueled many academic criticisms, one thing is widely accepted that he was the first among the leaders of nation to change ably the orientation of women question in nationalist mind. Some glimpses of his perspective on extent and nature of women emancipation are mentioned in the following article which substantiated by few examples from Bengal province.

Key Words: Gandhi, Women Emancipation, Bengal, National Movement, Satyagrahi, Swaraj, Non violence, Khadi, Charkha

In late nineteenth century India, the modern western educated mostly upper caste Indian social reformers took up the prejudiced sufferings of Indian women as the central locus of their reforming zeal. They followed west in this matter as social condition of women in the eyes of the colonial masters was regarded as the marker of a developed and progressive society. In reality, making legal reforms through debates and discussions was prioritized over involving women directly or indirectly in their empowerment process. This suppression of sufferer's opinion owing to a patronizing mentality of male reformers could never make eradication of the flagitious customs possible.[1] In this context, emergence of Mahatma as the charismatic leader of Indian national movement stimulated a drastic shift relating to the question of women emancipation. The late nineteenth century is marked as a watershed in Indian history because of the many changes and amalgamation that it bore with it. The

emergence of 'New Patriarchy' among the western educated elites of India produced an automatic byproduct, i.e., the compartmentalization of home and world on the basis of domination of these two poles apart spaces by the ruler and the ruled respectively. The women and her redefined role as wife and mother took a new turn simultaneously. Their secured residing place, inner domain of Indian household, was started being considered as the last untouched place where true nation and its traditions could be preserved. Indian women had always been the main driving force of this space.[2] an actual modification pertaining to the status of Indian women was brought forth by Gandhi in early twentieth century. This he could do as he was quite fortunate to see through many non violent natural traits found in Indian women as catalyzing forces necessary for nation's freedom struggle.

Gandhi took a deep interest in engaging women for nation's struggle against the colonial rule first through indirect means and later through direct participation owing to his recognition of womanly virtues. These womanly virtues were according to him; self strength, steadfastness, piety, loyalty, imbibed sense of responsibility, willfulness for making sacrifices, unquestionable devotion to own beliefs, flexibility and most importantly conducting every task using non violent means. All these convinced him amply that women's worth as true and honest *Satragrahis* could be far better than Indian men.[3] His childhood memories were surrounded by his mother who was flexible, sympathetic, pious and strong besides being extremely caring in nature. In his adolescence, his matrimonial affiliation with wife Kasturba made him realize womanly virtues of unquestionable devotion, responsibility, loyalty. These two women made quite an impression on him in matter of understanding true virtues of Indian women.[4] During his tour to England in 1906 he witnessed something that he had never seen before. Women of respectable English families took to the streets for demonstrating their demand of women suffrage. The female suffragettes of England had turned deaf against all the stigmatized slurs that they came across while protesting openly. In many cases going to jail was preferred over paying small sum of money as bail. Gandhi was awestruck by their steadfastness and started writing regularly in their praise in Indian Opinion newspaper.[5] However Gandhi took some more years to involve women directly in public demonstration 1913, during his Transvaal Satyagraha, he included

a group of women consisting his wife Kasturba in his team to enter the Transvaal without any permit.[6]

Gandhi's first meet with Bengal took place when annual session of Indian National Congress was organized in Calcutta in 1901.[7] Gandhi had always preserved a humble place for Bengal in his heart as could be seen in many of his speeches and writings. Gandhi chose Satish Chandra Dasgupta's Sodepur Khadi Pratishthan as his favorite place to take shelter in Bengal during his later years of visit. Gandhi's recurrent fondness and belief in Bengal resulted into two things; first, during Khilafat and Non-cooperation movement, Bengal observed an astonishing communal unity which had never been seen before and also had never been seen afterwards; second, the subservient limited role carried out by Bengali women during the days of Swadeshi movement was replaced with such zeal of emancipation that that Bengali women created the first historic instance of courting arrest in the hands of colonial police. Many Bengali women, belonging mostly to upper middle class urban based educated professional families established a lifelong relationship with Mahatma owing to their common interest of *Swaraj* for India. These well researched famous names are not mentioned in this article as prior to their constituting contact with Mahatma, most of them were already popular in their respective social circles. Some of them emerged as household names during Swadeshi Movement. Gandhi's appearance in their lives worked as a catalyst which helped them in gaining national recognition for their many praiseworthy capabilities. Many of them took an interest in mainstream politics and some even became constitutional politicians with records of remarkably well performances. Rather few unheard names and their contributions in Gandhi led national movement have been mentioned here as they tested the first bite of emancipation and self worth through their participation in these movements. These lesser known women never had shown interest in joining mainstream constitutional politics. Instead they mostly devoted their lives in Gandhian socio-economic constructive work. The time period of this article been framed limited as well, starting from Khilafat and Non- cooperation movement to Civil Disobedience Movement. The first movement made direct participation of women in political movement possible for the first time while the second one sowed the seed for their growth in multi- directional activities that too through very large scale participation.

When Gandhi first made his nationwide call for Khilafat and Non-cooperation, women were first given limited subordinate roles similar to those of their contributions as supporters of the cause during Swadeshi movement.[8] Events took a drastic turn when three female family members of Bengal's Chittaranjan Das courted arrest willingly while hawking *Khaddar* in Calcutta. This arrest of Basanti Devi, Urmila Devi and Suniti Devi was successful in spreading a sentimental wildfire across the nation, constructing also the altar for an unabated communal unity in Bengal. Gandhi immediately realized the importance of demonstrating women at the front line. He asked women all across the nation to follow the brave examples of these three Bengali women. Concurrently he acknowledged women's place as equal as men in obtaining his desired *Swaraj*.[9] Within two days of this incident, alone in Bengal, total 170 women courted arrest while hawking and selling *Khadi*. Many localities in Calcutta among which particularly Mirzapur Park, College Street, Bhawanipore experienced for next few months women giving a leading role in organizing campaigns etc.[10]

Concomitantly Bengal's countryside also awoke from its slumber to a new height of enthusiasm. In east Bengal Ashalata Sen became a very popular face among women participants. However prior to joining Gandhi's Khilafat and Non- cooperation movement, she had engaged herself in rural socio- economic uplift work. During her days as a leading face of the movement and latter also she remained actively in touch with Gandhian socio- economic constructive work. With the help and enthusiasm of her neighbors and relatives, she built up a centre named Gandaria Shilpasharm for socio- economic uplift work, primarily aiming at women emancipation. This centre became famous in a short span of time for producing trained female weavers.[11] At the same time, in Manbhum (present day Purulia), Nibaran Chandra Dasgupta established a similar institution. This institution was named as Shilpashram too. This centre took up a more expanded role of encouraging Gandhian socio-economic uplift work. But both of these institutions played similar roles pertaining to women emancipation at a local level. Nibaran Chandra's daughter, Labanya Prabha Devi was an ardent follower of Gandhi. She earned the epithet Manbhum Janani and courted arrest thrice for participating and demonstrating Salt Satyagraha (1930), Individual Satyagraha (1941), and Flag Satyagraha (1945).[12]

Gandhi was strictly against commencing Civil Disobedience while Non- cooperation was still going on successfully. He made this decision owing to the fact that he had always considered Civil Disobedience as the ultimate stage of Non- cooperation. He quite rightly felt that India at that time was far behind the final stage. However Gandhi's opinion in this matter was put aside in Midnapore as major parts of this district in Bengal started Anti Union Board Movement under the leadership of Birendranath Sasmal, one of Chittaranjan Das's ablest lieutenants. People boycotted union tax uninterruptedly for six long months which as a result pushed the government to seize the movable property of the defaulters. When government officials came down to execute their task, they were welcomed by female members of the household in a pompous way. Even when they took away forfeited property, their exit was treated in a same way[13].

However, though this phase of Gandhian national movement produced examples of direct women participation in politics for the first time, a large number of women chose to stay inside, continuing their subordinate roles. Their supportive roles chiefly included; making donations for Tilak Swaraj Fund, using *Charkha* to weave own cloth, taking vows of *Swadeshi*.[14] Gandhi also didn't except an overnight zeal of mass participation at least by Indian women as he was aware of Indian women's lack of self confidence. He felt grossed out at the thought of how conservative section of the Indian family, mainly male members, had always attempted to suppress women's talents and virtues so that she could never taste slightest of emancipation at home or beyond it.[15] It took him ten more years to change the scenario from a limited number of women engaging themselves in public demonstration to mass level women participation at every public platform of the national movement. The Civil Disobedience movement was able to create this historic example as the biggest of all organized national in the Indian subcontinent. In Bengal, the participating women in this movement had twofold roles; one was to break the salt law; the other was to picket in front of foreign cloth shops and liquor shops.[16] Salt is one of the most common ingredients found in Indian kitchen. Breaking the century old British monopoly over its production brought back the self worth and dignity of the participating women. In 24 Parganas district of Bengal, local congress committee arranged designated public places to break the

law by holding mass level demonstration. But instead of going there in a group to break the law as instructed by the local committee, women of that district started breaking the law on their own at their most secured and comfortable space, i.e., home. Many women of Bengal failed to break the law but did not stop themselves from going as far as buying locally produced banned salt. This makes it adequately vivid how eager they were to fulfill their part as contributors of a national cause. Shibani Chakraborty, Nistarini Ganguly, Shantilata Ghosh and Shailabala Roy broke the salt law by making a journey from Calcutta to Kalikapur village, located to the east of Calcutta. A large gathering of women came from nearby villages to witness this event, thus made it a great success.[17] In Midnapore's Tamluk, the women took quickly the leading charge of Salt Satyagraha.[18] In eastern Bengal, Surabala Basu, Ushabala Guha, Prabhalakshmi Devi and Kiranbala Kushari became popular leaders of Salt Satyagraha. Their participation attracted a large pool of enthusiastic women willing to engage their hands in the movement. Everywhere women were seen picketing and wearing white *khaddar saree* ritually, starting from Calcutta's College Street, Russa Road, Burra Bazar, R. G. Kar Road to district towns and villages of Bengal.[19] Liquor consumption at home by male members of the family often creates an ambience of violence of which women are the primary victims. Owing to this fact, a non violent protest against its consumption in form of picketing in front of liquor shops gained so much popularity and attention among female participants of the movement.

Immediately after the declaration of Civil Disobedience movement in 1930, almost all of the frontline leaders and volunteers, mostly men, were arrested. As now women had to take up charge of the movement in absence of prominent male leaders and volunteers, they were given the reap opportunity to demonstrate their skills in organizing peacefully at a mass scale. Their primary task involved; collection of donation; weaving and selling *Khadi*; preaching the gospel of *Charkha*; picketing; conducting Salt Satyagraha; organizing Gandhian socio- economic constructive work; becoming skilled *Satyagrahis* through thorough training etc.[20] some Bengali women belonging to countryside established many organizations at this stage which were made to execute twofold purposes; first goal was emphatically women's socio- economic emancipation which was somewhat put at a subordinate position as

against the final goal, i.e., establishing *Swaraj*. Some of the famous organizations which were engaged throughout their lifespan as Gandhi' socio- economic constructive work centers, were established around this time across Bengal's countryside. These were constructed and run by women with a prime focus on elevating women's status. Some of them were Gandaria Mahila Samity, Tangail Nari Samity, Kalyan Kutir Ashram, Satyagrahi Sebika Dal, Vikrampur Rashtriya Mahila Sangha, Nabinnagar Samiti, Balurghat Mahila Samity.[21]

Gandhi always wanted women of virtuous qualities belonging to respectable families at his frontline demonstration. His ideal choice of women was of morally and ethically pure one whom Gandhi had compared in his speeches with Sita, Draupadi, Damayanti. These mythical female characters established justice and truth force by defeating unjust forces utilizing their moral character, chastity, self sacrificing devotion, loyalty and steadfastness.[22] He opted for these pious and chaste qualities in his female recruits to take down demonic British rule in Indian subcontinent. Thus in 1925 while attending a conference in Barisal, Gandhi came to know about engagement of some local prostitutes in his socio- economic uplift activities. Instead of encouraging them, this news infuriated him to such an extent that he compared their profession with that of thieves. He advised them to take up vows of *Khadi* and *Charkha* as according to him, these two could only make their path of sacrifice successful besides making them acceptable in the society.[23] In spite of his ceaseless rejection of morally and ethically unchaste women's participation in national movement, many prostitutes in Bengal did not stay aloof. In 1921 during Chittaranjan Das's tour to Jalpaiguri some local prostitutes gave up their profession for one day for selling the rice that they collected through beggarly. They could make only rs.20 out of this which they contributed in Tilak Swaraj Fund.[24] While Civil Disobedience movement was still going on, in Tamluk's Terpakhya village, a fallen woman named Satyabati engaged herself willfully as caregivers of injured *Satyagrahis*.[25]

Many criticisms have arisen so far regarding Gandhi's role in women emancipation owing to Gandhi's nature of controlling the character and extent of participation of his female recruits. After taking in consideration Gandhi's one after another self contradictory remarks regarding extent of his desired emancipation for women, the task of

judging his position becomes more complicated. His engaging himself one after another experiment throughout his life in search of the ultimate truth makes it clear why he could never settle on one position regarding women's status and role. Gandhi never believed in existence of one constant truth which made him a pragmatic philosopher. One most prominent criticism pertaining to this question of emancipation is that in between the question of *Swaraj* and Women emancipation, he always had considered a subordinate position for the second one. While acknowledging the inner contradictions within Gandhi relating to his ideas on women, Madhu Kishwar says that Gandhi also failed to put an economic content in his conception of women emancipation. He was keener to uplift status of women socially and morally. According to Kishwar, Gandhi tried changing women's position without transforming that relation to the outer world of production and the inner world of family, sexuality or reproduction. Gandhi had always voiced his support in favor of part time professions for women as he believed these professional duties to be in accordance with their domestic duties. However at the same time Kishwar argues that Gandhi's entrance to Indian national movement signaled a break in the perception of women in nationalist thought. Gandhi saw women not as objects of reform and humanitarianism, but as self- conscious arbiters of their own destiny.[26] Veena Mazumdar concludes praising Gandhi's ideas which she thinks are remarkably close to those voiced by the women's liberation movement all over the world. Both of them propagate equality in the family and society, dignity of a women's personality, the opening up of wider opportunities for women for her self- development.[27] Devika jain concludes by saying Gandhi a methodological feminist because for him "the means were as important as ends".[28] Gandhi recognized women as God's greatest weapon on earth as he believed "If progress has not been what it might have been, one reason is that we have kept our women away from these activities of ours and have thus become victims of a kind of paralysis. The nation walks with one leg only".[29] His putting this faith in abilities of women thus gifted him in return with many silent followers across the nation whom he possibly never met of communicated with. Recognizing some of these names from Bengal could only hint at this direction more.

End Notes:

1. For details see; Tanika Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation: Community, Religion and Cultural Nationalism*, Indianapolis: Indiana University Press, 2001; Mrinalini Sinha, *Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and The 'Effeminate Bengali' In The Late Nineteenth Century*, Manchester: Manchester University Press, 1995.
2. For details see; Partha Chatterjee, *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*, New Jersey: Princeton University Press, 1993; Judith E. Walsh, *Domesticity in Colonial India: What Women Learned When Men Gave Them Advice*, New York: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2004.
3. Madhu Kishwar, "Gandhi on Women", *Economic and Political Weekly*, Vol. 20, No. 40 (October 1985), p, 1694.
4. Ibid., 1697.
5. Ramachandra Guha, *Gandhi before India*, Gurgaon: Penguin India, 2013, pp, 219- 221.
6. Ibid., 519.
7. Geraldine Forbes, *Women in Colonial India: Essays on Politics, Medicine and Historiography*, New Delhi: Chronicle Books, 2005, p, 29.
8. Ibid., 38-39.
9. Ibid., 40-41.
10. Srilata Chatterjee, *Congress Politics in Bengal, 1919-1939*, London: Anthem Press, 2002, pp, 78-79.
11. Ibid., 44.
12. "Labanya Prabha Ghosh (1897-2003)", *The Official Website of Purulia District*, accessed October 29, 2020, http://purulia.gov.in/distAdmin/departments/dico/per4.html.
13. Chatterjee, *Congress Politics in Bengal, 1919-1939,* pp, 98-99, 104.
14. Geraldine Forbes, *Women in Modern India*, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, reprint, 2004, pp, 128-129.
15. Kishwar, "Gandhi on Women", p, 1692.
16. Forbes, *Women in Modern India*, p, 136.
17. Chatterjee, *Congress Politics in Bengal, 1919-1939,* pp, 157-158.
18. Ibid., 159.

19. Ibid., 172.
20. Forbes, *Women in Colonial India: Essays on Politics, Medicine and Historiography*, p, 44.
21. Chatterjee, *Congress Politics in Bengal, 1919-1939*, p, 171.
22. Kishwar, "Gandhi on Women", p, 1694.
23. Ashwini Tambe, "Gandhi's Fallen Sisters: Difference and the National Body Politic", *Social Scientist*, Vol. 37, No. 1-2 (January-February, 2009), pp, 24-28.
24. Chatterjee, *Congress Politics in Bengal, 1919-1939*, p, 34.
25. Ibid., 173.
26. Kishwar, "Gandhi on Women", pp, 1691, 1698-1699.
27. Veena Mazumdar, "The Social Reform Movement in India: From Ranade to Nehru", in B. R. Nanda (ed.), *The Indian Women: From Purdah to Modernity*, New Delhi: Vikash Publishing House, pp, 58-60.
28. Devaki Jain, "Gandhian Contributions towards a Theory of Feminist Ethics", in Devaki Jain and Diana Eck (eds.), *Speaking of Faith: Cross-Cultural Perspectives on Women*, *Religion and Social Change*, New Delhi: Kali for Women, 1986, pp, 267-268.
29. M. K. Gandhi, "Speech to Gujrati Political Conference", in *Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. XIV, New Delhi: The Publications Division, Government of India, 1917, p, 14.

Mental health and Maladjustment Issues in the context of Indian Culture and Indian Economy

Sarthak Paul
Assistant Professor, B. L. Educational Teachers' Training College
Cooch Behar, West Bengal

Abstract: Health is wealth. Not only physical health, but also mental health is a matter of concern in our daily life.Maladjustment problem is also increasing day by day in our society. The issue of mental health and maladjustment problem are very new to our society, culture.People are hardly aware about such issues. Indian cultural is known for its richness. Indian economy is 6thlargest in the world and it has potential to reach to top three by 2030. If people of the country suffer for such issues, it will definitely hamper the culture and economy of the country. In a nutshell it will hamper the progress of the country.

In this study, causes of mental health and maladjustment problem will be discussed. Importance of culture and economy to fight against such issues will also be discussed. How value education can play a critical role to encounter such issues will be discussed.

Keywords: Mental Health, Maladjustment, Culture, Economics

Introduction: When the word 'Health' comes into our mind, we often think about only 'physical health'. In the 21st century, people are suffering more from mental health than physical health. But we rarely talk about mental health. Mental health issues have become a severe problem in the Indian society. Indian society is multicultural society. Indian society is always a tolerant society. So, very often we see the concept of join family in the Indian society. Very often our rich old culture teaches us about the importance of togetherness, unity, unity in diversity. But nowadays it has become a trend to move to a nuclear family from a join family. It is also seen that people are moving to another place even without taking their parents and are keeping their parents in old-age home. Teenagers are also suffering due to the ill affect of bad mental health and maladjustment problems. Depression, anxiety, jealousy, aggressiveness, tension, inferiority complex, hypermania, bipolar disorder, looniness etc are easily seen in the teenagers.

Conceptual Framework:

Mental health: Mental health means a person's condition with regard to their psychological and emotional well-being. Mental health is how a person thinks, feels or acts in a particular situation. When a hostile situation comes in front of a person, how he deals with the situation shows how good or bad mental health he is having. A person having good mental health can easily deal with a hostile situation and a person having bad mental health can easily goes to depression for his inability of handling the situation.

Adjustment ability: Adjustment ability is the ability how easily someone adjust or adapt with a different environment. Person who has good adjustment ability can easily adapt with a new situation or an environment. And people who are facing maladjustment problem face many difficulties to adapt with a new situation or with a new environment. There are many kinds of adjustment like social adjustment, emotional adjustment, educational adjustment etc.

Culture: Culture is a very broad term that includes our morals and manners, our customs and traditions, our religious, political economical and other types of activities. It includes all that man has acquired from his individual and social life. According to **E. B. Taylor**, "Culture is the complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and other capacities and habits acquired by man as a member of the society".

Economics: The term 'Economics' has been derived from two Greek works. 'Oikos' and 'Nemein'. 'Oikos' means a 'household' and 'Nemein' means 'management'. It came to be called 'Oikonemia' meaning 'house management'. Thus term 'Economics' is derived from the term 'Oikonemia'. According to Adam Smith, "Economics is the science of wealth".

Causes of Mental Health Problem in India:

Nowadays mental health and maladjustment problems have become a very serious issue not only in the world but also in India.WHO estimates that the burden of mental health problems in India is 2443 disability-adjusted life years (DALYs) per 100 00 population; the age-adjusted suicide rate per 100 000 population is 21.1.The economic loss due to mental health conditions, between 2012-2030, is estimated at USD 1.03 trillion.

- Now it is very common in Indian society that school students are suffering from depression, anxiety, tension etc. Too much pressure of educational system sometimes becomes the cause of these issues.
- Parents's high expectation from children may take the children to depression. Sometimes students fail to fulfil their parents' expectation, for that sometimes they committed suicide in depression.
- Too much competition among children and their parents, lack of resting time in study and work are pushing people towards the mental health problems.
- In Indian society, people suffering from mental illness are judged as mad. It is one of the reasons that people suffering from mental health issues hide their problems. So, they do not get the proper treatment that they needed. As a result, number of mental health issues are increasing day by day.

Causes of Maladjustment in India:

There are many reasons that causing maladjustment problems in India. For example:

Family: Family's socio-economical condition may be the reason of maladjustment problem in the people. Divorce, death, separation, quarrel and fight in families may cause maladjustment among children. If family can not fulfil the need of their children, it may cause maladjustment problem in the children.

Personal: It is found that children who are physically, mentally challenged, found difficulty to adjust in normal situations. When children fail to do well in examination and compared with other, the develop inferiority complex.

Society: Indian society is a multi-cultural, multi-religious society. So, when children do not get the proper value education, it develops maladjustment problem among children, people. A child belonging to a certain community or religion thinks that he/she should not be friend with others belonging to another community and religion.

The Importance of Family and School Culture for Nurturing Good Mental Health and Adjustment Ability

Family and School play an important role in developing good mental health and adjustment ability. Home is the first place and school are the second place where socialization of students happens. How family and school can help students to develop good mental health and adjustment ability are discussed below:

- When a child is born and brought up in a healthy family, he/she has good mental health. Family teaches children about the values and values help child to have good mental health and adjustment ability.
- A disrupted family affect the mental health and adjustment ability of a child in a wrong way. Separation between parents, rivalries in family make the home environment sick. A sick or unhealthy home environment affect child's mental health and adjustment ability.
- Family and School provide children the environment where children learn how to enjoy the life, how to deal with a situation, how to adapt with new environment, how to deal with success and failure etc.
- A healthy culture in the family and in the school provide the opportunity for the children to discuss about their problems. Family and school can also provide valuable suggestions to get rid of the problems.
- A healthy culture in the family and in the school teach children the art of sharing, caring.
- Parents play a vital for nurturing values among children. Parents should foster values like love, respect, charity, kindness, empathy, cleanliness, tolerance, compassion, truthfulness, etc. in their children to wipe away the mental health and maladjustment problems.
- Teachers' role is also very crucial. Teaching is a very novel profession in India. So, teachers have to take the responsibilities to foster the values like cooperation, sympathy, secularism, sacrifice, tolerance, understanding, freedom of thought, democratic values etc. among the students. Teachers have the responsibility to keep a healthy culture in the schools.

- It is very important for the members of a community to be educated about the mental health issues and maladjustment problems and realize the seriousness of such problems. It can make a healthy culture where everyone can discuss about their problems freely.

Importance of Economy for good Mental Health and Adjustment Ability:

Economy plays a crucial role for nurturing the mental health and adjustment ability of a person.

- A country with strong economy can easily build the infrastructure, needed for the persons, facing mental health and adjustment problems.
- A strong economic country can easily provide the resources, needed for the purpose.
- Such country can use their economic condition to spread awareness among people about such problems.
- These types of problems are very new and rear in our society. So, a country can spend a handsome amount on the research and development about such problems.
- Students whose parent's economic condition is very good, can get treatment for their such problems. As treatment of such problems are not easily available, so students coming from poor economic condition suffer very often.

Importance of Values to Nurture in the Culture for Good Mental Health and Adjustment Ability:

Values play an important role in someone's culture. Education based on values in fully helpful in the development of culture. Values make the country dynamic; the values and culture mutually affect each other. Therefore, value education is given due importance in the curriculum for the cultural development.

Now we will discuss about the importance of values that we should nurture in our culture to have good mental health and adjustment ability. NCERT compiled some value, here we will only talk about the values which are important to nurture in our culture for good mental health and adjustment ability. Anti-untouchability, appreciation of cultural values, citizenship, concern for others, cooperation, cleanliness, compassion,

courage, democratic decision making, dignity of the individual, duty, discipline, endurance, equality, friendship, faithfulness, fellow feeling, freedom, good manners, honesty, helpfulness, integrity, justice, kindness to animals, leadership, national consciousness, nation integration, national unity, non-violence, peace, punctuality, respect for others, secularism and respect for all religions, self-respect, sense of social responsibility, sympathy, tolerance, truthfulness, universal love, universal truth.

Mahatma Gandhi talked about Ahimsa (non-violence), Satya (truth), Astayans (non-thriving), sarva dharma sambhava (looking up at all religions equally-toleration), sparsha bhavana (abolition of untouchability) values. These values can be helpful to have good mental health and adjustment ability.

Conclusion: India is known for its rich culture and for its huge economically potential market. Its growth can be stopped due to such issues. Historically Indian people are always tolerant people, so it is matter of concern that maladjustment problems are rising in our society. So, it is the very high time we should start talking about such issues in our society. We need to talk, discuss about such issues freely. We need to take these problems on a serious note. We need to create an environment where people can freely discuss their problem; they would not have the fear of bully, humiliations.

REFERENCES:

Books:

1. Aggarwal, J. C. (2011), *Psychology of Learning and Development,* Shipra Publication, Delhi, India
2. Brahmbhat, S. G. (2016), *A Study of Mental health of higher secondary school students*, j.i.k.r.h.s.s., vol 4, issue 1, pp-215-218
3. Mangal, S. K. (2017), *Advance Educational Psychology,* phi learning private limited, Delhi, pp- 215-218
4. Mangal, S. K. (2016), *Essentials of Educational Psychology,* phi learning private limited, Delhi, pp- 524-583
5. Ravi, S.S. (2016), *A Comprehensive Study of Education, phi learning private limited, Delhi, p.p- 560-587*
6. Walia, J. S. (2015), *Development of the Learner and Teaching Learning Process,* ahil paul publishers, pp- 295-297

Articles:

1. Akhtar, Z. & Alam, M. (2016), *Impact of gender on adjustment and academic achievement*, International Journal of Indian Psychology, vol. 4, issue 1, pp- 41-49
2. Bartwal, R. S. (2014), *To study the mental health of senior secondary students in relation to their social intelligence*, ISOR Journal of Humanities and Social Science, vol. 19, issue-2, ver. 1, pp- 06-10
3. Gupta, M. & Mehtani, P. (2017), *Adjustment among secondary school students: A comparative study on the basis of academic achievement and gender*
4. Madhavan, V., *Emotional stability and adjustment perspective of mental health among rural school students in Tiruchirappalli district*, IOSR Journal of Humanities and Social Science, pp- 44-47 (International Conference on Well Being Children, Youth and Adults. A Global Social Work Perspective).
5. Makwana, M. D. & Kaji, S. M. (2014), *Adjustment of secondary school students in relation to their gender, International Journal of Indian Psychology*, vol. 02, issue 1, pp- 05-12
6. Mishra, B. & Sankar, T. (2015), *A study on the relation between mental health and academic adjustment of secondary students*, International Journal of Interactive and Futuristic Research, vol. 03, issue 2, pp- 501-507
7. Mishra, S. & Jha, M. (2015), *Role of gender and residence on mental health*, ISOR Journal of Humanities and Social Science, vol. 20, issue 3, pp- 51-55, doi: 10.9790/0837-20355-155
8. Pathak, Y.V. (2014), *Mental health and Social adjustment among college students*, International Journal of Public health and Neuroscience, vol. 01, issues 1, pp- 11-14
9. Ryabova, N.V. & Parfyonova, T. A. (2015), *Study of personal and social adjustment ability of the disabled pupils*, International Educational Studies, vol. 08, no. 05, pp- 213-221, doi: 10.5539/ies.v8n5p213
10. Rosenfield, S., Phillips, J. & White, H. (2006), *Gender, Race and the self in mental health and crime*, Social problems, vol. 53, issue 02, pp- 161-185

11. Shokeen, A. (2017), *A study of mental health and social adjustment of senior secondary students*, Educational Quest: An International Journal of Educational and Applied Social Science, vol. 08, no.01, pp- 33-36, doi: 10.5958/2230-7311.2017.00006.x
12. Taviyad, M. S. & Patel, prof. Y. H. (2014), *Adjustment and academic achievement of higher secondary school student*, j.i.k.r.h.s.s, volume 3, issue 1, pp-128-130

Online:

1. Adjustment and Maladjustment: Characteristics and Causes.(2021, December 12) Retrieved from http://www.edugyan.in/2017/03/adjustment-maladjustment.html
2. Four ways culture impacts mental health. (2021, November 12) Retrieved from https://www.mentalhealthfirstaid.org/2019/07/four-ways-culture-impacts-mental-health/
3. Mental Health. (2021, December 12) Retrieved from https://www.who.int/india/health-topics/mental-health

ROLE OF RAJA RAMMOHAN ROY AS A GREAT REFORMIST OF THE MASSES IN NINETEENTH CENTURY BENGAL

Pradip Kumar Sen Gupta
Associate Professor, Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math, Howrah, West Bengal

Abstract: Rammohan Roy pioneered the process of social reforms during colonial India. He may be called as a father of modern India. Bentinck's great achievement was his intellectual reform. Charter Act of 1813 had provided one lac of rupees annually for the revival and promotion of education in India. But this money was not properly used. Prior to the arrival of Bentinck a great controversy was going on regarding the medium of education in the schools and colleges. The Anglicists led by Sir Charles Trevelyan supported by Indian liberals like Raja Rammohan Ray expressed their views in favour of English Language. Lord Macauley, the law member of the Council gave a definite shape to the controversy.

Key Words: Reformist, Bentinck, Masses,Orientalist, Occidentalist.

Raja Ram Mohan Roy was renowned as the Father of modern India. Gurudev Rabindranath mentioned him as the title 'Bharat-pathik'. He was really a pioneer forerunner of mass awakener or eye-opener in various social, religious, cultural fields of nineteenth century namely Bengal originally Indian renaissance.But his real stature may be distracted from the facts of history. Rabindranath Tagore once rightly told ,"History made from facts, but truth is more expanded from facts only, truth must be extracted from facts through real logic and true imagination." Preferably it may be true for find out true picture of Rammhan Roy from historical facts. He may be called as a father of modern India. He stood firmly against all sorts of social bigotry, conservatism and superstitions and also a polyglot reformist, educationist, journalist. He preached monotheist idea of brahma, established Atmio-sabha in the year 1814 and later it turned into as Brahmo-Samaj. He wrote a letter to the Governor General in Council of the East India Company Lord Amherst for government's favour must brought upon spending money for spreading English knowledge centric western education throughout the country.

Then a great controversy of Orientalist and Anglicist was running behind, so British government had to make the important decision either they spent annual expenditure of money in favour of Oriental education or Anglican system of education. 11 December 1823, Raja Ram Mohan Roy wrote, "…we now find that the government is establishing a Sanskrit school under Hindu pundits to impart knowledge as is already current in India. This seminary can only be expected to load the minds of the physical distinctions of little or no practical use to the society…….The Sanskrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness" Roy's historic letter to Lord Amherst in 1823 marked the beginning of modern English education in India.The conception as well as the execution of the memorial was Rammohan Roy's own. Miss Collet has justly said of the memorial, "it may be regarded as the Areopagitica of Indian history. Alike in diction and in argument, it forms a noble landmark in the progress of English culture in the East." . From his child-hood, Rammohan was exceptional in the daily-life activities. Rammohan Roy was an utmost reformist in various ways of life. He was an educationist, social reformer, pathfinder of socio political modernism in India.If we use yardsticks articulated above, the eras of spiritual awakening in Firdausi's Iran or in the 15th – 16th century India of Kabi– r, Na– nak, Caitanya etc can hardly be called as the period of renaissance. The resurgence during Rammohun's time on the other hand, compares favourably even though 'it could not be an exact copy of the European Renaissance in content and form'. Quite emotively Saumyendranath argued: "As the Indian Renaissance flowered in the 18th century, Rammohun developed two fundamental concepts which could not germinate in the womb of the 15th century Europe: first, comparative study and synthesis of three world religions: Hinduism, Islam and Christianity; and, secondly, unqualified support to democratic struggles for freedom of the oppressed people all over the world"19.For any debate or comparison, we need to define 'renaissance' as a special kind of human awakening. Saumyendranath Tagore has made a reasonably good attempt in identifying the distinct features of renaissance in Europe: a rational evaluation of all religious teachings, and a revolt against ecclesiastical authority; affirmation of the importance of material possession as the means for virtuous actions; the belief that conscience of man is the voice of God and the rejection of the unnecessary authority of

'the terrestrial agents of God'; assertion of man's intellectual freedom; a belief in a law-governed universe and a deep interest in reason and scientific knowledge; development of new creative arts and literary forms; and lastly, an emphasis on education.18.

The emergence of the personalities like Raja Rammohan Roy was a truly multilingual scholar of Bengal as well as India. Bentinck's great achievement was his intellectual reform. Charter Act of 1813 had provided one lac of rupees annually for the revival and promotion of education in India. But this money was not properly used. Prior to the arrival of Bentinck a great controversy was going on regarding the medium of education in the schools and colleges. Was it to be given through the Indian language or through English language? The Orientalises led by Heyman Wilson and H.T. Princesp expressed their opinion in favour of Sanskrit, Arabic and Persian as the medium of education. The Occidentalises led by Sir Charles Trevelyan supported by Indian liberals like Raja Rammohan Ray expressed their views in favour of English Language. Lord Macauley, the law member of the Council gave a definite shape to the controversy. On his recommendations the decision was taken that the amount which was kept for education should be spent on the education of the Indians and the education is imparted through English medium. Macauley's proposals were accepted by Bentinck and embodied in a resolution of March 7, 1835, which declared that, "His Lordship in council is of opinion that the great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India and that all the fund appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone." Schools and colleges were established to provide English education. English language also became the official language and it helped the people of India for exchange of ideas.

Previously Sovabazar Raj of Kolkata, Maharaja Nabakrishna Deb (1733-1797) and his courtiers started to lay the foundation of Hindu College in the year 1817 for disseminating higher education to the then Bengal Presidency, Ram Mohan Roy helped them wholeheartedly. But after few years he was compelled to leave their association in a broken heart.In the year 1815 they were in consultation one evening with a few friends as to what should be done with a view to the elevation of the native mind and characters, Rammohan Roy's position was that they

should establish an assembly or convocation, in which what are called the higher or purer dogmas of Vedanta or ancient Hinduism might be taught,' in short the Pantheism of the Vedas and their Upanishads but what Rammohan Roy delighted to call by the more genial title of Monotheism. Mr David Hare was a watchmaker in Calcutta, an ordinary literate man himself,' but being a man of great energy and strong practical sense, he said the plan should be to institute an English School or College for the instruction of native youths. Accordingly he soon drew up and issued a circular on the subject, which gradually attracted the attention of the leading Europeans, and among others, of the Chief Justice Sir Hyde East. Being led to consider the proposed measure, he heartily entered into it, and got a meeting of European gentlemen assembled in May 1816.He invited also some of the intellectual natives to attend. Then it was unanimously agreed that they should commence an institution for the teaching of English to the children of higher classes, to be designated the Hindu College of Calcutta." Rammohan Roy threw himself into the project with characteristic energy but with a rare self-effacement, voluntarily withdrew from the committee, as some of the orthodox Hindu leaders on account of his religious views, objected to being his colleagues on it,' which, however, did not affect his zealous exertions in its behalf from outside. RamMohan was fluent to use nearly foreign and indigenous eight languages like Sanskrit, Arabic, Persian, English ,Greek, Latin ,Hebrew, etc. He founded Vedanta schools, English schools at the then Calcutta. Lord Bentinck's great achievement was his intellectual reform. Charter Act of 1813 had provided one lac of rupees annually for the revival and promotion of education in India. But this money was not properly used. Prior to the arrival of Bentinck a great controversy was going on regarding the medium of education in the schools and colleges. Was it to be given through the Indian language or through English language? The Orientalists led by Heyman Wilson and H.T. Princes expressed their opinion in favour of Sanskrit, Arabic and Persian as the medium of education. The Occidentalises led by Sir Charles Trevelyan supported by Indian liberals like Raja Rammohan Ray expressed their views in favour of English Language. Lord Macauley, the law member of the Council gave a definite shape to the controversy. On his recommendations the decision was taken that the amount which was kept for education should be spent on the education of the Indians and the

education be imparted through English medium. Macauley's proposals were accepted by Bentinck and embodied in a resolution of March 7, 1835, which declared that, "His Lordship in council is of opinion that the great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India and that all the fund appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone." Schools and colleges were established to provide English education. English language also became the official language and it helped the people of India for exchange of ideas.

Lord William Bentinck was the first governor general of British-occupied India. Everyone else before him was the governor of Bengal (Fort William) on his return to England; Bentinck served in the House of Commons for some years before being appointed Governor-General of Bengal in 1828. His principal concern was to turn around the loss-making East India Company, to ensure that its charter would be renewed by the British government.

Bentinck engaged in an extensive range of cost-cutting measures, earning the lasting enmity of many military men whose wages were cut. Although historians emphasise his more efficient financial management, his modernising projects also included a policy of westernisation, influenced by the Utilitarianism of Jeremy Bentham and James Mill, which was more controversial. He reformed the court system

Bentinck made English the medium of instruction after passing the English Education Act 1835. English replaced Persian as the language of the higher courts. He founded the Calcutta Medical college after the committee appointed by him found that "The Native Medical Institution established in 1822 , The Committee headed by Dr John Grant as president and J C. C. Sutherland, C E Trevelyan, Thomas Spens, Ram Comul Sen and M J Bramley as members found the education, examination system, training and lack of practical anatomy clearly below standards" and recommended its closure, which Bentinck accepted and he opened the Calcutta Medical college which offered western medical education and opening of this college is seen as Introduction of Western Science into India. It was the first western medical college in Asia and it was open to all without distinction of caste or creed. James Ranald Martin compares the creation of this college to Bentinck's other

acclaimed act of abolishing Sati. It may be seen that Rammohan was in double-minded condition against Sati system, but he firstly hailed Lord William Bentinck for passing the law to abolish Sati system in the country.

Bentinck decided to put an immediate end to *Sati* immediately upon his arrival in Calcutta. Ram Mohan Roy warned Bentinck against abruptly ending *Sati*. However, after observing that the judges in the courts were unanimously in favour of the ban, Bentinck proceeded to lay the draft before his council. Charles Metcalfe, the Governor's most prominent counsellor, expressed apprehension that the banning of *Sati* might be "used by the disaffected and designing" as "an engine to produce insurrection." However these concerns did not deter him from upholding the Governor's decision "in the suppression of the horrible custom by which so many lives are cruelly sacrificed."

Thus on Sunday morning of 4 December 1829 Lord Bentinck issued Regulation XVII declaring *Sati* to be illegal and punishable in criminal courts. It was presented to William Carey for translation. His response is recorded as follows: "Springing to his feet and throwing off his black coat he cried, 'No church for me to-day... If I delay an hour to translate and publish this, many a widow's life may be sacrificed,' he said. By evening the task was finished."

On 2nd February 1830 this law was extended to Madras and Bombay. The ban was challenged by a petition signed by "several thousand Hindu inhabitants of Bihar, Bengal, and Orissa etc." and the matter went to the Privy Council in London. Along with British supporters, Ram Mohan Roy presented counter-petitions to parliament in support of ending Sati. The Privy Council rejected the petition in 1832, and the ban on *Sati* was upheld.

Conclusion: Liberals like Raja Rammohan Ray expressed their views in favour of English Language. Lord Macauley, the law member of the Legislative Council gave a definite shape to the controversy. On his recommendations the decision was taken that the amount which was kept for education should be spent on the education of the Indians and the education is imparted through English medium. Macauley’s proposals were accepted by Bentinck and embodied in a resolution of March 7, 1835, which declared that, “His Lordship in council is of opinion that the great object of the British Government ought to be the promotion of

European literature and science education.Raja Ram Mohan Roy was against idol worship and orthodox Hindu rituals. He stood firmly against all sorts of social bigotry, conservatism and superstitions. But his father was an orthodox Hindu Brahmin. This led to differences between Raja Ram Mohan Roy and his father. Following differences he left the house . He wandered around Himalayas and went to Tibet. He also supported the education of women, when it was socially hindered..The Bengali journal " Sambad Koumudi" preached his pioneering ideas , but on the other side the orthodox journal " Samachar -darpan" critisized his all efforts and tried to infame him in various ways. He preached so many logical arguments in his journal " Brhamansevodhi" against the nasty preachings of christian missionaries against the Hindu religion. He wrote so many polemic books and pamphlets to raise protests against any kind of dogmatic or superstitious ideas of Hindu society. He defended Christianity mercilessly to establish uniterinian religious ideas.He wrote "Bhattachajeer Sahit Bichar","Prabortok Nibortok Sambad",etc.He initiated English journal "Inqueirer"and "Tuhufut-Ul Muhahidin" in Persian language.He ventured first to write original Bengali Grammar "Goudiobyakaron". He also endevoured to set a new way to Bengali prose-writing.The orthodox Bengali society critisized him in such a manner--"Surai Maler Kul,O Tar Bari Khanakul, Om Tat Sat Bole Beta khuleche Iskool." He fought against the orthodoxy and other backdated ideas more than eighteen years of his life-time. In 1831 Ram Mohan Roy traveled to the United Kingdom as an ambassador of the Mughal emperor to plead for his pension and allowances. Raja Ram Mohan Roy passed away on September 27, 1833 at Stapleton near Bristol due to meningitis.

Reference:

1. Collate Sophia Dobson :- The Life and Letters of Raja Rammohan Roy. Introduction,P-xiviii.& P-xi.
2. Selection of Official Letters of Raja Rammohan Roy
3. The Life Sketches of Raja Rammohan Roy.
4. Nag Suchinta (2017)Raja Rammohan Roy and the Dawn of Modernity and Nationalismin India, Post Scriptum,. An interdisciplinary journal of literary studies,online-Open Access-Peer Reviewed ISSN-2456-7507, Vol-2,No-1, Jan-2017,Pp18-27.
5. Raja Rammohan Roy -EGyankosh.ac.in> unit -4.

PROBLEMS OF ROAD TRANSPORTATION IN MURSHIDABAD DISTRICT, WEST BENGAL

Ananta Halder
Assistant Professor, Bijoy Krishna Girls' College
Howrah, West Bengal

Abstract: Roads are the effective means of transport. Quality and effective transportation system are necessary for economic development. Murshidabad, one of the under developed districts of West Bengal is experiencing transport problems. The present paper is a humble submission to analyze the problems in urban transportation as well as to find out the problems of rural transportation with the help of 'Index of Problem'. Traffic movement and congestion is one of the major problems in towns of Murshidabad district. Traffic noise and air pollution are other major environment problems caused by traffic in urban areas. The values of directly related index of problems range from the minimum of 0.21 in Berhampore block to the maximum of 1.24 in the Samserganj block. Whereas, the values of inversely related index of problems range from the minimum of 0.5874 in Nwada block to the maximum of 1.48 in the Samserganj block. Since most of the people of the district are villagers and connected with primary activity so proper planning of transportation is in need.

Key Words: Road transportation, Murshidabad district, Index of Problem.

Introduction:

Roads are the effective means of transport which bring the isolated places, people and goods in close contact with each other. Transport network helps in mobility and interaction by making the world at large. As the population grows day by day so the function of the society increases day by day. Quality and effective transportation system are necessary for interaction among the society and its development (Aderamo and Magaji, 2010). Transport networks do not work well in some place mostly in under developed and developing countries, so people have to face transportation problems. Due to vigorous growth of population urbanized place is coupled with transport development and it becomes a large obstacle to live a healthy life because of 'habitat damage'. On the Other hand poor transport system and lack of vehicles turn the country towards backward direction. Economic development and investment in infrastructure are positively correlated (Kessides, 1992; Crichfield and McGuire, 1997). The study area, Murshidabad one of the

under developed districts of West Bengal is experiencing transport problems on road and comes in light as a study of discussion. Rural parts of the district are organised with agricultural fields. But poor connectivity in transport system results on small productivity in agricultural field. Secondly natural resources hidden under ground are not properly utilized because of the low quality transportation. In this case planners should realize the utilization router design must be made. Inaccessibility, poor surface condition of roads, lack of bridges and organisational difficulties increase anxiety in road transportation among people day by day.

Objectives:

The study is aimed to study problems of road transportation in murshidabad district, West Bengal. An attempt has been made to analyze the problems in urban transportation as well as to find out the problems of rural transportation also.

Methodology:

Field observation, discussion with local people and past literature has been utilized for analyse the problem of urban transportation. To identify the level of rural transportation problems twelve indicators have been selected. Those indicators have been divided into two categories-

a) Directly related
   - X1 – Distance of district head quarter from block head quarter
   - X2 – Distance of nearest railway stations from block head quarter
   - X3 – No. of villages located within 5 km distance from block head quarter
   - X4 – No. of villages located within 5 km distance from metalled road

b) Inversely related
   - X5 - No. of villages located within 5 km distance from health sub-center
   - X6 – No. of villages located within 5 km distance from post office
   - X7 – Blockwise road density
   - X8 – Blockwise rail density
   - X9 – Number of primary school in a block
   - X10 – Number of gramin bank in a block
   - X11 – Number of villages located within 10km distance from local market
   - X12 - No of villages located within 5km distance from Public bus service

To measure the status of transportation problems of each block following Index has been applied-

IP = (X1 + X2 + ……. +X12)/TA

Where,

X1 = Obtained value of each indicator used

TA = Total area of the Block

IP = Index of problem

Here, Index of Problem has been divided into two categories due to the nature of indicators. X1 to X4 are directly related problem of transportation. So, higher value of Index of Problem shows greater transportation problems and vice-versa. The data for this study is collected from secondary sources like District Census Handbooks (DCHB) of Murshidabad (2011) and District Statistical Handbook (DSHB) of Murshidabad district, 2014.

Result and Discussion:

Problems of Urban Transport:

Murshidabad is basically covered with much rural areas having agricultural field though industrial growth is also seen here. From historical point of view it became a major tourism center haring the memories of Bengal Nawabs, That's why the place is well connected with industrial developed towns Malda, Suri, Bundwan, Krishnanagar and the capital city Kolkata. More over sub-divisional head quarters and block head quarters are spreading quickly are urban centres. So here people are concerned to get urban facilities by increasing number of traffic that causes transport difficulties. While urban transport had a tremendous liberating impact it has also posed a very serious problem to the urban impact.

Some problems of urban transport Interrelated with each other are mentioned below:-

1) Traffic Movement and Congestion:

Traffic congestion occurs when urban transport networks are no longer capable of accommodating the volume of movements. Levels of Traffic overloading vary in time specially during the daily journey to work periods at selected places of the town. Traffic movement and congestion is one of the major problems of Murshidabad district. Being an Under developing district towns like Berhampur, Dhuliyan, Raghunathganj, Beldanga have to face a growing pressure of Public on narrow roads near Schools, colleges, Office , Bus stand , hospitals , railway crossing during the busy working hours of the day. The rapid growth of private can ownership in town areas has been accompanied with it. These create on obstacle in traffic movement and results on traffic cogestion.

2) Increasing Number of Vehicles :

The more population increases their needs grow with it. Increasing numbers of vehicles is a result of this need and murshidabad District is not an exception. Various type of vehicles in the towns of the district do not only causes traffic congestion but provides a pressure on road capacity exploring defects of the road.

3) Parking Difficulties:

Parking problems is the urban transport problem as vehicles are parked haphazardly causing traffic jam. In every town two wheelers particularly motor cycle and bi-cycle have the larger part among the vehicles parked. Public transport is slowed by clogged congested street and movement on front becomes Impossible. Cars are parked on roads resulting narrowness and common people suffer as there is no perfect parking zone in towns.

4) Lacking Accessibility:

At a large scale, there is the problem of access to facilities and activities in the city. In town areas the replacement of small scale and localized facilities such as shops and clinics by large scale super stores and hospitals serving larger areas having urban activities but these are beyond the reach of the pedestrians. These greater distances can be covered by motorized vehicles. So the lack of facilities may be the biggest problem for the walker in developing cities. It shows increasing number of vehicles causes transport problem in one aspect and lacking accessibility of vehicles is another.

5) Environmental Impact:

Environmental Pollution is the result of Tremendous Increase in vehicle Ownership and affects the society dangerously.

i) Traffic Noise:- Traffic noise is the major environment problem caused by traffic in urban areas and it is generally proved. Working may therefore be difficult since noise disturbs concentration and conversation even domestic life suffers a lot.

ii) Atmospheric Pollution :- Exhaust fumes like carbon monoxide, unburnt hydrocarbons, nitrrogen oxides, Tetraethyl Lead, carbon dust particles, Al dehyde are the major source of a atmospheric pollution by the motor vehicles. This air pollution caused by increasing numbers of vehicles on roads. This feature is very common in berhampore busstand, dhuliyan, beldanga and raghunathganj town areas.

6) Public and Private transport :

A very high proportion of the day's journey is made under conditions of peak-hour loading. In this situation there is a co-existince of both the public and private transportation. If public transport operations provide sufficient vehicles there would have less demand of private ownership. But people have to depend on it without having any alternative. The relationship of public private transportation authorities is a little bit harsh and due to it suffer common people. It is said that to maintain sufficient vehicles for providing peak hour service is a hopeless uneconomic use of resources.

Problems of Rural Transport:

Generally in most of the cases rural areas have to face lack of facilities. Villages are not well developed in aspects of science and technology. So when we look towards rural transport system problems come out to be observed. Some common transport problems are there in each and every village. Tough due to varied physical features the problems in the rural tracts differ from region to region. Sufficient vehicle are not there, roads are not well equipped like the rods of towns. Naturally people cannot meet their demand and most of the time they have to use two wheelers on there wheelers to go elsewhere. Sometimes by walking they reach their destination when emergency comes. Almost all the rural roads are narrow and kutcha which increase the journey time of the people resulting to have a problematic situation during emergency. Inadequate supply of buses may even painful because then people cover the long distance by walk which is tough for aged people, children and female. In case of remote areas the advantage of Train connectivity is not there. When rainy season comes these narrow and kutcha roads remain submerged under the water. Villagers then are confined in their houses and important works stop for having no transportation. Essential services related to medical facilities available to adjacent urban area stand a painful access due to inaccessibility caused by narrow length of roads and absence of transportation advantages.

The steps taken by India Government like 'Pradhan Mantri Gram Sarak Yojona" (PMGSY) cannot reach to the remote parts of the villages and villagers stay deprived of such facilities. Rural areas of Murshidabad district suffer also economically. Agricultural Products determining to livelihood are not transported properly in time and need. This crisis period turns into economical problem. Durability and sustainability depend on materials and its use but very often roads are made by materials of low cost resulting problems in close future.

Table 9.1 shows the blockwise values of directly related transportation problem.

Table 9.1: Directly Related Index of Problem in Rural Murshidabad District

Sl. No.	Name of the Blocks	X1	X2	X3	X4	Composite Value	Area of the Block	IP value
1	Farakka	96	3	2	29	130	132.74	0.97936
2	Samserganj	82	2	11	10	105	84.21	1.24688
3	Suti - II	74	1	2	9	86	111.13	0.77387
4	Suti - I	60	4	19	17	100	143.68	0.69599
5	Raghunathganj - I	54	4	11	25	94	140.91	0.66709
6	Sagardighi	31	1	11	100	143	345.42	0.41399
7	Nabagram	22	20	1	67	110	306.63	0.35874
8	Khargram	35	45	8	63	151	318.45	0.47417
9	Kandi	31	26	26	49	132	227.48	0.58027
10	Burwan	44	40	14	64	162	299.66	0.54061
11	Bharatpur - I	43	14	3	36	96	183.72	0.52253
12	Bharatpur - II	56	2	0	25	83	158.50	0.52366
13	Raghunathganj - II	56	6	9	9	80	121.60	0.65789
14	Lalgola	42	1	11	46	100	184.37	0.54239
15	Bhagawangola - I	29	1	5	14	49	136.10	0.36003
16	Bhagawangola - II	34	12	2	24	72	175.26	0.41082
17	Murshidabad Jiaganj	11	1	74	41	127	192.13	0.66101
18	Berhampore	0	2	13	53	68	314.19	0.21643
19	Hariharpara	20	22	0	14	56	253.14	0.22122
20	Beldanga - I	20	1	16	21	58	168.75	0.3437
21	Nawda	36	22	1	4	63	231.39	0.27227
22	Beldanga - II	33	2	1	38	74	207.93	0.35589
23	Raninagar - I	47	35	0	18	100	146.93	0.6806
2	Raninagar - II	35	40	0	8	83	175.13	0.47393

4								
25	Jalangi	45	53	0	22	120	210.63	0.56972
26	Domkal	32	37	19	21	109	305.19	0.35715

Table 9.1 depicts that the values of directly related index of problems range from the minimum of 0.21 in Berhampore block to the maximum of 1.24 in the Samserganj block. Average value of the index is 0.53. Fourteen blocks namely Berhampore, Hariharpara, Nawda, Beldanga-I, Beldanga-II, Domkal, Nabagram, Bhagawangola-I, Bhagawangola-II, Sagardighi, Raninagar-II, Khargram, Bharatpur-I, Bharatpur-II have lower value than the district average and remaining twelve blocks namely Burwan, Lalgola, Jalangi, Kandi, Raghunathganj-II, Murshidabad-Jiaganj, Raghunathganj-I, Raninagar-I, Suti-I, Suti-II, Farakka, Samserganj have higher value of the index of directly problems than district average.

Three distinct classes of directly related index of problems have been presented in the following table along with name and number of blocks in each of them.

Table 9.2 Categories of directly related index of problems

Range	Level of Problem	Number of blocks	Name of the Blocks
Below 0.55	Low	16	Berhampore, Hariharpara, Nawda, Beldanga-I, Beldanga-II, Domkal, Nabagram, Bhagawangola-I, Bhagawangola-II, Sagardighi, Raninagar-II, Khargram, Bharatpur-I, Bharatpur-II, Burwan, Lalgola
0.55 – 0.90	Medium	8	Jalangi, Kandi, Raghunathganj-II, Murshidabad-Jiaganj, Raghunathganj-I, Raninagar-I, Suti-I, Suti-II
Above 0.90	High	2	Farakka, Samserganj

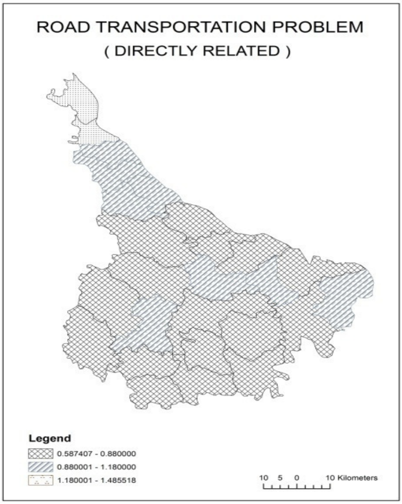

Indicators X5 to X12 are indirectly related to problems of the rural transportation. That means higher values represent lesser degree of transportation problem and vice-versa. Table 9.3 shows the blockwise values of inversely related transportation problem.

Table 9.3 : Inversely Related Index of Problem in Rural Murshidabad District

Sl. No.	Name of the Blocks	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	Composite Value	Area of the Block	IP value
1	Farakka	21	10	2.18	6.475	92	1	3	6	141.655	132.74	1.0672
2	Samserganj	5	10	5.44	7.655	85	2	0	10	125.095	84.21	1.4855
3	Suti - II	13	5	3.49	24.696	86	2	0	11	145.186	111.13	1.3064
4	Suti - I	19	0	1.28	11.052	73	3	2	6	115.332	143.68	0.8027
5	Raghunathganj - I	20	18	3.71	10.065	84	1	3	27	166.775	140.91	1.1836
6	Sagardighi	99	36	1.48	7.509	156	3	27	43	372.989	345.42	1.0798
7	Nabagram	42	41	2.86	0.000	150	7	17	37	296.860	306.63	0.9681
8	Khargram	77	44	1.29	0.000	148	1	19	47	337.290	318.45	1.0592
9	Kandi	44	39	1.54	0.000	125	2	5	29	245.540	227.48	1.0794
10	Burwan	49	72	0.94	0.000	174	3	9	52	359.940	299.66	1.2012
11	Bharatpur - I	42	37	1.26	0.000	101	3	2	17	203.260	183.72	1.1064
12	Bharatpur - II	23	19	2.05	15.850	94	4	4	25	186.900	158.50	1.1792
13	Raghunathganj - II	14	6	1.94	0.000	97	2	6	6	132.940	121.60	1.0933

14	Lalgola	33	10	2.82	18.437	131	2	18	21	236.257	184.37	1.2814
15	Bhagawangola - I	29	8	1.53	11.835	82	2	5	12	151.365	136.10	1.1122
16	Bhagawangola - II	32	25	2.54	0.000	73	1	3	7	143.540	175.26	0.8190
17	Murshidabad Jiaganj	57	28	3.2	7.390	110	1	13	43	262.590	192.13	1.3667
18	Berhampore	42	35	1.53	7.393	192	4	20	41	342.923	314.19	1.0915
19	Hariharpara	14	12	2.22	0.000	123	4	6	16	177.220	253.14	0.7001
20	Beldanga - I	19	27	2.68	15.341	116	4	8	22	214.021	168.75	1.2683
21	Nawda	8	6	0.92	0.000	109	2	1	9	135.920	231.39	0.5874
22	Beldanga - II	19	17	1.16	10.663	105	3	0	28	183.823	207.93	0.8841
23	Raninagar - I	22	15	1.18	0.000	78	2	2	11	131.180	146.93	0.8928
24	Raninagar - II	4	7	2.49	0.000	96	4	2	9	124.490	175.13	0.7108
25	Jalangi	11	10	3.02	0.000	113	3	7	7	154.020	210.63	0.7312
26	Domkal	21	12	2.06	0.000	144	5	10	13	207.060	305.19	0.6785

Table 9.3 depicts that the values of inversely related index of problems range from the minimum of 0.5874 in Nwada block to the maximum of 1.48 in the Samserganj block. Average value of the index is 1.02. Higher values of this index are found in ten blocks namely Nawda, Domkal, Hariharpara, Raninagar-II, Jalangi, Suti-I, Bhagawangola-II, Beldanga-II, Raninagar-I, Nabagram and lower index found in other sixteen blocks. Following table (9.4) presents the three category of status of problem as per inversely related transportation problem.

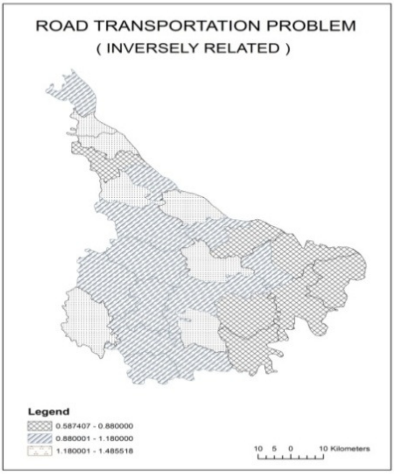

Table 9.4 : Categories of inversely related index of problems

Range	Level of Problem	Number of blocks	Name of the Blocks
Below 0.88	High	8	Nawda, Domkal, Hariharpara, Raninagar-II, Jalangi, Suti-I, Bhagawangola-II, Beldanga-II
0.88 – 1.18	Medium	12	Raninagar-I, Nabagram, Khargram, Farakka, Kandi, Sagardighi, Berhampore, Raghunathganj-II, Bharatpur-I, Bhagawangola-I, Bharatpur-II, Raghunathganj-I
Above 1.18	Low	6	Burwan, Beldanga-I, Lalgola, Suti-II, Murshidabad-Jiaganj, Samserganj

In index of transportation problem, two types of indicators have been applied e.g. directly related and inversely related. Therefore to rectify this bias common area of transportation problems have been identified by arranging the both index values. Table 9.5 represent that there are no common blocks in higher problematic zone. Four blocks namely Raninagar-I, Kandi, Raghunathganj-I and Raghunathganj-II are lying in moderate problematic zone. Burwan, Beldanga-I and Lalgola blocks lying in Lower problematic zone.

Sl. No. My work	Name of the Blocks	IP Value Directly related	IP Zone	IP Value Indirectly related	IP Zone	Common Area
1	Farakka	0.9794	H	1.0672	M	N
2	Samserganj	1.2469	H	1.4855	L	N
3	Suti - II	0.7739	M	1.3064	L	N
4	Suti - I	0.6960	M	0.8027	H	N
5	Raghunathganj - I	0.6671	M	1.1836	M	M
6	Sagardighi	0.4140	L	1.0798	M	N
7	Nabagram	0.3587	L	0.9681	M	N
8	Khargram	0.4742	L	1.0592	M	N
9	Kandi	0.5803	M	1.0794	M	M
10	Burwan	0.5406	L	1.2012	L	L
11	Bharatpur - I	0.5225	L	1.1064	M	N
12	Bharatpur - II	0.5237	L	1.1792	M	N

13	Raghunathganj - II	0.6579	M	1.0933	M	M
14	Lalgola	0.5424	L	1.2814	L	L
15	Bhagawangola - I	0.3600	L	1.1122	M	N
16	Bhagawangola - II	0.4108	L	0.8190	H	N
17	Murshidabad Jiaganj	0.6610	M	1.3667	L	N
18	Berhampore	0.2164	L	1.0915	M	N
19	Hariharpara	0.2212	L	0.7001	H	N
20	Beldanga - I	0.3437	L	1.2683	L	L
21	Nawda	0.2723	L	0.5874	H	N
22	Beldanga - II	0.3559	L	0.8841	H	N
23	Raninagar - I	0.6806	M	0.8928	M	M
24	Raninagar - II	0.4739	L	0.7108	H	N
25	Jalangi	0.5697	M	0.7312	H	N
26	Domkal	0.3572	L	0.6785	H	N

Note: H= High, M= Medium, L= Low and N= No common area

Conclusion: The study reveals that there is wide range of variations among blocks in Murshidabad district in road transportation problems. Road transportation problem is low or medium in most of the blocks of the Murshidabad district. There is a great prospect to develop efficient road transportation in blocks Suti – I, Bhagawangola – II, Hariharpara, Nawda, Beldanga – II, Raninagar – II, Jalangi and Domkal. Network connectivity between villages should be maximizing. Market places should be well connected with one another through road. Since most of the people of the district are villagers and connected with primary activity so proper planning of transportation is in need. Some minor mistakes can affect the development of society.

References

1. Aderamo, A. J., & Magaji, S. A. (2010). Rural transportation and the distribution of public facilities in Nigeria: A case of education local government area of Kwara state. *Journal of Human Ecology*, 29(3), 171-179.
2. Button, K. J. (1990). Environmental externalities and transport policy. Oxford Review of Economic Policy, 6, 61-75.
3. Calve, C. M. (1998). *Options for managing and financing rural transport*, Vol. 23, World Bank Technical paper no. 411, Washingto D.C, The World bank. 10-13.

4. Crichfield, J. B., & T. J. McGuire (1997). Infrastructure, economic development and public policy. Regional Science and Urban Economics, 27, 113-116.
5. Guha, S. (1991). *Economics of rural* transport. Delhi: Deys publishing House. 118-119.
6. Hart, T. (2001). Transport and the city In R. Paddision (Ed.) *Handbook of Urban Studies* London: SAGE. 102-105
7. Hilling, D. (1996). *Transport and Developing countries*. Routledge; London, 31-32.
8. Jonston, R. A. (2004). The urban transportation planning process. In S. Hanson & G Ginliliano (Eds.) *The geography of urban transportation*. The Guilford press: NY . 130-131.
9. Kessides, C. (1992). The contribution of infrastructure to economic development: A review of experience and policy, World Bank, Washington, D.C.
10. Lohmann, R. A., & Lohmann, N. (2005). *Rural social work practice*, NY, Columbia University Press. 278-279.
11. Madan, G. R (1990). *India's developing villages*. New Delhi : Allied Publishing Ltd., 516-517.
12. Pathak, D. R., Gite, H. K. (1990). *Highway engineering*, Pune: Nirali Prakashan, 3-14.
13. Prasad, K. N. (1993). *Poverty inequality and unemployment in India*, New Delhi: Concept publishing company. 358-359.
14. Roy, P. B. (2011). *A Handbok of Transport Geography*, Kolkata: Readers Service, 44-51.
15. Roy, P. B. (2011). Spatial dynamics, problems and prospects of surface transport network in Birbhum district, West Bengal, India. [Doctoral Dissertation]. Visva Bharti University.

A Study of Reflection of Pandemics in Literature in English: Context Covid 19

Tamali Neogi
Assistant Professor in English
Gushkara Mahavidyalaya, Gushkara,Purba Burdwan

"Men go and come, but earth abides"

(Stewart, 1949)

Fear. Man has archetypal fear of disease. From ancient period, civilization has faced serious damages and challenges caused by sudden break out of pandemics. Unknown or half- known nature of germs, the temporary defeat of Science have resulted into colossal deaths each time. But the attempt to fight back never stops, even for a second. This is the same attempt that has been there behind the progress of human civilization from ancient period and has ultimately led us to arrive at today's world of development. Now all around us is the smell of death- the humiliating and demeaning procession of dead bodies. The foul smell of cold death has caused every man to come out of his individual construct. An evenness is established as death eradicates the differences between king and subject, wise and fool, rich and poor, dishonest and honest. But beyond all the spectacles of massive destruction, each time what is proved as ultimate truth is: "Even this shall pass away"(Titlen,1858). Beckett says: " The tears of the world are a constant quantity....let us not then speak ill of our generation, it is not any unhappier than its predecessors"(Beckett, 1954). In the present depressing scenario caused by covid 19, remembering this aspect of truth we can once more attain mental strength and spirit to combat. The present article aims to make an analytical study of reflections of pandemics mainly in Science fictions and novels in English, to find out how the nature of reflections get changed over the centuries with an objective to help one to navigate his/ her own experience or understanding of Covid 19 pandemic through an understanding of pandemic literature. With the spread of Covid19 pandemic our world is led to utter confusion that has at the same time given rise to philosophical wonderings of some sorts for example, whether we are to become stoics and accept all the blows passively or not, etc. Besides, it has given rise to a "desire to identify universal truths

about how societies respond to contagious diseases "(Jones,2020)and the article shares the same objective.

There are certain diseases like tuberculosis. In eighteenth and nineteenth centuries it had significantly clouded the face of our globe by covering it with the dark canopy of death. At times seasonal changes in its pattern has been detected; it is still being found all powerful in underdeveloped countries where with the progress of science the death rate can only be reduced nowadays. There is HIV Aids. Up to 2019 the number of deaths from this disease globally, has touched 690,000. In recent past WHO applies the term "global epidemic" to this disease. Apart from these fatal diseases_ the spread of these diseases has never remained bound to any specific time frame rather the fear of being infected from these has always been with us_ our beloved earth has been invaded numerous times by different pandemics at different centuries. The causes have remained varied: Bubonic plague, influenza, cocoliztli, small pox, Typhus, cholera, SARS, unknown flu, Ebola virus or presently covid 19. Their outbreaks have spanned across centuries and continents. Undoubtedly at every age life is reflected and represented in literature. The study of pandemic literature helps us to understand politics, socioeconomic structures and personal relationships. From the earliest times to the present, epidemics have affected human history in myriad ways: demographically, culturally, politically, financially and biologically. We can mention Homer's *Illiad*(762 B.C) and Sophocles' *Oedipus* (429B.C). In this epic and Greek drama attempts are made to find the connections between human sin and plague. In *De Rerum Natura* of Latin poet Lucretius we see the emphasis is not upon finding the cause of plague but on the tremendous fear in human psyche of infection. Besides, how the selfishness and greed of people of a particular class becomes limitless at the time of pandemic is portrayed in his writing. In *Decameron*(1349-1353C.E) and *Canterbury Tales*(1400 c.)we see how fear of infection and related increase in greed and corruption gradually lead to the death of morality and ethics in society: “the fear of contagion increased vices such as avarice, greed and corruption, which paradoxically led to infection and thus to both moral and physical death”(Riva M and et al, 2014). During current lockdown period some such vices are exhibited by retailers, black marketers, thriving for limitless profit as well as by people of higher social strata and even

common citizens in their hoarding of essentials. In Alessandro Manzoni's *The Betrothed*(1630)we see the horrible description of plague in and around Milan. Defoe's chronicles(1722) speak of our times. Sen observes: "Defoe wrote about people keeping their distance when they met each other on the streets during the plagues, but also asking each other for news and stories from their respective hometowns, and neighbourhoods, so that they might stitch together a broader picture of the disease. Only through that wider view they hope to escape death and find a safe place. Likewise, in COVID-19 people created groups, blogs, and other social media platforms to exchange and record their sadness, grief, nostalgia, difficulties related to medieval processes, missing attending to local ones' health crises including mental distraught, missing funerals, cancellation of marriages, big events, online, virtual or home-alone religious, literary and art festivals, online shopping slots, own creativities in different media"(Sen, 2020). In M. Shelley's apocalyptic novel *The Last Man*(1826)we get the portrayal of human society towards the end of twenty first century- here the destruction is caused by an unknown disease. In this text are evidently present nineteenth century's culture, practices, socio-political realities and the then ideologies relating infection. The writer's deep knowledge in Medical science is noted here. Insufficient support received from existing medicines at a time when almost every household is being visited by sudden illness and death is painfully recorded in the text.

Now we come to the first half of twentieth century. In J.D. Beresford's *Goslings: A World of Women*, we get an imaginary picture of the death of primarily male folk in plague. An attempt is made on part of the writer to investigate into the fact whether the given situation is favourable to women and their efforts to attain fulfillment or not. From multiple aspects such as radical feminists' demand for autocracy or re-structuring of society at post-apocalyptic phase, this novel sets a landmark. At the time of publication of Jack London's *The Secret Plague*(1915), epidemic is no longer considered as punishment of God. Due to progress of science, the growth of superstition relating epidemic is largely faded then. Against this backdrop looms large man's fear of unseen and unknown world of germs and microbes. The text invites the reader to reflect on the ancestral fear of mankind towards infectious diseases. London portrays how in the initial days of pandemic man hasn't

lost faith in scientists and microbiologists. They have hoped so, that as several times before in past scientists were able to support mankind, that time too they would be able to do so. The society that is portrayed is found to have limitless faith in science. But unfortunately, seeing how mercilessly the body in which the germs enter is led to death and at an amazing speed, man gradually loses all faith in science. London 's horrific account of this, that is, how at times hours even minutes after manifestation of symptoms of infection in a body, the patient dies and the novelist's description of the whole brings in the element of naturalism in his writing. Besides, what makes him contemporary is, here he engages himself with such issues like how fast the corpse is rotten and how it emits germs which further has considerable role in increasing rate of infection. How utterly insufficient support received from available medicines, the deaths of microbiologists at laboratory and the temporary defeat of science create a deep depression in mankind's psyche are also parts of London's concerns in the novel. How the fear of infection has been gradually changing the behavioural pattern of the mob is also poignantly portrayed here. How pathetic is the description where London shows the panicked mob's mad rush to a comparatively less infected destination! No man has ever experienced such fear and panic in his lifetime. Literature portrays how the fear of infection leads to thorough change of human behaviour. Under the constraint of maintaining social distance today we see men, perhaps influenced by their doubts, have started to behave inimically with their neighbours and more so if they are found infected. Around us patients and their families are to face examples of such inhumanity on parts of their relatives and neighbours that on the other hand focuses on man's extreme helplessness in view of infection. That the picture of all pervasive panic that we see in our surrounding is not new but characteristic feature of every age that has seen deaths at colossal scales is revealed through literature.

The author portrays how the crisis develops. Because of pandemic men gradually and consequently are changed into completely irrational and inconsiderate beings. In this novel we see men divided into two groups in their fights against pandemic. Majority tries solely to distance themselves from infected people. The rest, though they belong to minority group, involve themselves in drinking alcohol and other negative activities; they go adrift. Naturally when the graph of fresh

infection starts showing downward movement and the horror of plague recedes, the survivors feel as if they are existing at the fag end of civilization. As per expectation London has tried to understand the reasons behind such destruction and like his predecessors he too blames social issues like capitalism, uncontrolled rise in population leading to unprecedented population density. What is most uncanny is recurrence of natural calamities that go hand in hand with the destructiveness of plague .The whole constantly reminds one that the end of civilization is near. Man reaches the apex point of helplessness and misery and while describing such crisis the novelist appeals to the citizens to maintain mutual love and brotherhood. The point that must be mentioned is that just like 'objective corelative' the people of our present world have been seeing examples of natural calamities during the years of pandemic. Literature even portrays this truth. Just in the context of West Bengal, 2020's "Bulbul", flood of July 2020, "Yaash" in 2021, shortly afterwards death of 27 caused by lightning at our state, are happenings that in an uncanny manner provoke fear relating imminent destruction of civilisation. At large, the rise of water level due to global warming, the increase in temperature of sea and for some such environmental issues lead to repeated natural calamities that make us fearful of our probable extinction in near future. Besides, in *The Secret Plague*, the novelist has also tried to focus the positive role played by social media like newspaper as it was then the only medium through which connectivity can be maintained among Government, different controlling agencies and public. Critics observe rightly: "Even though it was published more than a century ago, *The Scarlet Plague* feels contemporary because it allows modern readers to reflect on the worldwide fear of pandemics, a fear that remains very much alive"(Riva, Benedetti, Cesano, 2014). Thus, the role of media on which we are seeing much discussion in today’s world, also is not excluded from an author's insightful writing. In Camus’ *The Plague* (1947), disease ravages the town of Oran in Algeria. Here though the novelist’s main focus is epidemic, one can find observations about pestilences that are both natural and manmade. A vivid account of ensuing human suffering and mankind’s efforts to combat epidemic is found here. The critic observes: “When confronted with the erraticism of etiology, the arbitrariness of infection, the randomness of illness, we must contend with the reality that we are not masters of this world. We have

seemingly become such lords of nature that we’ve altered the very climate ...and yet a cold virus can have more power than an army. Disease is not metaphor, symbol, or allegory, it is simply something that kills you without consideration”(Simon, 2020).

Now we are at the second half of the 20th century. In Algis Budri's novel *Some Will Not Die* (1954) we get the painful portrayal of the apocalypse caused by epidemic - the loss of ninety percent world population, the most difficult challenge of the survivors to reconstruct the society .In Sakyo Komatsu's *Virus* (1964english translation 2012) we get the imaginary story of stealing the sample of virus from laboratory, of raising the power of virus through research ,incidental spread of virus in European countries where a sudden raise in fatal diseases is observed .The story involves the challenges and difficulties in the process of discovery of restorative drugs and vaccines though the success of the same is finally heard. In Michael Crichton's *The Andromeda Strain* we hear the story of destruction of the human resource of Arizono's Piedmont region caused by unearthly microbes. It is found that this microbe changes its nature with its each cycle of growth. In 1974 comes William C. Heine's *The Last Canadian* where for the first time we see the purposeful spreading of germs over the population of one country against the backdrop of cold war. In O.T.Nelson's *The Girl who Owned City*(1975) novel we see the description of post apocalyptic chaos following the death of the whole population above twelve years of age. Here the message is the necessity of acquiring constructive knowledge. In John Cristopher's *Empty World*(1977) we hear the story of spread of the disease named Calcutta plague worldwide; we see the imaginary story of higher rate of infection and death of adults from the disease. Once more we get the imaginary portrayal of how the lives of children in absence of the adults turn into a mess. Thus, what we presently see that adults are more prone to infection than children, also comes in the imaginary portrayal of apocalypse in writing. In 1978 comes Stephen King's famous novel *The Stand*. Here we further see the failure of distancing strategies. In Frank Herbert's *The White Plague*(1982)we get the imaginary picture of spread of a disease-the germs of which are developed by science-around the world. What is new in the fictional account of epidemic is here women are mostly attacked and men are the careers of germs. Here we see again the imaginary portrayal of sending the whole infected

population to quarantine, the deteriorated condition of law and order in society and the citizens' desperate attempt to find the path of recovery and salvation. We are reminded of this that when first we come to know of the spread of covid 19pandemic, in the pattern of science fiction it has come to our mind that perhaps the virus that has been leading to such massive destruction, gets leaked from science laboratory of a particular country where attempts were being made to originate biological weapon. In Alan E. Nurse's *The Fourth Horseman* (1985) what we see most importantly is whether any commercial matter remains related with the spread of germs across the countries or it gets spread naturally. Relating medicines and vaccines the unnatural greed of pharmacists and chemists gets highlighted in the novel. We have also heard people around us saying that this Covid 19 epidemic is caused by the vested interests of some pharmacists and chemists. In Jean Ure's *Plague After*(1989)we see the portrayal of London against the backdrop of pandemic and cold war. In 1990 comes Pat Murphy's *The City, Not Long After*. Here we get the horrific account of pandemic throughout the world. Very interestingly in Connie Wills' *Doomsday* we see the imaginary picture of our world (during different time zones) ravaged by influenza virus. A reader moves between 14th century and our imaginary existence in between 2054/55.In Gari Paulsen's *The Transall Saga* (1994)we see the destruction of world population caused by dangerously infectious Ebola virus; here we see a doctor's desperate attempt to find the path of recovery from this disease. In the same year comes Jack Mcdevitt's *Eternity Road* where we see the imaginary picture of destruction of human resource because of plague in North America 1700 years ago. How the loss of population implies loss of knowledge and memory is focused by the novelist.

Now we come to twenty first century. Kim Standley Robinson's *The Years of Rice and Salt*(2002)gives us the description of what is probably going to happen if instead of one third, ninety nine percent of world population gets destroyed in epidemic. The plot is set against the time frame of hundreds of years covering significant historical phenomena. In 2006 comes Jonathan Rand's *Pandemia*(2006) where we see the destruction is caused by HSN virus which is actually a different variation of Birdflu virus. How the virus destroys the economy of most of the countries and how the youngsters are trying to save themselves from oncoming chaos and collapse get portrayed here. What we see all around

us is, the survivors are continuously striving to create new structures and are trying hard to adjust with them and interestingly this is something that also comes within the periphery of writing. In Rod Glenn's *The Killing Moon*(2009)we see the loss of seventy percent world population caused by viral pathogen. Most pathetically what we see here is the portrayal of the lives of few survivors who find themselves in a world full of jealousy, greed and conflicts; it is a world full of disintegrating spirits and an uglier place to live in. In Justin Gonin's *The Passage* (2010) we see the attempts are made by councils under security force of a particular country to form human body as powerful as exploding bombs. Further, we hear the story of the germination of virus through research and experimentation. The issue that is necessarily addressed here is whether the virus after entering a human body is increasing its resistance power or not. Interestingly we see the usage of serum for treatment of the diseased. Once more here gets mentioned quarantine and we see how closing their borders the European countries are in self-declared quarantine. At the same time we see the efforts that are made to sterilize the infected areas. Reflection of pandemics in literature make us aware that our present modes of distancing, lock down, quarantine, even our present modes of treatment are not contemporary ideas but they have always been ideologically present and at times underwent experimentation. Then in Ann Agurre's *Enclave*(2011) we see once again the reference to epidemic - the imaginary portrayal of how the citizens of New York take refuge in the underground enclaves. Against this backdrop the story of how an young couple in exile find themselves in an apocalyptic world is heard here. In Emily St. John Mandel's *Station Eleven* we see the cause of epidemic and associated destruction is swine flu here. In Sandra Newman's *The Country of Ice Cream Star*(2014)we hear the imaginary story of the death of all who are of twenty years of age being attacked by a nameless disease so far which has no medicine. There is no treatment as well as no escape from death; the only thing that seems to exist is panic. Rumours relating probable ways of attaining recovery fill the air. In Ling Ma's *Severance* (2018) we hear the story of a spread of pandemic caused by one fungal infection named Shen fever. The disease is heard to be originated from a province of China named Shenzen. Presently we hear the rumour all around us that the meat mongers in Chinese market are to be blamed. But is this anything new? The critic appropriately observes:

"People and media have responded to epidemics by spreading rumour, false information, and portraying the disease as foreign and brought in with malicious intent. ... From Jews in medieval Europe to meat mongers in Chinese markets, someone is always blamed" (Sen, 2020). The picture of collapse of entire social structure because of this infectious disease that has no medicine is present here. We hear that the few people who are able to sustain are supposed to have highest immunity power. The controversy concerning immunity boosting is very much a part of our existence nowadays. In Sarah Pinsker's *A Song for a New Day*(2019) from an artist's viewpoint we get the portrayal of an apocalypse caused by war, particularly epidemic. We see here all the social programmes where there remains the probability of public gathering are declared as illegal. Literature shows us that prohibition on social gathering is also not very new practice during pandemics. Finally, in July of 2020 when already we are in the grip of terror caused by Covid 19 pandemic, there comes Lauren Beuke's *Afterland*. Here we see the imaginary portrayal of death of men folk caused by an epidemic named 'manfall'. In an unprecedented and unknown world of female domination we see the story of a mother's desperate attempt to save her son. The way in which our present society, culture, politics, economic structure, environment become the issues of social and political discussion, literature leads us to understand that it has been part of every age experiencing pandemic. What concerns us today _ the temporary defeat of Science, particularly medical Science _ comes within the periphery of pandemic literature. Besides, researches relating vaccine and probable medicine, many rumours regarding ways of resistance and recovery, the argument and discussion relating whether the virus develops one's resistance power or not are also found to be reflected in writing. Even the fact that has made almost all the doctors of our present era thoughtful, perturbed and tremendously disturbed, that is, the changing nature of virus with its each cycle of mutation, is also there in literature.

Thus, the author of the article has tried to capture how extensively, through ages, the destruction of human population, society, economy, culture is reflected in English novels and science fictions. The parallelism between the reflection of apocalypse and post apocalyptic world caused by pandemic on the one hand and the world we are presently inhabiting, is tried to be aptly established by the author of the

present article. Covid 19 has given rise to a situation that is new to the present inhabitants of this world but the above article leads us to see that literature very prominently portrays the truth that it is not at all new in view of world history. From Classical period up to very last year, in writing are reflected all those aspects that are the topics of discussion of today's scientists, doctors, microbiologists, politicians, social workers and they are there in the thoughts, actions and decisions of every citizen. Doctors say that the world had been originally of virus and microbes. Extended reflections of pandemics caused by virus and microbes in writings highlight this truth. Besides, a change in nature of such reflection is perceived by the present author. An analytical study of pandemic literature shows that from classical period to sixteenth/seventeenth century, connections are tried to be found between human sin and pandemics. From eighteenth century and onwards the focus seems to be on detail descriptions of destruction caused by epidemic. The issues like change in behavioural pattern and criticism of socio-economic structures come to be mostly highlighted then. In twentieth century the role of society behind crisis, self centred nature of mankind, nature of virus, different methods of treatment, distancing, quarantine and together with this the desperate attempt to find the paths of rescue, the death of adults and the struggle of survival on parts of inexperienced minors come to be more and more reflected. In comparison to previous centuries the portrayal of apocalypse tends to be bleaker in twenty first century. The pain of existence being the last few in a post apocalyptic world that is not free from greed and brutality is relentlessly portrayed in writings of twenty first century. We are living an agonized existence. But in all these the truth that can't be ignored is the fight of mankind to sustain amidst all adversities. The reflection of pandemics in literature show us undeniably that the way past gives way to present in the same way since ancient period of time men learning from the past have been advancing towards future conquering the pandemics and associated crises. "We shall overcome some day"."Beauty is truth, truth beauty..."(Keats, 2019). The bitter situation we now find ourselves in, is obviously marked by harsh, rather most cruel reality but it is beautiful at the same time. In man's attempt to stand erect, not to court defeat lies an unbounded beauty. It has remained beautiful ever; the spirit with which man has always fought against all odds and diseases, remains unquestionably beautiful forever.

Salute to man's indomitable spirit which has always taught him not to accept defeat. Finally, the effectiveness of such a study lies in understanding the value, necessity and worth of reading literature itself. "Literature regards each individual with compassion and goes deeper than what Statistics or historical records can tell us. Literature may not explain away or fight off things such as pandemics, even as modern science sometimes can't, but it does become a source of consolation, a way of sharing our common humanist concerns and in its own way, provides the deepest and most insightful record of the events "(Ghosh, 2020).

Works Cited

1. Beckett, Samuel. *Waiting For Godot*. Grove Press, New York, 1954.
2. Ghosh, Avijit. "How Literature Has Helped Us Make Sense of Pandemics', *Times of India*, 27th March, 2020 in https://m.timesofindia.com/india
3. Jones, D. "History in a Crisis-Lessons for Covid 19", *The New England Journal of Medicine*, 12th March, 2020, in https://www.nejm.orgfbclid=1 WAR 2tt8b7-JdIE0 nr W3eAzxlA84#x
4. Keats, John. *Ode on a Grecian Urn,* Kindle, 2019.
5. Riva, Michele Augusto, Marta Benedetti and Giancarlo Cesano. "Pandemic Fear and Literature: Observations from Jack London's *The Scarlet Plague*". *Emerging Infectious Disease*, 2014, October 20(10):1753-1757 in https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pme/articles/ PMC 4193163
6. Sen, Nandita. "Pandemics, Covid 19 and Literary Studies: Past and Present",11thJune, 2020 in https://blogs.ed.ac.uk/covid 19 perspectives
7. Simon, Ed. "On Pandemic and Literature", March 12, 2020 in https://themillions.com/2020/03/on-pandemic-and-literature.html
8. Stewart, George R. *Earth Abides*. Del Rey, 2006.
9. Tilten,Theodore. "Even This Shall Pass Away" in https://www.paulreapoetry.co

Importance of social media to eradicate Cultural issues and to boost Indian economy

Trisha Paul
Assistant Professor, Baikuntha College of Education

Abstract: Today's world cannot run without Internet and Social-media. From the morning to night, at every stage of our daily routine we use internet and social media. They have become an important part of our daily life. India is always renown country for its rich culture, for its multicultural society. But there are many social and cultural issues exist in India which block the country's progress. India being 2nd largest population of the world, is a huge market for the whole world. Indian GDP is 6th largest in the world. Indian economy has tremendous potential to reach the 3rd spot by 2030.

Importance of internet and social-media is increasing day by day. Internet and social-media user are also increasing in a rapid speed. A culturally rich country like India needs to utilise internet and social media to promote its rich culture, to eliminate the cultural issues and also to boost its economy.

Here we will discuss about the social and cultural issues in India. In this study we will discuss about the importance of social media in the modern society to eradicate the social and cultural issues. In this study we will also discuss about the use of social media to boost the economy.

Key Words: Social-media, Internet, Culture, economy.

Introduction: Social-media has become a part and parcel of our daily life. As social-media help us to create a bridge among the people, so it can also be utilized as a tool to stop the cultural issues. Besides this, we can also used social-media to promote our culture and to boost our economy. Social-media is a medium that connect the whole world and it is so much powerful that any information can be spread through social-media very easily. Economicdevelopment is very much important for the development of a huge country like India. Without Economic development a country can not survive; without economic development a country can not prosper. Social media comparatively is very new to our society, but it can play a very crucial role to boost the Indian economy.Similarly, Social-media can be used as a tool to fight against the social and cultural issues in India. Because, social media nowadays is a very popular medium that connected huge number of people. So, we can reach huge number of people with the help of internet and social-media.

Conceptual Framework:

Social-media:

According to oxford dictionary 'social media' means that websites and applications that enable users to create and share content or to participate in social networking.

The term 'social media' is used to describe a variety of web-based platforms, application and technologies that bring people online to interact socially with each other.

Internet:

According to Cambridge dictionary 'internet' is the large system of connected computers around the world that allows people to share information and communicate with each other. Internet is a network that connects people with each other through social media. Internet provides people new knowledge from many online sources. Internet works as a bridge between the people and the world.

Culture: According to Oxford dictionary 'Culture' means the customs and beliefs, art, way of life and social organization of a particular country or group.

Maclver told, "Culture is the expression of our nature in our modes of living and of thinking in our

Economics:

According to Oxford dictionary 'Economics' means the study of how a society organizes its money, trade and industry. "Political Economy or Economics is the study of mankind in the ordinary business of life, it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being". -Alfred Marshall

Social and Cultural Issues in India:

1. **Caste system:** Caste system in India has a root in ancient India. From the ancient period, there is caste system in Indian society. The society was divided into Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Sudra. But in today's Indian society, the society is divided into General, OBC, SC and ST. From the ancient period Indian society faces many issues due to Caste system. The upper class tried to dominate the others. Lower classes in the society were exploited. They are deprived from education; they were kept out of the society. They could not enjoy any social life.
2. **Gender discrimination:** From the ancient period in India our society is facing gender discrimination due to lack of education, superstition. Our Indian society is dominated by male. Child

marriage, female feticide still exists in our society. Still in India girls are not allowed to study in some parts.

3. **Dowry system:**The irony of 21st century is that dowry system still exists in Indian society. The practice of dowry is one of the worst social practices that has affected our culture. Inindependent India, one of the landmark legislations is the passing of the Dowry ProhibitionAct in 1961 by the Government of India. Sometimes it is seen that bribes' parents are happy to give dowry. In the modern society, Government, aware people, NGOs tried to stop the dowry system, for that many laws have been passed. But it still exists in our society.
4. **Communalism:** India is secular country. But still the society is divided into religious identity like Hindu, Muslim, Christian, Sikhs, Jains. Very aggressive attitude of one particular community towards others creates unrest, religious tension, clashes in the society. Hundreds of innocent people are killing in the riots due to communal tension and clashes.
5. **Old age home:**Issuesof old age is increasing in our Indian society day by day. People after marriage are facing difficulty to live with their parents. They are sending their parents to old age home.
6. **Issues related to Poverty and Unemployment:** After the independence India has done a great job to come out from the extreme poverty. But we have not come out of poverty completely. Still, we can see beggar in the streets, temples, hospitals. Beggary gang also exist in the society, they are doing all of that in an organised way. Rate of literacy have increased in India post-independence. Rate of unemployment is also increased in our society due to lack of opportunity of employment. Unemployment in October, 2021 rose to 7.75% from a three-month low of 6.86% in September, data from private research firm Centre for Monitoring Indian Economy Pvt. showed Monday. Rural unemployment jumped to 7.91% from 6.06% the previous month, whereas urban joblessness dropped to 7.38% from 8.62%, the data showed.
7. **Population Explosion:** India is 2nd most populated country after China in the world. Due to population explosion poverty, unemployment is increasing.

Education and Social-media to eradicate the Social and Cultural issues:

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."- Nelson Mandela. Any problem in the society can be solved with the help of education. Education and Social-media can play a crucial role to eradicate such issues.

1. **Awareness Program:**Awareness program among people is very important. We need to aware the people about such issues and apprize them with proper knowledge and understanding. Awareness program can also be organised through social media campaign. We can use social as a tool to spread the proper knowledge.
2. **Tv Ads:** Television is very popular electronic gadgets in our Indian society. Television ads can help to eradicate such issues from the society. Television can easily influence people, so it can be utilized to develop the feeling of brotherhood in the society. It can also be utilized to spread right information among the people.
3. **Film and Short videos:** Proper education to develop the feeling of brotherhood among people can also given by film and short videos. Film and short videos have a tremendous impact in our society. Social-media can help us to reach to every corner of the society.
4. **School Education:** Proper value education can be given in school days to eliminate such issues. For that proper value education need to be given. Proper examples in the text books can also be given to develop proper values in the children.
5. **Internet:** Nowadays Internet has become a huge source of knowledge. Sometimes wrong information creates communal tension, clashes among people. So, internet can be used in a proper way to spread the right information.
6. **Social-media:** Social-media has become a part and parcel of our daily life. So, it can be used to develop the feeling of brotherhood among people. Right information, an inspirational video of unity in diversity can be spread among people to rise the feeling of brotherhood.

Social Media to Boost Indian Economy:

Indian GDP is 6th largest economy in the world. The world sees India as a big market.Unemployment rate in India is increasing day by day. India is 2ndlargest country of internet users in the world after China. Indian use social-media in a massive scale. Social media has a tremendous potential to boost Indian economy.

1. **Opportunity of Employment:**Social-media can create opportunity for employment. India has huge users in social-media. Jobs can be

created to run such hug platforms like google, facebook, youtube, twitter etc. When people have job, naturally unemployment rate will decrease.

2. **Tourism Sector:**India is a culturally rich country. India has many beautiful places to visit; India has many cultural heritage sites. Information regarding these places can be reached to every corner of the world with the help of internet and social media. It will definitely help to boost Indian tourism sector.
3. **Developing Communication:**Although India has numbers of places to visit, communication in India is not great. Internet and social media can help people to reach such places. It will boost the economy of the local area.
4. **Information Technology Hub:**Bangalore is the information technology hub of India. Besides Bangalore, many Indian cities have the potential to develop as global technology hubs. It will create job opportunities for Indian youth.
5. **Need and Demand Supply:**Sometimes it is seen in India that need and demand are not properly balanced. Some organisations need man power, but they can not reach the proper person due to lack of information. Internet and social media can help to reach such people by creating job profiles in many sites.
6. **Spreading Business:**Nowadays people are using internet and social media to do business. Amazon, flipkart are such platforms which help individual to spread their business to the whole world. It also helps to create jobs for delivery agents, courier services.
7. **Online Payment:**The payment mode becomes very simple and easy due to internet and social-media. Now people can share money, purchase items online or offline with a single click. Internet and social-media have eased the business dealings.
8. **Direct transfer of Money:**Internet and social media have helped Government to reach the people of the country. They can circulate various important information because of internet and social-media. Any subsidy can directly transfer to the account of the beneficiary, Income tax submission, any bill can be paid with the help of Internet.

Conclusion: Man is main force behind every machine or any medium. So, only man can utilize the internet and social-media for the welfare of the human beings in the modern society. Like every rose has thrones, social media has also its dark side, so the minimum knowledge to use internet and social media need to be given to the people of India. Proper

understanding regarding internet and social-media need to be developed among people. At the same time, we should aware people what we should share and what we should not share in internet and social-media. Only then we can properly use internet and social-media to enrich our culture and to boost our economy.

Reference:

*A) **Book:***

i) Brindhamani, M. &Manichander, T. (2015), *Peace and value education,* Discovery Publishing House pvt.ltd., New Delhi, pp-46-82

ii) Charles, Dr. K & Selvi, V. A. (2014), *Peace and value Education,* Neelkamal publication pvt. ltd., Hyderabad, pp- 001-326

iii) Mangal, S.K. "Advance Educational Psychology", PHI Learning Private Limited, Delhi, 2018, p-98

iv) Ravi, S.S. (2016), *A Comprehensive Study of Education, phi learning private limited, Delhi, p.p- 560-587*

*B) **Article:***

i) Bernard, John Kolan and Dzandza, Patience Emefa "*Effects of Social Media on Academic Performance of Students in Ghanaian University of Ghana, Legon.*", Library Philosophyand Practice (e-journal).1637 2018

ii) Hoih, Ching Nun "*a study on the effects of social media among the higher secondary students (14 to 18 years) a case of don bosco hr. Sec school on their academic performance in churachandpur district, Manipur*", a thesis for MSW, Assam Don Bosco University, Assam, 2017

iii) Talaue, G. M et. Al. "*the impact of social media on academic performance of selected college students*", International Journal of Advance Information Technology (IJAIT), vol. 8, No 4/5, 2018, pp- 27-35

*C) **Online:***

i. Culture. (2021, November 15). Retrieved from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/culture_1?q=culture

ii. Economics. (2021, November 15). Retrieved fromhttps://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/economics?q=economics

iii. India has a people problem. (2021, December 16). Retrieved from https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-12-16/india-will-likely-get-old-before-it-grows-rich

iv. Internet. (2020, August 25). Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/internet

v. Social media. (2020, July 30). Retrieved from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/social-media?q=social+media

THOSE WHO COULD NOT CROSS

Pallab Das
Assistant Professor of English
Mankar College, Purba Bardhaman, West Bengal

Abstract: One of the major Post-Modern issues in respect of the Indian Sub-continent is Partition. The Partition and the migration in the Bengal side have for long been neglected. Literature related to that in English is hard to find. However, some works may be found on either side of the border written in the vernacular. Society is usually conservative and to trace the narrative detailing the experience of women during partition is a hard nut to crack. However, those who became direct victims of the partition, their experiences, became the main plot of several literary works. But many wanted or needed to cross the border but they could not. They were not killed but they had to live in a land presently alien to them, in a country that no more belonged to them, for the rest of their life. In the present essay the mentions of these people and their condition will be traced in some short stories from the other Bengal, at present, The Republic of Bangladesh.

Key Words: Partition, Marginality, Partition riots, Border, Crossing.

The doors are bolted.
.That is why
I pull open the windows…

- from 'Ferrying' (Kheya Paar) by Subhas Mukhopadhyay
(Translated by Subhoranjan Dasgupta)

With the celebration of Independence in 1947, came the horror of partition that brutally divided the states of Punjab and Bengal and a new country was born. Pakistan – the homeland for the Muslims – was a torn country from the very time of birth. The process of separation that started with the creation of Pakistan ended with the creation of Bangladesh in 1971. Although the partition of 1947 was a result of power politics, the commoners from both the communities – the Hindus and the Muslims - were made to believe that religious difference was the main reason behind it. People from neither community were ready to accept the dominance of the others. Even Mahatma Gandhi became less and less popular, especially among the Muslims, while he was walking for undivided India. Partition came with mass killing, riot, burning of villages and properties, horror of loss and obviously with the mass exodus. The Hindus in Pakistan had to return to their country and the Muslims had to journey to their sanctuary. While the larger part of the

population in the largest democracy was celebrating the newfound Independence millions became homeless, more precisely they had no country now. Those who had minimum hints of the effect of partition chose to exchange properties long before partition. But they were those having properties. The partition of 1947 came as a shock to the commoners. When the border was confirmed, those changing sides were even not allowed to take their belonging with them, in some cases, not even their honour. In the time of the birth of the two nations, even the female body became the occupied territory. While in the Punjab side the partition and the exodus were very prominent and period-specific, on the Bengal side exchange of population has never stopped since then. The commoners in the Bengal side never expected that the partition would uproot them from their 'Desh' until Calcutta, Dhaka and Noakhali experienced the carnage of communal riots. Even after that, some chose not to leave their birthplace. Some could not.

Literature reflects society. But strangely for almost five decades after partition, the affected population chose to be silent about that. Fictional writings were only a few. Memories, narratives were hard to find. A large part of the population on either side of the border was bewildered by the gift called independence. And the part of the population, who had undergone the horror of it, was too shocked to narrate or even recapitulate the experiences of suffering and humiliations. Whatever Partition fictions have been written the major light fell on the refugees, their experiences, the trauma they underwent, riots, religion, communal politics, the women victims and the torture they had faced. But there were many from both genders who neither had to take part in the exodus nor had to face torture or humiliations.

The Parasite: Sonadas Baul

In this context, the character that appeals to me most is that of Sonadas Baul in Imdadul Haq Milan's 'The Ballad of Sonadas Baul' (Sonadas Bauler Kathakata). The story unfolds at Lohjung Market in post-partition Bangladesh. At Gagan-Babu's paddy godown he has a corner. He sleeps there with his two bricks as a pillow and paddy sacks as the bed. Once he used to be a baul. Now age has made him weak, his voice coarse. He runs an errand for Gagan-Babu and against that he has a shelter, sometimes an earning, and no one cares if he takes some rice for him from those scattered on the floor. At this age, Sonadas is quite happy with this much to run his survival. He knew the real face of Gagan-babu.

> Gagan-babu was a sly fox: honeyed words dripped off his tongue. Among all the others in the market, he'd buy at the lowest price. (Milan)

He was aware of the reason behind Gagan-babu's sympathy for a wretched man like him. He was the witness of Gagan-babu's every crime. And probably he was the only one to be made silent against the cheapest bargain. At this age, Sonadas survived because of the allowances made by Gagan-babu. Therefore, he would even run in the dark hours of the rainy night to call Alta, the prostitute, if Gagan-babu needed her to satisfy a client and convince him for a lofty offer.

> In all this what was Sonadas's gain?
> Of course, Sonadas gained something. Gagan-babu helped him live, remember; gave him shelter and money when he ran errands. Whenever he got an opportunity, Sonadas would help himself to paltry nothings lying in Gagan-babu's godown. (Milan)

The news was in the wind that Gagan-babu would join his family at Calcutta. This would haunt Sonadas. But every time he would ask Gagan-babu about it, Gagan would ignore it as a rumour. He would assure Sonadas every time that leaving his land was impossible. But Sonadas was hit by a bolt from the blue when Gagan-babu announced that he was leaving for Calcutta and the godown had been sold.

Milan with his great thinking capability has created here a situation very different from the usual partition fiction. Sonadas is not affected by the trauma of partition. Being a baul, he is neither Muslim nor Hindu. He has no family, no root to care for. At this age, he only needed Gagan-babu's sympathy for survival. While the rich businessman chose to cross the border to settle at Calcutta, Sonadas could not. Neither his physical condition nor his economical condition could afford him a cross border migration. Moreover, Gagan-babu had no need of him at Calcutta. He would not bother what would happen to his reputation at Lohjung Market, once he would step on the other side of the border.

Thus Sonadas too becomes a victim of partition. He could not cross the border. His survival was now in jeopardy. Sonadas and many people like him, especially the aged ones, who mostly depended on others' sympathy for survival, were the expendables. While in Sunanda Bhattacharya's 'The Narrative of Kerech Buri' (Kerech Buri Brittanto) Hemantabala, despite being treated as an expandable, whose family had left her alone in Bangladesh and left permanently for India, chose to decide for herself and was able to manage to cross the border and earn

her living by herself, the case with Sonadas was different. He had learnt to live like a parasite. And now, when Gagan-babu was living he had no other option but to leave himself on destiny.

> With tired steps, Sonadas crossed the field. God alone knows where he was going! In this huge world, there were very few places for him to go to. (Milan)

In reality, at his stage people like Sonadas does not belong to any country. The only thing they belong to is their hunger. Gagan-babu satisfied that. Sonadas belonged to him. But, Gagan-babu decided to settle in Calcutta. Sonadas never had any 'desh' but he had a shelter. Partition snatched that away from him.

The Languid: Noni-da and Boudi

Noni-da and Boudi appear in 'Another Room, Another Voice' (Anya Gharey, Anya Swar) by Akhtaruzzaman Elias. Partition has not only divided a country but it has also divided many families. In this short story, Elias speaks of one such family. Pradeep, the centre figure of the story, comes to Bangladesh from India to visit those of his family who could not leave for West Bengal. The humanity that crossed the borders from either side, were not always welcome in the new land. The rich and the lucky few were able to exchange property. Some managed to settle in the new land with the help of the money they could bring hidden with them. Most of them were unlucky. They were looted, their properties vandalised or groped. They came here empty-handed. A lucky few had relatives on the other side to provide them at least temporary shelter. Others had sheltered in camps, or the refugee mob would sometimes occupy barren buildings in the outskirts of the cities. However, on either side of the border, this new wave of the population was not welcome, they were of the same community, they were own, but they were also outsiders – the others among the own. These families have struggled for decades after settling on the other side. Thinking about making a way for their relatives was a distant hope. The situation for those who settled in West Bengal from East Pakistan, later Bangladesh, was no different. On the other hand mountain of misunderstandings would nestle in the minds of those who were left-back with the hope that they would be taken to the new country once a good settlement is made by the others. Thus not only the family was divided, but they would also live the rest of their life with a feeling of being cheated by their family members.

Moreover, in the newly formed East Pakistan, the Hindus were minorities. Whenever a country is divided in the name of communal or religious differences, the woman wombs become the soft target. They are

treated as territorial properties. Humiliation, taunting were regular events, even rape was a common thing. The condition was really of trauma, horror and pain for the 'minority' families with daughters of ripe age and even young housewives who were vulnerable. Noni-da and his wife represented these people. Their dissatisfaction was evident from their conversation.

> 'We simply can't pack up and leave – can we?' Noni-da drew out the last words at the end of a loud yawn. 'What will I do in India? How will we survive?
> Boudi sat up straight and argued, 'Here you do nothing but eat and sleep. Don't we have to get our daughter married? We can't even send her to college, who will marry her?'
> 'She had completed her matriculation before the trouble began,' she apprised Pradeep. 'At the time your brother had declared, "I'll not let her study here in Pakistan, I'll send her to Calcutta, where she will stay with Didi and go to college." We stayed in Agartala for nine months, neither Didi nor Jamai-babu were bothered about her. East Pakistan became Bangladesh, she returned home and joined college. But all the money went down in drain! Our girls are teased by the very boys we have to placate with donations. Can she ever go to college here?' All the afternoon, Pradeep was told about the daughter's troubles, in great detail. (Elias)

This can be a conversation from any such family. Not only the languid Noni-da and his disgusted wife but also a large part of the new minorities who were waiting for their keens on the other side to do something for them had been facing the same condition. It was becoming worse day by day. Thus Noni-da and his wife were representing those who could not cross the border because they could not dare to depend on their fate. They waited for news from their keens of a safe passage for settlement. But responses were hard to find in the post World War and post-partition volatile economic situation at both micro and macro level. In the new country jobs and shelters were hard to find. While their keens were struggling to survive in the new country, mountains of misunderstanding were nestling in their heart. Distance continued to grow beyond borders. Partition continued to affect – from the large arena of parted nationhood, it was spread in the microcosmic world called family.

The Morbid: Ambujakhyo

Ambujakhyo appears in 'The Cage' (Khancha) by Hasan Azizul Haq. Like Milan and Elias, Haq is also a specialist in excavating different

layers of human psychology and understanding. His focus area being the partition his stories tend to reveal the less touched corners of partition psychology. Often his stories deal with human experiences which are strictly personal but socially significant. Ambujakhyo was an old homoeopathy doctor in post-partition East Pakistan. He had to earn for his four sons, some of whom were already spoilt, his wife and his father, who was still living like a ghost from the past. The condition of the family is in decay. They have an ancestral house that is dilapidated. The main concern for him is –

> But now that the country is partitioned, and we are living in Pakistan, what shall we do now? (Haq)

Twice Ambujakhyo had tried to make an exchange of properties and settle in West Bengal. For twice his attempt got frustrated. Not because like Sonadas Baul he could not afford it, or because he had any hesitation regarding the risk and toil the family had to undertake for this. He could not cross the border because the morbidity of human existence came his way. Once it was his son, Arun who died out of a snake bite. At the other time, it was the sudden accident that paralysed his old father, Kaliprasanna. Personal tragedies shattered his dream of settling in India, which was an event socially more significant. Ultimately old Ambujakhyo realises that there is no way out from this labyrinth. The peace they wanted to have after the settlement was a distant dream on the other side too. The neighbours' love could be avoided, but the paralysed Kaliprasanna was a matter of concern. Amidst such a situation music seemed to be his only escape. He could not talk looking straight at Shorojini, his wife.

> Ambujakhyo remains silent. A little while later he gently declares, ‘We are not leaving, Sharojini.’
>
> To overcome the misery of words, he tries to smile and says, ‘We can’t go, that’s all. And what’s the use? Everybody is starving on the other side too. We can at least get something here.’
>
> Shorojini is unnaturally quiet.
>
> 'It is nice to think about leaving – but actually, do so? All this time we kept talking about it. Now let's see how we feel about staying…' Ambuijakhyo talks in faded words, a desultory voice, 'Everybody loves us here; and then there’s Baba. We can't leave before he dies.'

> Shorojini sits like a ghost, without moving. The disorderly words float ethereal in the misty air. Ambujakhyo takes up the sitar and starts to play. (Haq)

This reminds me of Rabindranath Tagore's 'Hungry Stones' (Khudito Pashan). Like Meher Ali in 'Hungry Stones' Ambujakhyo was trapped in his old dilapidated house with his sitar. Whenever he would want to leave the house death and morbidity would clutch him and crush him as if a spell has been cast on him. Haq takes the deeply personal experience to the level of supernatural and linking partition with it he gives it a social macrocosmic perspective. Therein lies the dexterity of Haq.

For more than five decades after Partition, people on both sides of the border chose to remain silent on Partition and related issues. Only a few writers had addressed these issues in their literary work. Either they were too shocked or they were waiting for the appropriate time. Very recently, during the 1990s voices were raised addressing the strange silence. The scarcity of literary and cultural endeavours regarding the issues in concern was addressed as an important need of the time. Keeping in mind the cordial relation between the two nations, as well as between West Bengal and Bangladesh, serious steps are being taken to relive and rethink their common past and pains, common space sharing. Partition is not only the experience of those who were direct sufferers, migrants or refugees but also of the whole nation that was divided into two. Partition also affected those who didn't migrate, in their way. A discourse on Partition Literature remains incomplete without giving light on the experiences of these people who were the passive sufferers of the partition of 1947 and their mentions in literature. So many untouched fields persist. It is high time we should stop treating Partition as a mere side effect that came with Independence. The issue has its share of history and literature. Researches must be done to explore different facades of it.

Works Cited:

1. Elias, Akhtaruzzaman. "Another Room, Another Voice." Edt.Sengupta, Debjani. Mapmaking: Partition Stories from Two Bengals. New Delhi: Amaryllis, 2011.
2. Haq, Hasan Azizul. "The Cage." Edt.Sengupta, Debasish. Mapmaking: Partition Stories from Two Bengals. New Delhi: Amaryllis, 2011.
3. Milan, Imdadul Haq. "The Ballad of Sonadas Baul." Edt.Sengupta, Debjani. Mapmaking: Partition Stories From Two Bengals. New Delhi: Amaryllis, 2011.

Second Language Teaching Methods: Effectiveness, Limitations and Emerging Activities

Seuli Basak
Ph.D. Research Scholar
University of North Bengal

Abstract : This article focuses on SLT (Second Language Teaching) methodology. We all know that, language is a medium of communication. Without a language we cannot communicate to each other; even we cannot think. Moreover, as now we are living in a 'Global Village', we need to communicate with different language-communities for various purposes. And to communicate with them, we have to know their languages. We may use English all over the world as a 'lingua-franca'; but it is not enough for a good communication. Besides this, if we want to know about any community, their culture etc., we must need to know their language. We cannot even enjoy the authentic taste of literature, if we cannot read the particular language. So learning a second language has numerous advantages. But the process of learning a second language may be sometimes a challenging experience. So the first part of this article intends to introduce the conventional methods of language teaching and to mark the limitations in those methods. Then the second part of this article aims to find out some emerging activities to make the language learning process easier and interesting for the learners.

Key-words : SLT (Second Language Teaching) Methods – Grammar-Translation Method, Direct Method, Audio-lingual Method, S-O-S (Structural-Oral-Situational) Method, CLT (Communicative Language Teaching) Method; Limitations; Emerging Activities – Shadowing, Information Gap, Classic Jigsaw, Cloze Passage Exercise, Dictation, TPR (Total Physical Response), Miming-Guessing, Story Telling, Thinking, Read Aloud, CALL (Computer Assisted Language Learning).

Discussion

Language is a medium of communication. Without a language we cannot communicate to each other; even we cannot think. Moreover, as now we are living in a 'Global Village', we need to communicate with different language-communities from different parts of the world for various purposes. And to communicate with them, we have to know their

languages. We may use English all over the world as a 'lingua-franca'; but it is not enough for a good communication. *Nelson Mandela* once nicely said, *"If you talk to a man in a language he understand, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart."* Besides this, if we want to know about any community, their culture etc., we must need to know their language. E.g. it is difficult to know better about the culture of *Santals* for anyone who does not know the Santali language. Similarly, it is not possible to have a complete idea about *Bengali* people and their culture without knowing Bengali language. That's why language is called the road map of a culture. We cannot even enjoy the authentic taste of literature, if we cannot read the particular language. So learning a second language has numerous advantages. And in a multi-lingual country like India, it's a necessity to know the other languages to communicate with the people from different parts of our own country. The more languages we'll learn, the bigger our world will be. We must have to admit it that, learning a language is the most rewarding and worthwhile endeavour.

Before entering the main discussion, I should mention here that language acquisition and language learning are not same at all. There are similarities as well as differences between first language acquisition and second language learning. *Christopher Brumfit* said, *"Clearly, there are two ways in which the acquisition of a second language must differ from that of a first language. First language acquisition is in some sense the simultaneous development of the faculty of Language as well as of the structure of a particular language, and it is apparently a natural and automatic product of the process of socialization with adult human beings. … It makes more sense to attribute lack of success in second-language acquisition to the issues of age and social context than to the demands of second languages in themselves."*[1] The term 'Acquisition' mainly refers to an unconscious process where no formal instruction is involved. E.g. we all learnt to speak our mother-tongue at a very young age through the process of 'Language Acquisition'. On the other hand, 'Language Learning' is mainly about conscious knowledge and the application of rules and structures. And a very formal instruction is involved in it. The present article intends to focus on the second one i.e. language learning process only.

There are a fascinating variety of methods in SLT (Second Language Teaching) process. The effectiveness and limitations of some influential teaching methods such as Grammar-Translation Method, Direct Method, Audio-lingual Method, Structural-Oral-Situational Method, Communicative Teaching Method are highlighted here.

- **Grammar-Translation Method**

This language-teaching method is also known as Classical or traditional method. It is rooted in the formal teaching of Latin and Greek. This method became very popular in the late 18th century and in the early 19th century and in modified form it continues to be widely used in some parts of the world even today.

The main purpose of this method is to enable learners to read and translate. This method emphasizes the teaching of the target language grammar and the technique of translating from and into the target language. The grammar is taught in deductive process; and the vocabulary is taught through memorization with the help of bilingual dictionaries. Thus learners can enrich their vocabulary, though the process is quite laborious and monotonous too. *Mikulecky and Jeffries* suggested to use the dictionary more effectively, *"Along with the definition, a dictionary provides a great deal of other information about a word. It tells you the part of speech of the word (noun, verb, adjective, etc.), how to pronounce it, and how to divide it into syllables. An example sentence is often included as well."*[2]

In this method, learner's native language is the medium of instruction. It is used to enable comparisons to be made between the target language and the learner's mother-tongue. Thus learners can get a clear idea about the syntax of the target language. Because the structures of the target language is best learnt when compared and contrasted with that of the mother-tongue. Learners are expected to attain high standards in translation in this method.

But communication skills are totally neglected in this method. It is one of the major limitations of this method. Almost no attention is paid to speaking and listening. In this Grammar-Translation Method, the teacher is an authority and in control of the classroom. The role of the learners is almost passive here. That's why this method often creates frustration for learners. But it is still used in situations where understanding literary

texts is the primary focus of foreign language study and where the speaking knowledge of the target language is not much required.

- **Direct Method**

The Direct Method of second language teaching was developed as a reaction to the Grammar-Translation Method, in an attempt to integrate more use of the target language. The goal was now to prepare learners to use the language communicatively, something which Grammar-Translation method failed to do. Instead of studying the target language analytically, students may learn through direct and spontaneous use of the target language. In this method, oral communication is practiced by the teacher asking questions to which students have to answer in a full sentence. Concrete vocabulary is explained through demonstration and visualization, not through the simple translation into the student’s native language. Grammar is taught inductively in this method. Correct pronunciation and grammar are emphasized. Students are encouraged to self-correct and not allowed to use their mother-tongue in the class. In a broad sense any method which does not use the learner’s mother tongue, may be called Direct Method.

Now let’s have a look at the limitations of this method. This method is focused on spoken language mainly; reading and writing skills are less focused. It simply perceives oral communication as a basic skill. Whatever reading and writing exercises they do, are based on what the learners have first practiced orally. Another major limitation in this method is that, the learners must need to have a minimum knowledge of the target language. E.g. we can apply direct method in teaching Bengali language to only those learners who have a basic idea of Bengali language. That is, we can apply this method to Assamese, Bihari, Odia etc. native speakers in Bengali Second language teaching. This method is appropriate when the target language and the learner’s first language belong to the same language group or at least they have some mutual intelligibility. So this method may not be effective in foreign language teaching.

- **Audio-lingual Method**

While the Grammar-Translation method and the Direct method were largely developed in Europe, the Audio-lingual method was mainly developed in America. But then it became popular in many parts of the world. It appeared under a few other names also. In the middle of 20th

century it was mostly called the Aural-oral method. It is also known as 'Audio-lingual Habit Theory', 'Functional Skills Strategy' etc.

It was among the first theories to recommend the development of language teaching theory derived from linguistic and psychological principals. This method was influenced by B. F. Skinners 'Operant Conditioning' theory. According to this theory, habits are acquired through reoccurring behaviors. As such, it is thought that the way to acquire sentence patterns of the target language is through conditioning. In practice, this means drilling of such patterns through repetition and memorization. Foreign language learning is basically a process of mechanical habit formation. Since it is considered a major difficulty for learners to overcome habits of their native language, the teacher is aware of the areas in which learners will experience difficulty. The teacher uses only the target language in the classroom just like the direct method, so that the learner's native language does not interfere with the acquisition of the target language. The teacher gives the learners positive feedback when they answer correctly, to make them develop correct habits. *Diane Larsen-Freeman* said, *"Language learning is a process of habit formation. It is important for teachers to prevent student error since errors can lead to the formation of bad habits."*[3] This method emphasizes the need for practice rather than for explanation. In this method learners enjoy learning to use a language from the very first day. This method uses dialogues as the chief means to present the language. Correct pronunciation, stress, rhythm, and intonation are focused in this method.

As one of the most popular methods in the history of foreign language teaching, the audio-lingual method is of some great contributions to language teaching. In this method the learning process is viewed as the habituation and conditioning without any intervention of any intellectual analysis. Thus this method offered the possibility of language learning without requiring a strong academic background. So this method can be accessible to large groups of ordinary learners.

Following are some of the catchy tag-lines of this method:

1. Language is speech, not writing.
2. A language is what its native speakers say, not what someone thinks they ought to say.
3. A language is a set of habits.
4. Teach the language, not about the language.

One of the major limitations in this method is that, it is focused on spoken language mainly; reading and writing are less focused. This method was criticized for its exaggerated emphasis on oral drilling. Besides this, the techniques of memorization and drilling can be tedious and boring too. So the language trainer should be inventive and resourceful if the audio-lingual method is to be successful. The trainer should be able enough to prepare interesting and motivating teaching materials.

- **S-O-S (Structural-Oral-Situational) Method**

In the later half of the 20th century extensive research was conducted on language teaching. This caused the emergence of the Structural-Oral-Situational Method. This method is an improvement upon the direct method.

In this method sentence is taken as a teaching unit. Structures are taught through situation. Selection of structure is done on four principles – usefulness, productivity, simplicity and teachability. The principle of usefulness suggests teaching of those structures, which occur more frequently in real life situations. Structural approach distinguishes two types of structures – productive and non-productive structures. Productive structures are those with which other structures can be built. Naturally productive structures are given more importance since the mastery of such structures enable learners to construct other structures by themselves. The form and meaning of structure decide its simplicity and some structures can be taught easily through demonstration. In this method, mastery of structures is more important than acquisition of vocabulary. This method intends to emphasize the learners' activity rather than the activity of teacher.

Well equipped teachers are must required for effective application of this method. Another major limitation in this method is that, it is focused on spoken language mainly; writing skill is less focused. Language teaching begins with the spoken language. Material is taught orally before it is presented in written form.

- **CLT (Communicative Language Teaching) Method**

Earlier the goal of language teaching was mainly to enable learners to read literature in the target language. But later, the goal had become to enable learners to use the language communicatively. Sometimes we can observe that the learners are not being able to communicate naturally,

though they are able to write sentences accurately. For this reason, educators started questioning if they were going about reaching the goal in the right way. Thus, Communicative Language Teaching (CLT) emerged.

An important factor in making communication authentic is meaningfulness. So this method focuses on conveying meaning, not form. According to this method, the teacher is not an authoritarian controller of correctness who checks the errors made by learners. Instead, the teacher serves as a guide, whose job is to set up activities likely to promote authentic communicative situations. This method includes communicative activities like choice, feedback, and information gap. First, the speaker should have a choice of what to say and how to say it. Second, the speaker should be able to evaluate whether he/she has expressed meaning successfully from the feedback he/she receives from the listener. In those oral activities, errors are overlooked as a natural outcome in trying to make oneself understood. Use of the learner's native language is not to be avoided in the same degree as the Direct Method. Learners are allowed to use their native language if they feel stuck in their attempt to communicate. Additionally, if the learners do not understand the explanation to a certain activity, teacher may use their native language in this method.

Emerging Activities

The most common language teaching activities in the modern classroom are quite different from those of a few decades ago. Active learning involves students directly and actively in the learning process itself instead of listening to a lecture and taking notes only. Following are some of the effective language teaching activities, which can be followed to make the learning process easier and more interesting.

- **Shadowing**

Shadowing helps the learner to speak more accurately. It is as simple as playing a sound file of a native speaker and speaking aloud with the audio as best as we can. If the learner is interested in skills like pronunciation, clarity of speech, accent reduction and reading at native level speed, shadowing is most effective to them.

- **Information Gap**

It is a term used to describe a variety of language activities with one common feature. It uses as its premise the idea that one learner or group of learner has information that others do not have. Thus the point of information gap activity is to have learners interact with each other in an attempt to find all the missing information.

- **Classic Jigsaw**

There are many variations of Jigsaw. But in a classic jigsaw, a teacher divides the learners into four groups. A text is also divided into four, with one part for each group. After each group has finished reading the assigned section, learners form new groups, with one member from each original group represented. Students now report information to the members of the new group, and every learner should take notes on each section of the reading. That's why Jigsaw tasks are said to improve cooperation and mutual acceptance within the group. This activity gives the learners a chance to serve both as a reader, a speaker, and a listener, which naturally encourages interaction.

But this activity has some limitations too. It may not be effective at the beginners level, it is best used with intermediate and advance level learners. Besides this, *Friederike Klippel* said *"If your students have not yet been trained to use the foreign language amongst themselves in situations like these, there may be a few difficulties with monolingual groups when you start using jigsaw tasks."*[4]

- **Cloze Passage Exercise**

The word 'cloze' means 'fill in the blank' or 'missing information'. A cloze passage generally has missing words or phrases in the form of a space. Learners listen to an audio clip, either recorded or spoken, and attempt to fill in the blank with the missing information. A word bank may be provided, and the audio is generally listened to more than one time.

- **Dictation**

Dictation can simply mean 'write down exactly what I say', and this may seem like an audio-lingual technique. Dictation activities are often still used today to help introduce learners to new vocabulary or ideas, and to practice their listening and writing skills. Dictation activities also can give learners a chance to interact if done in groups.

- **Total Physical Response (TPR)**

It was a method of instruction that allowed learners to learn language through a chronological event filled with gesture and movement, and gave learners a chance to be silent while observing language. While few teachers today follow the techniques used in this method, a number of communicative teachers still use some of the techniques commonly recognized as TPR. Today teachers continue to use elements of TPR especially when helping learners to build vocabulary.

- **Miming and Guessing**

In this activity, objects, actions or people have to be mimed by the learners. The mimes are done in pairs or groups or individually. Since the speed of the guessing depends on the quality of the mime, less inventive learners may not be such performers as others. In spite of these possible drawbacks, miming activities are valuable language learning situations. Guessing something is linked with the real desire to find out and thus is a true communicative situation. Furthermore, miming exercises train the learners' skill of observation and improvisation. Finally, miming exercises are useful because they emphasize the importance of gesture and facial expression in communication.

- **Story telling**

The aim of this activity is to get the learners to produce longer connected texts. For this activity learners will need imagination as well as some skill in the target language.

- **Thinking**

An excellent way of practicing is to think in target language. Even when the learners are alone, perhaps in a bus, train, or simply looking out of a window, they may try to describe to themselves in the target language whatever they see. And at the end of the day, they may try to describe the events of the day in target language. This will help them practice the past and present perfect tenses.

- **Read Aloud**

While this has been called in many different names, the basic concept behind a 'Read Aloud' is to give learners the chance to comprehend a reading by having it spoken out loud either by the teacher, or with a partner or small group. Read aloud activities give learners a variety of strategies for reading, listening, and speaking. Some of the various types

of this activity are Choral Reading, One by One Reading, Dramatic Reading, Physical Response Reading, Paired Reading, The Leader and The Choral Response Reading, Silent Reading etc.

- **Computer Assisted Language Learning (CALL)**

In the 1990s the personal computer emerged as a significant tool for language teaching and learning. The widespread use of software and the internet has created enormous opportunities for learners to enhance their communicative abilities, both by individual practice and by tapping into a global community of other learners. As a tool for drill and practice in the four skills (reading, speaking, writing and listening), grammar and vocabulary, computer has repeatedly demonstrated its usefulness as a taskmaster. Instant feedback to learners can be provided for every answer, correct or incorrect. Besides this, tutorial and drill on the computer can provide more than a teacher in the classroom. The activities may be repeated without requesting the teacher to repeat. The learners may watch a video of native-speaker's facial movements while learning the pronunciation. They can watch animated videos demonstrating articulatory organs that are otherwise hidden. Although reading long passages on the computer screen is not recommended, reading skill programs can enhance reading speed by paced reading activities, where lines of text are scrolled with pre-determined timing. Such activities are time consuming for the teacher to prepare manually. Computers can also enhance all aspects of the writing process, allowing easy revision, spell-checking, increasingly sophisticated translation suggestions and grammatical advices. Besides this, to be accustomed to the target language, learners may watch films, serials, reality shows, news, lectures, interviews etc. delivered in target language on a variety of topics as per their choice available on the internate.

Now the question arises that which method and activity should we choose. There is no specific answer to this question. In this context *Richards and Rodgers* said, *"Language teaching has evolved a considerable body of educational techniques, and the quest for the ideal method is part of this tradition. The adoption of an integrated and systematic approach to language curriculum processes underscores the limitations of such a quest and emphasizes the need to develop a more rigorous basis for our educational practice."*[5] We know that, each learner has his/her a distinguished and unique learning style. Also the

capacity of learning is different from each other. So which method works with one learner may not work with another. Besides this, different activities may be appropriate to different contexts. As language teacher, we should be aware of the various methods, approaches and activities; but ultimately, we need to use our discretion in deciding on which method to use and when. It depends on the learners' level of language proficiency, their needs, and the circumstances in which they will use the target language in future and so on.

References

1. Christopher Brumfit, *Communicative Methodology in Language Teaching: The Roles of Fluency and Accuracy*, Cambridge University Press, Cambridge, First published 1984, Sixth printing 1990, p. 33-34.
2. Beatrice S. Mikulecky & Linda Jeffries, *Advance Reading Power*, Pearson-Longman, USA, 2007, p.27.
3. Diane Larsen-Freeman, *Language Teaching Methods*, Office of English Language Programs, Washington D.C, 1990, p.2.
4. Friederike Klippel, *Keep Talking: Communicative Fluency Activities for Language Teaching*, Cambridge University Press, Cambridge, First published 1984, Ninth print 1991, p. 41.
5. Jack C. Richards & Theodore S. Rodgers, *Approaches and Method in Language Teaching: A Description and Analysis*, Cambridge University Press, Cambridge, First published 1986, Fifteenth print 1999, p. 166-167.

Bibliography

1. Beatrice S. Mikulecky & Linda Jeffries, *Advance Reading Power*, Pearson-Longman, USA, 2007.
2. Carol A. Chapelle, Shannon Sauro (ed.), *The Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning*, WILEY Blackwell, Hoboken, USA, 2017.
3. Christopher Brumfit, *Communicative Methodology in Language Teaching: The Roles of Fluency and Accuracy*, Cambridge University Press, Cambridge, First published 1984, Sixth printing 1990.
4. Diane Larsen-Freeman, *Language Teaching Methods*, Office of English Language Programs, Washington D.C, 1990.

5. Eric Bodnar, *The Emmersion Method: How to learn any language to fluency the fun and easy way*, USA, Fourth edition, 2019.
6. Friederike Klippel, *Keep Talking: Communicative Fluency Activities for Language Teaching*, Cambridge University Press, Cambridge, First published 1984, Ninth print 1991.
7. Jack C. Richards & Theodore S. Rodgers, *Approaches and Method in Language Teaching: A Description and Analysis*, Cambridge University Press, Cambridge, First published 1986, Fifteenth print 1999.
8. Kate Wolfe-Quintero, Hae-Young Kim, Shunji Inagaki, *Second Language Development in Writing: Measures of Fluency, Accuracy & Complexity*, University of Hawai'i, Mānoa, 1998.
9. Ludivine Crible, *Discourse Markers and (Dis)fluency: Forms and functions across languages and registers*, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 2018.
10. Rod Ellis & others, *Implicit and Explicit Knowledge in Second Language Learning, Testing and Teaching*, SLA Series, Multilingual Matters Ltd, Bristol, 2009.
11. Rosamond Mitchell, Florence Myles, Emma Marsden, *Second Language Learning Theories*, Routledge, London, First published 1998, Third edition 2013.
12. Višnja Pavičić Takač, *Vocabulary Learning Strategies and Foreign Language Acquisition*, SLA Series, Multilingual Matters Ltd, England, 2008.

A feminist study of tribal women in selected works of Mahasweta Devi

Madhulina Bauri
Assistant Professor, Surendranath College

Abstract: This paper attempts to study the plight of tribal women as depicted in the works of Mahasweta Devi through feminist perspective, focusing on bonded labour, prostitution, rape and witchcraft. Feminism as a set of ideas and concepts that stands for a distinctive and established socio-political ideology developed during the second half of the 20th century.

Feminism covers all issues degrading and depriving women of their due in society. However, the concerns that feminism raises do seem alien to tribal inhabitants. Mahesweta Devi writes about the issues concerning tribal groups. She was a crusader in fighting for the rights of tribal communities and one of the founding members of the Denotified and Nomadic Tribes Rights Action Group. Through the depiction of different tribal women, I would try to argue that not all women are depicted as victims, rather some women irrespective of their educationor upbringing put forward a resistance towards the so-called patriarchal society. Tribal women are depicted not as victim but as crusader of free will and strength.

Key words: Subaltern, patriarchy, feminist, aboriginals, resistance, gender stereotypes

Mahasweta Devi is one of the most distinguished social activists among the contemporary Bengali literary artists. She took up her pen to expose the sham and fraudulence of the political system in our country and to represent the fates of marginalized women undergoing untold miseries within and without their own communities.

Mahasweta Devi's ***Outcast***: Four Stories is a discourse on the pathetic plight of four marginalized women characters—Dhouli, Shanichari, Josmina and Chinta. In these stories, Mahasweta Devi actually envisages a three-tier hierarchical structure in the Indian social order composed of the rungs of the non-marginalized or the mainstream, the marginalized or the subordinated, and finally the outcast or the marginalized by the marginalized. In these stories she intends to expose

the gendered causes lying underneath the socio-political and economic exploitation of three women belonging to a backward minority. The writer reveals the virtual slave trade that festers under the facade of the democratic society of India, and clearly indicates the plight of these women who usually have no one to turn to, nothing to look forward to, and have only a few to lend them a voice—women who are regarded as sub-human and treated as commodities both without and within their own communities.

Patriarchy in Indian society is treated with utmost honestly. Dhouli is an eye opener against the politics of higher caste and Intra caste. Even though things are changing but its changing at a very slow rate. Despite financial independence, a woman' identity is defined in terms of men. To be born a woman is considered a curse in society, and if you belong to the marginalized society, you are doubly cursed. Dhouli is a tribal woman, an outcast who suffersbecause of her unrequited love for a Deota (a higher class) and because of her fate, as her husband dies at a very young age due to fever. Her beauty and charm reserves for her more genital mutilation, when she is sexually exploited by Misrilal, a higher class Deota. When shegets pregnant, Misrilal's mother says that its her sin and exempted her son from any responsibility towards the child. A mother in Indian society is only an object of gratification and duty. This is also evident in the case of Kundan's wife. She bore three child of a man who never loved her. She is just a pleasurable object. A woman is worshipped if she gets pregnant after marriage, whereas the same woman is ostracized from society if she bears a child out of wedlock. Dhouli is asked to abort the child by her mother: "get rid of the thorn in your womb". After Dhouli refuses to give up her child, her mother takes her daughter and entrust Sanichari to make Dhouli Infertile after the baby was born. Here again we witness an affirmative attempt to remove the womb as a social factory for reproduction. Dhouli's mother was quite aware of the plight of young girls and refuses to let her daughter produce more lanourers for upper caste desire and entertainment.

Dhouli's story could have been different is society has given her a chance to redefine her life,being a widow, she cannot marry, but she can play the role of a concubine for her brother -in-law. Dhouli is not only a story of women's oppression but also honour killing. When she was denied any kind of job, she chose the path of sexual economy, she

realizes that her family canonly survive if she has financial independency at the cost of anything. Dhouli's decision is a revenge against upper class politics and hegemonic male society as she says , "*you landlord people, you take whatever pleases you , if you want to take my honour ,take it then. Let me bethrough with it*" This story makes it clear that women's identity in most part of India is identified with their sexualized body as they can procreate. This biological determinism is best represented in the philosophy of Aristotle who categorizes woman as body and man as soul, therefore she is inferior to him as animals are to humans. Freud and Lacan, the French Philosophers also define woman as a castrated state, as lacking or deficient by comparison with the masculine and depict civilization as the law of the Father. In Devi's most troubling enquiry, she asks, has nature got used to the Dhoulis being branded as prostitute or is it nature, sky, ocean which was not made by the Misrars' have become their private properties?This provocative rhetoric raises questions about the naturalization of gendered commodification of reproductive systems, according to the logic of Bourgeois patriarchy.

In ***Douloti the Bountiful***, Devi explores the exploitation of female reproductive system, this time focusing on the reification and commodification of virgin flesh in the Himalayan District of Uttar Kashi, which she fictionally calls Seori. Devi narrates the epistemic gendered violence of decolonization in which fathers unknowingly and knowingly sells their wives and daughters into bonded sex labours to pay off their debts, which they never could inreality. In both instances the protective structure of the family is abandoned. In this story, women are just merchandise, commodities, and unquenchable male sexual desires have created a premium demand for flesh untouched hymen. In *Douloti* we will examine the conditions of tribals post-Independence and see that instead of improvement in their conditions it continued to deteriorate under the nation state as decolonization seldom reaches the poor. Devi conforms to the same ethnographic accounts narrated in ***Dhouli*** that the young pubescent girls is a saleable commodity on the sexual market. Tribals were happy living in the forest and mountainous region with distinctive cultures and self-sufficient economic systems until they were dispossessed of their lands by deforestation and land conversion. Catapulted into the patriarchal, capitalist society they were frequently lured by moneylenders into the debt trap. These changes in turn transform

their familial and communal relations, preventing them from carrying on their parental roles as breadwinners and caregivers.

The bonded labour system is a continuing socio-economic illness in post-colonial India. Though it is prohibited through the Bonded Labour System Abolition Act it is still in practice largely affecting the most vulnerable class, tribes and especially tribal children and women-n who has no resource but their body and labour. The fictional village Seora, a feudally oppressed rural village in the Bihar District, functions as a metonymy of tribal India. Once tribal homeland, this village is know run by the land owner Munabar Singh Chandela, a Rajput, who retains the land through the help of his son, an important government Officer. He hires the forest Tribe Nagesia, expelled from the jungles and mountains, and subsequently makes a fortune by exploiting their labour. Just as Munabar profits from bonded labour, the brahman Paramananda becomes powerful as he entraps tribal women through debt and pimpsthem out for his own profit. Brothels are described as a productive and profitable factory for small capitalist businesses. It shows how resourceful persons gets more powerful in post- colonial capitalized India whereas the poor and marginalized sections of society are dehumanized and becomes products themselves. When all things are shaped by the language of market and calculated and quantified as economics there is no room for value systems prioritizing human relations, morality and ethics. Not only men but women to take part in establishing this capitalist patriarchal system. Rampiyari, the manager of Paramananda whorehouse was herself a victim of debt, but she makes use of other women when she has the upper hand in the capital centred logic. The empathy that might be expected from a victim is stripped off and replaced with envy, competition and individuation. Exploitation by debt bondage in the novella primarily focuses on Ganori Nagesia and his daughter Douloti. The loan of 300 rupees entraps Ganori in bonded labour. His labour is all purpose, but when his marketability ends, it is inherited by the 14-year-old Douloti, entrapping her in bonded prostitution. The upper caste predators connive in determining Douloti's fate. Tribal women are doubly denigrated and exploited not only in terms of caste and gender but also by capitalist and patriarchal Indian society. These women are sacrificed for their husbands and fathers in default. Even they are treated by their own family members as commodity once their role is fulfilled as

mothers or wives. Their existence is reduced to gender roles and duties in their patriarchal households. Douloti is transferred from one master to another and she knows that "there will be a loan as long as my body is consumable". These women have no rights even over their reproductive powers, they are forced to abort if they get pregnant and if they give birth the children lie around the market place. They are thus exploited doubly, firstly by the capitalist bonded labour system and secondly by the patriarchal system in post-colonial India.

But Mahasweta Devi has not only portrayed women as victim but women as a storehouse of resistance. The first story in *Imaginary Maps, "The Hunt*" celebrates the transformation of local festival into an act of emancipation when Mary Oraon, the Adivasis young girl, kills her tormentor and possible rapist just before the act of rape. Traditionally hunting is an activity performed by men because they have been considered the food provider of families. On the other hand, hunting also embodies a hierchical relationship between the prey -the weak objectand the predator. Therefore, hunting as given a chance to men to historicize their male identity under the premises of strength, power and domination. Mary is born of an Oraon mother and an English father and is a young woman of untamed spirit: "Eighteen years old, tall, flat- featured, light copper skin. Usually, she wears a print sari…At a distance she looks most seductive, but up close you see a strong message of rejection in her glance. You wouldn't call her a tribal at first sight. Yet she is a tribal." She is an iconoclast in her own respect, challenging the norms of society. The narrator constantly states that Mary involves herself in activities considered as demonstrations of masculinity. Mary's capacity to work hard shows that her female nature is weak. Her capacity to perform in both conventional male and female spheres challenges biological and socio-cultural delimitations about polarized gender identities. Mary's protectionist attitude is another evidence of gender reversal. She tells the villagers of the tremendous profits Tehsildar is getting with their trees. She loves a Muslim boy, Zaalim, but is tormented by the lustful offers of the Tehsildar. She decides to solve the problem by herself. Powerful as a man in chauvinistic society, Mary's aggressive nature reverses her femininity. Her machete is the symbol of her power. With it she faces Tehsildar and kills him in the hunt. Mary transgresses the stereotypical images about women deconstructing the traditional patriarchal gender

identities associations. Mary's attitude, temperament and behaviour deny any biological determinism or God given law stated over the male and female sex. Sexes as well as genders are distorted by social practices. Even though, Mary's attitudes can be considered grotesque for her female nature, her intelligence, strength and courage subvert any misogynistic conventions on gender. Devi Mahasweta's *TheHunt* is a social portrait of the contemporary transformations in gender roles and relationshipspeople are suffering in everyday life.

Draupadi: Mahasweta Devi's story 'Draupadi' was first published in 1978 in Bengali in her collection, Agnigarbha. The English translation-by Gayatri Chakravorty Spivak- came out inthe Critical Inquiry journal in 1981 and later in her collection Breast Stories in 1997. The backdrop to the story is the Naxalbari movement of West Bengal which started off as an armed revolt of landless peasantry and tribal people against landlords and money lenders.

Besides exploring the dialectical tension between of the exploited tribals and the Nation-state represented by the figure of Senanayak, the narrative also throws up significant issues of gender oppression, marginality, masculinity, female subjectivity, language, and identity. Set against the politically charged atmosphere of West Bengal in 1971, the story is centred around a young Adivasi woman Dopdi Mejhen and her husband Dulna Majhi who support the Naxalite rebels referred to as "gentlemen revolutionaries" as informer-activists. Dopdi and Dulna are wanted in connection with the killing of Surja Sahu, the upper caste landlord of Bankuli village for his atrocities against the tribals. Dulna is hunted down in the forest under 'Operation Forest Jharkhani', and Dopdi, who carries a prize money on her head is eventually apprehended. Torture and rape follow when she refuses to disclose the names of her accomplices to Senanayak, the army chief and 'a specialist in combat and extreme left politics.

The next day she is brought before Senanayak bloodied in body but indomitable in spirit. She laughs at Senanayak refusing to clothe herself and challenges male authority and power.

Thus, she emerges as an agent through a dramatic re-articulation of her identity. For the first time, Senanayak with all his theoretical knowledge of the tribals, even about information storage in their brain cells, fails to comprehend her moves and is "afraid to stand before an

unarmed target, terribly afraid (402). In other words, by refusing to be the object of a male narrative, Dopdi asserts herself as 'subject' and emphasizes on the truth of her own presence- she constructs a meaning which Senanayak simply cannot understand. Rajeswari Sunder Rajan (1999) points out that Dopdi does not let her nakedness shame her, her torture intimidate her, or her rape diminish her (352). Her act of defiance, she states, is a deliberate refusal of a shared sign-system (the meanings assigned to nakedness and rape: shame, fear, loss) and an ironic use of the same semiotics to create disconcerting counter-effects of shame, confusion and terror in the enemy. According to Gayatri C Spivak, "Dopdi is what the

Draupadi who is written into the patriarchal and authoritative sacred text of male power could not be", although her final assertion in her essay "Can the Subaltern speak?" is that the subaltern cannot speak which denies the gendered subaltern the ability to represent herself and achieve voice agency. However, contrary to the voicelessness of Spivak's subaltern, Dopdi creates a counter-narrative by using her body and sexuality as the locus of resistance. This feminist response to the myth of Draupadi, the icon of womanhood in Hindu mythology, deconstructs the representation of women, cultures, images, stereotypes and archetypes. VedaVyasa's epic The Mahabharata centres on Draupadi, the daughter of king Drupada and the common wife of the five Pandavas. She came from no mother's womb but out of a sacrificial yagna (fire-ritual). Being born so, as a full-grown captivating woman, she was destined to act "as an instrument of the gods," to bring about the rule of peace through destruction— to restore dharma (righteousness) through war. In the last five thousand years or so, after all accretion and deduction of the epic itself, the epic heroine Draupadi sets a canon of her own for all her beauty, charm, eloquence, intelligence, and personality. Mahasweta Devi's Draupadi, quite unlike the epic heroine, is a tribal-turned activist woman who fights a subaltern's fight, goes underground, gets caught, disrobed and raped. When she is asked, she refuses to put on her saree thrown on her and appears before the army officer stark naked, in a semiotically revolutionary gesture. The body, that matters most to the rapist police forces and their guru Senanayak, is the object of their subjugation, a tool to level subaltern resistance. Ironically, they can only mutilate the body but can never subdue the spirit; what is apparently a

female disgrace is sardonically shot back to her male counterpart. Standing at anepic distance, at a different space and time, Mahasweta's Draupadi tends to be a significant departure from, and extension to the ancient one. In Mahasweta's story, the title character, then a new-born girl, was given the classical name 'Draupadi' by her maid-servant mother's employer Surja Sahu's wife in a most condescending manner. It is a name she hardly fits intofor her low class and caste, and so, the name has been rarely used or preserved. In the tribal community her derivative/tribalized name 'Dopdi' rather conforms better; even in the SpecialForces' dossier, she is Dopdi Mejhan, with the beyond-the fence aloofness from her Sanskrit counterpart. Dopdi, is born 'other.' She has no splendour of birth and ethnicity. She claims no entrance to elitist education and ethics. She knows, she is being discriminated against and subjugated by the social and economic apparatuses of the local lords and the distant government. Her lords have changed nomenclature but not the spirit of the bygone rulers. To use Franz Fanon's words, it's a "Black Skin White Masks," situation. For her, the postcolonial era hasn't truly arrived. She remains doubly colonized: as part of the tribal community and as a female. Like Draupadi, she is protective about honour and conscious about her pure blood, if not royal: "Dopdi's blood was the pure unadulterated black blood of Champabhumi". Spivak aptly calls her "a palimpsest and a contradiction"

REFERENCES:

1. Devi, M. (1995). Imaginary Maps (G. C. Spivak, Trans). Routledge. (Original workpublished 1993).
2. Spivak, G. C. (1995). Afterward. Imaginary Maps (pp 197-205). Routledge Menon, R. (2005). The Mahabharata: A Modern Rendering (Vol 1): Rupa.
3. Basak, Suresh Ranjan: Canonizing the Drapaudis in Mahasweta Devi's "Draupadi", Journal of Interdisciplinary Studies in Education, Volume 9, Issue 2 (2020), pp. 223-233
4. Mahasweta Devi (1990) The hunt, Women & Performance: a journal of feminist theory, 5:1,61-79.
5. Dr. Ruchika Chauhan, Gendered Subalterns in Mahasweta Devi"s "The Hunt", InternationalJournal of Science and Research (IJSR), Volume 5 Issue 9, September 2016, pg-1179-1183

THE KARAM FESTIVAL AND WOMEN SOCIETY OF THE TRIBAL COMMUNITY

Jagannath Mahato
Research Scholar, Depatment of History,
Jadavpur University

INTRODUCTION: Karam Puja dates by and large falls in the long stretch of August or September. Karam Puja event is praised on the eleventh moon of Hindu month Bhadrapada. Karma Puja is considered as most sacred by the clans like Munda,Bhumij Oraon, Bhijhwari, Baiga, and Majhwar. On this day individuals go to Karam Devta to get favors. Karam Devta, the image of Nature, is adored as the whole ancestral network is, for the most part, subject to Nature for their occupation. This day is likewise significant for the siblings and sisters as the sisters appeal to God for the prosperity of their siblings. Indeed, even the couples appeal to God for a cheerful matrimonial life. Whatever might be the reason, Karam Puja is a vital piece of the ancestral network of different states. Karam is a reap celebration. The celebration likewise has a nearby connection to Nature. Individuals love trees during this celebration as they are a wellspring of vocation, and they petition the compelling force of Nature to keep their farmlands green and guarantee a rich reap. It is accepted that the love for good germination expands the fruitfulness of grain crops. Karam/Karma Devta/Karam Devis (the God of intensity, youth, and energy) is revered during the celebration. The ritual for Karam festival starts with the pounding of rice in the dheki by women, dheki is a wooden implement, to obtain rice flour. This rice flour is utilized to make a nearby delicacy, which can be sweet just as pungent. This delicacy is cooked toward the beginning of the day of the Karam celebration for utilization and shared all through the area. At that point, the individuals start the custom and hit the dance floor with a yellow sprout tucked behind their ear. A piece of the Karam tree is passed on by the Karma craftsmen and went among them while they are singing and moving. This branch is washed with milk and rice brew (privately known as hariya). At that point, the branch is brought up in the center of the moving field. In

the wake of presenting the legend - the story behind the revering of Karam (Nature/God/Goddess) - all the people drink alcohol and spend the whole evening singing and moving; both are fundamental pieces of the celebration. Women celebrate and move to the beat of drums and people tunes (siring). The Puja is trailed by a network feast and the drinking of hariya. The following day, the Karam tree is sprinkled with the curd.[i]

KEY WORDS: Karam puja, Women, God, Dance, Celebration, Tribal community

GEOGRAPHIC AND ETHNIC DISTRIBUTION:

The Karma is celebrated by all the lower-caste Hindus and aborigines in the eastern areas of Madhya Pradesh, that is Mandla, Balaghat, Bilaspur, and north of Raipur and in the northern half of Durg in Chhattisgarh. It is also celebrated in the Jashpur, Raigarh, and Sarangarh areas which merge with the region of the Kaimur Range. On the Chota Nagpur plateau the Karma festival and dances are in a flourishing state. Thus, Karma does not extend beyond the limits of Singbhum to the east or beyond Nagpur in the west; in the north it extends only upto Mirzapur, and southwards just to the northern parts of Durg and Raipur districts.[ii] The absence of the Karma in the south-eastern parts of the Raipur district (which merge into the Muria country) and in the south-eastern corner of Durg (the Oundhi and Panabaras areas, where we find some rare specimens of concentrated Gond culture), is in itself a very significant phenomenon. The Karma is not known in Bastar, or in the northern region of the Godavari district. This region is strongly influenced by the Gond culture of Bastar. Geographic distribution by itself shows that the Karma is not a part of the indigenous Gond culture; it has been superimposed on the Gond and allied tribes through contact with tribes living in the border areas. Thus it has been influenced either by the culture of the adjoining province or through migration of tribes belonging to some prominent neighboring group. This leads us to an inquiry into the problems of the particular tribes in Madhya Pradesh among whom details of the Karma festival are still preserved in an elaborate form and into their links with tribes outside the province.

The ethnic distribution of the Karma dances and songs within the geographic limits mentioned above-in some cases accompanied by ritual,

in others without ritual-is of primary importance. The subject sheds light on some moot points regarding: 1) the origin of the Karma festival; 2) the tribes which are special representatives of the ancient Karma worshippers, both in Madhya Pradesh and in the adjoining regions; 3) the technique of the ritual, dances and songs; 4) the popularity of the Karma dances and songs and 5) the religious significance attached to the Karma, as it is observed today.

All the agriculturists from among the lower-caste Hindus of Chhattisgarh, Mandla, Balaghat and all the way up to Nagpur, dance and sing the Karma. The language of the Karma songs is always the same as that of the eastern Hindi dialects. These forms have not reached those areas where the people speak Gondi, Marathi or Telugu. In Chhattisgarh, the Karma is very popular among the Rawat, Kosta and Panka.

Among the tribes, the Gond dances the Karma with great enthusiasm. The same can be said, with even greater truth, of the Baiga, whose Karma songs are famous. They know a variety of Karma dances.[iii] It is interesting to note that all the other tribes say that they have migrated into this province from somewhere else. The Baiga and the Bhumiya are the only two tribes who maintain that they belong here, that they have never migrated. They claim to be the original inhabitants of the province. The Karma songs of the Ghasia are well known, and still more famous are the Karma songs and dances of the Majhwar of Bilaspur. The latter also preserve the ritual worship of Karam raja or Karam devata in the form of the Karma tree. A few of their neighbours, both Hindus and tribals, imitate them in this respect. Equally famed are the Sahis' Karma songs and their ritual which is identical with that of the Majhwar.

Now, the Ghasia, Majhwar and Sahis are dispersed in great numbers in the bordering areas, in the Chota Nagpur and Mirzapur districts. Besides, in regions outside of Madhya Pradesh and especially in Chota Nagpur, the Hindu agriculturists dance the Karma more vigorously than the Bhuiya, Munda and Oraon (the latter have their Jadur and dormitary dances first, and the Karma dances afterwards). This has led S .C. Roy to conclude that the Karma festival and dances were borrowed by the Mundu tribes from the Hindus.5 But in Madhya Pradesh and Mirzapur, though the lower-castes among the Hindus observe the Karma,

the inspiration is most certainly from the aborigines, from the Baiga, Majhwar, Sahis and Gond in Madhya Pradesh and from the Majhwar and Sahis in Mirzapur.[iv]

THE MANNER OF OBSERVING THE KARMA FESTIVAL:

Mirzapur: The Karam festival is observed in Mirzapur in a very simple manner. It begins on the eleventh day of the bright half of the month of bhado'0 and lasts for at least ten days. Men fast on that day and wear a thread on the right arm over which some crude spells are recited. Then they go into the forest and cut a branch of the Karam tree, which they set up in the courtyard. The men bow before it and the women decorate it with red lead. Then they get drunk, dance round it and sing Karam songs. The festival is an occasion for wild license and debauchery. It is understood that if any girl takes fancy to a man, she has only to kick him on the ankle during the dance and the parents get the pair married." [v]

During the dance, men and women stand opposite each other; they advance and retreat to the music of the sacred drum.The dance continues the whole night; the next morning the branch is carried in a procession by the men and immersed in a tank or a stream outside the village.

Bihar and Orissa: The Oraon observes the Karam festival with zeal. The chief elements of the ritual include:

1. Cutting three branches of the Karam tree, which are called Karam raja.
2. Carrying the branches into the village dancing ground, accompanied by dance and music.
3· Dancing and singing throughout the night.
4. Garlanding the branches the next morning reciting the Karam legend.
5. Offering flovvers, rice and curds to the branches.
6· Red Karam baskets full of grain are placed in front of the branches and some ceremonially nurtured barley seedlings are distributed among the boys and girls, vvho put the yellovv blades in their hair.
7. The branches are lifted and carried by the vvomen through the village and then immersed in the stream.[vi]

Among the Hill Bhuiya, the Karma is observed as follovvs: the men plant the Karam tree on the altar, while the women make a continuous 'hurhura'

sound. The girls bovv lovv before the Karam branch and say, '0 Karam Raja, 0 Karam Rani, we are making Karam-Dharam night.'It is interesting to note that the Hill Bhuiya, unlike the Oraon and Munda, do not have any special dances for the Karma.[vii]

Madhya Pradesh: The Majhwar in the Madhya Pradesh dances the Karma dance in the asarh (.June-July) and kunwar (October-November) or at the beginning of the rains. The Gaota or the village-headman or the Baiga priest fetches a branch of the Karma tree from the forest and sets it up in his yard as a notice and invitation to the village. After sunset all the people, men, women and children, assemble and dance round the tree to the accompaniment of a cJrum known as mandar. The dancing continues all night and in the morning the host picks up the branch of the Karam tree and consigns it to a stream, at the same time regaling the dancers with rice, pulse and goat's meat. This dance is a religious rite in honour of the Karam raja and is believed to keep sickness at bay and bring prosperity. The Bunjhwar of Bilaspur perform the Karma ritual in the same way as the Majhwar.[viii]Among the Savar and Sahis of Bilaspur the same customs are observed with respect to the ritual. The Gond in the Bilaspur district and even the low-caste Hindus, like the Ahir, Kosta, Panka and Ghasia perform the Karma ritual in the manner mentioned above. However, the Karma does not form a nucleus of the indigenous Gond culture. In the south-eastern part of the province and in Bastar, where the Gond culture is found in a concentrated form, the Karma ritual is not observed at all. Nor is it observed in the western part of the province where the Gond are found in considerable numbers. It seems from this that though the Gond in the eastern portion of the province observes the Karma ritual and though the Karma dances and songs are so popular among them, it is an element borrowed from the local culture rather than from their tribal or Gond culture. The Baiga are adept Karma dancers but they do not seem to observe the ritual as do the Bunjhwar with whom they have racial and cultural affinities.[ix]

CONCLUSION: The Karma is not an indigenous part of the Gond culture, but seems to be the product of the Kolarian or Munda culture. In Madhya Pradesh, the Baiga, Majhwar and Savar are the people who chiefly practise the Karma, and the rest of the tribes have copied them.

The Karma ritual is observed by Bilaspur tribes alone; in the rest of the eastern part of the province, the Karma dances and songs have been amalgamated with the ritual of the Jawara festival. It is very popular among the Gond and the Hindus all over the province. The Karma or Kadamba tree thus recedes into the background in the land of the Gond. There is only one solitary instance known to us (cited by Hislop) where the Karma or Mundi wood is used by the Gond to make Nurma Pen (a god in the Gond pantheon) in Chhindwara. There is no other instance in the Gond religion where the Karma tree is looked upon as sacred. The Karma dance, also owing to the deterioration of the ritual in the province, exists only as a social traditional dance of the rainy season, and we find people dancing the Karma even in summer and winter.

REFERENCE:

---

[i]) W.Crook,Tribes and Castes of N.W.P.and Oudh, Calcutta,1986

[ii]) E.T.Dalton,The Descriptive Ethnology of Bengal,Calcutta,1872

[iii]) V.Elwin,The Baiga,London,1939.

[iv]) S.C.Roy,The Mundas and their country,Calcutta,1912

[v]) It can also begin on the fourteenth day, called Anantchaudas,Crooke.1896.

[vi]) Roy,Oraon Religion and Custom,Ranchi,1928.

[vii]) Roy,The Hill Bhuiyas,

[viii]) R.V.Russell and Hiralal,Tribes and Castes of the Central Provinces,1916.

[ix]) Russel and Hiralal,op.cit.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik
2582 3841

Ebong Prantik
2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182, 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 750/-